অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়
অলৌকিক জলযান

অলৌকিক জলযান

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

করুণা প্রকাশনী । কলকাতা-৯

অলৌকিক জলযান
অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

অখণ্ড সংস্করণ
প্রথম প্রকাশ – মাঘ ১৩৬৮

প্রচ্ছদ : পূর্ণেন্দু পত্রী

আবেদন

নুক্, কিন্ডেল, কোবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে, পিডিএফ-এ বেশীরভাগ সময় থাকে না।) ইত্যাদি প্রথমদিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই ভাবতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক, শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।

॥ এক ॥

১৭ই মে—১৯৫৩।

এ-ভাবে সোনা ক্রমে হেঁটে যাচ্ছে। ক্রমে সেই দিনগুলো থেকে, জন্ম থেকে সে এভাবে ক্রমে হেঁটে যাচ্ছে যেন। বড় হতে হতে চার পাশের মুগ্ধতার ভিতর কখন যেন কঠিন কিছু আবিষ্কার করেও সে হেঁটে যাচ্ছে। নস্কর বাড়ির লাল পাঁচিলের পাশ দিয়ে সূর্যের আলো আসছে। সে তার ভিতর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ক্রমে সূর্য ওপরে উঠছে, সে তখনও হেঁটে যাচ্ছে। ক্যাম্বেল হাসপাতাল পার হয়ে সে হেঁটে যাচ্ছিল সারপেনটাইন লেন ধরে, তারপর সে আরও কিছু দূর গেলে দেখতে পেল ট্রাম যায়। তবু সে হেঁটে যাচ্ছে। তাকে ধর্মতলা, চৌরঙ্গী পার হয়ে যেতে হবে। সবুজ রেমপার্ট সামনে। ফোর্ট উইলিয়ামের দুর্গ বাম দিকে। এবং এভাবে আর কিছুদূর হেঁটে গেলে শিপিঙ অফিস। সে সেখানে হেঁটে হেঁটে আর পারছে না। চোখ মুখ দেখলে বোঝা যায় তার অশেষ যন্ত্রণা। সরল সহজ চোখ দুটো দুঃখে টস টস করছে।

এভাবে সোনা শিপিঙ অফিসে আসছে-যাচ্ছে। মাসতার দিচ্ছে। জাহাজের খবর হলেই বড় বড় মাসতার পড়ে যায়। সে দাঁড়িয়ে থাকে সবার সঙ্গে। হাতে জাহাজী ছাড়পত্র 'নলি'। ঠিক যেন অনেকটা ধর্ম-পুস্তকের মতো সে দু হাতের ভিতর নলিটাকে ধরে রাখে। দেখলে মনে হবে সে প্রার্থনা করছে।

সবাইকে এমনভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বড় আম গাছের ছায়া ক্রমে ছোট হয়ে যায়। মানুষের ছায়া ক্রমে ছোট হয়ে আসে। জাহাজ থেকে কাপ্তান বড় মিস্ত্রি নেমে আসেন। ওরা যত কাছে এগিয়ে আসে তত বুকটা কাঁপে। সোনা তখন সোজাসুজি তাকাতে পারে না পর্যন্ত। সে প্রথম সফরে যাবে। প্রথম সফর বলে, অভিজ্ঞতা নেই বলে কেউ তাকে নিতে চায় না।

তার যন্ত্রণা বাড়ে। বোর্ডের লেখাগুলো সব এক এক করে মুছে দেওয়া হয়। আর কোনো জাহাজের খবর নেই। আজ আর কোনো জাহাজ থেকে জাহাজী রিক্রুট করতে কেউ আসছে না। সে তবু বড় আম গাছটার ছায়ায় দাঁড়িয়ে থাকে। যেন মনে হয় সে আজ হোক কাল হোক, কোনও জাহাজ পাবেই। বয়স যতই ওর কম হোক, অভিজ্ঞতা কিছু না থাকুক, একদিন না একদিন সে ঠিক সবার মতো জাহাজ পেয়ে যাবে। তার আকাঙ্ক্ষা তখন বাড়ে।

মাঝে মাঝে সোনা দেখতে পায় একজন বুড়ো মতো মানুষ তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকেন। সাদা লম্বা দাড়ি। চুল ছোট করে ছাঁটা। সাদা পাজামা। ঢোলা পাঞ্জাবি গায়ে। হাতে একটা লেদার ব্যাগ। মাসতার শেষ হয়ে গেলে তিনি এসে কিছুক্ষণ বড় আম গাছটার নিচে দাঁড়ান। কি যেন দেখেন। বোর্ডে পরদিন কোন কোন জাহাজ নোঙর ফেলছে খুটিয়ে খুটিয়ে দেখার স্বভাব। জাহাজ না থাকলে লোকটাও ঠিক ওর মতো চুপচাপ ফিরে যায়।

চারপাশে সব মানুষেরা জাহাজ পেয়ে যখন হাসি ঠাট্টায় মসগুল অথবা কেউ না পেয়ে যখন চুপচাপ চলে যাচ্ছে তখনও দুজন মানুষ দাঁড়িয়ে থাকে—একটা খবর না পেলে চলছে না। জাহাজ না পেলে ওরা আর বেশীদিন এই বড় শহরে থাকতে পারছে না।

সোনা দেখল তখন পাশে নদী। নদীতে কত জাহাজ। জাহাজের মাস্তুলে নানা বর্ণের নিশান। কোথাও জাহাজ রঙ হচ্ছে। কোথাও কোনও জাহাজ থেকে নাবিকরা নেমে ট্যাকসি ধরে শহরের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে—। আর তারা দুজন জাহাজের অপেক্ষায় মাসতারের অপেক্ষায় চুপচাপ গাছের ছায়ায় যেন কত যুগ ধরে দাঁড়িয়ে আছে।

বুড়ো মানুষটা একদিন বললেন, তুমি বাবা জাহাজ পাচ্ছ না?

সে বলল, না চাচা।

—এত কম বয়সে তো জাহাজে নেয় না।

—আমার ‘নলি’ আছে। ভদ্রা জাহাজ থেকে ট্রেনিং নিয়েছি।

—নলি দিয়ে কিছু হয় না। সফর না দিলে কিছু হয় না।

—আমার তবে হবে না?

বুড়ো মানুষটা সামান্য হাসলেন। হবে না কেন, হবে। তবে খুব ঝামেলা। বুড়ো মানুষটার মুখে চোখে আবার সেই কঠিন চেহারা। যেন এই মানুষ নিত্যদিন সফর করে জাহাজের সমস্ত খবর অথবা বলা যায় প্রাচীন নাবিকের মতো চোখ-মুখ এবং তিনি জানেন, সফরে কি যে কঠিন অভিজ্ঞতা। তুমি ছেলে নাবালক বলা চলে, ভাল করে দাড়ি গোঁফ ওঠেনি, তুমি ছেলে জাহাজে যাচ্ছ, তুমি তো জান না, সমুদ্র কি ভয়ঙ্কর, ঝড় কি ভয়ঙ্কর, সি-সিকনেস কি কঠিনভাবে নাড়া দেয়, রক্ত উগলে দিলেও তুমি নিস্তার পাবে না। আর সেই দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রায় হোম-সিকনেস এক কঠিন অসুখ। তুমি যাবে জাহাজে এটা চাট্টিখানা কথা!

আসলে বুড়ো মানুষটা বুঝি আর কথাই বলতেন না ওর সঙ্গে। কারণ চোখ-মুখ দেখলেই টের পাওয়া যায়—বুড়ো মানুষটা তাকে ভীষণভাবে উপেক্ষা করছেন। সব খবর না নিয়ে তোমার আসা ঠিক হয়নি ছেলে। তোমার জাহাজী ট্রেনিং এক, সমুদ্র সফর অন্য রকম। কিন্তু ওর বলার ইচ্ছা ছিল, চাচা, আপনি যা ভেবেছেন আমি তা জানি। আমি জানি সব। আমার বয়সের কথা আমি টের পাই। আমার চেহারার ভিতর একজন মায়াবী মানুষের ছবি আছে টের পাই। জাহাজে এমন মানুষের ছবি থাকা ঠিক না আমি জানি। তবু চাচা আমাকে অনেকটা পথ হেঁটে আসতে হয় এখানে। যতটা আমাকে ওপরে নরম মনে হয়, ভেতরে ভেতরে আমি তত শক্ত। জাহাজ ধরতে না পারলে পৃথিবীতে আমার দাঁড়াবার আর কোনও জায়গা থাকবে না চাচা।

সোনা বলল, আপনি জাহাজ পেয়েছেন?

বুড়ো মানুষটা বললেন, না। আমার জাহাজ আসছে। দু-চার দিনের ভিতর এসে যাবে।

—কোন কোম্পানির?

—ব্যাঙ্ক লাইন।

—জাহাজের নাম?

—এস এস সিউল ব্যাঙ্ক।

—জাহাজে ওরা আপনাকে নেবেই?

—নেবে না! কি যে বলছ! বলে একটা হাই তুলল বুড়ো মানুষটা। বাসটাস ধরতে হয় এমন একটা ভাব। কেমন নিশ্চিন্ত ভঙ্গী। আর তার তখন মনে হল যারা আসে সবাই একে একে জাহাজ পেয়ে যায়। সে পায় না। সে বলল, আমি যে কি করে জাহাজ পাব?

বুড়ো মানুষটা বললেন, আমার সঙ্গে তুমি যেতে পার। বলেই কি ভাবলেন—না না ঠিক হবে না। তেলের জাহাজে তুমি বরং যাও। পার তো মোটর ভেসেলে। কয়লার জাহাজে তুমি পারবে না ছেলে।

সেই এক কথা। বার বার সে এমন কথা শুনেছে। শুনেছে ভীষণ হাড়ভাঙ্গা খাটুনি—ঠিক খাটুনি বলা যায় না, প্রায় ক্রীতদাসের সামিল কাজ। সে বলল, আমি পারব না কেন চাচা?

—পারবে না ছেলে। চোখ-মুখ দেখলেই ওরা বুঝতে পারে কে কেমন মানুষ। মাঝ দরিয়ায় একটা কিছু হয়ে যাক ওরা চায় না। তাও যদি দুটো-একটা সফর থাকত তবে নিতে সাহস করত।

সোনা বুঝেছিল বুড়ো মানুষটা জাহাজে সারেঙ অথবা টিণ্ডালের কাজ করেন। দেখলেই বোঝা যায় অনেক সমুদ্র-সফর ওঁর মুখের রেখাতে। তিনি সহজেই সমুদ্র সম্পর্কে সব বলে যেতে পারেন। বলে যেতে পারেন সমুদ্রের নোনাজলের হাওয়া একবার গায়ে লাগলে কি হয়। তিনি বলে যেতে পারেন—পৃথিবীর কোথায় কি মানুষ আছে, তারা কিভাবে বাঁচে। সব

মানুষেরাই এভাবে নানা কারণে সব কাজ পারে না। তখন সোনা আর সাহস পায় না বলতে, আমি ঠিক পারব।

বুড়ো মানুষটা বললেন, সিউল ব্যাঙ্ক জাহাজটা আসলে জাহাজ না। জাহাজ হলে তোমাকে আমি নিতাম। সে যত কঠিন কাজই হোক না। আসলে ওটা একটা ইবলিশ। ইবলিশ বুঝতে পার?

—না চাচা।

—ইবলিশ জান না? ইবলিশ মানে শয়তান।

তারপর মানুষটা একেবারে চুপ। কিছু বলছেন না। সাদা পাতা মুখে দেবার স্বভাব মাঝে মাঝে। কৌটা খুলে সাদা পাতা জিবে ফেলে দিয়ে বললেন, আর দাঁড়িয়ে কি হবে। জাহাজ তো আর আজকে নেই। কাল তিনটে জাহাজ আসছে। বোর্ডটা একবার ভাল করে দেখে যাও। ক্ল্যান কোম্পানীর জাহাজ পাও কি না দ্যাখো। ভাল জাহাজ। কাজ কম। খাবার-দাবার ভাল। দু-তিন মাসের পচাগোস্ত অন্তত খাওয়ায় না। লম্বা সফরেও বের হতে হয় না।

সোনা কিছু বলছিল না। সে জানে, কালও এমনি আসবে। কালও সে এমনি ফিরে যাবে। পুরানো জাহাজিরা সফর শেষে ছ-সাত মাস বসে থেকে জাহাজ পাচ্ছে না। সব কপাল। কপাল ভাল থাকলে কেউ কেউ দু-তিন মাসেও জাহাজ পেয়ে যায়। সে তো এই পনের-ষোল দিন হল মাত্র ক্রমান্বয় মাসতার দিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং মনে হল—এই বুড়ো মানুষটাই তাকে কেবল রক্ষা করতে পারেন। সে, যে করে হোক তাকে সহজে ছাড়ছে না।

—জাহাজটা শয়তান কেন চাচা?

—ওটা কোন আমলের জাহাজ কেউ বলতে পারে না। কেউ বলে ডেনিসদের ওটা যুদ্ধ জাহাজ ছিল, কেউ বলে পালের জাহাজ, আবার কেউ বলে, প্রথম মহাযুদ্ধে জাহাজটা খুব ঘায়েল হয়েছিল। মাঝ দরিয়া থেকে মাঝিমাল্লারা টেনে কার্ডিফে নিয়ে যায়। চক্ পাল্টে, বয়লার পাল্টে ওটাকে ওরা কার্গোসিপ বানিয়ে ফেলে। কিন্তু ঘাড়ে শয়তান চেপে আছে। পুরানো জাহাজ কখন দরিয়ায় যে খসে খসে পড়বে কে জানে!

সোনা বলল, মানুষ এমন জাহাজে যায় সফর করতে!

বুড়ো মানুষটা পেট দেখাল। এটা ছেলে, এটা।

—আপনি যাবেন!

—যাব না! বলেই চোখ বুজে ফেললেন। যেন কতদিন পর তার অতি প্রিয়জন আসছে।

—বারে বা এ তো বেশ। সোনা খুব চিন্তায় পড়ে গেল। চোখ খুলছেনই না। যেন ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছেন। জাহাজটা বুঝি সাদা রংয়ের—কি আশ্চর্য নীল জলের ওপর দিয়ে জাহাজটা আসছে। সে এবার জোরে ডাকল, চাচা!

—হুঁ। বলেই চোখ মেলে হাসলেন। দুনিয়ায় দুজন কাপ্তান আছে জাহাজটাকে চালাতে পারে। একজন উইলিয়াম, বুড়ো মানুষ, হিগিন্স আরও বুড়ো। শেষ বয়সের বিয়ে। বৌ পালিয়ে গেছে। ছোট একটা ছেলে আছে। জাহাজে কাজ করলে অবশ্য এমন হামেশাই হয়। ছেলেটাও একটা ইবলিশ। বাপের সঙ্গে সঙ্গে জাহাজে ঘুরে বেড়ায়, পড়াশোনা করে না, বেহদ্দ পাজি।

ওর মনে হল বুড়ো মানুষটা কথা বলতে ভীষণ ভালবাসেন। আর কি যে কারণ থাকে কখনও কখনও মানুষ সহসা সবকিছু মন খুলে বলে দেয়।—আমারও কেউ নেই ছেলে। আমি আছি, দরিয়া আছে আর আছে তিনটে জ্যান্ত কসবি। জাহাজের তিনটে বয়লার। এই কসবি তিনটেকে বাগে আনতে পারে মাত্র দুজন সারেঙ। হ্যাঁ দুজন সারেঙ। বুড়ো মানুষটা কানের কাছে ঝুঁকে কেমন ফিস ফিস গলায় বললেন, মোহব্বত না থাকলে ছেলে জাহাজ চলে না। বয়লার স্টিম দেয় না।

সে বলল, আর কেউ পারে না চাচা?

—না। দুজনই পারে। একজন ইমানুল্লা, আর একজন এই বুড়ো মানুষ। ইমানুল্লা আসছে। খুব লম্বা, ঢ্যাঙা মানুষ। তুমি দেখলেই বুঝবে—কি শক্ত হাত-পা, মাংস, শরীর শুকিয়ে গেছে। কেবল হাড় কটা। লোহা পুড়িয়ে পুড়িয়ে যা হয়।

সোনা বুঝেছিল, বুড়ো মানুষটা এনজিন সারেঙ। তাকেও এনজিনে কাজ করতে হবে। কোলবয় হয়ে জাহাজে উঠতে হবে। একজন এনজিন সারেঙের সঙ্গে পরিচয় থাকা ভাল। সে বুড়ো মানুষটাকে ছাড়তে চাইত না। যখন যেখানে দেখা হত দাঁড়িয়ে গল্প করত।

পরদিনও দেখা। বুড়ো মানুষটা দোতালা থেকে নামছেন। সিঁড়ির মুখে সে দাঁড়িয়ে। কি ছেলে জাহাজ পেলে?

—না।

—একবার ওদিকের ব্যারাকে চলে যাও। সিটি-লাইনের জাহাজ আসছে। বোর্ডে কিছু লেখা হচ্ছে না। ওরা শুধু ক্রু নিতে আসছে। মাল খালাস-টালাস হবে না। তেলের জাহাজ। কাজ করে সুখ আছে। জাহাজটা খুব বড়। মাঝখানে ফোকসাল। দেওয়ানী তেমন লাগবে না। সারেঙ মজিদ মিঞা। স্টারবাক সাহেব কাপ্তান। ইয়র্কে বাড়ি......

ওর মনে হল বুড়ো মানুষটা জাহাজের এন্তার ফিরিস্তি দিয়ে যাবেন। যেন পৃথিবীর কোথায় কোন সমুদ্রে কোন কোম্পানির কটা জাহাজ আছে, জাহাজের কি কি সুখ-সুবিধা, কোন কাপ্তান কেমন, কে নতুন কাপ্তান হয়ে কোথায় আসছে, কাপ্তান কি কি পছন্দ করে, এবং দরিয়ায় মানুষের জন্য আর কি সুখ-সুবিধা রাখা দরকার—অন্যান্য দেশের দরিয়ায় জাহাজিরা কি কি পেয়ে থাকে, ওরা কি কি পায় না, আসলে সব সময় ওর মাথার ভিতর বুঝি জাহাজী খবর ঠাসা থাকে। পৃথিবীতে আর কোন জীবন আছে, সুখ-দুঃখ আছে বুড়ো মানুষটা বুঝি জানেন না। অথচ তার দেরি হয়ে যাচ্ছে, বুড়ো মানুষটা কথা থামাচ্ছে না। মাসতারে সে সবার শেষে পড়ে যাবে। অবশ্য শেষে আগে বলে কিছু নেই। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা। ছায়া ছবির মতো বড় মালোম, মেজ মালোম অথবা মেজ মিস্ত্রি এসে সার সার দেখে যাবেন। 'নলির' ওপর উঁকি দেবেন। ক' সফর, কনডাকট এসব দেখে ঝুড়িতে মাছ তুলে নেবার মতো তুলে নেবেন। ওর 'নলি' দেখে যদিও কেউ নেবে ভাবে—ওর মুখ দেখে কেউ নেয় না। জাহাজে কঠিন কদর্য শক্ত মুখ চোখ না হলে সমুদ্রের সঙ্গে যোঝা কঠিন। বড় মালোম মেজ মিস্ত্রি এটা জানেন।

সে তাড়াতাড়ি টিনের সেড পার হয়ে ক্যান্টিনের পাশ দিয়ে বের হয়ে গেল। রাস্তা পার হলে অন্য পাশে লম্বা দোচালা টিনের ঘর সব। সামনে মাঠ। কিছু ফল-ফুলের গাছ। এবং তার ছায়ায় মানুষের জটলা। সিটি লাইনের জাহাজের নাম গন্ধ নেই। সে আরও দ্রুত হেঁটে গেল। ভাল জাহাজ, কাজ কম, কম সময়ের সফর, বেশীদিন এক নাগাড়ে সমুদ্রে থাকতে হয় না। সে যত যাচ্ছে তত এসব মনে হচ্ছে। বেশ হয় জাহাজটা পেলে।

কে যেন তখন খবর নিয়ে এল—আসছে আসছে। লাইনে দাঁড়াও। সবাই যে যেখানে ছিল লাইনে জুটে গেল। খুব লম্বা লাইন। এনজিন রুমের জন্য ওদিকটায় মাসতার পড়েছে। সে ছুটে গেল ওদিকটায় একটু জায়গা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল। চেনা জানা দু-একজনকে সে দেখতে পেল। ওর সঙ্গে ওরা ট্রেণিং নিয়েছে। এখনও জাহাজ না পেয়ে ঘুরছে। সে ওদের দেখে কেমন সাহস পেল সামান্য।

না, সেই এক রকমের ব্যাপার। নলিটা উঁকি দিয়ে দেখলেন মেজমিস্ত্রি। তারপর কাগজে টোকা মারলেন। এবং একবার চোখ তুলে ওর মুখটা দেখেই কি ভেবে আর আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। সে বুঝতে পারছে না কেন এমন হয়। এই যে মেজমিস্ত্রি, ভীষণ সুপুরুষ, লম্বা, মাথায় এংকোরের ছবি আঁটা টুপি। কাঁধে দুটো করে সোনালি স্ট্রাইপ, এবং সিগার টানছিলেন। তিনিও তো এ জাহাজেই কাজ করছেন। সে আর দাঁড়াল না। ওর ধারণা, বেশী দেরী করলে

সেই বুড়ো মানুষটাকে সে হারিয়ে ফেলবে। তাড়াতাড়ি দু'লাফে আবার রাস্তা পার হয়ে গেল। লাফ দিয়ে পার হতে গিয়ে চটি ছিঁড়ে গেল। চটিটা হাতে নিয়ে সে এখন ছুটছে এবং সিঁড়ির মুখে গিয়ে দেখছে, বুড়ো মানুষেটা নেই। সে চোখ গোল গোল করে বসে পড়ল। মনে হল হতাশায় নাকটা সামান্য লম্বা হয়ে গেছে।

তবু খুঁজতে হয়। সে খুঁজতে খুঁজতে ম্যাডিকেল রিপোর্টের ঘরটা পার হয়ে গেল। বাঁদিকে বড় রাস্তার ওপর যে ফুল বাগানটা রয়েছে সেখানে উঁকি মারল। একটু ডানদিকে ঘুরে পেশাপখানায় ঘুরে ঘুরে দেখল। অনেক মানুষের ভেতর বুড়ো মানুষটা নেই সে ভাবতে পারল না। এক হতে পারে চলে গেছে, অথবা ক্যান্টিনে, না কি নদীর পাড়ে চুপচাপ বসে রয়েছে। সে, সে-সব জায়গায় খুঁজে তারপর ক্যান্টিনে ঢুকতেই দেখল, বুড়ো মানুষটা হা হা করে হাসছেন।

সে ঢুকেই ডাকল, চাচা।

—হেই।

—জাহাজ হল না! সে বলতে বলতে কাছে চলে গেল।

—বোস। বুড়ো মানুষটা নিজের মানুষের মতো ওকে কাছে বসাল। বলল, আমার বিবিজান তো চলে আসছে। ভয় কি!

সে বুঝতে না পেরে তাকিয়ে থাকল। সারেঙ সাব এবার পাশাপাশি মানুষগুলোর দিকে তাকিয়ে বললেন, জাহাজ পাচ্ছে না। কেউ নিচ্ছে না জাহাজে! মুখ দেখেই টের পাচ্ছে বাবু মানুষ। সখ করতে জাহাজে ঘুরতে যাচ্ছে।

—না না সখ করতে না চাচা। সখ করবার সময় কোথায়! একথা ঠিক না।

চা এসেছিল, বুড়ো মানুষটা চা, দুটো নিমকি বিস্কুট দিয়েছেন খেতে। সে খুব আগ্রহের সঙ্গে খাচ্ছে। এবং খাওয়া দেখেই কেন জানি টের পেলেন বুড়ো মানুষটা, ছেলেটার ভিতরে খুব খিদে। পেট ভরে খেতে পায় না।

বুড়ো মানুষটা এবার বললেন, জাহাজ আসছে। কাল। লম্বা জাহাজ। লম্বা ডেরিক। কাপ্তানের অসুখ। জাহাজ হোমে ফিরে যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারছেন না। এখানে নেমে যাবেন। এবারের বাড়িয়ালা হিগিনস। সেই বুড়ো মানুষটা। কেবল চার্ট রুমে বসে বসে ঝিমোয়।

সোনা বলল, বাড়িয়ালা!

—আরে ঐ হল কাপ্তান। আমরা তো সারাজীবন বাড়িয়ালা বলেই চালিয়ে দিলাম। এখনকার ছোকরা জাহাজিরা এসব শুনে হাসে! তা যাক—শোন, তুই যাবি। এখনও ভেবে দেখ। সব বলে রাখা ভাল। তারপর বলবি, সব খুলে বলিনি। কাজেই ছেলে আমায় দোষ দিবি না। দিলে ভাল হবে না। আমার আবার বদনাম নিতে ভীষণ খারাপ লাগে।

আর যারা পাশে ছিল, ওরা একে একে উঠে যাচ্ছে। বুড়ো মানুষটা এবার খিস্তি করছেন। শালারা! শালারা ভেবেছে ব্যাঙ্ক লাইনের এডেন ব্যাঙ্কে যাচ্ছি। চাচা আমারে নিবা না, আমার কথা মনে রাইখ। বেইমান—যেই শুনেছে সিউল ব্যাঙ্কে যাচ্ছি, শালারা দেখলি কেমন সুর সুর করে উঠে গেল।

সোনা চা খেয়ে বেশ কথা বলতে জুত পাচ্ছে।

—ওরা চাচা তোমার সঙ্গে যাবে ঠিক ছিল!

—কিছু ঠিক ছিল না। ঘুরঘুর করার স্বভাব। বলে, বুড়োমানুষ উঠে দাঁড়ালেন। সব ফাঁস করে দিতে যেন এ-সময় বুড়োমানুষটাও আর সাহস পাচ্ছেন না।

সে বলল, আমি কিন্তু আপনার সঙ্গে যাব।

—যাবি যাবি। বুড়ো মানুষটা হাঁটছে আর গজগজ করছে। মুখগুলো চিনে রাখা দরকার। বেশ নানাভাবে গুছিয়ে আনছিলেন। সিউল ব্যাঙ্ক আর তেমন জাহাজ নেই। খোলনলচে পাল্টে একেবারে আলাদা। কি এর মেসরুম, কি এর ফোকসাল, চক্ পাল্টে বয়লার রিপেয়ার করে সব এখন এমন ঠিকঠাক যে কয়লা না দিলেও চলে। বেশ শুনছিল কথা কিন্তু যেই না শুনেছে বুড়ো মানুষটা আসলে সেই জাহাজেই যাচ্ছে, কাল আসছে জাহাজটা, তখনি সুর সুর করে ওরা উঠে গেল।—আচ্ছা দেখা যাবে, ভালো জাহাজ আমার নসিবে এলে দেখা যাবে—আর বলি জাহাজটা খারাপ কি! এখন তো কত জাহাজ, কত আরাম। আগে তো এসব ছিল নারে বাপু। আমরা কাজ করিনি! জাহাজ চালিয়ে সমুদ্র পার করে দিইনি—গজগজ করতে করতেই মনে হল—হ্যাঁ পাশে সেই ছেলেটা –কিছু জানে না, যেতে চায়—কালতো সিউল ব্যাঙ্কের মাসতার দিতে বললে, লাইন থেকে লোক পালাবে। অথবা কেউ দাঁড়াবে না। যারা ছ-সাত মাস থেকে জাহাজ পাচ্ছে না তারা নসিবের ওপর ভর করে বিশমিল্লা রহমানে রহিম বলে ঝুলে পড়বে। এসব যখন হবে বা হচ্ছে তখন ছেলেটাকে সব খুলে না বললে বুঝি ঠিক হবে না।

বুড়ো মানুষটা তখন গজগজ করছেন আর হাঁটছেন। রোদের ভিতর দিয়ে হাঁটছেন। খুব তাড়াতাড়ি হাঁটার স্বভাব। যেন এই বয়সেও দেখানোর স্বভাব বয়স তেমন হয়নি। কথা খুব তাড়াতাড়ি বলেন—আচ্ছা আচ্ছা বাপু তুমি এস। যাবে যখন বলছ যাবে। এখন আমাকে আর কথা বাড়িও না। তবে ভেবে দ্যাখো একবার, ভাববে, কেন মাসতারে কেউ দাঁড়াতে চায় না। সিউল ব্যাঙ্কের নাম শুনলে সবাই পালায়। এনজিনরুমের ক্রু কিছুতেই যোগাড় করা যায় না। সব অচল মাল শেষপর্যন্ত তুলে নিতে হয়।

বুড়োমানুষটা যত জোরে হাঁটছেন, হাতের ফোলিও ব্যাগটা যত জোরে দুলছে তত সে দ্রুত হাঁটছে পাশাপাশি। যেন ছুটে যাওয়ার সামিল। মাঝে মাঝে কথা বলতে বলতে পিছিয়ে পড়ছেন। খিদিরপুরের ব্রিজের কাছে বাস। কিছুটা পথ না হেঁটে গেলেই নয়—সুতরাং তারও বুড়ো মানুষটাকে কিছুটা পথ এগিয়ে দেবার মতো যেন কথা বলতে বলতে যাওয়া। কিন্তু অচল মালের কথায় আসতেই সে কেমন থমকে দাঁড়াল। অনেকটা পিছিয়ে পড়ল সে। হনহন করে মানুষটা দু'পাশের বাড়িঘর গাছপালার ছায়া ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে। সে কেন এমন থমকে দাঁড়াল বুঝতে পারছেন না, তারপর ফের অচল মালের কথা মনে হতেই ডাকল—হেই!

—হেই। এস। এভাবে কেউ দাঁড়ায় না!

—হেই অচল মাল! সোনা জোরে জোরে হাসল। দুহাত ওপরে তুলে হা-হা করে হাসল।

—হেই অচল মাল! বুড়ো মানুষটাও জোরে হা-হা করে হেসে উঠলেন।

সে এবার ছুটে গিয়ে ধরে ফেলল বুড়োমানুষটাকে। তিনি বললেন, আসলে ওটা অচল জাহাজ, অচল মালে চলে। আসলে ওটাই হচ্ছে সবচেয়ে তেজী জাহাজ, জাহাজিরা তেজী। দুনিয়ায় তোমার এমন জাহাজ একটাই আছে।

—হিগিন্‌স্ আসছে জানো? হিগিন্‌স্ দুনিয়ার সেরা বাড়িয়ালা। ছেলেকে ছেড়ে কোথাও যায় না। অচল জাহাজ চালিয়ে নিয়ে যায় বলে কোম্পানি কিছু বেশি সুযোগসুবিধা দেয় হিগিন্‌স্ সাহেবকে। তুমি না দেখলে বুঝতে পারবে না, হিগিন্‌স্ সাহেব কী ভীষণ রগচটা মানুষ। কেবল ছেলেটার কাছে একেবারে জুজু। ওকে হাত করতে পারলে তুমি রাজার হালে থাকতে পার।

—কেমন বয়স?

—তোমার গিয়ে তেরো চোদ্দ হবে। একটু বেশি হতে পারে। ঠিক জানি না।

ওরা ক্রমে ব্রিজের ওধারে চলে গেল। এখান থেকে বুড়োমানুষটা বাসে উঠে যাবেন। সে যাবে কিসে জানে না। আসলে তাকে হেঁটে যেতে হবে। সুতরাং সে কিছু বলছে না। এখন দুটো চটিই হাতে। এবং সহসা বুড়ো মানুষটার মনে হল, এমন গরমের দিনে পিচের রাস্তার

ওপর দিয়ে ছেলেটা হেঁটে এসেছে। মুখ লাল হয়ে গেছে। ভীষণ ঘামছে। জবজব করছে ঘামে। পায়ে ফোসকা পর্যন্ত পড়ে যেতে পারে। বুড়ো মানুষটা কি ভেবে বলল, চটিটা ঠিক করে নে।

সোনা জেব উল্টে দেখাল—নেই।

—যাবি কি করে?

—হেঁটে।

—কোথায় আছিস?

—দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাড়ি।

—খেতে দেয়?

—দেয়।

—আমার কাছে থাকবি? কোন অসুবিধা হবে না। একটা তো দিন। সোনা কেমন বিব্রত বোধ করতে লাগল।

বুড়োমানুষটা প্রথম বাসটা ছেড়ে দিলেন। পাশের একটা দোকানের শেডে দাঁড়িয়ে ফোলিও ব্যাগটা খুলে দেখলেন—কি আছে ব্যাগে। এবং কিছু পয়সা, এই রেজকি নোট মিলে টাকা তিনেকের মতো আছে দেখে বললেন, কিছু মনে করিস না। পয়সা কটা রাখ। কাল তোর জাহাজ হবে। পরশু,সাইন হবে। সাইন হলে টাকা পাবি। আমি তখন তোর টাকাটা কেটে নেব। কিছু মনে করিস না।

কখনও সখনও মানুষের চোখ-মুখ সজল হয়ে যায়। সে চারপাশে তাকিয়ে সেই সজল চোখ লুকিয়ে ফেলল মানুষটার কাছে। কত দিন পর, হ্যাঁ কতদিন পর একজন মানুষ তার দুঃখটা কি, সে কেন যাচ্ছে তার দেশ মাটি মানুষ ফেলে, টের পাচ্ছে। ওর মনে হল কতদিন পর আবার একজন মানুষ পৃথিবীতে তার যন্ত্রণা ঠিক ঠিক ধরতে পারছে। সে হাত পেতে পয়সা নেবার সময় সোজাসুজি তাকাতে পারল না। মনে হল মানুষটা অনেক উঁচু হয়ে গেছে। সে যতই মুখ তুলে তাকাক মানুষটার আসল মুখ দেখতে পাবে না।

পরদিন সে অবাক, সত্যি এতবড় একটা জাহাজে ক্রু নেয়া হবে অথচ ভিড় নেই। ডেক জাহাজিদের লাইনে ভিড়টা তবু আছে, কিন্তু এনজিন ক্রুদের লাইনে খুব কম। যত লোক লাগবে তার সিকিভাগও নেই। কারণ এনজিনে তিনটে বয়লার, তিন বয়লারের জন্য তিনজন করে প্রত্যেক ওয়াচে ফায়ারম্যান। তিনটে ওয়াচের জন্য সুতরাং ন'জন ফায়ারম্যান। প্রত্যেক ওয়াচের জন্য দুজন করে কোলবয়। মোট ছ'জন। দুজন ডংকিম্যান। তিনজন গ্রিজার, একজন কসপ, বড় টিণ্ডাল, ছোট টিণ্ডাল, সারেঙ। তাছাড়াও দুজন বাড়তি। খুন জখম, জাহাজ থেকে জলে ঝাঁপ দেওয়া এসব তো আছেই। কারণ সফরে এক দুজন মানুষ মরবে, বা জলে ভেসে যাবে এ-আর বেশি কি।

জাহাজের বড়-মালোম ডেক-জাহাজিদের বেছে নিচ্ছেন। এনজিনে কিছু বাছার নেই। গড়পড়তা সব। এমনকি দু-একজন ব্ল্যাকলিসটেড জাহাজী এ-ফাঁকে জাহাজ পেয়ে গেল। তবু হয় না। বুড়োমানুষটা ডেকে সেধে আনছেন। এনজিন জাহাজিরা কোথায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে তিনি জানেন। মেজমিস্ত্রি বড়মিস্ত্রি হিমসিম খাচ্ছে। ওরা জানে এমনটা হয়। জাহাজিরা যেতে চায় না এ জাহাজে। ঘুরেফিরে দুটো দল। হোমে যারা যায় তারাই আবার বছর ঘুরে এলে ফিরে আসে।

কিন্তু বুড়োমানুষটার হয়েছে ঝামেলা। তিনি শেষপর্যন্ত একজনকে টেনে টেনে নিয়ে আসছেন। ওর লুঙ্গি খুলে যাচ্ছে। মানুষটা একহাতে লুঙ্গি আগলাচ্ছে। বুড়োমানুষটা এখনও বেশ শক্তি রাখেন। তিনি টেনে আনছেন, প্রায় যেন টেনে হেঁচড়ে নিয়ে আসছেন—যাবে না, যাবে না বললেই হল। এবং বোঝা যায় যাকে টেনে আনা হচ্ছে সে এই বুড়ো মানুষটাকে সমীহ

করে—তবু যেতে চায় না—কি যে ভয়!

সোনা এসব দেখেও ঘাবড়াল না। আর জাহাজ সে যখন পাচ্ছে না, এখানেও সে বেশিদিন থাকতে পারছে না, তখন যে কোনও জাহাজ, সে যত ভয়াবহ হোক, ভাবে না। সে যখন সাইন করে টাকা নিচ্ছিল তখনও বুড়োমানুষটা বললেন, ভেবে দ্যাখ। এখনও ইচ্ছা করলে থেকে যেতে পারিস। কিছুদিন অপেক্ষা করলে একটা ভাল জাহাজ মিলে যেতে পারে।

সোনা হেসেছিল। কিছু বলেনি। তার গুনে গুনে টাকা নেবার স্বভাব না, কারণ সে এই প্রথম পরিশ্রমের বিনিময়ে টাকাটা এডভান্স পাচ্ছে। এই টাকায় কেনাকাটা করে থাকে জাহাজিরা। অনেকদিনের সফর। সফর শেষে কবে ফিরবে, কি আদৌ ফিরবে না ঠিক থাকে না। তাছাড়া বসে খেলে যা হয়, জাহাজ থেকে দেশে ফিরে এলে চুপচাপ বসে থাকা, পয়সা নেই আবার জাহাজ না পেলে টাকা- পয়সা হয় না। সুতরাং এ-টাকাটার ভীষণ দাম জাহাজিদের কাছে। সে অবশ্য তত কিছু বোঝে না। কেবল সে জানে যতটা বেশি সম্ভব এর থেকে টাকা মাকে পাঠাতে হবে। টাকা তিনেকের মতো দিতে হবে চাচাকে। বাকি টাকাটা দিয়ে একজোড়া জুতো, একটা প্যান্ট, একটা জামা, টিনের একটা সুটকেস, মাজন, এখন রেজার-টেজার দরকার হবে না, গালের দাড়ি বেশ সামান্য কোঁকড়ানো এবং অল্পস্বল্প।

—বেশ একটা মুখে তার ঈশ্বর ঈশ্বর ভাব। সে এভাবে আরও অনেকদিন চালিয়ে দিতে পারবে। আরও কিছু কেনা দরকার। চাচাকে সে বলে জেনে নিতে পারে আর কি দরকার। সে ছুটে গিয়ে বলল, আর কি নিতে হবে।

চাচার ফদমতো সে নিল, একজোড়া নীল রঙের প্যান্ট, নীল রংয়ের জামা। এই পরে কাজ করতে হবে। পুরানো সু কারো যদি থাকে মেরামত করে নাও। বেশ শক্ত হতে হবে তলা। সে তাও নিল। সে বেশ ঘুরেফিরে কেনাকাটা করেছে। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাবার সময় কেমন তার সবকিছুর ওপর দিয়ে উড়ে উড়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল। সে যেন বেশ একটা বিজয়ে বের হয়ে যাচ্ছে। সে মাকে একটা চিঠি লিখতে পারে। লিখতে পারে—মা আমি জাহাজে যাচ্ছি, কবে ফিরব জানি না। আদৌ ফিরব কিনা তাও জানি না। একটা ভাঙ্গা জাহাজে সমুদ্রযাত্রা। কিন্তু সে লিখতে পারে না। মা তার তবে ভীষণ ভাববে। কেবল টাকাটা পাঠিয়ে দেবে জাহাজ ছাড়ার ঠিক একদিন আগে—এবং মা বুঝতে পারবে তার নিখোঁজ ছেলে জাহাজে চলে যাচ্ছে। অথচ তখন করার কিছু থাকবে না।

এই কলকাতা শহরে সে আজ প্রায় তিন মাস এগারো দিনের মতো আছে। এদিক ওদিক করে আড়াই মাসের ওপর ভদ্রা জাহাজে ছিল রোববার ছুটির থাকত ছিল। সাদা কোর্তা পরে নীল রঙের জাহাজি পোশাক আর সাদা টুপি মাথায় সে কখনও হেঁটে হেঁটে অথবা অল্প পয়সার ট্রাম ভাড়ায় ঘুরে বেড়িয়েছে—এই শহর কি বড়, 'আর কত মানুষ, মানুষেরা এখানে কেউ কেউ রাস্তায় শুয়ে থাকে, রাস্তায় মরে যায়। এসব দেখলে মনে হত সেও রাস্তায় একদিন এভাবে না খেতে পেয়ে মরে পড়ে থাকবে।

এখন আর এসব মনে হয় না। বড় বড় শো-কেসগুলোর আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। একটা বড় জাহাজ, তার ওপর সে যেন দাঁড়িয়ে আছে, আর সমুদ্রে কি যে স্বপ্ন থাকে মানুষের, সে যাচ্ছে কোলবয় হয়ে, সবচেয়ে কঠিন এবং পরিশ্রমের কাজ। তার প্রথম সফর, কোলবয় প্রথম সফরে, দ্বিতীয় সফরে সে ঠিক ফায়ারম্যান হয়ে যাবে, আর একটা সফর দিতে পারলে সে গ্রিজার, তারপর টিণ্ডাল। একটা পরীক্ষা, ওর তো ততদিনে জাহাজি অভিজ্ঞতা হয়ে যাবে, সে তো কলেজের পড়াশুনা কিছুটা এগিয়ে রেখেছে, সে তো ইংরেজি খুব ভাল জানে, অঙ্কে সে ভালো। পরীক্ষায় বসলে অনায়াসে বি-এ-ও- টির কাছাকাছি কিছু একটা সার্টিফিকেট পেয়ে যাবে। তারপরই সে জাহাজের ফিফ্থ এনজিনিয়ার, তার পরেই ফোর্থ, থার্ড, সেকেণ্ড চিফ। এমন সব স্বপ্নের ভেতর দিন তার কেটে যায়। এমনভাবে সে এই বড় শহরের ওপর দিয়ে কখনও হেঁটে যায়নি। কেমন ভয় ভয় ছিল। মানুষজনের ভিড়ে ওকে খুব অসহায় মনে হত। এখন সে বেশ প্রায় লাথি মেরে সব উলটে পালটে যেন হেঁটে যাচ্ছে। হাঁটার ভেতর

কিছুটা হাওয়ায় ভেসে যাবার মতো ভাব তার।

হাঁটতে হাঁটতেই কেন জানি মৈত্রের কথা মনে পড়ল। মৈত্র এসেই ওকে বলেছিল, কি নাম? সে নাম বললে বলেছিল, ছোটবাবু তুমি জাহাজের?

—ছোটবাবু!

—কোলবয়দের আমি ছোটবাবু ডাকি।

মৈত্র সঙ্গে যাচ্ছে। অমিয় বলে ওর চেয়ে একটু বেশি বয়সী আরও একজন জাহাজী যাচ্ছে। সেও কোলবয়। মৈত্র টিণ্ডাল। সে কাজ করত রয়েল নেভিতে। নৌ বিদ্রোহের দুটো একটা গল্প গাছের ছায়ায় সকলকে দাঁড় করিয়ে বেশ হাত নেড়ে নেড়ে শুনিয়ে দিয়েছে।

মৈত্র বেশ তাজা মানুষ। খুব হাসিমশকরা করতে ভালবাসে। ডেকে আরও দুজন আছে। ওদের সঙ্গেও আলাপ করে নিতে হয়েছে। আসলে, দীর্ঘ সমুদ্র-যাত্রায় ওরাই সব। চাচা বলছে, এরা তোমার জাতভাই ছেলে। আর তো সব আমার জাতভাই। আগে তো কেউ তোমাদের ছিল না। এখন দুচারজন, ট্রেনিং নিয়ে জাহাজে আসছে।

আসলে সোনা বোধহয় এতটা সাহস পেত না এই শহরকে উপেক্ষা করার। চাচা এবং মৈত্র সঙ্গে আছে বলেই তার এত সাহস। এবং সমুদ্র সফর যেন খুব বড় কাজ, এই শহরের অলিগলিতে পচে মরার চেয়ে, অসীম সমুদ্র-যাত্রায় এক কঠিন সুখ আছে। তুমি ছোটবাবু অনায়াসে সব মানুষকে অবহেলা করতে পার। এই শহরকে লাথি মারতে পার।

মৈত্রকে দেখলে এটা বিশ্বাস করা যায়। জাহাজে মারামারি করতে গিয়ে দু-দুবার ব্ল্যাকলিস্টেড হয়েছে, গর্বের সঙ্গে বলে। সে পরোয়া করে না, বেশ একটা অহমিকা নিয়ে আছে, যেন কোনও ভয় নেই বাছারা আমরা সবাই ঈশ্বরের সন্তান। কোন শালা কার চেয়ে কম। মৈত্রর এমন সব কথাবার্তা শুনে সে মাঝে মাঝে হেসে ফেলেছে।

—তাহলে ছোটবাবু জাহাজে মুখ গোমড়া করে থাকবে না।

সোনা বলেছিল, না না।

—কষ্ট হয় হবে। পারবে না যখন বলবে, আমরা আছি। কিছু লজ্জা করবে না বলতে। জাহাজে ওঠার সময় মৈত্র আগে। সে পিছনে। লম্বা সিঁড়ি। এক এক করে সবাই উঠে যাচ্ছে। মৈত্র বেশ লম্বা। খুব শক্ত মানুষ। বড় একটা সেলার হাতে। মাথায় তালপাতার নীল টুপি। মোটা বেল্ট কোমরে আঁটা। এবং জুতো কুমীরের চামড়ার। বেশ শক্ত মজবুত এবং হাঁটু পর্যন্ত জুতোর চামড়া উঠে গেছে। কিছুটা গামবোটের মতো দেখতে। সে পরেছে লাল রঙের পাতলা গেঞ্জি। সে তারপর পিছনের দিকে তাকালেই দেখল অমিয় কিং জর্জ ডকের তিন নম্বর জেটিতে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে কথা বলছে।

আর সে যা দেখল, কেমন নিঝুম একটা জাহাজ। মাস্তুলে একটা পাখি বসে আছে। সিঁড়ির ওপাশে একটা বড় জাহাজ থেকে মাল নামানো হচ্ছে। তার অতিকায় শব্দ, আর সব সারি সারি ক্রেনের নিচে জাহাজিরা এক এক করে উঠে আসছে দল বেঁধে।

জাহাজে ইউনিয়ান জ্যাক উড়ছে। এই জাহাজে সে এখন ছোটবাবু।

সোনার এসব খেয়াল থাকার কথা না। সিঁড়ি ধরে ওঠার সময়ই সে ঘাবড়ে গেছে। কি লম্বা সিঁড়ি, কি খাড়া! খুব সন্তর্পণে উঠে গেছে। এবং গ্যাঙওয়েতে মাত্র একজন রয়েছে। এবং বোধহয় কোয়ার্টার মাস্টার সে। বুড়ো মানুষটা বসে বসে একটা মাছ ধরার জাল বুনছে। মাঝে মাঝে কেবল জিজ্ঞাসা করলে জবাব দিচ্ছে—ওদিকে। জাহাজিদের সে আস্তানা দেখিয়ে দিচ্ছে।

সোনা দেখল বেশ বড় জাহাজ। সে হেঁটে গেল—সে জমুনা বাজু ধরে হাঁটছে। আগে যারা উঠে এসেছিল তারা পিছিলে দাঁড়িয়ে আছে। সে তাদের ভিতর চাচাকে দেখতে পেল। খুব সকালে চাচা সবার আগে চলে এসেছেন। মৈত্র কাছে থাকায় যত না সাহস ছিল, জাহাজে

চাচাকে দেখে সে আরও সাহসী হয়ে গেল। সে বেশ লাফ দিয়ে দিয়ে যেন উঠে যাচ্ছে। বাঁদিকে বড় বড় ফলকা পার হয়ে প্রায় কাছাকাছি গিয়ে বলল, কোনদিকে?

—নিচে নেমে যা। সিঁড়ি আছে সামনে। তোদের পছন্দ মতো ফোকসাল দেখে নে।

এসব ব্যাপারে যা হয়, ছোটবাবু, মৈত্র, অমিয় একসঙ্গে একটা ফোকসাল বেছে নিল। ওপরে নীচে দুটো দুটো চারটে বাঙ্ক। এটা পোর্ট-সাইড, এবং পোর্ট-সাইডে সব এনজিন ক্রুদের বুঝি থাকবার নিয়ম। সে বেশ তাড়াতাড়ির মাথায় তার বাঙ্কটা দখল করে নিলে মৈত্র বলল, এটা নিলে ছোটবাবু সামলাতে পারবে তো?

ছোটবাবু বলল, জানি না।

—এটা নাও। তোমার ভাল হবে। দেওয়ানি কম পাবে।

সে ভালমন্দ বোঝে না। চারপাশে কেমন একটা গন্ধ। রঙ বার্নিশ মিলে একটা পোড়া পোড়া গন্ধ। সে মোটা ম্যাট্রেসের ওপর একটা চাদর পেতে দিল। তখন মৈত্র বলল, একটু চা হলে ভাল হত ছোটবাবু। চা করে আনছি। তুমি বরং দেখে এসো অমিয় উঠে আসছে কিনা।

তখন অমিয় উঠে আসছিল। ওর লটবরহ যেন অনেক। এত লটবহর নিয়ে সে উঠে আসতে পারছে না। ওর কাঁধে বড় দুটো কিডস ব্যাগ। সঙ্গে একটা নীল রঙের লম্বা টিন, ডান হাতে একটা সুটকেস্, সঙ্গে ফ্ল্যাকস। বাঁ হাতে কোন রকমে সমস্ত শরীরের ব্যালেন্স রেখে সে উঠে আসছে।

ছোটবাবু তাড়াতাড়ি নিচে নেমে ওর কাছ থেকে টিনটা নিয়ে নিল। আরও সে দেখল বড় একটা ট্রাঙ্ক। এসব নিয়ে অমিয় জাহাজে উঠে আসছে। ওর ভারি অবাক লাগল, টিনের ভেতর মুড়ি, মোয়া নাড়ু। ওর মা ওর জন্য সমস্ত সফরে কি কি কষ্ট হতে পারে ভেবে বাঁধাছাঁদা করে যাবতীয় সুখ- সুবিধা ওর সঙ্গে গুছিয়ে দিয়েছে। ছোটবাবু অমিয়র দিকে তাকিয়ে ফিক করে হেসে ফেলল।

সারাটা সকাল এভাবে একজন দুজন করে উঠে আসছে। কিং জর্জ ডকের চারপাশে যখন সব বড় বড় ক্রেনগুলো বড় বড় জাহাজ থেকে মাল নামাচ্ছে, সূর্য বেশ মাথার ওপর কিরণ দিচ্ছে, এবং ভীষণ গরম, ফোকসালে টেঁকা যাচ্ছে না, ডেক-সারেঙ এনজিন-সারেঙ ছুটোছুটি করছে, কাজকাম বুঝে নিচ্ছে তখন ছোটবাবু দেখল, একজন বুড়ো মতো মানুষ জেটিতে খুব দামী গাড়ী থেকে নামছেন। সঙ্গে এক টেডি বয়। ঠিক টেডি বয় বললে ভুল হবে, চুল কেমন নীলাভ রঙের, কালো প্যান্ট সাদা হাফসার্ট, হাতে একটা ক্যামেরা, চোখ ভীষণ নীল, সমুদ্রে গেলে এ চোখের রঙ কেমন হবে সে এখন বলতে পারে না।

জাহাজের সব অফিসারেরা এখন খবর পেয়ে গেছে, ক্যাপ্টেন হিগিনস জেটিতে নেমেছেন। ওরা ছুটে ছুটে সিঁড়ি ধরে নেমে গেল। বড় মালোম জাহাজ থেকেই হাত তুলে ওয়েলকাম করছে কাপ্তানকে সব জাহাজিরা এসে ভিড় করছে রেলিঙে। এনজিন-সারেঙ নেমে গেছে নিচে। জাহাজের সর্বত্র ঘটাঙ ঘটাঙ শব্দ। আর সেই বুড়ো মতো মানুষ, সঙ্গে তার একমাত্র সন্তান, আগে আগে বেশ নিরিবিলি, যেন তার সব দেখা, জানা। পুরানো জাহাজের গন্ধে টের পান জাহাজের হাল তবিয়ত কেমন আছে, রেলিঙে হাত রেখেই টের পান, এ-সফরে কতটা নসিবে দুর্ভোগ আছে। তিনি সিঁড়ি ধরে উঠতে উঠতে গল্প করে যাচ্ছেন। কারণ সবাই তো তাঁর চেনা জানা। অনেক সফর এদের সঙ্গে তার কেটেছে। বড় মালোম তো বনিকে গত সফরে দেখেছে। বনিকে এ-সফরে দেখেও বড় একটু ঘাবড়ে যেতে পারে।

তবু কি করা ঠিক, কাপ্তান স্থির নিশ্চয় কিছু জানেন না। কোনটা ভাল ছিল। এই নিয়ে আসাটা ভাল, না রেখে আসা ভাল ছিল। তিনি সেজন্য এ-ব্যাপারে বড়কে মোটামুটি কিছু বলবেন। বড় যে একটা প্রশ্ন তুলবে তিনি ওঠার মুখে বড়র মুখ দেখে টের পেয়েছেন। যেন বড় এতে খুশি হয়নি। অন্য কেউ এটা জানে না বলে তারা বনিকে বেশ হেইল করছে। বনি আবার কতদিন পর—আঃ সেই জাহাজ! বনি এখন হয়তো ডেকে উঠেই সারা ডেকময় ছুটে

বেড়াবে। ওর দৌরাত্ম্য মাঝে মাঝে বড় বেশি কষ্টদায়ক।

কাপ্তান বুড়ো, ভীষণ বুড়ো, লম্বা, একটু নুয়ে গেছেন। কালো প্যান্ট, সেই সাদা হাফসার্ট, গলায় টাই। গরমে ঘামছেন। চোখ সাদাটে! নীল রঙটা চোখে কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। প্রথমেই ওঁর যা অভ্যাস, জাহাজে উঠেই ব্রীজে দু'বার পায়চারি করা। দু'বার পায়চারি করলে সমস্ত জাহাজটা চোখের ওপর কেমন আশ্চর্য জ্যান্ত হয়ে যায়। যেন জাহাজটা আর জাহাজ থাকে না, কাপ্তান হাত তুলে হেই বলে চিৎকার করে ওঠেন—হেই, হেই ডার্লিঙ এসে গেছি।

বনির আলাদা ঘর। কাপ্তানের আলাদা ঘর। ঠিক ব্রীজের পিছনে চার্ট রুম। চার্ট রুমের পাশে কাপ্তানের কেবিন। এবং তার ঠিক নিচে বনির কেবিন।

তিনি বনিকে নানাভাবে বুঝিয়েছেন, জাহাজে তুমি বড় হয়ে যাবে। তুমি আর আগের মতো চলাফেরা করলে চলবে না। তুমি মনে রাখবে সমুদ্রযাত্রা ভয়ঙ্কর সাহসী কাজ। সেখানে নানা কারণে বিদ্রোহ দেখা দিতে পারে। তুমি জাননা বনি—এই ইণ্ডিয়ান জাহাজিরা কত ভদ্র। তাদের তুমি উৎপাত কর না। অবশ্য বনি বলেছে, আমি দুষ্টুমী করব না বাবা, আমি ভাল হয়ে থাকব। তোমাকে আমি দুঃখ দেব না।

সিঁড়িতে তিনি তখন শব্দ পেলেন, ক্যাপ্টেন বয় সালাম জানাতে এসেছে। তিনি তাকে বললেন, দু'কাপ কফি পাঠাবে। জ্যাকের কেবিনে এক কাপ

আসলে বনি এখন এ-জাহাজে জ্যাক হয়ে গেছে। গত সফরেও বনি জ্যাক ছিল। চিফ-মেটের সঙ্গে একটু পরামর্শ দরকার। সেও তো তার মত বয়সী মানুষ। এবং বনিকে ভীষণ স্নেহ করে থাকে। তিনি দেখলেন পাইপটা নিভে গেছে। বাইরে তখন চিফ-মেটের গলা, স্যার আসতে পারি?

—ইয়েস্ কাম্ ইন্।

চিফ-মেট এসে চুপচাপ টেবিলের পাশে বসল। মাস্টার পিছন ফিরে আছেন। উনি একটা খৃষ্টের ছবি দেয়ালে টানাচ্ছেন। ওটা সব সময় ওঁর সঙ্গে থাকে। এবার যে আরও বেশি বুড়ো হয়েছেন ওঁর হাত কাঁপা দেখে চিফ এটা টের পাচ্ছে। সে এগিয়ে বলল, দিন। আমি ঠিক করে দিচ্ছি। কারণ যতবার এটা কাপ্তান করতে গেছেন ততবার কেমন ছবিটা তেড়চা হয়ে গেছে। ঠিক সোজা থাকছে না। কাপ্তানের চোখেমুখে দুশ্চিন্তার ছাপ। এ-সফর তার শেষ সফর। তিনি যত ঝড় সাইক্লোন থাকুক, খারাপ ওয়েদার থাকুক, চোরা হিমবাহ থাকুক, সমুদ্রের নিচে গোপন পাহাড় থাকুক, তার ডার্লিংকে বন্দরে ঠিক ভিড়িয়ে দিতে পারবেন। অথচ এবার কেমন একটা অমঙ্গলের আশঙ্কা। ছবিটা সোজা থাকছে না। চিফ এসে ছবিটা সোজা টানিয়ে দিলে কিছুটা শান্ত মুখে যেন বসতে পারছেন। কফি খেতে খেতে চিফই প্রথম বলে ফেলল, এবারও বনিকে নিয়ে এসেছেন দেখছি।

—কিছুতেই থাকতে চায় না।

—কিন্তু ওতো বড় হয়ে যাচ্ছে। আমরা কবে ফিরব ঠিক কি। ততদিন পর্যন্ত ওকে ছেলে সাজিয়ে রাখা যাবে?

কাপ্তান বললেন, জানি না কি হবে। কিন্তু না নিয়ে এসেই বা উপায় কি! কার কাছে রেখে আসব, কেউ রাখতে চায় না। হোসটেল থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে। কোনও আইনকানুন মানতে চায় না।

তারপর আর কোনও কথা না। বড়-মালোম আর কাপ্তান চুপচাপ কেবল গরম কফি খেয়ে যাচ্ছেন। ওঁরা শুনতে পাচ্ছেন, বনি ওর রেকর্ড-প্লেয়ারে একটা পপ গান বাজাচ্ছে। বনি বোধহয় এমন শান্ত আকাশ, নিরিবিলি নদীর ছবি দেখে চুপচাপ থাকতে পারছে না। সে কেবিনের ভেতর নাচছে আর গাইছে।

॥ দুই ॥

সকাল থেকেই বেশ একটা এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে। নদী থেকে এই হাওয়া উঠে এলে মৃদু ঠাণ্ডা একটা ভাব থাকে জাহাজের ভেতর। ছোটবাবুর উঠতে দেরি হয়ে গেছে। দুবার মৈত্র অমিয় ডেকে গেছে। কিন্তু ছোটবাবু রাতে একটা দুঃস্বপ্ন দেখায় সারারাত প্রায় ঘুমোতে পারেনি। সকালের দিকে ঘুমটা এসেছিল। পোর্টহোল দিয়ে সামান্য রোদ পর্যন্ত পায়ের কাছে এসে পড়েছে। কেমন শান্ত একভাব জেটিতে। মনেই হয়নি সে একটা জাহাজের ভেতর আছে। তার মনে হয়েছিল, সে আগের মতোই আছে—কাজ কর্ম নেই, একটু দেরি করে উঠলে কোন ক্ষতি হবে না।

সে সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে এল। চারপাশে রোদ। ডেক জাহাজিরা ও-পাশে চা চাপাটি খাচ্ছে। এ-পাশে এনজিন-জাহাজিরা গ্যালিতে ভিড় করেছে। আর একটু পর কাজের সময় হয়ে যাবে। সবাই বেশ জলদি যে যার চায়ের জল গরম করে নিচ্ছে। গতকালই ওরা রেশন পেয়েছে। চা, চিনি, সিগারেট। মৈত্র, অমিয় এবং ছোটবাবু মিলে 'বিশু' করে নিয়েছে। তদারকির ভার মৈত্রের ওপর। চা করবে অমিয়, কাপ প্লেট ধুয়ে রাখার ভার ছোটবাবুর।

কাল জাহাজটাকে খুব নিরিবিলি শান্ত মনে হচ্ছিল। আজ সকালে একেবারে আলাদা চেহারা। জেটি থেকে মানুষ-জন উঠে আসছে। চারপাশে সব লম্বা লম্বা জেটি। এক দুই তিন করে, সে গুনে গুনে দেখল এ-ডকে এগোরোখানা জাহাজ রয়েছে। বয়াতে বাধা জাহাজগুলোতে নৌকায় মানুষজন উঠে আসছে।

হাওয়াটা বেশ লাগছে তো। সে এখনও জানে না কি কাজ করতে হবে তাকে। জাহাজটাকে কিছুতেই ইবলিশ মনে হচ্ছে না। বরং মনে হচ্ছে বেশ বড় জাহাজ। কত লম্বা হবে, সে মেপে বলতে পারে। তবে জাহাজের পেছনে আছে এনজিন আর ডেক-ক্রুদের বাথরুম, তারপরে আছে দু'পাশে দুটো মেসরুম। মেসরুম দুটোর মাঝখানে সিঁড়ি। সিঁড়ি টুইন-ডেকে নেমে গেছে। সিঁড়ির দু'পাশে দুটো ফোকসাল। পোর্ট-সাইডের ফোকসালে এনজিন-সারেঙ, পরেরটায় দুজন এনজিন টিণ্ডাল। 'স্টাবোর্ড-সাইডের ফোকসালে ডেক-সারেঙ, পরেরটায় ডেক-টিণ্ডাল এবং কশপ। তারপর সিঁড়ি ক্রমে লোয়ার ডেকে নেমে গেলে মাঝ বরাবর বড় একটা লম্বা ঘর। ঘরে ক্রুদের জন্য রসদ। দু'পাশে লম্বা ভাগ করা সব ইনজিনক্রুদের থাকার জায়গা। ওপর নীচ বাঙ্ক মিলে অনেকগুলো পর পর ফোকসাল। লোয়ার – ডেকে ঠিক সিঁড়ির মুখের ফোকসালটায় ছোটবাবু, মৈত্র এবং অমিয় থাকে।

ওরা তিনজন তিনটা লকার পেয়েছে। তিনজনের জিনিসপত্র আলাদা রাখা আছে। কেবল চা চিনি একসঙ্গে। ছোটবাবু সিগারেট খায় না বলে প্রথম নিতে চায়নি, পরে মৈত্রকে দিয়ে দিতে চাইলে, মৈত্র বলল, রাখো ছোটবাবু রেখে দাও। আমাদের জাহাজ আপাতত যাচ্ছে বুনো সাইরিস। সেখানে তোমার সিগারেট সোনার দামে বিক্রি হয়ে যাবে। সে টাকায় সেখান থেকে ইচ্ছা করলে দামী কম্বল কিনে নিতে পার। পৃথিবীর কোথাও এত ভাল শস্তা দামী কম্বল তৈরি হয় না। সুতরাং ছোটবাবু সিগারেট নিয়ে লকারে রেখে দিয়েছে। তার খুব ইচ্ছে মার জন্য ভাল একটা কম্বল নিয়ে দেশে ফিরবে। শীতের রাতে মার ভীষণ কষ্ট। ঠান্ডা ঘরে কাঁথায় মার শীত কমে না। ছোট ছোট ভাই-বোনেদের ঢেকেঢুকে মার জন্য বাকি কিছু থাকে না। একটা ভালো কম্বল হলে বেশ হবে।

ডেকে দাঁড়িয়ে ছোটবাবুর মনে হল আসলে জাহাজটা ইবলিশ না। পুরানো জাহাজ হলে যা হয় কাজ সব সময় লেগেই থাকে। এখান থেকে রঙ খসে পড়ে যায়। ওখান থেকে রেলিং খসে পড়ে যায়। কাঠ উঠে যায়, এবং জাহাজ পুরানো হলে যা হয়, কেবল মেরামতের কাজ লেগেই থাকে। রঙ-বার্নিশের কাঁচা গন্ধ। জাহাজের আপ-ডেকে, মেসরুমের দু'পাশে দুটো গ্যালি। তারপর দুটো হ্যাঁচ। দু'হ্যাচের মাঝখানে মাস্তুল। মাস্তুলের দু'পাশে দুটো দুটো করে চারটা ডেরিক। মাস্তুলের গোড়ায় দুটো; করে উইনচ্। মাস্তুলের রঙ হলুদ। খোলের রঙ সাদা,

কেবিনের রঙ সাদা। তারপর চীফ-কুকের গ্যালি। গ্যালির দু'পাশে দুটো এলি-ওয়ে। দুটো এলি-ওয়ে দিয়েই এনজিন-রুমে নামা যায়। দুটো এলি-ওয়ের পোর্টসাইডে থাকে এনজিনের অফিসাররা। প্রথমটায় থাকে ফিফথ-এনজিনিয়ার, পরেরটায় ফোরথ, এভাবে শেষেরটায় থাকে চীফ এনজিনিয়ার। এরা কেউ এসেছে ওয়েলস থেকে। কারু বাড়ি স্কটল্যান্ডে, কেবল ফিফথ মানে ফাইবারের বাড়ি কলকাতায়। জাতিতে বাঙালী খৃষ্টান। স্টারবোর্ড সাইডের প্রথম কেবিনটা ফাঁকা। পরের কেবিনটাতে থাকে স্টুয়ার্ড। স্টুয়ার্ড কলকাতার পার্ক সার্কাসের মানুষ। বুড়ো এবং দেখলে খুবই অথর্ব মনে হয়। একটা কি যেন অসুখ আছে তার। জাহাজঘাটায় ছোটবাবুর এমন মনে হয়েছিল। পরের কেবিনগুলোতে ছোট-মালোম, মেজ-মালোম, বড়-মালোম এবং মাঝখানে রয়ে গেছে চৌকোন একটা বিরাট ফাঁকা জায়গা। ওপরে উঠে গেলেই বোট-ডেক এবং কাঁচের স্কাইলাইট। একটা লম্বা সিঁড়ি 'দ'-এর মতো বেঁকে বেঁকে পাতালে নেমে যাবার মতো। সিঁড়ির প্রথম ধাপে আছে প্রকান্ড সিলেন্ডার। বড় বড় লম্বা থামের মতো মোটা, স্টিম পাইপ এসে জুড়ে গেছে। সিঁড়ির পরের ধাপে রয়েছে গোল গোল লম্বা তিনটে পিস্টন রড। স্টিলের মোটা এত মোটা স্টিলের রড ছোটবাবু জীবনেও দেখেনি। আকার এবং পরিমাণ দেখে ছোটবাবু ঘাবড়ে গেছিল। নিচে নেমে গেলে ক্র্যাঙ্ক স্যাফট। লম্বা, কত লম্বা হবে, যেন ওটা যেতে যেতে টানেল পথে কোথায় হারিয়ে গেছে। ওটা গেছে ঠিক ওদের ফোকসালের অনেক নিচ দিয়ে এবং বাইরে বের হয়ে প্রপেলারকে ধরে রেখেছে। আশ্চর্য বিস্ময়ে ছোটবাবু দেখতে দেখতে বুঝল বড় বেশি তাপ্পি মারা জাহাজ। সে এনজিন-রুমে দৈত্যের মতো তিনটে অতিকায় বয়লার দেখতে পেল। বয়লারের গায়ে নানারকম পাইপ, কক এবং গেজ লাগানো আছে। এ-পাশে জেনারেটর, এভাপরেটার, ও-পাশে কনডেনসার, ব্যালেস্ট পাম্প, জেনারেল সার্ভিস পাম্প। জাহাজের ডানদিক দিয়ে ঠিক বয়লারের গা ঘেঁষে ওপাশে ঢুকে গেলে বয়লারের বিরাট তিনটে করে হাঁ-করা মুখ, যেন গিলতে আসছে। লম্বা স্টোক-হোলডে দাঁড়িয়ে সে ওপরের দিকে তাকাল। ভীষণ নিচে সে নেমে এসেছে। বয়লারের সামনে একা দাঁড়িয়ে থাকতে ওর ভীষণ ভয় লাগছিল। বয়লারের তিনটি করে ফারনেস। দুদিকে দুটো, একটা নিচে। লম্বা সব স্লাইস র্যাগ শোয়ানো পাশে। একটা তুলতে গিয়ে মনে হল খুব ভারি আর তখন ঝুপ করে মনে হল কিছু মাথায় পড়ছে। কালো অন্ধকার গহ্বরে ঢুকে গেলে যেমন ভয় লাগে, তেমনি একটা ভয়। এখনও ঝুর-ঝুর করে মাথার ওপর কি সব পড়ছে। গুঁড়ো গুঁড়ো, এবং ক্রমে অন্ধকার করে দিচ্ছে, প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবার মতো।

সে তাড়াতাড়ি স্টোক-হোলডের সিঁড়ি ধরে ওপরে ওঠার মুখেই দেখল কাপ্তানের বেহদ্দ ছেলেটা কি করে দেখতে পেয়েছে, নিচে সে দাঁড়িয়ে আছে। ছেলেটার হাতে চিপিঙ করার পাতলা হাতুড়ি। ফানেলের গুড়ি থেকে সব ময়লা টেনে ফেলছে। ছোটবাবু বুঝতে পারল না, ওকে দেখে এমন করছে, না, না দেখে। যেভাবেই হোক ছোটবাবু রাগ করতে পারে না। বাড়িওয়ালার ছেলে, কোন কারণেই সে মুখ গোমড়া করে উঠে যেতে পারে না। ছোটবাবু ওঠে ওর পাশ কাটিয়ে যাবার সময় সামান্য হেসে বলল, গুড-মর্নিং স্যার।

—গুড-মর্ণিঙ।

ছোটবাবুর মুখ বেশ কালো হয়ে গেছে। আসলে ও-সব কয়লার গুঁড়ো। জ্যাকেরও জাহাজে কাজ থাকে। একজন নাবিক হিসাবে ওকে উঠে আসতে হয়েছে। সে দেখতে পায়নি নিচে কেউ আছে। সে ওর খুশিমতো কাজ করে। যখন যেখানে খুশি। সে দেখছিল হলুদ রঙের চিমনি, তার চারপাশে সব কয়লার গুঁড়ো, রঙ খেয়ে নিচ্ছে। সে ভেবেছিল, জায়গাটা সাফ করে রঙ করবে। ওর তো খুশিমতো কাজ। কশপকে বলে হলুদ রঙ নিয়েছে। সে সেজন্য বেশ টেনে টেনে ময়লা নামাচ্ছে, এবং খুব নিচে একজন যে মানুষ দাঁড়িয়েছিল, এবং বয়লার দেখে ভয় পেয়ে গেছিল, তার মাথায় গিয়ে পড়েছে সব, সে জানত না। সে নিজের মতো কাজ করে গেছে। কে গুড-মর্নিং বলল, চোখ তুলে তার দেখার স্বভাব না। কারণ সে জানে, এ জাহাজে এখন কেবল সালাম সার, গুড মর্নিঙ, গুড নুন সাব। মাঝে মাঝে সে খুব

বিগড়ে যায়, কেন যে এমন হয় সে জানে না। সুতরাং বনি জানে না একজন কম বয়সের জাহাজি এ জাহাজে উঠে এসেছে। বরং সে জানে এ জাহাজে সে খুব ছোট, সবাই তাকে খাতির করে থাকে। তার ওপর কথা বলার কারু যেন অধিকার নেই।

আর ছোটবাবু দেখল, বেশ নিরিবিলি শান্তভাবে কাপ্তেনের ছেলেটা কাজ করে যাচ্ছে। আসলে ওর কাছে এটা কাজ না, খেলা। ছোটবাবু এটা দেখেই টের পেয়েছে। এবং তখনই মনে হল লম্বা চিমনি যেন আকাশ ছুঁতে চায়। তার নিচে, সাদা বয়লার স্যুট পরে নীল চোখের অতি মায়াবি মুখ সে ভেবে পায় না, কেন এই ছেলেকে সবাই খারাপ ভেবে থাকে। ওর মা নেই। মা না থাকলে মানুষের কি থাকে। ছোটবাবুর বেশ কষ্ট হচ্ছে। ছেলেটি লম্বা, অথচ বয়স কম, চোখ দেখলেই টের পাওয়া যায়, খুব নির্দোষ স্বভাবের মুখ। সে কারো দিকে বুঝি তাকায় না, না তাকিয়েই গুডমর্নিঙ বলে থাকে। এভাবেই জাহাজে যেন ছোটবাবু ওর মতো আর একজন দুঃখী মানুষকে সহসা আবিষ্কার করে ফেলল। সামনে একমডেসান ল্যাডার। কাপ্তানের ঘরে উঠে যাবার সিঁড়ি। নিচে বোধ হয় ছেলেটার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। টোপাস সকাল থেকেই চারপাশটা ভীষণ ভালভাবে সাফসোফ করছে। কাপ্তানের কেবিনের পাশে চার্ট-রুম। তারপর ব্রীজ। ব্রীজে দুটো কম্পাস। পাশে স্টিয়ারিং হুইল। সাদা রঙ ব্রীজের। দু'পাশে তার দুটো উইংস। কাপ্তান সেখানে পায়চারি করছেন অন্যমনস্কভাবে। সে ল্যাডারের আড়ালে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারল ক্রমে সে এক ভীষণ উঁচু জায়গায় উঠে এসেছে। এখান থেকে নিচে জাহাজের সামনের হ্যাঁচ দুটো চোখে পড়ছে। বড় মাস্তুল চোখে পড়ছে। দড়ি-দড়া সব চারপাশে ওপরে নিচে ছড়িয়ে আছে। দুটো হ্যাচের মাঝখানে দুটো দুটো চারটে ডেরিক। তারপর বড় একটা আলাদা উইনচ। জাহাজের নোঙর ফেলার জন্যে রাখা হয়েছে। সামনে পতাকা উড়ছে। এ-ভাবে একটা জাহাজ আর তার মানুষজন চোখের ওপর ভেসে উঠলে, সে দেখল, পেছনে কে দাঁড়িয়ে তাঁকে ডাকছে—ছেলে আমার সঙ্গে আয়।

মুখ ফেরালে সারেঙ দেখলেন, মাথায় মুখে কয়লার ধূলোতে ছেলেকে একবোরে চেনা যাচ্ছে না। এ সবে সারেঙের ঘাবড়াবার কথা না। বললেন, কোথায় ছিলি ছেলে? মাথাটা বাঁ-হাতে ঝেড়ে দিতে দিতে বললেন, মুখে মাথায়, এসব কয়লা লাগিয়েছিস?

—জাহাজটা ঘুরে ঘুরে দেখছিলাম চাচা! স্টোক হোলডে ঢুকতে এমনটা হল।

—আয় আমার সঙ্গে।

ছোটবাবু সারেঙের সঙ্গে হাঁটতে থাকল।

এনজিন সারেঙ যখন ছোটবাবুকে নিয়ে বয়দের কেবিন পার হয়ে বোট ডেক থেকে আপ ডেকে নেমে যাচ্ছেন তখনই জ্যাকের মনে হল, সাব না বলে কে যেন স্পষ্ট বলল স্যার। গুড মর্নিঙ কথাটা বেশ টেনে টেনে তার উচ্চারণ। জাহাজে একমাত্র অফিসাররা ওকে জ্যাক বলে ডাকে। যারা ক্রু তারা সবাই সাব, কিন্তু কে একজন বলে গেল স্যার, মনে হল স্যার বলে রসিকতা করে গেল।

জ্যাক উঠে দাঁড়াল। ওর কোকড়ানো চুল গভীর নীল রঙের। চোখ কিছুটা উদাসীন মাঠে বরফ পড়ার মতো। নাক সুন্দর নরম, মসৃণ ঘাড় গলা, থুতনি আশ্চর্য ঢেউ খেলানো, আর গোটা মুখে গোলাপি আভা। বোধ হয় সদ্য দেশ থেকে আসার দরুন এমন দেখাচ্ছে। এবং দেখলেই বোঝা যায়, খুব ঘন নীল রঙের চুলের ভিতর ভারি মনোরম হয়ে আছে মুখখানি। জ্যাক দৌড়ে বোট-ডেক থেকে নেমে গেল।

সূর্য তেমনি উঠে আসছে তিন নম্বর জেটির ও-পাশ থেকে। ক্রেনের ছায়াগুলো ক্রমে ছোট হয়ে আসছে। কে এমন বলে গেল, স্যার, তার কি স্যার বলার বয়স হয়েছে। সাব, বাংলা কথা জাহাজিরা বললে এটা সম্মানের বাবা এমন বলেছেন। সে সেই লোকটাকে খুঁজতে গিয়ে মনে হল, না অনর্থক খোঁজা। কাকে সে জিজ্ঞাসা করবে। এমনিতেই সে অনেক সময় খুব গুটিয়ে যায়, বাবাকে সব খুলে বলতে পারে না, তবু মাঝে মাঝে ভীষণ রেগে গেলে ওর

কান্ড-জ্ঞান থাকে না। জাহাজে উঠেই সে ঝামেলা পাকালে বাবা খুব বিব্রত বোধ করবেন। ফিরে আসার সময়ে মনে হল, উইনচের তলায় কেউ ঢুকে গেছে! পা দুটো বের হয়ে আছে। উইনচের ভিতর থেকে পুরানো নাটবোল্টু টেনে টেনে খুলে আনছে। ফিফথ ঝুঁকে আছে ভিতরে। সে খুব উৎসাহ দিচ্ছে, আবার আবার। আরো জোরে আঃ লাগছে না!

—এই তো ভাল করে লাগালাম স্যার।

—না লাগে নি।

—ফসকে যাচ্ছে স্যার। এবং মুখে তেলকালি লাগায় এখন আর ছোটবাবুকে আদৌ চেনা যাচ্ছে না। তবু ফানেলের নিচে সেই কোঁকড়ানো চুলের মুখ, ভারি সুন্দর এবং মুগ্ধতায় ভরা। কেন জানি ওর ভারি ইচ্ছে হচ্ছে ছেলেটির সঙ্গে বন্ধুত্ব হোক। সে তার ছেলেবেলাকার কবিতার কথা মনে করে, ফিফথকে বলল, আমি একটা কবিতা বলতে পারি স্যার।

—মানে?

—মানে স্যার এবার আটকে গেছে। দেখুন। বলে সে টান দিলে নাটটা আদৌ ঘুরল না। স্যার আপনি হ্যাঁচ্য দিন।

—হ্যাঁচ্য মানে?

—এই যে বলে না, বলুন স্যার, জ্যাক এন্ড জিল হেঁইয়; ওয়েন্ট আপ দি হিল—হেঁইয়। এই দেখুন ঘুরছে। আবার সে রেঞ্চ এঁটে বলল, জ্যাক এন্ড জিল ডাউন, হেঁইয়। ব্রেক হিজ ক্রাউন, হেঁইয়। এবার নাটটা একেবারে ঢিলে করে গা ঝাড়া দিয়ে বের হয়ে পেছনে তাকাতেই একেবারে কাঠ। জ্যাক দাঁড়িয়ে আছে। সব শুনেছে। ওর মুখটা এমনিতেই চেনা যাচ্ছিল না, জ্যাককে দেখে মুখটা আরও গোলমেলে হয়ে গেল।

জ্যাক ওর এমন কাতর মুখ দেখে হা-হা করে হেসে উঠল। হেসেই সে দু লাফে বোট-ডেকে উঠে গেল। ছোপ ছোপ কালির ভেতর ছোটবাবুর মুখ নরম দাঁড়ি কিছুটা বুড়ো ক্লাউনের মতো। এমন জোরে হাসায় ছোটবাবুও হি-হি করে হেসে দিল। পরে একেবারে শক্ত হয়ে গেল। ফের ভিতরে ঢুকে বলল, স্যার আমাদের জাহাজ কোথায় যাবে?

—কোথায় যাবে এখনও ঠিক হয় নি।

—শুনেছি বুনোসাইরিস যাবে।

—বুয়েনস-এয়ার্স যাবার কথা আমরাও শুনেছি। তবে বোর্ডে তো কিছু দেয় নি এখনও।

—স্যার, আমি জ্যাক এন্ড জিল বললাম বলে ছোট স্যার রাগ করে নি তো?

—সে তো আমি জানি না।

—আচ্ছা স্যার আমি না জেনে দোষ করেছি। কাপ্তান ডেকে পাঠালে এমন বললে নিশ্চয়ই ক্ষমা করে দেবেন।

—তা দিতে পারেন। আসলে ছোটবাবুর ভিতরটা খচ খচ করছে। এদিকের উইনচ চলছে না কারণ, পুরানো জং-ধরা মেসিন। বাইরে ক্রেন থেকে বড় বড় পাটের গাঁট নামানো হচ্ছে ফল্কার ভেতর। হারিয়া হাফিজ—কেবল ক্রমাগত এমন সব শব্দ গোটা ডেকময়। সব পাটের গাঁট বোঝাই হচ্ছে। এগুলো কোথায় যাবে—ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। এজেন্ট অফিস থেকে কোনও খবর দিতে পারে, কাপ্তান অথবা বড় মালোম খুলে কিছু বলছেন না। তবু আন্দাজে ধরে নেওয়া যায়। জাহাজ কোথায় যাবে ধরে নেওয়া যায়—যাবে বুনোসাইরিস।

সে জাহাজে উঠে উঠেই এটা যে কি করে ফেলল। উইনচের তলায় সে এখন চিত হয়ে শুয়ে আছে। ওর পা দুটো ডেকের ওপর সাঁড়াশির মতো এবং সাদা পা দুটোর মোজা কালো রঙের। পুরানো হাফ-সোল মেরামত করা জুতোর ফাঁক দিয়ে বুড়ো আঙুল বের হয়ে আছে। এবং এখন যেন এই ফাইবার অর্থাৎ ফিফথ এনজিনিয়ারকে খুশি রাখা একান্ত দরকার। ফাইবার কিছুতেই উইনচের নিচে ঢুকতে চাইছে না। কারণ, এত বড় শরীরটা তার ঢুকবে না।

অবাঙ্গালীর মতো লম্বা এবং ঘাড়ে- গর্দানে খুব শক্ত। বেশ যখন ছেলেটা কাজ চালিয়ে যেতে পারছে, তখন নীচে না ঢুকে বরং সাফসোফ থেকে সকালের টিফিনটা সেরে নেওয়া যাবে। পরে পরে হয়ে গেলে মন্দ কি! আসলে সারেঙের কাছে ফাইবার একজন হেলপার চেয়েছে। এ সব কাজ ফাইবারেরই করার কথা। ছোটবাবু শুধু এটা- ওটা এগিয়ে দেবে। নাট বোল্ট তেলে ধুয়ে দেবে, বাটালি হাঁতুড়ি এগিয়ে দেবার কথা। অথচ ফাইবার ওকে দিয়েই সব করিয়ে নিচ্ছে। সে এটা-ওটা ছোটবাবুকে এগিয়ে দিচ্ছিল।

ছোটবাবুর এসব কাজ জানা। ট্রেনিং শিপে সে এমন সব কাজ করে এসেছে। সে এখন অন্য কিছু ভাবতে পারছে না। ফাইবার বাঙ্গালী সাহেব। বাঙ্গালী সাহেবকে হাত না করতে পারলে তার চলবে না। সে তো আর ছোট-স্যারকে রাগাবার জন্য এমন বলে নি। সে তো কেমন সুন্দর সব ছবির দৃশ্য ভাবতে ভাবতে ছেলেবেলাকার একটা কবিতা মনে করতে পেরেছে। জ্যাক এন্ড জিল বলে হেঁইয় দিতে গিয়ে যত গন্ডগোল। ফাইবার হাতে থাকলে একজন অন্তত তার সাক্ষী থাকবে।

খাবার টেবিলে ছোটবাবুকে খুব বিমর্ষ দেখাচ্ছিল। ওরা তিনজন মিলে এক বীশু। মৈত্র, ছোটবাবু আর অমিয়। মৈত্র বলে দিয়েছে, বিফ যেন দেওয়া না হয় ওদের। সারেঙ বলেছে, আজ তো মটন দিয়েছে, কাল কি দেবে বলতে পারি না।

ছোটবাবু খেতে বসে বিফ কি মটন দেখছে না। অথবা ওদের কথাবার্তা বেমালুম শুনছে না। সে অন্যমনস্কভাবে খাচ্ছে। সে খুব ভীতু স্বভাবের মানুষ। সে হেসে দিয়েছিল, ছোট-স্যার হেসেছেন বলে। মুখ গোমড়া রাখলে যদি আরও রেগে যায়। কিন্তু হেসে কি লাভ হল। ছোট স্যার তো তখন লাইফ বোটের ও পাশে চলে গেছে। সে হাসল কি কাঁদল কে দেখেছে।

স্নান করে ছোটবাবু একটা সাদা প্যান্ট সাদা হাফ-সার্ট গায়ে দিয়েছে। সারা দিন সে কাজ করেছে ফাইবারের সঙ্গে। বারোটায় তাড়াহুড়ো করে ভাত ডাল খেয়েছে, বাঁধাকপি ভাজা খেয়েছে। মাংস খায়নি। এখনও জাহাজের বাসি মাংস শেষ হয়নি। যখন সকালের দিকে ভান্ডারী মাংস কাটছিল সে ভীষণ দৃশ্য, সাদা হয়ে গেছে, বরফ ঘরে মাংস দীর্ঘদিন থাকলে যা হয়।

কাল পরশু রসদ উঠবে। মৈত্র এ-নিয়ে একটা ঝগড়া বাধিয়ে পর্যন্ত দিয়েছিল, সারেঙকে শাসিয়েছে—মটন যেন রসদে বেশী করে নেওয়া হয়। আমরা যারা হিন্দু আছি তাদের কথা ভাববেন। অথচ মৈত্র সব খায়। সে বিফ মটন মানে না। তার কাছে দুই সমান। তবে সে এমন করছে কেন! ওরা দুজন বাঙালি হিন্দু জাহাজি নতুন উঠেছে বলে। ডেকে যে দুজন উঠেছে, একজনের নাম বঙ্কু, অর্থাৎ বঙ্কুবিহারী দেবনাথ। অন্যজনের নাম মজুমদার, অনিমেষ মজুমদার। মৈত্র বোধ হয় এদের নিয়ে জাহাজে একটা দল করতে চায়। আর্টিকেলে কি আছে না আছে, সে সেটা শুনতে চাইছে না।

মৈত্র মাংসের হাড়িটা ছোটবাবুর দিকে এগিয়ে দিল। —যা লাগে নে।

ছোটবাবু বলল, মৈত্রদা আমার মাংস খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

অমিয় বলল, আমারও।

—ওটা হলে তো চলবে না। মাংস না খেলে জাহাজ চালাবে কি করে। আবার এটা কয়লার জাহাজ। তারপর আবার জাহাজে স্টিম ঠিক থাকে না। সমুদ্রে পড়লে ঝড় উঠলে বুঝবে, বুঝবে। খাও খাও। পুরুষ মানুষ মাংস খাবে না, সে কি রকম কথা।

ছোটবাবু বলল, মাংসের আসলে যা চেহারা দেখেছি।

—পোকা দ্যাখো নি তো।

—পোকা?

—হ্যাঁ-হ্যাঁ পোকা।

ছোটবাবুর সঙ্গে সঙ্গে ওক উঠে এল। সে সোজা দৌড়ে গেল বাথরুমে। মৈত্র শুনতে পেল, ছোটবাবু বমি করছে।

—এ হলেই হয়েছে! সে তাড়াতাড়ি ভাত ফেলে ছুটে গেল। তুই ছোটবাবু এ-কথায় বমি করে দিলি! জাহাজে কি ট্রেনিং নিয়েছিস তবে। কচু ট্রেনিং! ওঠ। চল খাবি। তোকে জোর করে মাংস গেলাতে হবে, বমি তোর বের করে দিচ্ছি।

এনজিন-সারেঙ মেসরুমের বাইরে ছিলেন। জোরজার করে ছোটবাবুকে মাংস খাওয়ানো হবে বলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ছোটবাবুর মুখে রা নেই। এনজিন-সারেঙ মেসরুমে ঢুকে বললেন; মৈত্রমশায় কেন জোরজার করছেন। আস্তে আস্তে সব সয়ে যাবে। জোরজার করলে এই ভীতু ছেলেটা আরও ভয় পেয়ে যাবে।

মৈত্র, জাহাজের বড় টিন্ডাল। মৈত্রকে সারেঙ যথেষ্ট সমীহ করে কথা বলছেন এবং মৈত্র এ জাহাজের একজন দায়িত্বশীল মানুষ বুঝতে পেরে ছোটবাবু বলল, তাই মৈত্রদা। সময় ঠিক করে দেবে।

তবু মৈত্র কেমন গুম হয়ে বসে থাকল।—চল নিচে। ওরা নিচে নেমে গেলে দেখল ডেকজাহাজি বন্ধু অনিমেষ ওদের বাংকে বসে রয়েছে। অমিয়, ছোটবাবুর থালা গ্লাস ধুয়ে আনছে। ও এখনও নামে নি।

মৈত্র ভিতরে ঢুকেই গজগজ করছিল—হয়েছে বেশ, জাহাজে যে কেন আসা। মৈত্র টান মেরে লকার খুলে ফেলল, জামা কাপড় টেনে বের করছে। এ সব দেখে ওরা ঠিক বুঝল না মৈত্র এখন কি করতে চায়। মৈত্র তারপর একটি টিন বের করে বাংকের নিচে কি খুঁজছে। অমিয় এসে গেলে, ওর হাত থেকে একটা প্লেট টেনে তোয়ালে দিয়ে বেশ করে মুছল। অমিয়র সেই টিনটা। ওতে মুড়ি মোয়া নাড় আছে। গতকাল ওরা দুটো একটা করে খেয়েছে। অমিয় বাউন্ডুলে স্বভাবের ছেলে। সে দুটো একটার বেশি নিজে খায়নি। কিন্তু এখন যেন মৈত্র নিজের টিন থেকে মুড়ি বের করে দিচ্ছে। একবার অমিয়র দিকে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত।

ছোটবাবুর মনে হল এটা ঠিক হচ্ছে না। অমিয়কে ওর মা সফরে যাচ্ছে ছেলে, কবে ফিরবে ঠিক কি, পূজাপার্বণে ছেলের কথা মনে হবে, ছেলের জন্য বেশ যত্ন করে মোয়া, নারকেলের নাড়, তিলের তক্তি সব কত যত্ন করে সঙ্গে দিয়েছে। এ-ভাবে শেষ করে দেওয়া ঠিক না। সে বলল, মৈত্রদা আমার কিছু খেতে ইচ্ছা হচ্ছে না।

—খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না কেন? সারাদিন খেটে তো চোখ কোথায় গেছে! মুখ চোখ তো একেবারে ঈশ্বরের পুত্রের মতো করে রেখেছ। কে যে তোমাকে জাহাজে আসার ছাড়পত্র দিলো।

—সেই তো মৈত্রদা।

অমিয় বলল, খা না। কিছু তো একটা খেতে হবে।

মৈত্র ফের বলল, আরে জাহাজে বাবা মা কেউ কারো আসে না। আমরা নিজেরাই নিজেদের বাবা মা। সংকোচের কিছু নেই।

ছোটবাবু বলল, রাখো। খাচ্ছি।

তখন পোর্ট-হোল দিয়ে জেটির ও-পাশের ক্রেন দেখা যাচ্ছে। বন্দরের সব মানুষেরা ঘরে ফিরে যাচ্ছে। একটা জাহাজ ঢুকছে লকগেট দিয়ে। চোঙ মুখে পাইলট দু'পাশের মানুষদের দড়িদড়া ঢিলে দেবার অথবা টেনে ধরার নির্দেশ দিচ্ছে। বেশ সুন্দর উজ্জ্বল রোদ। সূর্য গঙ্গার ও-পাশে পাটকলের চিমনি পার হয়ে নারকেল গাছের ছায়ায় নেমে যাচ্ছে। সে কেমন অনিচ্ছার সঙ্গে খাচ্ছিল। ওকে ঘিরে ওরা চারজন নানারকম গল্প চালিয়ে যাচ্ছে। আর ক'দিন জাহাজ আছে, আর ক'দিন এ-ভাবে থেকে একদিন জাহাজ গিয়ে সমুদ্রে পড়বে। ছোটবাবু তখন শুধু ভাবছিল জ্যাক যদি বাবাকে বলে দেয়, যদি বলে দেয়, আমাকে বাবা ঠাট্টা করেছে

এবং সে এ-ভাবে একসময় সেজেগুজে গিয়ে ওপরে দাঁড়াল। দেখল, ডেকের পাশে মাস্তুলের নিচে জাহাজিরা বসে তাস খেলছে। সে কেবল ভাবছিল, কখন সারেঙ ডাকবে, ছেলে তোকে ডাইনিংরুমে বাড়িয়ালা ডেকেছে। এবং এ-ভাবেই ক্রমে রাত্রি বাড়ে।

আর অজস্র নক্ষত্র আকাশে। চারপাশে জাহাজ, জেটির লাল নীল আলো। সেই পরিচিত আবহাওয়া। ঠিক সে যেমন রেলিঙে দাঁড়িয়ে ভদ্রা জাহাজে কত কিছু ভাবত, আজও তেমনি এক সময় ভাবতে গিয়ে দেখল বোট-ডেকের ও-পাশে জ্যাক দাঁড়িয়ে আছে। ওর মুখে নীল রঙের আলো। উইংসের আলো মুখে বেশ একটা মহিমময় স্নিগ্ধ সুষমা সৃষ্টি করেছে। তার কেন জানি নিমেষে সব ভয় কেটে গেল।

এবং এ-সবই কেবল বিকেলে সবুজ ঘাস মাড়িয়ে যাবার মতো। সে যে কতদিন কোনো মাঠের ঘাসের ওপর ধীরে ধীরে হেঁটে যায়নি। তার ভারি ইচ্ছে কাল বিকেলে যে চলে যাবে বড় মাঠে। একা একা হেঁটে সেই ফোর্ট উইলিয়ামের রেমপার্টে বসে থাকবে। যে ক'দিন জাহাজ এ বন্দরে আছে মাঠের ঘাসে বসে থাকবে। একা থাকলে সে নিজের সঙ্গে অজস্র কথা বলতে পারে। তার তখন কোনও কষ্ট থাকে না।

জাহাজে মাল বোঝাই প্রায় শেষ। সবই চটের গাঁট। সামনে পেছনে চারটা ফল্কাতেই পাটের গাঁট আছে। উপরে রয়েছে কিছু চায়ের পেটি। এবং জাহাজ ছাড়ার আগের দিন এল বড় বড় খাঁচায় সব সারস পাখি। পাখিদের ডেকের ওপরই রাখা হল। মোটামুটি বোঝাই শেষ। ক্রেনগুলো সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। চব্বিশ ঘন্টায় ফ্ল্যাগ উড়ছে। সকালে জ্যাক পাখিদের খাবার দিচ্ছে। জ্যাক বেশ একটা ভাল কাজ পেয়ে চুপচাপ। সে আর কারো দিকে তাকাচ্ছে না। ছোটবাবু বেশ একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে পেরেছে। সে আর কখনও কাছে যায় না। জ্যাক পোর্ট-সাইড ধরে হাঁটলে, ছোটবাবু যায় স্টারবোর্ড সাইড ধরে। মুখোমুখি হতে ছোটবাবু ভীষণ ভয় পাচ্ছে।

সারেঙকে ছোটবাবু সব খুলে বলেছিল। সারেঙ জবাবে বলেছে, খুব বেঁচে গেছ। ওর নালিশ দেবার স্বভাব না। সে কখনও বাপকে লাগায় না। এমন অতিষ্ঠ করে তুলবে, তুমিই শেষ পর্যন্ত বাড়িয়ালার কাছে ছুটবে। যতটা পার এড়িয়ে যাবে।

সে খুবই এড়িয়ে যাচ্ছে। যদিও জ্যাকের মুখ ভারি সুন্দর, জ্যাককে কখনই খারাপ লাগার কথা না, তবু ছোটবাবু আর তাকায় না। বরং ছোটবাবু দেখল, জাহাজ লকগেট দিয়ে নামছে। বড় মিস্ত্রি, মেজ মিস্ত্রি সবাই বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে আছে। জ্যাক বাইনোকুলারে কিছু দেখছে।

ছোটবাবু জানে, বাইনোকুলারটা মেজ-মালোমের। তিনি এখন কাজে ব্যস্ত। জাহাজ নদীতে না নামা পর্যন্ত তিনি অবসর পাবেন না। সে জাহাজে উঠেই মেজ-মালোমকে দেখেছে মাঝে মাঝে তিনি বসে থাকেন বোট-ডেকে। চোখে থাকে বাইনোকুলার। অনেক দূরের কিছু দেখার আশা। খুব কাছে বড় বড় হয়ে দেখা দিলে বুঝি সব কিছুর মানে অন্যরকম তাঁর কাছে।

জাহাজের ওয়াচ আরম্ভ হয়ে গেছে। ছোটবাবুকে কোনও ওয়াচে রাখা হয়নি। এটা সারেঙ নিজেই ঠিক করেছেন। ওয়াচ ভাগের দায়িত্ব তাঁর। জাহাজে দুজন কোলবয় ফালতু। পাঁচ নম্বর অথবা চার নম্বর মিস্ত্রির সঙ্গে হেলপার হিসাবে কাজ করার কথা ওদের। ছোটবাবুকে সেজন্য ফালতু রাখা হয়েছে।

জাহাজ যাচ্ছে কলম্বোতে। বোর্ডে লেখা রয়েছে এমন। তারপর জাহাজ যাবে লরেঞ্জোমরকুইস এবং পরে ডারবান কেপ-টাউন হয়ে সোজা দক্ষিণ আমেরিকার সেন্টিসে। তারপর বুয়েনস-এয়ার্স। এই পর্যন্ত বোর্ডে লেখা রয়েছে। তারপর জাহাজ কোথায় যাবে, কেউ জানে না। এমন কি কাপ্তান পর্যন্ত বলতে পারবেন না। আর ব্যাঙ্ক লাইনের সফর বড় বেশি লম্বা সফর। কবে জাহাজ ফিরবে হোমে কেউ জানে না। আদৌ ফিরবে কি না, কারণ সমুদ্রের মায়ায় ভীষণভাবে মানুষেরা পড়ে যায়। তখন বুঝি পৃথিবীতে মাটি গাছপালা পাখি বলে কিছু আছে মনে থাকে না।

এবং এভাবেই সংসারে এক অতীব ইচ্ছা কখনও কখনও মানুষকে ভীষণ পাগল করে দেয়। কাপ্তানের পায়চারি দেখলে সেটা টের পাওয়া যায়। তিনি অন্যমনস্কভাবে হেঁটে যাচ্ছেন কেবল। তিনি কেবল জানেন, জাহাজের দূর্বলতম স্থান কোনটা। একটার পর একটা মেরামত করা হচ্ছে আবার অন্য জায়গায় ফুটোফাটা হয়ে যায়। বালকেডে নানারকম হিজিবিজি লোহার পাত লাগানো। কোনোটা সরে গেলে অথবা কোন কারণে ফুটোফাটা হয়ে গেলে কি হবে তিনি জানেন। এসব জানেন বলেই ব্যালেস্টের ওপর খুব নজর। একটা নয়, দুটো ব্যালেস্ট রেখেছেন। এবং এ জাহাজেই আছে একমাত্র উত্তরাধিকার তাঁর। তিনি তাকে নিয়ে উঠেছেন। তাঁর যে ভারি সখ ছিল—অন্তত একটা ছেলে। ছেলে না হলে এমন যে একটা পৃথিবী আছে, যার তিনভাগ জল, একভাগ স্থল, সমুদ্রে বের না হলে যা টের পাওয়া যায় না এবং সমুদ্রের এক ভারি আশ্চর্য টান আছে। সমুদ্রে তিনি জাহাজ নিয়ে প্রায় যাবতীয় দেশ এবং সমুদ্রের দ্বীপ, গাছপালা, ঝড় টাইফুন, তিমি মাছ, ডলফিনের ঝাঁক অথবা সিন্ধুঘোটক দেখে বেড়িয়েছেন। তাঁর মতো সেই উত্তরাধিকারও পুরুষানুক্রমে সেই ধারা টেনে নিয়ে যাবে এবং এভাবেই তিনি ভেবে থাকেন। মেয়েটাকে ছেলে বানিয়ে রাখেন। ছেলেটাকে সঙ্গে নেন। আসলে ওসব বলতে হয় চিফকে। –দ্যাখো নদী দ্যাখো। এর নাম কলকাতা বন্দর, হুগলী নদীর তীরে অবস্থিত বন্দর। তোমাদের পূর্বপুরুষরা এ বন্দরে প্রথম কলের জাহাজ নিয়ে এসেছিল। তুমি এসব দেখে রাখো।

বনি বাপের পাশে দাঁড়িয়ে চোখে দূরবীন লাগিয়ে সব দেখছে। সে স্থির। গরমকাল। সে গলস্ পরেছে চোখে। যখন দূরবীন পরছে না, তখন গগল্স্ পরে থাকছে। এটা গ্রীষ্মের বিকেল, এবং সারা দিনের প্রচণ্ড উত্তাপে জাহাজ-ডেকে দাঁড়ানো যাচ্ছে না। বোট-ডেক কাঠের। ডেক-জাহাজিরা জল মারছে এখন। জাহাজ বেশ দুপাশে বয়া রেখে এগিয়ে যাচ্ছে। এনজিনে খুব একটা স্টিমের দরকার হচ্ছে না। দুটো বাঙ্কারে দুজন কোলবয় একটু ফাঁক পেয়ে বিড়ি খাচ্ছে। এবং গুহার মতো কিছু সাইড বাঙ্কার থেকে সোজা স্টোক-হোলডে নেমে গেছে। অথবা সুট বলা যেতে পারে। কয়লা হড়হড় করে নেমে গেলে আবার সুট ভরে ফেলতে হবে। ক্রস-বাঙ্কার খোলা আছে। বাংকারে কয়লা ছাদ পর্যন্ত বোঝাই। দরজা খুলে বেলচা মেরে দিলেই হড়হড় করে নেমে আসে। তিনজন ফায়ারম্যান উইণ্ডসেলের নিচে দাঁড়িয়ে স্টিম দেখছে। খুব একটা স্টিম লাগছে না। একশো আশি হলেই হয়ে যাচ্ছে। অল্প কয়লা খাচ্ছে। এখনও স্টোক-হোলড তেমন তেতে যাচ্ছে না। বালকেডগুলো হাত দিয়ে ছোঁয়া যাচ্ছে। আসলে কাজ আরম্ভ এখনও ঠিকমতো হয়নি। মৈত্রের ওয়াচ। সে মাঝে মাঝে হেঁটে যাচ্ছে। ওর নীল রঙের টুপি, হাতে দস্তানা, পায়ে পুরানো বুট জুতো। সে মাঝে মাঝে ফার্নেস-ডোর খুলে দেখছে, কোনটায় কয়লা মেরে দিতে হবে, কোনটায় র‍্যাগ মেরে ছাই ফেলে দিতে হবে, অথবা কোনটাতে স্লাইস মেরে কয়লার চাঙ টুকরো টুকরো করে দিতে হবে। সে নিজেই দেখে যায়। কখনও এয়ার বালব ছেড়ে দেয়। মাঝে মাঝে এনজিনরুম থেকে গ্রীজার ছুটে আসে। মেজ-মিস্ত্রি ছুটে আসেন। কম, কম স্টিম মাংতা। আসলে জাহাজটা যাচ্ছে ভীষণ ধীরে ধীরে। কলকাতা বন্দরকে ভারি অবিশ্বাস সকলের।

তখন ছোটবাবু দেখল বেশ নিরিবিলি একজন মানুষ বোট-ডেকে ডেক-চেয়ারে চুপচাপ বসে আছে। পাশে মেস-রুম-বয় কফি রেখে গেছে। একটা ছোট টিপয়ে দুটো বই। বইয়ের ওপর আপেল একটা। ছোটবাবু তখন স্নান সেরে ডেক ধরে উঠে যাচ্ছে। অমিয় এবং মৈত্রের ওয়াচ আছে। ওরা চারটার ওয়াচ শেষ করে উঠে এসেছে। ওদের স্নান সারতে সময় লাগবে। এসময় বাথরুমে ভীষণ ভিড়। সে একটু পায়চারি করবে বলে ডেক ধরে যাচ্ছে। আসলে ওর ফোকসালে বসে থাকতে ভাল লাগছে না। কত কথা মনে হচ্ছে। এখনও সে এ-দেশের গাছপালা, বাড়িঘর, কলের চিমনি এবং জেলেডিঙ্গি অথবা জাহাজ ঢুকছে খাড়িতে এসব দেখতে পাচ্ছে। এখনও সে দেখতে পাচ্ছে দূ'পাশে কি সুন্দর নারকেল গাছ, মানুষের ছায়া। ঘুরে ফিরে মা, ছোট ভাইবোন, বাবার মুখ নদীর জলে ভেসে উঠছে।

মেজ-মালোমের পাশ কাটিয়ে সে নেমে যাচ্ছিল। আসলে সে চুরি করে মেজ-মালোমের

দূরবীনটা দেখতে চাইছে। ওর ভারি সখ দূরবীন দিয়ে দু'পাশের গাছপালা পাখি দেখে। কিন্তু সে তো সবচেয়ে ছোট কাজ করে। সে যদিও জাহাজিদের ভিতর সবচেয়ে পড়াশোনায়ালা আদমি, এটা জাহাজে সারেঙই প্রচার করে দিয়েছে। সবাই খতটত লেখাবার জন্য আসবে সেটাও ঠিক। এবং সুন্দর ইংরেজি বলতে পারে বলে ফাইবারও বেশ পছন্দ করে ওকে কাজের সময়। চার নম্বর মিস্ত্রি দেখেছে; ছেলেটিকে কোনো কাজ একবার বললেই বুঝে নেয়। বার বার প্রশ্ন করে বিরক্ত করে না।

মেজ-মালোমের মনে হচ্ছিল, এই যে ছেলেটি যাচ্ছে জাহাজে, যার চোখ ভারি আশ্চর্য মিষ্টি, মুখে গোঁফের রেখা, গালে দাড়ি মাত্র কালো হয়ে উঠেছে এবং প্রায় যেন লম্বা গাছের মতো শান্ত নিরীহ, কিছু বলতে চায় না, জাহাজে উঠেই চুপ মেরে গেছে তাকে একবার ডেকে বললে হয়, তুমি বাবু জাহাজে উঠেই গুম মেরে গেলে কেন? তারপরই মেজ-মালোম ডাকল, হেই।

সে কাছে গিয়ে খুব সুন্দর এবং স্পষ্ট ইংরেজিতে বলল, আমাকে ডাকছেন স্যার?

—হেঁ।

সে ছুটে গিয়ে আরও সামনে দাঁড়াল।

—এসব জায়গার কি নাম?

—ফলতা হবে। তবে আমি স্যার ঠিক বলতে পারব না।

—তোমার দেশ, তুমি জান না?

—এখানে তো কখনও আসিনি স্যার।

—কিচ্ছু নেই।

—ছোটবাবু বলল, না স্যার, গাছ-পালা, বাড়ি-ঘর, গ্রাম, মাঠ সব আছে।

—না, কিচ্ছু নেই।

—না স্যার, সব আছে।

—কিছু নেই। তুমি দ্যাখো, কিছু দেখা যায় কিনা, বলেই তিনি কফি খেতে থাকলেন।

ছোটবাবু তাড়াতাড়ি দূরবীনটা চোখে লাগালে দেখতে পেল, বেশ সব বড় বড় কলের চিমনি। কি যে বড়! আকাশে উঠে গেছে যেন একটা নারকেল গাছ। তারপর একটা বাঁধানো ঘাট, মানুষজন নেই, চিতায় আগুন-টাগুন আছে। সে দেখছে আর বলে যাচ্ছে। সব আছে স্যার। মানুষের যা যা দরকার সব আছে স্যার।

—আসল জিনিষটা নেই। তিনি আপেল খাচ্ছেন কামড়ে। তার গালে সামান্য দাঁড়ি মুখে প্রবীণতার ছাপ। চোখ দুটো খুব তাজা। বেশ খচমচ করে খেয়ে যাচ্ছেন। ভালো করে দ্যাখো। আমার দেখতে দেখতে চোখ টাটাচ্ছে।

ছোটবাবু দেখছিল সব। সে বলতে বলতে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছে। কেমন ছায়াছবির মতো সব সরে যাচ্ছে।

মেজ-মালোম বললেন, সব বললে হে, কিন্তু একটা কথা বললে না।

—কি স্যার?

—ওম্যান! ওম্যানের কথা বললে না।

—তা স্যার দেখলাম নাতো।

—তাহলে তুমি বলছ মানুষের জন্য যা দরকার সব আছে?

—না স্যার ঠিক বলিনি। ছোটবাবু কি যে ফ্যাসাদে পড়ে গেল। সে মুখ খুব কাঁচুমাচু করে রেখেছে।

—মানুষের জন্য যা যা দরকার সব আছে শুধু আসল জিনিসটাই নেই জাহাজে। বুঝবে ঠ্যালা। সমুদ্রযাত্রা কাকে বলে বুঝবে। বলেই সে থু করে আপেলের বোঁটাটা মুখ থেকে ফেলে দিল।—এজন্য বসে থাকি। বসে থাকি আর ভাবি, বেশ দিনকাল কেটে গেল। জীবনের সবটাই জাহাজে কেটে গেল। আসল জিনিসটাই মাঝে মাঝে কেমন জীবন থেকে হারিয়ে যায়। খুঁজি। খুঁজে যখন পাই তখন বন্দর থেকে জাহাজ ছেড়ে দেয়।

ছোটবাবুর ভারি মজা লাগছিল। বেশ মানুষটা। সে পরে আছে সাদা প্যান্ট গা-খালি। গায়ের রং শঙ্খের মতো সাদা অথবা মানুষের চামড়া তুলে নিলে যে রং হয়—তেমনি সাদা লালে মিলে এক আশ্চর্য কঠিন রং এবং গরমে পুড়ে কেমন ফোস্কা পড়ার মতো। পিঠের ওপরে ঠিক কাঁধের নিচে ঘা। কিছু মলম-টলম মাখানো।

এটা হয়। যারা শীতের দেশের মানুষ, তাদের এই গরমে রোদে ঘোরাঘুরি করলে ফোসকা পড়ে যায়। মানুষটার কোন কষ্ট হচ্ছে বোঝাই যায় না। বেশ শুনে যাচ্ছে। তারপর? —জাহাজ যাচ্ছে। জল কেটে জাহাজ যাচ্ছে। আর বাতাস কেটে ছায়াছবির মতো সব পার হয়ে যখন ছোটবাবু দেখল সূর্য অস্ত যাবার মুখে তখন মেজ ওঠে বললে, নসিব খারাপ। সে দুটো একটা যে বাংলা জানে ছোটবাবুকে এমন বলে যেন সমঝে দিতে চাইল।—নো ওম্যান। ঠোঁট উল্টে সিঁড়ি ভেঙ্গে নিচে তড়তড় করে নেমে গেল। যেন চোখের ওপর থেকে ভোজবাজির মতো অদৃশ্য হয়ে গেল মানুষটা।

সে একা দাঁড়িয়ে থাকল। উইংসে মাস্তুলে ডেরিকে, কেবিনে কেবিনে সব আলো জ্বলছে, লাল নীল রঙের আলো। ছোটখাটো একটা যেন শহর নিয়ে ছোটবাবু নদী ধরে সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে। এনজিনের একটানা শব্দ উঠে আসছিল। সমস্ত আকাশ জুড়ে নক্ষত্রের যে নামটাম মুখস্থ করে রেখেছিল সে সব মনে করার চেষ্টা করল। কবে একবার একটা বিদেশী ছবিতে কোনও ধর্মীয় সঙ্গীতের সময় সে শুনেছিল এক আশ্চর্য সিমফনি। নির্জনতা, একাকীত্ব সে সিমফনির সুরে সুরে ভরা। তারপর মনে হল, এইসব নক্ষত্র দেখতে দেখতে মনে হল, সে ভীষণ একা। ভীষণ সে অসহায়। সে কোথায় যাচ্ছে জানে না, কোথায় এর শেষ জানে না, কবে ঘরে ফিরবে জানে না। এমন নিরুদ্দেশে যাত্রা মানুষের হয় তার জানা নেই। কে যেন বলেছিল এ-বংশের একজন না একজন নিরুদ্দেশে যাত্রা করে থাকে। তারা কেউ আর ফিরে আসে না। তুমি আমার জেনারেশনে সেই মানুষ ছোটবাবু। তুমি বোধহয় ফিরে আসছ না।

মনে হল তখন কেউ পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। সে দেখল, মৈত্রদা।—কিরে মন খারাপ! দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছিস বলে মন খারাপ। মৈত্রদা না এলে সে সত্যি ভীষণ যেন এখন ভয় পেয়ে যেত।

ছোটবাবু ঘুরে দাঁড়াল।

—তোর এরকম হবার কথা না তো। মন খারাপ হবে আমাদের। বিয়ে করেছি। বৌ থাকল ঘরে। আমি ভেসে গেলাম সমুদ্রে। কিছু একটা হলেও কিছু করার থাকবে না। ছুটে আসতে পারব না। কত সব চিন্তা। ভাবলে ঘুম আসে না।—আয়, একা একা থাকবি না। জাহাজে একা একা থাকা খুব খারাপ। গল্পটল্প করে সব ভুলে থাকবি।

—এখানে আমি আছি কে বলল তোমাকে?

—আমরা জানি কে কোথায় থাকতে পারে। বলে হাসল। তুমি যে বোট-ডেকে থাকবে আমরা জানতাম। তোমার খুব যে ইচ্ছা কাপ্তানের ছেলেটার সঙ্গে বন্ধুত্ব হোক সেটা আমরা বুঝি!

—না মৈত্রদা। সত্যি তা না। এখান থেকে চারপাশটা স্পষ্ট দেখা যায়। এখানে মানুষজন কম থাকে, এখানে মেজ-মালোম দূরবীন নিয়ে বসেছিলেন। আমার ভারি সখ ছিল দূরবীনে পাড়ের গাছপালা দেখি।

—বেশ করেছ। এখন এস। লক্ষ্মী ছেলেটির মতো খেয়ে নাও। কাল সকালে সমুদ্রে

পড়ব। তখন আর ঠিকমতো খেতে পারবে না। জাহাজে পিচিঙ আরম্ভ হয়ে যাবে।

মৈত্র এভাবে কখনও ছোটকে তুই তুকারি করে কখনও তোমার বলে। এভাবে সে-রাতে ছোটবাবু বেশ পেট ভরে খেল। মনে হল জাহাজে খুব একটা পরিশ্রমের কাজ থাকে না। যা শুনেছে তা, এমন কি ভীতিকর সে বুঝছে না। যদিও সমুদ্রে জাহাজ পড়বে কাল সকালে। তিন জোয়ারে জাহাজ সমুদ্রে গিয়ে পড়বে। ফলতার কাছে ওদের একবার নোঙর ফেলতে হয়েছে, রাতে এক জায়গায়, সকালে সমুদ্র দেখতে কেমন না জানি হবে।

ভোরের দিকে ঘুম ভাঙলে মনে হল জাহাজটা একেবারে থেমে গেছে। বোধহয় নোঙর ফেলেছে। ছোটবাবু ওপরে উঠে এল। বা বেশ। সে চিনতেই পারছে না। পাইলট নেমে যাচ্ছে জাহাজ থেকে। ওপরে অজস্র পাখি। বড় বড় পাখি। যেন কি করে টের পেয়েছে একটা পুরানো জাহাজ যাচ্ছে সমুদ্রে। টের পেয়েছে, প্রচুর খাবার এই জাহাজে। ওরা মাস্তুলের ওপর ঝাঁকে ঝাঁকে বসে রয়েছে। আর সেই দিগন্ত বিস্তৃত নীল জলরাশি। ছোটবাবু ভাবল জলরাশি না বললে এর ঠিক ওজন থাকে না। অসীম জলরাশি। পারাপারহীন জলরাশি। আকাশ এবং সমুদ্র মিলে এক নীল ভূখণ্ড যেন। এভাবে একটা সাদা জাহাজ নীল জলরাশির ভিতর নীল আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে থাকলে আশ্চর্য, ছবি হয়ে যায়। আর পাখিগুলো সাদা বিন্দু বিন্দু প্রজাপতির মতো অনবরত সেই ছবির ভেতর উড়ে বেড়াচ্ছে। ছোটবাবু এমন একটা নিথর জগৎ আছে, এমন একটা ধীর স্থির সমুদ্র আছে, জানত না। পাইলট সিপটাই ছিল ডাঙ্গার শেষ সূত্র। সেও ক্রমে দূরে দূরে সরে একসময় সমুদ্রের ঢেউয়ের ভেতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

ছোটবাবু ডেকের ওপরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারছে না আর। জাহাজ এগিয়ে যাচ্ছে। দ্রুতগতিতে জাহাজ এগিয়ে যাচ্ছে। জাহাজ হেলছে দুলছে। মাস্তুল, ডেরিক, দড়িদড়া হেলছে দুলছে। এভাবে দাঁড়ালে বেশিক্ষণ সে ডেকে দাঁড়াতে পারবে না। সে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়িয়েছিল, তারপর সামনে পেছনে বেশ ঝুঁকে ঝুঁকে তাল রেখে হেঁটে গেল। টুইন-ডেক পার হয়ে দ্রুত ছুটে গেল সামনে। জাহাজের আগিলে সে উঠে দাঁড়াল। শেষবারের মতো বোধহয় পাইলট সিপটাকে সে দেখতে চায়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে না। সে ফিরে আসছে। জাহাজের পিচিঙ আরম্ভ হয়ে গেল বলে মাথা পেট গোলাচ্ছে। অথচ তার কাজ ফাইবারের সঙ্গে। তাকে এ-জাহাজে এভাবে এ-সফরে কাজ করে যেতে হবে। সে আর থামতে পারে না। ফিরে যেতে পারে না।

সে ফিরে আসার মুখেই দেখল জ্যাক মাংস কেটে পাখিদের খাওয়াচ্ছে। জ্যাক লম্বা বয়লার স্যুট পরেছে। পায়ে কেডস জুতো। ছোটবাবু সন্তর্পণে পালাচ্ছে। পালাবার সময়ই মনে হল কেউ সহসা ডাকছে—হেই। সে পড়ে যেতে যেতে কোনরকমে উঠে দাঁড়াল। দেখল, আড়চোখে তাকে দেখছে জ্যাক। সে এবার প্রায় ছুটে পালাল। জাহাজে পিচিঙ, এভাবে ছুটলে সে পড়ে যেতে পারে তার তাও মনে থাকল না।

॥ তিন ॥

বারোটা-চারটার ওয়াচ শেষে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠে এল মৈত্র। জাহাজের পিচিঙ ক্রমে বাড়ছে। সমুদ্রে বেশ বাতাস আছে। তবু আকাশ পরিষ্কার থাকলে তেমন ভয় থাকে না। ভয় অমিয় এবং ছোটবাবুকে নিয়ে। এরা দুজনই নতুন। এদের দুজনেরই প্রথম সফর। ছোটবাবু হয়ত পিচিঙ কোন রকমে সামলাবে। কারণ তাকে বাঙ্কারে কাজ করতে হচ্ছে না। কিন্তু অমিয় এ-ওয়াচেই যা দেখাল। সুট খালি পড়ে আছে। বাংকারে সে দাঁড়াতে পারছে না। র‍্যাগ দিয়ে আগুন ফার্নেস থেকে টেনে নামানোর সময় অমিয় জল জল করছিল। একসঙ্গে তিনজন ফায়ারম্যানের আগুন টানার ভিতর বেচারা নিঃশ্বাস পর্যন্ত নিতে পারছিল না। ছাই উড়ছে। আগুনের গনগনে উত্তাপ, আর আগুনের ওপর জল ঢেলে দিলে প্রচণ্ড গ্যাস। সে গ্যাসের ভিতর নতুন জাহাজির সাধ্য কি দাঁড়ায়। তার ওপর ইণ্ডিয়ান কোল। একেবারে অসার।

ওপরে এসেই মৈত্র টের পেল অমিয়র কাজ শেষ হয়নি। অমিয়র স্বভাব আগে উঠে ফানেলের গোড়ায় বসে থাকা। কিন্তু সে নেই। আকাশ বেশ মেঘলা। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হচ্ছে। এ-সব লক্ষণ ভাল না। ঝড় অথবা সাইক্লোনের লক্ষণ। এমনিতেই রক্ষা নেই, ঝড়ের ভিতর যে অমিয়টা কি করবে! পাশের বাংকারের কোলবয়, বয়সী মানুষ। তার এই নিয়ে এগারো-সফর। সে সব কায়দা-কানুন জানে। সে জানে ওয়াচের পরও কাজ করতে হবে। অন্ততঃ এক ঘণ্টা এক নাগাড়ে ওয়াচের পর কাজ না করলে সুট ভরতে পারবে না। অথবা সে এমন ভাবে এক নাগাড়ে কাজ করে যায়, কোন তাড়াহুড়ো নেই আবার আস্তেও নয়, সে বেশ সোজা সরলভাবে কাজটাকে নিয়ে ফেলেছে। বয়স হলেও মানুষটা কয়লা টানার কষ্ট গ্রাহ্যের ভেতর আনে না। সফরের অভিজ্ঞতায় সে সি-সিকনেস হজম করে ফেলেছে।

মৈত্র, বড়-টিণ্ডাল বলে ওয়াচের দায়-দায়িত্ব তার। স্টিম ঠিক রাখার দায়-দায়িত্ব থেকে সব কিছু। সুট ভর্তি না পেলে পরের ওয়াচের ছোট-টিণ্ডাল অমিয়কে বেগার খাটিয়ে মারবে। ছোট-টিণ্ডালের দলটা নিচে নেমে গেছে। নেমে এখন আগুন টানছে ফার্নেস থেকে। ফার্ণেসের ছাই ঝেড়ে ভেতরে কয়লা হাকড়াবে। এর ভেতর অমিয় সুট ভরে না দিতে পারলে রক্ষে নেই। মৈত্র তাড়াতাড়ি ফের নেমে গেল। ভেতরে একটা লম্ফ জ্বলছে। লম্ফটা আবছা মতো দেখা যাচ্ছে। কয়লার গুঁড়ো উড়ে চার পাশটা ভীষণ অন্ধকার। প্রথমে ঢুকে সে কিছু দেখতে পেল না। তারপর চোখ সয়ে এলে দেখল, কয়লা সুট থেকে বেশি দূরেও না। সুটে কয়লা এনে ফেলছে অমিয় আর মনে হচ্ছে সব কয়লা গড়গড় করে নিচে নেমে যাচ্ছে। সে আপন মনে দুটো একটা খিস্তি করছে। দুটো-একটা অশালিন চিৎকার এবং চোখ লাল, ঘামে ওর জামা-প্যান্ট জবজবে। টুপি ভিজে গেছে। চোখ আগুনের মতো লাল। সে টলছে। ঠিকমতো দাঁড়াতে পারছে না। বোধ হয় দু-একবার হড়-হড় করে জল খেয়ে বমিও করেছে।

মৈত্র তাড়াতাড়ি নিজেই গাড়িটা টেনে পর পর ক'গাড়ি খুব দ্রুত কয়লা ভরে ফেলে দিল। অমিয়কে বলল, তুই বোস। এভাবে সুট ভরে না। এতক্ষণ কি করছিলি!

ইচ্ছা হল অমিয়র, বেলচে দিয়ে ঠাস করে মৈত্রের মাথায় একটা বাড়ি মারে। সে এতক্ষণ বসেছিল বুঝি মৈত্র মনে করছে। সে বলল, টিণ্ডাল, তোমাকে কে আসতে বলেছে! যাও শালা। ভাগো। আর্মার কাজ আমি যেভাবে পারি করব। কাউকে ডাকি নি তো। শালা নবাবী দেখাতে এয়েছে।

এসব কাজে মাথা গরম হয়। মৈত্র অনেক সফরে এমন সব দেখেছে। সেজন্য সে কিছু বলল না। কেবল যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কয়লা ভরে যেতে থাকল। বলল, হাত লাগা আমার সঙ্গে। দাঁড়িয়ে থাকিস না।

এবং এক সময় সুট ভরে গেলে ওরা ওপরে উঠে দেখল, বৃষ্টিতে ডেক ভিজে গেছে। ছোটবাবু কি করছে কে জানে! সে দুদিন থেকে দেওয়ানিতে ভুগছে। কিছু খেতে পারছে না। সব ওক দিয়ে ফেলে দিচ্ছে। এখন তো আরও বেশি হবার কথা। ছোটবাবু পিচিঙের জন্য

ভাল করে রাতে ঘুমোতে পারছে না। হয়ত গিয়ে দেখবে, সে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছে বাংকে। চোখে ঘুম নেই। তবু চোখ বুজে আছে। এভাবে নতুন জাহাজিদের হ্যাপা সামলাতে সামলাতে ওর সফর শেষ হয়ে যায়। কোম্পানিগুলো এসব অজুহাত দেখিয়ে, নানাভাবে এই সব নতুন জাহাজিদের নিতে চায় না। মৈত্র বোঝে এতে তার দেশের সুনাম নষ্ট। কোম্পানিগুলি এভাবে দুর্নাম ছড়িয়ে ক্রমে এ-বন্দর থেকে ক্রু নেওয়া কমিয়ে দিচ্ছে। ওরা বেশী করে এখন চালনা অথবা চাটগাঁ থেকে ক্রু তুলে নিচ্ছে। এ- সব কারণে সে অমিয়র হ্যাপা সামলাচ্ছে এখন। এবং এভাবে কিছুদিন চালিয়ে যেতে পারলেই অমিয় ঠিকঠাক একদিন সব নিজেই চালিয়ে নিতে পারবে।

চারপাশটা অন্ধকার। সমুদ্রে কোনো রঙ ফুটে উঠছে না। সকাল হতে এখনও অনেক দেরি। অবশ্য সে এ-সময়টা জামা কাপড় ছেড়ে হাত পা ধুয়ে শুয়ে পড়ে না। সে নিজেই চা করে নেয়। অমি ও ছোটবাবুকে দেয়। তারপর সকাল হলে যখন ডেক জাহাজিরা কাজে বের হয়ে যায় তখন সে গড়িয়ে নেয়! ছোটবাবু চা খেয়েই যা সামান্য কিছু আরাম পায়।

নুন জল মাঝে মাঝে মৈত্র খেতে দিচ্ছে ছোটবাবুকে। এতে দেওয়ানি কমে শরীরের। মাথা তেমন ঘোরে না। সব স্বাভাবিক হয়ে আসে। সে ডেক ধরে হাঁটতে হাঁটতে বুঝতে পারল, দেওয়ানি তাকেও বেশ কাহিল করেছে। প্রথম প্রথম সবাই কিছু-না-কিছু কাহিল হয়ে যায়। কিন্তু ছোটবাবুর দিকে তাকানো যাচ্ছে না। দু-তিন দিনেই চোখ কোথায় ঢুকে গেছে। সুন্দর সুশ্রী মুখ চুপসে গেছে। আর মনে হয় কি যেন একটা ভয় সবসময় ছোটবাবুর। ছোটবাবু কিছু বলছেও না। ঝড়ের সময়ই সব চেয়ে বেশি আশঙ্কা। মৈত্র কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

মাঝে মাঝে মৈত্র ভীষণ রেগে যায়। কেন আসা জাহাজে! কে দিব্যি দিয়েছে। তারপরই মনে হয় কেউ দিব্যি দেয় না। কিনারায় কাজের কোন সুরাহা না হলে এই সব বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা জাহাজে চলে আসে। সবারই ভেতর একটা ইতিহাস থাকে। দুঃখের ইতিহাস। কেউ সখ করে জাহাজে মরতে আসে না। তখন তার ভীষণ মায়া হয় সবার জন্য।

সে গ্যালি পার হয়ে সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে গেল। খুব আস্তে আস্তে নামতে হয়। কেউ যেন পায়ের শব্দে জেগে না যায়। সারা সময় স্টিয়ারিং এনজিনের একটানা ক্যাচ ক্যাচ শব্দ। প্রথম প্রথম এ-জন্যও ছোটবাবুর ঘুম আসত না। সম্পূর্ণ একটা আলাদা জীবনে এই ছোটবাবু কেমন হয়ে গেছে।

অমিয় কোন রকমে জামা-কাপড় ছেড়ে বাংকে গা এলিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু মৈত্র কিছুতেই ওকে বাংকে বসতে দিল না। একজন স্বাভাবিক জাহাজির মতো অমিয় থাকুক সে চায়। সে বলল, এই ওঠো। স্নান না করে এলে তোমাকে শুতে দেওয়া হবে না। এমন কিছু হয় নি, স্নান না সেরে তুমি বাংকে শুয়ে পড়বে। যাও। ওঠো। সে এই সব কথাগুলো খুবই আস্তে আস্তে বলছিল। যদি ছোটবাবুর চোখে সামান্য ঘুম লেগে থাকে। সে এমনকি আলো জ্বালল না। পোর্ট-হোলের কাঁচটা কে বন্ধ করে রেখেছিল। গুমোট ভাব। পাইপ থেকে ঠিকমতো হাওয়া বের হচ্ছে না। মৈত্র ছোটবাবুর পাইপের মুখ ধীরে ধীরে ঘুরিয়ে দিল। বেশী হাওয়া লাগলে ছোটবাবুর ঘুম ভাল হবে। কিন্তু কি আশ্চর্য ছোটবাবু চোখ বুজেই বলছে, মৈত্রদা, আমি যে দাঁড়াতে পর্যন্ত পারছি না। মাথা ঘুরে পড়ে যাচ্ছি।

মৈত্র কেমন ক্ষেপে গেল, না দাঁড়াতে পারলে আমি কি করব!

—আমাকে বাথরুমে যেতে হবে। কতবার চেষ্টা করেছি। তুমি একটু ধরবে?

মৈত্র হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, ওঠ, ওঠ। কে বলছে দাঁড়াতে পারছিস না। যত সব বাজে কথা।

—না, সত্যি মৈত্রদা দাঁড়াতে পারছি না। সকাল হয়ে যাচ্ছে ভয়ে আর ঘুম আসছে না। সারেঙের টান্টু শব্দ কেবল শুনতে পাচ্ছি।

—ওঠ ওঠ বলছি। সে ঠেলে তুলে দিল। সে প্রায় যেন লাথি মারার মতো ঘাড় ঠেলে বের

করে দিল ছোটবাবুকে।

—যা যা বলছি। পেচ্ছাপ করে আয়।

শরীর টলছে বলে সে একটু গিয়েই বালকেড ধরে দাঁড়িয়ে থাকল

এবার মৈত্র খিস্তি করে বলল, কেন যে মরতে আসা। কেউ নেই তোমার জাহাজে। যাও ছোটবাবু। না গেলে সমুদ্রে হারিয়া করে দেব। তবু সুনাম নষ্ট হতে দেব না আমাদের।

অমিয় ভয়ে ভয়ে আগেই উঠে গেছে। সে স্নান করেছে। স্নান করায় শরীরটা ভীষণ হাল্কা লাগছে। সে এখন আর ক্লান্তি বোধ করছে না। ছোটবাবুর জন্য মৈত্র এখনও চেঁচাচ্ছে। এবং সবাই জেগে গেছে। সবাই ফোকসাল ছেড়ে চলে এসেছে। সারেঙ বলছে, মৈত্রমশায়, আপনি ওর পেছনে কেন লেগেছেন?

—কি বলছে শুনুন। এই যা বলছি। পেট খালি করে আয়। চা করে দিচ্ছি। তারপর ঘুমোবার চেষ্টা কর।

সবাই যে যার ফোকসালে চলে গেল। নতুন জাহাজিদের নিয়ে এমন সব কত ঘটনা এই জাহাজের ইতিহাসে ছড়িয়ে আছে। রেড-সিতে একবার একজন নতুন জাহাজি স্টোকহোলডের গরম সহ্য করতে না পেরে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। অথবা একবার এক জাহাজির সি-সিকনেস এমন হল, সে স্কাই-হোলের ভেতর দিয়ে এনজিনে ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। কেউ কেউ তো পাগল হয়ে যায়। এ-সব ব্যাপারে কারো কিছু বলার থাকে না।

সারেঙ শুধু বললেন, ছেলে সাহস করে এয়েছিস যখন, সাহস করে একবার উঠে যা। দ্যাখ না কি হয়।

এ-সবে ছোটবাবু ভীষণ লজ্জিত এবং অপমানিত। সে মুখ তুলে তাকাতে পারছে না পর্যন্ত। জাহাজে যখন সবাই নির্বিঘ্নে ঘুমোচ্ছে, খাচ্ছে দাচ্ছে, সে মনে মনে বলল, 'মাগো আমি ঠিক পারব। দ্যাখো পারব। ওরা আমাকে সময় দিচ্ছে না। সে আর দাঁড়াল না। সে উঠতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। মৈত্র ধরতে গেলে বলল, ধরবে না মৈত্রদা। আমি দেখছি পারি কিনা। ভদ্রা জাহাজের সেকেণ্ড অফিসার, চ্যাটার্জির শেষদিনের বক্তৃতার সময়ের মুখ ভেসে উঠল চোখে। তিনি যেন বলছেন, আমার জাহাজি বন্ধুরা, আজ তোমাদের যাবার দিন। জাতীয় সঙ্গীত গাইবার পরই বিউগিল বেজে উঠেছিল। ডাইনিং হলে সব মাসতার দিলে তিনি বক্তৃতার মতো করে বলে যাচ্ছিলেন। বলতে বলতে ওঁর গলা ধরে এসেছিল। তিনি বলেছিলেন, জাহাজি বন্ধুরা, আমি তোমাদের নানাভাবে টরচার করেছি। তোমাদের সহ্যসীমা কতদূর দেখেছি। আমার বিশ্বাস তোমরা পারবে। এর চেয়েও অনেক অনেক কষ্ট তোমাদের জন্য জাহাজে অপেক্ষা করছে। হলিস্টোনে তোমাদের হাতের রক্তপাত আমাকেও ভীষণ ভাবে টরচার করত। সিনিয়ার রেটিঙসদের র‍্যাগিংয়ের কথাও তোমাদের মনে থাকবে। সবই জাহাজে একজন ভালো জাহাজি হবার জন্য! আমার বিশ্বাস যাবার দিনে নিশ্চয়ই আমাকে ক্ষমা করতে পারবে। এখন না পারলেও জাহাজে গেলে ঠিক পারবে। আমার তখন দুঃখ থাকবে না।

আরও অনেক কথা। সব মনে পড়ছে না। এখন সব মনে পড়ার কথাও নয়। তবু সব কথার ভেতর এমনই বুঝি যন্ত্রণা ছিল তাঁর। ছোটবাবু সিঁড়ির রেলিং ধরে কোনরকমে এবার উঠে দাঁড়াল। সহজভাবে দাঁড়াতে চাইল। মাথা ঘুরছে। কিছু দেখতে পাচ্ছে না। তবু অন্ধের মতো ওপরে উঠে প্যান্ট খুলে সামনেই পেচ্ছাপ করে দিল। নেমে যাবার ক্ষমতা ক্রমে এভাবে হারিয়ে ফেললে কি যে হবে! অহঙ্কার শরীরে ফুলে ফুলে উঠছে। সে বলল, স্যার আপনি এত বড় জানতাম না। আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার। আমি যে কিছুতেই পারছি না। আমাকে তো সবাই নানাভাবে সাহায্য করে যাচ্ছে। আমাকে এখনও বাংকারে পাঠায় নি। জানি না পাঠালে আমার কি হবে!

সে প্রায় চোখ বুজেই হাত ধরে ধরে নেমে এল। সমুদ্র থেকে প্রচণ্ড বাতাস উঠে আসছে। সমুদ্রে ঢেউ প্রবল। ঢেউ-এর জলকণা শরীরে এসে লাগছে। সে বুঝতে পারল, এখন মে-জুনের সময়। এখন এ-সমুদ্রে ঝড়-ঝন্ঝা লেগে থাকারই কথা। এ ক'দিন ঝড়-বৃষ্টি হয় নি সে কপাল ভাল বলে। নিচে নেমে গেলে মৈত্র সোজা দাঁড় করিয়ে রাখল ওকে কিছুক্ষণ। এখন শোবি না। আর যখন ঘুম আসবে না বসে থাক। চা করে আনছি।

ছোটবাবু বলল, এত সকালে কিছু খাব না। খেলে আবার ফোকসাল পরিষ্কার করতে হবে।

—সে দেখা যাবে। আমি না পারি টোপাস করে যাবে। টোপাস আছে কি করতে!

—বেশ ভাল বলছ। বমি করে ভাসাই, আর ওরা ঐ কেবল করুক!

—বাছা তোমার গলা থেকে তো এখনও রক্ত উগলে ওঠেনি। এতেই টোপাসের জন্য তোমার এত ভাবনা।

ছোটবাবুর কাছে এর চেয়ে কষ্টের কি আছে জানা নেই। তবু সে চায় না এ-সব কথা আবার দু কান হোক। সে বলল, মৈত্রদা তুমি চেঁচামেচি না করলেই পারতে। বাড়িয়ালা শুনলে কি বলবে! কি ভাববে!

—কিছু ভাববে না। জাহাজে সবারই প্রথম প্রথম এমন হয়। আমারও হয়েছে। সারেঙেরও হয়েছে। তবে ভেঙ্গে পড়বি না। মনে জোর রাখ। কাজ করতে এয়েছিস। বসে থাকতে তো আসিস নি। এখন না হয় মোটর ভেসেল, অয়েল এনজিন এসব হয়েছে, আগে তো এ-সব ছিল না। তোর মতো মানুষেরাই কোম্পানীর আমলে জাহাজ চালিয়ে নিয়ে গেছে। জাহাজ সমুদ্রে থেমে থাকে নি। সে লকার থেকে চা, চিনি কনডেন্সড মিল্কের টিন বের করে তরতর করে ওপরে উঠে গেল। জলটা গ্যালিতে বসিয়ে স্নান করে নেবে বাথরুমে। জল গরম হতে হতে ওর স্নান হয়ে যাবে। নানাভাবে অমিয় এবং মৈত্রদা ওকে সাহস দিয়ে যাচ্ছে। শেষের কথাগুলো মৈত্রদার ভারী মজার। যেন এতক্ষণ যে চেঁচামেচি করেছে তার জন্য লজ্জিত। এখন কি করে যে এদের একটু তোয়াজ করবে ভেবে পাচ্ছে না। ছোটবাবু মনে মনে হাসছিল।

আসলে জাহাজে এভাবেই আত্মীয়তা গড়ে ওঠে। এভাবেই আবার বিদ্রোহ গড়ে ওঠে। এভাবেই জাহাজিরা কখনও কখনও আবার প্রতিপক্ষ হয়ে যায় যেমন কাপ্তানের ছেলেটা জাহাজে উঠেই ওর সঙ্গে কেমন শত্রুতা আরম্ভ করে দিয়েছে। সে তো কখনও তাকায় না। কিন্তু কি যে ভয়, সে না তাকিয়ে পারে না। তাকালেই দেখতে পায় বড় বড় চোখে ওকে দেখছে। সে তখন ভেবে পায় না এমন করে তাকাচ্ছে কেন। ভয়ে বুক গলা শুকিয়ে যায়। দুটো চোখ এভাবে ওকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। তাকে বুঝি লক্ষ্য রেখে যাচ্ছে। সে ঠিকমতো কাজ করতে পারে কিনা, না সে কাজে ফাঁকি দেয়। সে এ জাহাজে একজন অক্ষম মানুষ এসব খবর পৌঁছে দেওয়া ওর স্বভাব হতে পারে।

এভাবে সকাল হয়ে যায়। সে চা খেয়ে আজ বমি করে নি। শরীরটা হাল্কা লাগছে। সে আরও কিছুক্ষণ শুয়ে থাকল। পোর্ট-হোলের কাঁচটা বন্ধ ছিল, সেটা আবার খুলে দিয়েছে। পিচিঙ বাড়ছে বলে, জল পোর্ট-হোল দিয়ে মেঝেতে এসে পড়ছে। সে এবার নিজেই উঠে বসল, এবং বালকেডে একটা পা রেখে কাঁচটা বন্ধ করে দিল। ঢেউয়ের ঝাপটায় সব ভিজে যাচ্ছিল।

সবাই ক্রমে সকাল হলে উঠে পড়ছে। সকালের দিকে সূর্যের লাল আলো এসে ফোকসালে পড়ছে। ওর ইচ্ছা হচ্ছিল, ওপরে উঠে বসে থাকে। কিন্তু, ওপরে বসতে পারবে না। কারণ জাহাজ সামনে পেছনে দুলছে। এখন সোজা হাঁটা যাচ্ছে না। পেছনে সামনে-ঝুঁকে হাঁটতে হচ্ছে। সারেঙ টাটু না বললে সে উঠছে না। যতক্ষণ পারে সে এভাবে শুয়ে থাকবে।

এবং কাজের সময়ে সে ফাইবারের সঙ্গে কথায় কথায় হাসতে পারল না। অতিকায় সব ঢেউ চারপাশে। আকাশ আবার মেঘলা। বৃষ্টি হচ্ছে না। অথচ কি ভীষণ জোরে হাওয়া দিচ্ছে।

মাঝে মাঝে ডেকের ওপর সমুদ্রের জল। উইনচের নীচে ছোটবাবু কাজ করছিল—ওর প্যান্ট-জামা জলের ঝাপটায় ভিজে যাচ্ছে। সারসপাখিগুলো জলের ঝাপটায় কোঁ কোঁ করে উঠছে। এখন আসছে আবার সেই ছেলেটা। ফাইবার বুঝতে পারছিল, ছোটবাবুকে সি-সিকনেসে খুব কাবু করেছে। ওকে আজ সে খাটাচ্ছে না। সে নিজেই কাজ করছে। ছোটবাবু পাশে বসে কেবল নাটবোল্ট, তেল এসব এগিয়ে দিচ্ছে। কখনও কখনও বা দু'পা ছড়িয়ে বসে থাকছে ডেকে। দূরের দিগন্তরেখায় সমুদ্রের অজস্র ঢেউ, ওপরে সমুদ্রপাখিদের বিচরণ, কখনও বা একঘেয়ে নিরিবিলি অশান্ত সমুদ্রের ভেতর থেকে জাহাজে এনজিনের শব্দ—আমি যাচ্ছি, যাচ্ছি, আমি যাচ্ছি, যাচ্ছি। এভাবে একটানা শব্দ করে চলেছে এনজিনটা। আর মাস্তুলে ডেক-জাহাজি ইমরান উঠে গেছে। ফলঞ্চা বাঁধতে সে ওপরে উঠে গেছে। এ ঝড়ের দরিয়ায় মাস্তুলে রঙ হবে ভাবতে ছোটবাবুর কেমন গা গুলিয়ে উঠল।

এবং তখনই জ্যাক লাফিয়ে লাফিয়ে বোট-ডেক থেকে নেমে আসছে। সে অবলীলায় এ-ঝড়ের সমুদ্রে কেমন লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। সে বেশ ঝুঁকে ঝুঁকে হেঁটে যাচ্ছে। শরীরে ব্যালেন্স রেখে হেঁটে যাচ্ছে। কখনও লাফিয়ে ডেক পার হচ্ছে। সে পড়ে যাচ্ছে না। উইনচের ফাঁক দিয়ে ছোটবাবু এমন দেখে অবাক। কাপ্তানের ছেলেটা তো তার চেয়েও কমবয়সী। অথচ কি শক্ত সমর্থ। যখন ঢেউ এসে ডেক ভিজিয়ে দিচ্ছে, তখন এ কি খেলা তার! জল থৈ থৈ করছে ডেকে। সে জল নিয়ে খেলা করছে। সে পরেছে গামবুট। সে সারস পাখিগুলোকে ফল্কার কাঠে তুলে দিচ্ছে। সমুদ্রের জল ততটা এখনও উঠতে পারছে না। সে লম্বা একটা দড়ি দিয়ে কাঠের বাক্সগুলোকে মাস্তুলের সঙ্গে বেঁধে ফেলছে। এবং কাজ করে যাচ্ছে ঠিক একজন পাকা নাবিকের মতো। উইনচের ফাঁক দিয়ে এ-সব দেখতে দেখতে ছোটবাবুর মনে হল, জ্যাক কাউকে এরই ভিতর খুঁজছে। সে সঙ্গে সঙ্গে ও-পাশের ওয়ারপিনড্রামের আড়ালে নিজেকে লুকিয়ে ফেলল। না, আর এখান থেকে ওকে জ্যাক দেখতে পাবে না। তখন পঁচিশ টাকার খালাসী উঠে গেছে মাস্তুলের ডগায়। সে দুলে দুলে সার্কাসে ট্র্যাপিজের খেলা দেখানোর মতো রঙ লাগিয়ে যাচ্ছে।

এখন ভাণ্ডারিরা ক্রুদের রসদ নিয়ে ফিরছে। চীফ কুক এপ্রন জড়িয়ে দরজার মুখে এসে দাঁড়াল। কার্পেন্টার লম্বা একটা সুতোয় বাঁধা গেজে জাহাজের সাউণ্ডিং নিচ্ছে। মার্কনি সাব রেলিঙে ভর করে সমুদ্র দেখছেন। মেজ-মালোম ব্রীজে দাঁড়িয়ে আছেন। ওর চোখ লাব্বাস লাইনের দিকে। কোয়ার্টার মাস্টার কম্পাসের কাঁটা মিলিয়ে স্টিয়ারিঙ সোজা করে রেখেছে। জাহাজ যতই কাত হোক, হেলতে- দুলতে থাকুক, সে কখনও কাঁটা থেকে নড়বে না। কাপ্তান তখনও ঘুমোচ্ছেন। কারণ দিনের বেলায় জাহাজের তেমন ভয় থাকে না। রাতটাই সব সময় সমুদ্রে নানাভাবে কষ্টদায়ক। কি যে গভীর অন্ধকার। তবু তিনি শৈশব থেকে এভাবে সমুদ্রে বিচরণ করে কি অন্ধকার, কি আলোতে, সমুদ্রের ক্ষমতা কতটুকু ধরে ফেলেছেন। যেন সমুদ্রেরও একটা খেলা আছে—এইসব অতি ছোট ছোট কাগজের নৌকার মতো জাহাজ এই সেদিন ওর বুকে ভেসে এল। এই সেদিন সমুদ্র দেখেছে, ক্রমে এক-দুই, তারপর শয়ে, হাজারে। কি যে তাদের রূপ! কোনটা সাদা, কোনটা কালো, কোনটা নীল রঙের। নানা রংয়ের বাহার। আর যখন সমুদ্রে সূর্য ওঠে, সূর্য অস্ত যায়, অথবা জ্যোৎস্নার কি যে মায়াবিনী এক খেলা। মাঝে মাঝে ঝড়ের ভিতর এই এক খেলায় অথবা নিচে কত সব প্রবালের দ্বীপ, বরফের পাহাড়, চোরা স্রোতে জাহাজ আটকে যেতে পারে—তবু এক খেলা, অসীমে এলে এই খেলার রহস্য ধরা যায়। কেবল লুকোচুরি খেলা। খেলায় কাপ্তান দেখেছেন, প্রায়ই জিতে গেছেন তিনি। কারণ সমুদ্রেরও বুঝি আছে অসীম ভালবাসা। মানুষের এই সব অতিকায় জাহাজ অতি ছোট কাগজের নৌকার মতো ভেসে বেড়ালে সমুদ্রের ছেলেমানুষী হাতগুলো আকাশের দিকে লাফিয়ে ওঠে। পোষা বেড়ালছানার মতো ধরতে চায়। আর জাহাজগুলোও বেশ জল কেটে ঢেউ কেটে ক্রমে সুদূরে চলে যায়। তখন আকাশের নিচে নীল রঙের ছায়ায় আশ্চর্য ছবি। কাপ্তানের ভারি মজা লাগে দেখতে। সমুদ্রের জন্য তখন মমতা তার বাড়ে। তিনি হোমে ফিরে বেশিদিন একা থাকতে পারেন না। সমুদ্র তাঁকে টানে।

ছোট-টিণ্ডালের আজ ভারি খারাপ অবস্থা। টিণ্ডাল দেখছিল, ঝড়ে পড়ে বয়লারগুলো ভীষণ মারমুখো হয়ে উঠছে। স্টিম কিছুতেই রাখা যাচ্ছে না। মাঝে মাঝে তিন নম্বর মিস্ত্রি ছুটে স্টোক হোলডে চলে আসছে। এনজিনের শব্দে কিছু শোনা যায় না বলে, দু'হাত ওপরে তুলে চিৎকার করছে স্টিম স্টিম; আর তখন স্টোক-হোলডে, তিনজন ফায়ারম্যান, দুজন কোলবয়ের মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে। ফার্নেস ডোর খুলে অনবরত কয়লা হাকড়াতে হচ্ছে। মুখে আগুনের আভা, দাঁড়ানো যাচ্ছে না। গতকালের চেয়ে পিচিঙ আরও বেড়েছে। সমুদ্রের অবস্থা ক্রমে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে। ডেকে হিবিঙলাইন বেঁধে দেওয়া হয়েছে। কেউ যেন এখন আর বোট-ডেক ধরে উঠে না যায়। দিনের বেলাতে গেলেও রাতের বেলাতে কেউ যেন না যায়। নিচে টানেল-পথ খুলে দেওয়া হয়েছে—সেখান থেকে একটা সোজা সিঁড়ি প্রপেলার স্যাফটের গোড়া দিয়ে ওপরে উঠে গেছে। এনজিন-জাহাজিরা যেন সেখান দিয়ে যাওয়া-আসা করে—সারেঙ এই বলে সবাইকে সাবধান করে দিয়েছেন।

এখন টিণ্ডালের মুখেও ভীষণ দুশ্চিন্তার ছাপ। প্রত্যেকটা ফার্নেস ডোরে উঁকি দিয়ে দেখছে। এয়ার- বালব সব খুলে দিয়েছে। স্লাইস মেরে ফার্ণেসের ভিতর সব আগুন ঘেঁটে দিচ্ছে। ছাই ঝেড়ে দিচ্ছে। কয়লা ফায়ারম্যানদের অনবরত হাঁকড়াতে বলছে। সে হাত তুলে যাচ্ছে আর বলছে, জলদি জলদি, কয়লা হাঁকড়া। ফার্নেস জ্বালিয়ে দে। সব পুড়িয়ে দে। কসবীর কলজে উপড়ে আন। বলেই সে কখনও মনে ঐশীশক্তি পাবার লোভে, দু'হাত ওপরে তুলে চিৎকার করে ওঠে, আল্লা হু আকবর। অর্থাৎ যারা স্টোক-হোলডে আছে তাদের প্রত্যেকে তখন এই এক ধ্বনি মিলে একসঙ্গে যুস পেয়ে যায়। কেউ তখন ফার্নেস ডোর খুলে কয়লা হাঁকড়াচ্ছে, কেউ তখন ভীষণভাবে আগুনের জ্বলন্ত কঠিন চাঙগুলি ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিচ্ছে। কেউ তখন শ্বাস ফেলতে না পেরে উইণ্ডসেলের নিচে এসে দাঁড়িয়েছে। শাঁ-শাঁ করে জল নেমে আসছে ফানেলের গোড়া দিয়ে।

এভাবে টিণ্ডাল বুঝতে পারে দরিয়া ক্ষেপে গেছে। দরিয়া ক্ষেপে গেলে মজা পায় বয়লারগুলো। ওদের তখন ভেতরে ভেতরে ফেলা। স্টিম গেজের কাঁটা তখন আর উঠতে চায় না। সব স্টিম হজম করে বসে থাকে। তখন লড়াই মানুষে আর এই বয়লারে। তখন এনজিনিয়ার ছুটে আসে বার বার। এবং যা কিছু গালাগাল আছে সব সে অনায়াসে বলে যেতে পারে। টিণ্ডাল তখন এ-সব গালাগাল শুনতে হবে ভেবে ফের হল্লা এবং ঐশীশক্তির ওপর নির্ভরশীল না হলে উপায় নেই। বিশাল সমুদ্রের বুকে খুবই অসহায় এই মানুষের তৈরী কল—এবং বোধ হয় সেজ-মিস্ত্রির ইতর কথাবার্তা না শোনার জন্যও ফের চিৎকার সকলে মিলে, আল্লা-হু-আকবর। আর সঙ্গে সঙ্গে যেন বেড়াল পালায় জানালা টপকে, সেজ-মিস্ত্রি, সুড়সুড় করে সরে পড়ে। কারণ জানা আছে অনেক ঘটনা এমন। ঝড়ের দরিয়ায় বয়লারের পেটে কত এনজিনিয়ার এভাবে হাপিজ হয়ে গেছে। ধর ধর শালোকে। আন ধরে, ক্ষিপ্ত লাল চোখ, এবং অমানুষের মতো মুখ-চোখ এই সব ফায়ারম্যানদের। তখন না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না, যেন ওরা মানুষ না, আসলে দানব, দানব হয়ে যায়। এবং ফার্নেস ডোর খুলে ঠেলে দেয়, যাও জাহান্নামে। মিস্ত্রি মানুষেরা সেজন্য ঝড়ের দরিয়ায় খুব একটা স্টোক-হোলাডের ভেতর ঢোকে না। গলা বাড়িয়েই যা যা বলার বলে চলে যায়—স্টিম মাংতা।

তখন সমুদ্রের জল স্টোক-হোলডের ভেতর। জাহাজ ভীষণ কাত হয়ে যাচ্ছে। আবার উঠে যাচ্ছে, আবার ডানদিকে হেলে পড়ছে। সমুদ্রের ঢেউ বোট-ডেকে উঠে আসছে। মনে হচ্ছে ঝড় মাস্তুলের দড়িদড়া উড়িয়ে নিচ্ছে। আকাশে নক্ষত্র দেখা যাচ্ছে না। চারপাশে শুধু সমুদ্র, গভীর জল, নীল অন্ধকার আর ট্রেনের চাকায় যেমন শব্দ তেমনি এনজিনে শব্দ হচ্ছে, আর যাচ্ছি না আমি, যেতে পারছি না আমি। এনজিন এবং বয়লার ক্রমাগত যেন এমন বলে চলে যাচ্ছে।

এবং এরই ভিতর সেই অমানুষের মতো দানবের চোখ-মুখ, হিংস্র ভয়াল। দেখলে বোঝাই যায় না, গনি, জব্বার, মান্নান এদের নাম। লম্বা উঁচু চেহারা। মাথায় ফেজ টুপি, কালো রঙ।

বয়লারের ছাই টানায় মুখ সাদা ফ্যাকাশে। ওপরে বাংকারের অন্ধকারে কেউ নেই, শুধু লম্ফ জ্বলছে। নিচে কোলবয় দুজন জল খাচ্ছে। আর যে আগুন নিচে স্টোক-হোলডে টেনে নামানো হয়েছে, তা জ্বল দিয়ে তারা নেভাচ্ছে! ওরা মাত্র দুজন। তিনজন ফায়ারম্যান আয়াসে যা করছে, ওরা জীবন দিয়েও যেন সেটা নেভাতে পারছে না। কি প্রচণ্ড আগুনের তাপ। সারা স্টোক-হোলড লাল এবং মনে হয় আগুনের উত্তাপে সব গলে যাবে। ওরা দুজন, অর্থাৎ দুজন কোলবয় ক্রমান্বয়ে জল মেরে ছাই এস- রিজেকটারে হাপিজ করে যখন উঠে যাচ্ছে তখন ওদের মানুষ বলে চেনা যাচ্ছে না। যেন দুটো পোকা লোহার রেলিং ধরে উঠছে, উঠতে উঠতে একটু দাঁড়িয়ে পড়ছে, জাহাজ কাত হলে ওরা শক্ত হয়ে যাচ্ছে। জাহাজের ওপর দিয়ে জল গড়ালে ওরা রেলিঙের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। তারপর ক্রমে উঠতে উঠতে ওপরের অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে না।

আর ঠিক সাতটার সময় পিছিলে হঠাৎ খবর এসে গেল, একজন পড়েছে।

কে পড়েছে! সবার মুখ অধীর।

পড়েছে। নাম, লতিফ। লতিফ মানে সেই বুড়ো রোগা লোকটা। সারেঙ যাকে ধরে এনেছিল। যে কান্নাকটি করেছে—যাবে না, এমন বলেছে, যে সিপিং অফিসে এ-জাহাজে আসতে হবে ভেবে নদীর পাড়ে একটা গাছের আড়ালে লুকিয়েছিল, যাকে এনজিন সারেঙ প্রায় টানতে টানতে এনে দাঁড় করিয়েছিল।

বড় নিরীহ মুখ। বয়সের ছাপ মুখে ভীষণ। বয়স নলিতে কি আছে ঈশ্বর জানে। কিন্তু মুখ চোখ দেখলেই মনে হয়, ভেতরে ভেতরে সে ভারি অসহায়। কয়লার জাহাজের নাম শুনলেই মুখ ফ্যাকাসে! সে যেতে চায় না। এস. এস. সিউল ব্যাঙ্ক আসছে শুনলে, সে লাথি থেকে বের হয় না। না খেয়ে থাকে, টাকা পয়সা শেষ হয়ে যায় তবু মানুষটা কয়লার জাহাজে যাবে না। সেই মানুষটাই পড়েছে।

কেউ ডেক ধরে যেতে পারছেনা। ঝড় বৃষ্টিতে সমুদ্র আবছা মতো। জাহাজ কাত হয়ে জলের কাছাকাছি যাচ্ছে আবার ভেসে উঠছে। সব পাখিগুলোর খাঁচা বোট-ডেকে তুলে দেওয়া হয়েছে। মোটা দড়ি দড়ায় বাঁধা। একটা খাঁচা এর মধ্যে কখন যে ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেছে কেউ জানে না। উপরে ওঠা যাচ্ছে না। দুজন অতি প্রাচীন নাবিক খুব দরকারি কাজে ডেকের ওপর দিয়ে হিবিং লাইনে ঝুঁকে ঝুঁকে বোট-ডেকে উঠে যাচ্ছে। বেশ একটা খেলার মতো যেন ওরা ব্যালেন্সের খেলা দেখাচ্ছে। সমুদ্রের ঢেউ ওপর দিয়ে ভেসে গেলে ওরা হিবিং লাইন ধরে ডুবে যায় জলে। আবার ভেসে ওঠে।

অর্থাৎ ওরা লম্বা হয়ে যায়। প্যারালাল বারে খেলা দেখাবার মতো। খুব অনায়াসে ওরা ঢেউ মাথার ওপর দিয়ে বের করে দিতে পারে। তারপর জলে ডুব দিয়ে ওঠার মতো অবস্থা। নোনাজলে শরীর তখন জবজবে ভেজা। এমন যখন জাহাজের অবস্থা তখন ছোটবাবু দেখল, কেউ নড়ছে না। গল্প গুজব করছে সবাই।

ছোটবাবুর এখন ডেকে কাজ। সে আজ চপাটি কিছুটা খেতে পেরেছে। সে খুব দুর্বল ভেতর থেকে। তবু সে শক্তভাবে চলাফেরা করার চেষ্টা করছে। যখন মানুষটা বাংকারে পড়েছে তখন নিশ্চয় সবাই সেখানে এখন ছুটে যাবে।

সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামার সময় বুঝল, আসলে সে এখন কিছুই তাড়াতাড়ি করতে পারে না। কিন্তু আশ্চর্য কেউ পিছিলে কোন তাড়াহুড়ো করছে না, কেমন যেন এটা জাহাজে সব সময়ই হয় ভাব। কেউ বলছে, কে পড়ল রে! ট্যারা লতিফ না বুড়া লতিফ।

জাহাজে দুজন জাহাজি, লতিফ নামে। একজন ফায়ারম্যান। অন্যজন কোলবয়।

—বুড়া লতিফ।

—বুড়া মানুষের হাড় শক্ত। এটা কি কামের কথা। বুড়া জানে জাহাজ চলে ভাল!

আরও সব রসিকতা, কেউ বড় একটা লতিফকে নিয়ে ভাবছে না। মৈত্র এখন ঘুমোচ্ছে অমিয় ঘুমোচ্ছে। ওদের শরীর একবার ডাইনে আবার বাঁয়ে হেলে যাচ্ছে। তবু ওরা নির্বিঘ্নে ঘুমোচ্ছে। ওপরে ছাদের গ্যালিতে থালাবাসন পড়ার শব্দ। এবং ঝড় ঝঞ্ঝা হলে যা হয়, একটা চাপা গোঁ গোঁ আওয়াজ আর স্টিয়ারিং এনজিনের কক্ কক্ শব্দ। অতিকায় সব প্যানিয়ানের ভেতর কক্ কক্ আওয়াজ উঠলে ছোটবাবু ঘাবড়ে যায়। এটা যে কি হচ্ছে! বুড়ো লতিফের জন্য কেউ ভাবছে না। এবং যেতে যেতেই সে শুনল কে যেন বলছে, বেটা কুঁড়ের বাদশা। কতদিন থেকে সফর করে। সেই কয়লায়ালা। আর এক ধাপ এগোল না।

যেন এটা ধারণা মানুষের বিশেষ করে এই সব জাহাজিদের, পড়ে যাওয়া মানে দুবলা লোক, দুবলা লোকের জায়গা জাহাজে নয়। সরমের কথা। এবং এদের জন্য মায়া মমতা দেখানো পাপ। যেন এটা ঠিকঠাক থাকে, সমুদ্রে সাইক্লোন টাইফুন অথবা কঠিন হিমবাহের পাশাপাশি জাহাজ চালিয়ে নেওয়া, কখনও কখনও কলকব্জার ভেতরও মারামারি লেগে যায় অথবা যদি ইণ্ডিয়ান কোল থাকে জাহাজে তবে তো একটা কঠিন মারামারি। এসব জয়ের ভেতর জাহাজি জীবনের হামেসা সুখী হওয়ার ব্যাপারটা থেকে যায়। এবং যারা এ-সব পারে না, তারা জাহাজিদের মুখে কালি দেয়। তাদের জন্য মায়া দ্যাখানো ঠিক না।

একবার ইচ্ছা হল মৈত্রদাকে ডেকে তোলে। এখন মৈত্রদাই তার কাছে সব। সুখে-দুঃখে সব পরামর্শ সে দেয়। কিন্তু ওয়াচের পর ঘুম, ঘুম ভাঙ্গানো ঠিক না। এমন একটা যখন কঠিন মারামারি, মার মার কাট কাট বয়লারে, তখন ওদের ঘুমোতে দেওয়াই উচিত। ওপরে উঠতে পারলে ঝড়ের দরিয়াটা একবার দেখা যেত। সে একবার গ্যালির ওপরে উঠেও গিয়েছিল, কিন্তু সেই সমুদ্রের অতিকায় সব ঢেউ পাহাড় প্রমাণ ছুটে আসছে দেখলে কেমন মাথা ঘুরে যায়। এবং সেই চাপা আওয়াজ, লক্ষ লক্ষ দানবের হাহাকারের শব্দ। সে ভয়ে সিঁড়ি ধরে ওপরে না উঠে, নিচে সোজা টানেলপথে নেমে গেল! এবং ক্রমে সিঁড়ি ধরে নেমে যেতে যেতে, অনেক নিচে নেমে যেতে যেতে কিছুটা প্রায় পাতালে নেমে যাবার মতো, সে প্রপেলার স্যাটের পাশ কাটিয়ে নুয়ে নুয়ে এনজিনরুমে ঢুকে গেল। তারপর যেন দেখতে না পায় কেউ, কিছুটা চুপিচুপি সে যাচ্ছে। তার কাজ ফাইবারের সঙ্গে। কিন্তু ডেকের ওপর সমুদ্রের ঢেউ এসে ঝাপটা মারছে বলে হয়তো ফাইবার অন্য কোন কাজটাজ করছে। ফাইবারকে খুঁজতে স্টোক-হোলডে ঢুকে গেল। এখানে কাজকর্ম ঠিক চলছে। সে ছোট-টিণ্ডালকে দেখতে পেল না। আর সবাই কাজ করে যাচ্ছে। কে বলবে, এই জাহাজে একজন মানুষ বাংকারে পড়ে আছে। সে আবার সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠতে গিয়ে দেখল, সারেঙ বাংকার থেকে বেরিয়ে আসছেন। সারেঙকে দেখে ছোটবাবু না বলে পারল না, চাচা লতিফ পড়ে গেছে শোনলাম।

—হুঁ!

—পড়ে গেছে কেন?

—তুই নিচে যা। এখন ওদিকে যাস না।

—কেন!

—না। বলছি, যাস না।

—কে আছে ওর পাশে?

—কেউ না।

—আমি একটু দেখে আসছি চাচা।

সহসা সারেঙ ওর হাত ধরে ফেললেন।—যাবে না। যাবে না বলছি। চোখ গরম করে বললেন, নিজের কাজ করগে।

—কিন্তু .....।

—কিন্তু টিন্তু জাহাজে না......।

তবু মানুষের কি হয়ে যায়। সে বলল, না আমি যাব।

সারেঙ বললেন, যাও। গেলে মরবে।

মানুষের এমন হয়, এমন হয়ে থাকে, এটা মানুষের স্বভাব। ছোটবাবু ঠিক বোঝে না জাহাজে এলে মানুষেরা এমন নিষ্ঠুর হয়ে যায় কেন। সে বোঝে না মানুষের তো এটা স্বভাব না, মানুষ তো বিপদে আপদে ছুটে যাবেই। এমনভাবে সবকিছু এড়িয়ে যাওয়া ঠিক না। ভেতর ভেতর তার যে অসহায় ভাবটা ছিল কেন জানি সেটা ক্রমে ক্রমে কমে আসছে। কিন্তু ভেতরে ঢুকেই সে অবাক হয়ে গেল। বড়-মিস্ত্রি, মেজ মালোম অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। বাংকারে ভীষণ অন্ধকার। একটা মাত্র লম্ফ জ্বলছে বলে সে প্রথমে দেখল সাদা পোশাকে কারা ঘোরাফেরা করছে। ভূতের মতো যেন এবং কাছে গেলে সে আর ফিরে আসতে পারল না। দেখল, লতিফ লম্বা হয়ে পড়ে আছে। হাত- পা ছড়ানো। মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে। চোখ কেমন ওপরে উঠে গেছে। এবং মুখের রঙ কয়লার ধুলোতে কালো। পিছনে পাহাড়প্রমাণ কয়লার ঢিবি। ছাদ পর্যন্ত ঠেকে আছে। কয়লার গাড়িটা উল্টে গেছে। সুট থেকে কয়লা হড় হড় করে নেমে যাচ্ছে। এবং কয়লা টেনে ফায়ারম্যানরা সুর্ট একেবারে খালি করে ফেলেছে।

তখনই যেন পেছন থেকে হাঁক। কারণ ছোটবাবু বুঝেছিল ওখানে ওর থাকা ঠিক না। সে পালাবে। কিন্তু তখনই শব্দ—হেই।

সে ফিরে তাকাল। দেখল মেজ-মিস্ত্রি খুব শক্ত চোখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে।

মেজ মিস্ত্রি ফের চিৎকার করে বলছে, গো অন!

সে ঠিক বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে আছে।

এবং বোধ হয় মেজ-মিস্ত্রি জানে এও জাহাজি মানুষ, অক্ষরজ্ঞান নেই মূর্খ এবং কথা বোঝে না। মেজ-মিস্ত্রি নুয়ে বেলচাটা তুলে কয়লার ঢিবির কাছে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর এক দুই করে বেলচায় কিছু কয়লা তুলে দেখাল। এ-কাজটা ছোটবাবুর এখন করা দরকার। না হলে জাহাজ চলবে না। সুট খালি হয়ে গেছে। নিচে যমুনাবাজুর ফায়ারম্যানের কাছে কয়লা নেই।

ছোটবাবুর অন্য কাজের কথা, তবু মেজ-মিস্ত্রি জাহাজে সব। ওদের অন্তত সব। ওর ওপরে ফায়ারম্যান, তার ওপরে গ্রীজার, তারপর টিণ্ডাল, সারেঙ, সারেঙের মা-বাপ জাহাজে মেজ-মিস্ত্রি। ছোটবাবুর কোন কিছু করার নেই। সে হাতে বেলচে নিয়ে প্রায় যেন ভূত দেখার মতো গাড়িটা কয়লার পাহাড়ের কাছে নিয়ে গেল। এবং সে জানে এই জাহাজে সে ঠিক এখন লতিফের মতো। অন্ধকার বাংকারে দিনের পর দিন তার কাজ। সে ঠিক বুঝতে পারল না, সে কি কাজ করছে। সে জানে পিছনে দাঁড়িয়ে আছে মহামহিম মেজ-মিস্ত্রি। প্রায় তার কাছে তিনি সেই প্রাচীনকালের ফারাওদের মতো। অসীম ক্ষমতা। ছোটবাবু গড় গড় করে গাড়িটা ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে, আর ষাঁড়ের খেলার মতো অসীম উৎসাহ মানুষটার, যেন লাল রুমাল উড়িয়ে দেওয়া, সাবাস। জলদি। আরও জলদি। জোরে। দু'হাত ওপরে তুলে হারি আপ। ম্যান, হারি আপ। থামো মাত। চলো জলদি। কাম ঠিক মাংতা। এবং ছোটবাবুর হুঁস ছিল না। সে একটা তাঁতের মাকুর মতো সুটের কাছে গাড়ি ভরে, আসছে যাচ্ছে। অন্ধকারে সে এখন কয়লার গুঁড়োর ভিতর অস্পষ্ট দেখছে সব। কয়লা হড়হড় করে নেমে আসছে নিচে। পায়ের কাছে। গাড়ি ভরে সে হাতল ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ওরা গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং ভেতরে রয়েছে জ্যাক। জ্যাক মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখছে ওকে। কখনও কখনও অপলক। তখন ছোটবাবুর ভেতর কি করে যে ভয়টা কেটে গেছে। সে মানুষের মতো ভাবছে নিজেকে। সে সত্যি ভয় পাচ্ছে না। আর তখনই মনে হল, মেজ-মিস্ত্রি লতিফের মুখের কাছে জুতোর টো নিয়ে আসছে। জুতোর টো দিয়ে দেখছে, মানুষটা কেমন আছে। অর্থাৎ মুখ নেড়ে দিতে যাচ্ছে। এবং তখনই ছোটবাবুর সেই সবদিনের কথা, কেউ যেন হাতি চড়ে যায়, রাজার মতো নিরুদ্দেশে যায় সব মনে পড়ে যায়। এবং বড় এক নদীর কথা মনে পড়ে। নদীর পাড়ে পাড়ে

সেই সব প্রাচুর্যের দিনগুলো মনে পড়লেই ভেতরে সাহস বেড়ে যায়। সম্মানবোধ বেড়ে যায়। মানুষ হিসাবে সে কালো বলে কালো মানুষের ওপর তার প্রীতি বেড়ে যায়। এই যে মেজ-মিস্ত্রি মাঝে মাঝে টো দিয়ে মুখ নেড়ে দিচ্ছে, জ্ঞান ফিরে এসেছে কি না দেখছে এটা সারেঙ. সাব দেখেও কিছু বলতে পারছেন না। তিনি চুপচাপ। এবং দেখছেন, অর্থাৎ যা ভেবেছিলেন, ছোঁড়াটা নিজের দোষে মরল। এবং রাগে তিনি আর ছোটবাবুর দিকে তাকাচ্ছেন না।

সারেঙের মাথায় এখন নানা ভাবনা। কি করে ওটাকে বোট-ডেকে তোলা যাবে। এখানে পড়ে থাকলে চলবে না। ওপরে তুলে নুন জল খাওয়াতে হবে। ভাল করে স্নান করিয়ে দিতে হবে। এবং মাঝে মাঝে সেই জুতোর টো এগিয়ে আসছে। সাহেব-মানুষেরা লতিফকে নিয়ে হাসি-তামাসা করছে। ছোটবাবু দেখছে সব। ভিতরে যে এমন একটা রক্তপ্রবাহ মানুষের মাঝে মাঝে থেকে যায় সে জানে না। মাথাটা কেন যে গরম হয়ে যাচ্ছে। সে কাজে কোন অবহেলা দেখাচ্ছে না। তবু আবার জুতোর টো মেজ-মিস্ত্রি লতিফের মুখের দিকে এগিয়ে আনলে সে গাড়ি উল্টে দিল, বেলচেটা দূরে ফেলে দিল, এবং কাছে এসে খুব আলতোভাবে যেন কত বিনয়ের সঙ্গে সে মেজ-মিস্ত্রির পায়ের কাছ থেকে করুণ ভিক্ষার মতো লতিফের মুখটা সরিয়ে নিল। তারপর চোখ তুলে তাকাল মেজ-মিস্ত্রির দিকে। ছোটবাবু লম্বা মানুষ। সে এই বেঁটে ছোটখাট মানুষটাকে কাঁধে ফেলে নিল এবার।

সারেঙ কেমন ঘাবড়ে গেলেন। লতিফকে এভাবে তোলা যাবে না। তিনি তোলার জন্য দড়িদড়ার ব্যবস্থা করতে গিয়েছিলেন। আর ছোটবাবু ভোররাতের দিকে বমি করেছে। ওপরে উঠতে পারত না। কেমন নির্জীব মানুষ। সে কিনা এখন ঝড়ের সমুদ্রে এমন একটা ভয়াবহ কাজে জড়িয়ে পড়েছে। মেজ-মিস্ত্রি প্রথম ব্যাপারটা বুঝতে পারে নি। সে একটা নেটিভ ইণ্ডিয়ানের কাছে কি আশা করতে পারে, অথচ নেটিভ-ইণ্ডিয়ানটা অনায়াসে বের হয়ে যাচ্ছে টলতে টলতে। পড়ে গেলেই নিচে, স্টোক হোলডে দুটোই গুঁড়ো হয়ে যাবে। কিন্তু এমনভাবে কাঁধের ওপর ফেলে নিয়েছে যে এখন আর কিছু বলাও যায় না। সন্তর্পণে হেঁটে যাচ্ছে। ফানেলের গুঁড়ি ধরে সমুদ্রের ঢেউ, তখন থেকে উঠে আসছে। আর সে উঠে যাচ্ছে। সে উঠে যাচ্ছে লোহার সিঁড়ি ধরে। সে টলছে। সে কাঁপছে। কিন্তু ওর হাত পা ভীষণ শক্ত মজবুত। সে বোট-ডেকে উঠেই আর পারল না। বমির মতো উঠে আসছিল, সে চায় না বমিটা এখানে হোক। সে তাড়াতাড়ি লতিফকে বোট-ডেকে রেখে সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে যেতে থাকল এবং বাংকারে ঢুকে দেখল, কয়লা অনেক নিচে নেমে গেছে। যেন সে সারা মাস বৎসর কাজ করেও এই পাতালে নেমে যাওয়া সুটের ভেতরটা ভরতে পারবে না। বমিটা এবার সজোরে নাকমুখ দিয়ে বের হয়ে এল। এবং তাজা নোনতা স্বাদ। চ্যাট-চ্যাট করছে। কেমন কালো রঙ। অন্ধকার বাংকারে সে বুঝতে পারছে না, আসলে এটা কি। সে বেলচেটা আবার তুলে নিল। মুখটা মুছে ফেলল ভারি তোয়ালে দিয়ে। আসলে ওর মুখ এখন হিজিবিজি নিগ্রো দুঃখী মানুষদের মতো দেখতে হয়ে গেছে। তার যতসব স্বপ্ন, এখন হিজিবিজি খাঁজকাটা একটা মাকড়সার জালের মতো ছিঁড়ে যাচ্ছে। হাত দিলেই ছিঁড়ে যাচ্ছে।

সে জানে সে থেমে গেলেই হেরে যাবে। সে জানে পাশে এক অজগর পাতালের দিকে নেমে গেছে, তার সঙ্গে এক লড়াই তার। না-হলে সেই হাসি ঠাট্টা! মসকরা করবে, সে করুণার পাত্র হয়ে যাবে। সে দাঁড়াতে পারছে না—এমন আর কখনও ভাববে না। সে বেশ আছে, ভালো আছে, মাগো আমি ভাল আছি। টাকা পেলে কিনা জানাবে। কম টাকা, তবু তোমাদের কিছু অন্তত হয়ে যাবে। আমি এখন যাচ্ছি কলম্বো, তারপর আমেরিকা, আমি যে কত বড় হব বলে নিরুদ্দেশে চলে এসেছি। আমার আকাঙ্ক্ষা অনেক, আমি সুন্দর এক পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে বাঁচতে চাই। আমি হেঁটে যাব মা, চারপাশে মানুষেরা বলবে, ঐ যে মানুষটা হেঁটে যাচ্ছে। আমি স্বপ্ন দেখব মা, হ্যাঁ স্বপ্ন, পাশে স্টারবোর্ড-সাইডের বাংকারে এখনও গাড়ির শব্দ পাওয়া যাচ্ছে। মনু কাজ করছে ওখানে। খুব পরিশ্রমী মনু, মৈনুল হক, তা তুমিও তো বেশ কাজ করে যাচ্ছ। আমার এমন ভাবে ওক উঠে আসছে কেন। বার বার। এই নিয়ে সাত বার। তুমি কি এখন একবার এ-বাংকারে আসবে! এসে খোঁজ নেবে আমি পারছি কিনা!

সারেঙসাব বলে গেছেন দেখতে, মাঝে মাঝে দেখতে। তুমি আমাকে দেখবার আগে বলছি, ঠিক সুট ভরে দেব। তোমার আগে ভরে ফেলব।

এ-ভাবে সে ক্রমান্বয়ে একটা মাকুর মতো বাংকারের অন্ধকারে কাজ করতে করতে এক সময় দেখল, কয়লার লুট ভরে গেছে। সে তাড়াতাড়ি গাড়িটা প্রায় ঠেলে ফেলে দিয়ে হাত তুলে হৈ হৈ করে উঠলেই ছুটে এসেছিল মনু। সে দেখতে পেয়েছিল, ছোটবাবু হাত দিয়ে সুটের কয়লা সাজিয়ে দিচ্ছে। সে কেমন একটা গন্ধ পেল বাংকারে। তাজা রক্তের গন্ধ যেন। এমন হয় সে জানে এবং মনু তাড়াতাড়ি ওর কাছে লম্ফ নিয়ে গেল। লম্ফ তুলে দেখল। মুখটা ভীষণ বীভৎস। চোখ লাল। কালো মুখে সাদা দাঁত বের করে হাসছে। হাসিটা ভারি কষ্টের। মনু বলল, তোর বাংকারে বাঁস কেন রে!

—কোথায় বাঁস!

—তাজা খুনের বাঁস।

—যাঃ।

—হ্যাঁ। পাচ্ছি! দ্যাখতো বলে সে লম্ফটা নিয়ে অস্পষ্ট আলোতে খুঁজতে থাকল। তারপর এক জায়গায় এসে থমকে দাঁড়াল। বলল, এখানে তুই বমি করেছিস?

ছোটবাবু বলল, হ্যাঁ।

—এসে দেখ কি করেছিস।

ছোটবাবু বলল, আমি আর উঠতে পারছি না! আমার ওয়াচ শেষ, আমিও শেষ।

তবু মনু ওকে ধরে নিয়ে গেল। ছোটবাবু দেখল, লাল তাজা রক্তে ভেসে গেছে ডেক। সঙ্গে সঙ্গে আবার ওক ওঠে এল ভিতর থেকে। তারপর টলতে টলতে পড়ে গেল নিচে। ছোটবাবু যথার্থই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। সমুদ্রে ঝড়ের ঝাপটা তখন আরওবেগে নামছে। জাহাজ উঠছে নামছে। ফুলছে। ক্ষেপা সমুদ্র। মেঘলা আকাশ। প্রচণ্ড ঝড়ে দানবের মতো নীল রঙের ঢেউ। মাথায় সাদা ফেনা। এ্যালবাট্রস পাখিদের আর্তনাদ কখনও ঢেউয়ের মাথায় —ওরা উড়ে উড়ে ভেসে যাচ্ছে। অস্পষ্ট এক কুয়াশার ছবি যেন চারপাশে।

এবং খবর চারপাশে আবার ছড়িয়ে পড়ল। ছোটবাবু পড়েছে। মৈত্রের এখন ওয়াচ। সে নেমে যাবার মুখে এমন শুনল। মেজ-মিস্ত্রি আবার এসে নেমেছে! তার যা স্বভাব! জ্যাক এসে নেমেছে। সে পাশে দাঁড়িয়ে দেখল ছোটবাবু কাত হয়ে পড়ে আছে। সে পাশে বসবে ভাবল, কিন্তু মনে হচ্ছে সেকেণ্ড পা তুলে আছে। যারা ছোট কাজ করে তাদের মুখ হাত দিলে বড় অপমান। সম্মান থাকে না বুঝি। পা বাড়িয়ে মুখটা একটু নেড়ে চেড়ে দেখা। সত্যি পড়েছে না ভয় পেয়ে এমন করছে। মুখে রক্তের দাগ দেখেও মায়া হয় না। জ্যাক এবার উঠে দাঁড়াল। ঠিক পাশে। এবার পা তুলতে যাচ্ছে আর্চি। আর্চি স্নান সেরে নেমে এসেছে। পায়ে তার বাথরুম স্লিপার। বুড়ো আঙ্গুল বের হয়ে আছে। জ্যাক এখনও শক্ত বুটজুতো পরে আছে। পা-টা উঠে আসছে। ডান পা তুলে আর্চি ছোটবাবুর মুখের দিকে এগিয়ে নিচ্ছে। আর তখন ঠিক পাশে অর্চির বাঁ পা। পায়ের বুড়ো আঙ্গুলের মাথায় জ্যাক তার গোড়ালির সর্বশক্তি দিয়ে চাপ দিতেই চিৎকার করে উঠল আর্চি।—এহো গেলাম! গেলাম!

আর্চির বাঁ পায়ের বুড়ো আঙুলটা ভীষণভাবে থেঁতলে গেছে। না দেখে এমন একটা কাজ করে ফেলেছে জ্যাক। সে চোখ টেনে বলল, সরি মিঃ আর্চি। কোথায় লাগল। উপুড় হয়ে পায়ের কাছে বসতেই দেখল, আর্চি পাটা নিয়ে ঘুরে ঘুরে এক পায়ের ওপরে নাচছে। জ্যাকের ভীষণ হাসি পাচ্ছিল। কিন্তু মৈত্র যখন ছোটবাবুকে কাঁধে ফেলে নিয়ে যাচ্ছিল, তখন ফোঁটা ফোঁটা রক্ত দেখে জ্যাক ঘাবড়ে গেছে। মুখ থেকে ছোটবাবুর ফোঁটা ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। জ্যাক কেবল নিশি পাওয়া মানুষের মতো ছোটবাবুর পেছনে হেঁটে যেতে লাগল। সে হাসতে পারল না, কাঁদতেও পারল না।

॥ চার ॥

সমুদ্র ক্রমে শান্ত হয়ে এল একসময়। বন্দর পেতে বেশি দেরি নেই। জাহাজিদের এ-সফরে প্রথম বন্দর। কাজেই অনেকে, সেই সকাল থেকেই কিনার দেখার চেষ্টা করছে। কিছুই তো দেখা যায় না। কেবল নীল আকাশ, নীল সমুদ্র, আর মাঝে মাঝে সমুদ্রপাখিদের ওড়াউড়ি। রাতের জ্যোৎস্নায়, নীল আকাশ, সবুজ নক্ষত্র এবং সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা বাতাস। একনাগাড়ে বসে থাকলে ডেকে মনে হয় কেমন এক গোলাকৃতি নীল বিরাট একটা টানেলের ভিতর দিয়ে জাহাজটা নিশিদিন ছুটে যাচ্ছে। যেন কোন অতিকায় এক স্পেস রকেট, অথবা আরও কিছু—তখন আর উঠতে ইচ্ছে হয় না। বসে থাকতে ভাল লাগে।

ছোটবাবু এখন ভালোর দিকে। বমি করতে করতে গলা চিরে যায়। এবং গলা চিরে গলগল করে রক্ত উঠে আসে। তারপর নুনজল, এবং নুনজলই জাহাজে একমাত্র ওষুধ, জাহাজে বমি করলে, খেতে না পারলে, মাথা ঘুরলে একমাত্র এই জল। সমুদ্র থেকে বালতি করে জল তুলে খেয়ে ফেলা। তারপর অভ্যাস, অভ্যাসে সব কিছু সহ্য হয়ে যায়, মাথাও ঘোরে না, বমিও হয় না। কেবল তখন মনে হয় এই জাহাজের পিচিং ভারি আরামের। চোখ বুজে আসে। ঘুম চলে আসে। কিনারায় বেশিদিন থাকলে অসুবিধা!

মেজ-মালোম আবার সেই ডেক-চেয়ারে বসে আছেন। চোখে বাইনোকুলার। কিনার কাছে নেই। তবু দেখার স্বভাব। জাহাজ বন্দরের কাছাকাছি এলে তিনি সময় পাবেন না। জাহাজের বাঁধাহাদা আছে। আগিলে, বড়-মালোম, পিছিলে, মেজ মালোম। দু'জন দু'দিকে! আর ডেক-জাহাজিরা আছে। ওরা হারিয়া বললে, দড়িদড়া হারিয়া করে দিচ্ছে, হাপিজ বললে, দড়ি টেনে ধরছে। ওয়ারপিন ড্রামে দড়িদড়া টানাটানি করে বাঁধাছাঁদা হয়ে গেলে ছুটি। মেজ-মালোম তখন আবার ডেক চেয়ারে বসে জুতসই বন্দরের বড় বড় গাছপালার ভেতর কিছু খুঁজে বেড়াবে। কারণ যা খবর, জাহাজ এখানে থামছে না। শুধু রসদ নেবে। রসদ নিতে কত আর সময়। সুতরাং ডেকে বসে থাকলে বাইনোকুলারটা একমাত্র তার সম্বল। জাহাজে সময় কাটানোর পক্ষে সে একটা বেশ কাজ পেয়ে যায় তখন।

তখন নিচে মৈত্র ছোটবাবুর কাছে খবর নিয়ে এল, রাতে জাহাজ বন্দর ধরছে। মৈত্রের বারোটা- চারটা ওয়াচ শেষ। রাতে ওয়াচ নেই। জাহাজ বাঁধাছাঁদা হলে একটা বয়লার শুধু চলে। জাহাজের যে সামান্য কাজ, উইন্‌চ চালানো, জেনারেটর চালানো, এ-সব কাজে একটা বয়লার চালালেই হয়ে যায়। তখন ছুটি ছুটি ভাব। বেশ একটা উত্তেজনা, মৈত্রকে দেখলেই বোঝা যায়। সে শিষ দিয়ে নামছে। অমিয় একটা গান গাইছে। ওর গলা ভাল। বেশ গায়। সে যেন কি একটা আকাশ টাকাশ নিয়ে গান গাইছে! ডেক-সারেঙ, ডেক-জাহাজিরা ছুটি পাচ্ছে না। ওদের কাজ জাহাজের বাঁদাছাঁদা না হলে শেষ হচ্ছে না। তবু জাহাজ বাঁধাছাঁদা হবে ভেবে, বঙ্কু, অনিমেষ, মনু সবাই একবার করে খবর দিয়ে গেছে, সারেঙও এসেছিলেন, ছেলে, জাহাজ বন্দরে ঢুকছে। উপরে উঠে না গেলে দেখবে কি!

মৈত্র স্নান সেরে এসেছে। অমিয় লকার খুলে কি যেন খুঁজছে। বোধহয় খাম পোস্টকার্ড। কিন্তু অমিয় জানে না, দেশের খাম পোস্টকার্ডে চলবে না। মৈত্র একটা চিঠি লিখবে শেফালিকে, যা সময়, একটু সাবধানে না থাকলে চলবে না। মৈত্র বেশ আশায় আশায় আছে। সে জাহাজ বন্দরে ঢুকে গেলেই ঠিক খাম পোস্টকার্ড সংগ্রহ করে ফেলবে। এবং নানাভাবে সে ভেবে রেখেছে—শেফালির জন্য সে কি করতে পারে। বুনোসাইরিসে না যাওয়া পর্যন্ত সে কিছু করতে পারছে না। ওখানে জাহাজ বেশ কিছুদিন নোঙর ফেলে থাকবে। জাহাজ খালি হবে, জাহাজ বোঝাই হবে। বেশ কিছুদিন লেগে যাবে বোঝাই হতে। কোম্পানির ঘরে টাকা জমবে মন্দ না। সে এ বন্দর থেকে ভেবেছে কিছু কাঠের হাতি, ময়ূরের পালখ কিনে নেবে। ওগুলো বেশ দামে বিক্রি করা যাবে। এ ভাবে তার দু'পয়সা হবে। এবং এ-ভাবে সে শেফালিকে বেশ ভালো টাকা পাঠাতে পারবে।

ছোটবাবুর দিকে মৈত্র তাকিয়েছিল। কিছু ভাবছিল। শেফালির কথা। ছোটবাবু বেশ শুয়ে আছে! মুখে একটু সাদাটে ভাব। রক্তপাতে এমনটা হয়েছে। শুয়ে আছে সাদা চাদর গায়ে। সে লম্বা পাতলুন পরেছে আর ডোরাকাটা পাঞ্জাবি। ওর চুল আরও বড় হয়েছে। জাহাজে উঠলে শরীরের রঙ আরও মনোরম হয়। ছোটবাবু এমনিতেই ভীষণ সুন্দর, সুপুরুষ, তার ওপর নোনা জল লেগে এক আশ্চর্য সুষমা মুখে। খুব ভালবাসতে ইচ্ছে হয়। আদর করতে ইচ্ছে হয়। ছোটবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকলে চোখ ফেরানো যায় না।

মৈত্র বলল, ছোটবাবু তোমার কথা জ্যাক বলছিল।

—কি বলছিল! ছোটবাবু কোন রকমে উঠে বসার চেষ্টা করল। মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল।

—তুমি কেমন আছ!

ছোটবাবু বলল, যাঃ।

—সত্যি! বললাম, ভালোর দিকে।

—কেন বললে না, ভালো আছি। আমি আবার দু-একদিনের ভেতর বাংকারে নেমে যেতে পারব।

–এটা তোমার ছোটবাবু বাড়াবাড়ি। তুমি পারবে না। তুমি বড্ড একগুঁয়ে।

—সবাই পারলে আমি পারব না কেন! তাছাড়া সবাই কি ভাববে!

—তুমিও পারবে। পারতে তোমার সময় লাগবে।

—এখন তো আর মাথা ঘোরে না। বেশ সয়ে গেছে সব। খুব খিদেও পায়।

—শরীর ভাল হলে পারবে। তোমাকে আমার ওয়াচে নেব ভাবছি। ফালতু থাকলে, আবার কখন কোন দরিয়ায় কিসে কে পড়বে, তখন হঠাৎ পারবে না। একবার অভ্যাস হয়ে গেলে, দেখবে সব কাজই মানুষ পারে, মানুষ পারে না, পৃথিবীতে এমন কাজ নেই

ছোটবাবু কিছু বলল না। চুপ করে থাকল।

মৈত্র বলল, আচ্ছা ছোটবাবু তুমি এমন চুপচাপ থাক কেন। কথা বল না!

ছোটবাবু বাল্‌কেডে হেলান দিয়ে বসে আছে। সে মৈত্রের দিকে তাকিয়ে না হেসে পারল না। বলল—কথা বলি না কোথায়! বেশ কথা বলি।

—আচ্ছা ছোটবাবু জাহাজে তুমি এমন ভাবে থাকো কেন?

—কি ভাবে।

—এই যে মনে হয় কেউ তোমার যেন নেই।

—না না। তেমন ভাবে থাকি না তো।

—তুমি ভাল ছেলের মতো জাহাজে থাকলে ভীষণ কষ্ট পাবে।

—ভাল ছেলের মতো কোথায় থাকি!

—তুমি ছোটবাবু যাই বল খুব চাপা স্বভাবের। আমরা ফোকসালে কত কথা বলি, তুমি তো তোমার বৌদির সব খবর প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছ।

—তা বলতে পার। এত বেশি শেফালি বৌদির কথা বল, যে মনে হয়, পৃথিবীতে আর কেউ বাস করে না। একমাত্র শেফালি বৌদিই বাস করে।

—তবে! আর তুমি তোমার দেশে কে আছে, কেন এমন একটা কাজে এলে, অমিয় বলল, কলেজের পড়াশোনা পর্যন্ত তোমার আছে, জাহাজের ট্রেনিং-এ সব লুকিয়ে গেছ—এত সব কেন? কিনারায় একটা চাকরি দেখে নিতে পারলে না!

—তুমি তো জানো মৈত্রদা তোমার মতো, তোমার মতো কেন, আমাদের জাহাজে যারা

আছে, একমাত্র ডেক-সারেঙ বাদে সবাই আমরা পাকিস্তানের, আমরা দেশ ছেড়ে চলে এসেছি। আমাদের তো কিছু একটা করে খেতে হবে। নাবিক বলতে আমরা জানি, সবাই সন্দীপ, নোয়াখালি, চিটাগাঙের লোক। এখন দেশ ভাগ হয়ে গেছে। ওরা কতদিন আর আমাদের জাহাজ চালাবে। আমাদের তো সমুদ্র-যাত্রায় বের হতেই হবে।

—এসব বড় বড় কথা। এ-সব কথা তোমাদের ট্রেনিং-এ শেখায়। আসলে এমন একটা অমানুষিক কাজ, একঘেয়েমির কাজ করতে কেউ সখ করে আসে না। নানা কারণে অবশ্য আসে। কিন্তু তোমার মতো মানুষ কেন আসে বুঝি না!

ছোটবাবু ফের হাসল। বলল, মৈত্রদা অভাবে সবাই আসে। আমিও এসেছি। তুমি আমার সম্পর্কে এর চেয়ে বেশি না ভাবলেও চলবে।

বঙ্কু এবং অনিমেষ পাশে বসেছিল। অমিয় 'বিশুর' ভাত ডাল সবজি গরম করে নিচ্ছে। একটু পরেই ওরা মেসরুমে খেতে বসবে। ছোটবাবু সকালে ওপরে উঠে গেছিল। মেসরুমে খেয়েছে। এখনও উঠতে চায়। নিচে বসে থাকতে ভাল লাগছে না। পোর্টহোল দিয়ে আকাশ দেখা যাচ্ছে। এখন ওপরে ওঠে সমুদ্র দেখতে ইচ্ছা হচ্ছে। সমুদ্র ভীষণ শান্ত ঠিক শিশু সরল মানুষের মতো। লতিফ ভাল আছে। সে আবার বাংকারে নেমে যেতে পারছে। ডেকে উঠে যাবার সময় সেও একবার খবর নিয়ে গেল, কেমন আছেন ছোটবাবু।

ছোটবাবু হেসে বলল, ভাল। তুই কোথায় যাচ্ছিস!

—ওপরে। নামাজের সময় পার হইয়া যায়।

এনজিন-সারেঙ এসে বললেন, মৈত্র মশায়, ছোটবাবুকে ওপরে নিয়ে যান। কিনার দেখা যাচ্ছে।

এই কিনার দেখার ব্যাপারটা জাহাজিদের কাছে আশ্চর্য অভিজ্ঞতার মতো। যেন জল শুধু জল, দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল, পৃথিবীর কোথাও ডাঙ্গা আছে ভাবাই যায় না। সমুদ্রে জাহাজ চললে, নিশিদিন জাহাজ চলতে থাকলে ভাবাই যায় না, মানুষেরা ডাঙ্গায় থাকে। কোথাও মানুষ, গাছপালা, পাখি এবং মাটি আছে বিশ্বাসই করা যায় না। কিনারার নামে নতুন ডাঙ্গা দেখার জন্য সবাই পাগলের মতো ওপরে ছুটছে। যে-যার কাজ ফেলে এখন ওপরে উঠে যাচ্ছে। কেউ ফোকসালে নেই। বুড়ো ভাণ্ডারি পর্যন্ত গ্যালিতে হাতা-খুন্তি ফেলে রেলিঙে এসে দাঁড়িয়েছে।

যারা নিচে কাজ করছিল, এনজিনরুমে, তারাও কেউ কেউ যেমন ছোট টিণ্ডাল উঠে এসেছে। কাপ্তান ব্রীজে, রেলিং-এ ভর করে দেখছেন! মেজ-মালোম ডেক-চেয়ারে বসে আছে। ওর চোখে বাইনোকুলার। জ্যাক বোট-ডেক থেকে লোয়ার-ডেকে নেমে এসেছে। জ্যাকের চলাফেরা অদ্ভুত। সে কখনও জাহাজে হাঁটে না। সে লাফিয়ে অথবা দৌড়ে দৌড়ে যায়। এক ফল্কা থেকে আর এক ফল্কায় যেতে সে নিচে নেমে ওপরে উঠে যায় না। সে লাফ মেরে ফল্কাটা ডিঙ্গিয়ে যায়। ছোটবাবু ওপরে উঠেই দেখল, জ্যাক মেজ-মালোমের পাশে বসে রয়েছে। চুপচাপ। চোখে তার বাইনোকুলার। জ্যাকের বড় চুল কেটে ফেলা হয়েছে। জ্যাককে ভীষণ নেড়া নেড়া লাগছে। এত খাটো চুলে জ্যাককে দেখতে ভালো লাগছে না।

তখন যা হয়, চারপাশে সবাই তখন ডাঙ্গা খুঁজে বেড়ায়। ওরাও খুঁজতে গিয়ে দেখল, দিগন্ত রেখায় সমুদ্রের নীল জল পার হয়ে ছায়া ছায়া ভাব, মেঘের মতো এক টুকরো জমির ছবি। কি যে আছে, কিছুই দেখা যাচ্ছে না, তবু সবাই দাঁড়িয়ে আছে। কেউ নিচে নেমে যাচ্ছে না। যেন দেখা, কিভাবে কাছে যাওয়া যায়। জাহাজ চালিয়ে কাছে যাওয়া যায়। প্রপেলার তেমনি জলের নিচে অন্তহীন ঘুরে চলছে, সাদা ব্লেড নীল জলে ঘুরছে, কেবল ঘুরছে, সাদা ফেনা তুলে দিচ্ছে পেছনে, আর অনেক দূর থেকে ভেসে আসছে একটা সরলরেখার মতো ভাসমান তিমি মাছের ছবি, ছবিটা ক্রমে যেন জাহাজের সঙ্গে এগিয়ে আসছে, মনে হয় একটা না, অনেক কটা, সারি সারি, একটা আর একটার পেছনে, ছুটে আসছে। সমুদ্রের জল উঁচু

হয়ে যাচ্ছে সরলরেখার মতো। প্রপেলার জল ভেঙে ভেঙে এমন একটা দূরের ছবি তৈরি করে রাখলে মনে হয় জাহাজটার পেছনে তিমি মাছেরা স্রোতের মতো জলের নিচে উঠে আসছে। ছোটবাবুর বেশ ভালো লাগছিল—সে যত দূরে সম্ভব চোখ মেলে দিচ্ছে।

আসলে এমন একটা সুন্দর দৃশ্য সে কবে দেখেছে জানে না। সে কেমন বিস্ময়ে নড়তে পারছে না। সূর্য অস্ত যাচ্ছে। সমুদ্র এখন ভীষণ লাল। আকাশ লাল হয়ে গেছে। আর সাদা জাহাজ। সাদা জাহাজটাকে সে কিছুতেই ভাবতে পারে না জাহাজ, আসলে সেই সৌরলোকের অন্তহীন যাত্রার মতো মনে হয়, যেন চারপাশে সব গ্রহ নক্ষত্র, উপগ্রহ আর এক সৌরলোক থেকে অন্য সৌরলোকে একটা যান অনবরত ছুটছে। তারা ক'জন জাহাজি তার ভেতর বসে রয়েছে। বিরাট এক স্পেসঅডিসির মতো এই যানে তাদের যাত্রা আরম্ভ হয়েছে।

জাহাজে ক্রমে আলো জ্বলে উঠল। দূরের বন্দরে আলো জ্বলছে। জ্যোৎস্না রাতে সমুদ্রে আলো জ্বললে এক আশ্চর্য মায়ার খেলা। ডেকের মাস্তুলের মাথায় আলো, ব্রীজের উইংসে আলো, কেবিনে কেবিনে আলো, সামনে পেছনে সব জায়গায় আলো। ডগ-ওয়াচে যার 'আগিলে' পাহারা দেবার কথা তার ছুটি, জাহাজ বন্দর ধরলে, ফরোয়ার্ড পিকে পাহারা লাগে না। তাকে কোনও দূরের জাহাজ অথবা পাহাড় দেখে তখন ঘণ্টা বাজাতে হয় না। সেও শিস দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে ডেকে

এভাবে জাহাজ ক্রমে বন্দরের কাছাকাছি চলে আসছে। কেউ নেমে যায়নি। সূর্যাস্তে জাহাজিরা রাতের খাবার মেসরুমে খেয়ে নেয়। সবাই ভুলে গেছে খেতে হবে। ভাণ্ডারি ভীষণ গালাগাল করছে। জাহাজিদের খাইয়ে দিতে পারলেই ছুটি। সেও তখন তার বুড়ো চোখে বন্দরে, আলো, অস্পষ্ট ছায়া অথবা দুরের কোন জাহাজে ব্যাণ্ড বাজতে থাকলে সুদূরে সেইসব বিদেশিনীদের কথা মনে করে জীবন অন্তহীন এক সৌরযানের মত—কেবল নিয়ত চলা, এমনি ভাববে। নামাজের সময় মনের ভিতরে কত কথা বুড়ো বয়সে যে উঁকি দেয়।

আসলে ছোটবাবুকে ওপরে ধরে তুলেছিল অমিয়। এখন এ-সব দেখে মনে হচ্ছে, সেও জাহাজের চারপাশে ধীরে ধীরে ঘুরে বেড়াতে পারে। তার শরীর দুর্বল, সে ভাল করে এখনও খেতে পারে না, গলায় খেতে লাগে, এসব মনে থাকে না। কাপ্তানের ছেলেটা তো মেজ-মালোমের পাশে একটু বসে আবার কোথায় দু-লাফে নেমে গেল। পিছিলে সে আসে না। এখানে নিচে ফোরক্যাসেলে খালাসিরা থাকে, তার হয়তো মানা আছে এদিকটাতে আসা। তবু আজ ছোটবাবু দেখল সব বাঁধা নিষেধ ভেঙে জ্যাক ছুটে ছুটে পিছিলের যমুনাবাজু দিয়ে ঢুকে গঙ্গাবাজুতে বের হয়ে গেল। সবাই তখন তটস্থ। সারেঙ দু'হাত দিয়ে পিছিলের সব জাহাজিদের সরিয়ে দিচ্ছে। কোন কারণে যেন গায়ে না লেগে যায়।

আর ছোটবাবু তখন হাঁটছে। মৈত্র দেখছে না, ওর পাশে ছোটবাবু নেই। ছোটবাবু ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে। বোট-ডেকে মেজ-মালোমের কাছে কী যে ওর আকর্ষণ। সে পাশে গিয়ে দাঁড়ালেই মেজ- মালোম বলল, ও-কে?

সে বলল, ইয়েস ও-কে। তারপর সে বলল, এনি ওম্যান সেকেন্ড।

—নো।

ছোটবাবু চুপচাপ ওর চেয়ারের নিচে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। সেই প্রথম দিন থেকেই মানুষটিকে কেমন পাগলাটে পাগলাটে লাগে। থুতনিতে ওর লাল দাড়ি। সেই একমাত্র অফিসার মানুষ, ফোকসালে গিয়ে যে রোজ দেখে আসছে তাকে। কেমন আছে ছোটবাবু, এখন কি খাওয়া দরকার, সামান্য অষুধ অন্য সব আরও যা কিছু দরকার, সে দিয়ে আসছে। মানুষটিকে ছোটবাবুর ভীষণ ভালো লাগে। সে ওর সঙ্গে খুব সহজে কথা বলতে পারে। কোন সংকোচ বোধ করে না। এই যে সে বলে ফেলল, এনি ওম্যান সেকেন্ড যেন এটা না বললে আর কিছু বলার থাকে না। এখনতো জ্যোৎস্না রাত, এখনতো দূরের বন্দরে নানাবর্ণের আলো, শুধু হাজার জোনাকির মতো জ্বলছে, আর কিছু দেখা যাচ্ছে না। আর জাহাজ ইতস্তত

চারদিকে নোঙর ফেলে আছে, অথবা বয়াতে বাঁধা। তার ভেতর দিয়ে কিছু দেখা যেতে পারে না। এমন কি বাড়ি ঘর মন্দির সব অস্পষ্ট। তার ভেতর মেয়েমানুষের ছবি দেখা স্বপ্নের মতো।

আসলে ছোটবাবুর মনে হল, মেজ-মালোম দূরবীনটা চোখে দিয়ে অন্য একটা জগতের সন্ধানে থাকে। সেখানে একটা বড় রাস্তা থাকে। দুধারে পাইনের গাছ থাকে, পাশে নীল জলের হ্রদ থাকে, সে একটা স্কুটারে বসে থাকে, পেছনে থাকে এক সুন্দরী যুবতী, যেন নিশিদিন সে স্কুটার চালাচ্ছে, আর পেছনে পিঠের কাছে যুবতী তাকে সাপ্টে বসে আছে। সে একা জাহাজে উঠে এলেও যুবতী তাকে বুঝি ছাড়ে না। তাছাড়া মানুষের কি যে আছে, কি যে আশা কুহকিনী, আশা কুহকিনী না হলে এমন ভাবে সমুদ্রের ভেতর একটি মানুষ দূরবীন চোখে বসে থাকতে পারে না।

মেজ–মালোম বলল, তুমি ছোটবাবু এটা ধর।

—আপনি স্যার!

—আমার এখন জাহাজ বাঁধাছাঁদা আছে।

—কিন্তু স্যার।

—কিন্তু কি আবার!

—এখানে একা বসে থাকব...

মেজ-মালোম জানে ছোটবাবু জ্যাককে ভীষণ ভয় পায়। জ্যাক সম্পর্কে একটা কৃত্রিম ভয় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে জাহাজে। সবাই জ্যাককে ভীষণভাবে এজন্য এড়িয়ে চলে। কিন্তু মেজ-মালোম জানে জ্যাক, শান্ত, নিরীহ, সেও প্রথম প্রথম তার সম্পর্কে ভীষণ গুজব শুনেছে, এখন দেখছে উল্টো। জ্যাক আপন মনে থাকে, সে নিজের খুশিমতো কাজ করে। তার যেখানে খুশি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। সে কাউকে বিরক্ত করে না। অথচ চিফ-অফিসার কেন যে সবাইকে জ্যাক সম্পর্কে ভীষণ সাবধান করে দিয়েছে।

মেজ-মালোম বলল, চলো তবে পিছিলে। আমার তো সেখানেই কাজ। তুমি দেখতে টেখতে পেলে সহজেই ডাকতে পারবে।

ছোটবাবু বলল, সেই ভাল স্যার। এবং এ-ভাবে সে মেজ-মালোমের পেছনে হেঁটে গেল। খুব ধীরে ধীরে সিঁড়ি ধরে লোয়ার ডেকে নেমে গেল। নামার সময় মেজ-মালোম বলল, কি ধরতে হবে?

ছোটবাবু বলল, না। আপনি এগোন আমি আস্তে আস্তে হাঁটছি। ছোটবাবু ডেকের ওপর ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছে। মাথার ওপর মাস্তুলের লাল আলো দুলছে। ছোটবাবুর ছায়াটা আলোর জন্য একবার বড় হচ্ছে আবার ছোট হচ্ছে।

আর কি যে জাহাজটা নিরিবিলি মনে হয় এখন! জাহাজ থেমে আছে। খুব কাছেই বন্দর। তবু সে বুঝল, প্রায় মাইলের ওপর হবে। সমুদ্রের ভেতরে জাহাজ বয়াতে বাঁধাছাদা হচ্ছে। দূরবীন চোখে লাগিয়ে সে বসে রয়েছে। দূরবীন চোখে লাগালেই ডাঙ্গার সব ফাঁকফোকরগুলো কেমন চোখের ওপর ভীষণভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সে বসে বসে চারপাশে খুঁজতে থাকল। সে কি খুঁজছে! তার তো এভাবে খোঁজার কথা নয়। সে তো এমনভাবে জাহাজে বাঁচবে বলে আসেনি। এভাবে সে খোঁজাকে কেমন অসভ্যতা মনে করে থাকে, তবু বুঝি জাহাজের আছে এক অতীব কঠিন অসুখ, ছোটবাবু জানে না, এই ন-দশদিনেই তার ভেতরে ভেতরে একটা অসুখের জন্ম হয়েছে। তারও লুকিয়ে ডাঙ্গায় মেয়ে দেখতে ইচ্ছে হয়।

মাঝে মাঝে হাঁক আসছে, হ্যালো ছোট, এনি ওম্যান।

—নো স্যার।

—একা দেখে ফেলবে না। ডাকবে।

—ইয়েস স্যার, ডাকব।

—এ ব্যাপারে মানুষেরা ভীষণ স্বার্থপর

—ছোটবাবু বলল, একটা স্যার কুকুর! —কুকুর!

—হ্যাঁ স্যার, কুকুরটা রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে।

মেজ-মালোম বলল, অস্পষ্ট আলোতে কুকুর, মানুষ, মেয়ে দূরবীনে একরকমের দেখায়। ভালো করে দ্যাখো।

—ঠিক বুঝতে পারছি না স্যার।

মেজ-মালোম হাসিল ফেলে চলেও আসতে পারছে না। ডেক-জাহাজিরা এখন দড়িদড়া ঢিলা দিচ্ছে। উইন্‌চ চালাচ্ছে বংকু। ডেক-টিন্ডাল হাসান কেবল হারিয়া হারিয়া করছে। হাসিল ক্রমে নেমে যাচ্ছে জলে। দুটো ছোট নৌকা জাহাজের আগে এবং পিছনে। ওরা হাতের ইসারায় ঠিক বয়াতে হাসিল বেঁধে ফেলছে। অথচ মেজ-মালোম কি যে করে! সে আবার হাই করে ডাকল।

—আছে এখনও?

—আছে।

—আর একটু। এই হয়ে গেল। এই বাস্টার্ড টিন্ডাল—শালা লোগ, জাহাজ জখম করে দেবে। তারপরই যেন ক্রিশ্চিয়ানিটির সারমর্ম বুঝে ফেলার মতো দু'হাত ওপরে তুলে ফাদারের কায়দায় বলে যাওয়া—আ...স... তে আ...স..তে। তারপরই ছুটে ছোটবাবুর কাছে ফল্কার ওপরে চলে এলে শুনল, স্যার রাস্তা পার হয়ে চলে গেল। আর দেখা যাচ্ছে না।

মেজ-মালোম ছোটকে কিছুতেই বিশ্বাস করল না। সে প্রায় যেন জোরজার করে কেড়ে দূরবীনটা যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি চোখের ওপর রাখলে দেখল, শুধু অস্পষ্ট ঘর-বাড়ি, এলেবেলে রাস্তা। রাস্তা, সমুদ্রের বালিয়াড়ি, না জাহাজ, না কোন ব্রীজ-টিজ হবে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। আসলে এতদূর থেকে রাতে কিছু দেখা সম্ভব না। তবু নিরিবিলি দেখলে কখনও কখনও মনে হয় একটা বড় রাস্তা অনেক দূর, এই মিচিগান টান হবে তার দিকে চলে গেছে, সে একটা মোটর সাইকেলে বসে রয়েছে, তার শরীরে শীতের পোশাক পিছনে কেউ যেন সাপটে ধরে আছে। চুলের মেয়েলি গন্ধ নাকে লাগছে।

এ-ভাবে সে যখনই দূরবীনে চোখ রাখে, এমন একটা গন্ধ পায়। এখন জাহাজে তার, সারা অবসর সময়ে এই একটা আশ্চর্য আলাদিনের আকাঙ্ক্ষা হাতে। এটা নিয়েই সে আছে, সে এখন এই ফল্কাতেই বসে থাকবে, কতক্ষণ বসে থাকবে সে নিজেও জানে না। তার আকাঙ্ক্ষা, কারণ কিছুদিন সমুদ্রে থাকলেই বুঝি তার মনে হয় ডাঙা কবে সে ফেলে এসেছে। বন্দরে নেমে যেতে না পারলে ফুল, ফল, পাখী, মেয়েদের হেঁটে যাওয়া সব অর্থহীন।

ফল্কাতেই মেসরুম বয় এসে খবর দিয়ে গেল, রাতের খাবার দেওয়া হয়েছে। ডাইনিঙ হলে, কাপ্তান বসে রয়েছে। রাতের খাবারটা সবাই একসঙ্গে বসে খায়। ডাইনিঙ হলের লম্বা টেবিলের মাঝখানে কাপ্তান, পাশে জ্যাক, এ-পাশে চিফ-অফিসার, জ্যাকের পাশে সেকেন্ড। এভাবে থার্ড, মার্কনি সাব, ওপাশে চিফ এনজিনিয়ার, দু'পাশে সেকেন্ড থার্ড এবং এভাবে ফোর্থ ফিফথ্। স্টুয়ার্ড মেনু রেখে যায় প্রত্যেকের সমানে। টাইপ করা মেনুর কাগজটা হলদে রঙের থাকে। এবং ওপরে নানাবর্ণের আলো। ব্যান্ড বেজে উঠলেই কোন বড় হোটেলের একটা নাচের ঘর হয়ে যেতে পারে। জ্যাককে দেখা যায় তখন চুপচাপ খেয়ে যাচ্ছে।

আর এটা কেন যে হয়, জ্যাক ভারি সুন্দর; 'মেজ-মালোম এ জাহাজে উঠেই কেমন সেই মেয়েলি চুলের গন্ধটা জ্যাকের কাছে গেলে তখন পায়। তার তো সাহস হয় না,সে বলতে পারে না, জ্যাক তুমি কি কেবিনে কোন মেয়ে নিয়ে রাত্রিবাস কর। তোমার শরীরে এমন গন্ধ কেন। তুমি তো বালক, সাবালকের কোন চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। বরং তোমার কোমর ভীষণ সরু, তুমি বেশ মেয়েদের মতো মাঝে মাঝে হেঁটে যাও। এটা কি তোমার এ জাহাজে একটা

ভীষণ নেশা ধরিয়ে দেওয়ার জন্য করা। তোমার এটাকে কি বলব, এই পেছন টেছন বলতে পারি, বেশ ভারি হয়ে উঠছে। জাহাজিরা যে কি এখন করে! আসলে সেও জ্যাককে ভয় পায়। ভীষণ আদুরে ছেলে। কাপ্তান তো সেদিন দেখেও কিছু বলল না, মেজ-মিস্ত্রি আর্চি বলেছে ইচ্ছা করে জ্যাক পা তার মাড়িয়ে দিয়েছে। এখন মেজ-মিস্ত্রি খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে। একেবারে থেতলে দিয়েছে নখটা।

ওর উঠতে ইচ্ছা হচ্ছিল না, সে তবু উঠে পড়ল। পাশে তার কেউ নেই। ছোটকে, এনজিন-বড়-টিন্ডাল ধরে ধরে নিয়ে গেছে। ছোট বেশ ছেলে। ভীষণ লম্বা। একটু রোগা মতো। চোখ ভারি, নাক উঁচু, কপাল বেশ বড়। চিবুক বেশ ডিমের মতো। এবং মুখে সব সময় এক আশ্চর্য সুষমা বয়ে বেড়ায়। মানুষের মুখে, বিশেষ করে ওর মুখে নরম নীল রঙের গোঁফ দাড়ি মিলে সে যেন সুদূর এক পর্বতের গুহাবাসী মানুষের মতো জীবের কেবল মঙ্গল কামনা করছে। আগে মেজ ভাল করে দেখেনি, বাংকারে পড়ে গেলেই তার কিছু কাজ পড়ে যায়। ওদের ওষুধপত্র দেওয়ার একটা কাজ তাকে করতে হয়। ওতেই আসা যাওয়া। ছোটর চোখ দুটো ফোর-ক্যাসেলে গেলেই কেমন ব্যাকুলভাবে তাকাতো। সে যেতে যেতে ভাবল, সুন্দর মুখে ছোটবাবু এ-জাহাজে ক্রমে সবার প্রিয় পাত্র হয়ে উঠছে। কেবল একটা রাগ, মেজ-মিস্ত্রি পুষে রেখেছে। সে যখন ডেকের ওপর দিয়ে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটে তখন এটা বোঝা যায়।

তবু সে নানাভাবে ভাবতে ভাবতে এলি-ওয়েতে ঢুকে গেল। এনজিনে কোন শব্দ নেই। সে যে হেঁটে যাচ্ছে, সে নিজের জুতোর শব্দ পাচ্ছে। কেবিনের ভেতর কেউ এখনও আছে। তার চলাফেরার শব্দ সে যেতে যেতে পাচ্ছে। ঠিকঠাক পোশাক না পরে গেলে, কাপ্তান ভীষণ ক্ষেপে যায়। এখন ওকে কেবিনে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে রাতের পোশাক পরে নিতে হবে। এবং সে যখন টিপটপ হয়ে বের হয়ে এল, বয় বাবুর্চিদের খুব দৌড়াদৌড়ি। আসলে কাপ্তান এসে অনেক আগেই বসে থাকেন। একটু গল্পগুজব করা, এই যে পৃথিবীর চারপাশটা সারাজীবন ধরে দেখে ফেলার পর নানারকমের গল্প মাথায় গিজ গিজ করছে, এ সব ঠিক বলতে না পারলে জাহাজি জীবনে মজা পাওয়া যায় না। জ্যাক কাছে থাকলে একরকমের গল্প, এই মাছ টাছের গল্প, তিমি মাছ, শুষোক মাছ, অথবা সিল মাছের গল্প, অথবা নানাবর্ণের সব যে দ্বীপ, তার গাছপালা পাখি এবং যেতে যেতে যে মনে হয় অনেক দ্বীপে একটা কাক পর্যন্ত নেই, কেবল, নিশিদিন সমুদ্রে একা থেকে থেকে কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে, এবং সেখানে যদি কেউ ভেড়ার পাল নিয়ে যায়, আর হাতে সুবর্ণ লাঠি থাকে, তবে কোন বাইবেলে বর্ণিত মেষপালকের মতো দেখাবে। আর জ্যাক না থাকলে অন্য রকমের গল্প। জ্যাক অনেক সময় তাড়াতাড়ি নিজের কেবিনেই খেয়ে নেয়। এতে কাপ্তান অমত করেন না। কেউ কিছু বললে, বলেন, ছেলেমানুষ সন্ধ্যা হলেই ঘুম পায়।

অথচ মেজ-মালোম দেখেছে, জ্যাক বেশ রাত করে ঘুমোয়। ওর পাশের কেবিনে বড় বড় সব লকার। বিচিত্র সব বই। সে বই পড়তে ভালোবাসে। আর বিস্ময়ের ব্যাপার জ্যাক এমন সব বই পড়ে যাতে শুধু সমুদ্রের কথাই আছে। সে কিনারার কথা জানতে চায় না। তার মনে হয় না, বড় একঘেয়েমি এ ভাবে চলা। গত সফরের আগের সফরে সে জ্যাকের সঙ্গে এই জাহাজেই ছিল। সে দু-সফর দিয়েছে এই জাহাজে। জ্যাককে সে দুবার দেখেছে। এবার জ্যাকের শরীরে আরও বেশি ভালবাসার কথা লেখা আছে যেন। সে জ্যাক কাছে এলেই কেমন টের পায় মানুষেরা পৃথিবীর চারপাশে, বনে জঙ্গলে, কোন দ্বীপে, কোন নির্জন পরিত্যক্ত জাহাজে শুধু মেয়েদের কথাই কেবল ভাবে। জ্যাককে দেখতে বেশ মেয়েলি মেয়েলি। কিন্তু জ্যাকের কথাবর্তা পুরুষের চেয়েও কঠিন। জ্যাক খুব আস্তে আস্তে কথা বলে। খুব ওজন রেখে কথা বলে। সে বোঝে, সে জাহাজের সর্বময় কর্তার ছেলে। সে খুব একা একা থাকতে ভালোবাসে। বোধহয় জ্যাকের ভীষণ অহঙ্কার—সে, অহঙ্কারে ডেকের ওপর পা না ফেলে লাফিয়ে লাফিয়ে যায়। মনে হয় না, জ্যাকের ভিতর এই একাকীত্বের কোন দুঃখ আছে। তখন জ্যাক শান্ত, গম্ভীর, নিরীহ আবার চঞ্চল কখনও। জ্যাককে বোঝা মুস্কিল।

মেজ-মালোম তাড়াতাড়ি খেয়ে নিল। সে তার ড্রিংকস বোট-ডেকে পাঠিয়ে দিতে বলল। মেসরুম- বয়, একটা ইজিচেয়ার, একটা টিপয়, একটা গ্লাস, আর রেশনের মদ রেখে এলে বেশ যেমন একজন মানুষ, চার ফেলে বড়শিতে মাছ ধরার জন্য একটা সিগারেট খেতে খেতে বের হয়ে যায়, তেমনি মেজ-মালোম দূরবীন হাতে ওপরে উঠে গেল। কিন্তু কিছু দেখতে পেল না।

তখন কেউ যেন বলে, এনি ওম্যান সেকেন্ড।

—নো।

—ইফ এনি ওম্যান?

—ডাকব। তাবৎ মনুষ্যকুলকে ডেকে বলব, এস, দ্যাখো।

জ্যাকও একবার বলে গেছে। এনি ওম্যান।

—নো।

—এনি ম্যান।

—ম্যান।

—ইয়েস ম্যান।

মেজ-মালোম বলল, ম্যান দিয়ে কি হয়।

জ্যাক বলল, ছোটকে কেমন দেখলে?

—ভাল।

মেজ-মালোম বুঝল এখানেই জ্যাকের অহঙ্কার। কোন প্রশ্ন শুনতে সে চায় না। কাপ্তানের সে ছেলে, এটা মনে হতেই সে বুঝিয়ে দিয়েছে, সব প্রশ্নের জবাব তাকে দিতে হবে এমন কথা নেই।

—ছোট কি দেখছিল দূরবীনে?

—ওকে পাহারায় রেখেছিলাম। যদি মেয়েটেয়ে চোখে পড়ে।

—ন্যাস্টি।

মেজ-মালোম বলল, ভীষণ ভালো, ভীষণ ভালো। বলে জিভে মেজ চুক চুক করতে থাকল। সে ড্রিংক করছে, চোখ বুজে ড্রিংক করছে। তার এখন দূরবীনে চোখ রাখতে ভাল লাগছে না।

জ্যাক প্রায় দৌড়ে তার কেবিনে ঢুকে গেল। সে দরজা বন্ধ করে দিল। পোর্টহোল খোলা। ভীষণ গরম বলে পোর্টহোল খোলা রাখতে হয়। পাখা ঘর ঠান্ডা রাখতে পারে না। তবু জ্যাক পোর্টহোল বন্ধ করে দিল। কাচের ওপর পর্দা টেনে দিল। বড় আয়না সামনে। সঙ্গে এটাচড বাথরুম। সে এখন ভাবল ঠান্ডা জ্বলে ভাল করে হাত মুখ ধোবে। এইসব ইন্ডিয়ান নেটিভদের সেকেন্ড বাজে সব ব্যপার শেখাচ্ছে। সেকেন্ড অফিসারের দুরবীনে মেয়েমানুষ খোঁজা কেমন তার অহঙ্কারে লাগে।

সে রাগেই হোক, দুঃখে হোক শরীর থেকে সার্ট খুলে ফেলল। একেবারে খালি গা। এও হতে পারে ভীষণ গরম বলে গায়ে জামা রাখা যাচ্ছে না। সারাদিন ডেকে পুরুষ সেজে থাকতে তার খারাপ লাগছে না। ডেকে যখন জাহাজিরা দুলে দুলে মাস্তুলে অথবা ফানেলে রঙ লাগায়, তখন তার মনে হয় সেও উঠে যাবে। কখনও কখনও উঠে যায়। নিচে তখন ডেক-সারেঙ ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়ে। চেঁচামেচি শুরু করে দেয়। সে ভ্রূক্ষেপ করে না। তার ভাল লাগে এ-ভাবে দড়িদড়ায় লাফিয়ে লাফিয়ে যেতে। কিন্তু আজ এসেই কেন জানি ইচ্ছা হচ্ছে শরীরের যেখানে যে-ভাবে ভালবাসার আধারগুলো ক্রমে পুষ্ট হচ্ছে, সেগুলো দাঁড়িয়ে একটু দেখবে।

সে আয়নায় দাঁড়ালে বুঝতে পারে বয়স অনুপাতে সে ভীষণ লম্বা। শরীর তার হালকা। খুব

পরিমিত শরীর। মোটাও নয়, খুব রোগাও নয়। সে হাত লম্বা করে দিলে তাকে ব্যালাড সিংগারের মতো দেখায়। আশ্চর্যভাবে সে দাঁড়ালে দেখতে পায় আয়নায়, কি সুন্দর মসৃণ বুকের ভিতর ভালবাসার আধার সামান্য উঁচু হয়ে উঠছে, সে তখন হাত রাখে। এ-ভাবে হাত রাখলে ভাল লাগে সে যেন জানত না। আজ প্রথম তার এ-সব ভারি ভাল লাগছে।

জ্যাক অন্যদিন পুরুষের মতো রাত্রির পোশাক পরে শুয়ে পরে। কিন্তু আজ সে তার নাইটি বের করে নিল। সিল্কের নাইটির রঙ একেবারে শরীরের রংয়ের সঙ্গে মিলে গেছে। সে যখন নাইটি পরে হেঁটে যায় তখন তার ইচ্ছা করে আলোগুলো কেবিনের জ্বালা থাক। সে যেদিকে তখন ঘুরছে তার চারপাশে একটা ছায়া ঘুরছে। মোমের পুতুলের মতো ছায়াটা চারপাশে ঘুরছে। এবং সে দেখতে পেল, তার পাতলা সিল্কের ভিতর দিয়ে আজানু স্ত্রীজাতির অহঙ্কার শরীরে ক্রমে দেখা দিচ্ছে। এখন যদিও অস্পষ্ট, এবং মাসকাল পার হলে সব স্পষ্ট হয়ে যাবে। সে এখনও ঢোলা জামাপ্যান্ট পরে না। এখনও তার তেমন সব পুষ্ট নয় বলে, প্রায় অঙ্কুরোদগমের মতো সারা শরীরে ব্যাপারটা নিয়ত ঘটছে বলে, সে বেশ হাল্কাভাবে চলাফেরা করতে পারে। তার কোন অসুবিধা হয় না।

কিন্তু সে এভাবে কতক্ষণ যে বড় আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। বাবা যত দিন যাবে তত ক্রমে চুল খাটো করে কেটে দেবে। চুল কাটবার সময় বাবার সঙ্গে ভীষণ ধ্বস্তাধ্বস্তি করেছে। কিন্তু সে যাই করে, কেউ কাছে না থাকলে করে। বাবার অপমান হোক সে সেটা চায় না।

তবু কাপ্তান বলেছিল, বনি, চুল খাটো না করে দিলে তোমাকে ঠিক কেমন যেন দেখায়।

—ভাল দেখায় না বাবা!

—না।

—ভাল না দেখাক, তুমি আমার চুল বেশি ছেঁটে দেবে না।

—না বেশি ছাঁটছি না। দ্যাখ। বলে তিনি বনির চুল নেড়া করে দিতে দিতে বলতেন, আমি তখন জাহাজে তোর ডেক-এপ্রেন্টিস আছি! তখন ভাল চুল ছাঁটতে জানতাম না। ব্যাঙ্ক লাইনের লম্বা সফর। পোর্টে নেমে চুল কাটার সময় থাকে না। আমাদের চিফ-অফিসার বুঝলি, একটা ঘুঘু ছিল। সে আমাকে বলল, ওহে ছোকরা, জাহাজে উঠেছ, এ্যাপ্রেন্টিসগিরি করছ, চুল টুল কাটতে শিখেছ তো!

—ওঃ ঘাড় ধরে গেছে!

—এই হয়ে গেল, বলেই কাঁচি কচকচ করে চালাতে থাকলেন। —তারপর বুঝলি বনি, একখানা যা চুল ছেঁটে দিলাম না।

—মানে!

—মানে কাগে চুল ঠুকরে নিলে কেমন হয়। বড়র ঘাড় হেঁটে আমি প্রথম চুল কাটা শিখি। এখন তো সবারই ইচ্ছে চুল ছেঁটে দিই। আমার মতো জাহাজে কে এত ভাল চুল কাটে।

এবং বন্দরে নেমে চুল ছাঁটা দায়। কারণ বেশ লম্বা পাড়ি। বুয়েনস-এয়ার্স না যাওয়া পর্যন্ত চুল ছাঁটার কথা ওঠে না। মাঝে যা সব বন্দর পাওয়া যাবে, সেখানে একদিন কি দুদিন হল্ট, কাপ্তান পর্যন্ত জানে না। এজেন্ট অফিস বলতে পারবে ব্যাপারটা। এবং বেশ যখন চুল ছেঁটে কাপ্তান আয়নার কাছে গিয়ে বললেন, দ্যাখ কেমন সুন্দর চুল ছেঁটেছি, তখন বনির দু-পা ছড়িয়ে চিৎকার, চেঁচামেচি। সবাই ছুটেএসেছিল। পাশাপাশি যারা থাকে সবাই। স্টুয়ার্ড পর্যন্ত। কাপ্তান কেবল সবার সমর্থন চাইছেন, কি স্টুয়ার্ড, চুলটা সুন্দর দেখাচ্ছে না? এদিক থেকে দ্যাখো, হ্যাঁ ঠিক হেঁটেছি না? এই যে মেজ এসে গেছ, তুমি বল তো কেমন হয়েছে?

—বা বেশ! সুন্দর! একেবারে বাটি ছাঁট।

—বাটি ছাঁট মানে? কাপ্তান প্রশ্ন করলেন।

—ইন্ডিয়ার রাজা মহারাজারা যেসব ছাঁট ফাটে চুল কাটে।

—তবে! তুমি জ্যাক কেবল লাফাচ্ছ।

অগত্যা জ্যাক কি করবে। সে সবার সামনে কাঁদতে পারে না। অহঙ্কারে লাগে। সে চুপচাপ উঠে যায়। এবং পরে ঘরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়ালে তার হু-হু করে গলা বেয়ে কান্না উঠে আসে। তার এমন সুন্দর চুল বাবা জাহাজে উঠেই ক্যাচ ক্যাচ করে ছেঁটে দিয়েছে। বাবার একবার হাত পর্যন্ত কাঁপল না।

বনি এখন নিজের কেবিনে এ সব নিয়ে ভাবে না। বোধহয় বাবা খেয়ে-দেয়ে কেবিনে যাচ্ছেন। পাশের ল্যাডার দিয়ে ব্রীজে উঠে যাবার পথ। বোধহয় কোন কাজে কোয়ার্টার মাস্টার সিঁড়ি ধরে উঠছে। কেবিনে বসে সে সব টের পায়। জুতোর শব্দ প্রায় তার সব মুখস্থ, বাবা না সেকেন্ড অফিসার, না চিফ, না থার্ড অফিসার অথবা যদি কোয়ার্টার মাস্টার হয় তবু সে টের পায়। দরজা না খুলেও টের পায় কে যাচ্ছে। তার দরজা বন্ধ। দরজার সামনে দাঁড়াবার সাহস কারো নেই। সে এখন এ- কেবিনে সোজা লম্বা হয়ে শুয়ে পড়বে। তার টিপয়ে জল। সে শুলে পায়ের কাছে বড় আয়না, বেশ পালিশ করা দামী মেহগিনি কাঠের বাঙ্ক। একেবারে সাদা বিছানা। প্রতিদিন সকালে চাদর, বালিশের ওয়ার পাল্টে দিয়ে যায় কাপ্তানবয়। সে অন্যদিন আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে। কিন্তু আজ তার কেন জানি ঘুমোতে ইচ্ছা করছে না।

সে কেবিনের সবকটা আলো জ্বেলে দিল। দুটো আলো পাশাপাশি লাল নীল রঙের। একটা সাদা ডুম, কারুকার্য করা কাচের ঝালরে ঢাকা। আর ঠিক আয়নার সামনে কালো রঙের বাতিদানের ওপর হলুদ রঙের ডুম। ফুল স্পিডে সে পাখা ছেড়ে দিল। হাওয়া পাইপের মুখ ভাল করে ঘুরিয়ে দিল। তারপর সুন্দর প্রসাধন করে সে এসে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ল।

তার শরীরে সোনালি গাউন। সিল্কের পাতলা গাউনের ভেতর ওর আশ্চর্য শরীর দেখা যাচ্ছে। খুব হাওয়া, প্রায় ঝড়ের মতো হাওয়ায় চুল, চাদর, পাতলা গাউন সব উড়ছে। সে আয়নার দিকে তাকিয়ে আছে। আয়নায় তার প্রতিবিম্ব ভাসছে। আয়নায় সে নিজেকে এমনভাবে দেখে কেমন মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে। যদিও সুন্দর চুলের জন্য ওর ভারি মায়া হচ্ছিল, তবু এমন একটা পোশাকে সে ভীষণ বিহ্বল হয়ে গেছে। ওর মনে হচ্ছিল, হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। অথবা গভীর সমুদ্রে সে ডুবে যাচ্ছে। চারপাশে নীল জল, কারণ ঘরের আলোটা এক নীল জলের আভার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে কেবিনে, সে তার ভিতর শুয়ে আছে, চারপাশে এখন সমুদ্রের মাছেরা ঘোরাফেরা করছে যেন। কোনও মাছ ওর খুব কাছে। তেমন সুন্দর মনে হচ্ছে না। কেবল একটা রুপোলি মাছ অনেক দূরে। ওর দিকে তাকিয়ে আছে। কাছে আসতে সাহস পাচ্ছে না।

সহসা বনির মনে হল, সে এলিস ইন ওয়ান্ডার ল্যান্ড হয়ে গেছে। আবার সে যেন দেখতে পাচ্ছে আয়নায়, সেই ছোট্ট রাজকুমার যার একটা ছোট্ট গ্রহে বাস, যে সহসা পৃথিবীতে এসে আটকে পড়েছিল—যেতে পারছিল না, আর নানাভাবে প্রশ্ন পৃথিবীর সেই বিমানচালককে, অর্থাৎ বাওয়াব গাছের আগাছা ভীষণভাবে অনিষ্ট করে যাচ্ছে তার গ্রহে। একটাই গাছ সারা গ্রহে, এত ছোট্ট গ্রহ যে সেখানে এত বড় গাছ থাকা ঠিক না, ওর আগ্নেয়গিরি আছে একটা, যা অনায়াসে বাওয়াবের পাতায় ঢেকে রাখা যায়,

নদী আছে, যা সে ইচ্ছা করলেই ইউকনের পাতায় ঢেকে দিতে পারে—এমন একজন ছোট্ট রাজপুত্র তার পায়ের কাছে কেন যে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। সে ভেবে পায় না, চোখে তার এমন সব স্বপ্ন জড়িয়ে আসছে কেন! কেমন তার ভিতরটা ভীষণ আবেগে কাঁপছে। সে বুঝতে পারছে শরীরে এক অতীব উত্তেজনা। সে পৃথিবীতে এমন একটা সুন্দর মানুষ আছে জানত না। ভারি আরামে তার ঘুম আসছে। ছোট্ট রাজপুত্র, তার পৃথিবীতে এসে আটকে গেছে। তার নিজের গ্রহে আর ফিরে যেতে পারছে না। বনি স্বপ্নের ভেতর কেবল হাসছে, হেসে চলেছে। সে আলোর ভেতর দু'হাত বুকের ওপর রেখে কেবল এক অসমতল অমসৃণ পাহাড়ের চারপাশে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর তার কি যে মনে হচ্ছিল না! ছোট্ট রাজপুত্রের জন্য ভেতরে ভেতরে একটা মায়া গড়ে উঠছে। সে নিজেও সেটা কিভাবে কখন হয়েছে জানে না।

॥ পাঁচ ॥

ঠিক এ-সময়ে জাহাজে নানা জায়গায় নানা কাজ। যেমন, মৈত্র বৌকে চিঠি লিখছে, শেফালি আমরা কলম্বো বন্দরে আজ পৌঁছেছি। কাল আবার নোঙর তুলব। জাহাজে রসদ উঠলেই আমাদের কাজ শেষ। এখানে আশা করেছিলাম তোমার চিঠি পাব, কিন্তু কেন যে পেলাম না। চিঠি না পেলে ভীষণ খারাপ লাগে। ভাল লাগে না। আমরা লরেঞ্জু-মরকুইসে যাচ্ছি। ঠিকানা দেওয়া থাকল। গিয়ে যেন তোমার অন্ততঃ তিনটে চারটে.....তুমি তো বলতে, রোজ একটা করে আমাকে চিঠি লিখবে। কেন যে তুমি চিঠি লেখ না। কি করে যে চিঠি না লিখে থাকতে পার। তারপরই মৈত্র সেই এক কথায় চিঠি শেষ করবে—আমার ভাল লাগে না শেফালি। তোমাকে ছেড়ে আমার কোথাও থাকতে ভাল লাগে না।

রাত বাড়ছে। সকালে এজেন্ট অফিসের লোক আসবে। যে যার চিঠি ফোকসালে লিখতে বসে গেছে। ছোটবাবুর কাছে লাইন দিয়েছে কেউ কেউ। ছোট-টিণ্ডাল দুবার ঘুরে গেছে। এখনও বেশ ভিড়। ভিড় না কমলে সে ঠিক ঠিক লেখাতে পারবে না। চিঠি লেখার সময় কেউ পাশে থাকুক সে চায় না। ছোট-টিণ্ডাল বাদশা মিঞার কপালে সেজন্য ঘাম। তাকে খুব উদ্বিগ্ন দেখাচ্ছে। সে চিঠি এখন লিখিয়ে না রাখাতে পারলে সকালে আর সময় পাবে না। দরজার গোড়ায় খুব ভালো মানুষের মতো সে দাঁড়িয়ে আছে এখন।

সবার হলে ছোটবাবু ডাকল, আসুন চাচা।

বাদশা মিঞা ওকে হাতের ইসারায় ডাকল। ছোট বলল, কি ব্যাপার!

—আস না!

সে, ছোট-টিণ্ডালের পিছু পিছু উঠে গেল। টিণ্ডাল, ফোকসালে ঢুকে বলল, দরজাটা বন্ধ কইরা দেই।

ছোটবাবু বলল, কেন? দরজা বন্ধ করার কি আছে।

—তোমারে কই নাই, একটা কথা কমু, কেউ জানে না। তুমি জানবা কেবল। আমার বিবির কাছে একটা খত লিখা দেও।

—সেটা তো সবাই জানে।

–কেডা জানে?

—সবাই জানে চাচা। আমি তো জানি, জাহাজে উঠেই জানি, তুমি তোমার চার নম্বর বিবির কাছে খতটত লেখাতে চাও।

—এডা মনু মিঞার কাজ।

—মনু কেন হবে!

—না, ওডা আমার দ্যাশের লোক।

—মনু বলে নি।

—তবে কেডা কইছে কও। তারে একবার মোকাবেলা করি।

—সে যেই বলুক। এতে লজ্জার কি আছে।

—নারে বাজান, জাহাজে তুমি মানুষ চিন না। শালারা সব ইবলিশের বাচ্চা। কথা নাই বার্তা নাই, পিছনে লাগে।

—কেউ লাগবে না।

—তা তোমার শরীরডা ভাল না। দু'লাইনে লিখা দ্যাও। ভাল আছি। ডারবানের ঘাটে, বড় কইরা একটা খত লিখা দিয়। বিবির বড় খত না পাইলে মন ভরে না। আর শোন তুমি লিখা দিয়, তোমার শরীরটা ভাল না বইলা বেশি কিছু লিখতে পারলাম না।

ছোটবাবু হেসে বলল, ঠিক আছে লিখে দেব। এবং খুব সংগোপনে প্রায় ফিস ফিস গলায় অজস্র কথা বলে গেল ছোট-টিণ্ডাল। মৈত্রকে ছোট-টিণ্ডাল ভীষণ ভয় পায়। এখনই হয়ত মৈত্র এসে ছোটবাবুকে ডেকে নিয়ে যাবে। এবং ধমক দেবে, তোমার আক্কেল নেই মিঞা। একটা অসুস্থ মানুষকে নিয়ে তুমি টানাটানি করছ।

ছোটবাবু তাড়াতাড়ি খতটা লিখে দিতেই ছোট-টিণ্ডাল দাঁত বের করে হাসল। ছোটবাবু দেখল, দু'পাশের চার-চারটা দাঁত ওর সোনায় বাঁধানো। হাঁ করলে জিভটা বের হয়ে আসে। ওর মুখে নানা রকমের দাগ। এবং দেখলে বোঝাই যায়, সমুদ্রে সে ঘুরে ঘুরে নোনা জলের স্বাদ ঠিক ধরতে পেরেছে। সে একটার পর একটা নিকা করেছে। সে কাউকে তাড়ায় নি। সে চিঠিতে সবার খবর নিয়েছে।

বাদশা মিঞাকে ছোটবাবুর খারাপ লাগল না। ছোটখাট মানুষ। চল খুব ছোট করে ছাঁটা। দাড়ি নেই, গোঁফ নেই। বোধ হয় এটা ওর এ-বয়েসেও ওঠে নি। বয়স ষাটের ওপর হবে। নলিতেও কারচুপি—বয়স কমিয়ে রেখেছে। সমুদ্রের ঝড়ে-জলে মানুষটা ভীষণ দক্ষ। ওর চার নম্বর বিবির বয়স খুব যে কম এবং প্রায় বালিকা, এটা চিঠির সব কথাবার্তা থেকে ছোটবাবু ধরে ফেলেছে। সে বলল, চার নম্বর চাচি আপনাকে খুব ভালোবাসে?

বাদশা মিঞা কেমন ছেলেমানুষের মতো মুখ নীচু করে রাখল। যেন এটা বলে ছোটবাবু ওকে ভীষণ লজ্জা দিচ্ছে। ভালবাসার কথা মুখে বলে ছোট করতে চায় না বিবিকে।

ছোটবাবু বলল, আমি ঠিক লিখে দেব। আপনার কোন ভাবনা নেই। এবং এই বলে সে বের হয়ে এসেই দেখল, ফোকসালে অমিয় নেই। কোথাও সে পালিয়ে সেই ছবিগুলো বোধ হয় দেখছে। এ সব ছবি কোথায় যে পাওয়া যায় ছোটবাবু জানে না। বীভৎস সব ছবি যোগাড় করেছে বঙ্কু। সে একবার অমিয়কে দেখাবে বলে এসেও ছিল। ছোটবাবু কাছে ছিল বলে অমিয় আমতা আমতা করেছে। এবং যখন গিয়ে দেখল, অমিয় নেই তখন সে ঠিক ভেবে নিল, বঙ্কু ওকে নিয়ে গেছে। ওরা একসঙ্গে লুকিয়ে সেই সব ছবি দেখছে। উলঙ্গ এবং নগ্ন সেই সব ছবির ভেতর অমিয় বেশ আছে। ছোটবাবু ফোকসালে ঢুকে এবার শুয়ে পড়ল। মৈত্র বলল, এলি।

ছোটবাবু বলল, হ্যাঁ।

—কি লিখাল রে বাদশা মিঞা।

—জাহাজের খবর-টবর দিল।

—ওর চার নম্বর বিবির কথা তোকে কিছু বলে নি!

—বলেছে। ওকেই তো চিঠি।

–তোকে বলে নি, কাউকে বলবে না।

—তা বলেছে।

—ওর এই কারবার। সবাইকে বলবে। এখন ওর দুটো কাজ এমন বলবে। একটা কাজ বড় বেটার সাদি, দু নম্বর কাজ, চার নম্বর বিবির পেটে একটা বাচ্চা—এই হলে তার হয়ে গেল।

—সে আর কিছু চায় না!

—না। বলেই বলবে, কাউকে বলবে না, অথচ ও নিজেই বলে বেড়ায়।

—এমন স্বভাব কেন!

—ওর ধারণা, এই বয়সে চার নম্বর বিবি ঘরে এনে একজন সাচ্চা মরদের মতো কাজ করে ফেলেছে। সেটা ও জাহির করতে চায়।

—কিন্তু আমাকে যে বলল, জাহাজের সব শালা ইবলিশের বাচ্চা।

—ও ওমনি বলে। আসলে একটা আস্ত শয়তান। না হলে কেউ এমন বয়সে তার নাতনির বয়সী একটা মেয়েকে সাদি করতে পারে!

ছোটবাবুর হাই উঠছিল। ওর ঘুম পাচ্ছে। জলের ছলাত ছলাত শব্দ আসছে। জলের ঢেউ মাঝে মাঝে ধাক্কা মারছে বলে হালটা নড়ছে। এবং সেজন্য স্টিয়ারিং এনজিনের শব্দ আসছে। পাশাপাশি ফোকশালগুলোতে জাহাজিরা গল্প করছে। সবই দেশ-বাড়ির গল্প। মাছের গল্প। কেউ কেউ সময় পেয়ে গল্প করতে করতে জাল বুনছে। কেউ হয়তো এখন ওপরে কোরান শরিফের ব্যাখ্যা শুনছে, অথবা ইমানদার মানুষ হবার জন্য এ-সফরে কোরান শরিফ পড়াটা রপ্ত করে ফেলা ভাল। সময় পেলেই মাদুর বিছিয়ে ডেক-সারেঙের সামনে তারা বসে থাকছে।

তখনই ছোটবাবুর মনে হল, মাকে সে একটা চিঠি লিখতে পারে। সে সবার মতো লিখল না, আমার ভাল লাগছে না, কবে যে দেশে ফিরব জানি না। সে লিখল, মা আমি ভালো আছি। আমার টাকা হয়তো পেয়েছ। ভাইদের পড়া বন্ধ করে দিও না। জ্যাঠিমাকে বলবে যেন আমার জন্য চিন্তা না করে। বড়দা মেজদার খবর দিও। আমি মা যাচ্ছি দক্ষিণ আমেরিকা। কলম্বো থেকে জাহাজ কাল ছাড়ছে। কত বড় সমুদ্র মা, কত বড়, সমুদ্রে না এলে বোঝা যায় না। বাবা করে বাড়ি এসেছিল জানিও। জ্যাঠামশাইর জন্য খুব খারাপ লাগে মা। জ্যাঠামশাইর শরীর কেমন আছে জানিও। জাহাজে আমার মৈত্রদা আছে। অমিয়, বঙ্কু, সারেঙসাব, মেজ-মালোম সবাই আমাকে খুব ভালবাসে। আমার জন্য তুমি একেবারে চিন্তা করবে না। সফর শেষে যখন ফিরব ওঃ কি যে ভাল লাগবে না। শেষ করল এই বলে, মা আমি এখন জাহাজি।

এ-ভাবেই জাহাজে জাহাজিরা চিঠি লিখে থাকে। সকালের দিকে নৌকায় সব কাঠের হাতি, ময়ূরের পালখ কিনার থেকে এল। মৈত্র ভেবেছিল নেবে, কিন্তু সে যে একটা সঙ্গে ভীষণ দরকারী জিনিস নিয়ে যাচ্ছে। এটা সে জাহাজে উঠলেই লুকিয়ে নিয়ে যায়। এবারও গোপনে নিয়েছে। কাঠের হাতি, ময়ূরের পালখ নিয়ে কি আর হবে! সে কিছু নিল না। অন্য জাহাজিরা সব নিতে গিয়ে দেখল, রসদ আসছে। রসদ উঠছে জাহাজ-ডেকে। মেজ-মালোম ছুটোছুটি করছে। ঠিক রোজকার ঘটনা, অর্থাৎ ডেক- টিণ্ডাল যাচ্ছে আগিলে। কশপ যাচ্ছে, হাতে রঙের টব নিয়ে। বঙ্কুর কি কাজ জানে না। সে মেসরুমে বসে রঙের টব ঢোলের মতো বাজাচ্ছে।

আর গান গাইছে অমিয়। যেন এখন ওদের এই জাহাজে এ-সব ঘটনা রোজ ঘটবে। নামাজ পড়ছে দু'নম্বর 'পরী'র মানুষেরা। ওরা সকালে চাপাটি খেয়েই নামাজ পড়তে বসে গেছে।

তখন দেখা যাবে নেমে আসছে জ্যাক। সে এদিকে পাখিগুলোর খাঁচায় মাংস দিয়ে যাচ্ছে। রসদ তোলা হলে, মেজ-মালোম বোট-ডেকে সেই দুরবীন চোখে বসে গেল। তারপর জাহাজ ছাড়লে এক নিত্য দিনের ঘটনা! কবেতক যে আবার জাহাজ বন্দর পাবে কেউ জানে না। জাহাজ সমুদ্রে চলছে তো চলছেই।

তখন জাহাজ গভীর সমুদ্রে। দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। মৈত্র ওয়াচ শেষ করে ফিরেছে। অমিয় এসে চুপি চুপি ওর লকারে কি যেন রাখছে। আজকাল অমিয়র এটা হয়েছে। সে সবার সামনে লকার খোলে না। কিন্তু রবিবার ইন্সপেকসনের দিন থাকে। কাপ্তান, মেজ-মালোম, বড়-মালোম সবাই সার বেঁধে নেমে আসে। সব সাফসোফ আছে কিনা ঠিক আছে কি না দেখে। তাছাড়া কোথায় কি আবার ভাঙছে, ঘুরে ঘুরে এটাও কাপ্তান দেখতে চান। ইন্সপেকসনের সময় লকার খুলে রাখার নিয়ম। অমিয় লকার খুলতে চায় না। সে সারেঙকে বলেছে, চাবি পাচ্ছে না। আসলে চাবিটা ওর কাছেই ছিল। অমিয় যে কেন এমন একটা মিথ্যা কথা বলল সে ভেবে পায় না।

ছোটবাবু দেখল, অমিয় কি সব ভিতরে রেখে দিচ্ছে। কি রাখছে সে টের পেল না। ছোটবাবু বলল, কি রাখলি অমিয়?

—কৈ কিছু নাতো।

ছোটবাবু আর কিছু বলল না। অমিয় পাশের ঘরে ওয়াচের নোংরা জামা প্যান্ট ছেড়ে স্নান করতে গেলে মৈত্রকে বলল, অমিয় কি নিয়ে আসে সঙ্গে?

—কি আবার নিয়ে আসে! বাংকারে কি এমন আছে, শুধু তো কয়লা।

—কিছু নিয়ে আসে।

মৈত্র বলল, মরুক গে। জাহাজে উঠলেই নানারকম অসুখে ভোগে মানুষ। এ-নিয়ে তোমার মাথা ঘামাতে হবে না ছোটবাবু। ওপরে যাও। কাল থেকে তো তোমার আবার ওয়াচ।

ছোটবাবু এবার ওপরে উঠে গেল। থালা-বাসন ধুয়ে ভাণ্ডারীর কাছ থেকে 'বিশু'র মাংস নিয়ে নিল। কফি ভাজা, ডাল আর ভাত। মাংস নেবার সময় সে বলল, চাচা বিফ না মটন?

ভাণ্ডারী গলা বাড়িয়ে দেখল ছোটবাবুকে। মেসরুমের সঙ্গে গ্যালির একটা জানলা থাকে। তার ফাঁকে গলা বাড়িয়ে বলল, বিফ। তারপর ফের কচ্ছপের মতো সে গলা ভেতরে নিলে ছোটবাবুর কেমন রাগ হল। রোজ রোজ বিফ। সে বলল, চাচা আমাদের জন্য মটন নিতে পার না। কি দিয়ে খাই বলতো!

—দেয় না। ভাণ্ডারী সারেঙের চায়ের জল গরম করছে। পাশের উনুনে সে আর এক ডেকচি ভাত সেদ্ধ করছে। তামার বড় ডেকচি। ছোটবাবু কি বলছে, ঠিক মতো শুনতে পাচ্ছে না। সে ফের গলা বের করে বলল, কি বললে?

—আমাদের জন্য মটন নিতে পার না?

এবার ভাণ্ডারী কেমন রেগে গেল। বলল, আমারে কিছু কইবা না। সারেঙ-সাব কিছু করতে পারে না! তোমরা যাও, মাস্তার দ্যাও। কও, মটন না দিলে চলব না।

—চলব না তো বলিনি। তুমি তো জানো বিফ আমি খেতে পারি না, অমিয় খায় না। কেবল মৈত্রদা খায়।

—থাকতে থাকতে তুমিও খাবে। তারপর ভাণ্ডারী আর কোন কথা বলল না। সে এত রোগা মানুষ আর সে এত বেশি রগচটা যে কথা বলা দায়। এখনই হয়ত কিছু বললে ক্ষেপে যাবো, ছোটবাবু ভয়ে ভয়ে মাংসের ডেকচিটা নীচে রাখল। তিনটে থালায় সে ভাত নিল, ডাল নিল, কফি ভাজা নিল। সে কফি ভাজা ডাল এই দিয়ে ঠিক খেয়ে নেবে।

মৈত্র এসে আজ আবার ক্ষেপে গেল ছোটবাবুর ওপর। আমাকে তোরা কি পেয়েছিস? ছোটবাবু বুঝতে না পারে তাকিয়ে থাকল।

—আমি কি মানুষ না! এতটা গোস্ত আমার জন্য রেখেছিস।

ছোটবাবু বলল, কে খাবে। তুমি না খেলে কে খাবে। আমি খাই না,অমিয় খায় না!

—কেন অমিয় খায় না, কেন তুই খাবি না!

—আমার ভাল লাগে না। এবং এখনই হয়তো ফের মৈত্র মেসরুমে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিতে পারে। সারেঙের সাত পুরুষ উদ্ধার করতে পারে। এবং মৈত্র ক্ষেপে গেলে সারেঙসাব একবারে কোন রা করেন না। সারেঙসাব ইচ্ছে করলেই এদের জন্য আলাদা মটনের ব্যবস্থা করতে পারে। হিন্দু পোলাদের জাত মারতে চান তিনি। বিফ খাওয়াবার এমন একটা সুযোগ তিনি ছাড়তে চান না। অর্থাৎ এমন সব কথা মৈত্র তখন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলবে। সারেঙসাব রেলিংয়ে ভর করে তখন সমুদ্র দেখেন। তিনি মনে করেন, মৈত্র ভীষণ গোঁয়ার,ওর সঙ্গে কথায় পারা যাবে না। তিনি যে ভীষণভাবে চেষ্টা করেছেন, কলম্বোতে রসদ নেবার সময় বার বার বলেছেন, জাহাজে যখন হিন্দু নাবিক আছে, তখন কিছু অন্তত মটন নেওয়া হোক। একেবারে যে না নেওয়া হয়েছে তা না, তবু ডারবান পর্যন্ত এই রসদেই চালিয়ে নিতে হবে। বিফ সস্তা বলে, কোম্পানি রেশনে বেশি বিফ দেওয়া পছন্দ করে। সারেঙের কথায় কি হবে! আর্টিকেল বদলাতে না পারলে কিছু হবে না।

সারেঙসাব এই নিয়ে মৈত্রের সঙ্গে ঝগড়া করতে পারেন। বয়স মানুষকে নানাভাবে ধার্মিক করে রাখে। অযথা চিল্লাচিল্লি তাঁর পছন্দ না। ছোটবাবু এ-সব বোঝে। বোঝে বলেই বলল, তুমি মৈত্রদা এ নিয়ে ঝামেলা কর না। তোমার অযথা ঝামেলা করার স্বভাব।

—আমার অযথা ঝামেলা করার স্বভাব!

—তাই তো।

—আমার কচু। জাহাজে এয়েছিস, মরবি। বলে দিলাম, মরবি। কেউ রক্ষা করতে পারবে না।

ছোটবাবু বুঝতে পারে না, এই কথায় এত উত্তেজনা হয় কি করে! মৈত্রদা এখন ভীষণ গোগ্রাসে খাচ্ছে। বড় বড় মাংসের টুকরো দিয়ে চটকে ভাত খাচ্ছে। সবটা মাংস সে খুব সহজেই খেয়ে বলল, এই ছোটবাবু, আমি হিন্দুর পোলা না। আমি বামুন না, আমার জাত নেই। সঙ্গে সঙ্গে এমন বিষম খেল যে মুখের সমস্ত ভাত চারপাশে ছড়াতে থাকল। অমিয় বলল, তোমার মৈত্রদা ব্লাড প্রেসার আছে। মাংসটা কম খাও।

এত কাসছে, তবু কথা থামছে না মৈত্রের।—বিফ না খেলে জাহাজ চালানো যায় না। আমি, আমি হিন্দুর পোলা বলচি, বিফ না খেয়ে কয়লার জাহাজে কাজ করা যায় না। মটন, মটন চাই! কেন দেবে মটন! কেন দেবে। যখনকার যা, তোমাকে তাই খেতে হবে।

এবার ছোটবাবু যেন না বলে পারল না, আচ্ছা খাব, কাল থেকে খাব। তুমি চোচমেচি করবে না তো। জলটা খাও। ছোটবাবু জল এগিয়ে দিল। তারপর মৈত্র একেবারে চুপ। সে আর কোন কথা বলতে পারল না। সে নিচেও গেল না। ছোটবাবু রেলিঙে ঝুঁকে আছে। আর সেই সমুদ্র, নীল আকাশ এবং যেমন মনে হয়ে থাকে অনেকদূর থেকে সারি সারি তিমি মাছের ঝাঁক জাহাজের পেছনে ছুটে আসছে, তেমনি সব ঠিকঠাক থাকলে ছোটবাবুর পাশে খোলা ডেকে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছা করে তার। মৈত্র ছোটবাবুর পাশে দাঁড়াতেই দেখতে পেল, অতিকায় সব সমুদ্রপাখি জাহাজটার পেছনে ছুটে আসছে। এ অঞ্চলে এদিক-ওদিক সব দ্বীপ,পাহাড় ছড়ানো। কি করে জাহাজের খবর পেয়েছে পাখিগুলো, খাবারের জন্য ওরা জাহাজটার পেছন নিয়েছে।

সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছিল। চারপাশে সমুদ্র নীল জলের ভিতর যেন খেলা করে বেড়াচ্ছে। দূরে ওরা দেখতে পেল, ভেড়ার পালের মতো ডলফিন ভেসে বেড়াচ্ছে। ছোটবাবুর ইচ্ছা একটা তিমি মাছ যদি এ-সময় সমুদ্রে ভেসে ভেসে দিগন্তের দিকে চলে যেত, বেশ মজা হত তবে। এখন মনে হচ্ছে কোথাও কেউ রেকর্ড-প্লেয়ার বাজাচ্ছে। জ্যাক মাঝে মাঝে যখন একঘেয়েমি ঠেকে, বোট-ডেকে বসে বেহালা বাজায়। আসলে বেহালাটা কাপ্তানের। তিনি মাঝে মাঝে তাঁর ঘরে বসে বাজান। সবারই এই দূর সমুদ্র যাত্রায় কিছু না কিছু নেশা আছে। যেমন জ্যাক ভাল নাচতে পারে। একদিন জ্যাক বোট-ডেকে পায়ে খড়খড়ি লাগিয়ে নেচেছে। আজ জ্যাক, বোট ডেকে বসে আছে। জাহাজ জিরো ডিগ্রী পার হয়ে এসেছে। গরমটা এখন তেমন নেই। জ্যাক, একটা কালো রঙের প্যান্ট পরেছে। লতাপাতা আঁকা জামা গায়ে দিয়েছে। টাইটা বেশ লম্বা। জ্যাক এখন খুব সেজেগুজে থাকতে ভালবাসে। আর কেউ জানে না, জ্যাক বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে থাকতে ভীষণ ভালবাসে। সে সেখানে দাঁড়ালেই ছোটকে দেখতে পায়। সে ছোটকে আজকাল নানারকম ফরমাস করতে ভালবাসে।

জ্যাক ডাকল, হাই।

ছোট বুঝতে পারল, জ্যাক তাকে ডাকছে। সে দৌড়ে বোট-ডেকে উঠে গেল। বলল, জ্যাক আমাকে ডাকছ!

—তুমি কি দেখছিলে?

—কিচ্ছু না।

—এটা ধরো বলে একটা রেকর্ড তার হাতে ধরিয়ে দিল। তারপর জ্যাক নুয়ে কি একটা সুন্দর আই লাভ-টাব গোছের গান তুলে অন্য একটা রেকর্ড খুঁজে বেড়াল। তিন চারদিন আগেও এমনি হঠাৎ তাকে হাই করে ডেকেছিল। বলেছিল, তুমি দূরবীনে কি দেখেছিলে?

—কিচ্ছু না।

—কিচ্ছু দেখতে পাওনি?

–না। একটা কুকুর দেখেছিলাম।

—আর দেখবে না।

—আমি ঠিক দেখতে চাই না। কিন্তু মেজ বললে...

—মেজ বললেও দেখবে না।

ছোট খুব ভাল ছেলের মতো ঘাড় কাৎ করে বলেছিল, আচ্ছা।

আজ আবার কি জন্য ডেকেছে ছোট বুঝতে পারে না। বেশ শীত শীত করছে। সে হাতে একটা রেকর্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। কাপ্তান ব্রীজে পায়চারি করছেন। দুটো একটা নক্ষত্র আকাশে উঠছে। আকাশে বিন্দুমাত্র মেঘ নেই। এমন নির্মল আকাশ অনেকদিন দেখা যায়নি সমুদ্রে। এমন কি সমুদ্র এত শান্ত যে এখন ইচ্ছা করলে কাপ্তান, এক রবিবারে, ছোটখাটো একটা নাটক অভিনয় করিয়ে নিতে পারেন। ছোটখাটো স্ক্রীন টানিয়ে, ম্যাকবেথের কোন সিন, জ্যাক তো মুখস্থ বলতে পারে সবটা অথবা ও-নিলের কোন সমুদ্রবিষয়ক নাটক, তখন কাপ্তান বেহালা বাজাতে পারবেন, এটাই তাঁর লাভ। তিনি, উইংসের আড়ালে দাঁড়িয়ে বেহালা বাজাবেন এবং সমুদ্রের চারপাশের এক নীলাভ জ্যোতি তাঁকে কেমন গ্রাস করতে থাকবে তখন।

জ্যাক আর একটা রেকর্ড পাল্টাল। খুব দ্রুত তালে বাজছে। গমগম করে উঠছে সারা জাহাজটা। নিচে এঞ্জিনের শব্দটা পর্যন্ত এমন একটা গানের সুরে ছন্দ মিলিয়ে চলছে। জ্যাক, পায়ে তাল দিচ্ছে। জ্যাক বলছে, গাও, গাও। জোরে। ছোটবাবু একেবারে হাঁ। সে বলল, আমি পারি না।

—গাও,গাও না।

ছোটবাবু বলল, আমি পারি না জ্যাক।

—গাও, গাও না........উই আর ইন দি সেম বোট, গাও, গাও না।

ছোটবাবু বেশ গলা মিলিয়ে গাইবার চেষ্টা করল, উই আর ইন...

জ্যাক বলল, বেশ সুন্দর হচ্ছে। আরও জোরে। গাও, আরও জোরে....।

কাপ্তান আর থার্ড অফিসার তাড়াতাড়ি উঁকি দিল ব্রীজ থেকে। কাপ্তান বয় যেতে যেতে দেখল, জাহাজের সবচেয়ে কমবয়সী নাবিকটির সঙ্গে জ্যাকের ভারি বন্ধুত্ব। সে কফি আর আইসক্রীম রেখে গেছে।

ছোটবাবু বলল, তুমি খেয়ে নাও জ্যাক।

জ্যাক বলল, ছোটবাবু মনে থাকে যেন, আর কখনও স্যার-টার বলবে না।

—না বলছি না।

—আমার খারাপ লাগে স্যার শুনতে।

‘ছোটবাবু বলল, জ্যাক, তুমি মেয়েদের মতো দেখতে। বলেই জিভ কেটে ফেলল। সে ভুলে যায় সব। এটা ঠিক না। জ্যাকের অহংকারে লাগতে পারে। বেটাছেলেকে মেয়েছেলে বললে কার না রাগ হয়। সে তাড়াতাড়ি জ্যাককে অন্যমনস্ক করার জন্য বলল, জ্যাক ঐ দেখ কত বড় পাখি! কি বড় ডানায় যেন সমস্ত আকাশ ঢেকে দিয়েছে।

জ্যাক দেখল ওদের মাথার ওপর, হাত দশেক ওপর হবে, পাখিটা প্রকাণ্ড ডানা মেলে স্থির হয়ে ভেসে যাচ্ছে। জাহাজের সঙ্গে চলছে।

জ্যাক বলল, সর্বনাশ।

—কি হল!

—ওটা এখন ছোঁ মারবে!

—তার মানে!

—আমার সব খাবার ছোঁ মেরে নেবে।

ছোটবাবু তাড়াতাড়ি খাবারটার ওপর ঝুঁকে দাঁড়াল।

—তোমার চোখ তুলে নেবে ছোটবাবু। শিগগির বোটের নিচে চলে এস।

ছোট আর দেরি করল না। সে কফির কাপ এবং আইসক্রিমের প্লেট নিয়ে ছুটে বোটের নিচে চলে গেল। তারপর সে দেখল, জ্যাক সুন্দর দু'পা বিছিয়ে দিয়েছে। বোট-ডেকের ভিতর দিয়ে, উপুড় হয়ে পড়ে আছে। ছোটবাবু উবু হয়ে বসে আছে। খুব তাড়াতাড়ি খেতে কষ্ট। রেকর্ডটা শেষ হয়ে আসছে। যেন ওর'খাওয়াটা একটু দ্রুত সমাধান করার জন্য, সে কিছুটা ছোটকে দিয়েছে। ভাগ করে দিয়ে সে একটা কথাও ছোটকে বলতে দিল না। সে আবার রেকর্ড-প্লেয়ারের পাশে উবু হয়ে বসে পড়ল।

ছোটবাবুর সাহস হল না বলে, আমি খাব না জ্যাক। ছোটবাবু খেয়ে জামায় মুখ মুছে ফেলল। যেন সে খায়নি। সে খেল কিনা তাও বলল না জ্যাককে। বেশ পরিপাটি করে দু'পা ছড়িয়ে সহজ হয়ে বসে পড়ল। জ্যাককে সে যে খুব ভয় পেত, এখন এমন বলতে ইচ্ছা হচ্ছে। কিন্তু জ্যাক একবারও তাকাচ্ছে না। সে রেকর্ডের গাদা থেকে একটা ভাল রেকর্ড খুঁজছে। যা শুনলে ছোটবাবু বুঝবে, জ্যাকের সংগ্রহে কত সুন্দর গান আছে।

কাপ্তান ব্রীজে পায়চারি করতে করতে ভাবছিলেন যাক, জ্যাক সমুদ্রে একজন সমবয়সী সঙ্গী পেয়ে গেছে। ঠিক সমবয়সী নয়, তবু বয়সে ওরা কাছাকাছি। স্বাভাবিকভাবেই ওরা দুজন জাহাজে একটা টান বোধ করবে। আর নেটিভরা খুব বিনীত, ভদ্র, এবং ভীতু হয়। ছেলেটার ভিতর সব গুণগুলোই আছে। তিনি মনে মনে জ্যাকের জন্য যতটা উদ্বিগ্ন ছিলেন, এখন আর ততটা নেই। যেমন শিকারী তার দুষ্টু মেয়ের হাতে কখনও কখনও বাঘের ছানা দিয়ে দেয়, এবং তাকে ভুলিয়ে রাখে, অথবা পোষা বেড়াল, ছোটবাবু যেন জ্যাকের তাই। কাপ্তান বলল, বুঝলে থার্ড, জ্যাক আমার স্বভাব পেয়েছে। সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে ওর কখনও খারাপ লাগে না। স্কুলেটুলে কিছু হয় না। তার চেয়ে একজন মানুষ সমুদ্রে ঘুরে বেড়ালে বেশি শিখতে পারে। জ্যাক আমার কত কম বয়সে কত বেশি জানে। কেমন আত্ম-তৃপ্তিতে কাপ্তান চোখ বুজে ফেললেন।

এভাবে জাহাজ আবার ক্রমে এগিয়ে চলে। কখনও কখনও ছোটবাবু জ্যাকের সঙ্গে পাখিদের মাংস খাওয়ায়। ডারবান পর্যন্ত ছোটবাবুর শেষ পর্যন্ত ওয়াচ থাকল না। সে ফালতু হয়ে থাকল। ফালতু মানে কাজ কম। ডেকের ওপর উইনচে শুধু কাজ করা। ডেকের ওপর মাঝে মাঝে পাখিদের মাংস দেবার সময় বড় বড় সব এ্যালবাট্রস পাখি ডানা মেলে মাথার ওপর ভেসে থাকে। জ্যাক আর সে মাঝে মাঝে মাংস ছুড়ে দেয়। বেশ একটা খেলা। ডেকে ওদের ভারি আশ্চর্য খেলা জমে ওঠে। একে একে অনেক পাখি, প্রায় সারাটা ডেক তখন ছেয়ে যায়, দলে দলে ওরা মাংস খাবার লোভে জাহাজের চারপাশ ঘিরে ফেলে—তারপর উড়তে উড়তে ভাসতে ভাসতে সমুদ্রযাত্রার সঙ্গী হয়। মাংস ছুড়ে দিলেই হাওয়ায় ক্লপ করে ধরে ফেলে। ডেকে পর্যন্ত পড়তে দেয় না। পাখিগুলো মাংস খাবার লোভে কোথায় যে ভেসে চলেছে নিজেরাও জানে না। কারণ ওরা এভাবে জাহাজের পিছু পিছু শুধু উড়তেই থাকবে। সামনে যতক্ষণ কোনও ডাঙ্গা না পাচ্ছে ওরা আর থামবে না।

জাহাজিরা অবসর পেলেই পাখিদের স্নান, খাওয়া এসব দেখত। কখনও সবাই দেখত বেশ সামান্য ঢেউয়ের ওপর ওরা ভেসে রয়েছে। ডুবে ডুবে সাঁতার কাটছে। অথবা প্রপেলার যেখানে জল ভেঙ্গে চলে আসছে সেখানটায় ওরা ডুবে গভীর নীল জলে, সাদা ডানা মেলে মাছ খুঁজছে। প্রপেলারের ঝাপটায় কত সব ছোট মাছ, মরে যায়। ওগুলো জলে ভাসলে অথবা জলে ডুবে গেলে ওরা তুলে খায়। কখনও ভাণ্ডারিরা উচ্ছিষ্ট খাবার ফেলে দেয় জলে। ওরা সে-সবও খায়। জাহাজিদের কাছে, সমুদ্রের মতো, আকাশের নক্ষত্রের মতো এই সব পাখিদেরও একটা দাম আছে। মাস্তুলে কোনও পাখি এসে বসলে ওরা তাড়িয়ে দেয় না। ওদের সময় ভাল যাচ্ছে, এমন ভেবে থাকে।

বন্দরে ঢোকার মুখে মৈত্র ভাবল এ-বন্দরে শেফালির ঠিক চিঠি আসবে। এখানে শুধু বাংকার নেওয়া হবে। রাতে রাতে জাহাজ, দুটো পাহাড়ের ভিতর দিয়ে বন্দরে ঢুকে যাচ্ছে।

শেফালী বন্দরে বন্দরে এক চিঠি লেখে। সেই এক অপেক্ষার কথা চিঠিতে। তুমি কবে ফিরবে। মৈত্রকে ছেড়ে শেফালীর এক দণ্ড ভাল লাগে না। লিখবে জাহাজ তারপর কোথায় যাচ্ছে। ঠিকানা স্পষ্ট করে লিখ। গতবার এজেন্ট অফিসের কি যে ঠিকানা দিলে কিছু বুঝতে পারিনি।

বন্দরে ঢোকার মুখেই ঠিক চিঠি হাজির। পাইলট জাহাজে উঠে এসেছে। পাইলটের সঙ্গে সব চিঠি এসেছে। সারেঙ ডেকে ডেকে চিঠি দিচ্ছে সকলকে। মৈত্র চিঠি পেয়ে একটু গোপনে পড়বে বলে, বোট ডেকে উঠে গেছে। তা না হলে অমিয়টা গিদরের মতো করবে। কি লিখল দাদা। চুমুটুমু খাবার কথা লেখেনি! অমিয়র জিভ খুব আল্গা।

এবারের চিঠিতে শেফালী নতুন একটা উপসর্গের কথা লিখেছে। মৈত্র নুয়ে দেখল, অস্পষ্ট অক্ষরে লেখা, তবু হাতের লেখা বুঝতে কষ্ট হয় না, এতবার এই লেখা পড়েছে যে সে শেফালীর সামান্য আঁচড়ে ধরে ফেলে সব। শেফালী লিখেছে, আমার বড় বমি পায়। তোমার জন্য রাতে আমার ঘুম আসে না। তারপর লিখেছে, শেফালীর ভাল থাকছে না শরীর। ক্রমশ বমি বাড়ছে। শরীর দুর্বল। কেবল দুঃস্বপ্ন দেখি। তারপর নিচের প্যারায় শেফালী- সে তার স্বপ্নের কথা লিখেছে।

আচ্ছা তোমার জাহাজে লম্বা বড় একটা বাঁশ আছে? বাঁশের মাথায় কি কোন কঙ্কাল বাঁধা আছে? প্রায় একটা বড় তিমি মাছের ছবি সমুদ্রে ভেসে যেতে দেখি। প্রায়ই মনে হয় মাছটা তোমাকে গিলে ফেলার জন্য অপেক্ষায় আছে। তুমি সেটা বুঝতে পারছ না। তুমি ক্রমশ মাছটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছ। মাঝে মাঝে তোমাকে আমি সেই ঝোলানো কঙ্কালের নিচে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখি। ভয়ে তখন আমার মুখ শুকিয়ে যায়। মনে হয় আর সমুদ্রে গিয়ে কাজ নেই। বরং এবার এসে এই কলকাতা শহরে কিছু দেখে নাও। তুমি লক্ষ্মীটি আমার, দস্যুর মতো কোনও গোঁয়ার্তুমি কর না। ঝড়ের সময় ডেকের ওপর দিয়ে হাঁটবে না। মনে থাকে যেন লক্ষ্মীটি। জাহাজে উঠলেই এভাবে শেফালী ভীষণ সংশয়ে ভোগে।

দস্যু কথাটা বলে শেফালী যেন অদ্ভুত এক সুখ পায়। দস্যু কথাটা ওর সম্পর্কে একটা ভীষণ উপমার মতো। দু'হাত তুলে মৈত্র এখন সেই সব দৃশ্যের ভিতর ডুবে যেতে চাইছে। দস্যুর মতো ঝাঁপিয়ে পড়া, দস্যুর মতো সহবাস এসব হামেশা শেফালী তাকে বলে থাকে। মৈত্রের চিঠি পড়তে পড়তে ভীষণ জল তেষ্টা পাচ্ছে। সে আর ডেকে দাঁড়াতে পারছে না। নিচে নেমে সে ঢকঢক করে জল খেল।

আজকাল অমিয়র সঙ্গে মৈত্রের তুই তুকারিতে এসে দাঁড়িয়েছে। অমিয় এখন জাহাজে বেশ সাবালক জাহাজি। সে দেখল মৈত্র জল খাচ্ছে। বেশ ঠাণ্ডা। শীত লাগছে ভীষণ। এই শীতে কি করে যে ওর তেষ্টা পায়! সে বলল, কার চিঠি?

মৈত্র বলল, আর কার?

—শেফালী বৌদির?

মৈত্র বলল, তাইতো মনে হয়।

মাঝে মাঝে ওরা যখন ওয়াচ শেষ করে বাথরুমে ঢুকে যায়, তখন স্নানের ভেতর ওরা কেমন নিজেদের উলঙ্গ ছবি দেখে ফেলে। ভারি মজা এই স্নানে। সাবানের ফেনা সারা শরীরে। মৈত্রের চেহারা তখন বড় ভয়ঙ্কর। ওর চুল কোঁকড়ানো। হাত-পায়ের পেশী ভীষণ শক্ত। সে হাতে একটা তামার বালা পরে থাকে। এমন একটা শক্ত মানুষের চেহারা দেখলেই অমিয়র কেন জানি মৈত্রের বৌর কথা মনে হয়। সে তখন বলতে থাকে, তোর বৌটাকে এবার দেশে গেলে দেখাস মৈত্র।

—কেন কেন! এত লোভ কেন আমার বৌকে দেখার।

—আমার লোভ না। লোভ তোমার। তোর এমন শরীর, বৌয়ের কষ্ট হয় না!

–কষ্ট! কিসের কষ্ট! মৈত্রের মুখ একেবারে নাবালকের মতো। যেন সে কিছু বোঝেনি।

-–কষ্ট, কষ্ট, এত ব্যাখ্যা করতে পারব না। আশেপাশে ছোটবাবু থাকতে পারে—ছোটবাবুর সামনে মৈত্র চায় না খিস্তিখেউড় করে। অমিয় একটা ধারি, সে যা কিছু বলতে পারে। ওরা এদিক ওদিক খুঁজে দেখলে ছোট নেই। হয়ত সে মেজ-মালোমের পাশে বসে আছে। ওকে খুঁজে দেখা দরকার। ওর চিঠি আসেনি। চিঠি না এলে জাহাজিরা খুব বেজার মুখে ঘুরে বেড়ায়। একা একা থাকে। এবং নিজেকে খুব তুচ্ছ মনে হয়।

মৈত্র ছোটবাবুকে বঙ্কুর ফোকসালে শেষ পর্যন্ত পেল। বঙ্কুর বাংকে চুপচাপ শুয়ে আছে। চারপাশে যখন বন্দরের আলো, পাহাড়ের মাথায় বাতিঘর তখন ছোট এভাবে নিচে বসে আছে ভাবতেই মৈত্রের কেমন খারাপ লাগল। সে কোন চিঠি পায়নি। সে নিজে সবার চিঠি লিখে দিয়েছে, সবার চিঠির জবাব এসেছে,তার চিঠি নেই।

মৈত্র পাশের বাংকে বসে বলল, ঠিকানা ভুল লিখেছিস?

—না, ঠিকানা ঠিকই লিখেছি। তবে আমার যা মনে হয় বাবা-মা, আগের জায়গায় নেই।

—কোথায় গেছে?

—কোথায় যাবে, তাও জানি না। বাবা বারবারই জায়গা বদল করতে চাইছেন। নবদ্বীপের দিকে থাকার খুব ইচ্ছে। ওখানে কিছু যজমানি পাবেন কথা আছে। তবে ওখানে যদি যান, চিঠি একদিন না একদিন পাবেন। আমি ঠিক বুয়েন্স এয়ার্সে মার চিঠি পাব আশা করছি।

—তা হলে পেয়ে যাবি

—নাও পেতে পারি। আমাদের পরিবার এখনও ঠিক করতে পারছে না কোথায় থাকবে।

—কেন, কলকাতার দিকে চলে এলেই হয়।

—কলকাতাকে বাবার ভীষণ ভয়। জ্যাঠামশাই তো কিছুতেই আসবেন না। গাঁয়ের দিকে বাড়িটাড়ি করে কিছু জমিজমা কিনে বাঁচার একটা চেষ্টা চলছিল। কিন্তু বাবা, জ্যাঠামশাই এত আনাড়ি শেষ পর্যন্ত কিছু ঠিক করে উঠতে পারেন না। একটা রেশনের দোকান জ্যাঠামশাই করলেন। টাকা কম ছিল বলে পার্টনার নিলেন। পরে কি করে যে সেই মালিক হয়ে গেল বুঝলাম না। জ্যাঠামশাই একদিন ক্ষোভে দুঃখে সব ছেড়ে চলে এলেন। তারপর কেমন খুব দুঃখ থেকে বলার মতো সে বলল আসলে আমাদের পরিবার জানে না, একবার ছিন্নমূল হলে ফের কিভাবে বাঁচতে হয়। সে যেন বেশ দামী কথা বলে ফেলেছে। এমনভাবে বললে, বড় কথা শোনাবে তবু এটাই ঠিক। বাবা কেমন হাল ছেড়ে দিয়েছেন।

মৈত্র বলল, সব ঠিক হয়ে যাবে। একটু থেমে বলল, আসার সময় তুই জেনে আসিসনি সব।

—সে তো আটমাস আগে, আটমাস আগে বাড়ি ছেড়েছি।

—বাড়িতে আর যাসনি?

—না।

—জাহাজে ওঠার আগে একবার দেখা করে এলি না!

—তাহলে আমার জাহাজে আসাই হত না। সে বলতে চাইল আপাতত আমি নামগোত্রহীন। বাবা মার সঙ্গে সম্পর্কহীন! কিন্তু বলতে পারল না। বুয়েন-এয়ার্সে যদি না আসে তবে ভাগ্যের সন্ধানে ওরাও বের হয়েছে ভেবে নিতে হবে। ভাগ্যের সন্ধানে মৈত্রদা আমিও বের হয়েছি। টাকা মা পাবে না। অফিসে আবার ফেরত চলে আসবে।

মৈত্র এবার কেমন ঠাট্টা করে বলল, বাড়ি থেকে রাগ টাগ করে পালিয়েছিস বুঝি!

—রাগ, না রাগ ঠিক না। তবে সবাইকে না জানিয়ে ভাগ্যের সন্ধানে বের হয়ে পড়েছি। কেউ জানত না, আমি কোথায়। আমার চিঠি পেলে মা যে কি খুশী হতেন।

—তোর এটা ঠিক হয়নি ছোট। মাকে এভাবে চিন্তায় ফেলে দেওয়া তোর ঠিক হয়নি।

ছোট এবার দেয়ালের দিকে মুখ ঘোরালো। ছোট কি মায়ের জন্য কাঁদছে। ছোট কিছুতেই এদিকে মুখ ঘোরাচ্ছে না। মৈত্র ভীষণ বিব্রত বোধ করছে। এ-ভাবে ছোটকে মুখ ঘুরিয়ে থাকতে দেখলে সে ভীষণ ক্ষেপে যায়। সে বলল, বুঝলি ছোট তোর বৌদি চিঠি লিখেছে।

ছোট কোন আগ্রহ দেখাল না! তবু মৈত্র বলে চলেছে, বুঝলি তোর বৌদির কি ভয় রে! ও নাকি ডেকের মাস্তুলে একটা তিমি মাছ স্বপ্নে ঝুলতে দেখে। কখনও তিমি মাছের কঙ্কাল। এ আবার কি রকম স্বপ্ন রে বাবা!

ছোট উঠে বসল এবার। সে মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে এখনও। সে তেমনিভাবে বলল, সত্যি আজগুবি স্বপ্ন মৈত্রদা। না হলে শেফালী বৌদি হবে কেন। তোমরা দুজনেই দুজনকে ছেড়ে থাকতে পারছ না। বলে ছোট্ট রসিকতা করে নিজেই নিজেকে হাল্কা করে দিল। এবং বড্ড ছেলেমানুষী করে ফেলেছে ভেবে সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ধরে মৈত্রের নাগালের বাইরে চলে গেল।

মৈত্র বলল, বেচারা!

॥ ছয় ॥

এ-বন্দরটা বেশ নিরিবিলি নির্জন। শহর খুব কাছে না হয়তো। বাতিঘর থেকে আলো এসে মাঝে মাঝে তাদের জাহাজে পড়ছে। ছোটবাবু একবার আলোর মুখোমুখি পড়ে চোখে অনেকক্ষণ ঝাপসা দেখেছে। সে ভেবেছিল চুপচাপ ফল্কাতে বসে থাকবে। কিছু পাখী জাহাজে আসতে আসতেই মরে গেছে। লোনা জলের ঝাপ্টা কিছু পাখির সহ্য হয়নি। ওরা সে-সব সমুদ্রেই ফেলে দিয়েছে। কোথাকার পাখি, রাজস্থানের কোন অঞ্চল থেকে পাখিগুলো ডারবান যাবে, কি কোথায় যাবে কেউ জানে না। চিড়িয়াখানা-টানায় হবে হয়তো। এটা ওরা আন্দাজে অনুমান করেছিল। পাখিগুলো জলে ভাসিয়ে দিলে ছোটবাবুর এমন মনে হত। কারণ, মরা পাখিরা জলে কিছুটা ভেসেছিল, জাহাজ একটু দূরে গেলেই বড় বড় হাঙর ছুটে আসবে। কত সুন্দর নরম মাংস, ভারতবর্ষের কোথায় এদের বাস ওরা জানে না, তবু সে টের পায় জলের নিচে সেইসব অতিকায় হাঙরের ঘোরাফেরা আর জাহাজ যায়, সেই একভাবে, নীল রঙের সাম্রাজ্যে জাহাজ, সাদা জাহাজ যায় আর যায়। পাখিগুলোর মরা শরীর অনেক দূর থেকেও ভাসতে দেখা গেছিল।

কিছু পাখী মরে যাওয়ায় ফল্কার এদিকটা ফাঁকা। জাহাজ বেশ দ্রুত যাচ্ছে। কারণ জাহাজটাকে সমুদ্র-স্রোত কিছুটা দ্রুত যেতে হয়তো সাহায্য করছে। এখানে সে জানে একটা মৌসুমী স্রোত আছে, মৌসুমী স্রোতের জন্য হতে পারে, বা জাহাজ খুব নিরিবিলি সমুদ্র পেয়েছে বলে প্রায় একদিন আগে লরেঞ্জোমরকুইসে ঢুকে গেছে। আর হাওয়াটা জাহাজের সামনে। পেছনে সে জন্য ধোঁয়া যাচ্ছে। ফানেলের ধোঁয়ায় সারাটা আফটারপিক, ফলকা একেবারে কালো হয়ে গেছে। ছোটবাবু ফলকায় একটু বসবে ভেবেছিল, সকালে ডেক-টিণ্ডাল খুব ভালোভাবে জল মেরেছে, অথচ এখন হাত দিলে ফের কালো ছাপ। সে এখানে বসতে পারল না।

বেশ অন্ধকার এদিকটাতে। যে-কোন কারণেই হোক, মাস্তুলের আলোটা জ্বলছে না। ঠিক বোট- ডেকে এখন মেজ-মালোম আছে। কিন্তু সে গিয়ে দেখল মেজ-মালোম নেই। কেবল বড়-মিস্ত্রি সেজেগুজে কোথাও নেমে যাবে বলে গ্যাঙওয়েতে দাঁড়িয়ে আছে।

প্রায় একমাস হতে চলল, ওর মনেই ছিল না, এ-জাহাজে বড়-মিস্ত্রি বলে একজন আছে। অথচ সে প্রথম দিন দেখেছে, মানুষটি ক্রাচে ভর করে ডেকে উঠে আসছে। কিনারায় ওর মেয়ে ঠিক করা থাকে। বন্দরে বন্দরে ঘুরে এটা হয়েছে। হয় জেনি, নয় লরা, নয় এলমা এমন কেউ না কেউ আছে। কলকাতা বন্দরে কে থাকে, তার নাম কি? মানুষটা এতদিন কোথায় ছিল! কেবিনে, নিজের ঘরে! সারাক্ষণ মানুষটা সে শুনেছে দাবা নিয়ে বসে থাকে। আর টিপয়ে মদ এবং সে একা দুজনের হয়ে সকাল সন্ধ্যা কখনও গভীর রাত পর্যন্ত দাবা খেলে যায়। মনে হয় সে ঘুমোতে জানে না। সারাক্ষণ জেগে জেগে জাহাজ পাহারা দেবার স্বভাব বুঝি। যখন ভালো লাগে না পোর্ট-হোলে দাঁড়ায়। সমুদ্র যেন পেছনে চলে যাচ্ছে এমন তার মনে হয়। সে সমুদ্রে একটু সময় তাকিয়ে থাকলেই সমস্ত গ্লানি খুব সহজে শরীর থেকে মুছে ফেলতে পারে।

ছোটবাবুর মনে হল এ-মানুষটাই জাহাজে সবচেয়ে বেশী সুখী। বেশি লম্বা নয়, বেঁটেও নয়, গোলগাল মানুষ, গোলগাল বলে যতটা লম্বা দেখানো দরকার তা দেখায় না। মাথায় একটাও চুল নেই। টাকটা এত বেশি মসৃণ আর চকচকে যে কখনও কখনও একটা বরফের বলটল মনে হয়। বোধহয় জাহাজটা এখানে রাত কাটাবে! নয়তো বড়-মিস্ত্রি বের হত না। ওর তো কোন কাজ নেই, কেবল একটা কেবিন, দাবার ছক। ছকটা আবার সাধারণ ছকের মতো নয়, খাঁজকাটা। এতে দাবার বড়েরা পিচিং-এর সময় ছিটকে পড়ে যায় না।

ওর একদিন বড়-মিস্ত্রির ঘরে পাইপ মেরামতের কাজ ছিল। সেদিন বড়-মিস্ত্রি সারাক্ষণ মুখ গুম করে বসেছিল। কি বিরক্ত! ছোটবাবু আর পাঁচ নম্বর মিস্ত্রি কোনরকমে, যতটা

তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজটা সেরে বের হলে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়বার মতো। সেই থেকে সে আর মানুষটাকে দেখেনি। তার কোন ওয়াচ নেই। দিনের বেলা সবসময় বয়লার স্যুট পরে থাকে। পেছনের পকেটে একটা লম্বা টর্চ। এটা সে কখনও পকেট থেকে খুলে রাখে না। বড়-মিস্ত্রিকে একটা টর্চ বাদে কিছুতেই ভাবা যায় না।

গ্যাঙওয়েতে সিঁড়ি পড়ে গেলেই খোঁড়াতে খোঁড়াতে মানুষটা নেমে যাবে। সামনে কি আছে, রাস্তার নাম কি, ট্যাকসি কোথায় পাবে, সব সে জানে। হয়তো এ বন্দরে এই নিয়ে বিশবার এসেছে। তার কাছে বন্দরের ছবি এত স্পষ্ট যে, জাহাজিরা মেয়ে ধরতে গেলে পর্যন্ত ওর কাছে শোনা যায় টিপস্ নিতে। কোন জায়গায় ভালো জিনিস আছে বড়-মিস্ত্রির মতো কেউ বলতে পারে না।

সব শোনা ছোটবাবুর। মানুষটাকে দেখে আবার মনে পড়ে গেল। সে কোনরকমে অন্ধকারে গ্যাঙওয়ে পার হবার সময় টের পেল না, আরও একজন দাঁড়িয়ে আছে। একটু দূরে। সে অমিয়। অমিয়, জাহাজ বন্দর ধরছে, আর নেমে যাবার তাল করছে। ছোটবাবুরও ইচ্ছে করছে একবার নিচে নেমে যেতে। যেন কতকাল মাটির স্পর্শ সে পায়নি। পায়ের নিচে মাটি পেলে, আফ্রিকা, আমেরিকা, ইণ্ডিয়া, মনে থাকে না। মাটি, মাটি। মাটি, জননী, এমন শুধু মনে হয়। মানুষের কাছে এর চেয়ে প্রিয় কিছু নেই।

ছোটবাবু অস্পষ্ট অন্ধকারে দেখল, বড়-মিস্ত্রির পিছু পিছু আর একজন নেমে গেল। ক্রেনগুলোর পাশ দিয়ে ডকের বড় বড় লম্বা গুদাম, রেল-লাইন, লাইন পার হয়ে গেটের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। জাহাজ যখন বাঁধাছাঁদা হয়ে গেছে তখন যে যার মতো বন্দরে নেমে যাবেই। ফোকসালে এসে দেখল, মৈত্র উবু হয়ে চিঠি লিখছে। পাতার পর পাতা লিখছে, এবং একটা বাণ্ডিল বোধহয় করে ফেলবে। কেউ কেউ তাঁকে খুঁজে গেছে। চিঠি লেখাতে দল বেঁধে এসেছিল। সে ভয়ে আর জেগে থাকতে পারল না। যা সব চিঠি, মাঝে মাঝে সে না হেসে পারে না। হাসলে আবার ওরা রাগ করে। সে চিঠি লেখার ভয়ে তাড়াতাড়ি কম্বল গায়ে শুয়ে পড়লে মনে হল, ওপরে কেউ ওকে খুঁজছে। এবং সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। কেউ দ্রুত নেমে আসছে। মৈত্র দেখল, মেজ-মালোম উঁকি দিচ্ছে। তাড়াতাড়ি, মৈত্র লাফিয়ে দরজার কাছে গেলে ছোটবাবুর দিকে আঙ্গুল তুলে মেজ যেন কি বলছে।

মৈত্র বলল, স্যার ও ঘুমোচ্ছে।

ছোটবাবু ঘুমোয়নি। সে সব শুনছে। যদি মজার কোন ব্যাপার হয়, তবে বলবে, না স্যার ঘুমোইনি, আর না হলে এখন ঘুমের ভান করে পড়ে থাকতেই হবে। সে চুপচাপ কথাবার্তা শুনছে কেবল।

সেকেণ্ড বলছে, এত তাড়াতাড়ি ছোট ঘুমিয়ে পড়েছে।

—ওর মনটা ভাল নেই স্যার।

—কেন কেন!

—দেশ থেকে চিঠি আসেনি।

—স্যাড!

—খুব স্যাড। সবার চিঠি এসেছে, চিঠি না এলে কেমন লাগে বলুন!

—খুব খারাপ! খুব খারাপ! তবে তার জন্য মন খারাপ করার কি আছে।

—খুব মন খারাপ করে সন্ধ্যার দিকে চুপচাপ শুয়েছিল। কারো সঙ্গে কোন কথাবার্তা না। যখন খুঁজে বের করলাম তখন দেখি মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়ে কাঁদছে।

ছোটবাবু এবার আর সাড়া না দিয়ে পারল না। মৈত্রদা ওকে সেকেণ্ডের কাছে একেবারে বালকের সামিল করে ফেলেছে। ওর খুব এতে অহঙ্কারে লাগে। সে উঠে বসল, কম্বল গা থেকে ফেলে বলল, না স্যার, আমি কাঁদিনি। ও বেশি বেশি আপনাকে বলছে।

—তা ঠিক আছে, তুমি যখন কাঁদোনি, ভালো করেছ। জাহাজিরা চোখের জল ফেলে না। ওরা এত বেশি লোনা জল ঘাটে, চোখের জলে সেটা পোষায় না। তোমাকে যা বলছিলাম, তুমি যাবে ওপরে?

—কোথায় স্যার?

—এই জেটিতে একটু ঘুরে আসব।

প্রস্তাবটা মন্দ না। সে বলল, চলুন।

আসলে ছোটর গরম জামাকাপড় কিছু নেই। মৈত্র বলল, আমার সোয়েটারটা গায়ে দে। না হলে ঠাণ্ডা লেগে যাবে। মৈত্র ওর লকার খুলে বেশ ভাল সোয়েটার ঘি ঘি রঙের বের করে দিল। ভীষণ ঢোলা। এবং মৈত্রের প্যান্ট, আরও ঢোলা, তবু শীত মানবে ভেবে ছোটবাবু এসব পরে সেকেণ্ডের সঙ্গে জেটিতে নেমে গেল এবং সত্যি আরাম, আশ্চর্য আরাম। ওরা রেল-ইয়ার্ড পার হয়ে সামনের ইকাগে। রেস্তোরাঁতে বসে গেল—তুমি কি খাবে?

—কিছু না স্যার।

—আরে খাও। নতুন এয়েছ, দ্যাখো না খেয়ে! যাবে একদিন?

—কোথায় স্যার?

—কার্ণিভেলে।

—সেটা কোথায়?

—বুয়েনস এয়ার্সে। ও কি সব ব্যাপার। তোমার মনে হবে, সে একটা ব্যাপার। যাকগে, ড্রিঙ্কসের অর্ডার দিচ্ছি।

ছোটবাবুর আশ্চর্য মনে হল মেজকে। সে এতটা কখনও প্রত্যাশা করে না। ওরা সাহেবসুবো মানুষ। সে সবচেয়ে নিম্নতম মজুরিতে কাজ করে—ওর সঙ্গে মেজ-মালোমের সহৃদয় ব্যবহার কেবল কষ্টদায়ক ঘটনা। মেজ-মালোমকে মনে হয় দার্শনিক, কখনও মনে হয় হিসেবী, আবার কখনও লুচ্চা। এখন কি মনে হচ্ছে সে ভেবে পাচ্ছে না। সে বয়সে ছোট বলে, মসৃণ গাল মসৃণ দাড়ির ভেতর আশ্চর্য একটা লোভ এই সব জাহাজিদের থেকে যেতে পারে। এবং সেটা কতদূর পর্যন্ত গড়াবে সে বুঝতে পারে না, সে অনেক ভেবে বলল, না স্যার। আমি ড্রিঙ্ক করি না।

—তবে কফি খাও। খাবার কি খাবে?

—কিছু না স্যার। এক কাপ কফিই যথেষ্ট!

মেজ পর পর পেগ-পাঁচেক খেয়ে ফেলার সময় দূরে রেল-ইয়ার্ডের পাশে বড়-মিস্ত্রির গলা পাওয়া গেল। খুব বচসা করছে কারো সঙ্গে।

—তুমি শালা ইণ্ডিয়ান, দালাল, কিচ্ছু জান না, এখানে আমাকে বাজারের মাগি চেনাতে এসেছ!

কেউ তখন হেঁকে বলছে, আপনি স্যার ভুল করছেন, আমি দালাল নই। বাজারের সেরা মাগি খুঁজে বের করা আমার পেশা না।

রেল ইয়ার্ডে আলো কম। বেশ দূরে দূরে বাতির থাম। গাড়ি সান্টিঙের শব্দ আসছে। কখনও জেটির পাশ দিয়ে টংলিং টংলিং শব্দ করতে করতে একটা মালগাড়ি যেন সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে। অন্ধকারে ঠিক বোঝা যায় না। কেবল বোঝা যায়, আর একটু এগিয়ে গেলেই সমুদ্র। বড়-মিস্ত্রি খুব আজ বেকায়দায় পড়ে গেছে।

আসলে ব্যাপারটা ছিল অন্য রকমের। অমিয় চুপি চুপি বের হয়ে যাচ্ছিল! ওর ইচ্ছা ছিল বড় মিস্ত্রি নেমে গেলেই সে নেমে যাবে। সে গ্যাঙওয়ে থেকে যখন দেখল বড়-মিস্ত্রি, রেল-ইয়ার্ডের ভিতর ঢুকে গেছে, তখন সে নিজেও নেমে গেল। সে এখানে একটু হেঁটে বেড়িয়ে

দেখবে, এমন তার আশা। বড়-মিস্ত্রি খুঁড়িয়ে হাঁটে বলে সময় লাগে। অমিয় যেতে যেতে তখন দেখছে, কেউ অন্ধকারে তার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। যদিও এটাকে ঠিক অন্ধকার বলা যায় না, কম আলো, অস্পষ্ট আলোতে সে বুঝতে পারছে না, কে দাঁড়িয়ে আছে। সে পাশ কাটিয়ে চলে যাবে ভাবছিল, কিন্তু কেউ তাকে ডাকছে। হাত তুলে ডাকছে।

বড়-মিস্ত্রির মনে হয়েছিল, জাহাজ থেকে নামার পরই কেউ যেন তাকে অনুসরণ করছে। সে এসব দেশের দালালদের চেনে। ভীষণ টাকার খাঁকতি বেটাদের। জাহাজ এসে নোঙর ফেলেছে, এখন মৌকা, ওঁত পেতে আছে। কে নামছে, কেউ নামলেই সঠিক জায়গায় পৌঁছে দেওয়া। আরে বাপু আমাকে শহরের পথঘাট চেনাবে, বাজারের কে কেমন আছে জানাবে। আমি তো সব জানি! মিলড্রেড কি চিঠি পায়নি তাহলে! চিঠি পেলে সে তো না এসে থাকার মেয়ে নয়! সে তো অন্য সময়ে ঠিক জাহাজ বাঁধার আগেই জাহাজঘাটায় এসে দাঁড়িয়ে থাকে। যেন কত সে নিজের মানুষ! যেন বহুদিন সফর শেষে তার মানুষ ঘরে ফিরছে। বড়-মিস্ত্রি এ সব ভেবে সুখ পায়। মিলড্রেড যতই টাকা নিক, তাতে ওর কোন দুঃখ থাকে না।

সে ভেবেছিল, ইণ্ডিয়ান মার্কেটের দিকে যাবে, না পর্তুগীজদের যে বড় গীর্জা আছে, সেখানে, এবং প্রতি রোববারে যে মেলার মতো বসে জায়গাটা, সেখানে যাবে। সেখানে গেলে সে অনেক দিন আগের এসিকে পেয়ে যেতে পারে। কিন্তু সেই গীর্জায় যাবার পথটা এতদিন পর ভুলে গেছে। ওর হাঁটতে হাঁটতে মনে হয়েছিল, মিলড্রেড জাহাজঘাটায় না এসে অপমান করেছে। সে মিলড্রেডের সঙ্গে আর সম্পর্কে রাখবে না। সে আবার পুরোনো ঘরেই যাবে। পূরোনো জিনিস দামে সস্তা আর শরীরের পক্ষে উপকারী। প্রায় পুরোনো টনিকের মতো, অথবা পুরোনো মদের মতো।

সে অনুসরণকারী লোকটার জন্য অপেক্ষা করল। দালাল মানুষেরা সব খবর রাখে। সে ওদের কাছে ঠিক খবরাখবর পেয়ে যাবে। সে ডাকল। কিন্তু লোকটা আসছে না দেখে, সে হাত তুলে ডাকতে ডাকতে ছুটে গেল।

অমিয় কাছে এলে বুঝতে পেরেছিল বড়-মিস্ত্রি। সে খুব থতমত খেয়ে গেছে। সে বলল, আমি স্যার!

বড়-মিস্ত্রি বলল, ঠিক, ঠিক আছে। তুমি যে দালাল নও বুঝি। দালাল হলেও তেমন লজ্জার কি আছে, তোমার সেজন্য ভয় নেই। বলছিলাম, একটু চার্চের দিকে যাব। তুমি আমার সঙ্গে আসতে

পার।

অমিয় বুঝতে পারল না এমন কেন বলছে! চার্চ কোথায়, কি ব্যাপার সে কিচ্ছু জানে না। সে বলল স্যার চার্চ!

—হ্যাঁ বুঝেছি নেকা সাজতে চাও। তোমরা যারা ইণ্ডিয়ান এখানে থাক কেন যে পর্তুগীজ সরকার রেখেছে বুঝি না। ঠেঙ্গিয়ে সমুদ্রের ওপারে দিয়ে আসতে পারে না। এত মিথ্যা কথা তোমরা বলতে পার!

অমিয় বুঝতে পারল, সে যে একই জাহাজের জাহাজি বড়-মিস্ত্রি স্বপ্নেও ভাবেনি। বড়-মিস্ত্রি কেবিন থেকে বের হয় না। তার সঙ্গে জাহাজের ক্রুদের কোন সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক মেজ-মিস্ত্রির সঙ্গে সারেঙের। সারেঙের আদেশ মতো সব কাজগুলো হয়। সুতরাং অমিয়র মাথায় দুষ্টবুদ্ধি খেলে গেল। সে বলল, স্যার আপনি মহামান্য।

—তুমি মহামান্য আর প্রিন্স অফ ওয়েলস যাই বলে আমাকে সম্বোধন কর না কেন, তাতে একটা পয়সা বেশি পাবে না।

অমিয় বলল, চলুন স্যার গীর্জার দিকে।

—সেই ভাল।

—স্যার আমি কিন্তু মেয়েদের পাড়ায় আপনাকে নিয়ে যেতে পারব না।

—গুলি মার। এসির ঘর আমার জানা আছে। সেখানে আমি যাব। তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।

বড়-মিস্ত্রি মনে মনে খুব হাসল। বিদেশে কি করে চলতে হয় সে জানে। এদের কাছে কখনও অজ্ঞতা প্রকাশ করতে নেই। তাহলে এমন সব জায়গায় নিয়ে যাবে, যে আর জাহাজে সময় মতো ফেরা যাবে না। জলের মতো টাকা খরচ করিয়ে দেবে! সুতরাং যেন সেই নিয়ে যাচ্ছে দালাল মানুষটাকে কেবল যেন সঙ্গে একজন লোক থাকলে ভাল, লোক থাকলে সে ভয় পাবে না, মুখ দেখলে সে চিনতে পারে মাল কেমন, অমিয়কে বড়-মিস্ত্রি সেভাবে সঙ্গে নিয়েছে।

বড়-মিস্ত্রি যেতে যেতে বলল, মিলড্রেড কেন যে এল না!

কাল সকালে জাহাজ ছেড়ে দেবে। জাহাজ ছেড়ে দিলে, এ-জীবনে আর মিলড্রেডের সঙ্গে দেখা নাও হতে পারে। তাছাড়া ওকে দেখে বড়-মিস্ত্রি মনে রেখে দেবে না, হয়তো আট-দশ মাস সফরে কি বছরের ওপর হয়ে গেলেও একদিনও না দেখা হতে পারে—আবার দেখা হলেও, অন্ধকারে কাকে দেখেছিল মনে রাখতে পারবে না। সে খুব বিজ্ঞের মতো বলল, না স্যার মিলড্রেডের দোষ নেই। ওরা এখানকার বাস তুলে দিয়েছে।

—তুলে দিয়েছে!

—হ্যাঁ স্যার। আর টাকা-পয়সা হচ্ছিল না। ওরা আরও পশ্চিমে চলে গেছে।

—আমাকে একবার খবর দিতে পারল না! ছিঃ ছিঃ, কি যে করে, তারপর সে দাঁড়াল। টুপিটা মাথা থেকে খুলে আবার ঠিক করে পরল। যেন সে মিলড্রেডকে আর দেখতে পাবে না ভেবে কাতর হয়ে পড়েছে।

—না এটা মিলড্রেডের ভীষণ অন্যায়। ভীষণ। সে আমাকে চিঠিতে অন্তত টাকার কথা লিখতে পারত।

—আমি স্যার দেখা হলে বলে দেব।

—তোমার সঙ্গে দেখা হবে?

—তা হবে না!

—এখানে কত ইণ্ডিয়ান আছে?

—তা বেশ, প্রায় চারভাগের একভাগ আমরা।

—ওকে দেখা হলে বলবে তো, আমি ভীষণ দুঃখিত, কেন ও আমাকে চিঠি না দিয়ে পশ্চিমে চলে গেল। ওকে বলবে, কেন—কেন চলে গেল!

অমিয় আড়ালে মুচকি হেসে বলল, বলব স্যার।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে বেশ শহরের ভিতরে ঢুকে গেছে। এদিকটায় কিছু ঘিঞ্জি বস্তির মতো। নিগ্রো বালক-বালিকার মুখ, যুবতীরা হেঁটে বেড়াচ্ছে, কোথাও সিংহের ছবি, কোথাও আদিবাসী রমণীর পোশাকে স্বল্পতা। আর বন্য লতায়-পাতায় ওরা শরীর ঢেকে কেউ কেউ হেঁটে চলে গেল। যেন একটা আদিমতা এ-অঞ্চলে এখনও আছে। বলতে কি নিগ্রো যুবতীদের দেখে অমিয়র ভীষণ ভয় করছিল। সে প্রায় বড়-মিস্ত্রির গা ঘেঁষে হাঁটছে। সে কিছুই চেনে না, আসলে বড়-মিস্ত্রি যেখানে যেখানে যাবে, সেও তার সঙ্গে সেখানে সেখানে যাবে বড়-মিস্ত্রি এমনই চাইছে। এবং বড় মিস্ত্রি হাঁটতে হাঁটতে কেমন একসময় বলল, এস একটু বসি কোথাও।

—আপনি যে এসির ঘরে যাবেন বলেছিলেন?

—ধুস্ এসি! মিলড্রেডের জন্য মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল।

অমিয় দেখল, বড় মিস্ত্রি হেলায়-ফেলায় টাকা খরচ করতে পারে। জাহাজ বেঁধে ফেলার আগেই কোথা থেকে সে যে এত পয়সা পেল বুঝতে পারছে না। বেশ খেয়ে কেমন ঝিম মেরে থাকল কিছুক্ষণ, তারপর অমিয়র দিকে তাকিয়ে বলল, এই যে ইণ্ডিয়ান, তুমি ভালো, খুব ভালো। তুমি আমার জন্য যা করলে কোনদিন ভুলতে পারব না।

অমিয় বলল, তবে চলুন স্যার জাহাজঘাটায় পৌঁছে দিয়ে আসি।

—একটা ট্যাকসি দ্যাখো পাও কিনা!

অমিয় ট্যাকসি ডেকে বড়কে বসিয়ে দিল। এবং রেল-ইয়ার্ডে ঢুকেই বলল এবারে আপনি যান স্যার। কাল আছেন তো। কাল আবার দেখা হবে।

এখানেই গণ্ডগোলটা বেঁধে গেল। দুজনেই মাতাল। তবে অমিয় খায়নি বেশি। সে এ-ব্যাপারটা দেশে বেশ রপ্ত করেছিল, এবং এজন্য ওর দাদাদের সঙ্গে বনিবনা হত না। লেখাপড়া হল না। ওকে ওর বাবা মিশনারি স্কুলে পড়িয়েছিল, এখন একেবারে বেহেড মাতালের ভূমিকায় অভিনয় করা ঠিক না। সে তার মায়ের কাছে সব সময় নির্দোষ থাকতে চেয়েছে, কারণ তার মা তাকে শেষ পর্যন্ত ঘৃণা করত না। এমন কি আসার সময় শুকনো খাবার মুড়িমোয়া সব করে দিয়েছিল, সে এভাবে জানে কি করে মানুষের অন্তরে ঢুকে যেতে হয়। কেবল লীলাবৌদি, রমাবৌদির ভেতর সে ঢুকে যেতে পারেনি। ওদের তাড়নাতে সে শেষপর্যন্ত বাড়ি ছেড়েছে। বাড়িতে সে একদণ্ড থাকতে পারত না। সে এখন দাঁত-মুখ কেমন শক্ত করে ফেলল এবং বাজারে-মাগি মিলড্রেডকে মনে হয় না, নিজের বৌদিদের সম্পর্কে সে এই কটূক্তি করতে ভালবাসে! বাজারে-মাগিদের মুখ যেন এর চেয়ে বেশি ভাল হয়।

বড়-মিস্ত্রি বলল, আমাকে তুমি কোথায় নিয়ে এসেছ?

—এই তো স্যার, রেল-ইয়ার্ড, ডানদিকে কয়লার সুট। দেখুন না, কয়লা কেমন জাহাজের বাংকারে ঢুকে যাচ্ছে। সামনেই তো আপনার জাহাজ—এস-এস সিউল ব্যাঙ্ক লেখা।

—এটা চেসটনের রাস্তা, না?

—না স্যার। এটা বন্দরের রাস্তা। আপনার জাহাজে উঠে যাবার রাস্তা।

বড় মিস্ত্রি ট্যাকসি থেকে নামছে না।—কিন্তু আমার যে মিলড্রেডের কাছে যাবার কথা।

–সে তো নেই স্যার।

–নেই? কেন নেই? এবার সাঁ করে দরজা খুলে বের হয়ে এল। আলবৎ সে থাকবে। তুমি অন্য মেয়েদের কাছে নিয়ে যাবার জান্য দালালি করছ।

—তা না স্যার। সত্যি বলছি।

—দালালেরা আবার সত্যি কথা বলে! বলে তিনি সামান্য হাসলেন। তারপর ক্রাচের ওপর ভর করে মাথাটা কেমন নুইয়ে দিলেন।—কি সুন্দর রাত! মিলড্রেড পশ্চিমে গেছে। আমি শালা কাল জাহাজ ছেড়ে পশ্চিমে চলে যাব।—তুমি শয়তান, আস্ত শয়তান। তোমার জন্য আমার মিলড্রেডের সঙ্গে দেখা হল না। বলে বড়-মিস্ত্রি ক্রাচে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে দুঃখী মানুষের মতো মুখ করে রাখল।

অমিয় দেখল, খুব বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। এখন পালানো দরকার। অন্য কেউ নেমে এলেই ওকে চিনে ফেলবে। জাহাজ সামনে। ফার্লঙের মতো পথ। সে এখন অন্য পথে জাহাজে উঠে যাবে। আগে ওঠাই নিরাপদ। সে রেল-ইয়ার্ড ধরে হাঁটতে থাকল। এবং শোনা যাচ্ছে বড়-মিস্ত্রি এবার জোরে জোরে চিৎকার করছে—তুমি বাস্টার্ড ইণ্ডিয়ান, দালাল, কিচ্ছু জন না, এখানে আমাকে বাজারের মাগি চেনাতে এয়েছ!

অমিয় তখন দূর থেকে হেঁকে বলছে, আপনি স্যার ভুল করছেন, আমি দালাল নই। বাজারে মাগি খুঁজে বের করা আমার পেশা না।

—তুমি সৎ, তুমি ভালো, শুয়ারকা বাচ্চা। বেজন্মা, ইতর।

মেজ-মালোম এবং ছোটবাবু তখন ফিরছিল জাহাজঘাটার দিকে। দেখল একা একটা ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে বড়-মিস্ত্রি। আর টলছে। মুখ টুপিতে ঢাকা। মেজ-মালোম জানে বন্দর এলে বড়-মিস্ত্রি জাহাজে থাকে না। তার বাঁধা ঘর আছে। ওরা এসে ওকে নিয়ে যায়। সেই যৌবনের প্রথম থেকে কাজ করতে করতে এটা হয়েছে। অথচ বড় আজ এখানে একা। সে বলল, স্যার আপনি?

—তুমি কে হে?

—আমি সেকেণ্ড অফিসার ডেবিড় ম্যাকমবার

—ডেবিড়!

—হ্যাঁ স্যার।

—তুমি জাহাজে ফিরছ?

—হ্যাঁ স্যার।

—সঙ্গে কে আছে?

—আমাদের ছোটবাবু।

—ছোটবাবু! সে ভ্রু কোঁচকালো।

—জাহাজেই কাজ করে।

বড়-মিস্ত্রি ভেবেছিল, মেজকে সব ভেঙে বলবে। এক শয়তান ইণ্ডিয়ানের পাল্লায় পড়ে সে আজ যথাসর্বস্ব খুইয়েছে। তার যা ছিল সঙ্গে ট্যাকসিতে টিপসে গেছে। বড়-মিস্ত্রি যে এক সময় খুশি হয়ে অমিয়কে জেব খালি করে দিয়েছিল সে-সব আর মনে নেই। তার কিছু নেই। একেবারে খালি। চোট্টা ইণ্ডিয়ানটারই কাজ। অথচ আর একজন ইণ্ডিয়ান সেকেণ্ডের পাশে রয়েছে। তাছাড়া রুচি টুচির বালাই বলতে সেকেণ্ডের কিছু নেই। বড়-মিস্ত্রি নানাদিক ভেবে সব চেপে গেল। তারপর ওদের সঙ্গে টলতে টলতে হাঁটতে থাকল। যেন সে জেটিতে নেমে এসেছিল একটু হাওয়া খেতে। ওকে দেখলে এখন তার চেয়ে বেশি কিছু মনে হয় না।

বড়-মিস্ত্রি এবার গ্যাঙওয়ের নিচে এসে দাঁড়াল। সেকেণ্ডের মনে হল বড় উঠতে পারবে না। নিজেও তেমন শক্ত নয়। ছোট এখন সাহায্য করতে পারে। কিন্তু ছোট ওকে ধরতে গেলে অপমান বোধ করতে পারে। সেজন্যে সে নিজে উঠে গেল একা। কোয়ার্টার মাস্টারকে ইশারা করল হাতে এবং কাছে এলে বড়-মিস্ত্রিকে ধরে তুলে আনতে বলে কেবিনের দিকে হেঁটে গেল!

বড়-মিস্ত্রি নিজের কেবিনের কাছে এসে দেখল দরজা বন্ধ। সে ভেবে পেল না ওর কেবিনে কে এখন থাকতে পারে। দরজায় সে টোকা মারল। কেউ দরজা খুলছে না। বেশ জোরে ধাক্কা মারতেই সে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। আর ভেতরে একেবারে তাজা এক মেয়ে।

সে প্রথমটায় ভূত দেখার মতো উঠে দাঁড়াল। ওর সামনে মিলড্রেড।

—তুমি!

—তোমার তো কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই রিচার্ড?

রিচার্ড একটু ঘাবড়ে গেল। সে খোঁড়াচ্ছিল। সে তার স্বভাবে সেটা স্বীকার করবে না। মিলড্রেড ধরতে গেলে হাত সরিয়ে ঠিকঠাক হয়ে বসে বলল, বুঝতে পারছি না।

—বুঝতে পারছো না মানে।

—মানে, তুমি, কি করে তুমি!

—আমি ঠিকই আমি। জাহাজ একদিন আগে আসবে কে জানত।

—কি করে খবর পেলে।

—সকালে কাগজে দেখলাম। তোমার জাহাজ ভিড়ছে। সাত তাড়াতাড়ি আসা যায় না। সিটি কোম্পানির থার্ড অফিসার এসেছে। ওর সঙ্গে এপয়েন্টমেন্ট। ওটা শেষ করে আসতে দেরি হল।

—দাঁড়াও দাঁড়াও। হড়বড় করবে না। ভেবে দেখছি। সে ভাবতে থাকলে মিলড্রেড বলল, রাখো তোমার ভাবনা। এখন কি বের হবে?

—শরীর ঠিক নেই মিলড্রেড। দরজা বন্ধ করে দাও। এবং এভাবে রিচার্ড কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসে থাকল। মিলড্রেড তাড়াতাড়ি তেমন সেজে আসতে পারেনি অথবা শরীরে ধকলের চিহ্ন, মিলড্রেডের পায়ে সাদা মোজা লতাপাতা আঁকা সিল্কের গাউন। সে বাঙ্কে শুয়ে পড়ল। যেন সেও আর পারছে না। পোর্টহোল দিয়ে নীল একটা আলো এসে পড়ছিল, পোর্টহোলের কাচ বন্ধ করে পর্দা টেনে দিল রিচার্ড। তারপর সংক্রামক ব্যাধির মতো একটার পর একটা ঘটনা। সেই ইন্ডিয়ানটাকে গালাগাল। সে আর কিছু বলছিল না মুখে। ওর জাহাজি খিস্তি যা জমা আছে একটার পর একটা এবং এভাবে একটা সে মজা পেয়ে যায়। ঘরের নীল আলো নিভে গেলে ওর মনে হয় একা হাঁটছে এবং এক বাগার ইন্ডিয়ান ওর পেছনে ছুটছে তাকে ধরার জন্য।

সে মিলড্রেডকে বলল, আবার হাতের কাছে পেলে হয়। তারপর শুনতে পায় বাংকারে হড়হড় করে কয়লা নামছে। কি সাংঘাতিক শব্দ। জাহাজ কাল ছাড়ছে। রাতে রাতে বাংকার ভরে যাবে। সকালে জাহাজ ছেড়ে দিলে আবার কবে এই তাজা মেয়ের সঙ্গে শুতে পারবে জানে না। সে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাল প্রথমে ঈশ্বরকে, তারপর সেকেন্ডকে। সেকেন্ড ওকে না ডাকলে সে হয়ত আর একবার চেষ্টা করত এসির ঘরে যাওয়া যায় কিনা। তারপর ওর ধন্যবাদের পালা, সেই ইন্ডিয়ানটিকে। সে তার জেব সাফ না করে দিলে, ঠিক চলে যেত। যে-ভাবেই হোক এসির কাছে চলে যেত। এখন আর ইন্ডিয়ান দালালকে খচ্চর মনে হচ্ছে না, সে ভীষণ তার পক্ষে উপকারী। আবার দেখা হলে ধন্যবাদ না জানিয়ে তাকে পারবে না। খুব আপশোস এখন তার হাতের কাছে সে নেই।

॥ সাত ॥

রাত থাকতেই জাহাজ নোঙর তুলেছে। ডেবিডের ওয়াচ আটটা বারোটা। কিন্তু জাহাজ নোঙর তুলেছে বলে, শেষ রাতের দিকে পিছিলে হাড়িয়া হাফিজ করতে হয়েছে তাকে। জাহাজ নোঙর তুলে সমুদ্রে না পড়া পর্যন্ত সে ডেকে বসেছিল। কেবিনে ফিরে গিয়ে সে ঘুমোবার আর চেষ্টা করেনি।

এটা ওর স্বভাব। কিনারায় জাহাজ ভিড়লেই তার আর ঘুম আসে না। যতক্ষণ সমুদ্রে জাহাজ ভেসে না যায়, সে বসে থাকে চুপচাপ। মাথার ওপর আকাশ থাকে। আকাশের অজস্র তারা ক্রমে কেমন অনুজ্জ্বল হয়ে যায়। চারপাশে এক আশ্চর্য নিস্তব্ধতা থাকে। এনজিনের শব্দ বাদে আর কিছু তখন কানে আসে না। স্টোক-হোলডে স্লাইস অথবা র‍্যাগের শব্দ। বেলচায় কয়লা মারার শব্দ। আর কিছু কানে আসে না। সমুদ্রের কিনারায় গাছপালাও ক্রমে চোখের ওপর থেকে সরে যায়। পৃথিবীর সব বন্দরে সে এ-ভাবে বসে থাকে। স্ত্রী এবির কথা মনে হয়। ছেলে-মেয়ের মুখ ভেসে ওঠে। ওরা ওকে প্রত্যেকে একটা করে চিঠি দেয়। চিঠিতে ওদের নানা বায়নাক্কা থাকে। বউ নানাভাবে লেখে তুমি চিন্তা কর না, আমরা ভাল আছি। তখন মনে হয় এবির চোখ দুটো তেমন সুন্দর নয়। চুল সোনালি, এবি ভারী সংসারী মেয়ে। এত ভাল যে মাঝে মাঝে এবিকে খুব একঘেয়ে লাগে। সে তার ছেলেপিলে সংসার বাদে আর কিছু জানে না।

এবি নিজেও একটা কাজ করে। স্কুলে সে শিক্ষকতা করছে সেই কবে থেকে। দুজনের রোজগারে ওরা ডলফিনে বেশ সুন্দর ছিমছাম একটা বাড়ি করেছে। খুব শখ হে-ঘাসের ভেতর দিয়ে এবির হেঁটে যাবার। সূর্য উঠলে এবিকে সে কখনও দৌড়াতে দেখেনি। ওর ইচ্ছা হত, সূর্য উঠলে সে এবিকে নিয়ে হে-ঘাসের ভেতর দৌড়াবে।

এবি সবসময় কাজকর্মে ব্যস্ত থাকতে চায়। সে বেশি হৈ-চৈ পছন্দ করে না। চার্চে প্রতি রবিবার তার যাওয়া চাই। খুব ধর্মভীরু এবি! এতটা ধর্মভীরু যে মাঝে মাঝে ডেবিডের এবির ঈশ্বর সম্পর্কে খুব ঠাট্টা করতে ইচ্ছে হয়। খুব রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে। ক্যাথলিক এবং আচার-আচরণে আন্তরিক। এমন আন্তরিকতাও ডেবিডের খুব পছন্দ না। বৌ একটু ছলনা করবে না, একটু চাতুরি খেলবে না, একেবারে সতীসাধ্বী হয়ে থাকবে ভাবতে তার ভারি খারাপ লাগে। সমুদ্র থেকে ঘুরে গেলে ওর মনে হয় সে এবির প্রতি নানাভাবে অবিশ্বাসের কাজ করেছে। এবি যদি সামান্য অবিশ্বাসের কাজ করত তবে বোধ হয় তার এতটা অনুতাপ থাকত না।

কিনার সরে গেলেই সে ভাবে ধার্মিক হবে। স্ত্রীর প্রতি আন্তরিক হবে, কিন্তু কিনারায় গেলে কিচ্ছু তখন মনে থাকে না। কেবল একটা মুখ ভাসে, দূরবীনে সে এবির মুখ আর দেখতে পায় না। যেন এক পাখি নিরন্তর উড়ছে, সেটা যে কি, কেন ওড়ে, কেন সমুদ্রে ছায়া ফেলে যায়, দিগন্তরেখায় অদৃশ্য হয়ে গেলে কিছু ভাল লাগে না। সব গাছপালা দ্বীপ তখন কেন যে এত মনোরম লাগে সে বুঝতে পারে না। সে আজও বসেছিল, যতক্ষণ কিনার দেখা গেছে, চোখে দূরবীন। কাল তার ভারি ইচ্ছে ছিল কোথাও ঠিকানা খুঁজে যাবার, কিন্তু ছোটবাবুকে সঙ্গে নিয়ে সে যেন ভুল করে ফেলেছিল। আসলে সে চায় আন্তরিক থাকতে। একজন পাহারাদারের কাজ করবে ছোটবাবু। ছোকরা সে। ভেতরে এখনও রক্ত ততটা দামাল নয়। কিছুটা সন্ত মানুষের মতো লাগে। সে এখন ভাবছে ছোটকে সঙ্গে না নিয়ে বের হলেই ভাল হত। বড়-মিস্ত্রির মতো তবে একটা ঘরের খোঁজে যাওয়া যেত।

আসলে, রাতে জাহাজে কেউ ছিল না। কাপ্তান, চিফ-অফিসার, জ্যাক বাদে সবাই নেমে গেছিল। ক্রুদের ভেতর থেকেও কেউ কেউ নেমে গেছে। শেষ পর্যন্ত বড়-মিস্ত্রি মিলড্রেডকে নিয়ে কেবিনেই রাত কাটিয়েছে। এতটা অবশ্য ওর ভাল লাগে না। নির্লজ্জের মতো সে এটা এখনও করতে পারে না। কিনার চলে গেলেই ওর মায়া হয় গাছপালার জন্য। এবার সে

ভেবেছে সামনের বন্দরে ঠিক নামবে। যে-ভাবে হোক, কারণ এই প্রায় মাস দুই হল সে জাহাজে উঠে এসেছে, জাহাজটা পুরানো বলে বেশিদিন একনাগাড়ে কাজ করা যায় না। অনেকে অসুখে পড়ে যায়। সে সিঙ্গাপুরে উঠেছে। সে, বড়-মিস্ত্রি, মেজ মিস্ত্রি। জাহাজ হোমে গেলে সে নেমে যেতে পারবে না। ব্যাঙ্ক লাইনের সফরে বেশিদিন থাকার নিয়ম। পাঁচ-সাত মাসে নেমে গেলে, কোম্পানি সুনজরে দেখে না। যদিও সে যতটা জানে জাহাজ বুয়েন-এয়ার্স থেকে ব্রাজিলের ভিকটোরিয়া বন্দরে, তারপর সোজা কার্ডিফে। যদি জাহাজ ড্রাইডক হয় তবে বেশ কিছুদিন এবির সঙ্গে কাটাতে পারবে। ওর ভারি ইচ্ছে তখন এবিকে নিয়ে হে-ঘাসের ভেতর কেবল লুকোচুরি খেলবে। কিন্তু এবি যেন কেমন, সে এটাকে ভারি অসভ্যতা ভাবে। কখনও কোনও মাঠের ভেতর ঘাসেব ছায়ায় এবি দূরবীনে চোখ রাখতে চায় না। ওর ভারি লজ্জা। এই বয়সে এ-সব ওর এতটুকু ভাল লাগে না।

অথচ এবি জানে না, দূরবীনে মেয়েদের ছবি আশ্চর্যভাবে বদলে যায়। সে দেখতে পায় একটা জীবন, হ্যাঁ জীবনই তো যেন সচল আন্তরিক আকাশ ওর কাছে মাথা পেতে রেখেছে। ছুঁয়ে দিলেই ঝর ঝর করে বৃষ্টিপাত হবে। এমনটা না হলে ডেবিডের মন ভরে না। মাঝে মাঝে ডেবিড তখন কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যায়। কোন দ্বীপে বন্যমেয়ের স্নান সে চুরি করে দেখতে ভালবাসে। মানুষের অদিমতা তাকে অত্যন্ত জীবন্ত করে রাখে।

একা একা ডেকে বসে থাকলে কত কিছু এমন মনে হয়। রাতে জাহাজ বাংকার নিয়েছে বলে সারাটা ডেক কয়লার গুঁড়োতে ভরে গেছে। সারাটা ডেক হ্যাচ ডেরিক, বয় কেবিন, লাইফ বোট সব কয়লার ধুলোয় ঢেকে গেছে। হেঁটে গেলে জুতোর ছাপ পড়ছে ডেকে। তার হাঁটতেও ভাল লাগছে না।

ক্যাপ্টেন হিগিনস্ তখন ব্রীজ থেকে বারবারই সমুদ্রে কি যেন উঁকি দিয়ে দেখছেন। কিছু খুলে টুলে গেল নাকি। যা একখানা লক্কড় মার্কা জাহাজ, কখন যে কি হয়! বে-অফ বেঙ্গলে বড় রকমের একটা ঝড়ে পড়েছিল—তারপর তো জাহাজ পাট-রাণীর মতো চলছে। হেলে-দুলে কেবল দক্ষিণ পশ্চিমে এবং ক্রমে দক্ষিণে, কখনও দক্ষিণ-পূর্বও করতে হচ্ছে। স্টিয়ারিং হুইলের সঙ্গে কম্পাসের কাঁটার হিসাব ঠিক রাখা এবং জাহাজ চালানো তেমন কঠিন না। কিন্তু মুশকিল নদীর মতো সমুদ্র কখনও কখনও দামাল হয়ে যায়। কোথাকার স্রোত, কি ভেঙে এনে কোথায় জমা করে এবং কিভাবে চড়া পড়ে যেতে পারে আর তার চড়ায় উঠে গেলে হয়ে গেল। যেতে যেতে এমন যে দুটো একটা ছবি এই যেমন জাহাজ চড়ায় আটকে আছে, অথবা একটা বয়াতে লাল, নীল আলো, অর্থাৎ নিচে অতলে একটা জাহাজ ডুবে আছে, সেখানে এখন সমুদ্র প্রাণীরা নানাবর্ণের লতার ভেতর জলজ ঘাসের ভেতর আস্তানা বানিয়েছে—এমন সব দৃশ্য দেখতে পাওয়া যে না যাবে তা নয়। এ সব দেখলেই পুরোনো জাহাজের ভয়। অবশ্য পুরোনো জাহাজ অনেক সময় পুরোনো টনিকের মতো কাজ করে। ঝড় জলে সে বেশি সময় যুঝতে পারে।

হিগিন্স্ এখন চার্টরুমে ঢুকে যাবেন। ডেবিড এবার সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে গেল। ডেক-জাহাজিরা হোসপাইপে জল মেরে যাচ্ছে ডেকে। টিন্ডাল বোট-ডেকে উঠে সি-ওয়াটার ভালব ঘুরিয়ে দিচ্ছে। নানা জায়গায় নানাভাবে এইসব ভালব্ ছড়িয়ে আছে। যেখানে যেভাবে জলের দরকার ভালব ঘুরিয়ে দিলেই হল। হোসপাইপ লাগিয়ে দিলেই হল। জেনারেল সার্ভিস পাম্প থেকে নানাভাবে সব পাইপ জাহাজের চারপাশে ছড়িয়ে গেছে। এবং এ-জাহাজ পুরোনো বলে, স্টিমএঞ্জিন বলে, সবসময় জাহাজে জলের দরকার বেশি। লম্বা সফরে জল কখনও কখনও ফুরিয়ে যায়। তখন এভাপরেটিঙ করতে হয়। নোনা জল থেকে মিষ্টি জল করে নিতে হয়।

ডেবিড বুঝতে পারে এভাবে এক বিচিত্র জীবন এ জাহাজে থাকলে গড়ে ওঠে। কিনারার প্রতি টান, পরিবারের জন্য মায়া, তারপর দীর্ঘদিন বাদে মনে হয়, সে একজন নিরালম্ব মানুষ, সে আছে এই জাহাজেই, জাহাজেই তার জন্ম, জাহাজেই তার শৈশব, যৌবন এবং বার্ধক্য

এবং এভাবে সে মরে যাবে। তখন মনে হয় না, তার স্ত্রী আছে, ছেলেপুলে আছে, কেবল মনে হয় সে একটা যানে চড়ে ক্রমান্বয়ে সমুদ্র, দ্বীপ এবং পাহাড় অতিক্রম করে পৃথিবীর সব মানুষের ঘরে ঘরে পণ্য পৌঁছে দিচ্ছে। সাংসারিক জীবন, স্ত্রী-পুত্র সব অনেক দূরের মনে হয় তখন। বন্দরে নেমে তখন একটু বেলাল্লাপনা করতে না পারলে ভাল লাগে না। পুরোনো ছবির মতো মেয়েমানুষের শরীর একটা যাদুঘর হয়ে যায়। সে বুঝতে পারে ঠান্ডা, অতি ঠান্ডা কোমরের নিচু অংশটা। কেন যে সেখানে ফুল ফোটার মতো উত্তাপ থাকে না।

ডেবিড ভেবেছিল, এক বিকেলে ছোটবাবুকে নিয়ে বোট-ডেকে বসবে। একটা দ্বীপের পাশ দিয়ে তখন তারা যাবে। দ্বীপটা সোনালি। নানারকমের ক্যাকটাস। ক্যাকটাসগুলো এত বড় যে কখনও ওদের বড় গাছটাছ মনে হয়। এমন সব ক্যাকটাস পৃথিবীর অন্য কোথায় আছে তার জানা নেই। সে তো অন্তত দেখেনি। দূরবীনে এ-সব এত ভাল দেখা যায় যে, মনে হয় সমুদ্রের নীল জল যখন এ-ভাবে এমন একটা দ্বীপকে পৃথিবীর জন্ম থেকে ঘিরে রেখেছে, আর সেই ক্যাকটাস সব ধীরে ধীরে বড় হচ্ছে তখন সেখানে কোন মানুষের পায়ের ছাপ থাকবে না হয় না। কিন্তু সে জানে, এ দ্বীপে মানুষেরা আসেনি। কি হবে, এইসব দ্বীপে শুধু ক্যাকটাস, এবং এত ছোট যে ফার্লঙের মতো বৃত্তাকারে ভেসে আছে। মাটির রঙ সে যতবার যে-ভাবেই দেখেছে, সোনালি এবং ক্যাকটাসগুলো অতি প্রাচীন বলে নীল রঙের। আর সূর্য উঠলে ওর মনে হত পৃথিবীতে প্রথম মানুষ আদম ইভ এখানে বোধ হয় শৈশবে বড় হয়েছে। আদম ইভের পক্ষে এর চেয়ে নির্জন জায়গা খুঁজে পাওয়া মুশকিল। সে দূরবীনে কোনও গিরগিটি দেখেনি, কোনও টিকটিকি দেখেনি। পিঁপড়ে টিপড়ে আছে কিনা, বুঝতে পারে না। কেবল দ্বীপটার চারপাশে নানারকমের শঙ্খের মরা খোল পড়ে আছে। হঠাৎ দেখলে মানুষের মাথার কঙ্কালের মতো মনে হয়। তখন গা'টা শিউরে ওঠে।

কিন্তু সে দেখল, ছোটকে তখন ভীষণ ধমকাচ্ছে মেজ-মিস্ত্রি। ছোট কাজ করছিল ফাইভারের সঙ্গে। ফাইভারকেও খিস্তি করছে। এবং গালাগাল, মুখে যা আসে তাই বলছে। বড় বেশি হামবড়া ভাব এই মেজ-মিস্ত্রি আর্চির। সে জাহাজের এনজিনঘরের সব। দায়িত্ব সব তার। সে জোরে জোরে হাঁকছে—সারেঙ, সারেঙ! ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে হাঁকছে। এবং ওর চিৎকারে জ্যাক পর্যন্ত ছুটে এসেছিল। কাপ্তান চার্টরুমের পোর্টহোল দিয়ে দেখছে, আর্চি ভীষণ মেজাজে কথা বলছে সারেঙের সঙ্গে। সারেঙ আমতা আমতা করছে।

ছোট চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে।

আর্চি চেঁচিয়ে বলছে, এ ছোকরা এখানে কেন? এখানে কেন জবাব দাও।

হঠাৎ মেজ-মিস্ত্রি ক্ষেপে যাবার কারণ সে বুঝতে পারছে না। সে বলল, সারেঙসাব বলেছেন ফাইভারকে একটু হেল্প করতে।

—হেল্‌প, মানে তুমি ফাইভারকে হেল্প করবে! তোমার এত সাহস কোথা থেকে আসে হে ছোকরা! তুমি কি ভেবেছ!

ছোট যথাযথ ইংরেজীতে বিনয়ের সঙ্গে জবাব দিল, আমি কিছু ভাবিনি স্যার।

—মুখের ওপর কথা! কি সাহস! এইসব ছোকরাদের বেজায় সাহস। তুমি কাল কার পারমিশনে জাহাজ থেকে নেমে গেছ?

—কারো না। যাবার সময় সারেঙসাবকে বলে গেছি।

আর্চি বুঝল এখানে তার কিছু করার নেই। নিচে নেবে যাবার অনুমতি সারেঙ অনায়াসে দিতে পারে। সে আবার হেঁকে উঠল, ওহে ছোকরা, শুনে রাখো জাহাজের কাজে নবাবি চলে না।

ছোট বলল, জানি স্যার।

—তুমি জানো! কি জানো! কি জানো, যাও হতভাগা পাজি, নচ্ছার, নিচে যাও। ফাইভার,

এই রাসকেল ফাইভার, তোমার মুখের চামড়া খুলে এবার দেখছি একজোড়া জুতো না বানালে চলছে না। আহম্মক, তুমি হেল্পার নিয়েছ কেন!

—একা পারা যাচ্ছে না সেকেন্ড। দেখুন, কি পুরোনো জং ধরা, মনে হচ্ছে, জাহাজে যারা গত সফরে ছিল, তারা হাতই দেয়নি।

—রাখো তোমার নোংরামো। পরের ঘাড়ে দোষ চাপাবে না। পুরোনো জাহাজে এমন হয়।

—দেখুন স্ট্রেপারগুলো কেমন জ্যাম। দেখুন, বলে সে তেলকালিতে মাখামাখি হয়েও স্ট্রেপারের নাট আলগা করতে পারল না।

আর্চি দেখল, বেশ লম্বা হয়ে ফাইভার ডেক বরাবর উইনচের নিচে ঢুকে গেছে। ওর পা থেকে কোমর পর্যন্ত বাইরে। আর বাকিটা ভেতরে। নাট টেনে জ্যাম ছাড়াতে পারছে না। এ-শীতেও সে ঘামছে। এবার আর্চি খুব জোরে ফাইভারের পায়ের ওপর চাপ দিল। –আঃ একটা চিৎকার। টানো। এবং সঙ্গে সঙ্গে নাট-বোল্ট আলগা হয়ে গেল। এমন একটা নির্যাতনের ভেতর আর্চির নিষ্ঠুরতার যেন শেষ থাকে না। জাহাজ ডারবান যাচ্ছে! সেখানে কিছু পাটের গাট নামানো হবে। কিছু চায়ের পেটি। ডেরিকগুলো ঠিকঠাক, এবং উইনচগুলো সব চালু করে নিতে না পারলে মেজ-মিস্ত্রি আর্চির বদনাম হয়ে যাবে।

অথচ ছোটবাবু জানে মেজ মিস্ত্রি আগেও দেখেছে, সে ফাইভারের সঙ্গে কাজ করছে। কাল বড়- মিস্ত্রি ওকে মেজ-মালোমের সঙ্গে দেখেছে। সে জাহাজে কি কাজ করে হয়ত এমন খবর নিয়েছে। আর একটা রাগ তো পুষেই রেখেছে মেজ-মিস্ত্রি! এখন বড়-মিস্ত্রি পাশে থাকলে ঝাল মেটাতে সময় লাগবে না। সে মেজ-মিস্ত্রির এমন ব্যবহারে অবাক হল না। কেবল বলল, স্যার, আমি কোথায় কাজ করব।

সামান্য কোলবয়ের সোজাসুজি মেজ-মিস্ত্রির সঙ্গে কথা বলার এক্তিয়ার নেই। এসব বেয়াদপী সে সহ্য করতে পারে না। সে গম্ভীর হয়ে যায়। সারেঙকে শুধু কি বলে দিল। মেজ-মিস্ত্রির দায় নেই ছোটকে সোজাসুজি কিছু বলার। এবং এই যে সোজাসুজি ছোট জিজ্ঞাসা করল, এতে অপমান, ভীষণ অহংকারে লাগে। আগে এসব জাহাজে ছিল না। আগে যারা আসত, ওরা সবাই প্রায় যেন ক্রীতদাসের সামিল। একটা কথাও বুঝত না। সারেঙ সব কাজ বুঝে নিত, তারপর সে সবাইকে দিয়ে কাজগুলো করাত। এখন এরা নতুন উঠে আসছে। কেউ কেউ বেশ সুন্দর ইংরাজিতে কথাবার্তাও বলতে পারে। আর কি যে এরা ভাবে, একটু ইংরেজিতে কথাবার্তা বলতে পারলেই, যথাযথ বলেছে ভেবে ফেলার চেষ্টা করে। আর্চি তখন মনে মনে না হেসে পারে না।

আর্চির গালাগাল ছোটকে ভীষণ কাবু করে দিয়েছে। আবার জ্যাক মাথার ওপর বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে সব শুনছে। জ্যাক কাছে না থাকলে সে যেন এতটা অপমানিত বোধ করত না। সে জ্যাকের দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারল না পর্যন্ত। চুপচাপ সারেঙের পিছু পিছু এনজিনরুমের দরজায় ঢুকে গেল। লোহার জালিতে হেঁটে গেলেই সামনে সোজা সিঁড়ি নেমে গেছে। সে সিঁড়ির দু'রডে হাত রেখে শরীর সোজা ছেড়ে দিয়ে নেমে গেল না আজ। ধীরে ধীরে কোন কারাগারে বন্দী মানুষের মতো হেঁটে গেল। আর্চি যেভাবে পেছনে লেগেছে, আজ হোক কাল হোক সে একটা হয়তো কিছু করে ফেলতে পারে। ছোটবাবু ভেতর ভেতর কেমন সহসা অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। তখন সারেঙ বললেন, ওদিকে না। এদিকে।

ছোট, জেনারেটারের ডানদিকে হেঁটে গেল। তারপর বয়লার এবং ক্র্যাঙ্ক স্যাটের মাঝখানে ঢুকে সে ও-পাশের কনডেনসার বাঁয়ে ফেলে আরও ভেতরে ঢুকে গেল। এখানে সারেঙ একটা প্লেট তুলে বললেন, নিচে নাম। নিচটা ভীষণ অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। ছোটর ভীষণ ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেল। সে নিচে নেমে গেলে যদি সারেঙ প্লেট চাপা দিয়ে সরে যান। অন্ধকারে পর পর জলের খালি ট্যাঙ্ক নিচে। ভেতরে ঢুকে গেলে, একটা দিয়ে আর একটায় বের হয়ে যেতে পারবে, কিন্তু ওপরে উঠে আসার রাস্তাটা তার জানা থাকবে না।

কেমন একটা গুম গুম শব্দ ভেতরে। সারেঙ একটা বাতির ব্যবস্থা করছে। নিচে কিছু দেখা যাচ্ছে না। একটা বালব জ্বলছে লম্বা রবারে মোড়া তারে। সে সেটা নিয়ে ভেতরে নেমে গেলে দেখল, ট্যাঙ্কগুলো থেকে জল পাম্প করে ফেলে দেওয়া হয়েছে। ওর এখন কাজ বালতিতে সব ময়লা তোলা। লাল সবুজ নানারকমের শ্যাওলা জমেছে। ট্যাঙ্কের ছাদে, চারপাশে শ্যাওলার জট। এ-কাজ একা এক নাগাড়ে এক বছরেও শেষ করতে পারবে না। সে বুঝল, এটা শাস্তি দেবার কৌশল।

ছোট চুপচাপ কাজ করে গেল। সে ক্রমে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। বালতির সঙ্গে দড়ি বাঁধা। এনজিনরুমের নিচে এই ট্যাঙ্ক ছড়ানো। এক একটা এপারটমেন্টের মতো। ভেতরে গোলগোল হোল। একটার ভেতর দিয়ে আর একটা ট্যাঙ্কে চলে যাওয়া যায়। সারেঙ বালতিটা ভরে গেলেই তুলে ফেলছেন। মেজ-মিস্ত্রি জেনারেটারের পাশে দাঁড়িয়ে স্টিম দেখছে জাহাজের। আর বেশ একটা যেন মজা পাচ্ছে। সে হাভানা চুরুটের ধোঁয়ায় চারপাশ অন্ধকার করে ফেলেছে।

ছোট এভাবে কাজ করে যাচ্ছিল। সে বেশ ভেতরে ঢুকে গেছে। সে সব সময় সঙ্গে আলোটা রেখেছে, একটা এপারটমেন্ট থেকে অন্য এপারটমেন্টে ঢুকে যাবার সময় সে বাতিটা ছাড়ছে না। ভয়, সে একটা না গোলকধাঁধায় পড়ে যায়। এমন একটা জায়গা এই জাহাজে আছে যে স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি। ওপরে বিশাল প্লেটের ওপর বড় বড় কলামে সিলিন্ডার। বড় বড় তিনটে পিস্টন থামের মতো মোটা ঘুরে যাচ্ছে। অতিকায় প্রপেলার স্যাফট মাথার ওপর অনবরত ঘুরছে। আর তার তলায় সেই আলাদিনের দৈত্যের মতো সারেঙ গুহার মুখে। সে কোথায় যে ক্রমে চলে যাচ্ছে! সে বুঝতে পারছে তার পায়ের নিচে জাহাজের তলা, খোলের শেষ বিন্দ!

ছোটবাবুর ঘাড় ধরে গেছে। কারণ, ভেতরে সোজা বসা যায় না। নুয়ে নুয়ে কাজ করছে সে। সে ট্যাঙ্কের জল সাদা কাপড়ে মুছে দিচ্ছে। ওর জামা প্যান্ট ভিজে গেছে। ভেতরটা এত ঠান্ডা যে শীতের গুহা যেন। ওর মনে হচ্ছিল হাত-পা অসাড় হয়ে আসছে। সে বুঝতে পারছে আর কিছু সময় থাকলে সে এখানে ঠান্ডায় বরফ হয়ে যাবে।

কিন্তু সে তো কাজকে ভয় পায় না। সে তো মরে গেলেও বলতে পারবে না, শীত করছে। যতক্ষণ না সারেঙ নিচে নেমে বলছেন, উঠে আয়, ততক্ষণ এখানেই তাকে থাকতে হবে।

ছোট সেজন্য খুব দ্রুত কাজ করে যাচ্ছে! বসে বসে করলে শরীরের রক্ত গরম থাকে না, ঠান্ডা হয়ে যায়। সে কিছুটা হাঁটু গেঁড়ে কাজ করে যেতে থাকল। দাঁত, ঠকঠক করছে। তবু সে কাজ করে যাচ্ছে। যতটা সম্ভব সে হাত পা নেড়ে করে যাচ্ছে। ওর মুখ চোখে এখন নানাবর্ণের দাগ। কোথাও সবুজ, কোথাও খয়েরি। সে জানে না, ওর চোখ মুখ এখন একজন সারকাসের জোকারের মতো।

ছোটকে সারেঙ কোথায় নিয়ে গেল! জ্যাক কাজের অছিলায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। ছোটকে খুঁজে মরছে। আর্চি বেশ মজা করছে ছোটকে নিয়ে। জ্যাকের তাই মনে হল। আর্চি ভেবেছে, জ্যাক কিছু বোঝে না। জ্যাক লাফিয়ে লাফিয়ে নামছে। সে কাউকে কিছু বলছে না। সে চিমনির পাশে, বয়লার ঘরে নেমে যাবার সিঁড়িতে বেশ শিস দিতে দিতে নামছে। অথবা সেই গানটা যেন শিসের ভেতর—উই আর ইন দি সেম বোট..... অথবা মনে হয় জ্যাক ভীষণভাবে ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠছে। জ্যাককে এখন খুব চতুর মনে হচ্ছে। ছোটকে দিয়ে আর্চি কি করাচ্ছে, অথবা কি করাতে চায় সেটা না দেখতে পারলে ভেতরের অস্বস্তিটা যাচ্ছে না। সে লম্বা বয়লার স্যুটের ওপর একটা কালো সোয়েটার চাপিয়েছে। কারণ শীত ক্রমে বাড়ছে। যত ডারবানের দিকে যাচ্ছে তত ঠান্ডা বাড়ছে। এবং এভাবে ওরা এখন শীতের দেশে চলে যাবে। ছোট যে এখন কোথায়! সে বাংকারে উঁকি দিয়ে দেখল অন্ধকারে একজন কোলবয় বসে বসে বিড়ি খাচ্ছে। সে জ্যাককে দেখেই তাড়াতাড়ি বিড়িটা ফেলে বেলচে হাতে গাড়িটা টানতে টানতে কয়লার কাছে নিয়ে গেল। পাশের বাংকারের লোকটা মাঝ-বয়সী

মানুষ অনবরত গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে আর কয়লা ফেলছে।

না, এখানেও নেই। সে সিঁড়ি ভেঙ্গে আরও নিচে ঠিক বয়লার ঘরে নেমে গেল। টিন্ডাল, ফায়ারম্যান, ওকে দেখেই ব্যস্ত হয়ে পড়ছে। সারেঙের ওয়াচ। সবাই এখন দমাদম কয়লা হাকড়াচ্ছে চুল্লীতে। জ্যাক- এ-সব বুঝতে পারে, এটা ওরা ওর সম্মানে কাজ দেখাচ্ছে। এখন কয়লা ফার্ণেসে না দিলেও চলত। সে এখানেও ছোটকে দেখতে না পেয়ে হতাশ হল। মিঃ আর্চি ছোটকে কোথায় নিয়ে সেঁদিয়েছে।

জ্যাক এবার গঙ্গাবাজুর বয়লার আর বালকেড বরাবর যে রাস্তাটা এনজিনরুমে চলে গেছে তার ভেতর ঢুকে গেল। এখানে এলে চারপাশের ছাই ঝুরঝুর করে মাথার ওপর পড়তে থাকে। সে যেতে যেতে বুঝতে পারল ওর মুখেও ছাই লেগেছে। রুমাল দিয়ে ভালভাবে ছাই মুছে ভেতরে ঢুকে দেখল মিঃ আর্চি সিঁড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে দেখছে না, জ্যাক সামনে। জ্যাক বলল, গুড মর্ণিং মিঃ আর্চি।

—গুড মর্ণিং জ্যাক। হঠাৎ এখানে। তুমি তো কখনও আস না।

—আপনার এনজিনঘর দেখতে এলাম।

—তুমি আগে দ্যাখোনি।

—কবে দেখলাম! খুব বিস্ময়ের সঙ্গে তাকাল।

—বেশ, এস, দেখাচ্ছি।

মিঃ আর্চির কথাবার্তা কি সুন্দর এখন। বড় ভাল মানুষ। যেন সে জ্যাকের জন্য যা কিছু দরকার সব করতে পারে। জ্যাককে নিয়ে সে প্রপেলার স্যাটের পাশে চলে গেল। কখনও কনডেনসারের পাশে। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখালো। জ্যাক আসলে কিছুই দেখছে না। সে তো সব জানে, সে তো কতবার এসব দেখেছে। কিন্তু সারেঙ যে ছোটকে এদিকে নিয়ে এল তারপর কোথায়! সে বলল, মিঃ আর্চি আপনার এনজিনঘর খুব পরিষ্কার। এমন পরিষ্কার রাখেন কি করে! তারপর খস খস শব্দ। কেউ মনে হয় প্লেট তেল আর শিরিস কাগজে ঘসছে। মনে হল জ্যাকের, হয়তো ছোট হবে। ওরা নীল রঙের পোশাক পরে সবাই। কিন্তু কাছে গেলে দেখল, একজন বুড়ো মতো মানুষ কোলবয় টয় হবে, প্লেট ঘসছে। জ্যাক আর ভেতরে উত্তেজনা চেপে রাখতে পারছে না। সে তো, সারেঙ, ছোটবাবুকে নিয়ে এনজিনরুমে নেমে এলে অনেকক্ষণ বোট-ডেকের রেলিঙে দাঁড়িয়েছিল। এনজিনরুম থেকে উঠে যাবার দুটো পথ। একটা এনজিনরুম থেকে সোজা সিঁড়ি ধরে, অন্যটা বয়লারঘর দিয়ে চিমনির পাশে। সে বোট-ডেকে, বয়-কেবিনের পাশে ছিল বলে দুটো পথই চোখের ওপর। ছোট এবং সারেঙ এনজিনরুম থেকে উঠে গেলে ঠিক চোখে পড়ত।

অথচ সে বলতে পারছে না, মেজ, তুমি ওকে কোথায় রাখলে। মিঃ আর্চি, ছোট তো সামান্য একজন নাবিক, তুমি কত বড় কাজ কর জাহাজে, একজন সামান্য নাবিককে এভাবে অকারণ কষ্ট দিয়ে কি লাভ! তুমি নিজেকে ছোট করছ আর্চি। এ সবই মনের কথা। সে আর না পেরে, শেষবারের মতো যমুনাবাজুর বয়লারের ফাঁকে উঁকি মারলেই দেখল, সারেঙ দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে দড়ি! তিনি টেনে টেনে বালতি তোলার সময় দেখলেন, একেবারে সামনে জ্যাক। তিনি খুব থতমত খেয়ে গেলেন। বললেন, গুড মর্ণিং সাব।

জ্যাক বলল, গুড মর্ণিং! এখানে কি করছ সারেঙ?

—টাংকি সাফ করছি সাব।

—আমি টাংকিতে নামব!

—না না সাব। নামলে সব ভিজে যাবে। জুতা ভিজে যাবে। ঠান্ডা লাগবে। ভীষণ ঠান্ডা।

জ্যাক কিছু শুনল না। সে লাফিয়ে নিচে নেমে গেল। দেখল অনেক দূরে আলোর তারটা ভেতরের দিকে চলে গেছে! সে বলল, কি চমৎকার সারেঙ। সে ছোটকে দেখতে পাচ্ছে না।

মাথার ওপর ট্যাঙ্ক-টপ প্রায় ছাদের মতো। নির্জন কারাগারের মতো জায়গা। কেবল এনজিনটা গর্জাচ্ছে বলে কঠিন একটা ধাতব শব্দ। ভেতরে জলের আধার। এবং শ্যাওলার গন্ধ। ঠান্ডা এক অতীব হিমশৈল ভেসে বেড়ালে সমুদ্রে যেমন লাগে ঠিক তেমনি। জ্যাক শীতের দেশের মানুষ, ওরও কেমন ভেতরটা শীত শীত করছে। কিছুক্ষণ থাকলে ওরও দাঁত ঠক ঠক করবে।

এবং এ-সময়ে মনে হল, ঠিক ভূতের মতো অথবা ছায়া ছায়া অন্ধকারে কেউ হামাগুড়ি দিয়ে এদিকে আসছে! ক্রমে কাছে এলে বুঝতে পারল, ছোট। জলে ভিজে একেবারে সাদা হয়ে গেছে। মুখে নানাবর্ণের বর্ণমালা, সঠিক জোকার। চোখ তবু উজ্জ্বল। সে জ্যাককে দেখেই হাসল। জামাকাপড় জবজবে ভেজা। ভীষণ ক্লান্ত এবং দাঁত ঠক ঠক করে কাঁপছে।

জ্যাক হাসতে পারল না। কিছু বলতেও পারল না। ছোট, প্লেটের মুখে এসে বালতিটা সারেঙের হাতে দেবার সময় বলল, একটু আগুন না হলে চাচা মারা যাব।

জ্যাককে বলল, তুমি এখানে! দাঁত ঠক ঠক করে কাঁপছে বলে কথা স্পষ্ট হচ্ছে না। কেমন লম্বা হয়ে যাচ্ছে প্রতিটি শব্দ। যেন জলে ঠক ঠক শব্দ করে মাছ ধরার মতো এক পাখি। জ্যাক এবার ওপরে উঠে সোজা চলে গেল। একটা কথাও ছোটর সঙ্গে বলল না। সারেঙ কিছুটা এতে ঘাবড়ে গেছে। সে বলল, চল ওপরে। খাবার সময় হয়ে গেছে। পরে দেখা যাবে।

সে ছুটি পেয়ে এক দৌড়ে ওপরে উঠে গেল। সে যে সাদা হয়ে গেছে এবং তাকে অকারণ মেজ-মিস্ত্রি টরচার করছে এটা মৈত্র পিছিলে সব জাহাজিদের বলে বেড়াচ্ছে। এটা কেন হবে! সারেঙের কি ইচ্ছা। ওর কি ইচ্ছা ছোটকে মেরে ফেলবে! মেজ-মিস্ত্রি কি ভাবেন! তাকে কি আমাদের মাথা নেবার ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এবং ছোট, পিছিলে ঢুকে গেলেই বুঝতে পারল ভীষণ উত্তেজনা সৃষ্টি করছে মৈত্র, অমিয়, লতিফ, মনু, জব্বার। সারেঙকে ওরা এলেই ঝাঁপিয়ে পড়ল। —আপনি কি ভেবেছেন!

—কি ভেবেছি!

–মেজ-মিস্ত্রি যাই বলবে আপনাকে তাই করতে হবে! —তা ছাড়া কি!

—আপনি নিজের বুদ্ধি বিবেচনা খাটাবেন না? এখনও আপনি ভেবেছেন, আমরা ওদের গোলাম আছি!

—কিন্তু উনি অর্ডার দিলে আমি কি করব।

—বলতে পারলেন না, ডারবানের ঘাটে হবে। সবাই নেমে যা পারা যায় করা যেত। ছোটর একার কি দায় কাজ করার।

—কিছুটা কাজ এগিয়ে রাখা যাচ্ছে।

—শুনুন, মৈত্র বলল, তোষামোদ আর করবেন না। আর না। জব্বার বলল, আর না। ওরা যা খুশী একসময় করতো, এখন আর না।

সারেঙসাব পুরোনো মানুষ। তার কাজ করার স্বভাব। আদেশ তামিল করা তার কাজ! সে ভেবে পেল না কি অন্যায়টা মেজ-মিস্ত্রি করেছে। ওর বরং ছোটর ওপরই রাগ হল। একটুতেই কাহিল হয়ে যায়! এবং ছোটও ভীষণ লজ্জায় পড়ে গেছে। সে গ্যালিতে আগুন পোহাবার সময় বলল, আরে মৈত্রদা কিছু তো করতে হবে।

—যা জানিস না তা নিয়ে কথা বলিস না। ডারবানের ঘাটে আমরা সবাই মিলে করলে কি আর কাজ! এতো আর তকতকে ঝকঝকে করা হয় না। একটু মুছে পরিষ্কার করে দেওয়া। ঠিক পরিষ্কার করতে গেলে এক বছরে কেন, জাহাজের জীবনেও হবে না। এটা আবার জাহাজ নাকি! তাপ্পি মারা জাহাজ তায় মেজ-মিস্ত্রি তার আবার কত রোয়াব! শেষ পর্যন্ত মেজ সম্পর্কে মৈত্রদা কিছু উঁচুদরের খিস্তিও ঝেড়ে দিল।

মাঝে মাঝে এটা দেখেছে ছোট, মৈত্রদা ঝগড়ার সময় কেমন ছেলেমানুষ হয়ে যায়। সে সারা সফরেই এভাবে জাহাজিদের পক্ষ নিয়ে কথা বলে। সে সেদিনও ঝগড়া করেছে। সারেঙসাব, মেজ- মিস্ত্রির কি রাইট আছে জুতো দিয়ে মুখ নেড়ে দেখার! কি রাইট আছে বলুন। আপনারা কিছু বলেন না বলে পেয়ে বসে। আপনারা বলবেন না, আমাদেরও যেতে দেবেন না।

সারেঙসাব বললেন, আরে সাহেবদের সঙ্গে ঝগড়া করে পারা যায় না। ওরা আমাদের তো ওপরওয়ালা। ওরা আমাদের অনেক ক্ষতি করতে পারে।

মৈত্রদা যেমন বলে থাকে বলে ফেলল, কচু করতে পারে। কই দু-দুবার তো ব্ল্যাক লিসটেড হয়েছি, জাহাজ পাই না এমন তো হয় না।

ছোট কি করবে তখন ভেবে পায় না। সারেঙসাব এভাবেই সারাজীবন কাজ করে এসেছেন। সব কাজই জাহাজের কাজ, সবই করতে হবে, ভয় পেলে চলবে না। ছোট আগুনের পাশে দাঁড়িয়ে চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। ঠান্ডা লেগে যেতে পারে এই একটা ভয় থেকে গেল। জ্বরটর আসতে পারে। বুকে কফ বেঁধে একটা কেলেঙ্কারি হতে পারে। কারণ ভেতরে ভেতরে সে খুব আড়ষ্ট বোধ করছিল। খাবার খেয়ে আবার কি কাজ করতে হবে সে জানে না। যদি আবার ট্যাঙ্কের ভিতর নেমে যেতে হয়—ও কেমন অসহায় বোধ করতে থাকল।

তবু বিকেলের দিকে কেউ জানে না, কেন মেজ-মিস্ত্রি সারেঙকে বলে পাঠাল, এখন ট্যাঙ্কটপের কাজ বন্ধ থাকবে। ছোট যেমন কাজ করছে, তেমনি করবে।

ছোট কেবল বুঝতে পারল, এটা জ্যাকের কাজ। জ্যাক কিভাবে এটা করেছে সে জানে না। প্রথমে সে জ্যাকের ওপর ভীষণ খুশী। তারপরই জ্যাকের ওপর ওর কেমন একটা রাগ, অথবা জ্যাক কি ভেবে থাকে, আমি কোন কাজের উপযুক্ত নই, আমি কি কিছু পারি না! জ্যাক কি আমাকে খুব সাহসী মনে করে না? সে ভাবল, জ্যাককে একা পেলে দু-কথা শুনিয়ে দেবে। এবং তারপরই মনে হল, সত্যি সে সাহসী নয়। ভাবতেই ভেতরে কেমন হীনমন্যতা জন্মে গেল। এমন কি জ্যাকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলেও ভারি লজ্জার ব্যাপার। সে সারাটা বিকেল ফাইভারের সঙ্গে প্রায় ঠিক আগের মতো লুকিয়ে লুকিয়ে কাজ করল। জ্যাক যাতে দেখতে না পায়—সে জাহাজে সেঁধিয়ে গেল।

এভাবে সেকেন্ড অফিসারও বিকেলে বসে থাকল, ছোটকে দেখতে পেল না। এভাবে জ্যাক চুপচাপ বয়কেবিন পর্যন্ত বার বার ঘুরে গেছে তবু ছোটকে দেখতে পেল না'। বেশ জাহাজ যাচ্ছে। এবং কিছু উড়ুক্কু মাছ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে, আর নীল জলে ডুবে যাচ্ছে। সামনে জল কেটে যাচ্ছে জাহাজ, দু'পাশে অজস্র বিন্দু বিন্দু সাদা ফেনা। আর আকাশটাকে কখনও মনে হয় নীল চাঁদোয়ার মতো। এবং কতভাবে যে এ-আকাশ সুন্দরভাবে সেজে থাকতে ভালবাসে। কখনও কিছু মেঘ ভেসে গেলে, সমুদ্রে তাদের ছায়া, কখনও সাদা, কখনও লাল, অথবা হলুদ রঙের ছায়া। নীল জলে এইসব ছায়া খেলা করে বেড়ালে জ্যাকের মনে হয় পৃথিবীতে সে খুব ভালবাবে বেঁচে আছে। ঠিক সেই নদীর পারে কোন দুর্গের পাশে তার বাবার প্রাসাদের মতো বাড়িতে সে যখন হেঁটে যায়, চারপাশে ডেইজি ফুলেরা তখন ফুটে থাকে। এখানে ফুল নেই, কিন্তু ছোট আছে। ছোট আছে বলেই বোট- ডেকে তার বার বার হেঁটে বেড়াতে ভাল লাগে।

এভাবে একদিন সেই ক্যাকটাসের দ্বীপটাও দূরে দেখা গেল। তখন বিকেল, সূর্য অস্ত যাবে আর কিছু সময় বাদে। ছোটকে সেকেন্ড অফিসার ডেবিড খুঁজে বেড়াচ্ছে। এ তিন-চারদিন কেউ ওকে দেখতে পায়নি। ডেবিড বুঝতে পারছে ছোটকে এভাবে মেজ-মিস্ত্রি গালাগাল করছে বলে তার খুব আত্মসম্মানে লেগেছে। এবং এভাবে ডেবিড মানুষের স্বভাব বুঝতে পারে—ছোট ঠিক দশটা জাহাজির মতো নয়। কোথায় যেন সে একটা প্রাচীন সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছবি তার ব্যবহারে সব সময় ঝুলিয়ে রাখে। তখন ছেলেটার জন্য ডেবিডের কেন জানি কষ্ট হয়।

ছোটকে ডেবিড ফোকসাল থেকে ডেকে নিল। বলল, এস।

ছোট এবং ডেবিড পাশাপাশি হাঁটছে। ছোট পরেছে একটা সাদা পাজামা, একটা ডুরে সার্ট। সে একটা ফুলহাতা সোয়েটার গায়ে দিয়েছে। সোয়েটারটা সেই আগের—মৈত্রদা দিয়েছে। কথা আছে ডারবানে গিয়ে মৈত্রদা সেকেন্ডহ্যান্ড মার্কেট থেকে ওকে সব গরম জামা-কাপড় কিনে দেবে। কারণ জাহাজ যত যাবে তত ক্রমশ শীত বাড়বে। অবশ্য একটা কালো রঙের ফুলহাতা সোয়েটার আর কম্বলের গরম প্যান্ট কোম্পানী তাকে দিয়েছে। সেটা এত ঢোলা যে পরা যায় না। আর শীত আরও না পড়লে পরা যাবে না। তা ছাড়া জাহাজি মানুষেরা ফিটফাট থাকবে, পরিচ্ছন্ন থাকবে, শহরে বের হবার সময় টিপটপ বের হতে হবে, কারণ বিদেশে ছোট একজন ভারতীয়, সে যেভাবে বাঁচবে, সেখানে তার দেশ সেভাবে বাঁচবে।

ওরা এসে দুটো ক্যাপস্টানের পাশাপাশি প্রথমে বসল। এক নম্বর ফল্কার ঠিক পাশে। ওরা জাহাজের সামনে আছে এবং গঙ্গাবাজুতে আছে। ক্রমে দ্বীপটা দূরবীনে স্পষ্ট হয়ে উঠছে। মেজ বলল, তুমি কি দেখতে পাও বলবে!

ছোট দেখছে, সেই সোনালী রঙের দ্বীপ। বড় বড় ক্যাকটাস। কি যে বড়! শৈশবে সে একবার বনের ভেতর হারিয়ে গিয়েছিল। এবং মনে হয় সংসারে সবার জন্য এমন একটা প্রিয় বন অথবা তপোবন থাকা দরকার যেখানে মানুষ হেঁটে গেলে নিজেকে খুঁজে পায়। মেজ-মালোম এই দ্বীপের কাছে এলে কি যেন পেয়ে যায়, যা ওর মুখ না দেখলে ঠিক বিশ্বাস করা যাবে না।

মেজ বলল, জানো ছোট, আমার মাঝে মাঝে এই সব দ্বীপে নেমে যেতে ইচ্ছে হয়।

ছোট বলল, দু-একদিন ভাল লাগবে। তারপর আর ভাল লাগবে না।

—না তুমি জান না। তারপর মেজ-মালোম কেমন সঙ্কোচ বোধ করল, যেন ছোটকে এ সব ঠিক বলা যায় না। আসলে এমন একটা দ্বীপ দেখবে বলে সে সব সময় বসে থাকে। যদি গভীর রাতে কথা থাকে দ্বীপটা পার হয়ে যাবে—যদি এমন হয় ওয়াচ শেষে আরও দু-তিন ঘন্টা, দরকার হলে চার-পাঁচ ঘন্টা জেগে থাকতে হবে, সে তাও করে। দ্বীপে সে এবং এক সুন্দরী দ্বীপবাসিনী, সে আর কিছু চায় না। কিছু পাতি লেবুর গাছ থাকবে, আর থাকবে—নীল জলের গভীরে, পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে আশ্চর্য সব ঝিনুক। শালতিতে দ্বীপের চারপাশে সোনালী রোদে ঝিনুক খোঁজা সে যে কি বিস্ময়! সে ডুবে ডুবে ঝিনুক তুলে আনবে, ঝিনুকের খোল ভেঙ্গে শাঁস সে লেবুর রসে আর নুনে ভিজিয়ে খাবে। সে আর সেই যুবতী। যার শরীরে কোন পোশাক থাকবে না। সে মাথায় পাতার মুকুট পরতে ভালবাসবে আর সে রোদে অথবা বৃষ্টিপাতে মাঠের ছায়ায় ঘাসের ভেতর নিরন্তর ছুটে বেড়াবে। সে তার চিবুকে, তারপর স্তনে এবং নিচে নেমে যেতে যেতে ক্রমে গভীর সমুদ্রে ডুবে গেলে, মনে থাকবে না এবি তার স্ত্রী। মনে থাকবে না এবি আগামী বসন্তে ওর জন্য জন্মদিনের কেক বানাবে, এবং চার্চে সে সব কিছুর ভেতর তার স্বামী যে সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছে তার জন্য প্রার্থনা করবে।

॥ আট ॥

আবার ব্যস্ততা জাহাজে। বন্দর আসছে, বন্দর ধরছে জাহাজ। জাহাজিরা সবাই কাজ ফেলে ওপরে ছুটে যাচ্ছে। মেজ-মালোম ডেবিড দূরবীনে বন্দর দেখছে। এনজিন-সারেঙ মাঝে মাঝে উঠে আসছেন ডেকে। মৈত্র বার বার অমিয়কে সাবধান করছে, ঠিক ফাদার যেমন গীর্জায় ঈশ্বর সম্পর্কে বক্তৃতা করেন, তেমনি মৈত্র, ডাঙ্গার মেয়েরা কি ভয়াবহ তার বর্ণনা, জ্যান্ত ছবি এঁকে এঁকে সাবালক অমিয়কে বুঝিয়ে যাচ্ছে। বাংকে গল্পগুজব করার সবয় মৈত্র প্রাচীন নাবিকের মতো সব বন্দরের রহস্য ব্যাখ্যা করে যায়। অমিয়র যা স্বভাব দাঁড়াচ্ছে দিনকে দিন!

ছোটবাবু বসে বসে সব শুনছিল। সে এমন সব আজগুবি কথা কখনও শোনে নি। ওর মাঝে মাঝে মৈত্রের কথা অবিশ্বাস করতে ইচ্ছা হত। এমন সব নক্কারজনক কথা, যা সে বিশ্বাসই করতে পারে না, সে কি করে বিশ্বাস করবে কেউ তার মার জন্য মানুষ সংগ্রহ করে নিতে পারে। সে কেমন শুনতে লজ্জা পায়। সে তখন না বলে পারে না, মৈত্রদা চুপ কর। এসব আগলি কথা না শোনাই ভাল।

মৈত্র ভীষণ ক্ষেপে গেল এ-কথায়। দেখ ছোট, তোকেও বলে রাখি, বেশি বাড়াবাড়িও ভাল নয়। অত সোজা না দুনিয়াটা। বয়স এখনও হয় নি, বয়স ভাল করে হোক। আমার মতো ঝানু না হলে এ-সব বিশ্বাস করতে তোমার কষ্ট হবে। তুমি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবে না।

—তা হোক তুমি অন্য কথা বল।

—বন্দরে আবার অন্য কথা কি।

মনু বসেছিল পাশের বাংকে। সে বলল, ঠিক, বন্দরে আবার অন্য কথা কি!

—কেন কত কথা থাকতে পারে। আমরা ইচ্ছা করলে নেমে সব ঘুরে দেখতে পারি। বাসে চড়ে বেশ দূরে—এই সব আফ্রিকার জঙ্গলে ঘুরে আসতে পারি। এখানে যে ইন্ডিয়ানরা থাকে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারি। তারা কিভাবে আছে তা জেনে নিতে পারি। কি কি অসুবিধা, কালার-বার কি রকম ভয়াবহ এ-সব জেনে নিতে পারি।

অমিয় বলল, জেনে লাভ! ঘোরাঘুরির পয়সা কোন বাবা দেবে?

—লাভ আমরা জানলাম।

—মৈত্র শোন, ছোটর কথা শোন। সে ফস করে সিগারেট জ্বেলে টানতে থাকল। তারপর চুপ। অমিয় এখন এমন ভাবে তাকাচ্ছে যে ছোট ভেবে পাচ্ছে না কি করবে। অমিয় এবার ঠিক খিস্তি করবে। তাড়াতাড়ি ছোট বলল, এই আমি আসিরে!

—থাম, যাবি কোথায়! আমরা বুঝি অভিযানে এসেছি!

—না, তা না।

—তোর কথা শুনে তো এমনই মনে হয়।

ছোট বলল, ধুস, আমি এমনি বললাম। না বললে মৈত্রদা যেভাবে আরম্ভ করেছিল.........

—কি বললি, তুই ভাবলি আমি মিথ্যা বলছি?

—মিথ্যা বলবে কেন। হয়তো হয়েছে।

—হয়তো না, হয়েছে। হাসানকে ডাকব?

মনু বলল, হাসানটা আবার কে! মনু ডেক-জাহাজিদের পাত্তা দিতে চায় না। করে কয়লায়ালার কাজ। এবং মুখের ওপর কথা বলতে পারে। ওকে ডেক-টিন্ডাল হাসান একদিন বলেছিল, বোঝলারে মিঞা, দ্যাশের চকিদার আর জাহাজের কয়লায়ালা কামে তফাৎ নাইরে

মিঞা।

—হ হ যান, মিঞা কইবেন না, খালাসির কাম করেন বড় বড় কথা কন!

—তুমি মিঞা এনজিনিয়ার!

—আরে আমার কাজ এনজিনের লগে। পানি মারা কাম না। ওড়া তো টোপাসের কাম!

এভাবে জাহাজে ডেক-জাহাজিদের সঙ্গে এনজিন-জাহাজিদের বেশ একটা রেষারেষি থাকে। এবং মাঝে মাঝে বেশ মজার ব্যাপার স্যাপার ঘটে যায়। যেভাবে যাকে যে চটাতে পারে। হাসান খুব ইয়ার্কিবাজ মানুষ। জাহাজিদের পেছনে লাগা তার স্বভাব। তাকে ডাকার যে কি দরকার এখন, এলেই বলবে, আহা কি যে করেন! কয়লায়ালা বইসা আছে, আমার জাত মান আর থাকল না। এবং কখনও এক কথায় দু'কথায় কথা কাটাকাটি, ঝগড়া। মনু এটা পছন্দ করে না। সে বলল, আর ডাইকা কাম কি!

—ছোট বিশ্বাস করছে না।

—সেই পোলাডার কথা?

—হ্যাঁরে, লেমো নাম ছিল। ভাল নাম ডেবিড এ্যালবার্টসন না কি যেন, শালা এসব ইংরেজি নামফাম আমার মনে থাকে না। নাম ওলটেপালটে যায়। আগেরটা পরে, পরেরটা আগে বলে ফেলি।

—তা ঠিক ছোটবাবু। হাসানকে এ-বন্দরে এলেই ভালোমানুষের মতো দেখবে। সে ইয়ার্কি ফাজলামো করবে না। কেমন দুঃখী মানুষ। সে যেন তখন কি ভাবে! মাঝে মাঝে পয়েন্টস-রোড ধরে সামনের যে পাহাড়টা দেখছ সেখানে চলে যায়। আমার সঙ্গে চার-পাঁচ সাল আগে এক জাহাজে সফর ছিল। তখন দেখেছি।

ছোট বলল, কেন যেত?

—কেন আবার? জাহাজিরা যেখানে যায়, সেও যেত। ছেলেটা নিয়ে যেত। ওর মার কাছে নিয়ে যেত। আর ছেলেটার মার সঙ্গে ডেক-টিণ্ডাল কেমন তোমার মোহব্বতে পড়ে গেছিল। তারপর যা হয়—এখন আর ছেলেটা আসে না। পুরোনো ঠিকানায় বোধহয় আর ওরা নেই। তবু ডেক-টিণ্ডাল জাহাজ এখানে এলেই দাঁড়িয়ে থাকে। একদিন আবার হয়তো ছেলেটার সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। তাকে নিয়ে যাবে।

মৈত্র বলল, আশা কুহকিনী। ছেলেটা আসলে ওর নিজের ছেলে।

ছোটবাবু বলল, মৈত্রদা তোমার মায়া-দয়া ভারি কম।

—হবে। বলে সে বাংকে এলিয়ে পড়ল। শালা হাসান গত যুদ্ধে এখানে আটকা পড়েছিল। বুঝলে।

ছোট, জাহাজ বাঁধা হলে সত্যি দেখল, ডেক-টিণ্ডাল হাসান খুব সেজেগুজে রেলিঙে দাঁড়িয়ে আছে। চুপচাপ। কেউ কিছু বললে জবাব দিচ্ছে না। সে নিচে নামার জন্য দাঁড়িয়ে আছে।

গল্পটা শোনার পর হাসানের জন্য ছোটর মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। অথবা এক বালকের মুখ, যেন সে নিচে দাঁড়িয়ে আছে, হাতে ম্যাণ্ডোলিন, সে এই জেটিতে দাঁড়িয়ে বাংলা গান গাইছে। এমন একটা বন্দরে, সেই বালক, এখন তো সেই লেমো ওর বয়সিই হবে, কি তার বড়ও হতে পারে—আর আসে না। ডেক-টিণ্ডাল হাসান এখানে এলেই বার বার সারা শহরে হেঁটে যায়, যদি ছেলেটার সঙ্গে দেখা হয়। ওর মার সঙ্গে দেখা হয়।

হাসান এ-ভাবে আজও বিকেলটা এখানেই বুঝি কাটিয়ে দেবে। সে যদি ফিরে আসে। এবং এ- ভাবে ঠিক আশা কুহকিনী, হাসানের আশা আছে একদিন না একদিন লেমোর সঙ্গে ওর ফের দেখা হবে। তখন আর হাসানকে শুধু ডেক-টিণ্ডাল মনে হয় না, যেন জাম-জামরুলের ছায়ায় হেঁটে যাওয়া বাংলার মানুষ। তাকে মনে হয় প্রাচীন নাবিক। সে অনেক

সাগরে ঘুরেছে মনে হয়। তার বেদনা যেন সবার চেয়ে গভীর।

এ-সব ভাবতে ভাবতে ছোটবাবু দেখল, মেজ-মালোম ঠিক আগের জায়গায়। ওর চোখে দূরবীন। সে ওদিকে আর যাবে না। গেলেই ডেবিড ওকে দূরবীনটা দিয়ে নিজে চুপচাপ বসে থাকবে।

এবং এক কথা।

এনি ওম্যান।

—নো স্যার।

—বন্দরে মেয়েরা কেন যে আসে না!

—এখানে মালটাল নামানো হয়! এখানে কেন ওরা আসবে?

–কেন বেড়াতে!

তখন ছোট শুনল, কেউ ওকে ডাকছে। সে দেখল, বোট-ডেকে জ্যাক। সে তাকে ডাকছে। জ্যাক ডাকলে সে প্রায় দৌড়ে যায়। জ্যাককে সে সারাদিন দেখেনি। কোথায় যে থাকে। জ্যাক না ডাকলে সে যেতে পারে না। সে বলল—তুমি আমাকে ডাকছ?

—তুমি এস না! —কি ব্যাপার?

—আরে এস না।

ও গেলেই জ্যাক বলল, বেশ শীত পড়েছে।

—খুব।

—তোমার শীতে ডেকে দাঁড়াতে ভাল লাগছে!

—খুব।

—কেন তোমার ভাল লাগছে!

—কেন ভাল লাগে কি করে বলব।

—তুমি কিন্তু রাতে মেজ-মালোমের সঙ্গে কিনারায় যাবে না।

—গেলে কি হবে?

—গেলে ভাল হবে না।

—মেজ আমাকে যেতে বললে না গিয়ে থাকব কি করে! মেজ এ-জাহাজে সবচেয়ে ভাল লোক। -বাজে কথা।

—বাজে কথা কি ভাল কথা আমি জানি না জ্যাক। তবু বলি মেজকে আমার খুব ভাল লাগে।

–তোমাকে আজ বলেনি কিছু?

—কি কলবে?

—কিনারে যেতে।

—না-তো।

—ও ঠিক নেমে যাবে। যাবার সময় তোমাকে সঙ্গে নেবে।

—ও তো এখন বাইনোকুলারে কিসব দেখছে।

—কিছু দেখতে পাবে না, তবু দেখবে। তারপর একটু থেমে জ্যাক বলল, তুমি আমার কেবিনে একটু আসবে?

—কেউ দেখলে খারাপ ভাববে।

জ্যাকের মুখটা সহসা লাল হয়ে গেল। তারপর সামলে নিল।—কেউ খারাপ ভাববে না।

—মিঃ আর্চি টের পেলে আবার জাহাজের তলায় পাঠাবে।

—গুলি মারো। এসতো। বলে হাত ধরে টানতে থাকল।

ছোট খুব বিব্রত বোধ করতে থাকল। জাহাজের সর্বময় তিনি—তাকে জাহাজের ‘লর্ড বলা যেতে পারে, মাস্টার তিনি জাহাজের, তাঁর একমাত্র ছেলে জ্যাক। ছোটকে যতই আসকারা দিক, এ-ব্যাপারে কাপ্তানও কিছু মনে করতে পারেন। সে খুব মুখ কাঁচুমাচু করে বলল, জ্যাক আমাকে বিপাকে ফেলে তোমার কি লাভ?

জ্যাক কেমন ঘাবড়ে গেল।—বিপাকে মানে!

—আমার মতো মানুষ তোমার কেবিনে গেলে খুব খারাপ দেখাবে।

—কিছু খারাপ দেখাবে না।

—তোমাদের অন্য অফিসাররা কিছু মনে করতে পারেন।

—তারা তো আমার গার্জিয়ান নয় ছোট। বলেই সে ছোটর হাত চেপে ধরল। খুব উষ্ণ হাত মনোরম। অদ্ভুত নেশার মতো এই হাত দুটো ছোটবাবুর। ছোট এখন এত কাছাকাছি যে সেই সুন্দর ঘ্রাণ, ছোট কি শরীরে কিছু মাখে! ছোটর কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে জ্যাকের মনে হয় শরীরের ভার তার কেমন লাঘব হয়ে যায়। সে বলল, তুমি না এলে আমি ভীষণ দুঃখ পাব ছোটবাবু।

—তোমার বাবা কোথায় জ্যাক?

—তিনি কিনারায় গেছেন।

—চিফ-অফিসার?

—তিনিও নেই। এজেণ্ট অফিসে গেছেন চিঠিপত্র আনতে। ফিরতে দেরি হবে।

—মেজ-মালোম!

—সে তো ওর জায়গা থেকে উঠবে না।

—কেউ দেখতে পাবে না তো?

—আরে না। এস না।

জ্যাক প্রায় ছোটকে টানতে টানতে ওর কেবিনে নিয়ে গেল। কি সুন্দর সাজানো কেবিন। পর- পর দুটো ঘর। একটা ঘরে নানারকম বই। সাদা দেয়ালে নীল রঙের ক্যালেণ্ডার। একটা সুন্দর ছেলে সমুদ্র-বেলায় দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় একরাশ চুল। জ্যাক কেবিনে নীল আলো জ্বেলে দিল।

জ্যাক বলল, ঠিক তোমার মতো দেখতে।

—আমার মতো! সে সন্তর্পণে দরজার দিকে তাকাতেই জ্যাক বলল, তুমি খুব ভীতু ছোটবাবু। বলে সে দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর বলল, এখন ভয় করছে?

—না। কিন্তু ক্যালেণ্ডারের পাতায় আমার মতো ছেলের মুখ কৈ দেখি। বলে সে উঁকি দিয়ে দেখল জ্যাক ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। জ্যাকের লম্বা হাতা সার্ট গায়, জামাটা আগের চেয়ে বেশ ঢোলা। ওর প্যান্টের কাট-ছাট অদ্ভুত রকমের। জ্যাকের চুল আবার সামান্য বড় হয়েছে। ওর নীল রঙের চোখে কি যে আকাঙক্ষা সে বোঝে না। জ্যাক ওর এত ঘনিষ্ঠ যে সে জ্যাকের শরীরের আশ্চর্য ঘ্রাণ পাচ্ছে। কিছুটা ফুঁইফুলের মতো গন্ধ। অথবা বনের ভিতর হেঁটে গেলে বৃষ্টিপাতের সময় যে সবুজ গন্ধ পাওয়া যায় জ্যাক যেন তার চারপাশে তেমনি গন্ধ ছড়িয়ে রেখেছে। জ্যাক বলল, ছোট তুমি কাল আমার সঙ্গে বেড়াতে যাবে।

—কাল!

—হ্যাঁ কাল! এখানে আমরা একটা পাহাড়ের টিলায় উঠে যাব।

—আমার তো কাল সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড মার্কেটে যাবার কথা। গরম জামাকাপড় কিনতে হবে।

জ্যাক কেন যে আর কিছু বলতে পারে না। সে চুপচাপ থাকল। তারপর কেমন ভুল হয়ে গেছে মতো বলল, তুমি বসো ছোটবাবু।

ছোট খুব আস্তে আস্তে কথা বলছিল। এখন মৈত্র অথবা অন্য কেউ খুঁজে বেড়ালেই সে বিপদে পড়ে যাবে। সে বলল, এবারে যাই জ্যাক?

—বারে এই তো এলে। আমি কতদিন থেকে ভাবছি, তোমাকে আমার কেবিনে নিয়ে আসবো।

—মাস্টার জানতে পারলে ভীষণ খারাপ হবে। আমাকে এমন কি জাহাজ থেকে নামিয়েও দিতে পারে। তিনি এতটা বাড়াবাড়ি সহ্য করবেন কেন! শর্ত হলেও কয়লায়ালা। বলে, ছোট মুখ ভীষণ গম্ভীর করে ফেলল।

জ্যাক এবার বলল, ছোট, বাবা আমাকে খুব বিশ্বাস করেন। তিনি জানেন আমি এমন কিছু করব না, যাতে তাঁর অপমান হয়। তিনি আমাকে ছেড়ে থাকতে পারেন না। আমিও না। আসলে বাবা বাদে আমার আর কেউ নেই।

ছোট জানে জ্যাকের মা ওর বাবার সঙ্গে থাকে না। জ্যাকের জন্য এ-ভাবেও ভেতরে ভেতরে কেমন একটা টান গড়ে উঠেছে। ওর এখন মনে হয় জাহাজে যারা কাজ করে তাদের ভীষণ একটা দুঃখ থাকে।

জ্যাক বলল, তুমি হয়তো এবার চিঠি পাবে।

—চিঠি! মায়ের!

—হ্যাঁ।

—না, পাব না। আমি জানি পাব না। মা আমার চিঠি পেলে তক্ষুনি উত্তর দিতেন। চিঠি কোনদিন ওদের কাছে পৌঁছবে না।

জ্যাক ফের বলল, তুমি বসো। আমার কেবিন তোমার কেমন লাগছে?

—খুব সুন্দর। মনেই হয় না জাহাজে আছি। সব রকমের ব্যবস্থা আছে। আমার খুব ইচ্ছে এমন একটা কেবিনে ঘুমোই।

জ্যাক কিছু বলতে পারল না। শুধু বলল, তুমি জাহাজে কাজ করলে একদিন এমন একটা কেবিনে ঠিক থাকতে পাবে। বাবা মাঝে মাঝে তোমার কথা বলেন।

—কি বলছ জ্যাক? আমার কথা বলেন!

জ্যাক বলল, হ্যাঁ। তারপর বলল, তুমি আমার ফ্রেণ্ড; আমি তোমার কাছে তেমন ব্যবহার পেতে চাই।

—জ্যাক!

জ্যাকের মুখ বড় সরল দেখাচ্ছে। সে বলল, তুমি আমাকে কখনও ভয় পাবে না বল?

ছোট চুপ করে থাকল।

—বল, আমাকে তোমার সুবিধা অসুবিধার কথা সব বলবে।

ছোট কিছু বলল না। সে কেমন অভিভূত। এত ভাল জ্যাক! অথচ এতদিন সে জ্যাককে এড়িয়ে গেছে।

ছোট ধীরে ধীরে বলল, তুমি বসো। তুমি আমার অনেক ছোট জ্যাক। আমি তোমার বন্ধু হতে পারি না।

জ্যাক কেমন অধীর গলায় বলল, কেন! কেন?

তারপর ছোট আর কিছু বলতে পারল না। জ্যাক ওর কাঁধে পড়ে। জ্যাক শরীরে অতীব এক সুষমা বয়ে বেড়ায়। সে কেন যে নিজেকে এত অসম ভেবে থাকে। আসলে জ্যাক কখনও কখনও হয়তো আবেগে ভোগে। এটা একটা খেয়ালও হতে পারে। এবং নানাভাবে জ্যাক সম্পর্কে ছোট ভেবে বুঝল, সে কথা দিতে পারে না। সে পালিয়ে এসেছে। জ্যাক খুব ছেলেমানুষ। জ্যাক খুব আদুরে। জ্যাক ভীষণ খেয়ালি। নিজের ভাগ্য এত বেশি সুপ্রসন্ন ভাবতে সে পারে না। আসলে সে হয়তো আর একটা বিপদে জড়িয়ে পড়ছে। যেমন কাল সে মেজ-মালোমের সঙ্গে গিয়ে ঠিক করেনি। সে এবার বলল, জাহাজে তোমার সঙ্গে কথায় বলার কেউ নেই। তোমার সঙ্গে ঘুরে বেড়াবার কেউ নেই। তুমি খুব একা বুঝি? তোমার একজন কাছের মানুষ দরকার। যদি তিনি মনে করেন আমাকে দিয়ে হবে, তুমি যেখানে বলবে তখন যাব। তুমি যেমন আমার মনিবের মতো আছো তেমনি থাকো। যখন যা সার্ভিস চাইবে, পাবে।

জ্যাক কেমন সহসা ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। সে চিৎকার করতে থাকল,—ইউ গেট-আউট। আই সে ইউ গেট-আউট।

ছোট বলল, যাচ্ছি স্যার।

ছোট চলে গেলে জ্যাক দরজা বন্ধ করে দিল। তারপর যেখানে যা আছে সব ছুঁড়ে ফেলতে লাগল। ওর দু-চোখ বেয়ে ভীষণ প্রবল বেগে কি যেন নেমে আসছে। সে নিজেই এই অসম্মানে যা কিছু আছে সব তছনছ করে দিচ্ছে। চিৎকার চেঁচামেচিতে বাটলার, কাপ্তান-বয়, ডেবিড ছুটে এসেছিল।

—কি হয়েছে জ্যাক। কাপ্তান বয় বলল, কি হয়েছে সাব।

জ্যাক কিছু বলছে না। কেবল ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

তখন ছোট দৌড়ে পালাচ্ছিল। পাশে মেজ-মালোমকে সে ফেলে চলে যাচ্ছে। মেজ-মালোম ডাকল, এই ছোট শোন, শোন।

ছোট তখন ওর পাশে ঘাপটি মেরে বসল। তারপর হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, এনি ওম্যান সেকেণ্ড!

—নো।

—তবে আমি যাই।

—কোথাও গেছিলে?

—কোথাও না সেকেণ্ড।

—এত জোরে ছুটছ?

ছোট বলল, বড়-মিস্ত্রি কিনারায় নামছে

—এত ভয় বড়কে?

ছোট মিথ্যা কথা বলে পার পেল। তারপর কেমন নিশ্চিন্ত গলায় বলল, দূরবীনে মেয়ে ধরা পড়লে আমাকে ডাকবে।

—ঠিক ডাকব।

—একা একা দেখে ফেলবে না।

—আরে না না। একা আমি কিছু দেখি না। জাহাজিদের মতো এত স্বার্থপর নই।

তখন বড়-মিস্ত্রি হেঁটে হেঁটে ঠিক রেলব্রীজের কাছে গিয়ে থমকে দাঁড়াল। ছায়া-ছায়া অন্ধকারে আবার একজন ইণ্ডিয়ান। সে একটু থেমে গেলেই বুঝল বেশ নেশা করে বাবু ব্রীজের থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বোধহয় হেঁটে বাড়ি ফেরার সাহসটুকু নেই। কিন্তু এ যে সেই ইণ্ডিয়ান। আরে ওকে তো ধন্যবাদ দেওয়া হয়নি। ওকে তো মনে মনে খুঁজে

বেড়াচ্ছে।

সে ওর কাছে গিয়ে বলল, গুড ইভিনিং।

অমিয় হাঁটতে পারছিল না। সে টলছিল। সে কোনো রকমে বলল, গুড ইভিনিং!

—অনেক ধন্যবাদ। তোমাকে বন্ধু ধন্যবাদ দেওয়া হয়নি। দুজনেই বোঝা যাচ্ছে নেশা করেছে খুব। বড়-মিস্ত্রি নেশা করলেও ঠিক জায়গায় পৌঁছে যাবে। ওকে কেউ ফোন করেছিল। রেলব্রীজের ও-পাশে গাড়ি থাকবে। আর অমিয় বড়মিস্ত্রির কাছ থেকে যা খসিয়েছিল, এখানে ঠিক তা একজন দালালকে ধরে পাউণ্ডে বদলে নিয়েছে। এবং এ-পয়সায় এ-দেশের সস্তা মদ, চোলাই বলাই ভাল ঠিক ইণ্ডিয়ান মার্কেটের পাশে সবার সঙ্গে কাঠের মোড়াতে বসে হুস হাস পান করে, নেচে গেয়ে—সেই এক নাচ, বসে বসে, কখনও পিঠ উঁচু করে কখনও নুয়ে নুয়ে যখন একেবারে চোখ বুজে এসেছিল, একটি রিক্সা করে চলে এসেছে। আর কি চেহারা রিক্সায়ালার, একেবারে মা কালীর মতো। মাথায় পালকের টুপি, কোমরে পালক পাখির, মুখে নানারকম উল্কি আঁকা। প্রথম তো ভয়ে একেবারে ঠাণ্ডা। তারপর মনে হল তা অনেকেই, মেয়েরা পর্যন্ত উঠে বেশ এখানে সেখানে যাচ্ছে। সেও উঠে বসল। আর এখানে এসেই রিক্সা সে ছেড়ে দিয়েছে। পোর্টের ভিতরে ঢুকতে দেবে না। সে এখানে হাঁফ ছেড়ে তারপর যাবে—ভেবেছিল, তখনই কিনা ভূতের মতো বড়-মিস্ত্রি টলতে টলতে বলছে, বেশ আছো বাবা, তা তোমার কথামতো চলে গেলে দেখা হতো না। তুমি আমার বন্ধু। তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গেই আছ দেখছি। ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে।

অমিয়র মুখ শুকিয়ে গেছে। ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। নেশা টেশা একেবারে গোল্লায়। সে বলল, না স্যার আমি...

দাঁড়িয়ে কথা শোনার মতো সময় নেই বড় মিস্ত্রির। কি বলছে বিড় বিড় করে বোঝাও যাচ্ছে না! আসলে আমিয় নিজেও বুঝতে পারছে না কি বলছে। সে বাংলায় বলে যাচ্ছে। বাংলাকে সে ইংরেজি ভাষা মনে করছে। সে কলকাতার কোন খালাসী টোলা ভেবেছে এটা। সে যে এখানে, এই আফ্রিকার বন্দরে দাঁড়িয়ে আছে ক্ষণেকের জন্য ভুলে গেছে। তারপর সব খেয়াল হতেই কেমন সেও ছুটতে থাকল। সে এবার ক্রমে নিজের জালে নিজে জড়িয়ে পড়ছে। তাকে এখন এ-জাহাজে শেষ পর্যন্ত ভূতের অভিনয় না করতে হয়। বড়-মিস্ত্রি ওকে ছেড়ে দেবে না। কিভাবে যে কি করবে কিছুই, এখন মাথায় আসছে না। মৈত্রকে বলতে পারছে না। ছোট তো আরও সরল সে এমন শুনলে আরও ঘাবড়ে যাবে জাহাজে।

অমিয় সব ভুলে যাবার জন্য আবার গান ধরেছে। আসলে সে গ্যাংওয়ে ধরে উঠে আসতে পারছে না। পড়ে যাবে, পড়ে গেলে একেবারে অতলে। ওর জড়ানো গলায় গান শুনলে যদি কোয়ার্টার- মাস্টার ফোকসালে খবর দেয়।

শেষ পর্যন্ত মৈত্র নিচে নেমে দুমদাম পাছায় লাথি মারতে থাকল। জাহাজে কেন আসা। বেশ তো মা ভাইদের জ্বালাতন করছিলে, তাই করতে। আমাদের কেন। সে লতিফকে বলল, নে তোল। চ্যাঙদোলা করে তুলে নে। তারপর বাথরুমে ফেলে জল ঢাল।

অমিয় সব বুঝছিল। জাহাজের ওপরে এসেই সে ঠেলেঠুলে সবাইকে সরিয়ে দিয়ে বলল, আমাকে

ছোঁবে না। আমি ঠিক হেঁটে যাব। ঠিক এক দুই সে তারপর পা মুড়ে বসে পড়ল। সে বলল, উঠব না।

–কেন উঠবি না?

—আমাকে তুমি অপমান করেছ।

—অপমান মানে!

—আলবৎ অপমান। তুমি আমার পাছায় লাথি মারলে কেন?

—সবাই দেখছে। ওঠ প্লিজ, আর পাছায় লাথি মারব না!

—দেখুক। সবাই তো বেশ মৌজ করছে। বন্দর এলেই সব শূয়োরের বাচ্চা নাগর সেজে বের হচ্ছে। যত দোষ নন্দ ঘোষ।

মৈত্র বলল, অমিয় জাহাজ থেকে শালা তোমায় হারিয়া করে দেব।

—দাও না, বারণ করেছি। শালা এ মনুষ্যজন্ম থাকা না থাকা সমান। তুমি আমার পাছায় লাথি মেরেছ। ছোটকে না বলেছি তো আমি কুত্তার বাচ্চা।

এবং ছোট দেখল, পিছিলে কি যেন একটা গণ্ডগোল। সে বোট-ডেক থেকেই বুঝল, সবাই সেখানে জড় হয়েছে। সেও ছুটে গেলে দেখল অমিয় বেহুঁশ হয়ে আছে। কেউ এদিকে আসতে পারে, কিংবা কোনও অফিসার। এনজিন সারেঙ তাড়াতাড়ি ওকে নিচে নিয়ে যেতে বলছে। এবং ওকে ঠেলে ঠুলে নিচে নিয়ে গেলে মনে হল, অনেক দূরে একটা অতিকায় ট্রেন, কোন গভীর বনাঞ্চলের ভেতর দিয়ে ছুটছে। গাছ পালা পাখি সব ভয়ে উড়ে যাচ্ছে। এবং এক আশ্চর্য শব্দ জাহাজে উঠলে সবাই শুনতে পায়, শব্দটা, সেই ট্যানি টরেন্টো, ট্যানি টরেন্টো। গর্ভিণী তিমি শিকার করে ফিরে আসার সময় শিকারিরা এমন একটা শব্দে ডেকে দাঁড়িয়ে গান গাইতে ভালবাসে।

.

পরদিন সকাল সাতটা বাজতে না বাজতেই কিনারার সব মানুষেরা উঠে আসছে। ওরা অধিকাংশ নিগ্রো কুলি। ক্রেনগুলো সব এগিয়ে আসছে।

ডেরিকগুলো তুলে দেওয়া হচ্ছে। উইনচের বল বিয়ারিঙে তেল দিচ্ছে গ্রিজার। মেজ-মালোম ছুটে ছুটে বেড়াচ্ছে। ছোটকে দুবার দেখেও যেন চেনে না এমন ভাবে তাকিয়েছে। পাখিগুলো প্রথমে নেমে গেলো। ফল্কা একেবারে খালি। নিগ্রো কুলিরা এসে গ্যালিতে ভাত ভাত করছে। ওরা ভাত মুড়িমুড়কির মতো জ্যাবের ভিতর নিয়ে কাজ করছে আর খাচ্ছে। জাহাজিরা কাজের ফাঁকে ফাঁকে নিগ্রো কুলিদের সঙ্গে ভাঙা ইংরেজিতে হাসি ঠাট্টা করছে। বাদশা মিঞা একজন নিগ্রো কুলির হাত পা দড়ি দিয়ে কত মোটা মাপছে। সে একটা বড় টুল টেনে এনেছে। তার ওপরে উঠে দৈত্যের মতো মানুষটার হাতের পেশী কি যে সবল, এমন মাপবার সময় খুব দুঃখ, সে এতটা দুর্বল কেন! আর নিগ্রো কুলিটা ফিক্‌ফিক করে হাসছে। মাপবার সময় যখন যা বলছে মানুষটা তাই করছে। বাদশা মিঞাকে ছোট একটা পুতুলের মতো লাগছে। কি কালো আর সবল শরীর। মাথায় রোঁয়া রোঁয়া কোঁকড়ানো চুল। বাদশা মিঞা হাসতে হাসতে ঠাট্টা করছে—তোমার কটা বিবি মিঞা?

—তিন। সে আঙ্গুল দেখিয়ে এমন বলছে।

বাদশা খুব যেন কাছের মানুষ পেয়ে গেছে, সে একেবারে দাঁত বের করে বলল, মি...সে বুকে আঙ্গুল ঠেকাল, যেন 'মি' দিয়ে ঠিক নিজেকে প্রকাশ করতে পারছে না, বুকে আঙ্গুল ঠেকিয়ে সেটা সে প্রমাণ করছে—মি বুঝলে সাব্ ফোর। ফোর বিবি।

—ফোর! মাই গড। লিটল ম্যান। ভেরি লিটল।

বাদশা মিঞা লিটল কথার অর্থ বোঝে। সে খুব চুপসে গেল। ওকে সোজা কথায় হালার হালা বলেছে। এ-হালার গতরে চার বিবিরে সামলানো দায়।

—সাব, ফোর নো গুড?

—ইয়েস, গুড। ওয়ান নো গুড, টু গুড, থ্রি ভেরি গুড। নাইস। সে জিভ দিয়ে ঠোঁট চাটছে। ফোর! ও ভাবা যায় না।

—তুমি নাস্তায় কি খাও সাহেব?

—আণ্ডা।

—কটা করে?

—আটটা করে। কাঁচা। সরবৎ করে খাই।

—আমার খেলে হবে!

—জরুর হবে।

বাদশা মিঞা বলল, ভাত নেবে? সে ওর দু জ্যাব ভরে ভাত দিয়ে দিল। নিগ্রো কুলিটা তারপর দুলাফে নেমে গেল। ফল্কায় সব ভারি ভারি কাঠ হাওয়ায় উড়িয়ে দেবার মতো টেনে ফেলে দিচ্ছে। এবং এ-ভাবে জাহাজে কাজ সুরু হলে মনে হয়, কেউ এখন আর নিজের দুঃখের কথা ভেবে বসে নেই। সবাই কাজ করছে। চার নম্বর মিস্ত্রি সামনের উইনচে আছে, পাঁচ নম্বর আছে এদিকের উইনচে। কাপ্তান পায়চারি করে সব দেখছেন। মেজ-মালোমের কাছে হিসাবপত্র আছে। কি নামবে সে জানে। জাহাজে কোন আলাদা ক্লার্ক নেই। চিফ-অফিসার সেকেণ্ড-অফিসার এ সব কাজ ভাগ করে নেয়। আর্চি নিচে রয়েছে। কিছু মেরামতের কাজ আছে। কিনার থেকে কন্‌ট্রাক্টর এসেছে মেরামত করতে। বড় বড় অক্সিজেন সিলেণ্ডার নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্লেট খুলে ফের মেরামত হচ্ছে। স্মোক-বকসে কাজ পড়েছে ছোটর। সকাল থেকে ওর দেখা নেই। দুজন দুজন করে তিনটে-স্মোক বকস ভাগ করে নিয়েছে। মৈত্র নিজে গেছে সঙ্গে। ছ’জন কোলবয় স্মোক-বক্স সাফ করার জন্য রয়েছে বলে, ছোটকে সকাল থেকে দেখা যাচ্ছে না।

অনিমেষ, বঙ্কু এবং অন্য ডেক-জাহাজিরা ফলঞ্চা বেঁধে রঙ লাগাচ্ছে। চিমনিতে রঙ লাগাচ্ছে পঁচিশ টাকার জাহাজিরা। তেইশ টাকার জাহাজিরা ফলঞ্চা বেঁধে জাহাজের খোল রঙ করছে। বন্দরে এলেই এ-সব কাজ ওদের বেড়ে যায়। সমুদ্রের ঢেউ এসে ক্রমান্বয়ে সব রঙ ধুয়ে নিতে চায়। আর ওরা যেখানে যেভাবে রঙ ধুয়ে যায় আবার বন্দরে এসেই রঙ করে ফেলে। যেন নিয়ত এক সংগ্রাম এই সমুদ্রের সঙ্গে।

স্মোক-বকসের ভেতরে বসে তখন ছোট চেঁচামেচি করছিল, মৈত্রদা কিছু দেখতে পাচ্ছি না।

—মার জোরে, জোরে মার। জোরে বুরুশ চালা। মাগীর কলিজাতে পাড় দে।

এগুলো এমন সব কথা যা মৈত্রকে বলতে হয়। না বললে যারা কাজ করছে, মেজাজ পাবে না। এই যে এক মাসের ওপর ওরা জাহাজ চালিয়ে এসেছে, এই যে এক মাস ধরে স্মোক-বকসের পাইপগুলো ধোঁয়া গিলে গিলে জ্যাম হয়ে গেছে কালিতে, এগুলো ঠিক মতো বুরুশ না চালালে বয়লারে ঠিক স্টিম উঠবে না। ধোঁয়া বের হবার পাইপ জ্যাম থাকলে আগুন ভালো জ্বলবে না। আগুনের ভেতর আগুন, সে যে কি আগুন এই বয়লারে নিয়ত জ্বলে কেউ না দেখলে টের পাবে না। এ- ভাবে হাজার হাজার টন কয়লা পুড়বে বয়লারের পেটে। স্মোক-বকস সাফসোফ না থাকলে বয়লারের বদহজম হবে। এবং এটা মৈত্র ভাল বোঝে, সে সেই সকাল থেকে লেগেছে। চারপাশটা এখন ধোঁয়ার মতো, আসলে সব শুকনো ভুসো কালি, ফর্ ফর্ করে চারপাশে উড়ছে। এবং ওরা যে নীল জামা প্যান্ট পরে এসেছিল, তার ওপর পলেস্তারা পড়েছে ভুসো কালির। ভুসো কালিতে মুখ একেবারে মা-কালী। চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল। নাকে সবাই রুমাল বেঁধেও পার পাচ্ছে না। গলা থেকে থুতু উঠে আসলে কেবল মনে হয় দলা দলা কালো কফ। কেউ বেশিক্ষণ ভেতরে বসে থাকতে পারে না। পাইপের ভেতর বুরুশ ঠেলে বের করে ঘসে দুবার, তারপর বাইরে বের হয়ে আসে। আবার যখন যাচ্ছে ভেতরে সেই ঘূর্ণিঝড়ের মতো ভুসো কালির ঝড়টা কিছুটা থেমে গেছে তখন। বার বার গিয়ে তা প্রায় বিশ বাইশটা পাইপ, ঠিক গোনার মতো তখন অবস্থা থাকে না, এক এক করে সবাই সাফ করে যখন ঠিক বারোটায় উঠে গেল দল বেঁধে তখন মনে হচ্ছে একদল অভিযাত্রী সত্যি কোন দুর্গম কয়লা খনির ভেতর থেকে জীবন-মরণ লড়াই শেষে ক্লান্ত অবসন্ন পায়ে উঠে যাচ্ছে।

মৈত্রের ভীষণ তখন গর্ব হয়। গতকালের অমিয়র এমন বেলাল্লাপনা ভুলে যায়। এমন

একটা কাজের পর যদি এটুকু না করল তবে আর বাঁচা কেন। কিন্তু এইসব জাহাজিদের এত কম পারিশ্রমিক, আর্টিকেলে ওদের জন্য এত কম বরাদ্দ যে তখন তার মন খারাপ হয়ে যায়। মৈত্রের তখন এই সব হতভাগা জাহাজিদের জন্য আফশোস হয়।

জ্যাক তখন খুট খুট করে জাহাজে চিপিঙ করছে। ঠিক দু নম্বর লাইফ-বোটের নিচে সে বসে আছে। এবং সে দেখতে পাচ্ছে কতজন অভিযাত্রী ক্রমে পিছিলের দিকে চলে যাচ্ছে। ওদের চেহারা এক রকমের। মাথায় কালো টুপি। জামা প্যান্ট ভুসো কালিতে ঢাকা। ওরা কে এবং ছোটবাবু কোনটা সে বুঝতে পারল না। কিন্তু সে জানে ছোটবাবু ওদের ভেতর সব চেয়ে লম্বা। ছোটকে যে যে- ভাবেই সাজিয়ে রাখুক সে ঠিক চিনে ফেলতে পারবে। দূর থেকে না পারলেও, কাছে গেলে চিনতে পারবে। ছোটর শরীরে আশ্চর্য একটা সৌরভ আছে যা কখনও উবে যায় না।

সে কালকে রেগে গিয়ে যে কি করে ফেলল! ছোটকে এ-অবস্থায় দেখে সব রাগ-অভিমান সে ভুলে গেল। হঠাৎ এমন সরগোল এবং কাজকর্মের ভেতর সব ভুলে সে উঠে দাঁড়াল। তারপর চিৎকার করে ডাকল, ছো...ট। ছোট আমি এখানে! কেমন সরলভাবে বলে যাওয়া। ছোট যেতে যেতে হাত তুলে দিল। কিছু বলল না।

॥ নয় ॥

জাহাজ ছাড়ার আগে মৈত্র ছোটবাবুকে ওয়াচে নিয়ে নিল। সারেঙের ইচ্ছে ছিল না। কি দরকার, যখন চলে যাচ্ছে। এখন তো সমুদ্রে তেমন ঝড় উঠছে না। আর সামনে যে সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে, খুব ভয়াবহ হবে না। শীতের সমুদ্র। শান্ত নিরিবিলি। নানা বর্ণের সমুদ্র-পাখীরা ঘোরাফেরা করবে কেবল। এখন ছোট যেভাবে আছে সে-ভাবেই থাক না। ওকে আর কে ঘাটাচ্ছে।

তবু মৈত্র বলল, না। ওর শক্ত হওয়ার দরকার আছে। সব জাহাজে আপনি আমি থাকব না।

—ছোট কি বলে?

—ওর আবার বলার কি আছে! ওর ইচ্ছায় তো আর কাজ হবে না।

সারেঙ বললেন, ঠিক আছে, যা ভাল মনে করেন, করবেন

সারেঙের এ নিয়ে কোনও দ্বিধা থাকল না। ছোটবাবুর জন্য মৈত্রমশায় ভেবে থাকেন। এটা সারেঙসাব নিজেও চান, ছোট শক্ত হোক। অনেকটা হয়েছে। জাহাজের স্মোক-বকসে খুব ভালভাবে কাজ করেছে। কয়লা লেভেলিং-এর দিন, সে তো সবচেয়ে বেশি খেটেছে। এভাবে একজন জাহাজি জাহাজে ঠিকঠাক কাজ করতে না পারলে পদে পদে অপদস্থ হতে হয়। সুতরাং ছোটবাবুর ফালতু থাকা আর হল না। এখন সেও অন্য জাহাজির মতো 'পরিদার'। তার 'পরি' মৈত্রদার সঙ্গে। বারোটা- চারটা ওয়াচ। এক বাংকারে সে কাজ করবে, অন্য বাংকারে অমিয়। অমিয় ইতিমধ্যেই বেশ 'পরি' শেষে শিস দিতে দিতে উঠে আসে। একদিন ছোট দেখেছিল, অমিয় 'পরি' শেষ করে বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে জোরে জোরে কবিতা আবৃত্তি করছে। বোধ হয় কোন ইংরেজ কবির সমুদ্রবিষয়ক কবিতা। সে শুনতে পায় নি। ওর হাত পা নাড়া দেখে ভেবেছিল, অমিয় বোট-ডেকে পাগলামি করছে। সে ওপরে যেতে পারে নি। কারণ সে উইন্‌চে কাজ করছিল। ফাইবার ওকে দিয়ে কাজ করাচ্ছিল। ওকে সে জিজ্ঞাসা করলে বলেছিল, কবিতা আবৃত্তি করলাম। কি শান্ত আকাশ, কি অসীম সমুদ্র, ইচ্ছে হয় না হাত পা ছুঁড়ে কবিতা আবৃত্তি করতে! ইচ্ছে হয় না ধনধন্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা গানটা গেয়ে ফেলি!

এ-ভাবে প্রথম যে জাহাজ মনে হয় নিদারুণ, সমুদ্র-যাত্রা মনে হয় কঠিন সফর, জীবনযাপনে বিশ্বস্ততা থাকে না, মনে হয় সবাই ভিন্ন ভিন্ন গ্রহ থেকে নেমে এসেছে, ক্রমে তা আর মনে হয় না। মনে হয় এরা সবাই মিলে একই গুষ্ঠিভুক্ত জীব। এখানে ঠিক সবাই একইভাবে, যেমন সারেঙ বলতে পারেন কবে বাড়িয়ালা মাসতার ডেকে বলবেন, নাটক, যাত্রা, কবিগান, যার যা খুশি কর। শান্ত সমুদ্রে ডেকের ওপর নাটক, আবৃত্তি গান-বাজনা লাগাও। বেশ তো বের হয়েছি সেই ডাঙ্গা ছেড়ে এভাবে হাত-পা গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে কেন। তখন মনেই হয় না কাপ্তান খুব বুড়ো, মনে হয় না অথর্ব, মনে হয় না খিটখিটে তাঁর মেজাজ, বরং মনে হয় মানুষটা জীবনের চারপাশটা যেন শেষদিন পর্যন্ত দ্যাখোরে বাহার। চুপি চুপি বলবেন, আমার জন্য কিন্তু একটা প্রোগ্রাম রাখবে। এখনও একেবারে খারাপ হাত না।

সবাই তখন হেসে ফেলবে। এই যখন জাহাজের নিয়তি, অর্থাৎ যেখানেই জাহাজ যাক, জাহাজের একঘেয়েমি থাকবে, নিশিদিন তো শুধু নীল জল, নীল আকাশ, মাঝে মাঝে সমুদ্র পাখিদের ওড়া অথবা ডলফিনের ঝাঁক ভেড়ার পালের মতো সমুদ্রে দেখা আর তো বৈচিত্র্য বলতে কিছু নেই। যখন ঝড় সাইক্লোন দেখা দেয়, তখন বোধ হয় একটা বৈচিত্র্য আসে। একেবারে সব মানুষগুলোকে পাগলা করে দেয়। অথবা কুয়াশার ভেতর ঢুকে গেলে কিংবা কোন হিমশৈল, এটা সহজে ঘটে না। কাপ্তান সারাজীবনে দুবার সংকেত পেয়েছিলেন, নেমে আসছে, নেমে আসছে। পালাও পালাও। জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে দাও। ভয়ঙ্কর সমুদ্রের অতলে

মৃত্যুর বিভীষিকা। যেন এক অতিকায় সমুদ্র জুড়ে হিমশৈল এক প্রাগৈতিহাসিক জীব হয়ে যায়। আর তো কিছু নেই। কেবল কাজ, চার্ট দেখা, চার্ট মতো জাহাজ চলছে কিনা দেখা, সকাল-সন্ধ্যায় গ্রহ-নক্ষত্র দেখে জাহাজের অবস্থান বোঝা। কখনও কখনও দেখা, দিক ঠিক আছে কিনা, অথবা দিক নির্ণয়। অথবা মার্কনি সাব অর্থাৎ রেডিও অফিসার সকাল হলে জাহাজের খবর জানিয়ে দিচ্ছেন এরিয়া স্টেশনকে। প্রতি সকালে তার এটা কাজ!—হ্যাঁ হ্যাঁ, সিউল ব্যাঙ্ক। তারপর প্রায় মুখস্থ বলার মতো বলে যাওয়া, কত এন. আর. টি., কত জি. আর. টি., কোন কোর্সে জাহাজ যাচ্ছে এবং নেকস্ট পোর্ট অফ কল কি! অথবা পজিশান জাহাজের ভুল হলে চেয়ে নেন রেডিও বিয়ারিঙ। তা হলেই সব ঠিকঠাক। আর ভয় থাকে না। এভাবে সব কাজের ভাগবাটোয়ারা করে বাকি সময়টা কাপ্তান হুইল ঘরে বসে থাকেন। অথবা খোলা ডেকে বসে এই যে, পৃথিবী, সমুদ্র এবং গ্রহ-নক্ষত্র এবং সৌরলোক সব মিলে ঈশ্বরের কি অপার মহিমা এমন ভাবেন। তখন কাপ্তানের চোখ বুজে আসে, তারপরই কেমন একটা দুঃস্বপ্ন ভেতরে নাড়া দেয়, যেন কেউ পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার গাউন এবং চুলের গন্ধ পর্যন্ত পাচ্ছেন তিনি! যত বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন তত সে পাশে দাঁড়িয়ে কেমন হা-হা করে পাগলের মতো হাসে। তারপরই এক পতনের শব্দ হয়। নিশীথে কেউ শুনতে পায় না, খোলা-ডেক থেকে কে কাকে যেন ঠেলে ফেলে দিচ্ছে। আর কোন শব্দ নেই। প্রপেলারটা ঝিক্ ঝিক্ শব্দ তুলে কেবল যাচ্ছে। তখন কেমন ভয়ে কাপ্তানের বুক গলা শুকিয়ে যায়। তিনি হাঁকতে থাকেন, জ্যাক, জ্যাক, দ্যাখ তো কেউ আমার ঘরে ঢুকেছে কিনা!

—না তো। কে ঢুকবে।

—মনে হল কেউ আমার ঘরে ঢুকেছে!

জ্যাক এতে কিছু মনে করে না। সে এটা বাড়িতেও দেখেছে। বাবার হাতে কাজকর্ম না থাকলে এমন হয়। একা চুপচাপ বসে থাকলে, কেন জানি বাবা ভীষণ ঘাবড়ে যান। সে বাবাকে এ জন্যও ছেড়ে থাকতে পারে না।

বাড়িটা ওদের পোর্টের কাছাকাছি। একদিকে বড় মাঠ, শহরের ভেতরে রাস্তা চলে গেছে। রাস্তা পার হলে, কিছু লোহা-লক্কড়ের কারখানা। তারপরই নির্জন গাছপালা, ঘেরা একটা ফোর্টের মতো বাড়ি। সামনে লাইটহাউস। অর্থাৎ রাস্তা সামনে, তারপর ড্রাই-ডকের জেটি। কিছু লম্বা ক্রেন। ড্রাই- ডক করা সব জাহাজের খোল ওদের বারান্দায় দাঁড়ালে চোখে পড়ে। আর আছে আরও দূরে সব যুদ্ধজাহাজের ঘাঁটি। সারি সারি ডেস্ট্রয়ার সমুদ্রের জলে ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। বাবা বোধহয় বাড়িটা ইচ্ছে করেই এমন একটি জায়গায় করেছিলেন। সারাদিন ব্যালকনিতে বসে থাকলে সমুদ্রে সব ছোট ছোট জাহাজ, বড় জাহাজ, টাগ-বোট এবং যুদ্ধ জাহাজের নীল জলে ঘোরাফেরা ভাল লাগে দেখতে। আর বাড়িটা গাছপালায় ঘেরা। বেশ-জায়গা নিয়ে। নানাবর্ণের সব গাছ বাবা পৃথিবীর সব বন্দর থেকে সংগ্রহ করেছেন। কেউ বেঁচেছে, কেউ বাঁচেনি। তবু বাড়িটাকে দেখলে মনেই হয় না, ওয়েলসে এমন আর একটা বাড়ি আছে।

মাঝে মাঝে বাবা ঠিক এমনি চিৎকার করে ওঠেন, দেখ তো ভেতরে কে গেল?

—কে বাবা!

—মনে হয় কেউ।

—না তো।

—ভালো করে দ্যাখ।

জ্যাক ভিতরে ঢুকে ভাল করে দেখে আসে। পরিচারিকা মেয়েটিও ছুটে আসে। সফরে বের হলে একজন পাহারাদার থাকে বাড়িতে। মাঝে মাঝে পরিচারিকার সঙ্গে বাজারের হিসাবপত্র নিয়ে বসে। এমন শুনতে পেলে সেও ছুটে আসে। কি হয়েছে স্যার।

—চোখ বুজে ছিলাম, মনে হল কেউ এসে দাঁড়াল, কি বলল, তারপর কোন তোয়াক্কা না

করে ভেতরে ঢুকে গেল।

এ নিয়ে প্রথম প্রথম সবাই খুব চিন্তিত হয়ে পড়ত। ওদের ভাবনা হত। সমুদ্রে ঘুরে বেড়ালে, এমন হওয়া স্বাভাবিক। সারাক্ষণ জল আর জল, কখনও ডাঙ্গা, মানুষের কাছে ডাঙ্গা যে কত মধুর, একজন নাবিকের চোখ দেখলে তা টের পাওয়া যায়। এবং বোধ হয় কাপ্তান আর সফরে যেতে চান না। কিন্তু পরে এত স্বাভাবিক হয়ে যান যে তখন আর কেউ কিছু বলতে সাহস পায় না।—ও এটা আমার হয়। ওটা কিছু না, শোন তো বনি। কাছে গেলে বলবে, বেহালাটা আন তো একটু বাজাই।

তখন হয়তো সমুদ্রে সূর্যাস্ত হচ্ছে অথবা জ্যোৎস্না রাত থাকলে এ ভাবে কতক্ষণ যে বাজান! যত বয়স হয়ে যাচ্ছে, তত বাবা বেহালা বাজাতে বেশি ভালবাসেন। বনি এটা দেখে বুঝেছে, বাবার ভেতরে অসীম দুঃখ। তাকে তিনি কিছুই বলতে চান না। তখন তার ভীষণ অভিমান। সে পাশেই দাঁড়িয়ে থাকে। কোন কথা বলে না। বাবা তাকে যেন দেখছে না। সেও বাবাকে দেখছে না। সামনের রাস্তায় কিছু গাড়ি-ঘোড়ার শব্দ। রাত হলে তাও থাকে না। বাড়িটা পোর্টের পিছন দিকে বলে খুব নির্জনতা আছে। ছাদে উঠলে, শহরের ভেতরে যে ক্যাসেল আছে তার চূড়ো দেখা যায়। আর এই যে লাইট-হাউস, এবং সব রঙ-বেরঙের বাড়ি, জাহাজের ভোঁ এ-সবের ভেতর বাবা এবং সে মাঝে মাঝে এমন নীরব হয়ে যায় যে কেউ বুঝতেই পারে না, বাড়িতে কেউ আছে।

বনি সমুদ্রে এলে শরীর ওর ভাল হয়ে যায়। প্রায় নাবিকের জীবনেই এটা ঘটে। কিন্তু বনি যতটুকু বড় হয়েছে, যা কিছু শিখেছে, অথবা জীবনযাপনে সে যে মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখতে শিখে গেছে, সেটাও এই জাহাজে। এই রাতের বেলাতে বাবা হুইল ঘরে একটা ডেক-চেয়ারে বসে আছেন। এনজিন – ঘর থেকে ঝিক ঝিক শব্দটা উঠে আসছে। সমুদ্রের বাতাসে আর তেমন জলকণা নেই। বাতাস ক্রমশঃ শুকনো হয়ে উঠছে। বেশ ঠান্ডা বাতাস। বাবার মাথার চুল গত সফরেও দুটো একটা সে কালো দেখেছে। কিন্তু সে এ-সফরে দেখল, বাবা তার ভীষণ বুড়ো, চুলগুলো ভীষণ সাদা। বিশেষ করে বাবা যখন একা একা চুপচাপ উইংসে দাঁড়িয়ে থাকেন, তখন বাবাকে ভীষণ দুঃখী মনে হয়। উইংসের সবুজ আলো দুলতে থাকে। জাহাজ ক্রমাগত সমুদ্রে ভেসে যায়। জ্যোৎস্নায় কেমন চারপাশের সমুদ্র অলৌকিক এক জগৎ নিয়ে বেঁচে থাকে। সে শুনতে পায় বাবা সমুদ্রকে উদ্দেশ্য করে কি যেন বলছেন, অথবা মনে হয় কিছুটা গানের মতো, অর্থাৎ সারাটা জীবন বাবা সমুদ্রে কাটিয়েছেন, ওর বয়স যদিও কম, তবু সে সমুদ্রে এসেই বুঝতে পেরেছে, বাবা এই সমুদ্রেই থেকে যেতে চান। বাড়িটা যে তিনি সমুদ্রের ধারে করেছেন সেও তো মৃত্যুর আগে তিনি জানালা দিয়ে সমুদ্র দেখতে পাবেন বলে।

আসলে মানুষের এই হয়। যত বয়স বাড়ে, তত ঈশ্বর সম্পর্কে বিচিত্র অনুভূতি অথবা মৃত্যুচেতনা, এবং কখনও গভীরে কি যেন বাজে। বনি বাবাকে অবসর সময়ে এখন দুটো কাজ করতে দেখে। সে দেখে বাবা, ঈশ্বর সম্পর্কে সব রকমের বই, বিশেষ করে জেরুজালেমের প্রাচীন ইতিহাস পড়তে খুব ভালবাসেন। কখনও কখনও তিনি বালকের মতো পড়ে যান ট্রেজার আইল্যান্ড অথবা ফরাসী দেশের সেই ছোট্ট রাজপুত্রের গল্প। যে থাকত ছোট্ট একটা গ্রহাণুতে। বাবা আর এখন ডিকেন্সের বই পড়েন না। অথচ লাইব্রেরিতে তার সব বই আছে। তিনি এখন বেছে বেছে সব ছোটদের বই সঙ্গে নেন। অথবা কোনও বন্দরে গেলেই তিনি ছোটদের বই কি ভাল আছে খোঁজ করবেন। এ- সব দেখে মনে হত সব তিনি বনির জন্য কিনছেন। তার কোন এতে উৎসাহ নেই। কিন্তু বই কিনে কিছুতেই না পড়ে বনিকে দেবেন না। বনি তখন না হেসে পারে না। অথবা কখনও কখনও তাঁর যখন ঘুম আসে না, যখন সারা রাত্রি সাহসা খুব দীর্ঘ হয়ে যায়, তিনি-বোট-ডেকে একাকী বেহালা বাজান। রাতের জাহাজ এমনিতেই ভীষণ মায়াবী। নীল রঙের ভেতর সাদা জাহাজের চলা, কেবল ঢেউ ভেঙে অন্তহীন গভীর সমুদ্রে চলা, আর অন্তহীন নক্ষত্রের ছায়া সমুদ্রে, তখন বাবার ভীষণ আবিষ্ট

হয়ে বেহালা বাজানো বনির কি যে খারাপ লাগে! সেও নেমে যায় বোট ডেকে। বাবাকে সে ডাকে, বাবা!

—কে!

—আমি বাবা।

—অঃ। তোমার আবার এখানে আসার কি হল?

—এমন ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে থাকলে তোমার অসুখ হবে।

—কোথায় ঠান্ডা!

—ঠান্ডা নয়! আমার ভীষণ যে শীত করছে বাবা!

—যা! তুমি ছেলেমানুষ, তোমার তো আরও গরম লাগার কথা! বলেই তিনি জামার নিচে বুকের কাছে বনির হাতটা নিয়ে যেতেন। দ্যাখো তো ঠান্ডা লাগছে?

বনি দেখেছে, ঘামছেন বাবা। কেমন ভিজে ভিজে।

বাবা না বলে যেন পারেন না, আমি যে বেহালা বাজাচ্ছি। কি যে ভাল লাগে না। মনেই হয় না, পৃথিবীতে শীত আছে।

বনি টের পেত বাবার বুকটা কেমন ধীরে ধীরে ছোট হয়ে যাচ্ছে। ঠিক সে এমন আর একটা বুকের কাছে হাত রাখলে টের পাবে, তাজা, গভীর। সে যেন বলতে পারত, বাবা, ছোটবাবুর বুকটা তোমার মত না। ওর বোধ হয় খুব চওড়া। তোমার মত বয়সে ওর বুকে হাত দিলেও বুঝি এমন ছোট মনে হবে।

বনির এ-ভাবে কত যে ভাবনা! তার বয়স বাড়ে! বুঝতে পারে, সে নানাভাবে বুঝতে পারে, সে বয়স অনুযায়ী বেশী বুঝতে পারে। সে যখন এ-ভাবে ভাবে, তখনই কখনও দেখতে পায়, ছোটবাবু স্মোক-বকস পরিষ্কার করে পুপ-ডেকে ফিরে যাচ্ছে, কখনও দেখতে পায়, নীল রঙের পোশাক পরে বোট-ডেক পার হয়ে সোজা তরতর পরে ফানেলের গুঁড়িতে। তারপর সিঁড়ি ধরে স্টোক হোলডে নেমে যাচ্ছে। আবার কখনও সে দেখতে পায় পুপ-ডেকের রেলিঙে দাঁড়িয়ে চর্বি ভাজা রুটি খাচ্ছে, চা খাচ্ছে, আর অনবরত সমুদ্র দেখতে দেখতে কেমন তন্ময় হয়ে যাচ্ছে।

তখন কেন যে বনি জোরে না ডেকে পারে না–ছো....ট....বা....বু।

.

সেদিনও পোর্ট এলিজাবেথ বন্দর ছেড়ে যাবার মুখে বনি ডেকেছিল, ছোটবাবু এভাবে কোথায় ছুটে যাচ্ছ।

—সেকেন্ডের কাছে।

—কি ব্যাপার!

—মেয়ে। জাহাজে ওম্যান এসে গেছে।

—যাঃ

—হ্যাঁ। ওকে খবরটা দিতে হবে। বেচারা কাজের চাপে বন্দরে একবারও নামতে পারেনি। ফাঁক পেলেই বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে দেখেছে। অথচ ৭ত কাছে বন্দর, বার বার দেখেও তার-আশ মেটেনি। খবরটা দিয়ে আসছি।

বনি লাল রঙের জাহাজী টুপি মাথায় পরেছে। পায়ে পরেছে কেডস সাদা রঙের। চুল কাটা হয়নি অনেকদিন। চুল বড় হয়ে গেছে। চুল বড় হলেই ছোটবাবুর ইচ্ছে হয় আর একটু দাঁড়িয়ে থাকে জ্যাকের পাশে। জ্যাক সুন্দর একটা ডোরাকাটা পুল-ওভার পরেছে। পিছনে পকেট, সামনে পকেট, সবুজ রঙের প্যান্ট পরেছে। জ্যাকের কাছে এ শীতটা মনোরম। ছোটবাবুর

কাছে শীতটা প্রচন্ড। সে সেকেন্ড-হ্যান্ড মার্কেট থেকে দুটো সস্তায় সোয়েটার কিনেছে, একটা ফুলহাতা, একটা হাতকাটা। সে লেদার জ্যাকেট কিনেছে একটা। মাথায় পরার জন্য উলের টুপি। একটা পুরোনো ওভারকোট কিনবে ভেবেছিল। কিন্তু মৈত্র বলেছে, বুনোসাইরিসে পুরোনো জিনিস খুব সস্তা। আর আমেরিকা অথবা ইউরোপের বন্দরে গেলে তো কথাই নেই। যা না হলে নয় এমন কিছু কিনে নিতে বলেছে।

জ্যাক ছোটবাবুর পোশাক দেখে হেসে ফেলল। ছোটবাবুর পুরোনো পোশাক তার ওপর যা যা কিনেছে, শীতের জন্য সব পরে ফেলেছে। ছোটবাবু পোশাকের ভেতর আটকে গেছে। হাতে দস্তানা। একটু শীতকাতুরে ছোটবাবু। পেছনে পড়ে থাকছে বন্দর। একেবারে সমুদ্রের গায়ে সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে পাহাড়। তার কোলে ঘর বাড়ি, লাল, নীল কাঠের বাড়ি। পাহাড়ের ওপরে ট্রেন লাইন, জাহাজ থেকে পাহাড়ের মাথায় রাতে বনি আর ছোটবাবু গাড়ির এনজিন ছুটে যেতে দেখেছে। কেমন ঘুরে ঘুরে অদৃশ্য হয়ে যায়, এনজিনের আলো। পাহাড়ের গাছপালার ভেতর একটা এমন আলোর বন্যা দেখতে ওদের অনেকক্ষণ ভাল লাগছিল। ওটা গাড়ির এনজিনের মতো মনে হয়েছে। আসলে ছোটবাবু জানে না ওটা কি!

এখন সকাল বলে, এবং শীতের মরসুমে সবাই জামাকাপড় সেঁটে বেশ হাহা হিহি করতে করতে এনজিন রুমে নেমে যাচ্ছে অথবা ডেকে জল মারছে অথবা ফলঞ্চা বেঁধে মাস্তুল রঙ করছে। ইন্ডিয়ানদের পোশাক একেবারে বেঢপ। ছোটবাবুকে কিছুতেই আর আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। বনি বলল, ছোটবাবু যেভাবে তুমি ভাল্লুকের মতো ছুটছ—ঠিক উলটে পড়বে। একটু আস্তে যাও। ডেবিড অনেক মেয়ে দেখেছে, আলাদা করে তোমার না দেখালেও চলবে।

আসলে বনি ছোটবাবুর সব পছন্দ করে। কিন্তু যখন দূরবীনে মেয়ে খুঁজে বেড়ায় বন্দরে তখন কেমন ক্ষেপে যায় বনি। সে কখনও কখনও ছোটবাবুকে এ নিয়ে ছোট বড় কথা বলে ফেলে। ছোটবাবু জানে ক্যাপ্টেনের আদুরে ছেলে—তার সঙ্গে ভাব করে থাকাই ভাল। তাকে রাগালে জাহাজে থাকা চলে না। তাছাড়া বড়মানুষের ছেলেরা একটু বাঁদর গোছের হয়, সে দিক থেকে তো জ্যাক ভীষণ ভালো। কোনও অহংকার নেই মনে হয়। আবার যখন মনে হয় জ্যাক ভীষণ অহংকারী তখন সে আর বোট-ডেক দিয়ে নিচে নামে না। ওর নামতে ভয় হয়।

যেমন জ্যাক আর দাঁড়াল না। রাশভারি তার কথাবার্তা। গলার স্বর কিছুটা মেয়েলি। রাশভারি গলায় কথা বলতে চাইলে সেটা আরও বেশি মেয়েলি হয়। ছোটবাবু সেজন্য মাঝে মাঝে হেসে ফেলে। হেসে ফেললে জ্যাক আরও রেগে যায়। দুদিন তিনদিন তখন আর কথা বলে না। এ কদিনেই সে বুঝেছে, জ্যাক তাকে এ-জাহাজে নানাভাবে জ্বালাবে। এই যে সামনে পড়ে গেল, কেন যে বলতে যাওয়া, ওম্যান। না বললেই যেন ভাল ছিল, মেয়েদের কথা বলতে গেলে জ্যাকের চোখ মুখ কেমন হয়ে যায়। জ্যাক কি ওকে সাধুসন্ত বানিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। সে তো তা নয়। এভাবে সে শৈশবের কথা মনে করতে পারে—কবে কোথায় কে যেন প্রাচীন শ্যাওলাধরা একটা ইঁটের ঘরে তাকে নিয়ে কি করেছিল। সে সেই থেকে ভয় পায়। অবশ্য এখন সে আর তেমন ভয় পায় না। সে তো ডেবিডের সঙ্গে বের হয়ে ডারবানে শিস পর্যন্ত দিয়েছে। ডেবিড খুব খুশী সে জন্য।

এবং কেন যে এমন হয়, জ্যাক তাকে ভাল্লুক বলেছে। এখন শীতের রোদ ডেকে। জাহাজ সোজা এবার আটলান্টিকে পড়বে। তেত্রিশ ডিগ্রি বরাবর জাহাজ যাচ্ছে। শহর বন্দর ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। ফানেলের ধোঁয়া সমুদ্রের জলে যেন এক মহামায়ার মতো, অথবা মনে হয় কেউ মোহিনী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এই বিশ্বে এবং তার চুলের বাহার, উড়ছে অনবরত, সমুদ্রে, বাতাসে উড়ে যাচ্ছে।

ভাল্লুক কথাটা মোটামুটি খারাপ। এমন খারাপ কথা এই প্রথম বলেছে জ্যাক। ছোটবাবুর মনে হল, জ্যাকের সঙ্গে সে কোন সম্পর্কই রাখবে না। জ্যাক তো ওদের ফোকসালে আসে না। এলেও খুব কম। যেন না আসারই নিয়ম। রবিবারে সবাই যখন সাফাই দেখতে বের হয়,

ঠিক তখনও জ্যাক বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে থাকে।

তারপর মনে হল, ভাল্লুক কথাটা গালাগাল। ইংরেজিতে গালাগাল তেমন গায়ে লাগে না। একটা কথা অবশ্য ছেলেবেলা থেকেই সে শুনলে ক্ষেপে যায়। ব্লাডি কথাটা ওর কেন জানি সহ্য হয় না। সোয়াইন, বাস্টার, রাসকেল এসব কথা শালা শূয়োরের বাচ্চার মতো তত পাজি শব্দ নয়। সে ভাল্লুক কথাটাকে শালা শুয়োরের বাচ্চার মতো ভাবতে গিয়ে মুখ গোমড়া করে ফেলল। মুখ গোমড়া হলেই ভেতরে ভেতরে সে বেপরোয়া হয়ে যায়। সে তখন আর কিছু ভাবতে পারে না।

সে ফের ছুটতে থাকল। তা না হলে ডেবিড হুইল-ঘরে চলে যেতে পারে। সে অফিসারস গ্যালি পার হয়ে ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর দরজায় কড়া নাড়ল, সেকেন্ড সেকন্ড প্লিজ।

ডেবিড দরজা খুলে বলল, কি ব্যাপার?

—ওম্যান।

—কোথায়?

—এনজিন-রুমে।

–বলছ কি!

আর তখনই ছোটবাবু দেখল ওর প্রতিবিম্ব দর্পণে। একেবারে চেনা যাচ্ছে না তাকে। সে পোশাকের ভেতর হারিয়ে গেছে। শুধু মুখটা দেখা যাচ্ছে। মাংকি ক্যাপের জন্য সে কেমন ভুতুড়ে হয়ে গেছে। এমন মুখ এবং চেহারা হয় পোশাকের ভেতর আটকা পড়লে সে জানত না। বেশ মজা লাগছে দেখতে নিজেকে। সে নিজেই হেসে ফেলল, বলল, ছোটবাবু তুমি ভাল্লুক নও, একেবারে জাম্বুবান বলেই সে হাঁকল।—ওম্যান স্যার।

—ইয়েস স্যার ও–ম্যা.......ন।

ডেবিড ছুটছে, ছোটবাবু ছুটছে। ছোট চিৎকার করে বলছে, জাহাজে ওম্যান। ওরা ছুটে এসে এনজিন ঘরে ঢুকে গেল। আর চিৎকার করে বলতে থাকল ওম্যান। ওম্যান।

—কোথায়।

—আসুন না। দেখাচ্ছি। ওরা সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে গেল।

জাহাজে তখন খবর রটে গেল, যেমন খবর রটে যায় মৈত্রমশাই যাবেন সাগরসঙ্গমে, এগু জাহাজিদের কাছে সাগরসঙ্গম, না হলে সামান্য দুটো চড়াই পাখির পাশে দাঁড়িয়ে ছোটবাবু বলবে কেন, স্যার মিসেস স্পেরো।

—ইয়েস। ইয়েস।

—স্যার, মিঃ স্পেরো।

—ফাইন।

ছোটবাবু বলল, স্যার নেমে যাচ্ছি, দেখছি, কিচ-কিচ করছে। কে কিচ কিচ করে! ওমা দুটো পাখি। ওদের আমি জানি, এই যে ছাই রঙের দেখছেন এটা মিসেস স্পেরো, আর এই যে দেখছেন, গলার কাছে সাদা রঙ ওটা মিঃ স্পেরো।

তখন ডেবিড বলে উঠল, হ্যালো মিঃ এন্ড মিসেস হাউ ডু ইউ ডু।

—খুব ভালো আছে সেকেন্ড। ছোটবাবু কখন যে কি বলে! সেকেন্ড, স্যার, যখন যা খুশি। আসলে সে খুব অন্তরঙ্গ হয়ে গেলে—সেকেন্ড বলে ফেলে। যখন অফিসার ভেবে ফেলে, তখন স্যার। সে বলল, শীতে ভীষণ কষ্ট পাচ্ছিল, এনজিনের গরমে বেশ আছে এখন। দেখছেন না কেমন পাখা ঝাড়ছে। আবার আমাকে আপনাকে দেখছে ঘাড় বাঁকিয়ে।

—আমরা ওদের ডিস্টার্ব করছি না তো? সেকেন্ড বলল।

—না, না। দেখছেন না আমাদের ভয় পাচ্ছে না।

তারপর একে একে অনেকেই ছুটে এসেছিল। এসেই অবাক। দেখল মেজ-মালোম আর ছোটবাবু অতিকায় সার্কুলেটিঙ ফ্যানটার নিচে দাঁড়িয়ে আছে। তার নিচে মেন স্টিম-পাইপ, পাশে লম্বা রেলিঙ। রেলিঙে দুটো চড়ুই পাখি বসে পাখা ঝাড়ছে। উড়ছে। নাচছে গাইছে। মাঝে মাঝে কিচ কিচ করছে।

পাগল যেমন ছোট তেমনি মেজ-মালোম। পাগল না হলে দুটো পাখি নিয়ে এরকম একটা হৈ- চৈ বাধিয়ে দিতে পারে! আর তখন মৈত্র 'পরি'তে ছোটকে খুঁজছে। ওরা সারেঙকে বলে আটটা বারোটা ওয়াচ চেয়ে নিয়েছে। এটা সাধারণত সারেঙের ওয়াচ, কিন্তু সারেঙ মৈত্রের কথা ভেবেই হোক অথবা ছোটবাবুর কথা ভেবেই হোক ওয়াচ বদলে নিয়েছেন। আটটা বেজে গেছে। মৈত্র দেখল, ছোট নামেনি। সকালের চারটা-আটটার পরীদারেরা উঠে যাচ্ছে। মৈত্র এসেই স্টিম দেখে নিয়েছে। এখন স্টিম তর-তর করে নেমে যাবে। ফার্ণেসের ছাই ঝেড়ে দিতে হবে। র‍্যাগ মারতে হবে। অমিয় চুপচাপ উইন্ড-সেলের নিচে বালতি হাতে দাঁড়িয়ে আছে, ওদিকে ছোটবাবুর দাঁড়িয়ে থাকার কথা। কিন্তু সে নেই। এ বেশ ঝামেলা। বেশ বাবুটি বের হয়ে কোথায় যে চলে গেল। কেউ তো দাঁড়িয়ে থাকবে না। আগয়ালারা তিনটে বয়লার থেকে একেবারে সোজা সব আগুন টেনে ফেলে দিচ্ছে, এবং পর পর সাত আট বেলচা কয়লা হাকড়ে বালব্ খুলে দিচ্ছে। পায়ের কাছে আগুন ধক্ ধক্ করে জ্বলছে। স্টোক-হোলড লাল হয়ে গেছে তাপে। কেউ নিঃশ্বাস নিতে পারছে না। একা অমিয় জল মেরে আগুন আয়ত্তে আনতে পারছে না। মৈত্রকে ছোটাছুটি করতে হচ্ছে। সে এখন ছোটবাবুর হয়ে ক্রমান্বয়ে বালতি বালতি জল মেরে যাচ্ছে। ছাই টেনে জড় করছে। আর মাথায় রক্ত উঠে যাচ্ছে রাগে। কোথায় যে গেল! সে যেতেও পারছিল না। মোটামুটি সব ঠিকঠাক না করে স্টোক-হোলড ছেড়ে যেতে পারছে না। তাহলে স্টিম তর তর করে নেমে যাবে। স্টিম নেমে গেলে কেলেঙ্কারী। সে কোনরকমে মাথা ঠান্ডা রেখে যখন দেখল বেশ হাওয়ায় ফার্নেসের আগুন একবারে লাল, স্টিম- গেজের কাঁটা লাল দাগটা বরাবর থর থর করে কাঁপছে, তখনই সে দু-লাফে এঞ্জিনরুমে ঢুকে গেল। ছোটবাবুকে যেখান থেকে হোক ঘাড় ধরে নামাতে হবে। না হলে লজ্জা হবে না।

সে ওপরে উঠে অবাক। মেজ-মালোম আর ছোট দুই বন্ধুর মতো কথা বলছে। তিন নম্বর মিস্ত্রি নিচে দাঁড়িয়ে গজ গজ করছেন। হেল, এমন বলছেন। তিন নম্বর মিস্ত্রির কাছে টিন্ডালের বদনাম হবে। সে এটা দেখে আরও রেগে গিয়েছিল, কিন্তু কাছে গিয়ে মেজ-মালোমের সঙ্গে ওর এমন অন্তরঙ্গ কথাবার্তা শুনে আর ঘাড় ধরতে ইচ্ছে হল না। দুজন অসমবয়সী মানুষ জাহাজে এসে কেমন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে।

মৈত্র ডাকল, ছোট।

ছোট পেছন ফিরে তাকিয়ে জিভ লম্বা করে দিল, একেবারে ভুলে গেছি। বলেই আর দাঁড়াল না। এক দৌড়ে সে ওপরে উঠে গেল, টুইন ডেক পার হয়ে গেল। কিনার অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। শহর বন্দর দেখা যাচ্ছে না। সমুদ্র সামান্য ফের অশান্ত হয়ে উঠছে।

মৈত্র ওকে একটাও চড়া কথা শোনাতে পারল না। সে নেমে এসে বলল, এই অমিয় হাত লাগা।

—ছোটকে পেলি না?

—পেয়েছি।

—কি করছে?

—বাবু ওম্যান, আবিষ্কার করে মেজ-মালোমের সঙ্গে ওম্যান সম্পর্কে একটা বড় লেকচার দিচ্ছে। স্টোক-হোলড, খোলের সব চেয়ে নিচুতে বলে, ওপরে কি ঘটে, খবর রাখা ঠিক হয়ে ওঠে না। এখন এই যে এত বড় একটা খবর জাহাজে রটে গেল, অমিয় তার বিন্দুবিসর্গ জানে

না। সে কেমন অবাক হয়ে বলল, মৈত্র, বলিস্ কি!

—ঠিকই বলছি, ওম্যান!

—তার মানে মেয়েছেলে!

—হ্যাঁরে বাবা, ওম্যানের বাংলা মানে মেয়েছেলে, শালা তোর বাবাতো তোকে ইংরেজি স্কুলে পড়িয়েছিল রে। সাহেব করার ইচ্ছা ছিল, তা এখন ওম্যানের বাংলা মানেটা গুলিয়ে ফেলছ! কয়লায়ালা আর কাকে বলে!

—সত্যি বলছিস?

—মিথ্যা বলতে যাব কেন।

–কে ধরে এনেছে?

—কেউ না। নিজেই জাহাজে উঠে এসেছে।

—কোথায় নেমে যাবে?

—সে জানি না।

—মাইরি। আমি মরে যাব মৈত্র। বল, সব খুলে।

আগয়ালারা এসে জড় হয়েছে। মৈত্র ওদের সঙ্গে একটু রাশভারি কথাবার্তা বলে থাকে। এই যে মিঞারা কাম কর, খাড়ইয়া থাইক না। স্টিমের অবস্থা ভাল না। ওরা স্টিম দেখতে সরে গেলে মৈত্র বলল, চালা, হাত চালা। সে অমিয়র কথারও জবাব দিল না। এ্যাস রিজেক্টারে সে বেলচে মেরে ছাই তুলতে থাকল।

এবং তখনই দেখা গেল ছোটবাবু নেমে আসছে। নীল পোশাক সে পরেছে। যা পরে সে পরি দেয়, সেই পোশাক। মাথায় নীল রঙের টুপি। নিচে নেমে একটু যেন লজ্জায় পড়ে গেল। বেলচেটা নিতে গেলে মৈত্র বলল, যা, ওপরে যা। অমিয়, তুইও উঠে যা। কয়লা যা খাচ্ছে।

বাকি কাজটা মৈত্র করবে। আগয়ালাদের নিয়ে সে ফাঁকে ফাঁকে হাতে হাতে কাজটা সেরে ফেলবে। আগয়ালারা এটা করে থাকে। কারণ মৈত্রর মুখের ওপর তারা কথা বলতে পারে না। আগে কয়লায়ালাদের কাজ ছিল, সব কাজ কামের পর তাদের চানের জল তোলা। এবারে সারেঙসাব তাও বন্ধ করে দিয়েছেন। এ ভাবে কয়লায়ালারা বেশ মজা পেয়ে যাচ্ছে। ওরা মৈত্রের সামনে কিছু না বললেও নিজেরা ভেতরে ভেতরে সমালোচনা করতে ছাড়ছে না। কখনও কখনও এটা যে সারেঙসাবের কানে না গেছে এমন না। তিনি তখন বলেছেন, কেন করবে? তোমাদের চানের জল কয়লায়ালারা কেন গরম করবে। আগে করত, তোমরা ওদের বয়লারে কয়লা মারা শেখাতে, অসুখে বিসুখে অথবা কেউ কোন বন্দরে, নেমে গেলে, কাজের লোক হয়ে যেত কয়লায়ালা। বাড়িয়ালা খুশি হয়ে লিখে দিতেন সফরে কে কি কাজ করেছে। এখন তো বাপজানেরা তা আর হচ্ছে না। একটা সফর সেরে যেতে পারলেই আগয়ালা। তারপর কাজ দেখানোর পালা। সেটা তোমাদের হাতে না, সেটা সাহেবদের হাতে।

সুতরাং আর এ-নিয়ে বাড়াবাড়ি হয়নি। অমিয় বেলচে কাঁধে ওর, বাংকারে চলে যাচ্ছে। উঠে যাবার সময় সে লারে, লা লা বলে গান গাইছিল। অমিয়র চুল খাটো করে ছেঁটে দিয়েছে মৈত্র। চুল কাঁটার লোক না থাকলে যা হয়, মৈত্র ওদের চুল ছেঁটে দেয়। থ্যাবড়া ছাঁট। অমিয় মাথায় হাত দিয়ে মাঝে মাঝে বলতে ছাড়ে না, শালা চুল কাটতে কাটতে বউএর কথা ঠিক ভাবছিল।—দ্যাখ চুলটা পেছনে কি করে দিয়েছে!

ছোটবাবু দেখল, সত্যি চুলটার ভীষণ বাজে ছাঁট হয়েছে। এ-নিয়ে অমিয় তিন চারবার বলেছে। এখন বলছে, এজন্য যে, সে ছোটর কাছে কিছু জানতে চায়। সে বলল, ছোটবাবু কে এসেছে রে জাহাজে।

—কে আসবে!

—খুব র‍্যালা মারছিস!

—র‍্যালা মানে।

—ঐ খুব মেয়েছেলে নিয়ে ড ডট্‌। আমার যে কি হবে না! মাথার চুলটা এমন বাজে হেঁটে দিল। কে জানত বল, জাহাজে মেয়েছেলে উঠে আসবে। তারপর একটু থেমে বলল, কোথায় যাবে, সেন্টিস, মন্টিভিডিও না বুনোসাইরিস!

ছোটবাবু হেসে দিল। ধুস্‌, তুই যে কি না! তোকে কে বলেছে জাহাজে মেয়েছেলে প্যাসেঞ্জার যাচ্ছে! কেপটাউনে গেলে তবু হয়তো দেখা যেত মেয়েটেয়ে, পোর্ট এলিজাবেথ থেকে কে আর উঠবে! আমাদের নসিব খারাপ, জাহাজ সোজা আটলান্টিকে পড়ছে।

এদিকে তখন সুট থেকে গড় গড় করে কয়লা আগয়ালারা টেনে নিচ্ছে তো নিচ্ছেই। মৈত্র খেয়াল করছে না। মাথার ওপরে বাবুরা দাঁড়িয়ে গল্প করছে। সে এ্যাস-রিজেকটারে ছাই ফেলে দিচ্ছে। হঠাৎ মনে হল, ঠিক মাথার ওপর প্রায় ফুট বিশেক উঁচুতে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে গল্প করছে তারা। এবার সে চিৎকার না করে পারল না, এই হারামজাদা, রাসকেল, তোরা ভেবেছিস কি! আর সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল সব ফাঁকা। সঙ্গে সঙ্গে দুটো ছায়া দু'দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

মৈত্র ওপরে মুখ তুলে তখনও চিৎকার করে যাচ্ছে, আমি কিছু করতে পারব না। ভেবেছিসটা কি! সুট ভরতে না পারলে, ওয়াচের পর খেটে যেতে হবে। রোজ রোজ আমি পারব না। পরির বদনাম তোমাদের জন্য কেন নেব!

ছোটবাবু ঢুকে দেখল, কয়লা একেবারে অতলে। সে লম্ফটা হাতে নিয়ে সুটের পাশে দাঁড়াল। চারপাশটা ঘুটঘুটে অন্ধকার। ঠিক খাদের নিচে, মানুষ একা অন্ধকারে লম্ফ হাতে দাঁড়ালে যেমন দেখায়, তেমনি ভুতুড়ে। সে আর দাঁড়াল না। ডারবান থেকেও কিছু কয়লা নেওয়া হয়েছে। টুইন-ডেকের দু'দিকে কয়লার ডাই। এখন এক নাগাড়ে চব্বিশ-পঁচিশ দিন সমুদ্রে ভেসে যেতে হবে। যত ওরা দক্ষিণে নেমে যাবে তত শীত বাড়বে। ডেকের কয়লা মাঝ দরিয়ায় না গেলে ফেলা হবে না হয়তো নিচে। সে এবার বুঝতে পারল ঠিক এক নাগাড়ে ঘন্টা চারেকের মতো কয়লা ফেলতে না পারলে সুট সে ভরতে পারবে না।

এবং এ-ভাবে এক সংগ্রামের মতো, কখনও কখনও ভয়ে রাতে ঘুম আসে না, সকাল হলেই ওয়াচ, অথবা রাত আটটা বাজলেই ওয়াচ। বাংকে শুয়ে থাকলেও মনে হয়, কেউ যেন অনেক দূরে হেঁকে যাচ্ছে, যোয়ানলোগ টান্টু। এই এক শব্দ, অনেকটা টেনি টরেন্টো শব্দের মতো। গর্ভিনী তিমি শিকার করে ফেরার সময়, সমুদ্রে এমন একটা শব্দ শিকারীরা শুনতে পায়। গর্ভিনী তিমিরা কত যে অবলীলায় ভেসে ভেসে বেড়ায় সমুদ্রে। ছোটবাবুও বাংকে শুয়ে থাকলে এমন সব শব্দ শুনতে পায়। বুক তার ধুকপুক করতে থাকে সে নিজের এই আতঙ্কের কথা কাউকে বলে না। যেন গ্রাহ্য করছে না, সে অন্য সবার মতো কাজ করতে পারছে এটা প্রমাণের জন্য আর এক মুহূর্ত নষ্ট করল না। দরজার কাছে সে লম্ফটা রেখে এল। মেডিসিন কারটা সে ঠেলে নিয়ে গেল সামনে। সুট থেকে কয়লা দূরে সরে যাচ্ছে ক্রমশ। সে নুয়ে দ্রুত বেলচা দিয়ে গাড়ি ভরে ফেলল। তারপর দু হাতে সামনে ঠেলে দিল গাড়িটা। এখন আর ভারি গাড়িটা মাঝে মাঝে কাত হয়ে পড়ে যায় না। সে ঠিক ঠিক সুটের মুখের কাছে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিতে পারে, ঢেলে দিতে পারে, সে গাড়ি টানছে, কয়লা তুলছে, সুটে এনে ফেলছে। লম্ফটা দপ দপ করে জ্বলছে, আবার কখনও ঘন অন্ধকার, ওকে ছায়ার মতো মনে হয় তখন। সে ঘেমে নেয়ে যাচ্ছে। ওর জামা প্যান্ট ভিজে গেছে।

বাংকারে বুটের শব্দ, ঝম ঝম কয়লা ভরার শব্দ, থপ থপ করে হেঁটে যাবার শব্দ, গড় গড় করে কয়লা সুটে ফেলে দেবার শব্দ। এ-ভাবে সব নানা রকমের অতিকায় শব্দ ক্রমে গড়াগড়ি খেতে থাকলে, একসময় মৈত্র এসে দেখল, ছোট এক মুহূর্ত বিশ্রাম নিচ্ছে না। মৈত্র বলল, আমি ভরছি, তুই ফেল।

—না, তুমি যাও। আমি ঠিক পারব।

—ওয়াচের লোকেরা নেমে গেছে।

—আর ক'গাড়ি ফেললেই হয়ে যাবে। তুমি চলে যাও। পেটে আগুন জ্বলছে। খেতে বসে দেরী করতে পারব না।

অমিয় এবং মৈত্র উঠে গেল। ছোটবাবু এখানেই ছোটবাবু। সে কারও সাহায্য না নিয়ে কখনও কখনও খুবই যে সে দায়িত্বশীল বুঝিয়ে দিতে চায়।

মৈত্র এবং অমিয় সিঁড়িতে পা রাখার সময় শুনল, অনেকটা হিসাব রাখার মত, ছোটবাবু গাড়ি টেনে নিচ্ছে, আর হরে রাম বলছে, এক, দুই হরে রাম, হরে হরে এক দুই, গাড়ি ফেলে দিলে তিন, চার পাঁচ এবং শেষে একসময় যখন দেখল কয়লায় ভরে উঠছে সুটের মুখ সে একেবারে ছাদের দিকে বেলচে ছুঁড়ে দিয়ে, গাড়িটা কয়লার কাছে লাথি মেরে উল্টে সোজা দৌড়ে বোট-ডেক পার হয়ে গেল।

আসলে রোজ রোজ সে এভাবেই কাজের শেষে যেন কিছু আবিষ্কারের মতো চিৎকার করে ওঠে, সাবাস ছোটবাবু, সুট ভরে মাথা কিনে নিলে!

কারণ কাজটা তার কাছে প্রায় দুর্গম গিরি প্রান্তর পার হয়ে যাওয়ার মতো। সে রোজ রোজ এভাবে ভরে ফেলে সাংঘাতিক কিছু করে যাচ্ছে। সে জীবনের কাছে হেরে যাচ্ছে না। যত এমন ভাবে, তত বেঁচে থাকার আকাঙ্খা বাড়ে। সে ভাল করে স্নান করে। সে ওয়াচের জামা প্যান্ট পাল্টে বাথরুমে একেবারে উলঙ্গ হয়ে যায় এবং গরম জল ঢেলে সে যখন স্নান করে তখন মুখে শরীরে সাবানের ফেনা। সারা শরীরে অজস্র সাবানের ফেনা এবং বুদবুদ, সে মাঝে মাঝে হাত পা ঘসতে ঘসতে টের পায়, পেশী শক্ত হয়ে যাচ্ছে, সমুদ্রের বাতাসে শরীরের রঙ ক্রমশ উজ্জ্বল হয়ে যাচ্ছে। জল ঢেলে দিলে শরীরে বিন্দু বিন্দু ফোঁটা সারা শরীরে আর শরীরময় আকাঙ্খা। সে চুপচাপ তখন কেমন শুধু দাঁড়িয়ে থাকে। তার কিছু ভাল লাগে না তখন। মার চিঠি এল না, কেউ তাকে চিঠি দেয় না। সে নিরুদ্দেশে, সবাই হয়তো ভেবেছে, ছেলেটা বেঁচে নেই।

তখন অমিয় ডাকল, কিরে কতক্ষণ ধরে চান করছিস। তোর ক্ষিদে পায় না?

সে সত্যি খুব ক্ষুধার্ত। সে এক মুহূর্ত আর দেরি করতে পারল না। এতক্ষণ যে শরীর অবশ অবশ মনে হচ্ছিল, সে যেন জোর করে তা অস্বীকার করতে চেয়েছে। সে আর দেরি করতে পারছে না। পাজামা পরে নিল। জামা, গরম পুল-ওভার পরে সে সোজা মেসরুমে ঢুকে বলল, দে।

টেবিলে যে যার মতো খাচ্ছে। কেউ নিচে বসে খাচ্ছে, কেউ টেবিলে বসে খাচ্ছে। বড় টিনের ভেতর ডাল। কাঠের হাতা, ডেকচিতে ভাত। ডাল যে যার মতো তুলে নিচ্ছে। 'বিশু'র সবাই গোল হয়ে বসে গেছে খেতে। যাদের খাওয়া হয়ে গেছে তারা এখন ডেকে মাদুর পেতে নামাজ পড়ার আগে দাঁত খুঁটছে। রুপোর খড়কে। গলায় ঝুলানো। ছোটবাবু এসব কিছুই দেখছিল না। সে আসলে মুখ বুজে খাচ্ছে। আলুভাজা, ডাল, মাংস হয়নি। মটন হলে সে খায়, না হলে খায় না। বাঁধাকপির সঙ্গে মাংসের ছোট ছোট টুকরো দিয়ে বেশ একটা সুস্বাদু খাবার ভান্ডারি তৈরি করেছে। খেতে ভাল হয়েছে বলে সে গলা পর্যন্ত খেয়ে যাচ্ছে। আর মাঝে মাঝে অমিয়, মৈত্র দেখছে, ছোটবাবুকে। কিছু বলছে না। বেশ খেয়ে গেল ছোটবাবু। খাওয়া হলে মৈত্র বললে, বাঁধাকপি দিয়ে গোস্ত হয়েছে। কেমন লাগল রে?

—খুব ভাল হয়েছে। ভান্ডারি জ্যাঠা বেশ রেঁধেছে। জ্যাঠার হাত যা খোলে মাঝে মাঝে! ভান্ডারি তখন গ্যালি থেকে গলা বের করে হঠাৎ জিভে কামড় দিয়ে ফেলেছে।—তুমি খাইলা জ্যাঠা!

—হ খাইলাম। ভান্ডারি বুড়ো মানুষ, রোগা রোঁয়া রোঁয়া চুল মাথায়। তাকে খেতে শুনে এমন জিভ বের করে দিয়েছে কেন সে তার কিছুই বুঝতে পারল না।

সে বলল, না খাইলে পারতা।

—ক্যান এমন কথা কন!

ভান্ডারি কিছু না বললেও সে বুঝতে পারল, সে আজ বিফ খেয়েছে। সে তো কিছু বোঝেনি, সে তো বুঝতে পারেনি, বিফ কি মটন! তা ছাড়া ইদানিং ওদের জন্য ভান্ডারী আলাদা মটন বাটলারের কাছ থেকে বলে কয়ে নিত। কিন্তু আজকে নানা কারণে এটা হয়তো সম্ভব হয়নি। ভান্ডারিকে চারপাশ সামলাতে হয়। সব কিছু এক হাতে করতে হয় মানুষটাকে। খেয়াল না থাকার কথাই! তা ছাড়া ওর তো কিছু হচ্ছে না, বমি হচ্ছে না, না বমি একেবারেই পাচ্ছে না। তবে কি এটা জুজুর ভয়! সে যেন কেমন সাংঘাতিকভাবে বলে ফেলল, খেতে তো জ্যাঠা খারাপ লাগল না। বেশ লাগে খেতে।

মৈত্র বলল, সহসা চিৎকার করে বলল, থ্রি চিয়ার্স ফর ছোটবাবু।

ছোট উঠে পড়ল। তবু মনের ভেতর এক আশ্চর্য অহমিকা আছে, কিংবা দীর্ঘ দিনের সংস্কার, সে একেবারে তার সবকিছু উড়িয়ে দিতে পারে না। যত এমন ভাবছে, মনে হচ্ছে, না এটা ঠিক না, কাল আবার হয়তো আগে জানতে পারলে গা ঘিন ঘিন করবে। সে ভাবল, আর কখনও মাংসের ব্যাপারে কোন কথাবার্তা বলবে না। যেমন সবাই খায় মুখ বুজে খেয়ে উঠবে।

তখন ভদ্রা জাহাজের স্মৃতি তাকে কেন যে তাড়া করে—কে যেন ডেকের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে, আর কে যেন বলছে, বিফ খানে সাক্তা! তোমকো বিফ্ জরুর খানে হোগা।

গোটা ব্যাপারটা তার কাছে এখন হাস্যকর। এমন সুন্দর দিন যেন হয় না। জাহাজ এখন কোথায়? বোধহয় ভারতবর্ষের শেষ সংযোগটুকু আজ মুছে যাবে। কথা আছে জাহাজ দুটোর ভেতর আটলান্টিকে পড়বে। ঠিক সময়টা কেউ জানে না। আবার আটটায় ওয়াচ। এখন আর গিয়ে ফোসকালে চিৎপাত হয়ে শুয়ে লাভ নেই। সেই যে দূরবর্তী এক উপকূলে তার বাসভূমি ফেলে এসেছে, সেই যে ক্রমান্বয়ে জাহাজের প্রপেলার কেবল ঘুরতে থাকল, সেই যে সে দিনরাত জাহাজ ডেকে পায়চারি করতে করতে দেখল, সমুদ্র উত্তাল, ভয়াবহ, ওর শেষ বাসভূমির গাছপালা ছায়া ছায়া হয়ে যাচ্ছে, ক্রমে সেটা মেঘের মতো দিগন্ত রেখায়, তারপর মিশে গেছে আকাশের সঙ্গে, তারপর সেই অসীম যাত্রা, সমুদ্রে সমুদ্রে ওরা ভারত মহাসাগর পাড়ি দিয়ে চলেছে, আজ ওরা শেষবারের মতো তাও পার হয়ে যাবে। সে এখানে দাঁড়িয়ে থাকবে। নিচে এখন নামবে না। ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে শুধু। দাঁড়িয়ে থাকতে তার ভাল লাগবে। রেলিঙে দাঁড়িয়ে মেজ-মালোমকে ডেকে বলবে, স্যার বলবেন, কখন জাহাজ আটলান্টিকে পড়ছে।

সে এ-ভাবে যখন দাঁড়িয়েছিল, কেমন যেন একাকী, নিঃসঙ্গ। সে শীতের জন্য বেশ গরম পোশাক, পোশাক বলতে পুরোনো বাজার থেকে কেনা পোশাক। সে তাই সাদা প্যান্টের ওপর পরেছে। ঘন চুল সমুদ্রের হাওয়ায় নীল দেখাচ্ছে। আকাশ পরিচ্ছন্ন। তবু সমুদ্রে বেশ ঢেউ আছে। সে সোজা দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। জাহাজে সামান্য পিচিং, সে এখন আর এ-সব আমল দেয় না। এই পিচিং তার ভাল লাগে। ওর কেমন তখন চোখে ঘুম জড়িয়ে আসে। দূরে, দিগন্তরেখায় সব পাখিরা যায়, কোথায় যে যায়, উড়ে উড়ে কোন মহাসমুদ্রে যায় সে জানে না। সে তখন কেবল ওদের অবাক হয়ে দেখে।

মৈত্র ফোসকালে ছোটবাবুকে দেখতে না পেয়ে ওপরে উঠে এল। ওপরে উঠে দেখল, টুইনডেকে রেলিঙে দাঁড়িয়ে ছোটবাবু সমুদ্র দেখছে। ওর মনে হল বিফ খেয়ে বোধ হয় ছোটবাবুর মন ভাল নেই। কাছে গিয়ে সে দাঁড়াল। কিছু বলতে প্রথমে সে সংকোচ করল। তারপর যেন আর না বলে পারল না। কিরে বিফ খেয়েছিস বলে মন খারাপ!

তখন মেজ-মালোম, ডেবিড চিৎকার করে ছোটকে বলচে, সামনে আটলান্টিক ছোট। ভালো করে দ্যাখো। আটলান্টিক কি বিশাল, মহান সমুদ্র। দ্যাখো। দেখলে তোমার আর দুঃখ

থাকবে না।

॥ দশ ॥

সাগরের জল নীল, সব সাগরের জল নীল। যেখানে যখন সমুদ্র আলাদা নামে ভাগ হয়ে গেছে, ঠিক সেখানে তারা এমন কিছু দেখতে পায় না, যা দেখে সমুদ্রকে আলাদা নামে চেনা যায়। সেই নীল রঙ, সেই শান্ত নিরিবিলি আকাশ, সেই উড়ুক্কু মাছেদের উড়ে উড়ে জলের ওপর খেলা। তীরের মতো ওরা হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে আবার জলে ডুবে যায়। এবং সমুদ্র-পাখীরা কখনও কখনও দেখা যায় পেছনে উড়ে আসছে। ঝড়ের সময়ও ঠিক তেমনি। যেন এক ভয়ঙ্কর সমুদ্রের ভেতরে, ভয়ঙ্কর সব ঢেউ আর মেঘলা আকাশের নিচে জাহাজ ছোট কাগজের নৌকার মতো। জাহাজের ওপর দিয়ে ঝড়ের দাপট, অথবা ঢেউগুলো কি আশ্চর্যভাবে যে ডেকের ওপর দিয়ে কখনও বোট ডেকের ওপর দিয়ে ভেসে চলে যায়। যেন সমুদ্র আর জাহাজের এক খেলা, মায়ার খেলা, অথবা লুকোচুরি খেলা। জাহাজ কখনও কখনও ঢেউয়ের ভেতর হারিয়ে গিয়ে বিশাল সমুদ্রের সঙ্গে তামাসা করে। আবার ভেসে উঠলে, প্রচন্ড রোষ সমুদ্রের, সে প্রবল বেগে আছড়ে পড়তে চায়। আর সামান্য জাহাজিরা তখন স্টোক-হোলডে বয়লারের সঙ্গে, আগুনের সঙ্গে লড়াই করতে করতে কত সহজে এইসব রোষ থেকে জাহাজকে যে রক্ষা করে থাকে। মানুষ এ-ভাবে সমুদ্রের সমস্ত অহঙ্কার ভেঙে দেয়। সে তার ঢেউ ফালা ফালা করে একদিন ঠিক শান্ত আকাশের নিচে চলে যায়। মনেই হয় না সমুদ্র সেদিনও জাহাজটাকে কি যে দুর্গতির ভেতর ফেলে দিয়েছিল। সমুদ্র ভালমানুষের মতো একেবারে সরল সহজ হয়ে গেলে, জাহাজিরা কাজের শেষে রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে থাকে। অবসর সময়ে ছোটবাবুর সমুদ্র দেখা বাদে যেন আর কাজ থাকে না তখন। অথবা বর্ণময় দ্বীপের অসংখ্য গাছপালা।

এবং এভাবে ছোটবাবু কখনও ডেকে, কখনও ফল্কায় অথবা মধ্যরাতে ঘুম না হলে সে একাকী উঠে আসে। সবাই ঘুমোচ্ছে। কেবল ডগ-ওয়াচে ওয়াসিন কিংবা অন্য কোনও ডেক-জাহাজি পাহারায় আছে। আর ব্রীজে ছোট-মালোম। স্টোক-হোলডে ফায়ারম্যান, টিন্ডাল। ফানেলের গুঁড়িতে উঠে গেলেই দেখা যাবে যেন পাতালে ক'জন ক্ষুদ্রাকৃতি মানুষ, ফার্নেসের দরজা ঠেলে র‍্যাগ মেরে ওল্টে পাল্টে দিচ্ছে আগুন। ওদের মুখগুলো আগুনে ঝলসে উঠলে বোঝা যায় মধ্যরাত্রিতে কেউ জেগে থাকে না, শুধু ওরা জেগে আছে। এনজিনে জেগে আছেন তিন নম্বর মিস্ত্রি। সে চুরুট খাচ্ছে আর মাঝে মাঝে স্টিম ঠিক আছে কিনা দেখছে। জেনারেটর ঠিকমত কাজ করছে কিনা লক্ষ্য রাখছে। ব্লিজ পাম্প চালিয়ে দিচ্ছে মাঝে মাঝে। চারপাশটায় লক্ষ্য রেখে, যেমন সে মাঝে মাঝে সার্কুলেটিঙ পাম্পে হাত দিয়ে দেখছে খুব বেশী গরম হয়ে গেল কিনা জলটা—এভাবে শুধু জেগে থাকা। অনেক উপরে ঠিক স্কাই-লাইটের ফাঁকে দেখা যায় আকাশটা ক্রমে সরে যাচ্ছে। কখনও মনে হয় আকাশটা ভীষণ দুলছে। এ-ভাবে জাহাজ ক্রমাগত চলছে।

ক্রমাগত দিনের পর দিন এ-ভাবে শুধু চলা। জাহাজের চেহারা ওয়াচে ওয়াচে পাল্টে যায়! সমুদ্রে মধ্য রাতের চেহারা যেন সবচেয়ে নিঝুম। এবং এ-সময় কাপ্তানের ঘরে কোন আলো জ্বালা থাকে না। পোর্টহোল দিয়ে উঁকি দিলে দেখা যায় বড়-মিস্ত্রি একজন অসহায় বালকের মতো কম্বলের নিচে পা মুড়ে শুয়ে আছে। এনজিনের শব্দ কেবল উঠে আসে ভেতর থেকে, আর সব আলো জ্বালা ডেকে, উইংসের আলোগুলো মায়াবী এক জগত তৈরী করে দেয়। গভীর নীল সমুদ্রে সাদা জ্যোৎস্নায়, সাদা জাহাজ গভীর রাতে যখন যায়, তখন এক ছোট্ট সচল নগরী অথবা যেন জাহাজের সুন্দর সুচারু গতি দেখলে ঈশ্বরের পৃথিবীকে ভীষণ ভালবাসতে ইচ্ছে করে।

মধ্যরাতে ছোটবাবুর কখনও কখনও ডেকের ওপর দিয়ে হেঁটে বেড়াতে ভাল লাগে। সহসা কেউ দেখলে ভূত টুত বলে চিৎকার পর্যন্ত করতে পারে। কারণ কোয়ার্টার মাস্টার মহসীনের বিশ্বাস জাহাজে যেমন সবাই আছে, তেমনি ভূতও আছে। জাহাজে মানুষ থাকবে, ভূত থাকবে না, সে বিশ্বাস করতে পারে না। সে তার সফরের কত এমন সব ভূতের যে গল্প

করেছে। এবং এ-সব গল্প শুনলে, ডেকে একা ঘুরে বেড়াতে সত্যি ভয় লাগে। যেমন একটা ভূত ছিল, সিটি অফ পানামাতে। সে ডেকে মধ্য রাতে কোন জাহাজি পেলেই একেবারে ঠেলে সমুদ্রে হারিয়া করে দিত। যেমন একবার একটা ভূত একজন জাহাজির গলায় দড়ি লাগিয়ে একেবারে মাস্তুলের ডগায় ঝুলিয়ে দিয়েছিল। কাপ্তান নানাভাবে ভূতটাকে খুঁজে বেড়ালেন। তারপর দেখা গেল কাপ্তান নিজেই একেবারে চিৎপাত হয়ে পড়ে আছেন ইনজিন ঘরে। জ্ঞান ফিরে এলে তিনি বলেছিলেন, কেউ তাকে যেন, একটা বাতাস টাতাস হবে, ঠেলে নিচে ফেলে দিয়েছে।

এবং ছোটবাবু ঠিক দুপুর রাতে একা একা ঘুরে বেড়ালে—সেই সব ভূতের নানারকম কীর্তিকাহিনীর কথা মনে করতে পারে। ওর ভয় যে না হয়, তা নয়, তবু এই নিঃসঙ্গতায়, এবং সমুদ্রের গভীরে, অর্থাৎ হাজার হাজার মাইল এ ভাবে সমুদ্রের ভিতর দিয়ে যাওয়া এবং মধ্যযামিনীতে কখনও কখনও একা দাঁড়িয়ে থাকা এক ভীষণ রোমাঞ্চ সে বুঝতে পারে। এইসব মধ্যযামিনীতে সে কি যে প্রলোভনে পড়ে যায়! তার মনে হয় সে এ ভাবে একদিন ঠিক এই পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে ঘরে ফিরে যাবে। মানুষের কাছে এর চেয়ে বড় কি আছে! কারণ সে জানে ঘরে ফিরে গেলে, কত সব গল্প, মা চুপচাপ কুপি জ্বেলে বলবে, তারপর! ভাইবোনগুলো বলবে, তারপর

তারপর কি, সে নিজেও জানে না। কারণ, কোনও চিঠি কোথাও থেকে না এলে সে বুঝতে পারবে না ওরা কোথায় আছে। তখন ডেকে দাঁড়িয়ে তার কেমন গলা ধরে আসে। তার এত অহংকারের উপার্জন কোনও কাজে এল না। মানি অর্ডারের টাকা কোম্পানীর ঘরে ফিরে গেছে।

ঠান্ডায় জাহাজিরা কাঁপছে, সমুদ্র থেকে ঠান্ডা বাতাস উঠে আসছে। গ্যালি থেকে কেউ যেতে চাইছে না। বুড়ো মানুষ ভান্ডারী, সবাই এসে গ্যালিতে ভিড় করলে ভীষণ বিরক্ত হয়। একে ছোট্ট জায়গা, সবাই হাত সেঁকলে, সে দাঁড়ায় কোথায়। তার যে কত কাজ! সে উনুনে বড় তামার ডেকচিতে ডাল, আর ভাত বসিয়েছে। একটা বড় কড়াইয়ে সে চর্বি দিয়ে রুটি ভাজছে। যে যার মতো তুলে নিচ্ছে, এবং রোদে দাঁড়িয়ে খাচ্ছে।

এবং চড়ুই পাখি দুটো বসে আছে রেলিঙে। ওরাও শীতে কাঁপছে। এদের জন্য ছোটবাবু ভেবেছে একটা বাসা বানাবে। বাসাটাতে খড়কুটো দিয়ে এমন গরম জায়গা বানাবে, যাতে ওদের থাকতে কোন অসুবিধা না হয়। ছোটবাবু বুঝতে পারল না বোট-ডেকের রেলিঙে ওদের কি দরকার বসে থাকা। এখন এনজিন-ঘরে বেশ গরম। বয়লারের ওপর কোনও রেলিঙে-টেলিঙে বসে থাকলেই হয়ে যায়। না, তা না। সে ভেবেছিল, ওয়াচে নামার আগে ওদের তাড়িয়ে এনজিন ঘরে নিয়ে যাবে। অবসর সময়ে সে ওদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে থাকে। ওর সঙ্গে যখন কথাবার্তা হয়, তখন জ্যাক আসে, মেজ-মালোমও আসে। কখনও কখনও জ্যাক পাখি দুটোকে, বিশেষ করে মেয়ে-পাখিটাকে জাহাজ ছাড়া করতে চায়। কি দরকার, মেয়ে পাখি থাকার। যেন হেগে-মুতে জাহাজ নোংরা করছে। জ্যাকের ভীষণ রাগ এই মেয়ে পাখিটাকে নিয়ে। আর মেজ-মালোম এবং সে শুধু, সে কেন, এখন তো জাহাজে এত একঘেয়েমী, যে এ-দুটো পাখি জাহাজে ভীষণ বৈচিত্র্য বয়ে এনেছে।

সবাই ভেবে ফেলেছে তাদের মতো, পাখি দুটোও জাহাজের যাত্রি। এদের জন্য কখনও কখনও জাহাজিরা খাবার রেখে দিতে ভালবাসে। খেতে খেতে মনে পড়ে গেল, আরে মিঃ স্পেরো, মিসেস স্পেরো! কোন দরকার নেই। কারণ ওরা খুঁটে খুঁটে খায়, ওতেই চলে যায়। গ্যালিতে আসতে ভয় পায়, এত লোক দেখলে ভয়, তবু বেঁচে থাকার মতো খাবারের ভাবনা ওদের নেই। তবু জাহাজিদের যে কি হয়, খেতে খেতে মনে পড়ে গেলে, কখনও আপেলের টুকরো, কখনও কুচি মাংস, কখনও রুটির ভগ্নাংশ রেখে দিয়ে যেন মনে করে থাকে, এটা ঠিক জাহাজ চালিয়ে নেওয়ার মতো আর একটা কাজ। ওরা যেতে যেতে পাখি দুটোকে খুঁজে বেড়ায়। চারপাশে খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে না দেখতে পেলে, ভাবে, কি হল, কোথায় গেল!

যেন তখন তোলপাড় পড়ে যায়, কোথায় কোথায়! পাখি দুটোকে তো আর দেখা যাচ্ছে না।

তখন হয়তো কাপ্তানের ছেলে পাখি দুটোকে নিয়ে ঠিক ব্রীজের নিচে বসে আছে। সে বসে রয়েছে একটা টিনের চেয়ারে। সে বোধ হয় পরে আছে লম্বা সাদা ট্রাউজার। সে পরে আছে লম্বা সার্টের ওপর ঢোলা পুল-ওভার, সে পরে আছে একটা ষোড়শ শতাব্দীর জলদস্যুসের টুপি, ওর পায়ে নীল রঙের জুতো, এবং কালো মোজা। ওর হাতে দস্তানা সাদা রঙের। চুল আরও বড় হয়ে গেছে। সে পা দুটো সামনের দিকে ছড়িয়ে দিয়েছে। তার পায়ের চারপাশে পাখি দুটো উড়ে বেড়াচ্ছে। পাখি দুটোকে ওর আপেলের কিছু অংশ কখনও রুটির অংশ সে ছুড়ে দিচ্ছে। পাখিগুলো খেয়ে যাচ্ছে। এটা একটা এখন জ্যাকের খেলা হয়ে গেছে। সে যেন জাহাজে বেশ একটা কাজ পেয়ে গেছে। পুরুষ পাখিটাকে সে বেশি খাওয়াতে ভালবাসে।

পাখিদের খাওয়ানোর সময় হাতের দস্তানা খুলে ফেলে। দস্তানা সে কোমরে বেল্টে গুঁজে রাখে। সে কেমন এক অতীব সুন্দর ছবি তৈরি করে ফেলে ডেকে। জাহাজে থাকলে চুল চোখ কি মানুষের ক্রমে' নীল হয়ে যায়! ছোটবাবু পাশে গিয়ে দাঁড়ালে বুঝতে পারে না, চুলে এমন সুন্দর গন্ধ কি করে হয়। সে তো কিছু মাখে না। জ্যাকের শরীরে এই যে ঘ্রাণ, যেন সব জাহাজিদের চেয়ে আলাদা। কাছে গেলে নড়তে ইচ্ছে হয় না। জ্যাকের পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে তার ভীষণ ভাল লাগে। পাখি দুটো চারপাশে তখন উড়ে বেড়ায়, আর কিচ কিচ করে ডাকে।

জ্যাক একদিন দেখল, ছোটবাবু চুপচাপ গ্যালির পাশে কি করছে। ছোটবাবু ঠুক ঠুক করে কাঠে পেরেক মেরে যাচ্ছে। কি হবে, এই বাকসো দিয়ে সে বুঝতে পারছে না। ছোটবাবুও কিছু বলছে না। তারপর ডাকল, জ্যাক!

এ-ডাক জ্যাক কেন যে অবহেলায় মাড়িয়ে যেতে পারে না। কেমন সরল অনাড়ম্বর ডাক। সে এলেই ছোটবাবু বলল, তুমি একটা কাজ করবে জ্যাক?

জ্যাক বুঝতে পারে না কি কাজ!

সে বলল, হাতুড়িটা বড়। একটা ছোট হাতুড়ি কশপের আছে। আমি চাইলাম, দিল না। তুমি যাবে? আমাকে এনে দেবে?

জ্যাক লাফিয়ে চলে যাচ্ছিল, তখন আবার ছোটবাবু ডাকল, আর শোন তুমি কটা কাঠ, কিছু পেরেক আরও আনতে পার কিনা দেখবে। আমাকে দিল না। বলল, মেজ-মিস্ত্রি বকবে। তুমি যদি পারো।

জ্যাক যখন ফিরে এল, ছোটবাবু অবাক। কশপের কাঁধে কোমরে, প্রায় কশপকে চেনা যায় না, কাঠ বোঝাই হয়ে কশপ চলে এসেছে। এক গাদা কাঠ জ্যাকের হাতে, এত দিয়ে কি হবে, সে বুঝতে পারছে না।

ছোটবাবু বলল, আরে এটা করেছ কি!

জ্যাক পাশে কাঠ রেখে বসল। বলল, বেশ বড় করে বানাবে।

কশপ দাঁড়িয়ে আছে। সে জ্যাক না বললে নামাতে পারছে না। দাঁড়িয়েই আছে।

ছোটবাবু বলল, চাচা ওগুলো নিয়ে যাও। লাগবে না। জ্যাক যা এনেছে ওতেই হয়ে যাবে।

—তোমার পেরেক লাগবে না?

—জ্যাক আনে নি!

এনেছে। আমার কাছে ভাল পেরেক আছে। তিনটে হাতুড়ি এনেছি, কোনটা লাগবে বল।

—লাগবে না। জ্যাকের হাতুড়ি হলেই হবে। তুমি বরং এটা নিয়ে যাও। বলে সে হাতের হাতুড়িটা দিতে গেলে দেখল, নেবার মতো ক্ষমতা ওর নেই। এই কাঠগুলো ফের বয়ে নিতেই কষ্ট হবে। সে উঠে দাঁড়াল। কাঠগুলো সব নামাল। বলল, তুমি হাতুড়িটা নিয়ে চলে যাও।

কাঠগুলো যা লাগে নেব, বাকিটা আমি রেখে আসব।

এখানেই কেন জানি ছোটবাবুর জন্য সবার মায়া। এটা সে জানে, মানুষের কোথায় সব নরম জায়গা থাকে, সে নিজেও একটা দুঃখের ভিতর পড়ে গেছে, সে জন্য কারু সঙ্গে ছোটবাবু খারাপ ব্যবহার করতে পারে না। শৈশব থেকেই সে এমন একটা স্বভাবের ভেতর মানুষ হয়েছে।

এবং এ-ভাবে ছোটবাবু এক জাহাজি। আর কেউ জানে না, জ্যাক একটা মেয়ে, ছেলে সেজে বেশ চালিয়ে যাচ্ছে। কাপ্তান একদিন আবার জোর করে বনির চুল ছেঁটে দেবে বলে বনিকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। চুল ছেঁটে দেবার সময় জাহাজে এক দৃশ্য তৈরি হয়। বনিকে খুঁজে পাওয়া যায় না। কাপ্তান, সারেঙ, বড়মালোম সবাই মিলে তখন কেবল খোঁজে। বনি কোথায় যে লুকিয়ে থাকে তখন!

ছোটবাবু তখন বাংকারে কাজ করছিল। একটা লম্বা রাবারে মোড়া তারের মাথায় বাল্ব জ্বলছে। মাঝে মাঝেই টানাটানিতে নষ্ট হয়ে যায়। তখন থাকে একটা লম্ফ। লম্ফের আলোতে বাংকারটাকে কয়লার খাদ বাদে আর কিছু ভাবা যায় না। সে অন্ধকারে একা গাড়িতে কয়লা ভরে যাচ্ছে। শীতকাল, প্রচন্ড ঠান্ডায় সে ঘামছে। ওর মুখ কয়লায় কালো হয়ে গেছে। সে মাঝে মাঝে বেলচায় কয়লা ওপর থেকে টেনে নামাচ্ছে। বড় বড় পাথরের মতো কয়লার চাঙ এখন নেই। কয়লা কিছুটা ইংলিশ কোলের কাছাকাছি। খুব পরিশ্রম হবার কথা না। তবু সে তাড়াতাড়ি সুট ভরে ফেলতে পারলেই ছুটি পেয়ে যাবে। সে তাই এক নাগাড়ে কাজ করে যাচ্ছে। আর তখনই ফিস ফিস গলায় কে ডাকলে, ছোটবাবু আমি।

মইসীন মিঞার ভূতের গল্প সারা জাহাজে একটা ভয় ছড়িয়ে রাখে। ছোটবাবু মাঝে মাঝে একা বাংকারে ঢুকতে ভয় পায়। জাহাজের ভেতর এটাই সবচেয়ে বোধহয় অন্ধকার জায়গা। মাল গুদাম ছাড়া এত অন্ধকার আর কোথাও নেই। সে ভয়ে সহসা সোজা হয়ে গেলে দেখল, জ্যাক ওর পাশে দাঁড়িয়ে বলছে, প্লিজ ছোট।

ছোটবাবু কিছুই বুঝতে পারে না। সে বলল, কি!

—আমি এখানে লুকিয়ে থাকব।

—কেন?

—বাবা চুল কেটে দেবার জন্য খুঁজছে।

—আমাকে তবে জাহাজ থেকে নামিয়ে দেবে না!

—না। আমি বলছি তোমাকে কিছু বলবে না।

এ-ছাড়া সেই অস্পষ্ট অন্ধকারে বনির মুখে ভীষণ কষ্টের ছাপ, ছোটবাবুকে কেমন কাতর করে ফেলে। সে বলল, ঠিক আছে। ওদিকে চলে যাও। আমি এলে বলব, এখানে কেউ নেই।

—ওরা তবে খুঁজে বের করে ফেলবে!

—তবে কি করতে চাও?

—তুমি আমাকে বেলচাটা দাও। আমি কয়লা ফেলতে থাকি।

—আমি কি করব?

—তুমি স্টোক-হোলডে নেমে যাও।

—কিন্তু........।

—কিন্তু না। তুমি শোন, একটা কাজ করবে, এই মানে.......। মনে হয় বনি কিছু বলতে লজ্জা পাচ্ছে। সে নিজের পোশাকের দিকে তাকাচ্ছে। খুব সাদা পোশাক। এমন সুন্দর পোশাকে কেউ বাংকারে ঢোকে না। ওরা দরজায় কেউ উঁকি দিলেই, বুঝতে পারবে এমন

সাদা ধবধবে পোশাকে কেউ বাংকারে কয়লা ফেলতে আসে না। সে ঠিক ধরা পড়ে যাবে। তবু কি যে সংকোচ, কি যে সে বলতে চায় ছোটবাবু ঠিক বুঝতে পারে না। সে বলল, ছোট, তোমার পোশাকটা দেবে। আমি পরে নেব।

—আমার......মানে আমার নোংরা পোশাক। কী বলছ! তোমার ভীষণ ঢোলা হবে।

—তা হোক! তুমি দাও।

—আরে না না, সে কি করে হয়। খুব নোংরা।

—কিছু হবে না। এখানেই বোঝা যায় জ্যাক জেদি। সে বলল, তুমি দাও। আমারটা তুমি পরে নাও।

—তুমি কি বলছ জ্যাক! তোমারটা আমার গায়ে কখনও লাগে! খাটো হবে না!

—হোক খাটো। তুমি নাও। দেরী কর না। দেরী করলে ধরা পড়ে যাব।

ছোটবাবু আর কিছু ভাবতে পারে না। ঘামে গেঞ্জি ভিজে গেছে। প্যান্টালুন তেমন ভেজে নি। সে বনির সামনেই জামা খুলে ফেলল প্যান্ট খুলে ফেলল। আর কী শীত! সে তো এখন কাজ করছে না, শীতটা আবার জাঁকিয়ে বসেছে। সে বলল, এই তাড়াতাড়ি খুলে দাও। আমার ভীষণ শীত করছে জ্যাক। ও-তুমি আবার ওদিকে কোথায় চললে! জ্যাক!

—এদিকে এস না ছোট। প্লিজ।

—আরে তাড়াতাড়ি করে ফেল। আমার ভীষণ শীত করছে।

—প্লিজ, এদিকে এস না। আমার হয়ে গেছে। অস্পষ্ট অন্ধকার থেকে জ্যাকের গলা পাওয়া গেল।

—জ্যাক তোমাকে দেখা যাচ্ছে না। খালি গায়ে আমি কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব। জ্যাক, আমি শীতে মরে যাব। জ্যাক, তোমার এত লজ্জা কেন?

মনে হয় অন্ধকারে জ্যাকও শীতে ভীষণ কাঁপছে। সে ছোটবাবুর কাছে যেতে ভয় পাচ্ছে। সে কেমন অধীর হয়ে পড়ছে। যেন সে ছোটর কাছে গেলেই নিজেকে ঠিক রাখতে পারবে না। কি সুন্দর, পবিত্র যীশুর মতো। সে যে কি করে ফেলতে পারে তখন! আশ্চর্য সুন্দর শরীর ছোটবাবুর। বাহুল্য নেই। সোজা সরল বৃক্ষের মতো ছোট দাঁড়িয়ে শীতে কাঁপছে। বনি কেমন আবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে দেখতে দেখতে।

ছোটবাবু চিৎকার করে বলছে, কি হচ্ছে জ্যাক? বলে সে লম্বা বাংকারের মাথায় ছুটে গেলে বনি বলল,—এই যে আসছি। আমার হয়ে গেছে ছোট।

গলা এত কাঁপছে কেন? ছোটবাবু বুঝতে পারছে না, জ্যাকের গলা কেমন ধরে আসছে।

—আমি শীতে মরে যাচ্ছি ছোট। বলে, মাথার টুপি টেনে এগিয়ে আসছে জ্যাক। তারপর জ্যাক কাছে এসে বলল,—আর দাঁড়াবে না। একেবারে নিচে নেমে যাও। কোথাও গিয়ে লুকিয়ে বসে থাক।

ছোটাবাবু বলল, জ্যাক, তুমি আশ্চর্যভাবে ছোটবাবু হয়ে গেলে। আর একটু লম্বা হলে কেউ এমনিতেও ধরতে পারত না!

বনি কোন কথা না বলে গাড়ি টেনে নিয়ে যাচ্ছে। ছোটবাবু সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে গেল। আসলে এখন বনি ছোটবাবু বাদে আর কিছু জানে না। সে যে কি সুন্দর! যেন জীবনের এক আশ্চর্য মোহ অথবা ঘ্রাণ বলা যেতে পারে, অথবা রাজার রাজা ছোটবাবু, এবং শরীরের সর্বত্র মহিমময় ঈশ্বর কোন কৃপণতা রাখেন নি। নাভির নিচে সে এক আশ্চর্য বনরাজিলীলা। এক আশ্চর্য মোমের শরীর, অথবা পাথরের মূর্তি। ছোটবাবুর হাতের পেশী কোমরের ভাঁজ, উরুর দৃঢ়তা তাকে পাগল করে দিচ্ছে। সে যে কতক্ষণ এভাবে ছোটর সুন্দর শরীরের ভিতর ডুবে ছিল, জানে না। ঠিক বারোটা, বারোটা কেন, ঠিক এগারোটা পার করে দিতে পারলেই বাবা

আর তাকে চুল ফেলতে জোরজার করবে না। বারোটা ত্রিশে ডাইনিং হলে লাঞ্চ। লাঞ্চ টাইম হয়ে গেলে বাবা চুল কাটার কথা ভুলে যাবেন।

কাপ্তান-বয় সারা ডেক খুঁজে বেড়াচ্ছে। ছোট সাবকে কেউ দেখেছে কিনা বলতে পারছে না। ক্যাপ্টেন ব্রীজে কাঁচি নিয়ে অপেক্ষা করছেন। কাপ্তান-বয় একবার খবর দিয়ে গেছে, ডেকের ওপরে নেই ছোট সাব।

ফোকসালে খুঁজলে হয়। তখন কাপ্তান-বয় ছুটেছে, ফোসকালে। না, সেখানেও কেউ দেখেনি। এই মেয়েটার মাঝে মাঝে কি যে হয়—কাপ্তান হিগিনস ভেবে পান না। নিচে নামতে হবে, সে কাপ্তান বয়কে এক কড়া ধমক লাগাল, কোথায় যাবে, ভাল করে খুঁজে দ্যাখো। এনজিন রুমে পালিয়ে থাকতে পারে। সে এবার থার্ডকে ডাকল। দ্যাখ তো জ্যাক কোথায় পালাল।

—আবার!

—চুল ফেলতে গেলেই পালিয়ে যায় কোথায়।

সুতরাং থার্ড অফিসার আর কাপ্তান-বয় তন্ন তন্ন করে খুজে বেড়াল। এসে বলল—না নেই। কাপ্তানের রক্ত মাথায় উঠে গেল। সে বলল ওর কেবিনে দেখেছ? তারপরই মনে হল বনির কেবিনে ওদের ঢোকা ঠিক না। সে এবার বলল, দাঁড়াও দেখছি। কিন্তু আশ্চর্য বনি কেবিনেও নেই। কেবিনে থাকার কথা না। বনি এ-সময় ডেকে পাখি দুটোকে খাওয়ায়। সেখানে যদি থেকে যায়। কাপ্তান এবার বললেন, এনজিন রুমে দ্যাখো।

—স্যার, সব জায়গা খুঁজেছি। কোথাও নেই।

—বয়লারের ওপরে, স্মোক-বকসের পাশে?

—সব দেখে এসেছি।

—স্টুয়ার্ডের ঘরে, ওর বরফ-ঘরে?

—দেখে এসেছি, নেই।

তিনি এবার ডাকতে থাকলেন জ্যাক, ভালো হবে না। আমি তোমার চুল ফেলব না! কোথায় পালিয়ে আছ বল।

দলবল নিয়ে এবার নিচে নেমে গেলেন কাপ্তান। বাংকারে উঁকি দিলে, কোলবয়েরা কয়লা ফেলে যাচ্ছে। কি যে হবে! কোথাও দেখা যাচ্ছে না। এবং জাহাজে ভীষণ উত্তেজনা। খবর রটে যেতে থাকল, জ্যাককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ছোটর বুক ভীষণ ঢিপ ঢিপ করছে। সে তার সাদা পোশাক পরে অমিয়র বাংকারে ঢুকে গল্প করছে। অমিয় এটা খেয়ালই করে নি ছোটবাবু বেশ ছিমছাম পোশাকে আছে। মুখে কালি। এও হতে পারে এ-ঘরে লম্ফ জ্বলছে। লম্ফের আলোতে সব স্পষ্ট নয় বলে সে খেয়াল করে নি। অমিয় বলল, শুনেছিস?

—কি

—জ্যাককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, ক্যাপ্টেন, বড়-মালোম সবাই ওকে খুঁজছে।

—অঃ। এবং তারপর ছোটবাবু এক লাফে নিজের বাংকারে ঢুকে বলল, জ্যাক ভীষণ কান্ড। শিগগির উঠে যাও। ডেকের ওপর এবার কিন্তু কাপ্তান মাস্তার দিতে বলবে সবাইকে। সাইরেন বেজে উঠল বলে।

এবং সে দেখল ঘড়িতে এগারোটা বেজে গেছে। সে বলল, তাড়াতাড়ি প্যান্ট জামা খুলে দাও ছোটবাবু। তারপর কি ভেবে বলল, ঠিক আছে। সে তাড়াতাড়ি কি যে করতে যাচ্ছে। তোমার প্যান্ট জামা পাঠিয়ে দেব।

—আমার কি হবে?

—কেন তুমি ওপরে চলে যাবে!

—আরে বাংকারের অন্ধকারে কেউ টের পাবে না। ওপরে উঠলে সবাই টের পাবে।

—অঃ।

এবার যে যার পোশাক পাল্টে নিল। আগের মতোই জ্যাক চলে গেল অন্ধকারে। ছোটবাবুর এ-ব্যাপারে কোন লজ্জা নেই। সে আর অমিয় একসঙ্গে বাথরুমে স্নান করে থাকে। তাড়াতাড়ির সময় একটা বাথরুম বলে একই সঙ্গে স্নান করে নেয়। জাহাজে উঠে ছোটর লাজলজ্জা কিছুটা কমে গেছে। অথবা জাহাজে উঠলে বুঝি মানুষের ভিতর অনেক কৃত্রিমতা মুছে যায়। সব কেমন খোলামেলা। জামা প্যান্ট পাল্টে সে জ্যাককে দিয়ে দিল। যখন উঠে যাচ্ছে জ্যাক, তখন জ্যাক আবার যেন শীতে কাঁপছে! জ্যাকের মুখটা কেমন নীল হয়ে গেছে।

আর ঠিক তখনই জাহাজে সেই ভয়ঙ্কর কঠিন শব্দ। দুবার লম্বা সাইরেনের মতো শব্দ।

এবং যখন জাহাজে সবাই মাস্তার দিচ্ছে, কাপ্তানের চোখ মুখ সেই দুষ্টু মেয়েটির জন্য অধীর হয়ে আছে, কিছু বলতে পারছেন না, যেন তিনি ভেতরের সব দুঃখটা জোর করে চেপে রেখেছেন এবং হেঁটে যাচ্ছেন, বলতে সাহস পাচ্ছেন না, কোন রকমে যেন বড়-মালোম কাপ্তানের হয়ে বলছে তখন, জ্যাককে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কেউ তোমরা দেখেছ?

ছোটবাবু মাস্তার থেকে বের হয়ে বলল, হ্যাঁ স্যার, এইতো দেখলাম। এনজিন রুম থেমে যখন উঠে আসছিলাম, দেখলাম।

—কোথায়? কাপ্তান ছুটে কাছে চলে গেলেন।

—একোমডেসান ল্যাডারের নিচ দিয়ে চলে গেল।

—ঠিক তুমি দেখেছ? জ্যাককে!

—হ্যাঁ স্যার।

সঙ্গে সঙ্গে কাপ্তান ছুটে গেলেন। একোমডেসান ল্যাডারের নিচেই বনির কেবিন। কাপ্তান হিগিন্স্ ছুটে যেতে থাকলেন। তিনি নীল রঙের সুট পরেছেন। হাতে চারটা সোনালি স্ট্রাইপ, কাঁধেও চারটা। স্ট্রাইপগুলো ভীষণ চক্‌চক্ করছে। মাথায় এংকোরের ছবি আঁকা জাহাজি টুপি। তিনি ভেতরে ঢুকেই অবাক। একটা সাদা কম্বলের ভেতর বনি শুয়ে আছে।

তিনি ধীরে ধীরে ডাকলেন, বনি!

—বাবা!

—তুমি কোথায় ছিলে!

—এখানে বাবা।

—আমি তোমাকে খুঁজে গেলাম যে!

—আমি তখন বোধহয় চড়ুইদের বাসাটা তৈরী করছিলাম।

—শুয়ে আছ কেন?

তখন পেছন থেকে কে ডাকল স্যার, পেলেন!

তিনি ভুলে গেছিলেন, সবাই বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি এবার দরজায় মুখ বার করে বললেন, যেতে বল। জ্যাককে পাওয়া গেছে।

ওরা আর কিছু জানতে পারে না। এর চেয়ে বেশি জানার অধিকার তাদের নেই। ওরা বোট- ডেক থেকে নেমে গেল। জাহাজের ব্রাস্ট আবার বাজছে। এটা বোধহয় ক্লিয়ারিং সিগনাল। হিগিনস বনির কেবিনে বসেই শুনতে পেলেন সব। বড় উদ্বিগ্ন চোখে মুখে বললেন, তুমি অসময়ে শুয়ে আছ!

—আমার খুব শীত করছে বাবা।

—জ্বর আসবে মনে হয়? বলে তিনি বনির কপালে হাত রাখলেন।

—আমার ভীষণ শীত করছে।

—ডেবিডকে ডাকি। তোমাকে দেখুক। ওষুধপত্র যদি দিতে হয়!

বনি বাবাকে কিছু বলল না। কেবল তাকিয়ে থাকল। হিগিনসের মনে হল, বনির বয়স বাড়ছে। বয়স বাড়লে কখনও কখনও ভীষণ শীত পায়। তিনি ডেবিডকে ডাকতে পাঠালেন না। শীতটা কিছুক্ষণ পর হয়তো কেটে যাবে। তবু মেয়েটার জন্য কি যে কষ্ট থাকে ভেতরে। তিনি পাশে কিছুক্ষণ বসে থাকলেন চুপচাপ। কেউ কোনও কথা বললেন না। ডেবিডকে ডেকে পাঠালে হয়তো বনির বয়স ধরা পড়ে যাবে। ওর ভেতরে কষ্টটাও ধরা পড়বে। কার জন্য বনি ভেতরে এমন কষ্ট পায়। তিনি বুঝতে পারলেন না।

হিগিনস মেয়েটাকে কিছুতেই আর কিছু বলতে পারেন না। উঠে দাঁড়ান! ব্রীজে উঠে গেলে সমুদ্র চারপাশে। ব্রীজের উইংসে তিনি দাঁড়ান। অনবরত জাহাজটা জল কেটে যাচ্ছে। দু'পাশে সাদা ফেনা, অনেকদূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে। নীল পোশাক পরে কোয়ার্টার মাস্টার হুইলের হাতল ধরে রেখেছে।

সন্ধ্যার সময় বনি ওপরে উঠে গেল। বনি বেশ কালো রঙের সুট পরেছে, নীল রঙের টাই, সে টুপি পরেনি। কাজের সময় সে কখনও কখনও সাদা দস্তানা হাতে পরে নেয়, এখন আর তাও নেই। শীতটা বেশ ক্রমে বাড়ছে। ঠান্ডা বাতাস সকালের দিকে ছিল, এখন নেই। জাহাজ ক্রমে আরও নিচে নেমে যাচ্ছে। জাহাজ ক্রমে গড়িয়ে গড়িয়ে একটা অতিকায় সাদা তিমি মাছের মতো জল কেটে ভেসে যাচ্ছে। এ-সময়ে তাকে বাবা ডাকেন না। সে এ-সময় আজকাল পাখি দুটোর পেছনে ঘুরে বেড়ায়। সে একা ঠিক না। মেজ-মালোম, ছোটবাবু আর সে। আরও কেউ কেউ আসে। তবে ওরা কেউ ঠিক এদের মতো পাখি দুটোকে নিয়ে মজা পায় না। যেন ওরা তিনজন তখন সমবয়সী বন্ধু। শীতের জন্য পাখি দুটিকে ওরা খড়কুটো বিছিয়ে দিয়েছে বাকসোটাতে। বাবা এ-সময়টাতে অন্যদিন একা একা চুপচাপ বসে আকাশের গ্রহ নক্ষত্র দেখেন, তাকে ডাকেন না, আজ কেন যে ডাকছেন!

সে পাশে গিয়ে দাঁড়ালে হিগিনস বললেন, বোস।

বাবার গলা খুব নরম। বাবার এমন গলা শুনলে ওর ভেতরটা গুড়গুড় করে ওঠে। কেমন বাবা ক্রমে ভীতু স্বভাবের হয়ে যাচ্ছেন। সে ভেবেছিল, বাবা তাকে আজ ভীষণ বকবে। বাবা ওকে একা পেতে চান। কিন্তু ব্রীজে, বাবা একা থাকতে পারেন না, সেখানে এখন কোয়ার্টার মাস্টার এবং থার্ড অফিসার আছে। ওদের ওয়াচ। বাবা সেখানে তাকে কোনা মন্দ কথা বলতে ডাকতে পারেন না। সে বসে পড়ল। চুলগুলো সে হাত দিয়ে দেখল, বেশ বড়, চুল বড় না থাকলে সে একেবারে ষোলআনা পুরুষের মতো হয়ে যায়। ছোটবাবু তখন ওর পাশে একেবারে ঘেসতে চায় না।

বাবা অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকলেন। এনজিনের শব্দটা এখানে তেমন প্রবল নয়। আস্তে কথাবার্তা বললেও স্পষ্ট শোনা যায়। ওর ভাল লাগছে না। কেমন সে বসে উসখুস করছে। বাবা হয়তো টের পেয়েছেন। তিনি বললেন, বনি শান্ত হয়ে বোস।

বনি চুপচাপ বসে থাকল।

হিগিনস বললেন, তুমি নোয়ার নাম নিশ্চয়ই জানো?

—হ্যাঁ বাবা।

—নোয়ার আর্কই হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম জাহাজ। এর আগে পৃথিবীর ইতিহাসে জাহাজ টাহাজের খবর আর পাওয়া যায় না। তখন সবে সভ্যতার উন্মেষ। এ-সব খবরও হয়তো রাখো।

—হ্যাঁ বাবা।

—কিন্তু তুমি কি জানো তোমার পূর্বপুরুষেরা কি ভাবে আগে সমুদ্র সফরে বের হত?

—কারা বাবা?

—এই আমাদের আগে যারা সমুদ্রে এসেছিলেন।

—তোমাদের আগে, মানে ডাবলিউ ফোর্ডের কথা বলছ?

—আরে না না। এই যেমন হোমারের বীর নায়কেরা সমুদ্র ঘুরে এসে কি সব বলত? —না বাবা।

—তারা সব নানারকমের গল্প বলত। তখন যারাই সমুদ্রে গেছে, ফিরে এসে নানারকম গল্প বলতো। সে-সব গল্প বলে ঠাকুমারা পর্যন্ত ভয় দেখিয়ে আমাদের ঘুম পাড়াতো। তখন সমুদ্র আমাদের কাছে একেবারে অজানা। আমাদের কথাই ধর না, যারা ভূমধ্যসাগর এবং বে অফ বিসকের কাছাকাছি ছিল, অর্থাৎ যারা এ-সব অঞ্চলে বসবাস করত ওরা আটলান্টিক বলে যে একটা সাগর আছে জানতই না। ওদের কতরকমের বিশ্বাস ছিল। যেমন হোমারের বীর নায়কেরা ইথাকাতে ফিরে কত বিচিত্র গল্প যে বলেছিল! ওরা নাকি সমুদ্রে এক আশ্চর্য ধ্বনি শুনতে পেত—প্রায় সেটা অবিকল সাইরেন বাজানোর মতো। শুনতে পেতো সমুদ্রে কারা ক্রমান্বয়ে সুন্দর মিউজিক বাজিয়ে যাচ্ছে। আবার তারা নানারকম দৈত্য দানবের গল্প বলত, মায়াবিনীদের গল্প বলত। কুহকিনীরা, সমুদ্রের ওপর নৃত্য করে বেড়াচ্ছে। বড় বড় পাথর সমুদ্রের জলে ভেসে বেড়াচ্ছে। কুহকিনীরা তার ওপর নেচে বেড়াচ্ছে। নাবিকেরা জাহাজ নিয়ে কিছুতেই আর তখন এগুতে পারত না।

—অথবা কিংবদন্তি ছিল, দক্ষিণ অঞ্চলে, অর্থাৎ সূর্যের দেশে, বিষুবরেখার দক্ষিণে জাহাজ যাবার নিয়মই নেই। সেখানে সমুদ্র বলে কিছু নেই। একরকম মানুষ সেখানে বাস করে-যারা কেবল পোকা মাকড়ের মতো লাফায়। ওদের আহার নিদ্রা বলে কিছু নেই। অথবা কেউ কেউ বলত, সেখানে বড় বড় ষাঁড় ঘুরে বেড়ায়। ওদের নিঃশ্বাসে আগুন লক লক করত।

বনি বুঝতে পারছে না, বাবা হঠাৎ এমন সব প্রাচীনকালের গল্প বলে যাচ্ছেন কেন। বাবা অবশ্য যখন যেখানে গেছেন বনিকে নিয়ে, সমুদ্রের অভিজ্ঞতার কথা দ্বীপের কথা কখনও বলতেন। কখনও সমুদ্রের প্রাচীন ইতিহাস নিয়ে বাবার মাথাব্যথা ছিল না।

তখনও হিগিনিস বলে যাচ্ছেন, সমুদ্রে কিছুদূর গেলেই এক শয়তানের কালো হাত দেখা যেত। সেই হাত ওপরে ভেসে সাপের মতো দুলত। বলত, আর না। ফিরে যাও। অথবা একরকমের শামুকের খোল ভেসে বেড়াতো হাওয়ায়, তাদের ভিতর সব বিষাক্ত ধোঁয়া। জাহাজ আর এগুতে পারত না। সেখানে ঢুকলে নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসত জাহাজিদের। অবশ্য আমাদের প্রাচীন অভিজ্ঞতা সমুদ্র সম্পর্কে ক্রমে ভেঙে যায়। আমরা জানতে পারি সমুদ্র বিশাল, জানতে পারি আটলান্টিক বলে এক মহাসাগর আছে, আমাদের সব নাবিকেরা ক্রমে বের হয়ে যায়, পৃথিবীর কোন কোন জায়গায় সমুদ্র কি-ভাবে আত্মগোপন করে আছে দেখতে।

কাপ্তান-বয় কফি রেখে গেল। দু কাপ। সামান্য ফল। কাপ্তান সামনের সমুদ্র দেখছেন। মাস্তুল পার হয়ে জাহাজের মাথা কেমন সোজা একটা টর্পেডো বোটের মতো, আর পেছনে আফটার-পিক পার হয়ে প্রপেলারের ক্রমাগত সাদা ফেনা এ-জ্যোৎস্নায়ও দেখা যায়। তখনই মনে হয়, সমুদ্র মনোহারিণী। তিনি বোধ হয় সমুদ্র-মনোহারিণী বলার জন্য, এতসব পুরানো কথা বনিকে বলে যাচ্ছেন। অথবা তিনি কি বলতে চান, বনি, জীবন হচ্ছে মনোহারিণী। তাকে অবহেলায় নষ্ট করে দিও না। তোমার ইচ্ছেটা যখন ভেতরে পাগলা ঘোড়ার মতো দামাল হয়ে যায়, তখন সমুদ্র দ্যাখো। সমুদ্র দেখলে ভেতরের কষ্ট একেবারে মুছে যাবে। কেননা, সমুদ্র সেই কবে থেকে, কেউ বলতে পারে না, পৃথিবীতে .অথবা সৌরজগতে বড় সে একা! একাকী সে, আছে তার মতো, সে কখনও উত্তাল তরঙ্গমালার ভেতর আকাশের নক্ষত্রদের ছুঁয়ে দিতে চায়, তার কি যে প্রলোভন তখন। সে কখনও চুপচাপ। নিরীহ শান্ত। আকাশের নক্ষত্রেরা তার

বুকে প্রতিবিম্ব ফেলে সারারাত জেগে থাকে। অথবা দর্পণে নিজের মুখ দেখতে পায় বোধহয়! অথবা ভেবে দ্যাখো, কত গাছপালা পাখি, সমুদ্রের উপকূলে কত দীর্ঘকাল ধরে নির্জনে তাদের ছায়া ফেলে যাচ্ছে। একটা ফড়িঙ অথবা প্রজাপতির ছায়া পর্যন্ত বাদ পড়ে না। কত রঙীন দ্বীপমালা নিশীথে উত্তাল তরঙ্গের ভেতর ডুবে থাকে। পৃথিবীর সব সুন্দরীদের গলায় যে মহামূল্য মণিমাণিক্য ঝলমল করছে, সমুদ্রের কোন গহন অন্ধকারে তাদের জন্ম হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ বছর ধরে এরা জন্মাচ্ছে, নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, সমুদ্রের কিছু আসে যায় না। অথবা সেইসব মনস্টার, যারা এখনও সমুদ্রের ওপরে ভেসে ওঠেনি, যারা সূর্যের আলো সহ্য করতে পারে না —কে জানে, কত অতিকায় তারা। সীমিত অভিজ্ঞতায় তার কতটুকু খবর আমরা রাখি। সমুদ্রের শান্ত গভীর অন্ধকারে কি মহিমায় যে ওরা ঘুরে বেড়াচ্ছে কে জানে। অথবা বনি চারপাশে দ্যাখো, সমুদ্র তার বিশাল অস্তিত্ব নিয়ে জেগে আছে। সে পৃথিবীর এতটুকু ক্ষতি করে না। সে তো ইচ্ছে করলেই যা ডাঙা আছে নিমেষে গ্রাস করে ফেলতে পারে। কিন্তু কি মায়া দ্যাখো বনি, সে ডাঙার চারপাশে নিয়ত ফুঁসে বেড়াচ্ছে, কখনও অতীব শান্ত প্রায় করজোড়ে যেন বলছে, আমাকে নাও, চঞ্চলা হয়ে বলছে, আমার কি আছে, কেবল তুমি আছো।

—অথবা বনি, আরো আশ্চর্য দ্যাখো, সমুদ্র তার নিজের অসীমতা নিয়ে জেগে আছে। তার অস্তিত্ব কখনও কমে না, বাড়ে না। জল বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, মেঘেরা ভেসে বেড়ায়, যেন বাদাম তুলে চঞ্চলা তরণীর মতো সে তখন নিজের বুকে নিজেই ভাসতে ভাসতে চলে যায়। চারপাশে যা কিছু ডাঙা আছে, সেখানে তার বৃষ্টিপাত ফসল ফলায়, যত আবর্জনা রয়েছে, সে-নদী উপনদী ধরে তাকে বুকে. বহন করে আনে। এর জন্য তার কোন দুঃখ নেই বনি। পৃথিবীর জন্য তার কি যে মায়া। সব কিছু সে দিয়ে পৃথিবীর হয়ে বেঁচে আছে। বলেই তিনি সহসা মুখ ফেরালেন। তোমার কোন কষ্ট আছে?

—না বাবা।

—কষ্ট থাকলে, এই সমুদ্র দেখবে। পৃথিবীতে এর চেয়ে উদার, মহৎ এবং নিরিবিলি স্বভাবের আর কিছু নেই। আর সমুদ্র যে-ভাবে পৃথিবীকে ভালবাসতে জানে, আর কে আছে তেমন। তোমার যদি কিছু ভাল লেগে থাকে, তুমি যদি মনে করে থাক, ঠিক করছ, আমার কোন অমত থাকবে না। তবে যাই করবে, ভেবে করবে, বুঝতে না পারলে, অনেকক্ষণ, যত বেশি সময় হয় ততই ভাল, দাঁড়িয়ে থাকবে রেলিঙে। দেখবে, কেমন সূর্যাস্তের সঙ্গে তোমার ছায়া লম্বা হয়ে সমুদ্রের অনেক দূরে চলে যাচ্ছে। তখন একবার সমুদ্রকে জিজ্ঞাসা করতে পার, ঠিক করছ কিনা, সে কাউকে বনি, মিথ্যা বলে না।

বনি বুঝতে পারল, সে বাবাকে মিথ্যা কথা বলেছে। বাবা টের পেয়েছেন। বাবা মনে মনে ওর ব্যবহারে হয়ত রুষ্ট হয়েছেন। সমুদ্রের কথা বলে, বাবা তাকে শাসন করছেন। বাবাকে সে কখনও ওর প্রতি কঠোর হতে দেখেনি। এ-জন্য বাবা তাকে ডেকে এনেছিলেন। সে কফি খেয়ে উঠে পড়ল। বেশ রাত হয়েছে। ডাইনিং হলে ডিনার সাজানো হচ্ছে। সাদা জ্যোৎস্না বাবার পায়ের কাছে পড়েছে। বাবাকে তখন খুব একা এবং নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছে। বাবাকে ফেলে কেন জানি তার যেতে ইচ্ছা হল না। সে বাবার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। সমুদ্র দেখতে দেখতে বলল, আমি কখনও কষ্ট দেব না বাবা। কাল আমার চুল কেটে দিও। আমি আর পালিয়ে বেড়াব না।

॥ এগার ॥

রাতে রাতে বন্দরে ঢুকেছিল জাহাজ। সেন্টিসে রসদ, মন্টিভিডিওতে কয়লা, জল আর কিছু না—জাহাজিরা অন্ধকার রাতে বন্দর স্পষ্ট দেখতে পায়নি। কেমন পাহাড়ী ছায়ায় লাল-নীল আলোর মালা, কেউ জাহাজ থেকে নামতে পারেনি। সবাই অন্ধকারে বন্দরের দৃশ্য দেখছিল। অন্ধকারে বন্দর ঠিক চেনা যায় না। কেমন একরকমের মনে হয়। কোনটা সেন্টিসে কোনটা মন্টিভিডিও বোঝা যায় না। জাহাজ অন্ধকারেই আবার সমুদ্রে নেমে এসেছিল। ভোর রাতে জাহাজ গভীর সমুদ্রে নেমে গেছে। খুব একটা গভীরে যায়নি, উপকূলের আশেপাশে জাহাজ সারাদিন চলেছিল। দু'দিনের বেশি জাহাজের মানুষেরা দেখেছে ছায়া ছায়া উপকূল ভাগ। কেমন মেঘের মতো সমুদ্রের দিগন্তে ঝুলে আছে। দক্ষিণ আমেরিকার এই সব পাহাড়ী উপকূল কেমন রুক্ষ। গাছপালা চোখে পড়ে না। পাথর আর পাহাড় দক্ষিণে, যত এগিয়ে যাচ্ছে, শীত তত আরও বাড়ছে। প্রায় হাড়-কাঁপুনি শীত। পোর্ট এলিজাবেথ থেকে সাতাশ দিনের মতো জাহাজ ছেড়েছে। ক্রমে দক্ষিণ আমেরিকার কেপহর্ণের দিকে যাচ্ছে। প্রায় একশো আশি ডিগ্রী বরাবর দক্ষিণে এখন জাহাজ নেমে যাচ্ছে। যেন এভাবে আর কিছুদূর গেলেই জাহাজ দক্ষিণ মেরুতে পৌঁছে যাবে। মৈত্র শীতে ভীষণ কাঁপছে। সে মোটা কম্বল গায়ে পোর্ট-হোল দিয়ে কিছু দেখছে। গ্যাস-পাইপ ফোকসাল উষ্ণ রাখতে পারছে না।

সামনের বন্দরে ওরা কিছুদিন থাকতে পারবে। এদের পক্ষে এটা আশার কথা। শুধু জল আর মাঝে মাঝে দ্বীপ, অথবা সমুদ্রে কেবল চলা নিশিদিন। এনজিনের ঝ্যাক ঝ্যাক শব্দ, স্টিয়ারিং এনজিনের কক্ কক্ শব্দ বিরক্তিকর। মাঝে মাঝে একেবারে অসহ্য। সুতরাং বন্দরে জাহাজ ঢুকে গেলে জাহাজিদের মনে হয়, পৃথিবীতে মানুষেরা ডাঙ্গায় বেঁচে থাকে। ডাঙ্গায় নেমে গেলেই মনে হয়, মাটির মতো প্রিয় আর কিছু নেই।

জাহাজিরা বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠছে। বন্দর আসছে বন্দর দেখা যাচ্ছে। রাত এগারোটা পর্যন্ত অনেক জাহাজি জেগে ছিল, বন্দর দেখতে পাবে বলে। ডেক-সারেঙ বলে গেছে, বারোটার আগে দেখা যাবে না। তবু প্রত্যাশা, কখন যে কে দেখে ফেলবে, অনেক দূরে ছায়া ছায়া মেঘের মতো ডাঙ্গা, অথবা সেই সন্ধ্যা থেকে হল্লা করছে জাহাজিরা, ঐ দ্যাখো। সারেঙ হেসে বলেছে, আরে না, ওটা দ্বীপ টিপ কিছু হবে। সময় না হলে জাহাজ বন্দর পায় না। সময় না হলে যেমন ওঁর দেখা মেলে না, এও বাবুরা তেমনি।

অমিয় বলল, তা চাচা যা বলেছেন।

ডেক-সারেঙ তার দলবল নিয়ে জেগে আছে। একটা দেড়টায় জাহাজ বন্দরে ঢুকে যাবে, ওদের বাঁধা-ছাঁদার কাজ। ডেক-জাহাজিরা এখন ঘুমোচ্ছে। সারেঙ ঠিক ঘুমোতে পারছে না। যদি বেচাল কিছু হয়ে যায়। সে একেবারে জাহাজের বাঁধা-ছাঁদা শেষ করে ঘুমোতে যাবে।

এবং এ-সময়ে ছোটবাবু খবর নিয়ে এল, দেখা যাচ্ছে।

এখন বাথরুমে স্নান করা। মৈত্র একটু আগে উঠে এসেছে। সে স্নান করে নিচে পোর্ট-হোলে কেবল কিছু দেখছে। অমিয় ঢুকে বলল, মৈত্র তুই জেগে আছিস! বললি যে শরীরটা ভাল না।

অমিয় এবং ছোটবাবু স্নান সেরে এসেও দেখল, মৈত্র পোর্ট-হোলে দাঁড়িয়ে কি দেখছে! চোখ কেমন ঘোলা ঘোলা। ছোটবাবু কখনও মৈত্রকে এভাবে দ্যাখেনি। জাহাজে এ মানুষটাকে সে প্রায় সারেঙসাবের মতো ভেবে এসেছে। সেই মানুষ এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে কেমন ভয় পাবার কথা।

অমিয় বলল, ছোটবাবু, শুয়ে পড়। সে মৈত্রকে বলল, হ্যারে তুই কি দেখছিস।

—কিছু না।

এবার অমিয় বলল, ছোটবাবু কি মজা! কাল থেকে ওয়াচ থাকবে না। ও—ভাবতে কি

ভাল লাগছে! কদিন থাকবে জাহাজ!

মৈত্র পোর্ট-হোল থেকে নড়ছে না। নিচের বাংকে ছোটবাবু ওপরের বাংকে অমিয়, কখনও কখনও ওরা পাল্টে নেয় বাংক। এ-ফোকসাল ওদের তিনজনের। এ-ফোকসালে একটা বাংক বেশি। মৈত্রের ওপরের বাংক খালি। মৈত্র এখনও পোর্ট-হোলে দাঁড়িয়ে আছে। মৈত্র কখনও কখনও ওপরের বাংকে শুয়ে থাকে।

অমিয় স্নান করায় হি-হি করে কাঁপছে। সে লেপ, কম্বল, যা আছে সব নিয়ে একেবারে জাম্বুবানের মতো শুয়ে পড়েছে। মাথায় মাংকি ক্যাপ পরে শুয়েছে। সব একেবারে বরফ হয়ে থাকে। সে দেখল মৈত্র তখনও নড়ছে না। অমিয় বিরক্ত হয়ে বলল, ধুস শালা, কি যে দ্যাখে! এই মৈত্র, ঘুমালে ঘুমো না হয় ওপরে গিয়ে বন্দর দ্যাখ। আলো নিভিয়ে দেব।

মৈত্র এবার তাকাল।

অমিয় বালিস থেকে মাথা তুলে বলল, হ্যাঁরে তুই কি দেখছিস?

—কিছু না।

—কিছু দেখছিস ঠিক!

—একটা তিমি মাছ!

—হ্যাঁ, তিমি মাছ। বলে কি রে! আরে ছোটবাবু, অঃ ছোটবাবু তুমি ঘুমালে নাকি! শুনছ ছোটবাবু, সে লাফ দিয়ে সব লেপ কম্বল ফেলে দিয়ে একেবারে নিচে নেমে গেল। সে মৈত্রকে সরিয়ে এনে পোর্টহোলে মুখ এগিয়ে দিলে, দেখল সামনে শুধু অন্ধকার সমুদ্র। অনেক দূরে বন্দরের আলো দেখা যাচ্ছে। নীল অন্ধকারের ভেতর যেন আলোর অজস্র মালা। এবং দূরে লাইট-হাউসের আলো। ঘুরে ঘুরে লাইট-হাউস জাহাজগুলোকে পথ দেখিয়ে যাচ্ছে। এবং অন্ধকারের ভেতর কিছু জাহাজ সমুদ্রে ইতস্তত নোঙর ফেলে রেখেছে দেখতে পেল।

অমিয় এবার পোর্ট-হোলে চিৎকার করতে থাকল, কোথায়, কোনদিকে! অন্ধকারে তুই তিমি মাছ দেখবি কি করে। বলে অমিয় সরে এল!

মৈত্র আবার যথারীতি পোর্ট-হোলে মুখ রেখে দেখতে থাকল।

অমিয় পাশে দাঁড়িয়ে বলল, দেখতে পাচ্ছিস?

—হ্যাঁ।

ছোটবাবু এখন কি করবে ভেবে পেল না। ঠাণ্ডায় পা গরম হচ্ছে না ছোটবাবুর। পা গরম না হলে ওর ঘুম আসে না। কিন্তু কি যে শীত! পায়ের হাঁটু পর্যন্ত একেবারে ঠাণ্ডা বরফ। সে স্নানের সময় গরম জল হাঁটু পর্যন্ত ঢালে। সে পায়ে গরম উলের মোজা পরে শোয়। জ্যাক ওকে দুটো দামী দস্তানা দিয়েছে উলের। শীতে হাত বরফের মতো। মাঝে মাঝে অসাড় লাগে। সে দস্তানা পরে থাকে। কাজ করার জন্য জ্যাক ওকে দুটো ভারি চামড়ার দস্তানা দিয়েছে। এবং পারলে যেন জ্যাক তাকে সব দিয়ে দেয়। সে এখন যা কিছু পরে আছে প্রায় সবই জ্যাকের দেওয়া। বেশ গরম! অমিয় অথবা মৈত্রের মতো সে শীতে তেমন কষ্ট পায় না। পা গরম হলেই ঘুম চলে আসবে। কিন্তু মৈত্র আর অমিয় পোর্ট-হোলে কি যে দেখছে বার বার!

অমিয় ফের পোর্টহোল থেকে মুখ তুলে আনল।—সব বাজে কথা। গুল!

মৈত্র বলল, তুমি হতভাগা কিছু দেখতে পাবে না। তুমি একটা আস্ত ষাঁড়।

—আমি আর কি দেখতে পাব! কেবল অন্ধকার সামনে, কিছু জাহাজ নোঙর করা। জলে ফসফরাসের লাল ফুলকি। তুমি একটা মরুভূমির উট।

—তা হলে তিমি মাছ দেখতে পেলি না!

—না।

—তা হলে বড় একটা বাঁশ দ্যাখ। ওতে একটা তিমি মাছের কঙ্কাল ঝোলানো আছে।

—পাগল আর কি! বলে সে এক লাফে আবার ওপরের বাংকে উঠে গেল। আসলে মৈত্র ওর স্ত্রী শেফালীর চিঠির কথা বলছে। বন্দরে এলেই বোধ হয় ওর বৌর কথা বেশি মনে হয়। ওর ঘুম আসে না। অমিয় মুখে মাথায় লেপ কম্বল যা আছে সব দিয়ে ঢেকে দিল। শেফালি চিঠিতে সব সময় একটা তিমি মাছের কথা লেখে। বোধহয় মৈত্র জাহাজ নোঙর ফেললেই তিমি মাছটা দেখতে পায়।

পরদিন সুবোধ বালকের মতো ঘুম থেকে উঠেই মৈত্র চা করে আনল। কাজ কাম সেরে বারোটায় স্নান করার জন্য বাথরুমে ঢুকে গেল। পোশাক খুলে ফেললেই আয়নায় নিজের শক্ত শরীর দেখার ইচ্ছে। কিন্তু শীতে সে দাঁড়াতে পারে না। সে তার পেশী দেখতে দেখতে কেমন শরীরে অনবরত গরম জল ঢালতে থাকে। হাতের পেশী দেখতে দেখতে সে শেফালির কথা মনে করতে পারে। শেফালি উঁচু লম্বা মেয়ে। সহবাসে শরীর বড় মনোরম। দস্যুর মতো তুমি, দস্যুর মতো আমাকে মেরে ফেলতে পার না—শেফালির এমন কথা কিনারায় এলেই তাকে পাগল করে দেয়। আমাকে তুমি মেরে ফেল আর পারছি না অথবা কেন যে এখন মৈত্রের মনে হয় শরীরের কষ্ট শেফালির বড় বেশি উগ্র। বাথরুমে অথবা কম্বল গায়ে চুপচাপ শুয়ে থাকলে শেফালির সব খালি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চোখে দেখতে পায়। তখন মৈত্রের শরীরে শীতটা বাড়ে।

বস্তুত মৈত্র বন্দরে এলেই শেফালির কথা বেশি মনে করতে পারে। বন্দরের গাছপালা, পারসিমন লতার গুচ্ছ অথবা স্কাইলার্ক ফুলের হলুদ রঙ ওকে মাতাল করে ফেলে। মৈত্র, সুখী এবং সৎ মৈত্র যাতে থাকতে পারে, তার জন্য কি যে ওর চেষ্টা!

স্নান সেরে বের হলে মৈত্র দেখল, অমিয়, ছোটবাবু, টেবিলে থালা সাজিয়ে বসে আছে।

খাবার সময় মৈত্র অমিয়কে বলল, দেখ অমিয় তুই নতুন এয়েছিস। শহর বন্দর সম্পর্কে তোর কোনও ধারণা নেই। লরেঞ্জো মরকুইসে, ডারবানে যা সব করেছিস, এখানে যেন এ সব না হয়। সব কিছুর একটা সীমা আছে।

—আমি কি করেছি!

—যাকগে, বলে দিলাম, যদি সাবধানে চলাফেরা না কর তবে কে কাকে রক্ষে করে। তারপর কেমন যে সে সহসা উত্তেজিত হয়ে গেল, শালা তুই এটা কলকাতার মদ পেয়েছিস। ঢক ঢক করে এতটা খেয়ে ফেললি! বিদেশী মদে কত ঝাঁজ তুই জানিস!

—না।

মৈত্র মাংসের হাড় চিবুচ্ছিল। সে ছোটবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, কেমন লাগছে ছোটবাবু?

—ভাল।

—দেখেছ, কি সব পরীদের মতো মেয়েরা গাছের নিচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারপরই বলল, তোমাকে নিয়ে আমার ভয় নেই ছোটবাবু। যত ভয় অমিয়কে নিয়ে। একটু থেমে বলল, এখানে মেয়েদের কি বলে জানো?

অমিয় ক্ষেপে যাচ্ছিল। মৈত্র তাকে আর একটা কথা বলছে না।

ছোটবাবু মুখ তুলে তাকালে বলল, চেঙ্গেরিতা। শালা চেঙ্গেরিতাই বটে। যেমন রঙ, তেমনি বাহার। আর শালার কেবল খাই খাই! গাউনের নিচে কেবল...।

অমিয় থালা নিয়ে উঠে যাবার সময় শুধু বলল, কেবল খাবলা খাবলা। ও হাত দিলে কি যে মজা! আমি যাব। তুমি যা করতে পার কর শালা। বলে সে মেসরুম থেকে বের হয়ে গেল।

মৈত্র চিৎকার করে উঠল, মরবে! শালা মরবে।

ছোট বাবু সকালে ঘুম থেকে উঠে, সত্যি অবাক হয়ে গেছিল। জেটির পাশেই নানা রকম

ফল ফলের গাছ, বড় বড় গাছ সমুদ্রের ধারে। সমুদ্র এখানে লেগুনের মতো নয়, অথবা নদী ধরে ভেতরে ঢুকেও বন্দর নয়, একেবারে সমুদ্রের ধারে শহর। জেটি থেকে একটু এই ফার্লং-এর মতো হাঁটলে শহরের ভেতরে ঢুকে যাওয়া যায়; এবং পেছনে তাকালে বিশাল সমুদ্র, শান্ত, নীল রঙের ভেতর এই সব সারি সারি জাহাজ, এবং জাহাজের পাশে যে সব গাছেরা ফুলেরা ছড়িয়ে আছে তাদের ভেতর এমন সব সুন্দর সুন্দর যুবক-যুবতীদের ঘুরে বেড়াতে দেখে ছোটবাবু ভীষণ অবাক হয়ে গেছিল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে বড় বড় স্কাইস্ক্র্যাপার। সে জাহাজের বোট-ডেকে উঠে গেলে সব দেখতে পায়। এবং কালো এসফাল্টের পথ ধরে গোলাপী আভা মুখে মেয়েরা, ঠিক গোলাপী বললে ভুল হবে কিছুটা যেন নীল রং ফুটে বের হচ্ছে চোখের নিচ থেকে। সে ভেবেছিল দেবদেবীদের মুখ চোখ এমন হবার কথা, মানুষের মুখ চোখ এত সুন্দর হয় সে জানত না।

সুতরাং মৈত্র বলল, খুব খারাপ জায়গা বাপু। খুব সাবধানে চলাফেরা করবে। একা একা বের হবে না। বের হলে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

অমিয় এবং ছোটবাবু এই প্রথম সমুদ্রে বের হয়েছে, প্রথম প্রথম যতটা অবাক হবার কথা তার চেয়েও বেশি অবাক সব কিছু দেখে। মৈত্র স্পেনীশ মেয়েদের এমন সব গল্প বলেছে যে নেমে গেলে আর ফিরে আসা যায় না। কি যে মোহ থাকে। টাকা পয়সা সব রেখে একেবারে নাঙ্গা হয়ে ফিরতে হয়।

ওরা দুজন আবার শিশুর মতো চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল।

অমিয় তবু যেমন বলে থাকে, একটু বলে ফেলা যেন, যত বাজে কথা।

মৈত্র বলল, একবার খপ্পরে পড়লে বুঝতে পারবে।

অমিয় কি ভাবল, তারপর বলল, তুই বের হবি না?

—পাগল! বের হয়ে সব টাকা গচ্ছা দিই আর কি! এখন আমার খুব টাকার দরকার। আমাকে বে-হিসেবী হলে চলে!

ওরা তাড়াতাড়ি খেতে থাকল তারপর। কিছু জাহাজি রেলিঙে ভর করে গাছের ছায়ায় যুবক- যুবতীদের দেখছে। কিছু জাহাজি কলম্বো থেকে যে সব কাঠের হাতি, ময়ূরের পাখা কিনে নিয়েছিল বিক্রির জন্য—তারা ফোকসালে বসে সেই সব হাতী, পাখা সাফসোফ করছে। কারণ বিকেলে বন্দরে কত যে পাখী উড়বে। বন্দরে সব টিউলিপ গাছে কত ফুল ফুটে থাকবে। আর কত যুবক-যুবতী হেঁটে হেঁটে বন্দরে চলে আসবে হাওয়া খেতে। আশ্চর্য এই বন্দর। আসলে সব বড় বড় বার্চ জাতীয় গাছ চারপাশে। এবং গাছে সব হলুদ রঙের পাতা। নিচে লাল নীল স্কার্ট পরা যুবতী। হাতে কালো দস্তানা। মাথায় কালো টুপি। রঙ ওদের পাকা আপেলের মতো। মুখে ওদের সরল হাসি। আর কি অসামান্য রূপ। স্পেনীশ যুবতীদের চোখ কালো চুল কালো—সোনার হরিণের মতো পরম লোভের বস্তু। খেতে খেতে মৈত্র বন্দরের সব খবর দিয়ে যাচ্ছে।

ছোটবাবুর দিকে তাকিয়ে বলল, খুব সাবধান! মারা পড়বে। রাম রাবণের যুদ্ধের কথা মনে আছে? সোনার হরিণের জন্য রাম যে রাম যে শালা পিতৃ আজ্ঞা পালনের নিমিত্ত বনে গিয়েছিল, যে শালা রাম মনুষ্য নয়, দেবতা, সে পর্যন্ত সোনার হরিণের লোভ সামলাতে পারে নি-রে অমিয়। আর ছোটবাবু তুমি তো মনুষ্য জাতির অপোগণ্ডো।

অমিয় বলল, কোথাও একা যাচ্ছি না। তোর সঙ্গে যাব।

ছোটবাবু বলল, আমিও।

তখন গ্যালিতে ভাণ্ডারি, গলা বাড়িয়ে ওদের কথা শুনছে। বুড়ো মানুষ। রোগা। হাত পা কাঠির মতো। সে গলাটা কচ্ছপের মতো বের করে রেখেছে যেন। এটা শীতকাল, গ্যালীতে পর্যন্ত ঠাণ্ডা। ওর চোখ মুখ ঠাণ্ডায় সাদা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। মৈত্র বলল, কি শুনছ চাচা?

—আপনেগ রসের কথা শুনছি।

—আমি ঠিক বলিনি?

—ঠিক বেঠিক জাহাজ না ছাড়লে বোঝা যাবে না। বলেই ভাণ্ডারি গলাটা টেনে নিল ভেতরে। ওরা তিনজনই শেষ পর্যন্ত ভয়ে জাহাজ থেকে নামে নি। ঠিক নামে নি বললে ভুল হবে ছোটবাবু মাটি দেখলে না নেমে থাকতে পারে না। সে একটু সমুদ্রের ধারে ধারে ঘুরে এসেছে। একটু ভেতরে ঢুকলে লেন্দ্রো-এলেন। সে ঠিক জানে না কতদুর গেলে লেন্দ্রো-এলেন, তবু সে কিছুদূর গিয়ে বুঝতে পেরেছিল এমন শীতে সে বেশিদূর হাঁটতে পারবে না। সমুদ্র থেকে কনকনে ঠাণ্ডা বাতাস একেবারে সব হিম করে দিচ্ছে। অথচ এ-দেশের মেয়েরা ছেলেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে টেনিস খেলছে। ওদের শরীরে যেন শীত লাগছে না। সে ওদের দেখে অবাক না হয়ে পারছিল না।

রাতের বেলা মনে হল ঠাণ্ডা আরও বেড়েছে। কেমন জ্যোৎস্নার মতো সারাদিন ঠাণ্ডা। শীতের রোদে দাঁড়ালে মনে হয় না রোদ। তবু যতক্ষণ রোদ ছিল জাহাজিরা ওপরে উঠে দাঁড়াতে পারছে, সন্ধ্যা হলে কেউ আর ওপরে থাকছে না। যারা বের হবার এ-শীতেও বের হয়ে যাচ্ছে। বড়-মিস্ত্রি সেই এক পোশাকে ক্রাচে ভর করে নেমে যাচ্ছে। মাঝ বয়সী মেমসাব ওকে ধরে ধরে গাড়িতে তুলে নিচ্ছে। জ্যাক বিকেলের দিকে ওর বাবার সঙ্গে এজেন্ট অফিসে গেছে। হয়তো কোথাও ওর বাবার পার্টি আছে। সেখান থেকে ফিরতে রাত হবে। চিঠি পত্র এসেছিল। ওর কোন চিঠি নেই। সে আর চিঠির আশাও করে না। আত্মীয়-স্বজন কিছু কলকাতায় আছে। ওদের ঠিক ঠিকানা ওর জানা নেই। সে মানুষ হিসেবে অগোছালো—তার কিছু ঠিকঠাক থাকে না। এমন কি জাহাজে ওঠার আগে যে দূর সম্পর্কের আত্মীয়টি ভীষণ সদাশয় ছিলেন, সে তাদের ঠিকানায় চিঠি দিতে পারত। কিন্তু সেটাও সে এখন খুঁজে পাচ্ছে না। কাজেই সে আর কিছু করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত সে ঠিকানা লিখে বাসে রেখেছিল তো। এখন কিছুই মনে করতে পারছে না। আসলে এ-কাজটার সঙ্গে ওর মনের কোন সংযোগ নেই। যেন কোনরকমে সিঁড়ির ধাপ ভেঙ্গে ওপরে ওঠা। ঠিকমতো উঠতে পারবে কিনা জানে না। জাহাজে জ্যাক আছে, মৈত্র এবং অমিয়, সারেঙসাব, ইয়াসিন অনিমেষও আছে। ওরা আছে বলেই সে নিঃসঙ্গ নয়। সে এখন জ্যাকের কাছ থেকে নানারকম সমুদ্র বিষয়ক বই নিয়ে আসে। সমুদ্রের ওপর পড়াশোনা করতে ওর ভাল লাগে। এখন সে মার্কোর্পলোর ভ্রমণ কাহিনী পড়ছে। আসলে মানুষ এ-সব বই পড়লে মনে মনে সমুদ্রে না গিয়েও সমুদ্রে ভেসে চলতে পারে। অনেক সময় ওর ইচ্ছে হয় সেও লিখবে এমন একটা কাহিনী। কারণ মার্কোপলোর চেয়ে কম রোমাঞ্চকর নয় তার এই সমুদ্রযাত্রা।

রাত এভাবে জাহাজে বেড়ে যায়। স্টিয়ারিং এনজিনে কোন শব্দ নেই। ওপরে সমুদ্রের হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। তার শব্দ এবং সমুদ্র থেকে ঢেউ এসে আছড়ে পড়ছে। এ-বাদে কিছু শব্দ নেই। ক্রেনগুলো কাল থেকে এদিকে ঠিক ফল্কা বরাবর দাঁড়িয়ে যাবে। কাল থেকে মাল খালাস আরম্ভ হবে। ফল্কার কাঠ তোলা হবে কাল। কিনার থেকে মানুষ জন দলে দলে উঠে আসবে। এমন নিঃশব্দ, নির্জন তখন থাকবে না জাহাজ। দীর্ঘদিন পর জাহাজ বন্দরে এসে ভিড়লে কেমন সব চুপচাপ হয়ে যায়। সমুদ্রে পিচিঙের বিরাম থাকে না, কম বেশি, এনজিনের শব্দ সব সময়। সেটা সহসা বন্ধ হয়ে গেলে কেমন ভুতুড়ে মনে হয় জাহাজটাকে। কেমন একেবারে সব কিছু থেমে যায় যেন। কেউ সিঁড়ি ধরে নেমে এলে জুতোর শব্দ এত স্পষ্ট যে তখন ভীষণ অস্বস্তি লাগে।

যারা হাতী এবং ময়ূরের পালক নিয়ে দোকানের মতো ওপরে সাজিয়েছিল, তারা পর্যন্ত নেমে এসেছে। কিনার থেকে তেমন কেউ আর ওপরে ওঠে আসে নি। কাল খবর রটে যাবে শহরে। ভারতবর্ষ থেকে জাহাজ এসেছে। ওরা প্রতিবারের মতো এবারে ময়ূরের পালক, কাঠের হাতী নিয়ে এসেছে। সুন্দর সুন্দর সব চাকচিক্যময় হাতী, কালো রঙের, আর ময়ূরের

পালক ড্রইংরুম সাজাবার পক্ষে কি যে দরকারী। আর কি সস্তা! কেবল যমুনাবাজুর গ্যালিতে ডেক-ভাণ্ডারির গলা পাওয়া যাচ্ছে। সে বোধহয় উনুনের ছাই ঝাড়ছিল। সে বোধহয় উনুন পরিষ্কার করে রাখছে। অথবা এও হতে পারে—সে রাতে বন্দরে যাবে বলে সব ঠিকঠাক করে রাখছে। বেশি রাতে ফিরলে সকাল সকাল উঠতে কষ্ট হবে। হাতের কিছু কাজ সে সেরে রাখছে আগে থেকে।

মৈত্র শুয়ে শুয়ে চিঠি পড়ছিল। ওর বৌ যথানিয়মে চিঠি লিখে থাকে। বন্দরে এলে সবাই চিঠি না পেলেও যেন কথা থাকে সে চিঠি পাবে। কি যে লেখা থাকে চিঠিতে! ছোটবাবু দেখেছে অনেক সময় মৈত্র পালিয়ে পালিয়ে বৌর চিঠি পড়ে। কেউ এলেই সে লুকিয়ে ফেলে। অথবা ধরা পড়ে গেছে মতো মুখ করে রাখে। ছোটবাবু জানে, সে ঘুমিয়ে পড়লেও মৈত্র চিঠি পড়ে। তখন অমিয় কিছু বলে না। সে একটা ক্রাইম নভেল পড়তে থাকে শুয়ে শুয়ে। কারণ সে হয়তো জানে চিঠি পড়া মৈত্রের সারা রাতেও শেষ হবে না। সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চিঠিটা পড়ে। তারপর চিঠি লিখতে বসে। শীতের জন্য সে মাঝে মাঝে চা করে আনে। চা খেতে খেতে কত কি যে ভেবে সে চিঠি লেখে।

অমিয় মাঝে মাঝে ধুস্ শালা বলছে। কাকে ধুস্ শালা বলছে বোঝা যাচ্ছে না। মৈত্রকে না শীতের জন্য ধুস্ শালা বলছে ছোটবাবু বুঝতে পারছে না। মৈত্র আলো জ্বালিয়ে রেখেছে বলে অমিয়র ঘুম নাও আসতে পারে, অথবা শীতের জন্য, না কি সে ক্রাইম ফিকশানে কোনও এমন চরিত্র পেয়ে গেছে যাকে মাঝে মাঝেই ধুস্ শালা বলা যায়। ধুস্ শালা বললে, শীত কমে যায়, মৈত্রকেও বুঝিয়ে দেওয়া যায়, আলো জ্বালিয়ে রাখার জন্য ঘুম আসছে না।

মৈত্র দেখল, তখন ছোটবাবু পাশ ফিরছে। ছোটবাবু ঘুমোবে এখন হয়ত। এক কাপের মতো চা করে এনেছিল, সে তবু বলল, কি রে খাবি, যা ঠাণ্ডা। চা খেলে ভাল লাগবে। আর সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই লাফ দিয়ে উঠল। গলায় মাথায় মাফলার ঢেকে, কম্বল, লেপ মুড়ে একেবারে দুজন এসকিমোর মতো উঠে বসেছে। হাত বের করছে না পর্যন্ত। পারলে যেন মৈত্রকে এখন চা খাইয়ে দিতে হবে। আর উঁ হুঁ হুঁ এমন শব্দ, মুখ থেকে বাষ্প বের হচ্ছে গাদা গাদা।

মৈত্র চা খেয়ে বাংকে উঠে গেল। এত তাড়াতাড়ি ওর ঘুম আসে না। তবু বাজি ধরার মতো সে বন্দরে না নেমে থেকেছে। ওর জন্য ছোটবাবু অমিয় নামে নি। ছোটবাবু একটু ঘুরেই উঠে এসেছে জাহাজে। কিন্তু বন্দরে এলে জাহাজ থেকে না নেমে থাকা ভীষণ কষ্টের। ওর চিঠি পড়তে পড়তেই মনে হল, কতকাল থেকে সেও মাটি না ছুঁয়ে আছে। সে তো মানুষ। সে কি করে ডাঙায় না নেমে থাকে। জাহাজে থাকলেই সে শেফালীর কথা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারে না। সে শেফালীর মুখ ভাবতে ভাবতে অথবা ওর চিঠি পড়তে পড়তে সত্যি একটা অসুখে পড়ে যায়। সে কম্বলের নিচে তখন হি হি করে শীতে কাঁপতে থাকে। আর তখন মনে হয় শেফালীর ভীষণ অবিশ্বাস মৈত্রকে। সে ফিরে গেলেই ভূতে পাওয়া রুগীর মতো ছিঁড়ে খেতে চায়, সে সমুদ্রে ভাল মানুষ থাকে কি করে।

সময়-অসময় পর্যন্ত বোঝে না মানুষটা। পাগলের মতো ভালবাসার জায়গাগুলো নিয়ে পড়ে থাকে। তখন একেবারে সরল মানুষ। শেফালীকে ছেড়ে সে কোথাও যাবে না। দু’দণ্ড কোথাও দেরি করে না। যেন শেফালীর শরীর পেলে মৈত্রের আর কিছু লাগে না। আর কি আছে শেফালীর। লম্বা যুবতী শেফালী। শরীরের সর্বত্র মহিমময় ঈশ্বর সবকিছু ভরে দিয়েছেন। মনে হলেই মৈত্রের শেফালীর সবকিছু মনে পড়ে যায়। এবং এভাবেই মৈত্র জাহাজে তার সফর শেষ করে দেয় ভেবে ভেবে।

অথচ সে আবার একনাগাড়ে বেশি দিন ঘরে থাকতে পারে না। এক সময় মনে হয় শেফালীকে আর তেমন ভাল লাগছে না। বরং শেফালীকেই মনে হয় ভীষণ বেপরোয়া। সে শেফালীর কাছে এতটা আশা করে না। তখন শেফালীকে ভীষণ ওর বাজে লাগে। আবার নোনা জল, সমুদ্রে সফর। জাহাজের জন্য উঠে পড়ে লাগা। টাকা কমে আসে, কতদিন বসে

খাওয়া যায়, সে শেফালীকে নানাভাবে বোঝাতে থাকে, এবার সমুদ্রে বের হওয়া দরকার। বের হয়ে গেলেই যত মায়া ফের গড়ে ওঠে শেফালীর জন্য। সে শেফালীকে ছেড়ে সত্যি বেশিদিন সমুদ্রে থাকতে পারে না।

কখনও শেফালী বলবে, তুমি থাকো কি করে? কষ্ট হয় না?

মৈত্র হেসে বলত, তোমার কথা ভেবে ভেবে সফর শেষ করে দিই।

শেফালীর তখন বলার ইচ্ছে হত, তুমি মিথ্যা কথা বলছ। আমাকে সত্যি কথা বলছ না। অথচ শেফালীর বলার সাহস হত না। মানুষটি যা একগুয়ে, কখন কি করে বসবে কে জানে। তাই চিঠিতে সেই যেন মায়ের মতো লেখা, অথবা সেই জাহাজডুবির গল্প মনে করতে পারে মৈত্র, যেন শেফালী প্রত্যেক চিঠিতে লিখতে চায়, সাগরে জাহাজডুবি হয়েছে। সমুদ্রে সাঁতার কাটছে বাবা এবং ছেলে। ছেলে কিছুতেই আর পারছে না। মাঝে মাঝে ডুবে যাচ্ছে। তখন যেন বাবা বলছেন, তুমি নক্ষত্র দেখতে পাচ্ছ, ঐ যে দূরে আকাশে নক্ষত্র, ঠিক তার নিচে তোমার মা একটা ঘরে বসে রয়েছেন। আমাদের জন্য গরম খাবার টেবিলে সাজিয়ে বসে আছেন। অপেক্ষা করছেন কতক্ষণে আমরা যাব। তুমি তবু তলিয়ে যাচ্ছ কেন জলে! জলের নিচে সব বড় বড় হাঙর, জোরে হাত-পা নাড়তে পারছ না। আমরা এসে গেছি, ঐ তো সেই পাহাড়টা, তুমি কতদিন তার ওপর দাঁড়িয়ে দূরের জাহাজ দেখেছ। দেখতে পাচ্ছ পাহাড়ের মাথায় আলো জ্বলছে। আর একটু কষ্ট করলেই আমরা সেখানে আহার এবং উত্তাপ পাব জান। সামান্য ধৈর্য, অধৈর্য হলে আমরা উভয়ে তলিয়ে যাব।

শেফালীর যেন এভাবে বলার ইচ্ছে আমরা উভয়ে তলিয়ে যাব শুভেন্দু। আমি তোমার জন্য আহার এবং উত্তাপ সবই সঞ্চয় করে রাখছি। ঘরে ফিরলে আহার এবং উত্তাপ যা খুশি তোমার, যতটুকু ইচ্ছা সব চেঁটেপুটে নিও। এই উত্তাপের জন্য অন্যত্র হেঁটে যাবে না কথা দাও। আমার কাছে এক বাতিঘর সম্বল। সমুদ্রে ডুব দেবার প্রলোভন জাগলে নিজের বাতিঘরটির কথা ভেবো। শেফালীর চিঠিতে এমন অজস্র কথা থাকে। যার উত্তর দেবার সময় মৈত্র ভীষণ ভাবনায় পড়ে যায়।

মৈত্র ডাকল, অমিয়, রাত কত হয়েছে খেয়াল আছে?

—তোর বৌকে চিঠি লেখা শেষ?

—শেষ।

—ছোটবাবু কি করছে?

—ঘুমোচ্ছে।

—তুই শুয়ে পড়। আর একটু বাকি আছে, ওটুকু হলেই শুয়ে পড়ব। তুই ঘুমিয়ে পড় না।

—ঘুম আসবে না।

—কেন, আলো জ্বালা বলে?

—না। বৌটার বাচ্চা হবে। টাকা পাঠানো দরকার।

—টাকা পাঠাতে লিখেছে?

—হ্যাঁ।

—তাহলে সারেঙসাবকে বলে টাকা তুলে নিবি। কাল তো শুনলাম, কে কত তুলতে চায় একটা লিস্ট চেয়েছে।

মৈত্র আর কিছু বলল না। সে কম্বলের নিচে হাত রেখে, হাত-পা গরম করার চেষ্টা করল। কখনও হয়ত ঘসে ঘসে কানে হাত চেপে ধরেছে। কিছুটা এভাবে ওর শরীর গরম হয়। তারপর সে মুখে মাথায় কম্বল টেনে দেবার সময় দেখল, ছোটবাবুর লেপ কম্বল পা থেকে সরে গেছে। এই হয়েছে জ্বালা। ঘুমালে ছোটবাবুর কোন হুঁস থাকে না। সে উঠে লেপ-কম্বল

টেনে দিল। ছোটবাবুকে দেখলেই বোঝা যায়, খুব ছেলেমানুষ। ঘুমিয়ে থাকলে ওকে আরও বেশি ছেলেমানুষ লাগে। ছোটবাবুকে নিয়ে ভয় আছে। এ-বয়সটা খুব ভয়ের। অতি সহজে কোন যুবতী ওকে সম্বল করে বনবাসে চলে যেতে পারে। পোর্টহোল বন্ধ। দরজা বন্ধ। ঘরে, বাইরের ঠাণ্ডা ঢুকতে পারছে না। আলো জ্বালা থাকলেই যেন ভাল। যতটুকু উত্তাপ পাওয়া যায়। ছোটবাবু পায়ে মোজা পরেই শুয়ে পড়েছে। হাতে দস্তানা। ছোটবাবু যে ভীষণ শীতকাতুরে এই থেকে বোঝা যায়।

এমন সময় অমিয় দেখল, বড় টিণ্ডাল মৈত্রও নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। সে বইয়ের পাতা ভাঁজ করে শুয়ে পড়বে ভাবল। ঘুমিয়ে থাকলে মৈত্রের মুখ সে তার বাংক থেকে স্পষ্ট দেখতে পায়। সে ওপরের বাংকে থাকে। মাঝে মাঝে মৈত্র ঘুমের ভিতর হাসলে টের পায় অমিয়, মৈত্র স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন দেখলে সাধারণতঃ বৌকেই দেখতে পায়। ওরা একসঙ্গে সেই কলকাতা বন্দর থেকে আছে। নানাভাবে দেশের কথা উঠলে মৈত্র, ওর বৌ সম্পর্কে বলেছে। ওদের ভালবেসে বিয়ে। মৈত্রের স্ত্রী সুন্দরী, এ-কথাও মৈত্রের কাছ থেকে শোনা। এবং দেখতে ভালো। আর শেফালীর ভালবাসার জুড়ি নেই। সে প্রায় মাঝে মাঝে কেঁদে ফেলার মতো মুখ করে বসে থাকত, স্ত্রীর কথা মনে হলেই মৈত্র একেবারে চুপচাপ। কথা প্রসঙ্গে মৈত্র কত যেন কথা বলে—আর জাহাজে আসছে না, এমনও বলে মাঝে মাঝে। বয়স বেড়ে যাচ্ছে, এ-বয়সে একটা কাজ ডাঙায় খুঁজে না নিলে সারাটা জীবন সমুদ্রে কাটবে! সফরে সফরে সে টাকা জমাচ্ছে।

মৈত্র এভাবে কত রকমের পরিকল্পনা করে থাকে। সে কতবার যে বলেছে টাকা সঞ্চয় করছি অমিয়। চিরটাদিন জাহাজে কাজ করতে ভাল লাগবে না। তুইও জমা। টাকা অযথা নষ্ট করবি না। জাহাজের একটা পয়সাও আমি নষ্ট করছি না। মদ খাচ্ছি না। কার্নিভেলে যাচ্ছি না। জুয়া খেলছি না। কিনারার এক খদ্দের ধরতে হবে শুধু। কথা আছে মানুষটা জাহাজেই আসবে। যদি জাহাজ থেকে নির্বিঘ্নে নামাতে পারি, তবে দু'পয়সা হয়ে যাবে। যা সামান্য আয় এতে বাড়ে। আমি এজন্য কাঠের হাতী আনিনি, ময়ূরের পালক আনিনি।

অমিয় বলেছিল, একটা কেলেঙ্কারী না হয়।

—কি আর হবে। ধরা পড়লে চুপ মেরে যেতে হবে। কার জিনিস কে খোঁজ রাখে।

—আমার এসব ভাল লাগে না মৈত্র।

মৈত্র বলল, আমারও কি ভাল লাগে! বউ সুন্দরী হলে অনেক খরচ।

মৈত্রের ঐ অভ্যাস। দোষ ত্রুটির জন্য সে সবরকমের যুক্তি-তর্ক খাড়া রাখে। না পারলে চুপ। কোন কথা বলবে না। চুপচাপ কাজ করবে। তখন মনে হবে, ছোটবাবু এবং অমিয় জাহাজে সত্যি কয়লায়ালা, সে বড় টিণ্ডাল। আস্কারা দিয়ে মাথায় তুললে যা হয়। কথা না বলে সে মনে করিয়ে দেয় সে জাহাজের বড় টিণ্ডাল। অমিয় এবং ছোটবাবু তখন একেবারে ঠিক ঠিক কয়লায়ালার মতো ব্যবহার করতে থাকে। টিণ্ডাল সাব, খানা রেডি।

মৈত্র আরও গম্ভীর হয়ে যায়।—খুব মজা, হারামজাদা, পঙ্গপালের দল। সে তেড়ে যায় ছোটবাবুকে। ছোটবাবু আর অমিয় তখন ডেকের ওপর ছুটে গিয়ে হা-হা করে হাসতে থাকে।

রাত থাকতে অমিয়র ঘুম ভেঙ্গে গেল। বন্দর এলে ওয়াচ থাকে না। কাজের চাপ কম। সাতটা থেকে কাজ আরম্ভ। অমিয়র ইচ্ছে ছিল ছ'টা পর্যন্ত ঘুমাবে। একঘণ্টার ভেতর বাকি কাজ অর্থাৎ হাত-মুখ ধোয়া, বাথরুমের কাজ, এবং অন্যান্য, যেমন চর্বি ভাজা রুটি-চা এসব খাওয়ার কাজ সেরে ফেলতে পারবে। তারপর টান্টু বললেই লাফিয়ে কাজে বের হয়ে যাওয়া। অথচ ঘুম যে কেন রাত থাকতে ভেঙ্গে গেল। বেশ রাত। সকাল হতে হতে সাতটা বেজে যাবে। তবু তখন কিছুটা অন্ধকার থাকে। অন্ধকারে এনজিনরুমে নেমে যেতে হবে। সে ঘড়িতে দেখল পাঁচটা বাজেনি। সে ফের লেপ- কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করল। কিন্তু ঘুম এল না। সে কম্বল গায়ে উঠে বসল। বাথরুমে যেতে হবে। শীতের সময় যতক্ষণ

পারা যায় চেপেচুপে পড়ে থাকার স্বভাব। সে বুঝতে পারল এর জন্য ঘুম ওর ভেঙ্গে গেছে। সে নেমে ওপরে ওঠার সময় ভাবল, দরজাটা বন্ধ করে আসেনি। সিঁড়ির মুখে, আলোটা সবসময় জ্বালা থাকে। দরজা খোলা রাখলে ঘরে অন্ধকার থাকে না। সে নেমে গিয়ে দরজা ফের বন্ধ করে দিল।

তারপর ধাপে ধাপে ওপরে উঠতেই মনে হল, পূবের দিকটা বেশ ফর্সা মতো। সে রাতে এটা লক্ষ্য করেনি। একটা দ্বীপ-টিপ থাকবে। সেখানে আলো থাকতে পারে। নানাভাবে চারপাশের আলো মিলে এমন দেখাতে পারে। নতুন বন্দর। সামনে জেটি পার হলে বড় বড় গাছ। আলো-অন্ধকারে গাছগুলোকে বড় রহস্যময় লাগছিল। মৈত্র বলেছে জেটি পার হলে শহরের পার্ক। সমুদ্রের বুক থেকে এই পার্ক উঠে এসেছে যেন। এই পার্কে টিউলিপের ফুল প্রচুর ফোটে। ফুলের লোভে শহরের সব উঠতি বয়সের মেয়েরা এখানে বিকেল হলেই চলে আসে।

এইসব মেয়েরা স্বাভাবিকভাবেই জাহাজিদের ভীষণভাবে মাতাল করে দেয়। এবং এখানে এক কার্নিভেল আছে, কার্নিভেলে গুহাপথ আছে অথবা রিঙের খেলা, মোটর রেস আছে যা মৈত্র এবং নাবিকদের পক্ষে ভীষণ লোভের। মৈত্র বলেছে মাথা ঘোরাবার পক্ষে জুয়োখেলায় যে-কোন রমণীই যথেষ্ট।

প্রচণ্ড ঠাণ্ডায় ওর ঘুম ভেঙ্গে যেতে পারে। খুব বেশি ঠাণ্ডা পড়লে ওর শীতে ঘুম ভেঙ্গে যায়। এখন সে কেবল চা খেয়ে কিছুটা শরীর গরম করতে পারে। সে গ্যালিতে ঢুকে দেখল, উনুনে আঁচ দেওয়া আছে কিনা। সে দেখল আছে। ছাই ঝেড়ে সামান্য কয়লা দিয়ে দিল। ভাণ্ডারির এখন ওঠার সময়। ভাণ্ডারি উঠে খুশিই হবে দেখে।

সে চা নিয়ে এসে দেখল, মৈত্র আলো জ্বেলে ঘরে বসে আছে। মুখে-চোখে ভয়ঙ্কর বিরক্তিকর রেখা ফুটে উঠেছে। ওর হাতে চা দেখেও একটা কথা বলল না। ভয়ঙ্কর কিছু হলে এমন হয়। অমিয় বলল, কি রে, কি হয়েছে! শরীর খারাপ!

সে কেমন আরও ক্ষেপে গেল। কথা বলল না। তোয়ালে মগ নিয়ে ওপরে উঠে গেলে অমিয় হেসে ফেলল, শালা আমার নীতিবাগীশ। মৈত্র নেমে এলে বলল, বন্দরে ভিড়তে না ভিড়তেই।

—হ্যাঁ ভিড়তে না ভিড়তেই। সে একবার অমিয়র দিকে তাকাল না পর্যন্ত। শরীর সাফসোফ করে এসে শীতে আরও কাবু হয়ে গেছে। সে কোনরকমে কম্বলের নিচে ঢুকে যেতে পারলে যেন বাঁচে। সে আণ্ডার-ওয়ারটা লকারের মাথায় শুকোবার জন্য ছড়িয়ে দিল।

—নীতিবাগীশদের এই হয়। অমিয় চা খেতে খেতে ব্যঙ্গ করল।

মৈত্র জবাব দিল না।

—সারাদিন বৌ বৌ। আর শালা মানুষ বিয়ে করে না বুঝি!

—বিয়ে না করলে এসব কথা মানায় না। তুমি তো বাউণ্ডুলে। বাপের খেয়েছ, বোনের মোষ তাড়িয়েছ। ইচ্ছে করেই মৈত্র বন না বলে বোন বলল।

অমিয় ও-কথায় কান দিল না। বলল, আমার হলে বেশ ভাল লাগে। বলে সে বেশ জোরে জোরে কথা বলতে চাইলে মৈত্র বলল, আস্তে, ছোটবাবু ঘুমোচ্ছে। ওরও ঠিক হয়ে যাবে। যেভাবে ঘুমোচ্ছে!

লেপের নিচে ঢুকে বলল, তুই কার মুখ দেখিস অমিয়?

—কত মুখ। কেবল দেখতে পাই একটা ফ্রক-পরা মেয়ে দৌড়াচ্ছে। আমি তার পেছনে ছুটছি। তারপর কোনরকমে ছুঁয়ে দিলেই আমার হয়ে যায়। খুব বেশি দূর যেতে পারি না। তারপর আর মুখটা মনে পড়ে না। সে হেঁটে হেঁটে অনেক দূরে চলে যায়। আমার আর তখন কোনও মুখের কথা মনে থাকে না। সকালে উঠে কাকে দেখে রাতে কলিসানটা হল কিছুতেই

মনে করতে পারি না।

মৈত্র বলল, আমার সব মনে থাকে।

—কি দেখলি আজকে।

—দেখলাম.......এই দেখলাম।

—বলতে চাস না?

—না, তোর এই আর কি, শেফালীকে দেখলাম। না বললে কি আর হবে। তোমাদের তো সবই বলি। তবে তোরা পঙ্গপালের দল, বিয়ে করিসনি, তোদের বলা ঠিক না। তোরা তবে খারাপ হয়ে যাবি।

—ধুস্ শালা। তুই খারাপ করার কে রে? বাদ দে! চা খাবি?

—খাওয়াবি!

—মুখ সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। অনেকটা গেছে? চা খেলে আরাম পাবি।

—অনেকটা। মৈত্র বলতে গিয়ে মুখ গোমড়া করে ফেলল।

ওরা বসে বসে দুজন বেশ অনেকক্ষণ কথা বলল। এখন আর মনে হচ্ছে না, ওরা চার মাস আগেও ছিল অপরিচিত। কত সহজে সব কথা বলে ফেলতে পারে সবাই। মৈত্রের যা-কিছু কথাবার্তা সব এদের সঙ্গে। এরা মৈত্রের বন্ধু আবার সহকর্মী। আবার একেবারে অধস্তন মানুষের মতো ব্যবহার করতেও ছাড়ে না। তথাপি এই বাংকে অথবা ফোসকালে এলে ওরা বুঝতে পারে, যত দেশ ছেড়ে ক্রমে দূরে সরে যাবে, তত ওরা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হবে। জাহাজ তো সবেমাত্র চলতে আরম্ভ করেছে। বলতেই বলে ব্যাঙ্ক লাইনের সফর। সহজে শেষ হয় না।

সকাল হলে অমিয় পোর্ট-হোলের কাচ খুলে দিল। সাতটা কখন বেজে গেছে। অথচ সারেঙ টান্টু বলছে না! কাকে কোথায় কাজ করতে হবে বলছে না। অমিয় অবশ্য জানে তাকে কোথায় কাজ করতে হবে। কারণ, ছোট টিন্ডালের সঙ্গে স্মোক-বসে তার কাজ আছে। বন্দরে এলেই বয়লারের সব স্মোক-বক্স পরিষ্কার করে ফেলতে হয়। এবং এ-কাজটা একমাত্র কোলবয়দের দিয়ে করিয়ে নেওয়া হয়। ছোটবাবু হয়তো ডেকে কাজ করবে। ডেকে কাজ দিলে ছোটবাবু বেশ সব দেখে বেড়াতে পারবে।

সিঁড়িতে এখন জাহাজিদের ওঠানামার শব্দ। জেটিতে লোকজনের ভিড়। বড় বড় ক্রেন সব এগিয়ে আসছে। ওরা ফোকসালে বসে দেখতে পাচ্ছে। সামনের পোর্ট-হোল খোলা। কিনারায় মানুষ জড় হচ্ছে। ওরা গ্যাঙওয়ে দিয়ে উঠে আসছে। কেউ কেউ দল বেঁধে, কাজের পোশাকে গাছের নিচে জটলা করছে। বেশ একটা উৎসবের মতো মনে হয়, যেন সাড়া পড়ে যাবার মতো। ডেক-জাহাজিরা ফল্কায় কাঠ খুলে দিচ্ছে। ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছে কাঠ। আর হাজার হাজার পাখি উড়ছে মাথার ওপর, সমুদ্র পাখি। এদের ডানা তেমন বড় নয়। পাখিগুলো প্রায় কবুতরের সামিল। ওদের ডানার শব্দ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। অমিয় বসে বসে পোর্ট-হোলের ঘুলঘুলিতে বন্দরের দৃশ্য দেখতে থাকল। বড়-মিস্ত্রিকে খুব ভয়। সে খুব সাবধানে চলাফেরা করছে। এবং রক্ষে বড়মিস্ত্রি কোনদিন ডেকে বের হয় না। এতদিন পর দেখলে নাও চিনতে পারে। তবু আরও কিছুদিন সাবধানে থাকা ভালো।

এভাবে কেন যে বন্দরের দৃশ্য দেখতে দেখতে কখনও বড়-মিস্ত্রির গোলগাল মুখ এবং অবয়ব চোখের ওপর ভেসে ওঠে। সে দৃশ্যটা ভুলে যেতে চায়। বরং ভাল লাগে, সেইসব বড় বড় গাছ, টিউলিপ ফুলের গাছ, গাছে সাদা অথবা মেরুণ রঙের ফুল—বন্দরে ফুলের ছবি, মেয়েরা সোনালী গাউনে ঢেকে চুপচাপ হেঁটে চলে আসবে, ওদের কালো চোখ, নীল চুল, সুষমায় ভরা মুখ, সে একটু ছুঁয়ে দেখবে তাদের—আর কিছু না। বন্দরে এর চেয়ে বেশি কিছু চায় না।

॥ বারো ॥

সেই জেটি সেই প্রশস্ত পথ সামনে। অদূরে ওরা শহরের ভিতর স্কাইস্ক্রেপার তেমনি দেখতে পাচ্ছে। ডেকে দাঁড়ালে চার পাশে অজস্র জাহাজ। জাহাজের চিমনি। সব চিমনি থেকে ধোঁয়া ওঠে না আজকাল। মোটর ভেসেলে কোন ধোঁয়া থাকে না। কিন্তু ওদের জাহাজে অথবা অন্য অনেক জাহাজ যেখানে ইনজিন কয়লায় অথবা তেলে চলে, সেখানে চিমনিগুলোর অল্প ধোঁয়া। বাকি চিমনিগুলো ঝক্‌ঝকে। মাস্তুলে সব নানা বর্ণের পাখি। ডেকে মানুষের ভিড়। সারি সারি ট্রাক, অথবা মালগাড়িতে ক্রেনে মাল নামানো হচ্ছে। এবং গাদাবোটগুলোকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে ছোট ছোট মোটর বোট। নানা রকমের পতাকা উড়ছে চারপাশে। এবং জাহাজের সিটি......বাজছে....... কোথাও। সব জাহাজেই জাহাজিরা এখন সুখী' পায়রার মতো উড়ছে। কখন সন্ধ্যা হবে, কখন ওরা ছুটি পাবে, ছুটি পেলেই সেজে-গুজে লারে লারে গান গলায়, অথবা শিস দিতে দিতে ওরা নেমে যাবে বন্দরে।

অমিয় বলল, মৈত্র, এমন বন্দরে না নেমে থাকা যায়!

—নামব না বলিনি তো, আমাকে একদিন নামতেই হবে।

—সে তো তোর মালের জন্য। অমিয় ফিফিস্‌ গলায় বলল, আমার একা নামতে ভয় লাগে। ওর যেন বলার ইচ্ছে এবার ঠিক বড়-মিস্ত্রির সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। দেখা হয়ে গেলে ধরা পড়ে যাবে। সে যদি কোন রকমে মৈত্রের সঙ্গে যেতে পারে, তবে তার আড়ালে আবডালে ঠিক নেমে যাওয়া যাবে।

মৈত্র বলল, নামব, কিন্তু খবরদার কোথাও যাবি না আমাকে ফেলে। আমি যা বলব তা করবি। কোথাও ঢুকতে পাবে না, কোনও কার্নিভালে ঢুকতে পাবে না!

—তুই তো আচ্ছা লোক মৈত্র। তোর জন্য শেষ পর্যন্ত রাস্তায় হাঁটতে পারব না, কোনও রেস্তোরাঁতে ঢুকতে পারব না।

—তা আমি বলছি না।

—বলতে বাদ রেখেছিস কি! কার্নিভেলে ঢুকবি না। তবে খাব কি, দেখব কি! জাহাজে আসার মজাটা কোথায়।

—ঘুরে দ্যাখো। পথ ধরে হেঁটে যাও। সুন্দরী মেয়েদের গন্ধ পাবে। পার্কে কত সব ফুল, বাড়িগুলোর সামনে কত যে ফুল! মেয়ে দ্যাখো ফুল দ্যাখো তবে ছুঁতে যাবে না। লোন্দ্রা এল্যান ধরে গেলে বিচ পাবি সমুদ্রের। বিচে ওরা নাঙ্গা হয়ে শুয়ে থাকে।

—আর কি দেখব?

—যদি তুই না বের হস, জাহাজেই যদি থাকিস, তবে দেখবি, সামনের পার্কটায় শহর থেকে কচিকাচা মেয়েরা এসে বিকেলে ভিড় করবে। রং-বেরঙের ফ্রক গায়ে, আর কি সুন্দর পা। পা দেখলেই মনে হবে সারা জীবন এই পা জড়িয়ে পড়ে থাকি। কোথাও আর যেতে ইচ্ছে হবে না।

অমিয় ডেকের ওপর দু' হাত ছুঁড়ে বলল, ফাইন। কবে যাবি?

—তোর খুব লোভ অমিয়। তোকে নিয়ে যাওয়া যাবে না।

—আমি ভালছেলে হয়ে থাকব মাইরি। তুই বিশ্বাস কর আমি হারামিপনা করব না।

—তোর স্বভাব ভাল না।

—গঙ্গার জলে মুখ ধুয়ে নেব। স্বভাব ভাল হয়ে যাবে।

—নোনা জলে ভাসলে গঙ্গার জলে স্বভাব ভাল হয় না।

—ধুস্‌ শালা। তোর সঙ্গে আমি বের হচ্ছি না। একাই বের হব।

—আরে না না। আমি যাব তোর সঙ্গে।

—ঠিক?

—ঠিক।

—কথা দিচ্ছিস তবে?

—হ্যাঁ, যাব বলছি। সব চিনিয়ে দিতে হবে না! সব সফরে তো আমি আর তোর সঙ্গে যাচ্ছি না। কোথায় কে বেকুব বানিয়ে দেবে কে জানে।

আর তখন জাহাজের ওপর ডেক-সারেঙ, এনজিন-সারেঙ যে যার দল নিয়ে নিচে ওপরে কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। মৈত্র এনজিনে নামার আগে এসব গল্প করছিল। দুটো বয়লার নেভানো। একটা বয়লার সামান্য চালু রাখা হয়েছে। জেনারেটর চালু রাখার জন্য স্টিমের দরকার।

ডেক-জাহাজিরা জল মারছে ডেকে। বড় বড় পাটের গাঁট নেমে যাচ্ছে এখন। ডেরিকে পাটের গাঁট নামানো হচ্ছে। ফল্কায় একটা ক্রেনও কাজে লেগে গেছে। যত তাড়াতাড়ি করা যায়। বিশ বাইশ দিনের আগে তবু জাহাজ খালাস হচ্ছে না। অন্ততঃ এরা বিশ বাইশ দিন এ-বন্দরে থাকতে পারবে, ঘুরে বেড়াতে পারবে। তারপর জাহাজে কি বোঝাই হবে জাহাজিরা বলতে পারে না। মাল বোঝাই হলে আরও ক'দিন। তারপর ফের সমুদ্রে ভেসে পড়া।

বন্দরে প্রথম দিন বলে জাহাজিদের তাড়াতাড়ি ছুটি হয়ে গেল। বারোটায় খানা খেতে এসে সবাই শুনল ছুটি। সবাই এখন হল্লা করছে বাথরুমে। একসঙ্গে স্নান করা যায় না। গরম জলের অভাব। যে যার গরম জলের টব টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সবাই মাজাঘষা করছে। এবং স্নান করার সময় কিছু অশ্লীল গান যা কানে শোনা যায় না। কে গাইছে। গাইছে অনিমেষ। ডেক-জাহাজি। সে ইয়াসিনের গলা জড়িয়ে নেচে নেচে গাইছে, ওলো সখি ললিতে যাচ্ছি আমি গলিতে। সে এটা ধুয়া দিচ্ছে নেচে নেচে। নেচে নেচে সে মেয়েদের মতো গাইছে। এবং কেউ হয়তো ওরই ভিতর অনিমেষের পাছা টিপে দিয়ে মজা লুটছে। অনিমেষের মুখ চোখ কিছুটা মেয়েলি ধরনের। শ্যামলা রং। জাহাজে থেকে আরও উজ্জ্বল হয়েছে। এবং ডেক-জাহাজিরা ওকে জড়িয়ে ধরে রঙ্গরস করে থাকে। মাঝে মাঝে অনিমেষ ক্ষেপে যায়। তখন সবাই হা-হা করে হাসে।

মৈত্র, অমিয়, ছোটবাবু তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়েছে। ছোটবাবুর জন্য মৈত্র পোশাক বের করছে। ওর ভালো পোশাক সে দিচ্ছে ছোটবাবুকে পরতে। এবং ছোটবাবু পরেছে, সাদা কটনের ফুলসার্ট, চকলেট কালারের প্যান্ট, নীল রঙের কোট, সবুজ টাই। এবং সমুদ্রে ঘুরে ঘুরে শস্য-শ্যামলা বাংলাদেশের যে ছবি ফুটে ওঠে, এই পোশাকের ভেতর ছোটবাবুকে তেমন মনোরম লাগছে দেখতে। এত ভাল লাগছে ছোটকে যে মৈত্র একেবারে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল। বলল, তোকে ছুঁলে মনে কোন পাপ থাকে না। তোর সঙ্গে ঘুরে বেড়ালে, আমরা ভাল হয়ে যাব।

অমিয় উদাস গলায় বলল, ছোটকে যে কেন নিয়ে যাওয়া। তুমি বাপু ক্যাপ্টেনের পোলাডার লগে যাও না ক্যান!

ছোট বলল ওপরে যাচ্ছি। তোরা আয়। সেও ওকে বিদ্রূপ করতে পারত কিন্তু করল না।

সে ওপরে উঠে গেল। মৈত্র, অমিয়, দ্রুত ওপরে উঠে গেল। আহা কতদিন পর এই মাটি! সে শহরের ভিতরে ঢুকে যাবে ওদের সঙ্গে। ওর সব কিছু মনে হচ্ছে মনোহারিণী। সে দেখল, তখন জ্যাক ডেকে দাঁড়িয়ে আছে। জ্যাক বোধ হয় পাখি দুটোর জন্য বাকসে খাবার দিচ্ছে। পাখি দুটার জন্য এখন জ্যাক সবচেয়ে বেশি সময় দিচ্ছে। সে আরও কিছু লক্ষ্য রাখতে পারে। মাঝে মাঝে জ্যাক পিছিলের দিকে তাকাচ্ছে।

ছোট জানে, ওখানে গেলে ওর দেরি হয়ে যাবে। সেদিকে একেবারে সে গেল না। শিস

দিতে দিতে ওরা নেমে গেল। তিনটে বাজে। সূর্য হেলে গেছে। চারটা বাজলেই সন্ধ্যা হয়ে যাবে। রোদে কোন উত্তাপ নেই। সোনালী রোদ, এবং চারপাশে যেন অতীব মায়াবি মানুষেরা ঘুরে বেড়াচ্ছে। দিনের বেলা এইসব ফুল-ফল পাখি আর আশ্চর্য রূপবান মানুষের রাজত্বে জ্যাক যে তাকে লক্ষ্য করছে ছোট দেখছে না।

আকাশ স্বভাবতই পরিচ্ছন্ন। পার্ক থেকে ফুলের গন্ধ আসছে। সবুজ চারপাশে, মাঝখানে কালো এ্যাসফাল্টের রাস্তা শহরের দিকে গেছে। নানা বর্ণের গাড়ি চারপাশে। জেটিতে কিছু সৌখিন মেয়ে পুরুষ দাঁড়িয়ে জাহাজের মাল নামানো দেখছে। আশ্চর্য ওরা কোন কাস্টমসের ঝামেলা অথবা বেড়াজাল এখানে দেখতে পেল না। সামনের পার্কটা মেলার মতো হয়ে গেছে। মানুষের ভীষণ ভিড়। ছোট বড় ছেলে যুবা এবং বৃদ্ধারাও আছেন। মৈত্র এ সময় ওদের নিয়ে শহরের দিকে উঠে যেতে থাকল। মৈত্র খুব সাদাসিদে পোশাক পরেছে। ট্রাউজার, মোটা উলেন জামা, গলায় মাফলার, ওপরে লম্বা কোট। সে টাই লাল রঙের পরতে ভালবাসে। বড় রাস্তা, প্রশস্ত ফুটপাথ, মাঝে মাঝে এভিনিউ, ভিন্ন ভিন্ন গাছের সমারোহ। গাছের নিচে সুন্দরী যুবতীরা ঘোরাফেরা করছে।

তখন আপেলয়ালা হাঁকল, আ.....পে.....ল!

কেউ হাঁক দিল, এমিগা! কোমো ইস্তা ওস্তে।

ওরা এদেশের মানুষদের কথাবার্তা বুঝতে পারছে না। ইংরেজি বললে কেমন এ-দেশের মানুষেরা হাবাকালা হয়ে থাকছে। সাধারণ মানুষ একেবারেই ইংরেজি জানে না। ওরা দুটো একটা স্পেনীশ কথাবার্তা শিখে নিয়েছে। ফলে ওরা প্রায় সময়ই এদেশের মানুষদের কাছে বাংলা বলছে। বাংলা- উর্দু এবং পৃথিবীর যে কোনও ভাষা ওরা বলে গেলেও কিছু বুঝবে না। ওরা সেজন্য নিজের খুশিমতো যা ইচ্ছা বলে যাচ্ছে। এবং অমিয়র যা স্বভাব। সে খুব খারাপ কথা মেয়েদের বলছে। ওরা অমিয়র কথা শুনে হাসছে। যেন মৈত্র, অমিয় বিদেশী মানুষ, ওদের কথা বুঝতে না পারলে ছোটবাবু বেশ মজা পায়।

ছোটবাবু দেখল সামনে একটা টাওয়ার। মৈত্র ঘুরে ফিরে আগে দেখেছে বলে, সে জানে কোথায় কিভাবে যাওয়া যায়। ঠিক টাওয়ারের নিচে স্টেশন। ওরা আন্ডার গ্রাউন্ড ট্রেন ধরে ফ্লোরিদাতে যখন পৌঁছল, তখন রাত হয়ে গেছে। তখন শহরে সব আলো তারাবাতির মত জ্বলছে। আর সব কাচের শো-কেসে দামী শহরটা মনে হয় ঢুকে গেছে। বড় বেশি কৌতূহলী করে রাখে মানুষগুলোকে। সব স্বপ্নের দেশের মতো মানুষ মনে হয়। এমন সাজানো গোছানো শহর পৃথিবীতে আর কোথায় আছে ওরা জানে না। কোন চার্চ থেকে ধর্মীয় সঙ্গীত ভেসে আসছে। আর পথ জুড়ে তখন কোলাহল। ওরা হাঁটছে শিস দিচ্ছে, বাংলা গান গাইছে। কোথাও ঢুকে কফি খাচ্ছে। ঠাট্টা মসকরা করছে মেয়েদের সঙ্গে। মৈত্র মাঝে মাঝে অমিয়কে সাবধান করে দিচ্ছে। বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে অমিয়—এতটা ঠিক না। সে ভাবছে এখন সেই মানুষটার বাড়ি খুঁজে বের করতেই হবে। সেখানে গেলে সে দেশে টাকাটা পাঠিতে দিতে পারবে। এখানে সে সেই মানুষের নামে একটা একাউন্ট করে নেবে। সেই সব করে দেবে ওর হয়ে। কিন্তু মৈত্র সেই বাড়িটা ঠিক খুঁজে পেল না।

মৈত্রকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। টাকাটা খুব তাড়াতাড়ি পাঠানো দরকার। অথচ এখানেই সেই সাহেব লোকটা থাকত। সাহেব বিনিময়ে কিছু টাকা নেয়। আর একবার সে বাড়তি টাকা এভাবে পাঠিয়েছে। এবারেও বাড়তি টাকা তার হবে।

অমিয় হাঁটতে হাঁটতে বলল, কত পাঠাচ্ছিস?

—তা হাজার প্যাসু পাঠানো দরকার। আজ কিছু দিয়ে যেতাম। বলতাম, সে যেন আমার নামে পাঠিয়ে দেয়। বাকিটা কাল দেব।

ছোটবাবু সব বালকের মত দেখে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে সে চিৎকার করে বলছে কি গ্রান্ড! কিন্তু মৈত্র লোকটার বাড়ি ঠিক হদিস না করতে পারায় কোনো কথা বলছে না। কেবল

অমিয়কে পারে না বলে মৈত্র জবাব দিচ্ছে।

—মোটামুটি বৌর কাছে খুব বড় মানুষ হয়ে বেঁচে থাকিস।

—তাছাড়া কি। যা টাকা পাই ওতে শেফালীর মতো মেয়ে বিয়ে করা যায় না। কম পাঠালে আমার সম্মান থাকবে না।

—তার মানে!

—মানে, বৌ বলবে, আমি ছোট কাজ করি। ঠিকমতো টাকা পাঠাতে পারি না।

—তার মানে তুই বৌকে বড় কাজটাজ করিস বলেছিস?

—হ্যাঁ, তাই। শেফালী জানে জাহাজে আমি এনজিন রুমে ভাল কাজ করি। অনেক টাকা পাই।

—এভাবে মিথ্যা বলে লাভ!

—লাভ, শেফালীর মতো মেয়েকে কাছে পাওয়া। বলে, মৈত্র অমিয়কে একটু অন্যমনস্ক করার জন্য বলল সামনে শো-কেসটার পাশে দ্যাখ।

—কিছু দেখছি না! একটা ওভারকোট ঝুলছে না!

—হ্যাঁ।

—নিচে কিছু দেখা যাচ্ছে?

—ও মা। চারটা পা। বলেই অমিয় ছুটতে চাইল। মৈত্র হাত ধরে ফেলল, ধীরে অমিয়। ওদিকে চল। সে টেনে অমিয়কে অন্য রাস্তায় নিয়ে গেল।

এবার মৈত্র বলল, সেবারে, এভাপেরুনকে নিয়ে কি একটা উৎসব চলছিল! ওঃ কি জাঁকজমক।

ওরা তিনজনেই দেখল, এভাপেরুনের একটা বড় মূর্তি। এবং কিছুটা মা মেরীর মতো মুখ চোখ।

ছোটবাবু বলল, এখানে একটু বসলে হয় না। হাঁটতে হাঁটতে পা ধরে গেছে। বেশ সুন্দর জায়গা। শীতটাও কম মনে হচ্ছে।

মৈত্র তখন একটা গাছের পাতা ছিঁড়ে বলল, এ গাছটার নাম জানিস? সে পাতাটা দু আঙ্গুলে পিষে ওদের নাকের কাছে নিয়ে গেল, কেমন সুন্দর গন্ধ দ্যাখ। এটা বুনো মূস্কোদাইন।

অমিয় বলল, সামান্য খাব।

ছোটবাবু বলল, আমিও।

মৈত্র বলল, পয়সা কে দেবে?

—কেন তুমি! এত টাকা কামাবে, আর খাওয়াবে না!

—ঢুকলে যে বের হতে চাইবে না। ভেতরে হাড়ের খেলা দেখাবে। সব বাঁদরের হাড়। আমার পকেটের সব ফাঁকা করে দেবে। তোমরা বাবা সুবোধ বালকের মতো হেঁটে এস তো। কোরিএন্টুজ হয়ে সোজা জাহাজে ফিরে যাব।

অমিয় বলল, আসলে শালা তুমি চিপ্পুস। তারপরই সে চিৎকার করে উঠল, মৈত্র, দ্যাখ, দ্যাখ! মৈত্র তাকাল ডান দিকে। ঠিক মোড়ের মাথায় একটা স্টেশনারি দোকান। দোকানের সামনে একটা সেলস-গার্ল। খুব সরলভাবে অমিয়কে দেখে হাসছিল। অমিয় বলল, কি চমৎকার হাসে রে! মেয়েটার সঙ্গে একটু কথা বলে আসি!

—যা দ্যাখ, কি বলে।

অমিয় ফিরে এলে মৈত্র বলল, কিরে কিছু বলেছে?

—না। আমার কথা কিছু বুঝতে পারছে না!

—মাগীকে আচ্ছা খিস্তি লাগা।

—খিস্তি করলে হাসছে। আর কিছু বলছে না। হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে রে। তবু কিছু বলছে না।

মৈত্র বলল, ছোটবাবু যাবে নাকি! মেয়ে মানুষের হাসি দেখে আসতে পার।

ছোট বলল, তুমি বরং যাও। রেলিঙে একটু বসছি আমি। হাঁটতে হাঁটতে কোমর ধরে গেছে। একটা ট্যাকসি নিতে পারতে। বাসে উঠে যেতে পারতাম।

—হাঁটাপথ সব চিনি। কিন্তু বাসগুলো কোথায় যায় জানি না। লেখা দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। হেঁটে হেঁটে আমি শহরটাকে ঘুরতে পারি, কিন্তু গাড়িতে উঠলে, কিছুতেই বোঝাতে পারি না কি করে জাহাজঘাটায় যাব। ওরা যে জাহাজটাকে কি বলে!

অমিয়র মনে হল এটাও মৈত্রের ভুজং ভাজুং। ছোটবাবু আর অপেক্ষা না করে রেলিঙে বসে পড়ল। মৈত্র তখন বলছে, আমি যাচ্ছি। দেখি কি বলে। সে গিয়েই বলল, চেঙ্গেরিতা। আরও কি বলল, তারপর একটা ইটালিয়ান কম্বল দরদাম করে কিনে ফেলল। মৈত্র হ্যান্ডশেক পর্যন্ত করল। অমিয় ভীষণ রেগে যাচ্ছে। সেও হাত বাড়িয়ে দিল। ওর সঙ্গেও হ্যান্ডশেক করছে। বেশ মজা লাগছে। সে বলল মৈত্রকে, শালা তুমি ভোজবাজি জানো। তুমি আমাদের রাজা।

মৈত্র এবার ঘড়ি দেখল। রাত খুব বেশি হয়নি। ওরা যদি ট্রেনে যায় তবে সামান্য পথ। এই ফালং-এর ‘মতো হবে। ইচ্ছা করলে হেঁটেও যাওয়া যায়। কিন্তু বেশি রাত করে জাহাজে ফেরা মৈত্রের পছন্দ নয়। একবার পাবে ঢুকে গেলে অমিয়কে তোলা যাবে না। বরং যাবার সময় ছোটবাবুকে একবার কার্নিভেলটা দেখিয়ে নিয়ে যাবে। সে ট্রেনে উঠে গেল। এক সময় ঠিক জায়গায় নেমে গেল। পাতাল রেলে চড়তে পেরে ছোটবাবু খুব খুশি। পাশেই বোধহয় কার্নিভেলের সদর দরজা। কোনটা কি সে বুঝতে পারে না। তার কাছে সব এক রকমের মনে হয়।

ওরা কার্নিভেলের গেটে দেখল, উর্দিপরা দারোয়ান। মাথায় উটপাখির পালখ গোঁজা। গেটের ওপরে নিয়নের বড় হরফে লেখা নাম। বড় বড় সিংহ, বাঘের মুখোস ঝুলানো। পাশে ক্লাউনের কায়দায় নাচতে নাচতে একটা সাহেব ক্ল্যারিওনেট বাজাচ্ছে। পাশে সারি সারি চারটা টিকিট ঘর। খুব বড় লাইন নেই অথবা এখন রাতের বেলা বলে যে যার মতো আগেই ঢুকে গেছে। যারা গেছে তাদের অনেকে বের হয়ে আসছে। ওরা তাড়াতাড়ি টিকিট পেয়ে গেল। ওরা ভিতরে ঢুকে দেখল, বেশ হল্লা, মদ খেয়ে কেউ কেউ বেলল্লাপানা করছে। এখানে ইচ্ছা করলে দু পেগ মেরে নিলে মন্দ হয় না। খালি চোখে দেখার চয়ে, যেন সামান্য গোলাবী নেশা করে দেখলে জমে ভাল। এবং চারপাশে নীল আলো। ছোটবাবুকে এক পেগের বেশি দেবে না। কারণ ও বোধহয় খেলে জীবনে প্রথম খাবে। খেয়ে স্ট্যান্ড করতে পারবে কিনা কে জানে।

ঢোকার মুখে দেখল একটা আলোর মুরগী ঘুরে ঘুরে ডিম পাড়ছে। নীচে এক বৃদ্ধা, হাতে ছোট বাসকেট। একটা করে মুরগিটা ডিম পাড়ছে, একটা করে বৃদ্ধা বাসকেটে রেখে দিচ্ছে। এটা হয়তো কোনও বিজ্ঞাপন। কিসের বিজ্ঞাপন ওরা বুঝতে পারল না। ওরা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মুরগির ডিমপাড়া দেখল। দেখতে দেখতে মৈত্র বলল, হাফ পয়সা উসুল।

অমিয় বলল, উসুল।

মৈত্র ছোটবাবুকে বলল, এদিকটাতে একটা টানেল আছে। ভিতরে খুব অন্ধকার। গুহা, ঝর্ণা, বরফের পাহাড় আর মাঝে মাঝে নকল সাপ, বাঘ, হরিণ, মানুষের কঙ্কাল ঘোরাফেরা করছে! খেলনার রেলগাড়িতে উঠে গেলে বেশ আধঘন্টার মতো নিচে ঘুরিয়ে আনবে।

ওরা টানেলের ভেতর ঢুকল না। দুটো মাঝারি তাঁবু পার হয়ে গেল। মৈত্র অথবা ছোটবাবু না বললে, সে কোনও পাবে ঢুকবে বলে আশা করে না। যে কোন সময় মৈত্র বলতে পারে।

একটা তাঁবুতে তখন কে যেন সুর করে মেঠো গান গাইছে। এবং ওরা দেখতে পেল, ঠিক গানের সমের সঙ্গে একটা করে পুতুল ওপরে উঠে যাচ্ছে। তার ঠিক ফাঁকে মানুষেরা গোল চাকতি বসিয়ে দু এক বোতল মদ জিতে নেবার চেষ্টা করছে। অনেকে পারছে না, কেউ কেউ পারছে। এটা একটা জুয়া খেলার তাঁবু। কেউ কেউ তখুনি বোতল জিতে দাঁতে কামড়ে ছিপি খুলে ঢক ঢক করে খাচ্ছে। এরা কোনো জাহাজের জাহাজি হবে। মৈত্র খেলার মতো করে দশটা চাকতি সোজা তুলে নিল। মাত্র চার প্যাঁসুর বাজি। সে দশটা চাকতি ছুঁড়ে সহজেই তিনটে চাকতি পুতুল নামা-ওঠার ফাঁকে জায়গামতো বসিয়ে দিল। অমিয় দেখল, হাতের টিপ মৈত্রের অসামান্য। সে সহজেই তিনবার জিতে দু বোতল, এই আট আউন্সের মতো করে হবে, বেশ পেয়ে গেলে বললে, নে। খাব খাব করছিলি, বসে বসে খা। মাগনায় যখন পেয়ে গেলাম—বলে মৈত্র ওদের দুজনকে নিয়ে একটা বসার মতো জায়গা খুঁজে নিল। সামনেই গোল গম্বুজের মতো তাঁবু। এক প্যাসু দিলেই লাল নীল চেয়ার পাওয়া যায়। এক প্যাসু দিলে গ্লাস। ওরা সেখানে বসে গ্লাস নিল। ছোট বড় হলুদ রঙের টেবিল আর ছোট বড় মাঝারি মানুষের কোলাহল। মেয়েরা যেন বেশি মাতাল। কখনও খেতে খেতে গাইছে, কিসব এটটিন পেটটিন..........তারপর তোতালামিতে পেয়ে যায়। আর গাইতে পারে না। মৈত্র বলল, খাও বাপু। কিন্তু বেশ্যা মেয়েরা বেশ তক্কেতক্কে আছে। একেবারে বেহুঁশ হবে না। ছোট, তুমি কি খাবে দ্যাখো। এটুকু খাও। তোমার শীত থাকবে না। রাতে ভাল ঘুম হবে। সকালে বাউয়েলস্ একেবারে ক্লিয়ার। ও শালীর শালীরা যে কি গাইছে!

এভাবে মৈত্র খেতে থাকল। সে একাই খেয়ে ফেলল পুরো একটা। অন্যটা ওরা দুজনে ভাগ করে খেয়েছে। বেশিটা অমিয়, কমটুকু ছোটবাবু। ছোটবাবু গলায় ঝাঁঝ পাচ্ছে। বড় বিদঘুটে ব্যাপার, কেন যে লোকে খায় সে বোঝে না। এটা যে মৈত্র কি করছে। সে টাকা দিয়ে আরও দু বোতল নিজে কিনে এনেছে। সেই খুব বেশি সাবধানী ছিল, একটুতেই কেমন যেন এখন একগুঁয়ে হয়ে গেছে। মৈত্রদা এত মদ খেতে পারে, জাহাজে ছোট একেবারে বুঝতে পারেনি।

এভাবেই মৈত্র জাহাজি মৈত্র হয়ে যায়। এভাবেই সে তার সংসারের কথা ভুলে গেল। শেফালীর কথা ভুলে গেল। মৈত্র, জাহাজি মৈত্র, এখন ঘাসের ওপর দু-পা ছড়িয়ে মদ খাচ্ছে। সামনে সব নীল লাল স্কার্ট পরা মেয়েরা হেঁটে যাচ্ছে। ওদের উরু দেখা যাচ্ছিল। পুরুষ্ট উরু। কোথাও নাচ হচ্ছে। কোথাও থেকে ব্যান্ডের বাজনা ভেসে আসছে এবং ব্যান্ড বাজলেই মেয়েরা ওর চোখের ওপর ফুলের মত হয়ে যায়। যেন ঈশ্বরের বাগানে এরা সব সদ্য ফোটা ফুল। ওর কেন যে সব ফুল তুলে নিতে ইচ্ছে করে। এবং একটা একটা করে ফুলের পাপড়ি ছিড়ে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে। পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে ইচ্ছে করে কেবল।

জায়গাটা এখন প্রায় উৎসবের মতো। কচি কচি মেয়েরা গ্যাসের বেলুন বাতাসে ভাসিয়ে দিচ্ছে। বালিকারা কোল্ড ড্রিঙ্কস খেয়ে মৈত্র এবং অমিয়কে দেখছে। ওরা দেখে তাজ্জব, এমন দু তিনটে দৈত্যের মতো মানুষ এখানে বসে হামেসা মদ খেয়ে যাচ্ছে কেন। ওদের মায়েরা তখন এত বেশি উরু খালি রেখেছে যে মৈত্র বেশিক্ষণ স্থির থাকতে পারছে না। অমিয় এবং ছোটকে ধাক্কা মেরে প্রায় যেন উঠে গেল। এবং বালিকাদের মায়ের সঙ্গে অশ্লীল কথা বলার চেষ্টা করল। শীতের ঠান্ডায় ছোটবাবুর কান লাল হয়ে উঠল মৈত্রের কথা শুনে।

অমিয় রেগে গিয়ে নিজের পয়সায় আরও চার আউন্সের বোতল কিনে ফেলল। সে স্টুয়ার্ডের কাছে যে পয়সা পেয়েছে সবটাই পকেটে। মৈত্র কি ভেবেছে!

যাতে মৈত্র না দেখে, একটু দূরে বসে অমিয় খাচ্ছিল। আর আকাশ দেখছিল। মনে হয় ওর কাছে আকাশটা খুব নিচে নেমে এসেছে। রাত বাড়ছিল। মৈত্র দেখল, অমিয় পাশে নেই। ছোট সামান্য খেয়েই শরীর ছেড়ে দিয়ে চেয়ারে মাথা এলিয়ে দিয়েছে। সে দেখল, ভারি

ঝামেলা। ওর নেশা কেটে যাবার মতো। সে তাড়াতাড়ি উঠে গেল ছোটর কাছে, কি বাবু ভাল লাগছে না। ছোট মাথা ঝাঁকাল। মৈত্র ভাবল, এখন জাহাজে ফেরা দরকার। কি যে মোহের ভিতরে পড়ে যায় সে।

মৈত্র অমিয়কে বলল, এই কি হচ্ছে!

—কি আবার হচ্ছে।

মৈত্র দেখল, আধ বোতলের মতো এখনও বাকি। সে সেটা উপুড় করে দিল। তারপর অমিয়কে ভীষণ মাতলামি করতে দেখে বলল, এক থাপ্পড় মারব মাতলামি করলে। পা ঠিক রাখবি।

কে কার পা ঠিক রাখে! অমিয়র ঠিক রাখতে গিয়ে নিজের পা ঠিক রাখতে পারছে না। অমিয় বলল, তুই আমার সঙ্গে এমন করিস কেনরে! আমি কি করেছি তোর সঙ্গে।

—তুমি শালা মুখ উঁচু করে রেখেছ কেন! কি দেখছিস ওপরে।

—কিছুই দেখছি না। কবে আমরা দেশে ফিরব মৈত্র?

—আমি তার কি জানি!

—তুই আমাকে একা ফেলে যাবি না?

মৈত্র ওর হাত ধরে টেনে তুলে দিল। মৈত্র এবং ওরা দুজন প্রায় টলতে টলতে হাঁটছে, কেবল ছোটবাবু টলছে না। কিন্তু কেমন যেন বমি বমি পাচ্ছে। ভেতরে অস্বস্তি হচ্ছিল। এখন সে আর কোথাও যেতে চাইছে না, শুধু জাহাজে ফিরে যেতে চাইছে। তবু সে, মৈত্র অথবা অমিয়কে ফেলে যেতে পারে না। সে ওদের সঙ্গে হাঁটতে থাকল। ওরা সোজা ডেনছিগোর দিকে যাচ্ছে। ওরা নকল এরোপ্লেনে চড়ল না। নকল মোটরে উঠে দাপাদাপি করল না। সামনের একটা মঞ্চের দিকে ওরা হেঁটে গেল। সামনের মঞ্চটায় উঠে গেলে কেবল ঘুরতে থাকে, উড়তে থাকে, উপরে উঠলে বেশ একটা মেজাজ আসে। তখন মনে হয় এই সংসার, যুবক যুবতী সহবাস সব এই কার্নিভেলের মতো। নিছক খেলনা। গত সফরে ওখানে উঠে মৈত্র বমি করে দিয়েছিল।

ফেরার পথে মৈত্র বলল, কিরে ফের যাবি? তুই ছোটবাবু?

অমিয় বলল, আমি যাব না। গেলেই শুয়োরের বাচ্চার সঙ্গে ঠিক দেখা হয়ে যাবে।

মৈত্র বুঝতে পারল না অমিয় কাকে গালাগাল করছে।

—শুয়োরের বাচ্চা খুব জ্বালাচ্ছে।

—কে শুয়োরের বাচ্চা?

—আছে। ওকে শালা এমন শিক্ষা দেব না।

মদ খেলে নানাভাবে ভেতরের দুঃখ উথলে ওঠে। এটাও এমন একটা কিছু হবে। মৈত্র কথাটার তেমন গুরুত্ব দিল না। সে ছোটবাবুকে বলল, চল, ওদিকটায় ঘুরে যাই। সর্টকাট হয়ে যাবে। জুয়ার আড্ডাগুলোর পাশ দিয়ে সামনের রাস্তায় পড়তে পারব।

অমিয় ধরা গলায় বলল, কোনদিকে?

মৈত্র বলল, ওদিকে। খেলতে পারবি না কিন্তু।

অমিয় বলল, তুই না খেললে, আমি খেলছি না।

—ছোটবাবু সাবধান।

—আমার টাকাই নেই।

অমিয় বলল, তুমি ছোটবাবু কিন্তু ভীষণ চালাক লোক। একটা প্যাসু তুললে না।

মৈত্র বলল, কিছু তোমাকে তুলতে হবে ছোটবাবু। তোমার দুটো স্যুট কেনা দরকার।

সেকেণ্ডহ্যাণ্ড মার্কেটে খুব সস্তায় পেয়ে যাবে।

ছোট বলল, অনেকদিন এখানে আছি তো। কাল তুলব ভাবছি।

—তোমার শরীর কেমন লাগছে?

—খারাপ না। বেশ ভাল লাগছে। আগের মতো খারাপ লাগছে না।

মৈত্র বলল, কেমন সস্তায় মদ খাইয়ে দিলাম।

অমিয় বলল, অনেক ধন্যবাদ। বলে, অমিয় হাত তুলে দাঁড়িয়ে থাকল। যেন সে মৈত্রকে আশীর্বাদ করছে। ওর হাত শিথিল। হাওয়ায় যেন হাত টলছে। ছোটবাবু বলল, এভাবে হেঁটে যাওয়া যাবে না। বরং একটু বসে গেলে হয়। অমিয়র নেশাটা যদি কমে।

—এখানে কোথায় বসবি! শালা সব সোনার ঈগলেরা উড়ছে। চল একটু ফাঁকা জায়গা দেখে বসি।

সুন্দরী যুবতীদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল না অমিয়র। সে এদিক ওদিক তাকিয়ে শিস মারছে। মৈত্র এবং ছোটবাবু এখন জাহাজে ফেরার জন্য আকুল। হয়তো গিয়ে দেখবে, শেফালীর চিঠি এসেছে আবার। বন্দরে সে তিনটে চারটে চিঠি পেতে পারে। শুধু এক খবর। টাকা, খরচ শেফালী দুহাতে করতে ভালবাসে। এখন তো শেফালীর দরকারেই লাগবে টাকাটা। শেফালীর সব চিঠিই নতুন মনে হয়, তাজা মনে হয়। যত পুরানো থাকুক, এত দূর দেশে এসে সে সব সময় চিঠিতে শেফালীর শরীরের ঘ্রাণ পায়। শেফালীর শরীরের গন্ধ চিঠিতে যেন লেগে থাকে।

সে শেফালীর চিঠি পেলে সব ভুলে থাকতে পারে। বন্দরে নেমে এদিক-ওদিক ঘোরার আকর্ষণ বোধ করে না। কোন বারে, রেস্তোরাঁয় বেশ্যালয়ে ঘোরার নিদারুণ অভ্যাস ওর মনের ভেতর থেকে মুছে যায়।

মৈত্র এবার বলল, অমিয় তুই থাক, আমরা চলে যাই।

—আমাকে ফেলে চলে যাবি! আমি একা যেতে পারব!

—তবে চল। বেশ রাত হয়ে গেছে। সামনে অনেকগুলো জুয়ার আড্ডা পড়বে।

—তুমি আমার জী-গুরু-দোস্ত। তোমার কথা না শুনলে চলে।

তারপর ওরা সেই নকল মঞ্চ পার হয়ে গেল। ডানদিকে আর একটা বড় হলঘর। ভিতরে নাচ হচ্ছে। ক্যারিওনেট বাজছে। এবং একটা লোক ম্যাণ্ডোলিন বাজিয়ে ষাঁড়ের মতো চিৎকার করে গাইছে। এইসব চেঁচামেচি অথবা গান ভীষণ উত্তেজিত করে রেখেছে চারপাশটা। ডেনছিগোর বাইরে যেসব ফুলের গাছপালা অথবা সারি সারি পাম গাছের নকল জঙ্গল, বনের ভিতর মাঝে মাঝে লাল আলোর সংকেত, অর্থাৎ ওখানে কেউ কেউ যুবক যুবতীরা শুয়ে নীল আকাশ দেখছে, অথবা নতুন নক্ষত্রের জন্ম দিচ্ছে। লাল আলোর সংকেত, এদিকে না, এদিকের জায়গা দখল, অন্যদিকে, অন্যদিকে খুঁজে নাও। জায়গা পেয়ে যাবে। এখানে এসে মৈত্র বলল, ভালছেলের মতো চোখ বুজে থাক। তাকাবি না।

—খুব মজা। হোঁচট খাই আর কি! তুই চোখ বুজে হাঁট না। অমিয় বরং লাল আলোর পাশ দিয়ে হেঁটে গেল। যেন সে এর ভিতর একটা জায়গা খুঁজতে এসেছে। আসলে ওর দেখা চাই, কে, কিভাবে কিসব চালাচ্ছে। এটা যে কি শহর! সে বুঝতে পারে না, খোলা আকাশের নিচে এসব হয়! ও কেমন ক্রমে অধৈর্য হয়ে পড়ছে।

ছোটবাবু বলল, আমার ভয় করছে মৈত্রদা, এর ভিতর দিয়ে আসা ঠিক হয়নি। কেউ কিছু বলতে পারে।

—আরে আয়তো। এরা কেউ কিছু বলবে না।

মায়াবিনী আলো চারপাশে, ছোটবাবুর মনে হচ্ছিল, সে একেবারে কেমন হাবাকালা হয়ে

যাচ্ছে। সব এত স্পষ্ট! সে লজ্জায় তাকাতে পারছে না, কেমন এক অপরাধবোধ এবং ভেতর থেকে আবার শীত উঠে আসছে। খোলামেলা জায়গায় এসব এ-ভাবে হয় সে জানত না। চারপাশে সারি সারি নানা ভঙ্গীতে উলঙ্গ হয়ে শুয়ে আছে তারা। কেউ ওভারকোট পেতে নিয়েছে, কেউ কিছুই পেতে নেয়নি। দেখে মনে হয়, শীতটিত ওদের শরীরে লাগে না। সে প্রায় দু'লাফে জায়গাটা পার হয়ে গেল যেন। অমিয়কে টানতে টানতে নিয়ে আসছে মৈত্র। কলার ধরে টেনে আনছে।

জুয়া খেলার মেলায় ঢুকে মৈত্র অমিয়র কলার ছেড়ে দিল। এবং মৈত্র এসব জায়গায় গত সফরে বেশ গচ্ছা দিয়ে গেছে। তখন মৈত্র একা ছিল, দায়-দায়িত্ব কম ছিল। জুয়া খেলার আসরটাই মৈত্রের কাছে কার্নিভেলের মজার জায়গা। দোকানগুলো ওর সব চেনা। সে মুখগুলো পর্যন্ত মনে করতে পারে। কিন্তু এখন সে দেখছে সব কেমন বদলে গেছে। নানাবর্ণের বেলুন, কাগজের ফুল উড়ছে হাওয়ায়। সে আগের কাউকে দেখছে না। দুজন বেশ বলবান মানুষ, ওদের কোমরে মোটা বেল্ট, পায়ে হাঁটু পর্যন্ত সু, এবং হাতে লম্বা চামড়ার দস্তানা, ওরা খেলছে। দুজন মেয়ে দুপাশে দাঁড়িয়ে ওদের রিভলবারে গুলি ভরে দিচ্ছে। ওদের দেখেই বুঝল, এরা ঠিক জাহাজি। ওরা আসলে পাশের মেয়েদুটোকে ধরার জন্য জুয়া খেলে পয়সা নষ্ট করছে। রাত বাড়লে, এরা ঠিক মেয়েদুটোকে কোথাও নিয়ে যাবে। মৈত্র এবার দেখে অবাক হল, আগের বয়সী যুবতীরা একজনও নেই। খুব অল্পবয়সের ফুলের মতো নরম মেয়েরা এখন দোকান আগলাচ্ছে। আর এভাবে কি যে হয়ে যায় মানুষের, মৈত্র যেতে যেতে নীল লাল রঙের, কাঠের বল, গড়িয়ে দিতে পারলেই বাজি মাত, এক প্যাসুতে একটা নতুন কোট মিলে যাবে... যেন এখন ইচ্ছে মৈত্রর একটা কোট এক প্যাসুতে মিলে গেলে মন্দ হয় না। মাত্র এক প্যাসু ওর হাত ভীষণ পাকা। সে পাকা জুয়াড়ীর মতো অল্পবয়সের মেয়েটির সামনে দাঁড়িয়ে গেল। এই শহর, এত বড় শহর, আর এখানে মেয়েরা এখন জুয়ার রিঙে বসে থাকে ভাবতেই শরীরের ভেতর কেমন শিহরণ খেলে গেল। সে এবার হামলে পড়ে দুটো কাঠের বল বাজীকরের মতো তুলে নিল। বল দুটো ওপরে ছুঁড়ে দিয়ে আরও তিনটে লাল নীল বল বাতাসে এক এক করে পাঁচটা বল খেলাতে থাকল। পাঁচটা ক্রমে আরও তিনটা তারপর চারটা টপাটপ তুলে হাওয়ায় ভাসিয়ে রাখল। দুটো হাতে বারোটা বলের খেলা। অমিয়, ছোটবাবু এমনকি রিঙের মেয়েটা পর্যন্ত তাজ্জব বনে গেল।

অমিয় চিৎকার করে বলল, শুয়োরের বাচ্চা তুমি সার্কাসে তবে সিংহের খেলা দেখাতে!

মৈত্রের ইচ্ছে হল, গালে ঠাস করে চড় বসিয়ে দেয়। কিন্তু মদ খেলে হুঁশ থাকে না। শিশুর মতো সরল কথাবার্তা। তাছাড়া এমন এক তাজা মেয়ে সামনে। এমন একটা আশ্চর্য খেলার সব তামাসা মাটি। সে খুব সহজভাবে বলল, সিংহের খেলা নয় রে। এটা রিঙের খেলা দেখাচ্ছি। এবং এভাবে সে কখনও বারোটা বল পেছনে হাতের ভিতর অদৃশ্য করে ফেলেছে, আবার কেমন সব এক এক করে হাত নামিয়ে ট্রেতে রেখে দিচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি হাততালি দিয়ে উঠল এবং রূপোর স্টিকে একটা বল এগিয়ে দিল মৈত্রের কাছে।

মৈত্র বলল, না। আজ না মেমসাব। অনেক রাত হয়ে গেছে। কাল খেলব। তারপর আঙ্গুল তুলে অমিয়কে দেখাল। যেন বলা, মাতাল। এক্কেবারে মাতাল।

মেয়েটি কিছুই বুঝল না। শুধু রুপোর স্টিক দিয়ে আরও দুটো বল মৈত্রের দিকে এগিয়ে দিল। সেই সরল হাসি। এবং এখন আর এ-মেয়েটিকে কম বয়েসী মনে হচ্ছে না। খাটো স্কার্টের ভেতর উরু দেখে সে বুঝল, খুব সেয়ানা মেয়ে। ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায়।

—না মেমসাব। ঘরে আমার বিবি আছে। ও জানতে পারলে রাগ করবে।

মেয়েটি কিছু বুঝতে পারছে না। বোকার মতো হাসছে। মেয়েটি বোধ হয় বুঝেছে মানুষটা জাহাজি। রাত হলে সব জাহাজিদের ভিড় এখানে। মৈত্রকে ভীষণ লোভী দেখাচ্ছে! মেয়েটি ওর দিকে অপলক তাকিয়ে আছে। মৈত্রের যেন সাহস নেই এখন রিং ছেড়ে যায়। মাত্র এক প্যাসুর খেলা। সে না খেললে, মেয়েটার কাছে ছোট হয়ে যাবে। সে এবার প্যাসু ছুঁড়ে দিল।

দুটো বল, রুপোর স্টিক হাতের কাছে। ট্রেতে এমন অনেক লাল নীল বল। সে বল গড়িয়ে দিল। বল গড়িয়ে অন্য দিকে চলে গেল! সে ঠিক জায়গার বল গড়িয়ে দিতে পারল না।

মেয়েটি মৈত্রকে হেরে যেতে দেখেও হাততালি দিল। খুব খেলা দেখানো হচ্ছিল! এখন সব ভোজবাজি শেষ। মেয়েটি যেন এবার ওকে শেখাতে পারে। সে বাইরে বের হয়ে মৈত্রের পাশে দাঁড়াল। বোধ হয় বলল, এই দ্যাখ্যো সাঁইয়া। সে দুটো বল ঠিক ঠিক জায়গায় গড়িয়ে দিল। যেন খুব সহজ।

মৈত্র এবার দু প্যাসু দিয়ে তিনটি বল নিল। কোন দিকে তাকাল না। ছোটবাবু একটা থামে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মৈত্রের টিপ দেখছে। মৈত্র এবার খুব সহজে একটা বল জায়গামতো পৌঁছে দিল। ছেলেবেলায় টিপ্পি খেলত। খেলাটা হুবহু একটা আধুনিক টিপ্পি খেলা। সে অনেকগুলো টিপ্পি বাঁচিয়ে সহজেই রাজা টিপ্পিটাকে গর্তে ফেলে দিতে পারত। সুতরাং মৈত্র একবার জিতেই ভেবেছে, মেয়েটার ঠিক জামা-কাপড় খুলে নিতে পারবে। কিন্তু পরে চার বার মেরে একবার। সে ফের প্যাসু দিয়ে দশটা। একটাও গেল না। মেয়েটা তেমনি ঠোঁট টিপে হাসছে। বড় সুস্বাদু খাদ্যের মতো হাসিটা ওকে প্রলোভনে ফেলে দিচ্ছে। সে ইতিমধ্যে দশ প্যাসুর মতো হেরে গেছে। অমিয় নাইটের মতো এগিয়ে এসে এক ধাক্কায় সরিয়ে দিল মৈত্রকে, খেল মেমসাব। তোমারে উলঙ্গ কইরা দিমু। অমিয় দেশের ভাষায় এবারে কথা বলতে লাগল।যা খেইল দেখামু, বোজবা কারে কয় বাঙ্গাল! বলে অমিয় আট প্যাসুতে ষোলটা কাঠের বল তুলে খেলতে গিয়ে দেখল সব কটা কাঠের ট্রেতে উঠে গেছে। সুতরাং এক ধাক্কায় ওকে সরিয়ে সামনে দাঁড়াল মৈত্র। হা-হা করে হাসল। সে এবার ষোল প্যাসুতে বত্রিশটা বল কিনে ফেলল।

ষোল প্যাসু হেরে যেতেই শেফালীর মুখ মনে পড়ে গেল। হয়ত এতক্ষণে জাহাজে শেফালীর আর একটা চিঠি এসে গেছে। রোজ রোজ সে শেফালীর চিঠি পাবে আশা করে। সে তাড়াতাড়ি খেলা শেষ করে বুঝল জেতা যাবে না। কিন্তু মেয়েটা এমন অবজ্ঞার হাসি হাসছে যে পায়ের রক্ত মাথায় উঠে যাচ্ছে। হাতে রুপোর স্টিক। যেন রিঙের ভেতর এখন মেয়েটা ইচ্ছে করলে সিংহের খেলা দেখিয়ে দিতে পারে। দু-একবার জিতে গেলে প্যাসু ডাবল ফিরিয়ে দিচ্ছে। সবই অবহেলাভরে। কেমন ঝর্ণার উৎস থেকে কল কল করে নেমে দু'পাড়ের সব ভাসিয়ে দেবার ইচ্ছে। যত এমন হচ্ছে তত মৈত্রের জেদ। সে এবার সব বলগুলো কোলের কাছে টেনে নিলে, মেয়েটি চোখের ইসারায় বলছে, আর কেন, এবার যাও। কাল, মাথা ঠাণ্ডা করে এস। খেলতে পারবে।

মৈত্র খিস্তি করল এবার, ছেনালী হচ্ছে! খেলবে না! সে এলোমেলোভাবে এক গাদা প্যাঁসু পকেট থেকে তুলতেই, মেয়েটি দ্রুত স্টিক হাতের ওপর ঘোরাতে থাকল। যেন মেয়েটির ইচ্ছে না, মৈত্র আর খেলুক। রেগে গেলে খেলা ঠিক হয় না। লোকটা ব্যালেন্স হারিয়ে ফেলছে। অথবা বলার ইচ্ছে যেন, লক্ষ্মী ছেলের মতো জাহাজে যেতে বললাম, তুমি বাপু ফের একগাদা নোট বের করেছ। কি করা। খেলা যাক। সে ট্রে এগিয়ে দিল।

ছোটবাবু বলল, কি তুমি জাহাজে যাবে না!

—দাঁড়া!

মেয়েটি ততক্ষণে ওদের জন্য তিন কাপ কফি আনিয়ে দিয়েছে। ওরা দাঁড়িয়ে খাচ্ছে। অমিয় পাশে একটা টুলে বসে রয়েছে। সে দাঁড়াতে পারছে না। কফিটা খেলে নেশা মরে যাবে। মেয়েটির এমন সৌজন্যবোধ দেখে ছোটবাবু কেমন অবাক হয়ে গেল!

মৈত্র কফি খেতে খেতে টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়েছে। কফি খেতে খেতে দাবার ছকের মতো কি যেন পরীক্ষা করছে। টেবিলের ওপর গোটা ছকটাতে কি যেন যাদু আছে। মেয়েটি যতবার বল গড়িয়েছে, প্রত্যেকবার ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছে। সে পারছে না কেন বুঝছে না। মৈত্র, শেফালীর মতো দুর্ধর্ষ মেয়েকে সামলায়, সে চাল-চলনে লড়নেওয়ালার মতো, তার

কাছে এই মেমসাব সামান্য মেয়ে, তার কাছে সে বার বার হেরে যাচ্ছে।

চারপাশে অনেকে দাঁড়িয়ে ওর খেলা দেখছে। ছোটবাবুর কফি শেষ। কেউ কেউ বল নিয়ে খেলবে ভাবছে, কিন্তু মৈত্রকে ও-ভাবে হেরে যেতে দেখে সাহস পাচ্ছে না। মনে হয় ওরা সবাই মেয়েটিকে চেনে। সে সবাইকে খেলার জন্য স্টিক দিয়ে বল ঠেলে দিচ্ছে। মৈত্র ওদের কথা বুঝতে পারছে না। সবাই স্প্যানীশ বলছে। তার জন্য মৈত্রের কোন অসুবিধা হচ্ছে না। সব দেশে সাধারণ বাজার করবার মতো বিদ্যা তার আছে। কিছুটা দর কষার মতো, কিছুটা চিটাগাঙ এবং সন্দিপী নিরক্ষর জহাজিদের ইংরেজির মতো। দর-দামের কথা বললে, হাউ মুচ মেমসাব, অর্থাৎ হাউ মাচ মেমসাব! সুতরাং মৈত্র প্রায় বোবার সামিল। সে, সব রেখাগুলো টেবিলের পরীক্ষা করছে। সে যেন এই ছকের ভেতর মেয়েটির মুখ দেখতে পাচ্ছে। বড় কোমল মুখ। নাক লম্বা। চুল কালো নীল চোখ। আর গায়ের মাংস আপেলের পিঠের মতো। পরনে লাল স্কার্ট, আঁটা ফ্রক, কোট শাদা রঙের। গলায় নীল পাথরের মালা, মাথায় লাল টুপি। তাতে পাখির পালক গোঁজা। কপালের কিছুটা কালো মখমলের জাল দিয়ে ঢাকা। চোখের নিচে কেমন নীলাভ রঙের আবছা অন্ধকার। মৈত্র মেয়েটিকে বেশিক্ষণ ছকের ভিতর দেখতে পেল না, অমিয় এসে কলার চেপে ধরেছে, এই যাবি কিনা বল!

—যাব, চল। মৈত্র এবার মেয়েটির দিকে তাকাল। মেয়েটি ওকে দু হাঁটু ভাঁজ করে বাউ করল। মৈত্র, মাথার টুপি খুলে ওর বাউকে সম্মান জানাল। তারপর কোনও দিকে তাকাল না। সে সোজা অন্যমনস্কভাবে হাঁটতে থাকল। সে ছোটবাবু এবং অমিয়র সঙ্গে একটা কথাও বলল না। রাত গভীর। রাস্তায় লোক চলাচল কমে গেছে। কোথাও বোধ হয় এখন স্কাইলার্ক ফুল ফুটছে। ওরা ফুলের গন্ধ পাচ্ছে। টাওয়ারের বড় ঘড়িটাতে ঘণ্টা বাজছে এক দুই তিন... এভাবে অনেক। মৈত্র এমন সময়ে করুণ গলায় বলল, আমার জাহাজে যেতে ইচ্ছে করছে না রে। মেয়েটার পায়ের নিচে আমার পড়ে থাকতে ইচ্ছে হচ্ছে।

॥ তেরো ॥

ভোরবেলা মৈত্রের উঠতে একটু বেলা হয়ে গেল। বোধহয় মৈত্র রাতে সেই স্বপ্নটা দেখছিল। বোধহয় স্বপ্নটা এত দ্রুত মাথার ভেতর পাক খাচ্ছিল যে কখন ভোর হয়ে গেছে মৈত্র টের পায়নি। একটা মাছের কঙ্কাল, তিমি মাছের কঙ্কাল বড় পাইন গাছে কেউ ঝুলিয়ে রেখে গেছে। সে স্বপ্নে সব সময় গাছটার নিচে দাঁড়িয়েছিল। কাজে যাবার সময় বার বার স্বপ্নটার কথা তার মনে হচ্ছে।

কাল মদ বেশী মাত্রায় হয়েছে। ঘুমও ভাল হয়নি। আর একটু ঘুমোলে বেশ ভাল হত। কিন্তু রাত থাকতেই সাতটার ঘণ্টা পড়ে গেছে। এখনও ডেকে আলো জ্বালা। সারেঙ ওপরে দাঁড়িয়ে টান্টু বলছেন। এনজিনরুমে অনেক কাজ। জাহাজের এসব কাজ বন্দরে না এলে করা যায় না। কিনার থেকে লোকজন উঠে এসেছে। এনজিনে ওয়েলডিং-এর কাজ। পুরানো জাহাজ় বলে, এটা থাকে তে ওটা খসে যায়। যতক্ষণ বন্দরে জাহাজ ততক্ষণ ওয়েলডিং।

সকাল থেকেই মৈত্রের মেজাজ খারাপ। অমিয়র জন্য এটা হয়েছে। কাল মৈত্র অনেক প্যাসু হেরেছে। হেরে যাওয়ার মূলে অমিয়। সেই লোকটার একাউন্টে টাকা না পাঠাতে পারলে শেফালী তাড়াতাড়ি টাকা পাবে না। একটা ড্রাফট যাবে। তাছাড়া রিজার্ভ ব্যাঙ্কের কিছু নিয়ম কানুন আছে, সব ঠিকঠাক করে পেতে পেতে এমনিতেই দেরি হয়ে যাবে। যদি মানুষটা আজ আসে, এলে দুপুরে আসবে, তখন জাহাজে কে না কে উঠে আসে ঠিক থাকে না। জাহাজ-ডেকে হাজার রকমের মানুষ। কেউ কাউকে চেনে বলে মনে হয় না। কনট্রাকটারদের লোকই বেশি। নানা জায়গায় মেরামত করছে ওরা। এ- সময়ে মালটা নামিয়ে দেওয়া খুব সহজ! সেই মানুষটি আসবে কনট্রাকটারের লোক হয়ে। কারো কোন সন্দেহ করার কারণ থাকবে না!

সেই একঘেয়ে কাজ। বন্দরে একরকম, সমুদ্রে অন্যরকম। জেটিতে ভীষণ ব্যস্ততা। মাল কেবল নেমে যাচ্ছে। মেজ-মালোম ফল্কায় ছুটে যাচ্ছেন। বড়-মালোম হিসাব মেলাচ্ছেন। পাঁচটায় ছুটি হলে আবার স্নান। মেসরুমে বসে আহার। তারপর ফুরফুরে পাখির মতো বন্দরে নাইটিঙ্গল দেখতে নেমে যাওয়া।

সিঁড়ির মুখে অমিয়র সঙ্গে দেখা। অমিয় মগে চা নিয়ে নিচে নামছে। সিঁড়িতে নামার সময় মৈত্র বলল, কাল তোর জন্য এসব হল।

—বা বেশতো। খেললি তুই, আর দোষ আমার!

—তোর জন্যই তো বের হওয়া।

—ন্যাকামি করবি না।

—আজ আর কোথাও যাচ্ছি না। সোজা ঠিক জায়গায় চলে যাব।

—যাবি না তো যাবি না। আমাকে কি বলছিস!

এবং অমিরর আর ইচ্ছা হল না কথা বলতে। ছোটবাবু ওদের কথা কাটাকাটিতে খুব মজা পায়। এবং সে জানে এটা খুব সাময়িক। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

জাহাজ থেকে নেমে যাবার মুখে মৈত্রের মনে হল, কেউ ওকে ডাকছে। সে দাঁড়াল। ডেকবোসান এদিকে আসছে। ওর হাতে একটা চিঠি। শেফালীর চিঠি সে বুঝতে পারে। এখন সে নামতে পারে না, চিঠিটা পড়া দরকার। সে ফের ফোকসালে ফিরে গেল। আলো জ্বেলে বসল। ছোটবাবু অথবা অমিয়কে সে সঙ্গে নিচ্ছে না। একাই যাবে ভেবেছে। তারপর চিঠির ভাঁজ খোলার সময় অন্যবারের মতো তেমন সুগন্ধ পাচ্ছে না যেন। আর লেখাটা মনে হল বড় হিজিবিজি, এবং এখন সে বুঝতে পারল, আগের চিঠিটা অনেকদিন আগে শেফালী লিখেছিল। বুনো-এয়ার্সের ডাকঘরে অনেকদিন পড়েছিল হয়ত অথবা এজেন্ট অফিসে। আর এ-চিঠি সদ্য লেখা। চিঠিটা পড়তে পড়তেই বুঝল, শেফালী ভয়ঙ্কর অসুস্থ। দুর্বলতার জন্য

ভালভাবে চিঠিটা লিখতে পারেনি। চিঠিটা পড়তে পড়তেই সে কেমন বিচলিত বোধ করছে। হিজিবিজি লেখা স্পষ্ট বুঝতে পারছে না। সময় লাগছে পড়তে। লিখেছে ওর বমি ভয়ানক হচ্ছে। কিছু খেতে পারছে না। বিছানার সঙ্গে শরীর মিশে গেছে। শেষে লিখেছে, টাকার খুব দরকার। তুমি যে টাকা দিয়ে গিয়েছিলে সব শেষ। মাসে মাসে যে টাকা কোম্পানীর ঘর থেকে আসে ওতে কি হয় বল! ডাক্তার আর ওষুধে সব ফুরিয়ে গেছে। তুমি কবে ফিরছ, জাহাজ কবে ফিরবে। আবার কোথায় যাচ্ছ ঠিকানা দেবে।

মাঝে মাঝে অনেক অস্পষ্ট কথা লেখা আছে। সে ঠিক তা এখনও উদ্ধার করতে পারেনি। যেন একটা নাম হ্যাঁ বিমল, ফের এসেছিল। শেফালী লাইনটা আবার নিজেই কেটে দিয়েছে। দুর্বল হাতে ভালভাবে কাটতে পারেনি। বিমলের স্ত্রী শেফালী, কথাটা মনে হলেই ভেতরে সে ভীষণ কষ্ট পায়। বিমল ওর বন্ধু, বিমল খুব জাহাজের গল্প শুনতে ভালবাসত। বিমল, সরকারী অফিসে কি একটা বড় চাকুরে। বিমলের কথা মনে হলেই মনে হয়, লোকটা আস্ত শয়তান!

তখন মৈত্র সবে মাত্র কার্গো লাইনের জাহাজে কাজ নিয়েছে। সফর ঘুরে এসে কেমন শেয়ানা হয়ে গেল সে। পৃথিবীর অনেক দেশ সে দেখেছে। রয়েল নেভিতে সে সুযোগ তেমন ছিল না। সফর শেষে এভাবে বাড়ি ফিরলে সে রাজার মতো চলাফেরা করত। পৃথিবীর সব বন্দরের যাবতীয় সুখ যেন ওর দু'পকেটে। সে যেন সেইসব সুখের গল্প দু'পকেটে ভরে ফেরি করতে ভালোবাসে। সে, গল্প বলার সময় শেফালীকে একজোড়া ম্যানিলা হ্যাম্পের চটির গল্প শুনিয়েছিল। সে যে কি আগ্রহ! একজোড়া ম্যানিলা হ্যাম্পের চটি না পরতে পারলে শেফালী বুঝি ভাবল, বেঁচে থেকে সুখ নেই। বেঁচে সুখ নেই, বেড়িয়ে সুখ নেই। কি সুন্দর সুন্দর গল্প বলত শেফালীকে, মিয়ামি বিচের সুন্দরীদের প্রতিযোগিতার গল্প শুনলে শেফালী হাঁ করে থাকত। শেফালীকে সে কুহকে ফেলে দিয়েছিল। এবং যা হয়ে থাকে, সেই থেকে এমন সুন্দরী বৌটা বিমলের, ওর কাছে চলে আসতে চাইল। লাজ- লজ্জা সব সে হারিয়ে ফেলল।

মৈত্র বলল, তাহলে তুমি শুভেন্দু মৈত্র, মনে মনে বিমলের নাম শুনলে কষ্ট পাও। বিমলের এখন কি ইচ্ছে সে এত দূর থেকে জানতে পারে না। সে চলে এলে বিমল সব লুটেপুটে খেতে পারে। বিমলের সুবিধা ওর চেয়ে অনেক বেশি। বিমল তো অন্য একটা মেয়েকে ঠিক মিয়ামি বিচে নিয়ে গেছে, তবে আর কেন! শেফালীর কি দরকার, বিমলের কথা লেখার! শেফালী কি বিমলকে এখনও ভুলতে পারেনি। শেফালী কি বিমলকে...কারণ মৈত্র নেই, মৈত্র জাহাজে চলে গেছে, তুমি এ-সময় আমার কাছে কাছে থাকো।

সে চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে ভরে রাখল। অমিয় দুবার এসেছে, একটা কথাও বলেনি। মৈত্র কোথায় যাচ্ছে, জানতে চায়নি। যেন অমিয় অথবা মৈত্র কেউ কাউকে চেনে না। ছোটবাবু আজ বেশ সকাল সকাল মেজ-মালোমের সঙ্গে কিনারায় নেমে গেছে। বোধহয় এসব ছোটবাবুর ঠিক ভাল লাগেনি। ছোটবাবু চাপা স্বভাবের মানুষ। নানাভাবে চেষ্টা করেও ছোটবাবুর কিছু জানা যায় না। ওর চিঠি আসে না। চিঠি না এলে এখন সে আর দুঃখ করে না। মন ভার করে থাকে না। ছোটবাবু নিজের দুঃখ বোধহয় নিজের ভেতর সবসময় লুকিয়ে রাখে। ছোটবাবুকে ঠিক মৈত্র বুঝতে পারেনা।

চারপাশটা দেখতে দেখতে নেমে গেল মৈত্র। চারপাশে তেমনি আলো জ্বলছে এবং আলোর বাহার। সে তার ভেতরে একাকী হেঁটে যাচ্ছে। দুপুরবেলা, সে ঠিক নামিয়ে দিয়েছিল মালটা। এখন সে রাজার মতো হাঁটতে পারে। কারণ টাকা পয়সার ভাবনা তার নেই। এখন শুধু পাঠানোর ভাবনা। সামনে সেইসব টিউলিপ ফুলের গাছ, সেইসব লাইটপোস্ট, সেইসব পাখিরা একরকমের, অথবা তেমনি নাইটিঙ্গেল পাখিরা উড়ছে।

সেই টাওয়ারটা, সামনে। ঘড়িতে পাঁচটা বাজার শব্দ। লোকটার কাছে সে ঠিকানা ভালভাবে জেনে নিয়েছে। সে এখন শুধু সেদিকেই যাবে। অন্য কোথাও নয়। লাল নীল বলের কথা, মেয়ের বাও করা চোখের কথা দু-একবার মনে হয়েছে। সে একেবারে আমল দেয়নি। বাস, মানুষজন, নিচে ট্রেন ছুটে যাচ্ছে। বেশ ভিড়। এবং মানুষের শরীরে বিদেশী

গন্ধ। সে ওদের পাশ কাটিয়ে গেলেই কেমন একটা আশ্চর্য গন্ধ পায়। ওর মনে হল তখন, না খেয়ে জাহাজ থেকে নেমে আসা ঠিক হয়নি। আসলে অমিয়কে সে এড়িয়ে থাকতে চেয়েছিল। একটু খেয়ে নিতে হয়। খুব খিদে পেয়ে গেছে। ফিরতে ফিরতে রাত হবে বেশ। কারণ যা বলেছে, তাতে ওকে কেরিয়েন্মুজ পার হয়ে যেতে হবে। সে রেস্তোঁরাতে ঢুকে খাবার চাইল। বড় রেস্তোঁরা। পাশে রেকর্ড-প্লেয়ারে নানারকম গান। কাউন্টারে দামী কাচের ভিতর মেমসাব, মুখে সেই সরল মিষ্টি হাসি। কি করে যে ওরা এমন সুন্দর হাসতে পারে। এতবার হাসতে ওদের কষ্ট হয় না! মেয়েরা এমনভাবে হাসলে সে শেফালীর কথা মনে না করে পারে না। আর মনে হলেই শির-শির করে শরীরে একটা শীতের মতো ঠাণ্ডা। চোখ মুখ জ্বালা করতে থাকে।

সে ইচ্ছে করেই আর মেমসাবের দিকে তাকাল না। সে স্যাণ্ড-উইচ এবং কিছু গ্রীণ পিজ সেদ্ধ চেয়ে নিল।

তখন অন্য এক যুবতী মেমসাব, সে এসে আর কি লাগবে জানতে চাইছে।

সে বলল, আর কিছু চাই না।

—একটু চা?

—চা লাগবে না।

—খুব ভাল আইসক্রিম কফি আছে।

মৈত্র বলল, না।

—অক্সটেল পরিজ আছে!

মৈত্র বলল, না।

—ড্রিংকস!

—ইয়েস।

এবং এ-ভাবে দামী মদ, সাদা টাওয়েল, অর্থাৎ টাওয়েল পাল্টে দিয়ে গেল মেয়েটা। অর্ডার নিচ্ছে যেসব মেয়েরা ওরা খদ্দেরদের খুব পাশাপাশি থাকছে। ঘুরছে ফিরছে। অনেক সময় কেউ কেউ পাশে বসে সঙ্গ দিচ্ছে। বোধহয় মৈত্রকে মেয়েটি পাশে বসে চিয়ার-আপ করছিল।

মৈত্র বলল, দু পেগ।

দু পেগ এলে, একটা নিজের কাছে টেনে নিল, অন্যটা মেয়েটিকে এগিয়ে দিল।

—আমাকে! সব ইসারাতে কথাবার্তা।

—ইয়েস।

—নো।

—খুব রাগ করব। হাত ঘুরিয়ে মুখ ভার করে বোঝাল, না খেলে সে দুঃখ পাবে।

মেয়েটি এবার টেনে নিল গ্লাসটা। আর ঠিক তখনই অমিয় হাজির। ঠিক ওৎ পেতে আছে। মৈত্রের আবার পায়ের রক্ত মাথায়।

—কিরে মেয়েছেলে নিয়ে মদ খাচ্ছিস! তুইতো আচ্ছা লোক। এই বৌকে টাকা পাঠানো! মৈত্র আরও দু পেগের অর্ডার দিল। তারপর সে খেল না। উঠে পড়ার সময় অমিয়র হাত ধরে

বসিয়ে দিল। শালা খা, যত পারিস মদ মেয়েছেলে খা।

—বা বেশ মৈত্র, তুই নিজে খেয়ে আমার নামে বিল রেখে যাচ্ছিস!

মৈত্র অযথা কথা বাড়াল না। কাউন্টারের সামনে সে বিল মেটাবার জন্য দাঁড়াল।

অমিয় প্রায় সরবত খাবার মতো চুমুক মেরে সবটা গলায়, মিনিটখানেক মুখ কুঁচকে

রাখল। তারপর বলল দাঁড়া মৈত্র, আমি যাচ্ছি।

—না। তুমি বরং আর একটু খাও শালা। বলে সে কাউন্টারে ইশারা করতেই আরও দু পেগ। অমিয় লোভ সামলাতে পারল না। পরের পয়সায় ইচ্ছে মতো মদ খেতে কি যে ভালো লাগে। মনে মনে সে মৈত্রকে জাহান্নামে পাঠালেও এখন খুব ভালবাসছে। মরুক গে, যেখানে খুশি যাক। সে এখানে বেশ আছে। বাকি দু পেগ, একটু সময় নিয়ে খাবে।

মৈত্র ভাবল, যাক বাঁচা গেল! মেয়ে এবং মদ দিয়ে বসিয়ে দিতে পেরেছে। নতুবা সারাটা রাস্তা ভ্যানর ভ্যানর, এটা কি, ওটা কি—মেয়েটার প্রলোভনে অমিয় পড়ে গেছে। অমিয় মদ খেয়েই চলে যাবে সেখানে! তারপর খেলা আরম্ভ করবে। এবং সঙ্গে সঙ্গে মৈত্রের ফের কেন যে মদের নেশা পেয়ে গেল। ঠিক যেন জমেনি। তুমি অমিয় আমার ওপর টেক্কা দিতে চাইছ! সে ভাবল, খুব তাড়াতাড়ি যাওয়া দরকার! টাকাটা কাল পাঠালেও ক্ষতি হবে না শেফালীর। এবং মনে মনে ভাবল এক দুই করে কাঠের বল তুলে নেওয়া যাবে। চোখে যে ওর কি সব রঙীন ছবি ধরা পড়ছে এখন। এক দুই করে সব কাঠের রঙ্গীন বল ওর চোখের ওপর বেলুনের মতো উড়ে বেড়াচ্ছে। সব বল সে যেন বাজীকরের মতো আকাশে এক দুই করে অদৃশ্য করে দিচ্ছে। এমন কি মেয়েটাকে পর্যন্ত। এমন

সে দেখতে পাচ্ছে, চারপাশে বলগুলো নক্ষত্র হয়ে গেছে, এবং সে আর মেয়েটি আকাশের নিচে নক্ষত্রের পাশে দুটো মাছের মতো সাঁতার কেটে বেড়াচ্ছে। আহা, হরি ওঁম। বলে মৈত্র রাস্তাতেই একেবারে বেমালুম মাতালের মতো হাঁটতে হাঁটতে ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেল। কখনও লাইনে দাঁড়িয়ে, কখনও রেলিঙে ভর দিয়ে, চুক চুক করে মদ খেল। সব নদ-নদীর জল মাথায় ছুঁইয়ে গেল যেন।

মৈত্র বার বার পেছনের দিকে তাকাচ্ছে। না, অমিয় ওকে পেছনে ফলো করছে না। জিভ বেশ ভারি ভারি ঠেকছে। কিছু রোস্ট মাংস নিয়েছিল প্যাকেটে। সে প্যাকেট খুলে রোস্ট মাংস চিবুতে থাকল। নরম জিভে এক ধরনের স্বাদ, নরম মাংস কতদিন খাচ্ছে না। কত দীর্ঘদিন...সে ভয়ঙ্কর ভাবে নরম মাংসের জন্য দীর্ঘদিন পর এক...দুই...তিন, চার...পাঁচ... ছয়, সে দীর্ঘদিন পর ছয় থেকে বারোটা লাল নীল বল চোখের সামনে ভাসতে দেখল। কার্নিভেলের মেয়েটা যেন এখন ওর সামনে ফের বাউ করছে।

তারপর ওর আর কিছুই মনে আসছিল না। শুধু লাল নীল বল, হলুদ রঙের কাঠের ট্রে, রুপোর স্টিক এবং মেয়েটির আশ্চর্য সরল হাসি অথবা দু হাঁটু ভাঁজ করে সামান্য নুয়ে বাউ, সে যেতে যেতে এসবই মনে করতে পারছে। সে রিঙের সামনে দাঁড়িয়ে গলায় টাই টেনে দিল। সে ভীষণ স্মার্ট হবার চেষ্টা করছে। সে মাথার টুপিটা আরও টেনে দিল মুখের কাছে। সব কাউন্টার থেকে সেই এক সরল হাসি, এখানে আসুন স্যার। আপনার জন্য আমরা নানারকম মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা রেখেছি। সে সব কিছু না শোনার চেষ্টা করছে। মাথার টুপিতে যতটা পারছে কপাল মুখ ঢেকে দিচ্ছে।

তারপর সেই সরল অনাড়ম্বর হাসি। হাতে রুপোর স্টিক, এরেনার ভিতর হাতে চাবুকের মতো খেলা বেশ জমে উঠবে। মেয়েটি রুপোর স্টিক দিয়ে বল ঠেলে দিচ্ছে। মৈত্র সোজা বল তুলে নিল না। সে শুঁকে শুঁকে কি যেন টেবিলের চারপাশটা দেখছে। আসলে সে নুয়ে দেখছে। কোথায় কি রেখা অথবা ভাঁজ রয়েছে টেবিলের দাগগুলোর ভেতর সে যেন খুব ভালভাবে দেখছে। দেখলে মনে হবে, সে শুঁকে যাচ্ছে টেবিলের চারপাশটা।

আর রুপোর স্টিকে মেয়েটি পায়চারি করতে করতে মাঝে মাঝে লাঠি ঘোরাচ্ছে। কেউ কেউ দোকানের সামনে পায়চারি করছে। ওরা তিন-চার দান হেরে যেতেই মুখ গোমড়া করে ফেলেছে। মেয়েটা পরেছে নীল রঙের ট্রাউজার। মনে হয় কোন নরম পাখির বুকের পালক দিয়ে সে তৈরি করেছে তার পোশাক। ওর পোশাকের ভেতর কি যে সব সুন্দর সব লতা-পাতা আঁকা ছবি। ওর পোশাকে আছে ভীষণ চাকচিক্য। মৈত্র এমন পোশাক জীবনেও যেন দেখেনি। হাতের কাছে ফুলের মতো গাউনের হাতা। ফুলে আছে। আর বুকের কাছে শরীরের

সঙ্গে জামা সেঁটে আছে। স্তন এমন উঁচু করে রাখার কি যে দরকার! সে ভালভাবে তাকাতে পারছে না পর্যন্ত। মাথায় মেয়েটি আর টুপি পরেনি। চুলে বব্ ছাঁট। কোঁকড়ানো কালো চুলে নীল চোখে এক দুর্ধর্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী। মৈত্র দান তুলে নিল।

মেয়েটি ভেবেছিল সে খেলবে। কিন্তু আশ্চর্য, না খেলা না, প্যাসু গুনে গুনে দেওয়া। মৈত্র বরং বলগুলি নিয়ে তারের ওপর খেলা দেখানোর মতো বল হাওয়ায় ছুঁড়ে দিতে থাকল। আসলে মৈত্র জানে বেশি রাতে ওর খেলা জমবে। সে এখন যেন মেয়েটার বল ছুঁড়ে ছুঁড়ে বিজ্ঞাপন দিচ্ছে। এখানে আসুন, খেলুন, খুব সহজ খেলা, আপনার যা দরকার লাগে নিয়ে যান। কেবল রিঙের মেয়েটি বাদে। এর জন্য আমি শেষ খেলা খেলব ভাবছি মশাইরা। সে ঘুরে ঘুরে বলের নানা ট্রিক্স—জ্যাবের ভিতর কানের ভাঁজে এবং মাথায় বল রেখে ব্যালেন্সের খেলা—এবং লোক জমে গেলেই, কিছু কিছু লোক খেলতে আরম্ভ করে দেয়। দিলে যা হয় নেশা লাগে। হারতে থাকে। টেবিলে প্যাসু গুনে শেষ করতে পারে না মেয়েটি।

কে বলবে এখন মৈত্র এই রিঙের খদ্দের! সে কখনও মেয়েটাকে টাকা গুনে দিতে পর্যন্ত সাহায্য করছে! একা পেরে উঠছে না। সে মেয়েটার হয়ে রুপোর স্টিকে বল ঠেলে দিচ্ছে। ভিড় কমে গেলেই সে আবার রুপোর স্টিকের মাথায় বল রেখে ব্যালেন্সের খেলা আরম্ভ করে দেয় এবং এভাবে সে এই রিঙে একজন মজাদার মানুষ।

মৈত্র থামের আড়াল থেকে কখনও কখনও মেয়েটিকে দেখছে। সে আর খেলা দেখাচ্ছে না। এই ভিড়টা কেটে গেলেই আরম্ভ করবে। কিন্তু মনে হল, কেউ যেতে চাইছে না। কেউ খেলছে, কেউ মজা দেখছে। এমন একটা রিং ছেড়ে কারো যেতে ইচ্ছে করছে না। অথচ অন্য রিঙগুলো ফাঁকা হয়ে গেছে। কেবল এখানেই ভিড়। আচ্ছা মুশকিল হল। সে চারপাশে তাকিয়ে এবার এগিয়ে গেল। বল গড়িয়ে আসছে, আর সে ধরে ফেলছে। অর্থাৎ সে এবার খেলবে এবং ক্রমে ক্রমে বলগুলো ট্রে থেকে তুলে নিল। অর্থাৎ সে কাউকে আর খেলতে দিচ্ছে না। যাদের খেলে অভ্যাস যারা জানে মেয়েটির নানা রকমের বাহাদুরী, তারা মুচকি হাসছিল, বোকা জাহাজিটা মরবে। বেটা এক আজগুবী মানুষ।

এবার মৈত্র এবং মেয়েটি। মৈত্র চুপচাপ খেলে যেতে থাকল। প্যাসগুলো ড্রয়ারে রেখে তালা মেরে দিল মেয়েটা। কারণ একা যখন এবং সামনে জাহাজি মানুষ, সে ঠিক ভরসা পাচ্ছে না। সে এখন রুপোর স্টিকে চিবুক রেখে মৈত্রের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে আছে। মানুষটা বিদেশী এবং জাহাজি মানুষ। জাঁহাজি মানুষকে পোশাকে ঠিক চেনা যায়। মানুষটা ভীষণ বেপরোয়া। একসঙ্গে অনেকগুলো প্যাসু বাজী রেখেছে। মরদের মতো খেলে যাচ্ছে। অথচ মুখে ভীষণ তুচ্ছ তাচ্ছিল্য ভাব মেয়েটির। যেন এমন সে কত খেলোয়াড়দের দেখে থাকে রোজ।

রাত বাড়ছিল। ভেতরে ভেতরে মৈত্র মরিয়া হয়ে উঠেছে। আর হেরে যাচ্ছে। এত হেরে গেলে রিঙেরও বদনাম। মেয়েটি জাহাজি মানুষটার ওপরে করুণা বশেও হয়তো রিঙের সব বল তুলে বড় একটা কাচের পাত্রে রেখে দিচ্ছে। কাচের পাত্রে তুলে দেওয়ার অর্থ আর না। একটু পর সব বন্ধ হয়ে যাবে। আর খেলা হবে না। এবার জাহাজে ফের।

মৈত্র এবার ঝুঁকে দাঁড়াল। ইশারা করল। এবং হাতের পাঁচ আঙ্গুলে কিছু বোঝাতে চাইল।

মেয়েটি বুঝল, পাঁচ প্যাসু! মেয়েটি ঠোঁট উল্টে দিল।

মৈত্র আসলে আজও একগাদা প্যাসু হেরে গেছে। সে এই হেরে হেরে মেয়েটিকে জিতে নিতে চাইছে। সে পাঁচ আঙ্গুলে পঞ্চাশ প্যাসু বলতে চেয়েছে, মেয়েটি কি বুঝেছে কে জানে।

মৈত্রের হাতে এখন আর কোনও বল নেই। সদরে যারা ব্যাণ্ড বাজাচ্ছে যারা ব্যাগ-পাইপ বাজাচ্ছিল এখন তারা পর্যন্ত বাজনা থামিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ এবার ছুটি। মেয়েটিও একসময় ওকে পাহারা রেখে বাক্সের সব প্যাসু ভেতরে কোথায় জমা দিয়ে এল। ঝাঁপ ফেলে দিচ্ছে। ডেনছিগোতে একজনও বসে এখন মদ খাচ্ছে না। কার্পেট তুলে ফেলা হচ্ছে। গোটা

কার্নিভেল এখন ফাটা বেলুনের মতো চুপসে গেছে। কেমন নিঝুম। দু-একজন মাতাল পুরুষ অথবা রিঙের মেয়েরা বের হয়ে যাচ্ছে। ওদের দেখে মৈত্র আরও অস্থির হয়ে উঠছে।

মৈত্র' আর থাকতে পারল না। সে দশ আঙুলে, দেখাল, একশ। একশ প্যাসু দেব মেয়ে।

মেয়েটি কোন কথা বলল না। সে মৈত্রের মুখের ওপর ঝাঁপ ফেলে দিল। এবং মৈত্রের দিকে সে আর ফিরে তাকাল না। হন হন করে সদর দরজার দিকে হাঁটতে থাকল। মৈত্র কেন জানি ডাকতে সাহস করল না। ওর চোখের ওপরে রাতের এমন সুন্দর নাইটিঙ্গেল পাখি অদৃশ্য হয়ে গেল। সে হায় হায় করে উঠল।

.

রবিবার সুতরাং সকলের ছুটি। ডেক এবং এনজিন জাহাজিদের কোন কাজ নেই। ডেক-ভাণ্ডারি এবং এনজিন-ভাণ্ডারির কেবল কাজ গ্যালিতে। মেসরুমবয় এবং মেটদেরও কাজ থাকে। স্টুয়ার্ড ইকবাল সাহেব ভোরে উঠেই চিফ কুক এবং ভাণ্ডারিদের রসদ দিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং তিনিও প্রায় ছুটি উপভোগ করছিলেন। অফিসার এনজিনিয়াররা ছুটির দিন বলে বেশ রাত করে জাহাজে ফিরেছে। ওরা এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি।

ভোরের দিকে ছোটবাবু একবার উঠেছিল। কি ঘন কুয়াশা চারপাশে! কুয়াশার জন্য কিছু দেখা যাচ্ছে না। সে কুয়াশা এবং শীতের জন্য ফের এসে শুয়ে পড়েছে। মৈত্র জেগেছিল। সে খুটখাট শব্দ হতেই কম্বল সরাল মুখের। অমিয় এখনও ঘুমোচ্ছে। ওকে ডাকতে সাহস হচ্ছিল না। কাল কিনারায় সে শেষ পর্যন্ত কি কাণ্ড করে ফিরেছে কে জানে। ছোটবাবু হয়তো ফের নাক ডাকিয়ে ঘুমোবার জন্য কম্বলের ভিতর ঢুকে যাচ্ছে।

অথচ একটু চা না খেলে হচ্ছে না। কাজের কোন তাড়া নেই। যতক্ষণ পারা যায় শুয়ে থাকা। আলস্য সারা শরীরে। এবং এ জন্যই যত হিজিবিজি চিন্তা থেকে রক্ষা পাবার জন্য ডাকল, এই ছোটবাবু।

কম্বলের ভেতর থেকে জবাব এল—হুঁ

—একটু চা খাওয়াবি?

—খুব ঠাণ্ডা ওপরে। কুয়াশা। কিছু দেখা যাচ্ছে না।

মৈত্র বুঝতে পারল ছোটবাবু কিছুতেই এখন উঠতে চাইছে না। এত শীতে সহজে কেউ উঠতে চায় না। কিন্তু ওকে উঠতে হবে। সে আর শুয়ে থাকতে পারবে না। তাকে একবার বাথরুমে যেতে হবে। শেফালী নানাভাবে সারারাত বিব্রত করেছে। রাতে ওর ভাল ঘুম হয়নি। সকালে শেফালীর কথা ভেবে ভীষণ মায়া হচ্ছিল। শেফালীকে কাল বিকেলে একেবারে ভুলে গিয়েছিল। কাল রাতে এবং মধ্য রাতে, অন্তত স্বপ্নটার আগে পর্যন্ত শেফালীর কথা মনে করতে পারেনি। ভোর রাতে ঘুমের ভেতর প্রথম একটা অপরিচিত মুখ, ঠিক কুয়াশার ভেতর দাঁড়িয়ে থাকলে যেমন লাগে, তেমনি শেফালী দাঁড়িয়েছিল। সে প্রথম বুঝতে পারেনি শেফালী। পরে যেন মনে হয়েছে চেনা চেনা। তারপরই যখন চোখ তুলে তাকাল, একেবারে শেফালী। বিমলবাবুর ভালবাসার স্ত্রী শেফালী। শুভেন্দু মৈত্রের কিডন্যাপ করা বৌ। বিমলবাবু যে বৌর ওপর অধিকার ছেড়ে দিয়ে ভেবেছিল, বাঁচা গেল। যা উত্তাপ মেয়ের বিমলবাবুর পক্ষে বোধ হয় সামলানো কঠিন ছিল বৌকে।

ভেতর বাইরে কোথাও তেমন সোরগোল নেই। কাজের জন্য কোনো কিনারার লোক ডেকে উঠে আসেনি। ফল্কায় কাজ হচ্ছে না। কাঠের পাটাতনে ঢাকা। সকালে বড়-মালোম আর কাপ্তান নিচে নেমে গেছে। ওরা যাবে গীর্জায়। বাথরুম থেকে ফিরে এলে, শরীর খুব ঝরঝরে এবং হাল্কা মনে হচ্ছে। ওর ইচ্ছা হচ্ছিল, এখন চুপচাপ এক কাপ চা খায়। এ সময় সামান্য ধূপের গন্ধ থাকলে যেন ভাল হত। ফুলের গন্ধ অথবা চন্দনের সৌরভ হলে যেন মন্দ হয় না। রাতে সব পাপ কাজের কথা সে ভুলে যেতে পারত। রাতের শেষে জলের নিচে, নীল স্ফটিক জলে সে তবে হয়তো আর শেফালীকে বিশ্রীভাবে শুয়ে থাকতে দেখত না।

সে নিজেই চা করে আনল। ছোটবাবু এবং অমিয়কে ডেকে চা দিল। ওদের জড়ানো চোখ। কোনরকমে চা খেয়েই আবার কম্বলের নিচে। যেন ওরা এমন সুখ সহজে হাতছাড়া করবে না। চা খেতে খেতে কেন যে গত সফরের সেই মেয়ে, এলসা দ্য কেলি, ওর মা স্যালেস দ্য কেলি, সেই মামাবাবু ক্যাপ্টেন ফ্রগের কথা মনে পড়ছে। দুপুরের দিকে কোথাও বের হয়ে পড়তে হবে। বের হতে না পারলেই সেই গোলকধাঁধা। সে বুঝতে পারছে, কিছুতেই আর জাহাজে সে থাকতে পারছে না।

এবং এভাবে সে ভাবল, যদি বিকেলের দিকে ছোটবাবুকে নিয়ে বের হওয়া যায়। ছোটবাবুর ভেতর কেমন একটা সরল অনাড়ম্বর জীবনযাপন আছে, যা মুগ্ধ করে বিস্মিত করে। সে পাশে থাকলে বোধহয় সাহস পাবে। সুতরাং অমিয়কে সঙ্গে না নিয়ে বরং সে ছোটবাবুকে সঙ্গে নিয়ে বের হবে। ছোটবাবু মেজ-মালোমের সঙ্গে বের হতে পারে। সে চা খেতে খেতে বলল, আমার সঙ্গে এক জায়গায় যাবি ছোট!

—কোথায়!

—সে আছে, তোকে নিয়ে যাব। খারাপ জায়গা না। তোকে এলসা দ্যর কথা বলিনি! ওদের ওখানে যাব।

কম্বলের নিচে অমিয় মিউ মিউ গলায় বলছে, আমিও যাব।

—না, তোমাকে নেব না!

—না নিলেও যাব। আমি যাব কিন্তু বলছি।

—আচ্ছা ঝামেলা হল দেখছি!

ছোটবাবু বলল, চলুক না মৈত্রদা। ও আবার একা ঘুরে বেড়াবে কোথায়!

যেন মৈত্রকে রাগিয়ে দেবার জন্য কম্বলের ভেতর থেকেই জিজ্ঞাসা করল অমিয়—কিরে টাকা পাঠালি?

—তোমাকে বলব কেন? আমার পার্সোনাল ব্যাপারে ঝুট ঝামেলা করবে না।

এত শীতে ওরা আর ঘুমোতে পারছে না। দুজনই উঠে বসেছে। ছোটবাবু মুখটা শুধু বের করে রেখেছে। অমিয় তাও না। সে বসে আছে সব ঢেকে। এমন কি মুখে ঠান্ডা লাগার ভয়ে সে ঘোমটার মতো কম্বল মুখের ওপর ফেলে দিয়েছে। মৈত্রও বাংকে বসে পড়ল। টাকা পাঠাতে পারেনি, আজ ঠিক পাঠাবে। এলসা দ্য কেলির বাড়ি হয়ে বিকেলে চলে যাবে ঠিক জায়গায়। অমিয় থাকলে প্রলোভনে পড়ে যেতে পারে।

ছোট বলল, তুমি তো সবই বল।

—তা বলি।

—তবে আর না বলে থাকছ কেন?

—না, পাঠাই নি।

অমিয় বলল, তাড়াতাড়ি পাঠা।

—সে আমি বুঝব।

এবং এভাবে ওরা ঠিক দুপুরে বের হয়ে গেল। ওরা জেটি ধরে হেঁটে গেল। এরা ভারতবর্ষের মানুষ, এদের দেখলেই কেউ কেউ ভারতবর্ষের মানুষ বলে চিনতে পারে। ওরা যে, শীত-কাতুরে ভীষণ, তাও বুঝতে পারে। কারণ সকালটা এত কুয়াশা আর ঠান্ডা ছিল হাত-পা কেউ গরম রাখতে পারে নি। দুপুরের দিকে কুয়াশা কেটে গেলে যা হয়, রোদ, মনোরম রোদ, রোদের ভেতর হেঁটে যাচ্ছে, হাল্কা মসলিনের মতো রোদ। ওরা তার ভেতরে হেঁটে যাচ্ছে অথচ শরীরে ওভারকোট, হাতে দস্তানা, মাথায় মাংকি ক্যাপ, যেন ওরা বরফের দেশে এসে গেছে। এখন তো এখানে শীত চলে যাবার সময়। বরং এদেশে এখন বসন্তকাল পড়বে। ওরা

এমন ঢেকে-ঢুকে হেঁটে গেলে, কেউ কেউ হেসে ফেলে। আর তখনই বুঝতে পারে, ওরা ভারতবর্ষের মানুষ, একটু ওরা শীতকাতুরে। ওদের ক্ষমা করে দেওয়া চলে।

কেউ হেসে ফেললে, মৈত্র হাতজোড় করে ক্ষমা চায়। তখন রাস্তার লোকজন ওদের দেখার জন্য ভিড় করতে থাকে। সে তাদেরও হাত জোড় করে ক্ষমা প্রার্থনা করছে। কেউ বুঝি ঠিক ঠিক বুঝতে পারে না। অমিয় তখন সুযোগ বুঝে আবোল-তাবোল অশ্লীল বাংলা কথাবার্তা যা মুখে আসে বলে যায়। ছোটবাবুর এসব শুনলে কান গরম হবার কথা। কিন্তু এখন কেমন সহ্য হয়ে গেছে। অমিয় অনেকের নামকরণ পর্যন্ত করে ফেলেছে। যেমন বড় মিস্ত্রির কথা উঠলেই অমিয় বলবে, শালা মগরবাজ আজও দেখলাম ঠিক নাগর সেজে চলে গেল রে মাইরি। মেয়েটার কি যে অল্প বয়স!

সুতরাং এভাবে ছোটবাবু আনন্দই পায়। বিশেষ করে এই যে অচেনা শহর, মানুষজন, তাদের কথাবার্তায় সে নানাভাবে মজা পায়। সে জানে না তখন তার ভেতরে আছে এক প্রচন্ড দুঃখ। নিশিদিন সে দুঃখ সুপ্ত থাকে ভেতরে। ছোটবাবু সেজন্য কখনও খুব উচ্ছল হতে পারে না। ভেতরে উচ্ছাস থাকলে সেও বোধহয় গলা মিলিয়ে বাংলা অশ্লীল সব কথাবার্তা বলে মজা করতে পারত। কিন্তু সে পারে না।

মৈত্র যেতে যেতে এক সময় বলল, এদেশের মেয়েরা দেখতে আশ্চর্য সুন্দর। অমিয় বলল, সে তো জাহাজেই টের পাচ্ছি।

—বোধহয় পৃথিবীর আর কোথাও এমন সুন্দর যুবতী দেখতে পাবে না।

—তা জানি না। ছোট বলল।

—না পাবে না। এমন রঙ, এমন চোখ, এমন চুল পৃথিবীতে আর আছে বলে আমি জানি না।

—হবে হয় ত।

—এলসা ছিল, এদের ভেতর রাজকন্যা।

—তাই বুঝি।

—শালা ব্যানার্জী, এই ঠিক তোর স্বভাবের মতো ছিল রে, শালা কোথাকার এক অপোগন্ড, তাকে কিনা এদেশের এমন সুন্দর 'মেয়েটা ভালবেসে ফেলল।

—ভালবাসার কথা কেউ বলতে পারে না। কখন কিভাবে যে সব হয়ে যায়।

—হেলেন অফ ট্রয়! মেয়েটাকে আমি পৃথিবীর ট্রয় নগরীর হেলেন ভেবে থাকি। সে প্রায় দু হাত তুলে বলে উঠল, হার মিরাকল ফেস চার্মস্ মি। .

—তা হলে চল দেখা যাক তোমার হেলেনকে। অমিয় বলল, দ্যাখো আমার সঙ্গে ভিড়িয়ে দিতে পার কিনা। তবে আমি ঠিক এখানে থেকে যাব। পৃথিবীর আর কোথাও গিয়ে আমার কাজ নেই, ট্রয় নগরীর হেলেনকে নিয়ে শুধু ঘুরব। কাজ করতে আমার বয়ে গেছে!

—কি আজেবাজে বকিস না।

এই হচ্ছে মৈত্রের স্বভাব। কখন যে সে খুব ভালো মানুষ হয়ে যায় বোঝা যায় না। এলসাকে নিয়ে মৈত্র কোন ঠাট্টা পছন্দ করছে না। এলসা ওর আত্মীয়র কাছাকাছি যেন। সে শেষে বলল, আয়। লেন্দ্রো এলেন থাউজেন্ড টু। এই নম্বর। সে তার ডাইরি থেকে নম্বর টুকে এনেছিল। যেতে যেতে বাড়ির গায়ে নম্বর মিলিয়ে দেখছে। সে এই শহরের সব কেমন গোলমাল করে ফেলছে। এতবার এসেও ঠিক মনে রাখতে পারছে না। সব বাড়িঘর দেখতে এক রকমের, রাস্তা এক রকমের, সোজা একেবারে ছককাটা। একটা বাড়ির সঙ্গে অন্য বাড়ির কোন অমিল নেই এদিকটায়।

মৈত্র জাহাজেই এলসার নানারকমের গল্প ছোটবাবুকে বলেছে। ছোটবাবুর তখন মনে হয় সব বন্দরের ছোটখাট ঘটনা মৈত্র জানে। এবং সে প্রায় ঐতিহাসিকের মতো। যা জানে বলে

যায়, বন্দরের বিধি-নিষেধ সে সব জানে। ঘুরে বেড়াও ক্ষতি নেই, ফুল কেন ক্ষতি নেই কিন্তু আর বেশিদুর যাওয়া ঠিক না। আর যারা জাহাজি ওরা বলবে যদি বন্দরে মেয়েমানুষই না পেলে তবে কেন যে জাহাজি হওয়া। এমন সব নিয়মকানুন চলতি আছে জাহাজে। আর যেহেতু মৈত্র ওদের প্রায় গার্জিয়ানের মতো বন্ধুর মতো, তার কথা নানাকারণে রাখতে হয়। ওরা হাঁটতে হাঁটতে মৈত্রের কথামতো রাস্তাঘাট পার হয়ে যাচ্ছে।

মৈত্র যেতে যেতে বলল, এই শোন তোরা আবার ওকে বলিস না, ব্যানার্জী বিয়ে করেছে। ব্যানার্জী শিক্ষকতা করছে। তোদের তো বলতে কিছু আটকায় না। আর দেখবি, এলসা কি সুন্দর ইংরেজি বলে। ও হল ইতালির মেয়ে। বাবা ওয়েলসের। ভদ্রলোক এখানে তেলের ব্যবসা করতে এসে কার- এ্যাকসিডেন্টে মারা যান। আর শোন, যাচ্ছি যখন, একটু কেনাকাটা দরকার।

অমিয় সেই যে চুপ করেছে, আর একটি কথাও বলছে না। সামনের সেই টাওয়ারের ঘড়িতে দুটো বাজার শব্দ। মৈত্রের বুকটা ধ্বক করে উঠল। পাশেই যেন কেউ বিউগিল বাজাচ্ছে আর যেন ক্যারাভেন যায়, নানা রকমের উটের মুখ বোধ হয় সদর দরজায় টাঙিয়ে দেওয়া হয়েছে। মৈত্র এসব ভুলে থাকার জন্য একটা ফুলের দোকানে ঢুকে কিছু ফুল কিনে ফেলল। সেলেস দ্যর জন্য কিছু ফল। আর সে জাহাজ থেকে নেমে আসার সময় দু-প্যাকেট ক্যাপস্টেন সিগারেট নিয়েছে। মামাবাবু এ- সিগারেট খুব পছন্দ করেন। এখানে ভালো টোবাকো পাওয়া যায় না। দু-প্যাকেট ক্যাপস্টেন পেলে কি যে খুশী হবে!

মৈত্রের সব জানা বলে, সে যেতে যেতে বলল, এটাই ফ্লোরিদার সব চেয়ে বড় বাড়ি। তুই এখানে ঢুকলে আমাদের এমব্যাসি-হাউজ দেখতে পাবি। পাশে একটা বড় রেস্তোঁরা আছে। মাঝ ভাজা পাওয়া যায়। অলিভ-অয়েলে রান্না। খেতে খারাপ লাগবে না। কতদিন মাছ খাই না। ওরা তিনজন সময় কাটাবার জন্য বসে চা খেল। এখানে এসেই কেন জানি মৈত্রের মনে হয়েছে, ওরা খুব তাড়াতাড়ি চলে এসেছে। একটু পরে না গেলে ঠিক হবে না। ওরা চা খেল, মাছ-ভাজা খেল। মেয়েদের সঙ্গে আড্ডা জমাতে চাইল। একটা কথাও বুঝছে না বলে, অমিয় ধুস্ শালা বলে ওঠে পড়ল।

বের হতেই মনে হল শহরময় বড় গন্ডগোল আরম্ভ হয়ে গেছে। মানুষজন ছুটোছুটি করছে। যে যেদিকে পারছে পালাচ্ছে। কিছু স্টেনগানের শব্দ। পুলিশ এবং কিছু মিলিটারি ঘুরে গেল। ওরা এ- দেশের মানুষদের মতো ঠিক কোনও গলি-ঘুঁজি খুঁজে পেল না। দোকানের ভেতর ঢুকতে গিয়ে দেখল, সব ঝুপঝাপ সাটার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। জানালা-দরজা সব বন্ধ। ওরা এবার এলোপাথারি ছুটতে গিয়ে বুঝতে পারল, ঠিক হবে না। ওরা একটা বড় ক্যামাও গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে পড়ল। গাছটার চারপাশে নাবালকের মতো ঘুরে মরার সময় মনে হল, সব আবার ঠান্ডা। গাড়ি ঘোড়া চলছে, কেন এটা হল বুঝতে পারছে না। একটা মানুষের খোঁজে কারা এসে ফিরে গেছে। ধরতে পারেনি। পাশের এক বৃদ্ধা ওদের ক্যামাও গাছের চারপাশে ঘুরতে দেখে হেসে ফেলল। বলল, স্পষ্ট ইংরেজিতে বলল, তোমাদের কিছু হবে না বাছা। তোমরা ঘোরাফেরা কর, ময়ফেল কর। তারপর নিজে কেমন বিড় বিড় করে বকতে থাকল, পেরণ সরকারের পতনের পরই এমন আকছার ঘটনা ঘটছে।

ওরা এখনও হাঁটছে। হাঁটতে হাঁটতে কেরিয়েস্থুজ পার হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে আপেলের গাছ, চেরিফলের গাছ। কিছু আঙুরলতা দেয়ালের ওপর। আর সদর দরজায় তেমনি সেই বড় টিউলি প গাছটি আছে। ওরা সহসা গাছটার নিচে দাঁড়িয়ে পড়ল।

টিউলিপ গাছটায় তেমনি ফুল ফুটে আছে। পাশে পাথরে নানাবর্ণের অর্কিডের ছড়াছড়ি। কিছু ফুলের চাষ লনে, পাশে গোলাপের বাগান। বড় বড় বেগুনি রঙের লাল রঙের গোলাপ ফুটে আছে। আর লনে সব ডেইজি ফুল, ফুটে আছে। হলুদ রঙের ছোট ছোট ফুল, এবং কেউ যেন জানালায় এখন চাঁদমালার মতো গুচ্ছ গুচ্ছ সান-ফ্লাওয়ার টাঙিয়ে দিয়ে গেছে। এমন সুন্দর টিপটপ সাজানো বাড়ি, অথচ জানালা বন্ধ, দরজা বন্ধ, কেউ নেই। ওরা কি

কোথাও শীতের ছুটিতে চলে গেছে? জানালায় পারসিমন লতা ঝুলছে। এতটুকু ধুলো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন নয়। যেন কেউ এখুনি দরজা বন্ধ করে বাইরে গেছে।

মৈত্র বলল, রোজই এসে দেখতাম, ব্যানার্জী এবং এলসা এখানে বসে রয়েছে। ব্যানার্জী নানা রকমের গল্প বলছে। সবই আমাদের দেশের গল্প। ও যে কত জানত। ভাল ইংরেজি বলতে পারত ব্যানার্জী। কলেজে পড়েছে। তোর চেয়ে বয়সে বড় ছেলেটা। বেশ কিন্তু ছিল তবে খুব ভীতু। না হলে এলসাকে ফেলে এ-ভাবে কেউ চলে যায়! তারপর সে একটু হেসে বলল, আসলে ও হারামজাদা একটা অমানুষ। আমরা অমানুষ লেখাপড়া না শিখে, ও-শালা অমানুষ লেখাপড়া শিখে।

একসময় মৈত্র বলল, চারপাশে নানারকমের ঘটনা ঘটছে, হয়তো সেজন্য দরজা-জানালা সব বন্ধ। সে এবার দরজায় দাঁড়িয়ে বেল টিপল। বেশ শব্দ হচ্ছে। বাজছে বেলটা। কিন্তু কেউ এসে দরজা খুলে দিচ্ছে না।

কোন সাড়া পেল না মৈত্র। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ভেতরে ওরা কোন আলো জ্বলতে দেখল না। ওরা কি তবে শহর ছেড়ে চলে গেছে। সেলেস দ্য ক্যালি, বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপিকা। সেবারে ব্যানার্জি দরজাতেই পথ হারিয়ে অনেক রাত অবধি অপেক্ষা করেছিল। ভোর হলে পুলিশের শরণাপন্ন হবে, এমন একটা ভাবনা মনে মনে। সে সদর দরজার পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল, যেমন একজন মাতাল মানুষ অথবা বাজ-পড়া মানুষ মরে যাবার পরও দাঁড়িয়ে থাকে, ঠিক তেমনি সে একজন প্রায় চেতনাহীন মানুষ, সকাল না হলে সে এখান থেকে নড়বে না ভেবেছিল। ঠায় দাঁড়িয়ে একটা লাঠিতে ভর করে রাত কাটাবে ভেবেছিল। শহর ঘুরতে বের হয়ে ওর এমন বিপাক। সে জানত না স্পেনীশ না জানলে, শহরে এমন বিপাকে পড়তে হয়।

তারপর মৈত্র শার্শির ভেতর দিয়ে উঁকি দেবার চেষ্টা করল। না কিছু দেখা যাচ্ছে না। সে বলল, ভাগ্যিস এই দরজা দিয়ে সেলেস দ্য ক্যালী বাড়িতে ফিরছিলেন। দরজায় একজন মানুষ! কপালে টুপি নামানো। প্রথম তিনি ভেবেছিলেন মাতাল মানুষ। এ-ভাবে মানুষেরা শহরের রাস্তায় চুপ চাপ দাঁড়িয়ে থাকে কখনও! তিনি প্রথম ওকে স্পেনীশ ভাষায় কিছু জিজ্ঞাসা করেছিলেন। কিন্তু কোন উত্তর না পেলে ইংরেজিতে। ব্যানার্জী ইয়াংকি কিনা তাও।

না এখনও কেউ আসছে না। এ-ভাবে এখানে দাঁড়িয়ে থাকাও খারাপ দেখাচ্ছে। সে যেন কথা প্রসঙ্গে আবার সব বলে যেতে থাকল, সে-রাতে ব্যানার্জীকে সরষে ফুল দেখতে হত। সেলেস দ্য ক্যালীর এমন কথা তার কাছে প্রায় তখন ঈশ্বরের সামিল। সে বলেছিল, মাদাম আমি ইয়াংকি নই। মাদাম আমি মাতাল নই। আমাকে ভয় পাবার কিছু নেই। আমি জাহাজি, ভারতীয়। শহর দেখতে বের হয়ে পথ হারিয়েছি।

অমিয় বলল, একেবারে নবকুমার দেখছি।

—প্রায় তাই।

এখন মনে হয় ঘরের ভিতরে কেউ পায়চারি করছে।

দরজা খুললে মৈত্র বলল, গুড ইভিনিং মাদাম

তিনি কিছু বললেন না। তারপর যেন কি ভেবে বললেন, গুড-ইভিনিং। আপনারা.......।

—চিনতে পারলেন না মাদাম! আমি মৈত্র।

—মৈত্র! অনেকক্ষণ পর যেন বুঝতে পারলেন। আবার এসেছ!

—হ্যাঁ, মাদাম। আবার এসেছি।

তারপর মৈত্র তাঁর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল, এ অমিয় আর এ ছোটবাবু। গত সফরের ব্যানার্জীর মতো এক ফোকসালে আমরা থাকি।

এলসাকে দেখা যাচ্ছে না। এ-সময় সে বাড়ি নাও থাকতে পারে। তবু উঁকি ঝুঁকি মারল

সে। সেলেস দ্য বুঝতে পেরে বললেন, সে নেই। তারপর বললেন, এস ভেতরে। আকাশ ক'দিন থেকে বেশ পরিষ্কার কি বল?

–তা ঠিক।

–তোমরা আসবে বলেই হয়ত, বলে তিনি সামান্য হাসলেন।

মৈত্র লক্ষ্য করছে, সেলেস দ্য কেমন বুড়ি হয়ে গেছেন। মামাবাবু নেই। তার কুকুর নেই। এলসা মামাবাবুর সঙ্গে কোথাও যেতে পারে। যেন এখানে এলসা না থাকলে আসার কোন মানে হয় না। কিন্তু এলসা সম্পর্কে সেলেস দ্য আর কিছু বলছে না।

মৈত্র এবার বসতে বসতে অন্য কথা পাড়ল। বলল, ক্যাপ্টেন সাবকে দেখছি না। ওর কুকুরটা। তিনি থাকলে দেখতে ছোটবাবু যুদ্ধের গল্প খুব জমে উঠত। মামাবাবু যুদ্ধ ছাড়া কিছু বোঝেন না।

সে এখন এভিতাতে আছে। সমুদ্রের ধারে তাঁবু বানিয়ে নিয়েছে। বেশ আছে।

—কি করছেন এখন?

—কিছুই না। সারাদিন কুকুর মেজিকে নিয়ে সমুদ্রের ধারে ছুটে বেড়ায়। সারা দুপুর সমুদ্রের নিচে ডুবুরিদের সঙ্গে সাঁতার কাটে। হাতে ওর একটা বর্শা থাকে। ম্যাকরল মাছ মেরে খেতে খুব ভালবাসে। সে এখন কুকুর বাদে কিছু জানে না। মেজির জন্য সে এ-শহর ছেড়ে চলে গেছে।

ছোটবাবু বলল, মেজির বুঝি শহর ভাল লাগছিল না?

—না। শহরে সে ভালভাবে ছুটতে পারে না। ফাঁকা জায়গা না হলে আয়াস পায় না মেজি। তাছাড়া একটি লোককে মেজি কামড়ে দিয়েছিল। ফ্রক ফাইন দিয়েছে। তা ছাড়া সরকার পক্ষের উকিল গুলি করে মারার জন্য সওয়াল পর্যন্ত করেছিল।

—তাই বুঝি। অমিয় খুব সহজভাবে বলল। আর অমিয় এবং মৈত্র কি ভদ্র এখন। অশ্লীল কথাবার্তা বলতে পারে মুখ দেখে এখন তা বিশ্বাসই হয় না।

—ওর ভীষণ ভয়, মেজিকে কেউ একদিন না একদিন ঠিক গুলি করবে। সে শেষ পর্যন্ত সব ছেড়েছুড়ে চলে গেল।

মৈত্র যাকে খুঁজছে, তাকে দেখতে পাচ্ছে না। সেলেস দ্যকে খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। ফ্রক এখানে নেই। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে মানুষটা জার্মানির হয়ে লড়েছেন। কত রকমের নিষ্ঠুর মৃত্যুর গল্প যে করেছেন, করতে করতে হেসেছেন। মৃত্যুর জন্য, ধ্বংসের জন্য ওঁর কোন দুঃখ ছিল না। তিনি এখন একটা কুকুরের প্রাণ বাঁচাতে সমুদ্রতীরে বনবাসে চলে গেছেন। মানুষের মাঝে মাঝে কি যে হয়?

ঘরে নীল রঙের কার্পেট পাতা। সবুজ, হলুদ, লাল সব কৃত্রিম ফুলের যেন ছড়াছড়ি কার্পেটে। দেয়ালে সাদা রঙ, কিছু ছবি। এলসার ছবি নেই। এ-ঘরে আগে মৈত্র এলে এলসার একটা বড় ছবি দেখতে পেত। এলসার হাতে টেনিস র‍্যাকেট। সে ছুটে গিয়ে বল মারছে এমন একটা ভঙ্গিতে তোলা ছিল ছবিটা। এত সুন্দর ছবিটাও এ ঘরে নেই। কেবল যীশুর একটা কাঠের মূর্তি। আর কোণে সবুজ বাতিদান। ফুলদানিতে কেউ ফুল তুলে রাখেনি। বোঝাই যায় এ-পরিবারে কোথাও একটা বড় রকমের ঝড় গেছে। সেলেস দ্য সেই ঝড় নিয়ে বেঁচে আছেন।

সেলেস দ্য এক সময় এভিতাতে কি করে যাওয়া যায় তার সবরকমের পথঘাট বলে দিলেন মৈত্রকে।

ছোটবাবু এলসার কথা ভাবছিল। ঘরের ভেতর কেমন একটা বিদেশী গন্ধ। অমিয় উসখুশ করছে। এমন একটা ছুটির দিনে, এ-ভাবে বসে থাকতে তার ভাল লাগে না। কেমন একটুতেই একঘেয়ে। কেন যে এ-ভাবে আসা! সেলেস দ্য ছোটবাবুকে বললেন, কেমন লাগছে

আমাদের শহরটা।

—খুব সুন্দর। ছিমছাম। আমার তো খুব ভাল লাগে হেঁটে বেড়াতে। কিন্তু কেউ এখানে ইংরেজি বোঝে না। পথ হারাব ভেবেই খুব বেশি দূর যেতে পারি না।

এ-সব কথাও তেমন জমছে না। একটু কফি করতে সেলেস দ্য ভেতরে গেছেন। তখন অমিয় বলল, এই ওঠ। আমার ভাল লাগছে না।

ছোটবাবু বলল, এলসা থাকলে আমাদের খুব ভাল লাগত।

মৈত্র বলল, মনে হয় কোথাও গেছে। ঠিক এসে যাবে। এলসা মাকে বাদে থাকতে পারে না।

অমিয় যেন কেমন ক্ষেপে গেল—দেখছিস বুড়ি খুব সেয়ানা। মেয়ের কথা কিছু বলছে না।

—বেশি বললে ভাবতে পারে, এলসাকে আমাদের খুব দরকার। তিনি খারাপ ভাবতে পারেন।

অমিয় বলল, এ-দেশের মেয়েরা ভাল কবে। ব্যানার্জী যাবার সময়, তুমি বিহনে প্রাণ বাঁচে না আমার, আর চলে গেলেই নটে গাছটি মুড়ল, আমার গল্প ফুরোল

মৈত্র বলল, এই আসছে!

অমিয় হেসে দিল, বলল, সেলেস দ্য বাংলা জানেন বুঝি।

—এটা অসভ্যতা। তুই যখন ইংরেজি জানিস, যখন আমরাও মোটামুটি জানি, তখন ওঁর সামনে বাংলা বলা অভদ্রতা।

এই প্রৌঢ়ার সঙ্গে গল্প করতে মৈত্রেরও খুব একটা ভাল লাগছে না। মৈত্র এ-সব দেশগুলোতে ঘুরে বেশ একটা নিজের মতো স্বভাব গড়ে তুলেছে। সে এখন সেলেস দ্যকে সাহায্য করছে কাজে। মৈত্রকে দেখে মনে হয় সে যেন এ-পরিপারের কেউ। তাকে কিছুতেই আর ভাবা যায় না, সে কখনও কোন জুয়ার রিঙে দাঁড়িয়ে আঙ্গুল ফাঁক করে বলতে পারে, পঞ্চাশ অথবা একশ।

সেলেস দ্য বললেন, রাস্তায় গন্ডগোল দেখে দরজা জানালা বন্ধ করে রেখেছিলাম। একটা লোককে কারা খুঁজে বেড়াচ্ছে। কে যে সে! তার কি নাম আমরা জানি না। তার একটা নাম আইখম্যান। শোনা যায় ওটা নাকি মানুষটার ছদ্মনাম। আসল নাম কেউ জানে না।

–সে কে!

সে অনেক কিছু ছিল। তার নিষ্ঠুরতার শেষ ছিল না। সে এ-দেশে পালিয়ে আছে, কি করে যে এ-সব খবর রটে যায়! সে এখানে আসবেই বা কেন!

—তা ঠিক।

—কি করত?

—যুদ্ধের সময় কনসেনট্রেশন ক্যামপে ইহুদীদের নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করত।

—ভয়ঙ্কর!

—হুঁ। ভয়ঙ্কর। বলেই সেলেস দ্য খ্রীষ্টের ছবিটা দেখলেন।

ওরা প্রত্যেকেই এখন বেশ আগ্রহ নিয়ে শুনছিল। এবং মাঝে মাঝে জুতোর শব্দ অথবা কোন শব্দ শুনলে দরজার দিকে তাকাচ্ছে, না কেউ না। একটা পাতা পড়ার শব্দ, না কেউ না, বোধহয় ও-পাশের সিঁড়িতে কোন ভাড়াটে মানুষ উঠে যাচ্ছে। ছোটবাবু ঠিক বুঝতে পারে না, এলসাকে দেখার এমন আগ্রহ কেন। যেন ওরা ওকে দেখে না গেলে প্রায় ট্রয়ের হেলেনকে দেখার সুযোগ হারাবে। মৈত্র সুন্দরীদের সম্পর্কে বড় বেশি খুঁতখুঁতে স্বভাবের। তার মুখে এসব কথা, সুতরাং ওরা ভাবছিল, সেই মহিমময়ী এসে গেলে চারপাশের যত কিছু সহসা ফুলে ফলে ভরে যাবে। আর এমন একটা লোভে পড়ে গিয়ে কেউ উঠতে পারছে না।

কফি অথবা খাবার, কিছুই ভাল লাগছে না। সেলেস দ্য ভীষণভাবে ওদের জাহাজ, ওরা তারপর কোথায় যাচ্ছে, ওরা বাড়িতে মাকে চিঠি লেখে কিনা, আর কে কে আছে, এ-সব জানতে চাইছেন। এবং এ-জন্য প্রশ্নের পর প্রশ্ন

কিন্তু এ-সবের জন্য ওরা এখানে আসেনি। ওরা এসেছে এলসার জন্য। যে প্রতিদিন জাহাজঘাটায় ওর ছোট্ট বেবিমোটর নিয়ে অপেক্ষা করত। কি যে ছিল ব্যানার্জীর, কি যে ছিল ব্যানার্জীর চোখে! অনেক রাতে জাহাজে পৌঁছে দিয়েছিলেন সেলেস দ্য। পরদিন মেয়েকে পাঠিয়েছিলেন খোঁজ নিতে, সে কেমন আছে। ঠান্ডায় দাঁড়িয়ে শীতে অসুখে পড়ে যেতে পারে। বিকেলে ব্যানার্জী দেখেছিল একটি মেয়ে, চুল তার কবেকার........কি যেন গাছের ছায়ায় দাঁড়ানো একটা মেয়ে, ভারি সুন্দর, ভারি লম্বা, ভারি হাসি-খুশি। তাকে সে খুঁজতে এসেছে। সে আছে, ভালই আছে, এবং সে নিচে নেমে গেলে বলেছিল, তুমি কোনদিকে যাবে? ব্যানার্জী বলেছিল, কোথাও না। আবার হারালে, কে আমাকে পৌঁছে দেবে।

এলসা বলেছিল, আমি।

এ-সব গল্প মৈত্র বলেছিল। অমিয় শুনে বলেছিল, কিছুটা গানের সুরে, এলসা আহা, আমরা হারিয়ে গেলে পৌঁছে দেবে না। আমি বার বার হারিয়ে যাব।

সেলেস দ্য দুটো প্লেট আনতে গেলে অমিয় প্রায় গানের সুরে হাত তুলে গুনগুন করে গেয়েছিল—বার বার হারিয়ে যাব।

—অমিয় তুই একটা জংলি

—তা তুমি বলতে পার।

—নমস্কার! একশবার নমস্কার। তোমাকে নিয়ে কোনও ভদ্র-পরিবারে যাওয়া ঠিক না।

সে বলল, আচ্ছা নমস্কার। আমিও আর যাব না। কেবল দয়া করে এলসাকে এখন দেখিয়ে দাও। দেখাতে না পারলে জাহাজে ফিরে শালা তোমাকে পেঁদাব।

মৈত্র ক্ষেপে গেল খুব। অথচ সে মুখ ভার করতে পারে না। এবং অমিয় এটা বুঝেই ফেলেছে। ঘন্টাখানেক সময় পার করে দিতে পারলেই মৈত্র সব ভুলে যাবে। সেলেস দ্য এলে সেও খুব গম্ভীর হয়ে গেল। একেবারে অসীম সমুদ্রে পাল তুলে দিয়েছে। মস্তো সিরিয়াস মুখ সবার।

মৈত্র যেন নিজের মান সম্মান বাঁচানোর জন্য বলল, আজ উঠি মাদাম।

—কেন! এতো সকাল সকাল। বোস না। গাড়িটা বেচে দিয়েছি। না হলে তোমার বন্ধুদের নিয়ে শহরটা ঘুরতে পারতাম। ওরা এখানকার সবকিছু দেখে গেলে আমার ভাল লাগত। এমন শহর, এমন সুন্দর জায়গা পৃথিবীতে আর নেই।

মৈত্র যেন দুঃখ দিতে চায় না। সে বলল, আমরা আবার কাল আসব।

অমিয় যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচল। আর একটা চান্‌স।

সেলেস দ্য বললেন, কাল এস কিন্তু! অনেকদিন একা একা আছি। কেউ এখন আসে না। রিটায়ার করেছি বছরের ওপর। সেলেস দ্যর গলা কেমন ভারী ভারী। তারপর কেমন সহজ গলায় বললেন, তোমাদের এখানে ভাল লাগছে না বুঝতে পারি। তোমরা এখন শুধু খাবে দাবে, ঘুরে বেড়াবে। আনন্দ করবে। বড় সুখের সময় এটা।

—না না আপনি তা মনে করবেন না। আপনাকে আমাদের খুব ভাল লেগেছে। আমরা কাল ঠিক আসব। ছোটবাবু খুব আন্তরিক গলায় বলে অপলক সেলেস দ্যকে দেখল।

অমিয় বলল, এলসাকে বলবেন, আমরা এসেছিলাম।

সেলেস দ্য কালীকে মনে হচ্ছিল তিনি এবার দূরে হেঁটে যাবেন। এবং ছায়ার মতো গাছপালার ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাবেন। তিনি কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকলেন। কিছু

বললেন না।

অমিয় বলল, বলবেন কিন্তু মনে করে আমরা এসেছিলাম বলবেন।

সেলেস দ্য ওদের সঙ্গে সদর পর্যন্ত হেঁটে গেলেন। তারপর তিনি দাঁড়ালেন। বললেন, কাল এস। তারপর হেসে বললেন, এলসা বেঁচে নেই।

মৈত্র সহসা কিছু বলতে পারল না।—এমন একটা ফুলের মতো মেয়ে মরে গেল।

—হ্যাঁ মরে গেল মৈত্র। তোমাদের যাবার মাস তিনের ভেতর সেও চলে গেল।

ওরা কেউ আর এক পা বাড়াতে পারছে না। অমিয় যে অমিয়, যার মুখে কিছু আটকায় না, সেও বড় কোনও নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে মনে হয়। মনে হয় নিঃসঙ্গ, বড় বেশি নিঃসঙ্গতা। নদীর বুকে ঢেউ উঠে শান্ত হয়ে গেল সব। সে চোখ তুলে সেলেস দ্যকে দেখার চেষ্টা করল না। ওর ভয় ধরে গেছে। মুখটা কেমন দেখাবে কে জানে! দুঃখী মুখ দেখতে তার ভাল লাগে না।

মৈত্র বলল, কি হয়েছিল?

–কি হয়েছিল জানি না। কেমন এক মেলাঙকোলিয়া। চুপচাপ থাকত, কথা বলত না। ক্রমে রোগা হয়ে গেল। চোখের ওপর আমার সুন্দর মেয়েটা পোড়া কাঠ হয়ে গেল। সে খেতে চাইতো না। কারো সঙ্গে কথা বলতে চাইত না।

—কিন্তু ও যে একটা চিঠি লিখেছিল। পানামা ক্যানেলে আমাদের তখন জাহাজ। আমরা নিউজিল্যান্ড যাচ্ছি। ব্যানার্জী, চিঠির কথা আমাকে বলেছিল।

—ওটা ওর শেষ চিঠি।

—সামান্য একটা মাত্র লাইন। ডোন্ট ফরগেট মি। এমন কিছু বোধহয় লিখেছিল।

—কি লিখেছিল আমি বলতে পারব না। তবে চিঠিটা যখন লেখে, তখন আমি ছিলাম। তখন ও বিছানা থেকে উঠতে পারে না, খুব দুর্বল। ওর কিছু লেখার আর তখন ক্ষমতাও ছিল না। ছোটবাবুর কেন যেন মনে হয় পৃথিবীতে মানুষের দুঃখটা এক রকমের। ভালবাসা এক রকমের মা-মাসীরা পৃথিবীর সব সময় এক রকমের হয়।

এলসাকে সে দেখেনি, তবু কেন যে মনে হয়, এলসা পৃথিবীর এমন মেয়ে যার তুলনা নেই। সেও যেন এলসার জন্য এ-দেশে থেকে যেতে পারত। পৃথিবীর এমন সুন্দর মেয়েটা, ভালবাসতে গিয়ে মরে গেল।

রাস্তায় নেমে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলল, ব্যানার্জীটা কি অমানুষ!

—অমানুষ কিনা জানি না। দুঃখটা ওর দিকেও ছিল। অথচ দ্যাখ ভেবে পাই না, ওর বাবা কেমন মানুষ। আমরা লিখেছিলাম, এমন একটি ঘটনাতে আপনার মত দেওয়া উচিত।

—তিনি কি লিখেছিলেন?

—জানি না। তবে উনি ব্যানার্জীকে ঠিক কিছু লিখেছিলেন। কি যে লিখেছিলন! সে অমানুষের মতো তারপরই কাজটা করে ফেলল। এলসাকে বলল, হয় না, আমি এখানে থেকে যেতে পারি না। থাকলে, খুব স্বার্থপরের মতো কাজটা হবে।

ছোটবাবু বলল, এখানে থাকলে সেটা অবশ্য হত। আমাদের ভারতবর্ষের মানুষরা এমন ঠিকই ভাবতেন।

অমিয় ধমক লাগাল, রাখ তোর কথা। আসলে ব্যানার্জী অমানুষ। না হলে এমন কাজ কেউ করে না। সে ভয় পেয়ে গেছিল শেষ পর্যন্ত।

মৈত্র, আর একটু ব্যাখা করল, ওর বাবা সেকেলে মানুষ

—সবার বাবারাই সেকেলে থাকে। ভালবাসার সে দাম দেবে না সেজন্য!

ছোটবাবু বলল, কোথাকার একটা ছেলে, কোথাকার একটা মেয়ে, মেয়েটা কিনা, একটা ছেলেকে দেখেই প্রেমে পড়ে গেল। তারপর মরে গেল। ভাবা যায় না!

মৈত্র বলল, মানুষের নিষ্ঠুরতা নানা রকমের থাকে। ব্যানার্জী পরে যা বলেছিল, জাহাজে মাঝে মাঝে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেলে বলত, বাবার চিঠিটাতে মায়ের সতীত্ব প্রমাণের কথা ছিল।

—তার মানে!

—মানে, আমার জাতক হলে তুমি এ কাজ করবে না, ওর বাবা লিখেছিল।

—হায় ভারতবাসী, হাসতে হাসতে গলায় ফাঁসি। সত্যি এমন হয়!

—ব্যানার্জীর বেলায় এটা হতে দেখেছি। সে আছে, বেশ আছে। বউ আছে। বউ জানেনা এ সব। আমরা এখানে মেয়েটার জন্য কষ্ট পাচ্ছি।

অথচ ওরা হাঁটতে হাঁটতে দেখল, রাত হয়ে গেছে। শো-কেসগুলোতে আলোর বর্ণমালা। কত সব বিচিত্র বর্ণের ছবি। কত সব সাজগোজ, কত সব লোভের পাখী ডানা মেলে উড়ছে। এ-সব দেখলে তারপর বুঝি মনে থাকে না, কোথাকার কে এলসা, কে ব্যানার্জী, কে সেলেস দ্য অথবা কোনও ক্যাপ্টেনের সমুদ্রতীরে বনবাস, তার প্রিয় কুকুর মেজিকে নিয়ে সে আছে। কেবল মনে হয় উটের মতো মুখটি তুলে এক অতীব নিষ্ঠুর খেলা মানুষের ভেতর বেঁচে থাকে, বেড়ে ওঠে, অবহেলায় দূরে ঠেলে দেয়া যায় না। মানুষ তার অতীব এক দাস। তাল-বেতাল সে তার স্বভাবে।

মৈত্র এখন প্রায় দৌড়ে দৌড়ে হাঁটছিল। দেরি হলে কার্ণিভেল ভেঙ্গে যাবে যেন। অথচ মুখে কিছু বলছে না। সে কেবল হেঁটে যাচ্ছে। ওরা ওকে অনুসরণ করে হাঁটছে। বাসে অথবা ট্যাকসিতে ওরা যাচ্ছে না। অথবা মনে হয়, ছেলেমানুষের মতো মৈত্র মেলায় যাচ্ছে, ঘোড়দৌড় হয়ে গেলে সব গেল। সে ঘোড়দৌড় দেখার জন্য জোরে হাঁটছে যেন। কোন দিকবিদিক জ্ঞান থাকছে না।

এবং মনে হয় তিনজনেই ভুলে কার্ণিভেলে ঢুকে গেছে। কেউ একটা কথা বলছে না। মেলাটা ঘুরে চলে যাবে।

সেই এক চারপাশে নানাবর্ণের দোকান। মদের বোতল, রিঙ, সুবেশা রমনী। পিস্তলের খেলা অথবা ম্যাগপাই। কৃত্রিম হ্রদ, কৃত্রিম পাহাড়। আর হাজার হাজার জুয়ারি ছুটছে। ছুটির দিন বলে হয়ত এমন হয়েছে। নিয়ন আলো। আলোর রঙে রিঙের যুবতীদের মুখ ঝলমল করছে। আর কেউ কেউ খেলছে, হাঁটছে। কেউ কেউ নাচছে এবং গাইছে। যুবক-যুবতীরা হাসি মসকরা করছে। ওরা ছুটছে, খেলছে। ওরা সামনের পাহাড়ের টানেলে ঢুকে যাচ্ছে। সব নকল পাহাড়, নকল টানেল। যেন এই যে মানুষেরা তোমরা ভারি নকলনবিশ, আসলে চেহারা তোমাদের এমন নয়—কি যে সব ভাবছে মৈত্র। গত সফরে মৈত্র এক জাহাজি বন্ধু ব্যানার্জীর সঙ্গে এই টানেলের ভেতর ঢুকে গিয়েছিল।

অন্ধকার গুহামধ্যে মৈত্র বাঘ হরিণ থেকে আরম্ভ করে কতকালের ভয়ঙ্কর মুখ পর্যন্ত দেখেছে। সবই নকল। ভয় দেখানোর জন্য এমনভাবে সাজিয়ে রাখা। এবং কত সব মুখোশের ভেতর ভূতের হাত-পা নাড়া। ওরা ভয় পায়নি। এলসা ওদের সঙ্গে ছিল। হঠাৎ ঢুকলে ভয় পাবার কথা। কিন্তু এলসা ছিল ভারি ভাল মেয়ে। ব্যানার্জি ভয় পাবে বলে প্রথম সে ঢুকতেই চায়নি।

এ-ভাবে এলসা মরে গেলে মনে হল, ফুল ফোটার সময় হলে মৌমাছিরা উড়ে আসে। ফুলের মতো মেয়ে এলসা। এলসা এখন নাগালের বাইরে। হায়, এলসা ভালবেসে মরে গেল! হায়, এলসার হাতের দস্তানা পর্যন্ত সাদা রঙের ছিল। এলসা পোশাক পরতে ভালবাসত সাদা রঙের। ওর চুল ছিল নীল রঙের, মুখে ছিল গোলাপী আভা, আর চোখে ছিল সুন্দর নীল রঙের সমুদ্র। তাকালে চোখ ফেরানো যেত না। মাথায় সোনালী টুপি, ময়ূরের পালক গোঁজা।

সবুজ ঘাস মাড়িয়ে গেলে ওর পা খুব সুন্দর দেখাত।

আর এ-ভাবে ফুল ফোটার সময় হলে, মৌমাছিরা সব উড়ে আসে। দু-পেগ গিলে ফেলতেই মৈত্রের এমন মনে হল। স্মৃতির ঘর থেকে কি সব উড়ে আসছে! সে যেন কেবল এলসার মুখ দেখতে পাচ্ছে। এলসার মুখ-চোখ এমন কি শেষদিন সে কি পোশাক পরেছিল, গাউনের রঙ কি, সব মনে করতে পারছে। তারপরই যেন মনে হয়—কি ফুল ফুটতে পারে এ সময়। গাছে গাছে কি ফুল থাকবে। ফুলের সৌরভের জন্য মানুষেরা এত উড়ে বেড়ায় কেন! এমন কি, কি রঙের জুতো পরতে ভালবাসত এলসা, সে এইসব চারপাশে লোকদের ভিড় দেখেও ভুলে যাচ্ছে না। আসলে ফুলের জন্য বড় লোভ মানুষের। এই লোভ মানুষকে খারাপ করে দেয়, নৃশংস করে তোলে। ফুলের পাপড়ি ছিঁড়ে খেতে ভালবাসে মানুষ।

এবং এই লোভের জন্য এই যে এক লোভ, আমি আমার জন্য, আমার ভালবাসার জন্য আমি, আমি কোন বস্তুতে নেই, আমি আছি আমিতে। সুখ, আমার সুখ লোভ আমার নিজের। সুতরাং আমি যখন আমিতে, শেফালীর জন্য কি করতে পারি। এখন শেফালীর কথা মনে এলেই, ওর পুরু ঠোঁটের কথা মনে হয়। জংঘার কথা মনে হয় এবং এক সুরভিত অঞ্চলের কথা মনে হয়। সে তখন কেমন মানুষ থাকে না, লোভের পাখি হয়ে অদৃশ্য জায়গাগুলোতে বসতে চায়। এবং যেন কার্ণিভেলের সেই মেয়েটা ওকে এভাবে বসতে ডাকছে। সে পারছে না।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে এখান থেকে চলে যাবে। এখানে থাকলেই একটা লোভের পাখি, পাখির কেবল উড়ে যাবার বাসনা, বসার বাসনা। কাল সব টাকা সে পাঠিয়ে দেবে। আজও নানা কারণে দেরি হয়ে গেল। এবং এ-ভাবে যখন সে প্রায় ড্রাইভ দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিল তখনই দেখল, কে যেন ওর সামনে একটা রুপোর স্টিক ঝুলিয়ে রেখেছে। সে চোখ তুলে তাকাতেই দেখল, ওকে দেখে মেয়েটি বাউ করছে। বাউ করতে গিয়ে হাঁটুর ওপর এতটা গাউন তুলে ফেলেছিল যে, একটু হলেই সে সব দেখে ফেলত।

আর সঙ্গে সঙ্গে সে কেমন হয়ে গেল। ওর হাত-পা শিথিল। সে নড়তে পারল না। যেন কেউ সমুদ্র দেখাবে বলে, অথবা পাহাড় থেকে দূরবীনে অনেক দূরের নক্ষত্র দেখাবে বলে ওকে ডাকছে। সে প্রায় পাগলের মতো লাল নীল বলের পাশে দাঁড়িয়ে গেল। এবং সে সার্কাসের হাতি-ঘোড়া লুফে নেবার মতো বলগুলোকে হাওয়ায় ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিল।

সদর দরজায় তখন লোকটা বেশ জোরে জোরে ব্যাগপাইপ বাজাচ্ছে। সে নাচছে কোমর দুলিয়ে, পা তুলে নাচছে। মানুষের এমনই স্বভাব, শুয়োরের বাচ্চারা আবার বড় বড় কথা বলে! সে সেজন্য পা তুলে পাছা দুলিয়ে ঘুরে ঘুরে নেচে যাচ্ছে। সে ঠিক জানে, মানুষের স্বভাব কি! তখন মৈত্র খেলতে থাকল। খেলতে খেলতে সে যে মৈত্র, সে-কথা একেবারে ভুলে গেল।

অমিয় বলল, এটা কি হচ্ছে!

মৈত্র কিছু বলছে না। অমিয় অথবা ছোটবাবুকে সে চেনে না মতো। ওরা চলে গেলে যেন ভাল হয়। আসলে সে ওদের নিয়ে এসেছিল সঙ্গে পাহারা দেবে বলে। এখন এরা থাকলেই অসুবিধা। ওরা চলে গেলে সে ভীষণ খুশী হবে! সে বলল তোরা জাহাজে যা। আমি পরে যাচ্ছি। ওরা হাঁটতে থাকলে সে বলল, চিনে যেতে পারবি তো?

অমিয় বলল, খুব।

ছোটও খুব বলে চলে গেল।

আর যুবতী রুপোর স্টিক নিয়ে হাঁটছে। রিঙে বাঘের খেলা দেখাচ্ছে যেন। বল এগিয়ে দিচ্ছে। মৈত্র খুব একটা আজ হারছে না। সে খেলছিল আর চোখে চোখে কথা বলে যাচ্ছে। সে মাঝে মাঝে চোখ টিপে দিচ্ছিল। মেয়েটা এজন্য কিছু বলছে না। রিঙে বাঘের খেলায় বাঘটা একটু হাই তুলবে, হাউ করে উঠবে, কতটা কি করবে মেয়েটা যেন জানে।

এবং এ-ভাবে সে আর মৈত্র এক ভয়ংকর খেলায় মেতে উঠেছে। এ-খেলা শেষ হতে

সময় নেবে। অন্য যারা খেলছিল, তারা মৈত্রের সঙ্গে পেরে উঠছে না। কেউ কেউ মৈত্রের অসম্ভব রকমের মার দেখে হাততালি দিচ্ছিল পর্যন্ত। বড় রকমের মার দেখে কেউ কেউ আর খেলতে সাহস পাচ্ছে না! তখন সেই যুবতী আগুনের মতো জ্বলছে। মৈত্রের চোখ দেখলে টের পাওয়া যায়। মেয়েটি সাদা জ্যাকেট পরে আছে। ক্ষণে ক্ষণে যুবতী পোষাক পাল্টে আসছে, তাঁবুর পাশে নিজের ছোট্ট ঘরটায় গেলেই মৈত্র বুঝতে পারে কিছু একটা এবার হবে। কিন্তু কিছু হয় না। ব্যাগপাইপের সুর ক্রমে থেমে আসে। মৈত্র আরও রাত বাড়ার আশায় আছে।

ওদিকে ক্রমে কার্ণিভেলের আলো নিভিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এবং ইতস্ততঃ অন্ধকার। ফিসফিস্ শব্দ কেউ জোরে জোরে গলা ছেড়ে গান গাইছে। মৈত্র গানের কোন কথা বুঝতে পারছে না। কোথাও ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে কেউ গাছের নিচে। সব অস্পষ্ট। জলের মতো শব্দ কোথাও। টুপটাপ শব্দের খেলা। যুবতী এবার সব বলগুলি তুলে নিচ্ছে। আর না। রাত অনেক হয়েছে।

মৈত্র খেলতে না পেরে থামে হেলান দিল। সিগারেট খেল থামে হেলান দিয়ে তারপর ফের হাতের পাঁচ আঙ্গুলে মেয়েটার চোখে তিন-চারবার নাচাল। ইশারায় টাকার অঙ্ক বোঝবার জন্য পাঁচ আঙ্গুলে পাঁচ রকমের নোট গুঁজে দিল।

যুবতী সামান্য হাসল। তারপর ভালমানুষের মতো দোকানের ঝাঁপ বন্ধ করে দিচ্ছে। বের হয়ে হাঁটতে থাকল। একবার তাকাল না। মৈত্রের এবার ওর ওপর লাফিয়ে পড়তে ইচ্ছে হল। তারপর সে দৌড়ে আগে চলে গেল। দু-হাত তুলে আগলে দিল ওর পথ। মরিয়া হয়ে গেছে মৈত্র। কিন্তু মেয়েটি ওর হাতের নিচ দিয়ে গলে গেল। তারপর একটু দূরে গিয়ে ফের বাউ। আমার পেছনে এস না, তোমাকে গুডবাই। ওর চোখের ওপর দিয়ে মেয়েটা চলে গেল। বাস-স্ট্যান্ডে মানুষের ভিড়ের ভেতর ঢুকে দাঁড়িয়ে আছে। মৈত্র কিছু আর করতে পারছে না। হাওয়ায় ঘুসি মেরে কেবল হাঁটছে। একটুকুর জন্য ফসকে গেল।

.

সে জেটিতে কখন ঢুকে গেছে খেয়ালই করেনি। দুধারে বড় বড় ক্রেনের নিচ দিয়ে সে উঠে গেল। সিঁড়ি ধরে জাহাজে ওঠার সময়ই সে সমুদ্রের গর্জন শুনতে পেল। কেমন শোঁ শোঁ বাতাসের শব্দ। শরীর টলছে। সে একা! খালি ডেক। কেউ জেগে নেই বোধহয় জাহাজে। একটা বেড়াল থাকলে এই রাতে মিউ মিউ করে ডাকতে পারত। ফোসকালে ঢুকে সে আলো জ্বেলে জল খেল ঢকঢক করে। ওর ভীষণ তেষ্টা পেয়েছিল।

পরদিন যথারীতি মৈত্র কাজ করল এনজিন রুমে। আজ তাকে বাকি টাকাটা পাঠাতেই হবে। একটার পর ছুটি হয়ে গেছে। এনজিন রুমে মেরামতের কাজ বেশি। ওদের হাতে কাজ কম। ছুটি হলে সে বাংকে শুয়ে ক'বার শেফালীর চিঠি পড়ল। চিঠি পড়লেই মনে হয় শেফালী ওর ভীষণ কাছে, যেন পাশে বসে রয়েছে। দূরের চিঠি কত যে কাছের মনে হয়, তখন ওর ভাল লাগে না। কেমন সে, বাড়ি ফেরার জন্য অধীর হয়ে পড়ে। চিঠি পড়লেই ওর ইচ্ছে হয় সমুদ্রের মাছ হয়ে সে যদি চলে যেতে পারত। জল কেটে নদীর মোহনায় উঠে যেতে ইচ্ছে হয়। তারপরই মনে হয় সে জানালায় দাঁড়িয়ে আছে। শেফালী তখন দাঁতে ফিতে কামড়ে চুল বাঁধছে। কপাল ভাল রাতে সে কোনও স্বপ্ন দেখেনি। যে-ভাবে সে গত রাতে মেয়েটার পেছনে ছুটেছিল, রাতে তার ঠিক স্বপ্ন দেখার কথা। যেন মানুষটা তিমি শিকারে বের হয়েছে, আর ফিরে আসছে না। সমুদ্রের ধারে তেমনি বৃদ্ধ পাইন গাছে, মাছের, বড় হাঙ্গর হবে হয়ত অথবা হিংস্র তিমি মাছের কঙ্কাল ঝুলছে। তার নিচে কেন যে মৈত্র দাঁড়িয়ে থাকে কেবল।

অমিয় ভেতরে ঢুকে বলল, মৈত্র জানিস, কাল লোকটাকে শেষ পর্যন্ত ধরতে পারেনি। পালিয়েছে।

—কোন লোকটা?

—আরে খুব খারাপ লোক। গত যুদ্ধে ওর নাকি নিষ্ঠুরতার তুলনা নেই। লোকটার নাম আইখম্যান। এখানে লোকটা পালিয়ে আছে। এখানে ওর ছদ্মনাম। নাৎসি জার্মানীর ইহুদি নিধনের পান্ডা।

—ইহুদি নিধন মানে?

—তুই একটা আস্ত জাহাজি। গত যুদ্ধের খবর রাখিস না! কনসেন্ট্রাসন ক্যাম্প, গ্যাস-চেম্বার, এ-সবের নাম জানিস না!

—লোকটার সঙ্গে তার কি সম্পর্ক?

—সেই তো সব করিয়েছে।

–ধ্যাৎ, ও করাবে কেন। অমন একটা ভাল কাজ পেলে তুইও করতিস।

—কি নিষ্ঠুর কাজ বল!

—ও তো সাক্ষাৎ মহাদেব।

—বাজে কথা।

—বাজে কথা কি?

—লোকটাকে পুড়িয়ে মারা উচিত। আমাদের মেজাজ খারাপ হয়ে গেছে শুনে।

—ও-ভাই সব এক ব্যাপার। বলে আর দাঁড়াল না মৈত্র। পোশাক পাল্টে ওপরে উঠে গেল। সে জাহাজ থেকে নেমে পড়ল, কিছুতেই লোভে পড়ে যাবে না। লোভে পড়ে গেলেই রক্ত গরম হয়ে যায়। কিন্তু সে যত শহরের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে, তত শুনতে পাচ্ছে তার পাশে কারা নেচে নেচে ব্যাগ-পাইপ বাজাচ্ছে। সে কিছুতেই জায়গা মতো যেতে পারছে না। সবাই নেচে নেচে যাচ্ছে, সে তার ভেতর মিশে না গেলে কেমন একা পড়ে যাবে। ওর আসলে ইচ্ছা হচ্ছিল না কোথাও সে যায়। বরং সেই উটের মত মুখটি তুলে যারা ব্যাগ-পাইপ বাজায় সেখানে যেতে পারলে যেন ভালো হত। মেয়েটির সুন্দর চোখ সমুদ্রের মতো নিরীহ চোখ তাকে কিছুতেই আর কিছু আছে পৃথিবীতে, ভাবতে দিল না।

এবং এ-ভাবে মৈত্র দেখল, সে ঘুরেফিরে কার্ণিভেলের দরজায়। আর ব্যাগ-পাইপ বাজিয়ে যাচ্ছে লোকটা। নতুন মনে হয়, একই লোক বাজায় না। সাজ পাল্টে পাল্টে যায়। লোকজন ভিড় করে দাঁড়িয়ে গেটে। সে ভেতরে ঢুকলে অন্যদিনের মতো মেয়েটা বাউ করল। মেয়ে তুমি এভাবে কেন যে গাউন টেনে হাঁটু ভাঁজ করে দাও। এমনভাবে গাউন টেনে ওপরে তুললে আমি ঠিক থাকতে পারি না।

সে খুবই হুঁশিয়ার। টাকা নষ্ট করলে তার চলবে না। যত রাতই হোক আজ যে-কোনভাবে যুবতীর পায়ে গড় হতে হবে। না হলে সে পাগল হয়ে যাবে। মৈত্র এ-জন্য খুব রয়েসয়ে খেলছে। কখন কার্ণিভেলের সব মানুষরা চলে যাবে, কখন ঝাপ বন্ধ করে মেয়েটি হাঁটবে, এখন সে সেই আশায় আছে।

মেয়েটির হাতে তেমনি রুপোর স্টিক। সবার সঙ্গে সে প্রাণখুলে হাসছে। মৈত্রের এসব ভাল লাগছে না। ধমক দিতে ইচ্ছে ইচ্ছে, না এমন কর না। এমন করলে ঠিক ভালবাসা হয় না।

যেন এই মেয়ে এবং সে রিঙের মালিক! এক বোতল মদ নিয়ে এল। দুটো গ্লাসে দু-জন ভাগ করে খাচ্ছে। মৈত্র মেয়েটির হয়ে খেলা পরিচালনা করছে। সে নিজে না খেলে অন্যদের বল এগিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু শেষের দিকে যারা এল, তাদের সে খেলতে দিল না। ওরা খেলতে আরম্ভ করলেই সহজে ঝাঁপ বন্ধ হবে না। ওরা রাত করে ফেলবে। মৈত্র তখন নিজে সব বল তুলে খেলতে থাকল। সে ওর সময় মতো তবে ঠিক ওকে কাছে পেয়ে যাবে।

মৈত্রকে এখন দেখলে মনেই হয় না সে বিদেশে এসেছে। যেন এই মেয়ে এবং সে কতকাল একসঙ্গে আছে। কতকাল থেকে সে এবং এই মেয়ে সমুদ্রের ধারে বসে রয়েছে। ওদের মাথার ওপর অজস্র টিউলিপ ফুল ঝরছে। ওরা ফুলের নিচে কবরের মতো শুয়ে

আছে। বোঝাই যায় কেউ কারো ভাষা জানে না। বরং শেফালীর কথা মনে হলে, কেন যে মনে হয় শেফালী এই মুহূর্তে তার কেউ না। সে বিমলবাবুর ভালবাসার স্ত্রী।

এক সময় রাত গভীর হলে মৈত্র দেখল যুবতী দোকান বন্ধ করছে। সে টাকা গুনে কোথায় কাকে দিয়ে এল। মৈত্র ওর পাশে পাশে হাঁটছে এখন। সে বন্ধুর মতো হেঁটে যেতে থাকলে মেয়েটি গাউন টেনে বাউ করতে চাইল। গুড-নাইট বলতে চাইল। কিন্তু মৈত্র ছেড়ে দেবার পাত্র না। সে সোজা এবার ওর পকেট থেকে সব প্যাসগুলো তুলে ধরল নাকের কাছে। চকচক্ করছে। লোভে পড়ে যাক্ মেয়েটা, এত প্যাসুর লোভ মেয়েরা সামলাতে পারে না। কিন্তু কেমন নির্বিকার তবু মেয়েটি। মৈত্রের পায়ের রক্ত মাথায়। ঝাঁ-ঝাঁ করছে শরীর। এবার হাতের ঘড়ি, আংটি পারলে যেন পোশাক খুলে সব দিয়ে-থুয়ে সে পায়ে পড়ে থাকতে চায়। তখন মেয়েটি ওর হাতে হাত রাখল। এ-ভাবে রাস্তার ওপর এ-সব ঠিক না। সন্তানের মতো স্নেহের চোখে তাকাল। তারপর সবাই জেগে আছে, সে ইশারায় শহরের আলো ঘরবাড়ির দিকে আঙ্গুল তুলে এমন বলতে চাইল। এখনও পুলিশের টহল আছে মোড়ে মোড়ে। আর এই কার্ণিভেলে সব বাতি নিভে যায়নি। সব মানুষ চলে যায়নি। শিশুর মতো এত অধীর হলে চলে না।

তারপর কি যেন জানে এই মেয়ে। সে শিস্ দিতেই একটা নতুন ঝকঝকে ট্যাক্সি সামনে হাজির। দরজা খুলতে না খুলতে মৈত্র ডাইভ মেরে একেবারে ভেতরে। মেয়েটিও ভেতরে। ওর কি যে মনে হচ্ছে এখন! মাথার ওপরে আকাশ আছে, নক্ষত্রেরা জ্বলছে সে বুঝতে পারছে না। চারপাশের বাড়ি ঘর আলো, গাছপালা ফেলে কোথায় যে যাচ্ছে গাড়িটা। সে কিছুই দেখছে না। সে পাশে বসে মেয়ের শরীরের মনোরম গন্ধ নিতে নিতে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। তারপর একটা হাত পেছনে ফেলে দিল। অন্য হাতটা সে সামনে জড়িয়ে যেন সে শীতের রাতে মেয়েটাকে নিয়ে চাদরের নিচে ওম পোহাচ্ছে। যতক্ষণ এভাবে থাকা যায়। কিন্তু মৈত্র দেখছে, সে খুব বেশিদূর এগোতে পারছে না। মেয়েটা বাধা দিচ্ছে। কি যে করে! কামড়ে খামচে এখন যেন ফালা ফালা করে দিতে ইচ্ছা হচ্ছে। অথচ সে পারছে না। এমন নির্বিকার মেয়েরা থাকতে পারে তার বিশ্বাস হয় না।

এবং এ-ভাবে সে ভেতরে খুব বেশি অস্থির হয়ে উঠলে দেখল, মেয়েটা তাকে হাত তুলে কি দেখাচ্ছে।

সে দেখল, একটা গীর্জা। গীর্জার মাথায় ক্রস।

মৈত্র এ সব মানতে চাইছে না। সে উপুড় হয়ে ট্যাকসিতেই...

মেয়েটা সবলে যেন দু-হাতে শক্ত করে ধরে রেখেছে মৈত্রকে। এ-দেশের টাকসিওয়ালাদের এমন দৃশ্য দেখা হামেশা অভ্যাস, রাত হলেই ওরা এমন সব ঘটনা দেখতে পায়। অথচ মৈত্রকে তখন অধীর হতে দেখে, আশ্চর্য সুন্দর ইংরেজিতে বলছে, ওয়েট ম্যান। ওয়েট। সি উড ক্যারি ইউ টু হার হোম। আসলে ট্যাকসিওয়ালাদের নানারকম প্যাসেঞ্জার বইতে হয় বলে, ইংরেজিটা কিছু শিখে নিয়েছে। এবং সে ইংরেজি বুঝতে পারছে দেখে, মেয়েটাও ভাঙ্গা ভাঙ্গা একটা দুটো ইংরেজি বলতে চাইল। কিন্তু মৈত্র কিছু বুঝতে পারছে না। আকাশে বেশ মেঘ। সে শহর পার হচ্ছে এটা বুঝতে পারছে। এবং এক সময় এমন শীতে বেশ জোরে বৃষ্টি।

এইসব বৃষ্টিপাতের ভেতর রাস্তার আলো ঝাপসা। কাচে জল পড়ে পড়ে সামনের সব কিছু ধূসর করে রেখেছে এবং আশ্চর্য উষ্ণতা ভেতরে। যেন কতকাল থেকে, মনে হয় আজন্ম এমন এক ভূখণ্ডের জন্য মৈত্র অপেক্ষা করে আছে। মেয়ের স্কার্ট হাঁটুর ওপরে উঠে গেছে। ওর বার বার নরম জায়গাগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখার কি যে ইচ্ছে! যেন ছুঁতে না পেলে মরে যাবে। আর নরম চুল, ফাঁপা এবং ফুরফুর করে সামান্য কাচের ফাঁকে বৃষ্টির ছাঁট, চুল উড়ছে ফুরফুর করে, সে সেই নরম চুলে মুখ ডুবিয়ে দেবার জন্য আকুল হতে গিয়ে দেখল, একটা পুরানো বাড়ির সামনে গাড়ি থেমেছে। দরজায় কেউ দাঁড়িয়ে। মেয়েটির হাতে সে একটা

প্যাকেট দিল। সর্বেশা অর্থাৎ মদ, উগ্র মদের গন্ধ চারপাশে। মৈত্র এ-পাশে ও-পাশে ফ্লাটবাড়ির মতো সাহেব মেমদের মুখ দেখে ক্রমে দোতলার সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠে গেল। একটা ক্রাচ ঠিক দেয়ালে হেলান দেওয়া, কেউ ভেতরে আছে মনে হয়। দরজা খুলে গেলে দেখল, আধপোড়া একজন মানুষের মুখ। সে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে দরজার কাছে এল। দরজা খুলে দিয়ে যেন সে কাউকে চেনে না মতো এবং সঙ্গের লোকটি কে, তার সম্পর্কে পর্যন্ত কোন উৎসাহ নেই, লোকটা এমন কি একবার মৈত্রের দিকে তাকাল না পর্যন্ত। সে কেমন যেন সব সময় আচ্ছন্ন হয়ে থাকে কিসে, হেঁটে হেঁটে ভেতরের দরজা দিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। লোকটার মুখে ভীষণ ক্রুরতার ছাপ। মৈত্রের এ হেন দৃশ্যে ছুটে পালাবার কথা, কিন্তু আশ্চর্য সেই মায়াবিনী তাকে কিছুতেই যেতে দিচ্ছে না। এবং দরকার হলে মৈত্র দ্বন্দ্বযুদ্ধে লোকটাকে ডাকবে। পৃথিবীতে সে আর পাশের যুবতী, আর কিছু আছে এ-মুহূর্তে সে জানে না। সে বিশ্বাসও করে না। সে বলল, মেয়ে আর কতক্ষণ!

যুবতী ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে কিছু বলে গেল। যেন বলা এমন অধীর হলে চলে না! তুমি কেমন জাহাজি হে! আমার মানুষকে দেখার পরও আছ, ভাবা যায় না।

হায় যুবতী জানে না, মৈত্র আর এক পা নড়তে পারছে না। সে যুবতীর ওপর এবার যেমন বাঘে শিকার নিয়ে পালায় প্রায় তেমনি ছোট কচি হরিণশিশুর মতো ঘাড়ে গলায় চুমু খেতে থাকল আর সঙ্গে সঙ্গে মনে হল, মেয়েটার ভেতরে একটা দুর্গন্ধ। সে এতক্ষণ কেন যে পায়নি! সে বলল, মেয়ে তোমার পিঠে এগুলো কিসের দাগ!

মেয়েটির শরীরে কোন পোশাক নেই। জঙঘার পাশে আশ্চর্য নীল সুবর্ণ বাতিঘর। অথচ পিঠে লাল ছোট ছোট বিজবিজে ঘা। লোকটার মুখ আধপোড়া। চামড়া ওঠানো মুখ। কি যে ভয়ঙ্কর আর কুৎসিত। পাশের ঘরে লোকটির গোঙানি শোনা যাচ্ছে। মৈত্র মেয়েটির স্তনে হাত রাখল। মৈত্র জীবনে যেন যুবতী দেখেনি, সুবর্ণ বাতিঘরে আলো জ্বালায় নি, সে শরীরের সব অংশের ভেতর নিমজ্জমান এক নেমকহারাম। যেন সে কিছুই ছুঁতে চাইছে না। যেন এই শরীরে পৃথিবীর সব কিছু মেয়েটি জড় করে রেখেছে। কোথায় সামান্য বিজবিজে ঘা, অথবা এটা যে এক অতীব কঠিন অসুখের চিহ্ন তা সে বুঝতে চাইছে না। যুবতী নানাভাবে চাইছে ওকে ফিরিয়ে দিতে। এমন অসুখ নিয়ে আমার কিছু ভাল লাগে না। তুমি পাগলামি কর না। তুমি শুনতে পাচ্ছ না, দূরে কোনো গীর্জায় ধর্মীয় সংগীত বাজছে। তুমি কি জান না, সমুদ্র কি নীল আর গভীর! তোমার শরীর নষ্ট হয়ে যাবে ম্যান।

ভাল কথা কে শোনে! পাশের ফ্ল্যাটে মিউজিক বাজছে। সমুদ্রে—ধীরে ধীরে অথবা, গভীর সমুদ্রে হাওয়ায় যেন বৃষ্টিপাতের শব্দ ধীরে ধীরে ঝম্ ঝম্ শব্দের মতো। যেন সহসা অতিদূর থেকে কোন সমুদ্রপাখির ডানার শব্দ ক্রমে এগিয়ে আসতে আসতে সহসা বাতাসে বৃষ্টিপাতের ভেজা গন্ধ পেয়ে ওপরে উঠে যাওয়া। অনেক ওপরে। আবার কখনও পাখিটা যেন পাখা বিস্তার করে প্রবহমান ধারায় নেমে আসছে। মেয়েটি মিউজিক শুনতে শুনতে কেমন অধীর গলায় বলল, ম্যান, আমাকে ক্ষমা কর। আমি পারব না। ভেবেছিলাম আমার সব দেখে তুমি ভয় পাবে। ঘাবড়ে যাবে।

মৈত্র পায়ের কাছে মাথা নিচু করে বসে রয়েছে। সে অনুমতি চাইছে। সেও যেন সেই মিউজিকের ভেতর এই মেয়েকে কেমন সুগন্ধী হয়ে যেতে দেখছে। ওর হাত-পা কাঁপছে, কান গরম হয়ে গেছে, সে পায়ের কাছে পড়ে থেকে বলছে যেন, আমি মরে যাব মেয়ে। সব দিয়েছি। আরও দেব। মেয়েটির কষ্ট হচ্ছিল। সে জানে, ব্যবহারে, এই যুবক, ক্রমে তার পুরুষের মতো হয়ে যাবে। ওর ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। ভীষণ। সে এ-সব থেকে পরিত্রাণের জন্য এখন জুয়ার রিঙে কাজ নিয়েছে। এমন একজন আধপোড়া কঠিন অসুখের মানুষকে নিয়ে যখন শরীরের বিজবিজে ঘা ক্রমাগত পাগল করে দেয়, অস্থির করে তোলে তখন এক অপার্থিব চিৎকার এবং দেয়ালে ক্রমাগত মাথা ঠুকে মরা

মৈত্র বলতে চাইল কিছু। বলতে পারছে না। ছেলেমানুষের মতো শরীরের সর্বত্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে

দেখছে। দেবীপ্রতিমার গায়ে হাত দেবার মতো। অথবা সন্তান মায়ের স্তন নিয়ে যে-ভাবে খেলা করে, তেমনি পুষ্ট স্তন হাতে নিয়ে বসে থাকা। যেন মৈত্র এখন এ-শরীর দিয়ে হলেও, সে নিঃশেষ হয়ে গেলেও পায়ের নিচে পড়ে থাকবে।

মেয়েটির সত্যি কষ্ট হচ্ছিল। সে বলল, এস। মৈত্র একেবারে শিশু হয়ে গেল। যে-যেভাবে মৈত্র চাইল, ঠিক সেভাবে তাকে শুইয়ে রাখল পাশে। আর সব কিছু নিয়ে মৈত্র এমন ছেলেমানুষী করতে থাকল যে শুড়শুড়ি, কি যে শুড়শুড়ি, মেয়েটি ভীষণ জোরে হাসতে থাকল। সে ওর শরীর সরিয়ে নিতে থাকল। না না, ওটা কি করছ ম্যান! আমার ভীষণ শুড়শুড়ি লাগছে। এখানে না। এখানে না।

কে শোনে কার কথা, সারাক্ষণ জাহাজি মানুষের প্রেম কি যে নিদারুণ! এক অতিকায় হাঙ্গরের সমুদ্রে ডুব দিয়ে আহার অন্বেষণের মতো। মেয়েটি বলল, ম্যান, তোমার ভীষণ কষ্ট?

মৈত্র বলল, ভীষণ।

—এখন ভাল লাগছে? —ভীষণ ভাল লাগছে।

—তুমি কতদিন আছ?

—কিছুদিন।

তারপর মৈত্র সুন্দর বিছানায় ঘুমিয়ে পড়ল। সারারাত ওপাশের ঘরে লোকটা চেঁচাচ্ছিল। মৈত্র কিছু শুনতে পায়নি। গভীর রাতে ঘুম ভাঙলে মনে হল মেয়েটি ওর পাশে নেই। সে দেখল ঘর অন্ধকার। পাশের ঘরে আলো জ্বলছে। যুবতী এখন ওর স্বামীর পাশে।

মৈত্র আবার ঘুমিয়ে পড়ল। ওর কোন হিংসে হচ্ছিল না। বরং এক অতীব শান্তি শরীরে, কি যে মহিমময়ী মনে হচ্ছে যুবতীকে। ওর ভাল লাগছিল ঘুমিয়ে পড়তে।

খুব সকালে সে শুনতে পেল। ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজিতে বলছে, ম্যান, বেলা হয়েছে। এবারে ওঠো। জাহাজে ফিরতে হবে।

ঠিক যেন শেফালির মতো গলা। কি যে আপন আর সুন্দর এই বেঁচে থাকা! সে পাশ ফিরলে দেখল, চা। যুবতীর শরীরে কপালে পবিত্রতা। মৈত্র উঠতে পারছে না। ভীষণ লজ্জা করছে। আলনা থেকে মৈত্রকে ওর পোশাক এনে দিল। মৈত্রকে অবোধ বালকের চেয়ে বেশি কিছু মনে হচ্ছে না। যুবতী সামান্য হেসে বলল, ম্যান চা ঠাণ্ডা হচ্ছে।

মৈত্র কম্বল কোমর পর্যন্ত জড়িয়ে নিল। সেন্ট্রাল হিটের জন্য বেশ আরাম বোধ হচ্ছে। সে চা খেতে খেতে বলল, কোথাও আর যাব না। থাকব। এখানেই থেকে যাব।

—থাকলে মারব। ওঘরে গিয়ে একটু বোস। এত বেশি ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা যে মৈত্র কিছুই বোঝে নি। তারপর ইশারা করলে, বুঝল, এ-বাড়িতে এসে গৃহকর্তার সঙ্গে একটু আলাপ হবে না, এটা ঠিক না। মৈত্র বাথরুমে ঢুকে গেল, স্নান করল, পোশাক পাল্টাল, এবং সেই কঠিন পোড়া অসুস্থ মানুষটার সঙ্গে কথা বলার জন্য মাথার কাছে একটা চেয়ারে বসল।

লোকটির কথা বলতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল, তবু বলল, সাহস আছে তোমার।

মৈত্র কিছু বলল না।

সে নিজের মনে মনে বিড়বিড় করে বলল, সাহস আমারও ছিল। এখন কিচ্ছু নেই। তারপর ওপরের দিকে তাকিয়ে থাকল। একেবারে ভীষণ শূন্যতা চোখে। মৈত্র আর বসে থাকতে সাহস পেল না। ওর সত্যি এবার লোকটাকে ভয় করছে। সে বলল, আসি। সে উঠে প্রায় দৌড়ে পালাবার মতো সিঁড়ি ধরে নামতে থাকলে দেখল, যুবতী পেছনে পেছনে নেমে আসছে। সে বলল, তুমি চিনে যেতে পারবে না। আমার সঙ্গে যাবে।

যেন সে কতদিন পর এক সুদীর্ঘ প্রবাস থেকে ফিরে এসেছে। মেয়েটিকে তার কিছুতেই মনে হচ্ছে না, দূরের, যেন সে-আছে, তার চারপাশেই আছে, কতকালের চেনা প্রিয়জনের মতো, ওর চোখ ভারি হয়ে আসছিল। মৈত্র বলল, আবার আসব।

যুবতী ওকে জাহাজঘাটায় নামিয়ে বলল, না। আর আসবে না। সে একটু থেমে বলল, ডাক্তার দেখাবে।

মৈত্র বলল, আমার কিছু হবে না।

যুবতী তবু বলল, না হলেও দেখাবে। বলবে সব। পিঠে বিজবিজে ঘা, সব খুলে বলবে। না বললে আমি কষ্ট পাব।

মৈত্র মেয়েটির কথাবার্তা এখন যেন মন দিয়ে শুনছে না। সে আর কি দিতে পারে। সব দিয়েছে, তার আরও কিছু থাকলে মেয়েটিকে এমুহূর্তে দিয়ে দিতে পারত। বড় বেশি ছোট মনে হচ্ছে নিজেকে। সে এত খাটো মাপের মানুষ। সে বলল, এসে গেছি।

গুড বাই। মেয়েটি গাড়িতে বসে হাত নাড়ল। শিফনের ফ্রক গায়ে। মাথায় উলের টুপি। মুখটা সব দেখা যাচ্ছে না। মৈত্র নুয়ে হ্যাণ্ডসেক করল। আসলে নুয়ে ওর সুন্দর মুখটা আর একবার দেখতে চাইল। কি কোমল, আর নরম, আর বড় বেশি স্নিগ্ধতা চোখে মুখে! সে কিছুই বলতে পারল না। ধীরে ধীরে ক্রেনের লম্বা ছায়া অতিক্রম করে জাহাজে উঠে গেল।

॥ চৌদ্দ ॥

সকালে উঠেই মৈত্র দেখল, চব্বিশ ঘণ্টার ফ্ল্যাগ মাস্তুলে টানিয়ে দেওয়া হয়েছে। জাহাজের মাল নামানো শেষ। ড্রিফটিঙ লাইন অনেক ওপরে উঠে গেছে জাহাজের। গ্যাঙওয়েতে সিঁড়ি খাড়া। খাড়া সিঁড়িতে উঠতে ভয়। ক্রমে জাহাজ জলের ওপর ভেসে উঠলে যা হয়। মেরামতের কাজ মোটামুটি শেষ। তবু মনে হয় বয়লার চক মেরামত করে নিলে হত। জাহাজ সরফাই-এর সময় এমন একটা রিপোর্ট যেন ছিল। তারপর কি করে যে কি হয়ে যায়। মৈত্র ঠিক বোঝে না, এ-ভাবে একটা ভাঙ্গা জাহাজ নিয়ে কাপ্তান দরিয়াতে ভেসে চলেছে কি করে! এবং চারপাশে এত নিয়মকানুন থাকা সত্ত্বেও এটা হয়। বুড়ো কাপ্তানের চোখ মুখ লাল। অথচ তিনি কিছু করতে পারেন না। কোম্পানী এজেণ্ট-অফিসের মারফত এ-সব করে থাকে। কিভাবে কোথায় কি পরিমাণ টাকা দিলে, বেশি পরিমাণ টাকা বেঁচে যায়, এবং রিপোর্টে লেখা থাকে তখন, দি সিপ মে সেইল, কাপ্তান যেন ঠিক জানেন না।

সকালের দিকে ঘন কুয়াশা। কাজের ভেতর শুধু এখন এনজিন রুমে ঘুরে বেড়ানো। কোলবয়দের দিয়ে রেলিঙ, অথবা এনজিনরুমের পাটাতন ঝকঝকে করা। ঘন কুয়াশার ভেতর দিয়ে শীতের পোশাকে এখন সব জাহাজিরা যে যার কাজে চলে যাচ্ছে। মৈত্র, জানে তার টাকা পাঠানো হল না। সে সব শেষ করে ফেলেছে। সামনের বন্দরে কিছু একটা করা যায় কিনা, শেফালীকে যে সে মাসোহারা দিয়ে এসেছে, ওতে ওর চলার কথা। তবু সে যেমন মুদিখানা, ডাক্তার এবং অন্য সব মানুষদের বলে আসে, আমি যাচ্ছি, ওর যা লাগে দিয়ে যাবেন। সবাই ঠিক ঠিক দিয়ে যায়। সফর শেষে বাড়ি ফিরে এলে সে কারো এক পয়সা বাকি রাখে না। শেফালীর স্বভাব বেশি খরচ করে আরামে বেঁচে থাকা। টাকার প্রতি ওর ভীষণ মায়া কম। এবং তখন এমন একটা সময়, যে সারা সফর ঘুরে শরীরে জমে থাকে এক ভয়ঙ্কর ক্ষুধা, শেফালী যতই আরামে থাকুক, পয়সা খোলামকুচির মতো খরচ করে থাকুক, তার রাগ থাকে না। শেফালী একেবারে সবকিছু এমন ভাবে খরচ করেছে বলেই খুশি। এতটুকু অসুবিধে করে বেঁচে থাকলে মৈত্র ভীষণ কষ্ট পেত যেন। কিন্তু জাহাজে ওঠার সময় মনে মনে সে ভীষণ ক্ষেপে যায়। শেফালী এভাবে খরচ না করলে আরও কিছুদিন কিনারায় থেকে যেতে পারত।

গত রাতে সে ফেরেনি। কেন ফেরেনি, কোথায় ছিল কিছু বলছে না। সে এখন পুরোপুরি টিণ্ডাল। ছোটবাবু অমিয়কে কয়লায়ালা বাদে আর কিছু ভাবছে না।

অমিয়, ছোটবাবু জানে অথবা বুঝতে পারে বাবু কোথায় রাত কাটিয়েছে। ওরাও এ-নিয়ে কোনও কথাবার্তা বলছে না। বললেই যেন টিণ্ডাল গরম দেখাবে।

বিকেলের দিকে মৈত্র কোথাও বের হয়নি। কেবল একটু নিচে নেমে সে পায়চারি করছিল। কেউ কেউ কিনারায় আগুন জ্বেলে গরম পোহাচ্ছে। ওরা সবাই জাহাজে মেরামতের কাজ শেষ করে ফিরে যাচ্ছিল। ওদের বোসান হয়তো এখনও ফিরে আসেনি। ওরা আগুন পোহাচ্ছে। ডালপালা, গাছপাতা জড় করে আগুন জ্বেলে নিচ্ছে। মৈত্রের ভেতর কি যেন অস্থিরতা। সে বুঝতে পারে না। সে আর যেতে পারে না দূরে, সে জেটিতেই ঘুরে বেড়ায়। তার মনে হয় চারপাশে কি যেন ঘণ্টাধ্বনি, সেই যে কবে থেকে শুনে শুনে একেবারে পাগল হয়ে যাচ্ছে। সে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে, যেন সমুদ্রের নিচে কেউ ঘণ্টাধ্বনি বাজাচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। সামনে আগুন জ্বলছে। ভীষণ কুয়াশার ভেতর দিয়ে সে হাঁটছে। পৃথিবীর সব কিছু এখন অন্যরকমের মনে হয়। কাছের মানুষ ছায়া ছায়া, দূরের কিছু দেখা যায় না। পর্দায় ভেসে আসা একটা মানুষ যেন তার কাছাকাছি ভেসে এল। সে বলল,

ছাঁইয়া। সে তার পাশে এসে বলল, এটা দ্যাখো। আমরা একজন মানুষকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। সে নিষ্ঠুরতার প্রতীক। সেদিন ধরা পড়েও কি করে যে পালিয়ে গেল। এটা ওর ছবি। কেমন ছায়া ছায়া হয়ে ভেসে এল মানুষটা, কুয়াশার মতো ভেসে এল, তারপর আবার মিলিয়ে গেল।

মৈত্র দেখতে পেল, হাতে একটা ছবি। কুয়াশায় একেবারে স্পষ্ট নয়। সে ওপরে ওঠে ফোকসালে আলো জ্বেলে দেখল, ছবিটা যেন চেনা, খুব চেনা। নিচে একটা বড় টাকার ঘোষণা। খুব লোভের। সে ইচ্ছা করলেই ধরিয়ে দিতে পারে। হাতের কাছে এমন সুযোগ!

অথচ তার ভাল লাগছে না কিছু। ক্যাপ্টেন ফ্রক, আইখম্যান হতে পারে, আইখম্যান মৈত্র নিজে ও হতে পারে, অথবা সেই সিফিলিস আক্রান্ত মানুষটি। কেউ যেন কম যায় না। বরং ক্যাপ্টেন ফ্রক এখন একটা কুকুরের প্রাণরক্ষার্থে বনবাসে চলে গেছে। সে যেই হোক, তার আর এ নিয়ে ইচ্ছা নেই কিছু করার। সে জানে, একটু রাত হলে অথবা গভীর রাতে জাহাজে মানুষটা উঠে আসতে পারে। কিংবা কাল, কাল ওরা থাকছে না। চলে যাচ্ছে। ওর ঘুম পাচ্ছিল। সে ওপরে উঠে ফোকসালে ঢুকে গেল। বাংকে শুয়ে পড়ল। অমিয়, ছোটবাবুর সঙ্গে একটা কথাও বলল না।

রাত না পোহাতেই জাহাজ আবার চালু হয়ে গেল। এনজিনরুমে তিনটি বয়লারেই লক্ লক্ করে জ্বলে উঠল আগুন। ফায়ারম্যানদের মুখ লাল হয়ে গেল। ওপরে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা বলে এই স্টোক-হোলডে বেশ গরম এবং এক অনিবার্য সুখ। তখন ওপরে জাহাজের সামনে পেছনে বড় মালোম, মেজ মালোম। জাহাজের দড়ি দড়া সব খুলে দেওয়া হচ্ছে। নোঙর উঠে যাচ্ছে জাহাজের। মাস্তুল থেকে ফ্ল্যাগ নামানো হচ্ছে। কোয়ার্টার মাস্টার জাহাজের পেছনে ইউনিয়ান জ্যাক তুলে দিয়ে গেছে এবং এ-ভাবে ক্রমে জাহাজ জেটি থেকে দূরে সরে যাচ্ছে, ক্রমে প্রপেলার বেশ জোরে ঘুরছে। বন্দর পেছনে ফেলে জাহাজ আবার দূর সমুদ্রগামী হয়ে যাচ্ছে।

তখন সব জাহাজিদের ভীড় উপরে। কেউ নিচে নেই। যারা ওয়াচে নামার তারা নিচে এবং এনজিনরুমে এখন ঘড়ির কাঁটায় মাঝে মাঝে এ্যাস্টার্ণ-এ-হেড অথবা স্লো কখনও ফুল। বন্দর এলাকায় জাহাজটা এ-ভাবে পথ করে ক্রমে সমুদ্রে, গভীর সমুদ্রে নেমে গেলে মনে হয় এক রহস্যময় বন্দর ফেলে ওরা চলে যাচ্ছে। যত বাড়িঘর এবং জাহাজের মাস্তুল দূরবর্তী হয়ে যায় তত এই জাহাজিদের আপ্রাণ চুপচাপ ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা। আসলে এই হচ্ছে জাহাজ, জাহাজের মানুষ। তারা নিরন্তর বন্দর ফেলে চলে যায়। নিরন্তর এক বন্দর ফেলে গেলেই প্রত্যাশা আবার কবে বন্দর পাবে। এবং এই বুঝি নিয়ম জাহাজি মানুষের যা চলে যায়, তার জন্য মায়াও শেষ হয়ে যায়। আবার নতুন মায়া গড়ে ওঠে, এবং স্বপ্ন নানাভাবে, বন্দর এলে কিভাবে যে তাদের দিনগুলো কেটে যায়।

ওরা আবার বন্দরের জন্য দিন গুনতে থাকে।

যেমন ছোটবাবু কয়লায় একটা একটা করে দাগ কেটে রাখে কাঠের পাটাতনে। একটা দিন গেলেই সে দাগ কেটে রাখে—এভাবে তার হিসেব ঠিক থাকে। আবার কখনও ক্যালেণ্ডারের পাতায় কেউ দাগ কাটছে। জ্যাক এভাবে তার দিনের হিসেব রাখে। এবং সে বুঝতে পারে এই জাহাজে প্রায় চার মাসের ওপর তার সময় পার হয়ে গেল। সে যে বয়সে ছিল এখন যেন ঠিক সেই বয়সে নেই এবং স্নান করার সময় সে কি সব টের পায়, আশ্চর্য নরম এক রঙের বৃত্তের মতো বুকের দু'পাশে তার বয়স ক্রমে সজীব হয়ে উঠছে। সে নানাভাবে এইসব সজীবতা থেকে আত্মরক্ষা করতে চেষ্টা করছে। তখনই কেন যে শৈশবের স্বপ্নের মতো এক সুন্দর মুখ তার চারপাশে খেলা করে বেড়ায়। নিজের হাতে তৈরি সে ব্র্যাসিয়ারের ভেতর রুমাল গুঁজে দেয়। এক দুই তিন। এখন ঠিক সে তিনটে রুমাল পর পর ভাঁজ না করে দিলে বুক অসমান থেকে যায়। সে ধরা পড়ে যাবে। অথচ তার মুখে কষ্টের ছাপ। এই ভাঁজ করা রুমাল মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় ছুঁড়ে ফেলে দিতে। সে যেন পারলে ডেক ধরে ছুটে যেতে চায়। এবং বলার আকাঙ্ক্ষা, হে মানুষেরা, আমি মেয়ে। মি গার্ল এবং তখন সত্যি গভীর সমুদ্রে শুধু নক্ষত্রেরা জেগে থাকে এবং দূরে হয়তো কোথাও তিমি মাছের ঝাঁক, জ্যোৎস্না ওদের পিঠে পিছলে যাচ্ছে—কি যে মনোহারিণী এই সমুদ্র! জ্যাক একা ডেকে দাঁড়িয়ে থাকলে এটা টের পায়।

সে এই বিষণ্নতায় বেশি সময় ডুবে থাকতে পারে না। ছোটবাবুর বোধ হয় পরি শেষ। সে ঘড়ি দেখলেই বুঝতে পারে এই ঠিক সময়, এখন ছোটবাবু সিঁড়ি ধরে ওপরে বোট-ডেকে উঠে আসবে। তখন তাঁর ইচ্ছে হয়, লুকোচুরি খেলা, মহামহিম এই ঈশ্বরের জগতে তার, নীরবে কোথাও আড়ালে দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে হয়। ছোটবাবুকে সে ভয় পাইয়ে দিতে পারলে মজা পায়। হয়তো ছোটবাবু ফানেলের গুঁড়ি ধরে ওঠে আসছে তখনও। বনির কি যে কৌতূহল! সে জালিতে মুখ রেখে দেখতে থাকে, উঠে আসছে, উঠে আসছে ছোটবাবু, ছোটবাবু মাথা নিচু করে রেখেছে। ওকে দেখতে পাচ্ছে না। ঠিক ফানেলের পাশ কাটিয়ে যেই না যাওয়া হঠাৎ চিৎকার, হেই। ছোটবাবু বুঝতে পারে জ্যাক। সে ভয় না পেলে জ্যাক আনন্দ পায় না। তখন ছোটবাবু আর কি করে। কেমন ভয়ের অভিনয় করে বলতে থাকে, জ্যাক তুমি! ওঃ কি না ভয় পেয়েছিলাম।

আবার সমুদ্রে সূর্য অস্ত যায়। পিছিল আর আগিল থেকে ফ্ল্যাগ জড় করে ব্রীজে উঠে যায় কোয়ার্টার মাস্টার। রেডিও অফিসার মাংকি-আয়ল্যাণ্ডে দূরবর্তী স্টেশনের খবরের আশায় থাকে। সাদা ফুলশার্ট কালো প্যান্ট পরে জ্যাক একাকী রেলিঙে। চড়ুই পাখি দুটো ওর মাথার ওপর। সমুদ্রে এতটুকু ঢেউ নেই। জলে একটা ফুটকিরি উঠলে পর্যন্ত টের পাওয়া যাচ্ছে। ফ্লাইং ফিসেরা উড়ে উড়ে অদৃশ্য হচ্ছে যখন, অথবা জলে প্রপেলারের ভাঙ্গা শব্দ, অতিকায় জলে ভাঙ্গা ভাঙ্গা শব্দ শুনলে মাছেরা ভয় পেয়ে যেতে পারে। জ্যাক তখনও দাঁড়িয়ে থাকে, ছোটবাবু হয়তো পাখি দুটোর টানে চলে আসবে। কারণ সে তো ইচ্ছে করলেই ছোটবাবুরা যে-দিকটায় থাকে যেতে পারে না। এদের জন্য জাহাজের পেছনটা। তাও ছোটবাবুরা থাকে ডেকের নিচে সিঁড়ি ধরে নেমে গেলে, বেশ অনেক নিচে, অর্থাৎ জাহাজ যখন ত্রিশ-বত্রিশ ড্রাফটে চলে তখন ছোটবাবুদের কেবিন প্রায় জলের নিচে থাকে। ছোটবাবুর কি যে মজা! তার পোর্ট-হোলে কেবল নীল জল চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে নীল জল, সমুদ্রের নীল জল ক্রমাগত ওর পোর্ট-হোলের কাচের ওপরে ভেসে যাচ্ছে। জ্যাক শরীরে আশ্চর্য ঘ্রাণ মেখে এভাবে কখনও কখনও ছোটবাবুর জন্য বোট-ডেকে অপেক্ষা করতে ভালবাসে তখন বড়-মিস্ত্রি কেবিনের দরজা বন্ধ করে পৃথিবীর সব বই যেমন যাবতীয় ঘোস্টস্টোরির ভেতর ডুবে থাকে। সে দরজা খোলে না। ডিনারে খেতে যায় না। তার খাবার তার ঘরে দিয়ে যেতে হয়।

কি যে একটা ভয় বড়-মিস্ত্রির। আগে তবু কখনও কখনও কেবিনের বাইরে বের হতেন। আফ্রিকার বন্দর পার হবার পর থেকে তাও নেই। একদিন কেবল ছোটবাবু দেখেছে, বড়-মিস্ত্রি প্রায় ছুটে এক পায়ে, রেলিঙে দু-হাতে ঝুলে অনেকটা গ্লাইড করে দ্রুত নেমে যাবার মতো, তখন মেজ-মিস্ত্রি ভীষণ হতবাক, চিফ নেমে আসছে। মেজ-মিস্ত্রি দ্রুত ছুটে তাঁর সামনে দাঁড়ালে একটা কথা না। চুপচাপ পকেট থেকে টর্চ বের করে হেঁটে গেছিলেন তারপর টর্চ মেরে ব্যালেস্ট পাম্পের গোড়ায় যে একটা নাট লুজ হয়ে গেছে, এবং এত শব্দের ভেতরও সেই লুজনাটের শব্দ কিভাবে যে তাঁর কানে পৌঁছেছিল তা ভেবে ছোটবাবু একেবারে মনমরা। এতদিনের একটা আপশোস, লোকটার কাজকর্ম নেই, কেবল কেবিনের দরজা বন্ধ করে সারাদিন আহার মদ্যপান বই পড়া, দাবা খেলা, পৃথিবীতে আর কিছু আছে তিনি যেন জানেন না এবং এনজিনের শব্দ ছন্দের মতো বোধ হয় তাঁর কানে বাজে। একটু বেসুরো হলেই টের পান, কোথায় কি গণ্ডগোল! এবং খবরটা মৈত্রকে দিলে বলেছিল, শালা সঙ্গীতজ্ঞ। সেই থেকে কেন জানি ছোটবাবু বড়-মিস্ত্রিকে বড় সঙ্গীতজ্ঞ বাদে কিছু ভাবতে পারে না।

সঙ্গীতজ্ঞ সায়েবটিকে এক রাতে সে দেখেছে বুয়েন-এয়ার্স বন্দরে, চুপি চুপি বের হয়ে যাচ্ছেন। মাথার টাক এত বড় যে পূর্ণিমার চাঁদের মতো বিশাল মনে হয়েছিল, ক্রাচের চেয়ে দু-হাতের ওপর যেন বেশি উনি নির্ভরশীল। বেঁটেখাটো মানুষ, গোল মতো অথচ হাঁটা দেখলে মনে হবে ভীষণ ফিট- বড়ি। সারাদিন বসে বসে এমন ফিট বডি রাখে কি করে! কতবার ভেবেছে, এনজিনরুম থেকে উঠে যাবার সময় একবার পোর্ট-হোলে যা আছে কপালে,

দেখবে—কি করছেন তিনি। এবং একবার সে যা দেখেছিল বিশ্বাসই হয় নি, সাহেব মানুষের এ-সব কি আবার। এবং সে দেখেছিল বড়-মিস্ত্রি চোখ বুজে যোগাসন করছেন।

এ-সব কথা অবশ্য দু-কান করা চলে না। সে কেবল তার মৈত্রদাকে বলেছিল। তখন মৈত্রদা আবার মৈত্রদা হয়ে গেছে। আর গরম নেই। সে বলেছিল, ছোটবাবু, তুমি শেষ পর্যন্ত জাহাজে একটা কেলেঙ্কারি করবে।

সে ভেবে পাচ্ছিল না, কি কেলেঙ্কারি সে করতে যাচ্ছে!

মৈত্র বলেছিল, তোমার ওদিকে যাবার কথা না।

ছোটবাবু বলেছিল, কেন

—কোনদিন ধমক খাবে। সারেঙকে ডেকে বলবে, তোমারা আদমি ইধার কিউ ঘুমতা। অবশ্য ছোটবাবু পোর্ট-হালে উঁকি দিয়ে দেখেনি। আসলে দেখতে সাহস পায় নি। হলে কি হবে কৌতূহল মানুষকে ভীষণ বিপদে ফেলে দেয় কখনও কখনও। ছোটবাবুর বেলায়ও তাই। তখন সকালবেলা। রেডিও অফিসার এরিয়া স্টেশনকে বলে যাচ্ছে—জাহাজের নাম, যেমন প্রতিদিন সকালে করতে হয়, রেডিও-অফিসার সকালের ডিউটিতে যা যা করে থাকে, প্রতিদিন, ইয়েস এস এস সিউল ব্যাঙ্ক অথবা এক কথায় ডেনসিঙ গার্ল অর্থাৎ কি নাম জাহাজের, কোন কোম্পানীর জাহাজ, এসব বলতে হয় না। ডেনসিঙ গার্ল বললেই যেন বলে দেওয়া হয় এটা ব্যাঙ্ক লাইন কোম্পানী, ২১, বারি স্ট্রীট, লণ্ডনের একটি ভাঙ্গা জাহাজ—আর কিছু বলার দরকার হয় না। তারপর কোর্স-লে, নেকস্ট পোর্ট অফ কল, জাহাজের এন আর টি, জি আর টি, এরিয়া স্টেশনকে জানিয়ে দেওয়া এবং বোধ হয় জায়গাটা ছিল চোয়াল্লিশ পয়েণ্ট তিন ওয়েস্ট লঙ্গিচুড এবং বত্রিশ পয়েন্ট আট সাউথ ল্যাটিচুড।

সমুদ্র শান্ত ছিল। জাহাজ খালি বলে তবু সামান্য পিচিঙ ছিল জাহাজে। শীত ছিল না। বরং কিছুটা গরমকালের মতো ব্যাপার! তবে সকালের সমুদ্র এমনিতেই ঠাণ্ডা থাকে। সামান্য ঠাণ্ডা হাওয়া সে-জন্য জাহাজের দড়িদড়া কাঁপিয়ে আমাজন নদীর মোহনায় অথবা গভীর বনাঞ্চলে চলে যাচ্ছে। জাহাজের গতি কিছুটা উত্তর পূর্বমুখী ছিল।

ঘোস্ট-স্টোরি যাদের পড়ার বাতিক, তাদের একটা বিশ্বাস জন্মে যায়, ভূতেরা সর্বত্রই থাকে। এমন কি এই যে এখন জাহাজ গভীর সমুদ্রে, এখানেও ভূত অনায়াসে চলে আসতে পারে! অথবা এইসব জাহাজে, এত দীর্ঘদিনের জাহাজ যখন, যদি ধরা যায় এটা এক সময়ে যুদ্ধজাহাজই ছিল, তবে অসংখ্য মৃত্যু এই জাহাজে ঘটেছে। যাত্রীজাহাজ হলেও রেহাই নেই। ক্রুদের সমুদ্রে আত্মাহুতি তো লেগেই থাকে। সুতরাং যেমন মাছ বাদে জলাশয় হয় না, ভূত বাদে জাহাজ হয় না। আর এই যেন জাহাজ, জাহাজে কতদিন ধরে সব মরা গরু, ছাগল, শুয়োর বরফ ঘরে ঝুলে থাকে। এদেরও প্রাণ থাকে। একবার নর্দানসায়ারে তো একটা গাধা নিয়ে হৈ চৈ। গাধাটা থাকত চার্চের মাঠে। নানারকম পপলার গাছের ছায়ায় গাধাটা ঘুরে বেড়াতো। বে-ওয়ারিশ গাধা—কার গাধা কেউ জানে না। সবাই কখনও না কখনও ওটাকে দেখেছে গীর্জার মাঠে। জ্যোৎস্নায় বেশি দেখা গেছে। এটা যে কেবল ছেলেপুলেরাই দেখে থাকে তাই শুধু নয়, এটা আবাল-বৃদ্ধ-বনিতারা দেখেছে। এটা যে শুধু এ-সময়কার লোকেরাই দেখেছে তা নয়, গত শতাব্দীর লোকেরাও দেখেছে। গাধাটা সেণ্ট জনের গাধা। না দেখে উপায় নেই। কেলেঙ্কারি সেদিনই ঘটে গেল, কার আলু খেত খেয়ে শেষ করে দিচ্ছিল, মালিক তো তেড়ে মারতে যায়—ওমা গাধা হাওয়ায় বিলীন। এবং লোকজন সব চেঁচামেচিতে বের হয়ে এলে ক্ষেতের মালিক অবাক তার একবিন্দু শস্য নষ্ট হয় নি। এসব ঘটনা বড়-মিস্ত্রি হামেশাই শুনে আসছে। অথবা এ্যাশ-ট্রির সেই উইচ মাদারস্টোলের হত্যার হুকুম এবং এ-সব কারণে ভূতেরা অনেক সময় প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে থাকে।

বড়-মিস্ত্রির কি হয়েছে কে জানে আর কেবিন থেকে বের হন না। দরজা বন্ধ করে বসে

থাকেন সারাদিন। পোর্ট-হোল খোলা থাকে কেবল! এনজিনের গণ্ডগোল হলে কেবল এনজিনরুমে হপ্তাহে দু হপ্তাহে মুহূর্তের জন্য দেখা যায়। ছোটবাবু এ-হেন বড়-মিস্ত্রির কেবিনের পাশ দিয়ে যাবার সময় একটা কেলেঙ্কারি করে ফেলেছিল আর কি!

ছোটবাবু ভেবেছিল কিছুতেই সে ওদিকে যাবে না। তবু কি যে আকর্ষণ থাকে। রাত্রে আজকাল অমিয় আপেল ডিম কোথা থেকে নিয়ে আসে। আপেল এবং ডিম ঠিক তিনজন মিলে সমানভাগে খায়। ধারণা ছিল ছোটবাবুর যে, এটা অমিয় স্টুয়ার্ডের কাছ থেকে চেয়ে নিচ্ছে। সুতরাং রহস্য তার জানার কথা না। দুপুররাতে সে যখন ওয়াচ শেষ করে উঠে আসছে তখন কি কপাল, কে বলবে, সোজা স্টোক-হোলডের সিঁড়ি ধরে না উঠে সে এনজিন-রুমের সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে উঠে যাচ্ছে। এ-পথ ধরে সাধারণত ক্রুদের ওঠার নিয়ম নেই। সে, পথ সংক্ষেপ করার জন্য আগে মাঝে মাঝে উঠে যেত। সে-রাতে ওঠার মুখে দেখল, সামনের রাস্তা ব্লক করা। দরজা লক করে দেওয়া হয়েছে। আবার এনজিনরুমে নেমে বয়লাররুম পার হয়ে সিঁড়ি ধরতে হবে। অনেকটা পথ। ডাইনিঙ হলের পাশ দিয়ে একটা গুপ্তপথ আছে। সে ভাবল ওটা দিয়ে স্টাবোর্ডসাইডে নেমে যাবে। অন্ধকারে পথটা অস্পষ্ট। অমিয় সবসময়ই আজকাল একটু দেরি করে উঠে আসে বাঙ্কার থেকে। বোধহয় স্টুয়ার্ডের কাছ থেকে ডিম এবং আপেল চেয়ে নিতে দেরি হয়, অথবা কি অমিয়, গোপনে স্টোররুম থেকে চুরি করে থাকে। ও যা মানুষ সব পারে। জাহাজের একঘেয়েমী খাওয়া সহ্য হয় না। এ-জন্য অমিয়র এমন একটা দুর্ধর্ষ কাজ ওরা মনে মনে তারিফ করে থাকে। ওরা প্রশ্ন করলে, অমিয় ক্ষেপে যায়।

তবে মুসকিল হচ্ছে ডাইনিং হলের ও-পাশের গুপ্তপথের লাগোয়া কেবিনে থাকে সেই বড় মিস্ত্রি। যাকে সে একদিন দেখেছিল শীর্ষাসনে আপেল খাচ্ছে। এখন হয়ত গেলে দেখতে পাবে বই পড়ছে। ওর ধারণা এসব লোকেরা কখনও ঘুমায় না। সারাক্ষণ জেগে থাকে। নাহলে সব এনজিনিয়াররা বড়-মিস্ত্রিকে দেখে ভয় পায় কেন। এনজিনের কোথায় কি গণ্ডগোল মানুষটা যা জানে, আর কেউ তেমন জানে না। অথবা ও বোধহয় জানে, কত তারিখে, কোন সময়ে এনজিনের কোন অংশে ব্রেক- ডাউন হবে। না হলে সঙ্গে সঙ্গে টের পায় কি করে! কি সকালে, কি বিকেলে, কি মধ্যযামিনীতে এ-পর্যন্ত যতবার ছোটবাবু দেখেছে, অবশ্য খুব কমই দেখেছে, কিন্তু সময়ের কোন ঠিক নেই। ওর কেবিনটা ঠিক এনজিনরুমের পাশে। এমন গোলযোগে থেকে থেকে, সারাক্ষণ থেকে থেকে—এই তো জাহাজ যতদিন চলবে, বিশ বাইশ মাস নাগাড়ে, চব্বিশ ঘণ্টা কেবল অতিকায় ঝ্যাকোর ঝ্যাকোর শব্দ। এভাবে একজন সারাক্ষণ শব্দ শুনতে শুনতে—কারণ সে তো দেখেছে এনজিনে এমন শব্দ যে, চিৎকার করে কথা না বললে শোনা যায় না। বেশির ভাগ সময় হাতের ইশারায় কথা বলতে হয়। চার ঘণ্টা ওয়াচ শেষ করে যখন উঠে যায় এনজিনিয়াররা তখন ওদের মানুষ বলে মনে হয় না। শব্দেই হয়তো মাথা ধরে যায়। অথবা মাথার ভেতরে শিরা-উপশিরা যা কিছু থাকে তার নাটবল্টু আম্মা হতে কতক্ষণ।

ছোটবাবু এতসব ভাববার সময় পায় নি। সে এতরাতে এই জায়গায় এসে ফিরেও যেতে পারছে না! কারণ এতক্ষণে হয়তো মেজ-মিস্ত্রি নিচে নেমে গেছে। যে-করেই হোক তাকে এলিওয়ে ধরে আরও কিছুটা এগিয়ে যেতে হবে এবং গুপ্তপথটা আবিষ্কার করতে হবে। খুব একটা পরিচিত নয় পথটা। কেবল একদিন এদিকটায় সে জ্যাকের সঙ্গে এসেছিল। এখানে কেবিনের পাশে পাশে ঘুরে ঘুরে নিচে ওপরে পথ নেমে গেছে। কেবিনগুলো দেখতে সব একরকমের। বোট-ডেকে উঠে যেতে পারলে হত। পাশেই কোথাও একটা সিঁড়ি আছে। কিন্তু সে একটু এগিয়ে অন্ধকারের ভেতর পড়ে গেল। কেউ এখন এদিকটায় জেগে নেই। কেবল একটা ছায়ার মতো দেয়ালের পাশে কেউ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে যেন! বোধহয় এগুলো কাপ্তান-বয়, মেসরুম-বয়ের কেবিন। যাই হোক খুব তাড়াতাড়ি সে আবছা আলো অন্ধকারে

দেখতে পেল অস্পষ্ট এক ছায়ার মতো, কেউ দাঁড়িয়ে আছে। এবং এমন একটা অন্ধকার এলিওয়ো তো কোন বাতি না থাকলে যা হয় কেবল এনজিনের ভৌতিক একটা শব্দে, ওর মাথা কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে অথচ সে সামনের সরুপথটা ধরে না গেলে জাহাজের স্টাবোর্ড-সাইডে পড়তে পারবে না। সেই ছায়াটা ক্রমে লম্বা হয়ে যেতে থাকল। আর ওর চোখ- মুখ শুকনো, ভৌতিক ব্যাপারটা একেবারে মিথ্যা নয়, সে দেখল সেই ছায়া ক্রমে লম্বা হতে হতে ওর পায়ের কাছে নেমে এসেছে এবং সে তখনই চিৎকার করে উঠবে ভাবল, আর মুখে কেউ তখন হাত চাপা দিয়ে প্রায় টানতে টানতে যখন স্টাবোর্ড-সাইডে নিয়ে গেল, তখন সে একেবারে অবাক, অমিয়। অমিয় সামনে দাঁড়িয়ে।

অমিয় বলল, ওদিকে কেন গেছিলি!

ছোটবাবু কিছু বলতে পারল না।

—ও-রাস্তাটা ভাল না। শালা সঙ্গীতজ্ঞ ভূতটুতের ব্যবসা করে।

ছোটবাবু বলল, সত্যি!

—সত্যি! কেউ যায় না।

—কেন যায় না!

—মাঝে মাঝে একটা লম্বা ছায়া দাঁড়িয়ে থাকে।

ছোটবাবুর গা ছম ছম করতে থাকল। দুপুর রাতে এমনিতে জাহাজ ভীষণ ভয়াবহ। অনেকে একা তখন ওপরে উঠতে ভয় পায়। চারপাশে সমুদ্র। কিছু দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারে শুধু কিছু নক্ষত্র। এবং কোনো কেবিনে অথবা ফোকসালে আলো জ্বালা নেই। কেবল ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকে বড় বড় দুটো মাস্তুল। মাস্তুলের দু'পাশে দুটো আলো আর উইংসে আলো। এমন একটা ভয়াবহ ঘটনার সম্মুখীন হয়ে ছোটবাবু জাহাজটা যে সত্যি ভূতুড়ে বিশ্বাস না করে পারল না। এবং সে দেখল অমিয়র হাতে একটা আপেল দুটো ডিম। ছোটবাবু বলল, কোথায় পাস তুই এ-সব। এত রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন কোথা থেকে সব সংগ্রহ করিস!

অমিয় বলল, এত সব জানবার তোমার কথা না! ভাগের ভাগ খাবে। কোন প্রশ্ন নয়।

তারপর ছোটবাবু দেখল অমিয় জামার নিচ থেকে এক টুকরো চকচকে কি বের করছে। ওরা তখন ডেকের ওপর দিয়ে হাঁটছিল। অমিয়র কি যে বাতিক দিন দিন হচ্ছে, লকারটা সে কিছুতেই খুলছে না। যখন সাফাই দেখতে বের হন কাপ্তান তখন তিনি দু-একবার এই লকার বন্ধ করে রাখার রহস্য জানতে চেয়েছেন। অমিয় বলছে, সে চাবি হারিয়েছে। তা তিন-চার মাস হয়ে গেলে সন্দেহের কারণ দেখা দিতে পারে। এভাবে যে অমিয় কি গোপন করছে ছোটবাবু বুঝতে পারছে না। অবশ্য লকার খুলে মাঝে মাঝে অমিয় যে না দেখেছে তাও নয়। অমিয় বয়লার রুমে কয়লা পুড়ে গেলে তার ভেতর থেকে উজ্জ্বল সব ভারি ধাতুপিণ্ড সংগ্রহ করছে। ওর ধারণা যে কি! দেখতে মূল্যবান, কিন্তু এ-সব এত সহজে যদি মিলে যায় তবে, কোলবয় হয়ে পৃথিবীর সবাই গোল্ড-রাশে নেমে যেত। ছোটবাবু এবং মৈত্র এ-নিয়ে রসিকতা করেছে, কিন্তু মনে মনে কষ্ট পাবে ভেবে, চাবিটা পাওয়া যে ঠিকই যাচ্ছে না এমন সমর্থন জানিয়ে এসেছে। আসলে গোটা লকারটাতে সে রেখেছে সব পোড়া কয়লা থেকে কাল্পনিক অমূল্য সব ধাতু। সে এ-ভাবে একদিন ঠিক বড়লোক হয়ে যাবে। স্বপ্নে প্রায় রাজা হবার মতো। এবং ছোটবাবু দেখল আজও অমিয় কিছু সংগ্রহ করে এনেছে। দেখলে সত্যি অমিয়র জন্যে মায়া হয়। অমিয় যেন এ-জন্যই ছোটকে এত তোষামোদ করে থাকে। আপেল খাওয়ায়, ডিম এনে খাওয়ায়। এদের রেশনে যা নেই তা জীবন বাজী রেখে সংগ্রহ করে আনছে।

ছোটবাবু আর কোন প্রশ্ন করল না। কেবল বলল, ঠিক আছে, আর ওদিকটাতে যাব না। সকালে ঘুম থেকে উঠলে ছোটবাবুর মনে হল ওপরে কেউ নাচছে। এবং ঢোল বাজাবার মতো

টব বাজাচ্ছে কেউ। সুর ধরে কেউ গাইছে। সারেঙ দুবার খোঁজ নিয়ে গেছে ছোটবাবুর! ছোট তখনও ঘুমোচ্ছিল বলে ডাকে নি। ওপরে উঠে সে তাজ্জব। অনিমেষ মজুমদার একটা স্লিপিঙ-গাউন পরে মেয়ে সেজেছে। চুলে খোঁপা বেঁধেছে গামছা দিয়ে। আজ রবিবার। ছোটবাবুদের সমুদ্রে রবিবার শনিবার বলে কিছু নেই। ডেক-জাহাজিদের আছে।

ডেক-ক্রুরা আয়াসে চলাফেরা করছে। তাড়াহুড়ো নেই। মেসরুমে ভীড়। বাথরুম থেকে ছোটবাবু বুঝতে পারল অমিয় টপ্পা গাইছে। এ-সব টপ্পা শোনা যায় না। অফিসারের নামে অশ্লীল পদ্য এবং সমে অমিয়, ছোটবাবু ভূত দেখেছে বলে শেষ করছে।

অমিয় বেশ মিলিয়ে টপ্পা তৈরি করতে পারে। ছোটবাবু উঁকি দিলে দেখল, অমিয় বসে রয়েছে, পায়ের নিচে রঙের টব। জানালা দরজায় সব ক্রুদের মুখ। যারা বয়সে বুড়ো এদিকটায় আসছে না। গনি, ছোট টিণ্ডাল, বাদশা মিঞা নামাজ পড়তে এসে ফিরে গেছে। বেশ ময়ফেল জমেছে এবং রঙের টবে ঢোলের শব্দ আর পায়ের ঘুঙুর বেঁধে পুরানো এক স্লিপিং-গাউন মেমসাবের পরে ঘুরে ঘুরে মাথায় হাত তুলে পেছনে হাত রেখে অনিমেষ মজুমদার নাচছে। কেউ ওকে জড়িয়ে ধরে কামড়ে দিতে চাইছে। কেউ ওর হাত ধরে চুমু খাচ্ছে এবং পয়সা দিচ্ছে। সে তারপর ঘুরে ঘুরে ডেকে নেচে বেড়াল। এবং চারপাশে এই যে সমুদ্র, জাহাজ দিনরাত ভেসে চলেছে, তার ওপর অনিমেষ এ-ভাবে একটা মেয়ে সেজে তামাসা দেখাল, কে কত দেবে ঠিক হল। তার বিনিময়ে কেউ ঠেলে ঠেলে নিয়ে গেল ফোকসালে, নাও, এবারে লিখে নাও, বন্দরে এলে অনিমেষকে এ-টাকাটা দিতে হবে। একসঙ্গে যা টাকা জমবে, তা দিয়ে উৎসবের মতো জাহাজে, একেবারে কিনার থেকে তাজা মুরগি কিনে আনবে সারেঙ, তারপর পিকনিকের মতো ব্যাপার। অনিমেষ সং সেজে টাকা তুলে দিচ্ছে ডেক-সারেঙকে।

আসলে এই সং সাজার ভেতর অনিমেষ কেমন আনন্দ পায়। সে আবিষ্কার করেছিল, ডেক- টিণ্ডাল বুনোসাইরিসের পুরানো বাজার থেকে বিবির জন্য একটা সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড স্লিপিং-গাউন কিনে এনেছে। সবাই যা আনে বাজার থেকে, পাশাপাশি সবাইকে খুলে দেখায়। কিন্তু ডেক-টিণ্ডাল অন্য রকমের। সে গোপনে তুলে রাখার সময় ধরা পড়েছিল। অনিমেষ তারপর বেশ সং সেজে ফেলল রাতে। রাত নটায় সে ঘুরেছে মেয়ে সেজে। সকালেও মেসরুমে মেয়ে সেজে বেশ পয়সা কামিয়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু ছোটবাবু ভূত দেখেছে এটাই ছিল বার বার এক কথা। ছোটবাবুকে সারেঙ ডেকে সাবধান করে দিয়েছেন, তোকে ছোট কত করে বলব, তুই যে কেন একা উঠে আসিস! এবং সারেঙ যেন ছোটকে কি বলতে গিয়েও বলতে পারেন না। কেবল একসময় না বললেও যেন নয়, এমন ভেবে মুখ কাছে এনে বললেন, জাহাজে কত সব অদ্ভুত ঘটনা ঘটে। তুই সবচেয়ে কম বয়সের জাহাজি। কখন কি ঘটবে বলা যায় না। রাত বারোটায় কে তোকে একা একা এনজিন রুম থেকে উঠে আসতে বলেছে। মৈত্র মশাই কোথায় থাকে! জব্বার, অমিয়? তুই একা একা আসবি না। দুপুররাতে কেউ জাহাজে একা ঘুরে বেড়ায় না।

ছোটবাবুর খুবই বিশ্বাস সারেঙকে। তিনি তাকে হাতে ধরে জাহাজে নিয়ে এসেছেন। ওদের এখন ওয়াচের সময় হয়ে যাচ্ছে। জাহাজ কেমন নিরিবিলি যাচ্ছে। রোদ গ্যালিতে এসে পড়েছে। যত বেলা বাড়বে রোদ গ্যালি থেকে সরে যাবে। এবং কেউ কেউ রেলিঙের ধারে বেঞ্চিতে বসে সমুদ্র দেখছে, চর্বিভাজা রুটি খাচ্ছে। এবং ভূত নিয়ে ক্রুদের ভেতর কথাবার্তা। কোন কোন জাহাজে ভূতের উপদ্রব সত্যি ছিল ক্রমে তাও কথায় কথায় চলে আসছে। এবং একবার যে একটা জাহাজ-ভূত ছিল সাউথ-সিতে তার গল্প। এখন তো শোনা যাচ্ছে সে রাস্তায় আর কেউ জাহাজ চার্টার করে না। কোর্স- লে পাল্টে দিয়েছে। ছোটবাবু সারেঙের কথাবার্তা শুনে বুঝেছে, মধ্যরাতে একা ওর সত্যি ঘুরে বেড়ানো ঠিক না। গতকালের ঘটনার পেছনে সে কোনো কার্য-কারণ খুঁজে পাচ্ছে না। অথচ চোখের ওপর ঘটনাটা দেখেছে। এবং হতবাক হয়ে গেছে।

তখন কাপ্তান ফল আর এক-কাপ কফি খাচ্ছিলেন। তখন জ্যাক নিজের কেবিনে ফল, দু স্লাইস স্যাণ্ড-উইচ এবং কফি খাচ্ছে। জ্যাকের পায়ের কাছে পাখি দুটো। জ্যাক আজ কাজে বের হয় নি। দেরি করে ঘুম থেকে উঠেছে। রাত হলে, যখন সত্যি গভীর রাত হয়, এবং ডগ-ওয়াচের ঘণ্টায় ওর ঘুম ভেঙ্গে যায়, তখন নিভৃতে খুব দামী দামী স্কার্ট এবং সুন্দর সব গাউন পরে নিভৃতে বসে থাকে। আয়নায় প্রতিবিম্ব ভাসে। চুল আরও বড় হলে ওর মুখ আরও সুন্দর দেখাত। যা আছে তাই দিয়ে চুলটাকে পেছনের দিকে সামান্য ফাঁপিয়ে রাখে। এবং হাত দিয়ে, দু-হাত দিয়ে চুলের চারপাশটা চেপে চেপে সে তার মায়ের মতো দু-পাশে দুটো ক্লিপ এঁটে দেয়। তারপর দু-হাত দু-দিকে ডানার মতো মেলে দেয়, উঠে দাঁড়ায়। রেকর্ডপ্লেয়ারে সুন্দর রিন-রিন্ করে বাজনা বাজে, কখনও স্লোভাক লোকসঙ্গীত অথবা এক অবিরাম সঙ্গীতের মতো যেন কোন গীর্জায় কেউ ঝম্ ঝম্ করে পিয়ানোর রিডে হাত চালাচ্ছে। সে নিজের মতো কোনও ব্যালেগার্লের ছবি শরীরে ফুটিয়ে ধীরে ধীরে একা একা নাচে। একা একা সে টো-এর ওপর ঘুরতে ঘুরতে কোনও দূরবর্তী সরোবরের নীলপদ্ম হয়ে যায়। ওর শরীরে থাকে তখন আশ্চর্য ঘ্রাণ। রাত বারোটায়, জাহাজে সবাই যখন ঘুমিয়ে থাকে তখন সারা জাহাজে এক মূল্যবান সুগন্ধি ছড়িয়ে যায়। কেবিনে কেবিনে, ফোকসালে ফোকসালে গন্ধটা ভেসে বেড়ালে শরীরে আকাঙ্ক্ষা জন্মে। সমুদ্র আর ভাল লাগে না। কবে যে জাহাজ আবার বন্দর ধরবে!

সকালে ঘুম ভাঙলেই জ্যাকের কাজ, সব পোশাক শরীর থেকে খুলে ফেলা। সে তার পোশাক খুলে বড় একটা ট্রাঙ্কে রেখে দেয়। সুন্দরভাবে রেখে দেয়। ভাঁজ করে, যেন ভাঁজ নষ্ট না হয়, কারণ বাবা তার পোশাক কিনে আনার সময় খুব গোপনীয়তা রক্ষা করেন। বনি রাতে নিজের পোশাকে সাদা চাদরের নিচে শুয়ে থাকতে ভালবাসে। তিনি তা বোঝেন। তবু খুব সতর্ক থাকতে হয়। বনিকে তিনি সব বলে দেন। তখন বনির কান্না পায়। সে আর এ ভাবে পুরুষ সেজে থাকতে পারছে না। ছোটবাবু কি যে, বোকা! কিছুতেই বোঝেনা সে মেয়ে। সে তো ছোটবাবুর পিঠে পিঠ লাগিয়ে এক দুপুরে বাংকারে বসে গল্প করেছিল। কি যে সুন্দর আর তরুণ সন্ন্যাসীর মতো অথবা মনে হয় মহান বৃক্ষের ছায়ায় সে তখন দাঁড়িয়ে। ওর ইচ্ছে, যেমন বাবা জানে সে মেয়ে, ছোটবাবুও জানুক সে মেয়ে। পৃথিবীতে আর কারো কাছে ধরা না দিলেও ক্ষতি নেই। যত জাহাজের দিন যাচ্ছে বনি তত পাগল হয়ে যাচ্ছে এবং যখন কিছু ভাল লাগে না, সাহসে কুলায় না, কিছু একটা করে ফেলতে, তখন রাতে মধ্যরাতে সে রেকর্ড-প্লেয়ারে সব মহান সঙ্গীতজ্ঞদের মিউজিক বাজিয়ে চলে। পৃথিবীর সবচেয়ে দামী পোশাকে সে একা একা নাচে। তার সঙ্গে থাকে তখন ছোটবাবু। কল্পনায় সেই ছোটবাবুকে ← তার পাশে রাখে কোন যুবক ব্যালে-ড্যানসারের মতো। ছোটবাবুর চওড়া কাঁধ, সোনালী অথবা নীলরঙের দাড়ি গোঁফ এবং শক্ত হাতের ভাঁজে এক পা তুলে নিজের সব কিছু অর্পণ করে দেবার ভিতর কি যে আকুলতা! বনির এই অস্থিরতা ওর চোখ মুখে ভাসে। সে কখনও শুয়ে থাকে নরম বিছানায়। সাদা মোমের মতো পা, হাতে নীল শিরা উপশিরা, গোলাপী রঙের স্তনে হুল ফোটালে রোমকূপে বিন্দু বিন্দু ঘাম। সে এ-ভাবে আর পারে না।

পারে না বলেই সকালে সে বার বার দরজা খুলে উঁকি দিয়েছে, কখন ছোটবাবু আসবে। সে তার বয়লার সুট পরে দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। তাকে সে আজ একটা কথা বলবে। বলবে, আমি মেয়ে, ছোট, মি গার্ল। এবং সে প্রতিদিন এটা ভেবেছে বলবে, তুমি কাউকে বল না, বললে, বাবা আমাকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দেবে, দেশে পাঠিয়ে দেবে। পরিচারকদের হাতে আমায় নির্বাসন দেবে। তুমি কিন্তু বল না। কেবল তুমি জানবে, আমি মেয়ে। আর কেউ না। হ্যাঁ আর জানে চিফ অফিসার। তিনি আমার আংকল। তিনি এবং বাবা আমার কাছে সমান।

ছোট যখন বোট-ডেকে উঠে এল, তখন জ্যাক ফানেলের গুঁড়িতে কিছু একটা করছে। আসলে এটা অজুহাত, ফানেলের গুঁড়ি ধরে ছোট সবার পরে এনজিন রুমে নেমে যাবে। এখনই ঠিক সময় এবং কি ভেবে জ্যাক ডাকল, ছোট!

তখন জাহাজের চিমনির ছায়া বেশ লম্বা হয়ে সমুদ্রে ভেসে গেছে। ধোঁয়া ব্রীজের ওপর

দিয়ে সামনে কিছুটা এগিয়ে আবার উত্তর-পূব মুখি ভেসে যাচ্ছে। নীল সমুদ্রে এই ধোঁয়া কিছুটা ছায়া ফেলে এগিয়ে যাচ্ছে, এবং তাজা রোদ বলে সমুদ্রের নীল রঙ কেবল সোনালী বর্ণমালায় সেজে চারপাশের অসীমতায় ডুবে যাচ্ছে। এমন যখন জাহাজের চারপাশের বর্ণমালা তখন ছোট দেখল, চিমনির পাশে উইণ্ডসেলের নিচে জ্যাক দু-হাঁটুর ভেতর থেকে মুখ তুলে ওকে দেখছে! উইণ্ডসেলের ছায়ায় জ্যাকের মুখ ভীষণ দুঃখী অথবা ভীতু দেখাচ্ছে। সে ছোটকে কী বলতে গিয়ে বলতে পারল না। ছোট তখন ডাকল, জ্যাক।

জ্যাক বলল, কাজে যাচ্ছ?

ছোট মাথা হেলাল। এটা জ্যাক জানে, এখন ছোটবাবু বয়লার রুমে নেমে যাচ্ছে। জ্যাক যে কি করে বলবে, আমার কেবিনে তুমি এস! তার খুবই সংকোচ বলতে পারে না। সে বলল, বারোটার পর কি করছ?

—স্নান করব। খাব। তারপর ঘুমোব

—কখন উঠবে?

—চারটে বাজতে পারে, পাঁচটাও বাজতে পারে।

—পাঁচটায় আমার কেবিনে আসবে। তখন কেউ ওপরে থাকবে না।

ছোট কেমন ঘাবড়ে গেল। জ্যাকের কেবিনে ও আর যেতে পারে না। ওদিকে ক্রুদের যাবার নিয়ম নেই। গেলে কথা উঠতে পারে। সে সহজেই বলে ফেলতে পারল না, যাব। একবার গিয়ে সে যা ফ্যাসাদে পড়ে গেছিল!

জ্যাক বলল, কাউকে বলবে না তুমি আসছ। দরজার পাশে আমি দাঁড়িয়ে থাকব। তুমি এলেই দরজা বন্ধ করে দেব। কেউ টের পাবে না।

ছোট বলল, কেউ দেখে ফেললে!

—কে দেখবে! এদিকে তখন কেউ আসে না।

এটা সত্যি, তখন এ-দিকটা খুবই ফাঁকা থাকে। ক্যাপ্টেন তখন ব্রীজে উঠে যান। কাপ্তান-বয়কে ডেকে না পাঠালে সে যেতে পারে না তখন। ডিউটিতে যে কোয়ার্টার মাস্টার থাকে সেও নামে না। কাপ্তান ব্রীজে থাকলে সবাই খুব মনোযোগী হয়ে যায় কাজে। ছোটবাবু টুপ করে নিচে ডুবে যাবার আগে কি ভেবে যে বলে ফেলল, যাব। তারপর আর দেখা গেল না। জ্যাক আবার উইণ্ডসেলে হেলান দিয়ে বসে থাকল। তার এখন আর উঠতে ইচ্ছে করছে না। বসে বসে কেবল সমুদ্র, দূরের কোথাও কোন সবুজ দ্বীপ ভেসে উঠবে এক্ষুনি, এ সব ভেবে বসে বসে অনেকটা সময় কাটিয়ে দিল। ওর চোখ আনন্দে এবং উত্তেজনায় চিকচিক করছে। ছোটবাবু তার কেবিনে আবার আসছে, আনন্দে ওর চোখে জল এসে গেছে।

॥ পনের ॥

জ্যাক অনেকক্ষণ এ-ভাবে বসে থাকল। সূর্য মাথার ওপরে উঠে আসছে। আকাশে কোন মেঘের আভাস নেই! জাহাজটা দুরন্তগতিতে জল কেটে যাচ্ছে। দু'পাশে জাহাজের জলকণা উড়ছে। জাহাজের দু'পাশে অজস্র বুদবুদ ওঠে ভেঙে যাচ্ছে। অনেক দূরে সে দেখতে পাচ্ছে জলের একটা সরল রেখা ক্রমে সমুদ্রের অতল থেকে উঠে আসছে এবং টগবগ করে যেন ফুটছে। প্রপেলারের ধাক্কায় জলরাশি ভেঙে খান খান হয়ে যাচ্ছে। দুটো একটা সামুদ্রিক মাছ মরে ভেসে উঠছে। কোথা থেকে কিছু ছোট ছোট পাখি আবার উড়ে এসে সে-সব খাচ্ছিল! জ্যাক কেমন আনমনা হয়ে গেছে সে-সব দেখতে দেখতে।

এবং তখনই মনে হল পেছনে কেউ ডাকছে তাকে। দেখল, বাবা তার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। একা একা সমুদ্রে এভাবে ঘুরে বেড়াতে বোধ হয় মেয়েটার ভাল লাগছে না। এখন স্নানের সময় জ্যাককে তিনি মাঝে মাঝে সব মনে করিয়ে দেন। জ্যাক কোন কারণেই একটু অগোছালো হতে পারে না। এ-কমাসে জ্যাক আরও বড় হয়ে গেছে। জ্যাকের চুল আবার বড় হয়ে গেছে। জ্যাকের চুল কাটার সময় তাঁরও মনের ভেতর তোলপাড় করে ওঠে। কি সুন্দর নীলাভ চুল। সারা মাথা ঢেকে রয়েছে। ঘাড় পর্যন্ত চুল এসে নেমেছে। মসৃণ নরম উলের মতো চুলে হাত দিলেই অনেক স্মৃতি এসে তাঁকে তোলপাড় করে দেয়।

এবং তিনি যেন বুঝতে পারেন তাঁর যৌবনে প্রথমা স্ত্রীর চুলে ছিল এমনি সুন্দর সব বর্ণমালা। স্ত্রীর মুখ মনে হলেই কেন জানি মনে হয়, তিনি ওকে অবিশ্বাস করে ভুল করেছেন। আসলে যৌবনে মেয়েরা তো একটু চঞ্চল থাকবেই। চিরদিনই তাঁর মনে হয়েছে ভাঙা জাহাজের তিনি কাপ্তান। সব সময় উদ্বেগ, জাহাজ বন্দরে না পৌঁছানো পর্যন্ত। ভীষণ তিনি সজাগ। স্ত্রীর প্রতি তাঁর কর্তব্য রয়েছে সেটা তিনি ভুলে যেতেন। এই জাহাজ, তাঁর সব কিছু তখন। একটা পাগলা জেদি ঘোড়ার মতো জাহাজটা সমুদ্রের ঝড় সাইক্লোন কাটিয়ে যখন নিরিবিলি শান্ত আকাশের নিচে এসে দাঁড়াত তখন তাঁর মনে থাকত না যে কে তাঁর বেশি আপন। তাঁর স্ত্রী না এই জাহাজ! বোধ হয় তাঁর স্ত্রী এলিস এটা বুঝতে পারত। হিগিনস ওর জন্য একেবারেই সময় দিতে পারছেন না। সারাক্ষণ চার্ট-রুমে বড় টেবিলে ঝুঁকে অথবা কখনও সব ওসেনোগ্রাফির ভেতর এই জাহাজের নিরাপদ আশ্রয়ের কথা ভেবে বুঁদ হয়ে থাকতেন। মনে মনে এলিস এটা পছন্দ করত না। ভাবত বুঝি, তবে এত কষ্ট করে মানুষটার সঙ্গে সমুদ্রে আসা কেন।

কখনও জ্যোৎস্না রাতে এলিস খুব সেজে ওঁর চার্ট-রুমে ঢুকে যেত।—কি হল! এই যাচ্ছি। এলিস কেবিনে অথবা বাইরের ডেকে একা একা পায়চারি করে ক্লান্ত হত। মানুষটার কাজ কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। এত কি যে কাজ! এমন অসীম নীল সমুদ্রে একটু পাশাপাশি বসে সামান্য মদ আর মাংসের রোস্ট। নক্ষত্রেরা মাথার ওপর দুলছে। এ-হেন সময়ে মানুষটার চার্ট-রুমে কেবল কাজ। কেবল বই ঘেঁটে ঘেঁটে দেখা। রিপোর্ট লেখা। জাহাজের হাল তবিয়ত কেমন যাচ্ছে তার একটা বিবরণ প্রতিদিন লগবুকে রাত জেগে লিখে রাখা। যেন জাহাজটাই মানুষটার কাছে সব, এলিস তাঁর কেউ নয়। তখন বোধহয় এলিসের ভীষণ অভিমান হত। চোখে জল আসত। সে যে এমন সুন্দর পোশাকে অপেক্ষা করছে মানুষটার জন্য তার দাম দিতেন না তিনি।

স্যালি হিগিনস আরও সব মনে করতে পারেন এবং এ-সব মনে হলে তিনিও ভুলে যান বারোটায় লাঞ্চ সাজানো হচ্ছে ডাইনিং হলে। ভুলে যান, তাঁর পায়ের কাছে চুপচাপ বসে রয়েছে বনি। বনি এখন নানাভাবে স্বপ্ন দেখতে পারে সে-সবও ভুলে যান। যেমন ভুলে যেতেন, জাহাজে অন্য সুন্দর সব যুবকেরা যাদের কাজ এনজিনে অথবা ডেকে, যারা অফিসার জাহাজের, তাদের একঘেয়ে সমুদ্রযাত্রা ক্যাপ্টেনের সুন্দরী স্ত্রী অনেকটা লাঘব করে

দিচ্ছে। ফাঁক পেলেই তারা এলিসের চারপাশে ঘুরঘুর করছে। দুটো একটা কথা বলার জন্য সারাদিন স্বপ্ন দেখছে। এখন যেন তিনি সব বুঝতে পারেন। বয়স হলে সবার সব দোষত্রুটি সহজেই ক্ষমা করে দেয়া যায়। এবং নিজেকেই সব কিছুর জন্য দায়ী ভাবতে বেশি ভাল লাগে।

তিনি মেয়ের মাথায় আঙুল চালিয়ে বললেন, চুল আবার বেশ বড় হয়ে গেছে।

বনি জবাব দিল না।

—চুল কাটবে না?

—না বাবা।

কি করুণ সেই স্বর বনির!

হিগিনস আবার বললেন, কেন?

—চুল কাটতে আমার ভাল লাগে না বাবা।

—কিন্তু জাহাজ যে খুব খারাপ জায়গা বনি!

হিগিনস মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু আর বলতে পারলেন না।—ওঠো। বারোটা বাজবে এবার।

—তুমি যাও আমি যাচ্ছি।

আসলে বনি বসে আছে ছোটবাবুর জন্য। এখানে বসে থাকলে অনেক নিচে, সেই স্টোকহোলডে উঁকি দিলে ছোটবাবুকে দেখা যায়। ছোটবাবুকে দেখার একটা নেশা হয়ে গেছে বনির। বনি জানে ছোটবাবু এখন বাংকারে। খুব সন্তর্পণে কান সজাগ রাখলে শোনা যায় ছোটবাবুর গাড়ি টানার শব্দ। গাড়ি এনে সুটের মুখে উপুড় করে দিচ্ছে। ছোটবাবু উঠে এলে আর একবার মনে করিয়ে দিতে হবে।

ছোটবাবু উঠে এলে সে ফের বলল, মনে আছে তো।

—খুব।

সে এবার আনন্দে শিস দিয়ে উঠল। ছেলেদের পোশাকে থেকে থেকে সে ছেলেদের মতো শিস দিতে শিখে গেছে। সে মাঝে মাঝে শিস দিয়ে গান গায়। পায়ে তাল ঠুকতে থাকে —অথবা কেবিনে পোশাক পাল্টানোর সময় সে পায়ে তাল দিয়ে গান গায়। তার মনের ভেতর থাকে অজস্র দুষ্টুমী বুদ্ধি। ছোটবাবু কেবিনে এলে সে কি কি করবে, এবং ছোটবাবুকে কি কি ভাবে হতবাক করে দেবে এ-সব ভাবতে ভাবতে সাওয়ারের নিচে দাঁড়িয়ে যায়। নরম শরীরে, এবং কি যে কোমল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, সে নরম হাতে সারা শরীরে দামী সাবান বুলিয়ে দেবার সময় অজস্র ফেনা এবং নাভির নিচু অংশে সোনালি রেশমের মতো বিজবিজে এক আরামদায়ক ঘটনা। কি যে হচ্ছে সব শরীরে, যত এমন সব হচ্ছে তত ছোটবাবুর জন্য মায়া তার বেড়ে যাচ্ছে।

ডাইনিং হলে সবাই দেখল জ্যাক ভীষণ চঞ্চল। ওর চোখ দুটো ভীষণ উজ্জ্বল দেখাচ্ছে আজ। সে উত্তেজনায় ভালভাবে খেতে পর্যন্ত পারল না। দেখলেই মনে হয়, জ্যাকের জীবনে চরম কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। অথচ কি সেটা জ্যাক নিজেও বুঝি ভালভাবে জানে না।

ঠিক চারটে ত্রিশে ঘুম থেকে উঠে মনে হল ছোটবাবুর, কোথাও আজ তার যাবার কথা! জ্যাক তাকে ডেকেছে। গোপনে যেতে বলেছে। কেন যে জ্যাক ডাকল! যত সময় এগিয়ে আসছে তত বুক কাঁপছে! সারেঙসাব বার বার বলেছেন, ছেলে, জাহাজ খারাপ জায়গা। সাবধানে চলাফেরা করবে। জ্যাক তাকে আবার কোনো বিপদে ফেলবে না তো! জ্যাকের দুষ্টুবুদ্ধি তাকে কোনো বিপদে ফেলবে না তো! এখন অবশ্য কিছু সে করতে পারে না। জ্যাককে কথা দিয়েছে, শুধু কথা কেন, জ্যাক তাকে আদেশ করতে পারে। জ্যাক যা যা বলবে সে তা করতে বাধ্য। ইচ্ছে করলে জ্যাক ওকে একটা ক্লাউন বানিয়ে ফেলতে পার। সে

তখনও কিছু বলতে পারবে না।

সে তার সবচেয়ে ভাল পোশাক বের করল। কিন্তু জ্যাক গোপনে যেতে বলেছে। ভাল পোশাকে গেলে জাহাজিদের মনে সংশয় দেখা দিতে পারে, জাহাজ সমুদ্রে, বন্দর কবে পাবে ঠিক নেই, এখন থেকেই সাজগোজ করে বসে থাকা! সুতরাং সে পরেছে একটা হাফ-হাতা সিল্কের গেঞ্জি। নানারকমের ছবি গেঞ্জিতে। যেমন কোথাও উট অথবা বাঘের ছবি আবার কোথাও জলের মাছ ডাঙায় লাফিয়ে পড়েছে। আবার কোনো বনাঞ্চলের ছবি, ছোট্ট একটা মেয়ে—হাতে তার খেলনা, সে বসে আছে গেঞ্জির নিচু দিকটায়। এবং এ-ভাবে সে তার গেঞ্জিতে পৃথিবীর যাবতীয় জীবজন্তু নিয়ে যখন সত্যি হাজির তখন ঠিক ঘড়ির কাঁটায় পাঁচটা বাজে। সে দেখল কেবিনের দরজা বন্ধ। সে পরেছে কালো রঙের প্যান্ট। কালো রঙের প্যান্ট পরলে ছোটবাবুকে কেমন বেশি লম্বা দেখায় বেশি সাহসী দেখায়। সে চারপাশে সতর্কভাবে তাকাচ্ছে। কেউ দেখছে কিনা। না কেউ নেই। সে ধীরে ধীরে দরজায় কানপেতে ডাকল, জ্যাক, আমি ছোটবাবু। তুমি আমাকে আসতে বলেছিলে।

আর আশ্চর্য, দরজা সামান্য ঠেলে দিতেই খুলে গেল। ভিতরে কোন আলো জ্বালা নেই। চারপাশটা কেমন অন্ধকার লাগছে। সে বুঝতে পারছে না, ভেতরে সত্যি কেউ আছে কিনা। পোর্ট-হোলের কাচে পর্দা টানানো। বাইরের এতটুকু আলো কেবিনে আসতে পারছে না। জ্যাক কোথায়! সে ভয় পেয়ে গেল। সে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। জ্যাক কি তাকে ছেলেমানুষের মতো আড়ালে দাঁড়িয়ে হেই করে উঠতে চায়, ভয় দেখাতে চায়। দেয়ালে তেমনি নীল রঙের লাইফ বেল্ট, বাংকের মাথায় সোনালী লাইফ-জ্যাকেট দুলছে।

সে আবার ডাকল, জ্যাক তুমি কোথায়!

কোন উত্তর নেই।

সে এবার বলল, জ্যাক আমাকে ভয় পাইয়ে তোমার কি লাভ!

এবার মনে হল কেউ খুব ধীরে ধীরে বলছে, আমি এখানে ছোট।

ছোট তবু বুঝতে পারল না জ্যাক কোথা থেকে কথা বলছে। কেবিন আর ততটা অন্ধকার মনে হচ্ছে না। দামী মেহগিনি কাঠের বাংক। বাংক না বলে দামী খাট বলাই ভাল। দু'জন অনায়াসে পাশাপাশি শুতে পারে। পাশে আর একটা বাংক—মোটা তোয়ালে বিছানো। ডানদিকে কাঠের বড় আলমারি। আলমারির ওদিকটায় সে আর একটা দরজা দেখতে পাচ্ছে। ওটা বোধ হয় বাথরুমের দরজা। সুন্দর ক্যালেণ্ডার দেয়ালে। তারিখের ওপর লাল দাগ। সব এখন স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জ্যাক তখন আবার ওকে বলছে, আমি এখানে।

তারপর ছোট দেখল ক্রমে একটা আলো ফুটে উঠছে কেবিনের ভেতর। ক্রমে কেমন দিনের বেলার মতো, ঠিক ঠিক দিনের বেলা বললে ভুল হবে, পুজো মণ্ডপে যে রঙিন আলো থাকে তেমনি এবং এ-ভাবে এক মায়াবী জগৎ গড়ে তুলে কি যে লাভ জ্যাকের। সে এবার এক পা এগিয়ে গেলে দেখতে পেল, দেয়ালের নতুন ক্যালেণ্ডারে এক বালিকার ছবি। ঠিক বালিকা বলা যাচ্ছে না, কেমন ব্যালে-গার্লের মতো। বালিকা মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। চোখ দেখা যাচ্ছে না, নরম নীলাভ চুলে প্রজাপতি আঁটা ক্লিপ। সাদা রিবন। এবং গলায় মুক্তোর মালার মতো পবিত্রতা চারপাশে ঘিরে আছে। সে হতবাক। সে কি বলবে ভেবে পেল না। আসলে এই জ্যাক, না এটা কোন যাদুকরের ছবি, সে নিজেকে ঠিক বিশ্বাস করতে পারছে না। বার বার চোখ মুছে বলছে, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তুমি কোথায় জ্যাক। দোহাই তুমি আমাকে ভয় পাইয়ে দিও না। আমি কিন্তু দৌড়ে পালাব।

বনি নিজের ভেতর তন্ময় হয়ে আছে। সে কিছুতেই এমন পোশাকে চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। সাদা সার্টিনের ফ্রক, হাঁটু পর্যন্ত ফ্রক নেমে গেছে, ফ্রকে নানা বর্ণমালা অথবা চাঁদমালা বলা যায়, এবং পায়ে সে পরেছে সাদা দামী হাবসী লেদারের সু এবং দামী মোজা ওর পায়ের চারপাশটা কি যে আশ্চর্য স্নিগ্ধ করে রেখেছে! সে বলল ছোট আমি এখানে।

ছবিটা তবে কথা বলছে! সুন্দর ঘ্রাণ শরীরে। সেই যে মহার্ঘ ঘ্রাণ ওরা মাঝে মাঝে জাহাজে পায়, তেমনি এক ঘ্রাণ! সে বলল, তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না জ্যাক। তুমি কোথায়!

জ্যাক এবার দুপা এগিয়ে এল এবং মুখ তুলে দাঁড়াল। যেন, এই যেন আমি, আমি বনি, আমার কিছু আর ভাল লাগে না। সমুদ্রে আমি ভীষণ একা। এবং এ-সব কথা সে একটাও উচ্চারণ করতে পারল না। আর তখন কেমন নেশার মতো ছোটবাবু কাছে এগিয়ে যেতে যেতে সহসা হা-হা করে হেসে উঠল, জ্যাক তুমিও! জ্যাকের ট্রাপে সে কিছুতেই পা দিচ্ছে না। জ্যাক তাকে সত্যি ক্লাউন বানিয়ে দিতে চায়। সাধারণ কার্গো জাহাজে মেয়ে দেখা ভূত দেখার সামিল। সে বলল, তুমিও! অমিমেষের মতো মেয়ে সেজে মজা করছ জ্যাক। ঠিক না। সঙ্গে সঙ্গে সারেঙসাবের কথা মনে হল। বলল, আমি যাচ্ছি জ্যাক। তুমিও অনিমেষের মতো দেখছি ঠিক ফলস্ পরে.....দ্যাটস ভেরি আগলি।

সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ। বনি প্রায় হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল। যেন সে অনেক কষ্টে তার অসম্মান হজম করছে। এবং ধীরে ধীরে আঙুল তুলে দরজার দিকে দেখাল, প্লিজ ইউ গো।

এবং প্রায় দৌড়ে বের হয়ে যেতে দেখা গেল ছোটবাবুকে। ছোটবাবু হাঁপাতে হাঁপাতে পিছিলে এসে দাঁড়ালে সবাই ওকে ঘিরে দাঁড়াল। ভূত দেখলে যেমন মুখের চেহারা হয়, ঠিক তেমনি, শূন্য দৃষ্টি। সবাই নানাভাবে প্রশ্ন করলেও একটাও কথা বলতে পারছে না ছোটবাবু। সে এ-সব কাউকে বলতে পারে না। জ্যাক সত্যি এবার তবে ওর পেছনে লেগে গেল। সে এখন কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

আর তখনই জ্যাক নিজের পোশাকে বাইরে বের হয়ে এল। সে পরেছে আজ নীল রঙের ঢোলা সার্ট। সে পরেছে শিকারীর বেশ, এবং সে পাখি দুটোর পেছনে প্রায় ছোটখাটো অরণ্যদেব হয়ে গেছে! জাহাজের এ-দড়ি ঝুলে, কখনও বোট ডেক থেকে ফল্কায় নেমে আসছে। আবার লাফিয়ে উইনচে উঠে যাচ্ছে। আবার কখনও আরও ওপরে। সে যেন এখন পাখি দুটোকে না ধরতে পারলে বাঁচবে না। সে সিঁড়ি বেয়ে মাস্তুলের ডগায় উঠে গেল। যত ছোটবাবু এমন দেখছে তত তাজ্জব বনে যাচ্ছে। সে ভাবল এখন পালিয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। এবং তখনই হাঁক, হেই ছোট, কাম-অন।

সে কাছে গেলে বলল, গেট দ্যাট বার্ড।

ছোট দেখল, জ্যাক মিসেস প্যারোর দিকে হাত তুলে দেখাচ্ছে।

ছোটবাবু দাঁড়িয়ে থাকল তেমনি। জ্যাক ভীষণ ক্ষেপে গেছে। পাখিটা হাতে পেলে হয়তো পাখা ছিঁড়ে দেবে, মুন্ডু ছিঁড়ে ফেলবে। জ্যাক সব পারে। জ্যাককে সে কেন যে এসব বলতে গেল!

—আমি বলছি, আমি জ্যাক বলছি। এবং জ্যাকের সেই সুন্দর মুখ কি ভীষণ ক্ষিপ্ত! ওর এমন সুন্দর চোখে কি গভীর ক্ষত!

ছোট বলল, প্লিজ!

জ্যাক ফের বলল, ধরে দাও।

তা ক্যাপ্টেনের জেদি ছেলে। মাথায় কি যে তার হয়, সে আর কি করে, সে কথা না শুনে জ্যাককে অবমাননা করতে পারে না। সে কাতর গলায় বলল, দিচ্ছি।

কারণ সে জানে পাখি দুটো ওর পোষমানা, অবশ্য এখন এ মুহূর্তে ওরা কি করবে সে বুঝতে পারছে না। ধরা যত সহজ ভেবেছিল, আসলে তত সহজ নয়। কারণ ওরা বোধহয় টের পায় সব। তারপর ছোট লাফিয়ে ফল্কায় উঠে গেল। এবং তখন জ্যাক ছুঁড়ে দিল ওর হাতের দস্তানা। ছোট টেনেটুনে পড়ে নিল দস্তানা। এবং সে দেখতে পেল মিসেস স্প্যারো মাস্তুলের ডগায় বসে রয়েছে। সে খুব সন্তর্পণে মাস্তুলের ডগায় দড়ি ঝুলে উঠে গেল। পাখিদুটো আবার উড়ে গেল। ছোট তখন পাখিদুটোর নাম ধরে ডাকছিল। ফিরে আসতে

বলছিল। যেমন মাথার ওপর ঘুরে বেড়ায় উড়ে বেড়ায়, ছোট যেন এখনও ওদের তেমনি কাছে চাইছে। কিন্তু পাখিরা বুঝি বুঝতে পারে ঠিক। ছোটর ডাকে কেউ আর কাছে আসছে না। ওরা গ্যালির ছাদে বসে নিশ্চিন্তে পাখা ঠোকরাচ্ছে।

ছোট সেখান থেকে লোহার তার বেয়ে নেমে গেল। অনায়াসে সে যেখানে যখন খুশি উঠে যেতে পারছে। দেখলে মনে হবে পাকা জাহাজি। লম্বা সফরে ছোট, পাকা জাহাজি বনে গেছে এবং এই দুরন্তপনা এনজিন সারেঙের ভাল লাগছিল না। এত বেশি উড়ে বেড়ানো ভালো না। ছোটবাবুর কান্ড দেখে সারেঙ মাঝে মাঝে চোখ বুজে ফেলেছেন ভয়ে। যেন ছোট মজা করছে নিজের জীবন নিয়ে। রাগে শরীর কাঁপছে তাঁর। কি যে দরকার কাপ্তেনের ছেলেটার সঙ্গে ভাব করার। একেবারে কথা শোনে না ছোট। কান ধরে নামিয়ে আনলে এখন ঠিক হয়। কাপ্তানের ছেলেটার জন্য তাও করতে পারছেন না।

তখন ছোট আবার ছাদ থেকে লাফ দিয়ে ডেকে নেমে পাখি দুটোর পেছনে দৌড়াল। সেও যেন এ-জাহাজে আর একটা পাখি হয়ে গেছে। পাখির মতো ফল্কায় ডেকে মাস্তুলে মাংকি অ্যায়ল্যান্ডের ছাদে কখনও উইংসে ঝুলে সে বার বার পাখি দুটোকে ওর কাঁধে অথবা মাথায় এসে বসতে অনুরোধ করছে। কিছু করবে না। যেমন জাহাজে ছিল তেমনি থাকবে ওরা। আর নিচে তখন জ্যাক। সে দু হাত তুলে বেশ মনোরম এক রিঙের খেলোয়াড়ের মতো খেলা দেখাচ্ছে। কেবল ছোটবাবুকে উত্তেজিত করে যাচ্ছে—ওহো! পারলে না। ইউজলেস।

বুঝি রক্তের ভেতর থেকে তেজী ঘোড়ারা। এ-সব বললে আরও তেজী স্বভাবের হয়ে যায়। -ওই ওদিকে চলে গেল। দ্যাখো ফওর-মাস্টে গিয়ে বসেছে। ছোট লাফিয়ে উঠে গেলে জ্যাক চিৎকার করতে থাকল উড়ে যাচ্ছে, তোমার কানের পাশ দিয়ে পালিয়ে গেল। এনজিন-রুমে ঢুকে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ছোট দড়ি ঝুলে একেবারে মাংকি আয়ল্যান্ডের মাথায়। তারপর স্টেনসান ধরে নিচে সোজা ঝুলে পড়ল।

ছোট এ-ভাবে স্কাইলাইটের সিঁড়িতে নেমে গেল। এনজিন-রুমের ভেতর ঢুকে গেল। প্রায় গ্লাইড করার মতো দু'রেলিঙে হাত রেখে নেমে যাচ্ছে। হাওয়ায় পা ভাসিয়ে দুহাতে ভর করে ক্রমে নিচে, নিচে নেমে যাচ্ছে। আর পেছনে জ্যাক তার চেয়ে যেন এককাঠি ওপরে।

মৈত্রের ইচ্ছে হল একবার, ঘাড় ধরে তুলে নিয়ে আসে। চা করে বসে রয়েছে, চা ঠান্ডা হচ্ছে। পাখি দুটোর পেছনে লেগেছে। কিন্তু কাপ্তানের দুরন্ত ছেলেটা আছে সঙ্গে। আর সাহসে কুলাল না। অমিয় চা হাতে নিয়ে ওপরে উঠে গেলে দেখল, ছোটবাবু মেইন-মাস্টের ক্লোজ-নেস্টে দাঁড়িয়ে আছে। সে আকাশ দেখছে, কি সমুদ্র দেখছে না পাখি দুটোকে খুঁজছে অমিয় বুঝতে পারছে না। ডেকে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাক। অমিয়র হাতে ছোটবাবুর চা। অমিয়, যে অমিয় জাহাজে ভয়ঙ্কর খেলায় মেতে উঠেছে এবং ঘোস্ট খেলা, বেশ জমে উঠেছে, যদিও সে জানে না শেষ পর্যন্ত কিভাবে শেষ হবে খেলা সেও জ্যাককে দেখে ট্যাসে গেল। ডেকে বলতে পারল না ছোট, তোর চা। চা ঠান্ডা হচ্ছে।

আর ছোটও তখন ঠান্ডা একেবারে ঠান্ডা। ঠিক বুঝতে পারছে না, এমন নিরিবিলি সমুদ্রে দিগন্তরেখায় এটা কি দেখা যাচ্ছে! যেন এক অতিকায় মনস্টার আকাশ কালো করে এগিয়ে আসছে ক্রমশঃ। ক্রমশঃ ওটা বড় হয়ে যাচ্ছে এবং বিদ্যুতের তরঙ্গমালা ওর মাথায় খেলে গেলে সহসা সাইরেন বেজে উঠল। সারেঙ, ডেক সারেঙ কাপ্তান যে-যার মতো চোঙ মুখে ফুঁকে যাচ্ছে—নিচে নেমে যাও। নিচে।

জ্যাক পাগলের মতো হাত ওপরে তুলে চিৎকার করে উঠল, দি ব্রেকার! ছোট তাড়াতাড়ি জলদি। ছোট, দাঁড়িয়ে থেকো না।

বোধহয় কখনও কখনও এ-সব অতিকায় মহামায়া মানুষের চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। ছোট কেমন ক্রমে ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। ওর শরীরে শক্তি নেই, হাত-পা শিথিল, নিচে কি করে নামতে হয় সে যেন জানে না। জ্যাক পাগলের মতো হাঁকছে, এবং একে একে এনজিন-সারেঙ, মৈত্র,

মনু, জব্বার এবং সেকেন্ড অফিসার ছুটে এসেছে। জাহাজের মুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ছোট তেমনি দাঁড়িয়ে—তারপর কেমন হাত তুলে দিল ওপরে। আকাশ ছুঁতে চাইল যেন।

মৈত্র আর পারল না। ওটা মরবে। ও জানে না, ওটা কি আসছে। ভাসিয়ে নিয়ে যাবে কোথায় অপোগন্ডটা জানে না। সে উপরে উঠে গেল। ক্রোজ-নেস্টে উঠে চুল ধরে নামাবে ভাবল। তখন কাপ্তান চিৎকার করছে, জ্যাক! সেকেন্ড অফিসার জ্যাককে টানতে টানতে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ক্রমে এসে গেল, এসে গেল, ভেসে গেল—ছোটবাবু রব উঠে যাবার মুখে দড়ি ধরে, ঝুলে একেবারে আফট-পিকে। কিন্তু পারল না। শেষ রক্ষা করতে পারল না। সে উইন্ডসেলে আটকে গেল। এবং পড়ে গেল। অমিয় সারেঙ জব্বার সবাই ধরাধরি করে নিয়ে আসার আগেই—দি ব্রেকার। ওরা সিঁড়ির মুখে ঠেলে দিল ছোটকে। এবং অনেকটা উঁচুতে জাহাজ উঠে গেছে। ওদের ভাসিয়ে নিয়ে যেত, কিন্তু ওরা ব্রেকারের মুখে পড়লে কি করতে হয় জানে, এবং সারেঙ-সাব এই বুড়ো বয়সেও স্টেনসান ধরে ভেসে থাকলেন। জল জাহাজের ওপর দিয়ে নেমে গেল। দেখলেন তিনি একা। ডেকে কেউ নেই। তাকাতে না তাকাতেই আবার একটা ব্রেকার। আবার জলে ডুবে ডুবে মরণ খেলা! খেলার মতো খেলা। জাহাজ অনেক ওপরে উঠে নিচে নেমে গেল। তিনিও জলের ভেতর থেকে উঠে এলেন! এবং মনে হল, আবার ব্রেকার আসছে। অনেক দূরে। মেসরুমে এসে বুঝতে পারলেন তিনি পাগলের মতো জীবন বিপন্ন করে ছোটকে বাঁচিয়ে এনেছেন। ছোটকে ঠেলে ঢুকিয়ে না দিলে সে অসীম তরঙ্গ মালায় সমুদ্রের গভীরে ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। তিনি মৃত্যুর মুখোমুখি এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন ভাবতেই কেমন শরীর থরথর করে কেঁপে উঠল। নিচে নামার শক্তিটুকু পর্যন্ত নেই। সমুদ্রের এইসব সহসা জলোচ্ছাস বেশীক্ষণ থাকে না। কেউ সঠিক জানে না, কেন এমন হয়! কোন বেতার সংকেত পর্যন্ত পাওয়া যায় না। হয়তো বা কোনও টাইডল ওয়েভ হবে, যাই হোক ব্যাপারটা গুরুতর বোঝা গেল যখন আকাশ পরিষ্কার, সমুদ্র শান্ত যেন জাহাজ সমুদ্রে কিছুক্ষণ ডুব-সাঁতার কেটে আবার অবিরাম ভেসে চলেছে। তখন মৈত্র সারেঙের ঘরে উঁকি দিয়ে বলল, জলদি! সারেঙের ঘর তখন লোকজনে ঠাসা।

—কেন কি হল!

—শিগগির আসুন। ছোটর মাথায় কি ঢুকে আছে।

—মানে! এবং সঙ্গে সঙ্গে ভেজা জামা কাপড়ে নেমে গেলেন। দেখলেন ঘাড়ের ওপরে একটা পেরেকের মতো। এতক্ষণ ছোট ভয়ে কিছু বলে নি। জামা রক্তপাতে ভিজে গেলে, অমিয় চিৎকার করে উঠেছিল, ছোট, রক্ত!

ছোট কিছু বলেনি। অনেকক্ষণ থেকেই এটা হচ্ছে। মাঝে মাঝে গোপনে সে হাত দিয়েছে মাথায়, বুঝতে পারছে ভীষণ কিছু একটা হয়েছে কিন্তু সবাই ওর ওপর এমন ক্ষেপে আছে যে, বলতে সাহস পায়নি। সে অসহ্য কষ্ট ভোগ করছে। চোখ বুজে দাঁত চেপে সহ্য করছে। বসে আছে। কেমন হিতাহিত জ্ঞানশুন্য মানুষের মতো ওর চোখ মুখ দেখাচ্ছে।

সারেঙ-সাব বললেন, আমি যাচ্ছি।

ছোট বলল, কিছু হয়নি। কেটে গেছে একটু। এর জন্য লাফালাফি।

সবাই ছোটর ফোকসালে ভিড় করেছে।

ছোট কেমন বিব্রত বোধ করতে থাকল। সমস্ত শরীরে অসহ্য জ্বালা। কেমন ঘুম ঘুম এবং নেশার মতো মনে হচ্ছে। সে নিজেকে শক্ত রাখছে। জাহাজে আবার দুর্ঘটনা। সে নিজেকে ভীষণ অপয়া ভাবতে থাকল। ওর জন্য সবাই এভাবে বিব্রত হচ্ছে দেখেও একটা সংকোচ ভেতরে। সে আর পারছিল না। মৈত্র গরমজল করে এনে, ক্ষতস্থান ধুয়ে দিচ্ছে। সারেঙ সেকেন্ড অফিসারকে ডেকে আনলে বোঝা গেল দুর্ঘটনা অতীব—কারণ তখন বেতার সংকেত পাঠানো হচ্ছে। ক্যাপ্টেন নিজে এসেছেন ছুটে। চীফ-অফিসার এসেছে। জ্যাক খবর শুনে যখন এল, তখন ছোট লম্বা হয়ে শুয়ে আছে। সাদা চাদরে শরীর ঢাকা। মাথায় ব্যান্ডেজ,

মাথা কাত করা। চোখে কি ছোটবাবু দেখতে পাচ্ছে না। জ্যাকেক দেখে ছোট এতটুকু চিনতে পারল না যেন। যেভাবে তাকিয়েছিল, তেমনি সাদা চোখে তাকিয়ে আছে। চোখের পলক পড়ছে না।

তখন রেডিও-অফিসার কাপ্তানের ঘরে। সেকেন্ড-অফিসার রিপোর্ট করেছেন। কাপ্তান দেখে সই করলেন। ডাকলেন, রেডিও-অফিসারকে। রেডিও রোমাকে জানাও, সিপ সিউল ব্যাঙ্ক। কোল-বয় ছোট- বাবু। অ্যাকসিডেন্ট। অ্যাকসিডেন্ট রিপোর্ট দাও।

রেডিও-অফিসার বললেন, নিয়ারেস্ট স্টেশন ক্যালিফোর্ণিয়া।

—তাকে জানাও।

রেডিও অফিসার তাড়াতাড়ি রেডিও-মেডিকাল ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করে জানালেন, জাহাজ ঘুরিয়ে দিতে হবে। এক্ষুনি।

—কোথায়?

—জাহাজ ভিকটোরিয়া পোর্টে ভিড়িয়ে দিতে বলছে। রিস্ক নিতে রাজী হচ্ছে না।

জাহাজের মুখ আবার ঘুরিয়ে দেওয়া হল। জাহাজের মুখ এখন পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম। জাহাজ এখন যত তাড়াতাড়ি ভিড়িয়ে দেওয়া যায়।

এবং খবর এই ফোকসালে এসেও পৌঁছে গেল। খারাপ খবর। সবাই উদ্বিগ্ন হয়ে আছে। সেকেন্ড- অফিসার শেষ রাতের দিকে কোরামিন দিয়েছেন ছোটকে। কেমন ধীরে ধীরে ছোটর চোখ বুজে আসছে। তেমন রক্তপাত হয়নি! একটা লোহার শক্ত মতো কিছু মাথার ভিতর ঢুকে আছে। মাঝে মাঝে মৈত্র স্থির থাকতে না পেরে ডেকেছে, ছোট! সারেঙ ডেকেছেন, ছেলে, কোনও ভয় নেই, আমরা তো আছি! জ্যাক নির্বাক। জ্যাক ডাকে নি। সে সারাক্ষণ এই ফোকসালে ছোটর শিয়রে বসে রয়েছে। কাপ্তানবয় খেতে ডেকেছিল, সে খেতে গেছে।

খাওয়ার পর ব্রীজে বাবার পাশে কিছু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। কাপ্তান বলতে পারতেন, বনি তুমি বড় হয়ে যাচ্ছ। তুমি এ ভাবে ছোটকে বিপদের মুখে ফেলে না দিলেও পারতে। কিন্তু মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কিছু বলতে পারেন নি। ভারী দুঃখী মুখ। বনি যেন এ জাহাজে এখন সবচেয়ে দুঃখী। এবং বড় তার অপরাধ। সে মাথা নিচু করে রেখেছিল। বনির বোধহয় এটা স্বভাব, অপরাধ করে ফেললে সে মাথা নিচু করে রাখে। তখন হিগিনস বলেছিলেন, যাও শুয়ে পড়গে।

বনি যায় নি। সে তেমনি দাঁড়িয়েছিল।

হিগিনস জানেন, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলে বোঝা যায়, বনির কিছু বলার ইচ্ছে। তিনি বলেছিলেন, আমাকে কিছু বলবে?

—ছোটবাবুর ফোকসালে যাব।

হিগিনসের মনে হল, মেয়েটা বুঝতে পেরেছে তার অপরাধের কথা। তিনি মেয়ের বোধবুদ্ধিতে খুশী হলেন। বলেছিলেন, না গেলেও কিছু কেউ ভাববে না।

বনি তখন কিছু না বলে নেমে যাচ্ছিল। বনি যখন ভাল হয়ে যায় সত্যি ভাল হয়ে যায়। আসলে বনির বয়সে এমন একজন ছোট্ট নাবিকের মায়ায় পড়ে যাওয়া স্বাভাবিক। কেমন এক অমলিন ঘ্রাণ বনির শরীরে। বুড়ো বয়সে কিছুতেই মেয়েটাকে দুঃখ দিতে মন চায় না। তিনি ফের ডেকেছিলেন, বলেছিলেন, যাও। দুষ্টুমি কর না। ঘুম পেলে চলে এস। এবং সারেঙকে ডাকিয়ে জানিয়েছিলেন, জ্যাক যাচ্ছে, ছোটবাবুর ফোকসালে। লক্ষ্য রেখ। আসলে হিগিনস মেয়ের কথা ভেবে না নিজের কথা ভেবে বললেন, বুঝতে পারলেন না। সকালের রোদ জাহাজে, এত বড় একটা দুর্ঘটনা এই জাহাজে ঘটেছে বোঝাই যায় না। কাপ্তানের উৎকণ্ঠা দেখলে শুধু বোঝা যায়। কারণ তিনি এখন লগ-বুগে গত রাতের রিপোর্ট পড়তে পড়তে

কেমন থমকে গেছেন। তিনি বনির কথা লেখেন নি। বনি যে ছোটবাবুকে পাখি ধরার জন্য ডেকেছিল, এবং ছোটবাবু বনির কথা মতো কারণ ছোটবাবু তো সামান্য জাহাজি, সে বনি কিছু বললে না করে থাকে কি করে—অথচ রিপোর্টে এ-সব কিছু নেই। তিনি লগ- বুকে আসলে লিখেছেন, ভয়ঙ্কর ব্রেকারের মুখে পড়ে গিয়ে ছোটবাবুর এই দুর্ঘটনা। বনিকে তিনি একেবারেই জড়ান নি।

রিপোর্ট পড়তে পড়তে বয়সের কথা মনে হল। ধর্মাধর্মের কথা মনে হল। এই শেষ সমুদ্রসফর তাও মনে হল তাঁর। সারাজীবন চেষ্টা করেছেন জাহাজের সব রকমের কাজে সৎ থাকতে। এবং ভাঙ্গা জাহাজেই প্রায় সব সফর বলে তিনি জীবনে সৎ থাকা বাঞ্ছনীয় ভেবেছিলেন। যেন কোম্পানী তাঁকে ভাঙ্গা জাহাজ দিয়ে পরীক্ষা করেছিল, তুমি কেমন নাবিক দেখা যাক হে। তখন জাহাজ সাউথ সিতে, কাপ্তান ম্যানিলি অসুস্থ। তাকে কিঙস আয়াল্যান্ডে নামিয়ে দিলেই তার এসেছিল, হিগিনস জাহাজ হোমে নিয়ে যাবে। ডেক-অ্যাপ্রেন্টিস থেকে আজ পর্যন্ত যা যা উন্নতি, সব এ জাহাজেই।

লগ-বুকের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি নুয়ে নুয়ে কি দেখছেন। বয়সের জন্য চোখে কম দেখেন। কাছের জিনিস আরও কম। চশমায় যেন কুলোয় না এমন নুয়ে নুয়ে বার বার রিপোর্টটা পড়ছেন। ভীষণ সতর্ক হয়ে যাচ্ছেন। এই যে জাহাজ কোর্স পাল্টে অন্য পোর্টে ঢুকে যাচ্ছে সব ক্ষয়ক্ষতি দেবে বীমা কোম্পানী। এদিক-ওদিক হলে দেবে না। বনির কথা লেখা থাকলে তো আর কথাই নেই। এবং এ- সময়ে মেয়েটার ওপর তিনি কেমন বিরক্ত বিব্রত এবং তালা টেনে টেনে যখন দেখলেন খুব সুরক্ষিত, কেউ পড়তে পারবে না কি লেখা আছে, তখন চীফ অফিসার ছুটে এসেছিল, লগ-বুকে এটা লেখা দরকার। কাপ্তান বলেছিলেন, আমি লিখেছি। আমার খেয়াল আছে। তিনি বনিকে বাঁচিয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রিপোর্ট লিখেছেন। এবং এ-সময় এত বেশি ধূর্ত মনে হল নিজেকে যে জাহাজে ঠিক কিছু অঘটন ঘটবে—যে-জাহাজ ওঁর জন্য এত করেছে, শেষ সফরে তিনি আবার তার লগ বুকে ঠিক কাপ্তানের মতো সাহসী কাজ করছেন না। দুর্বল কাপুরুষের মতো তিনি এটা কি যে করে ফেলেছেন বনির কথা ভেবে!

আর তখনই বোধ হয় মনে হয় তিনি ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস। সোজা হয়ে দাঁড়াতে চান। দু হাত ওপরে তুলে বলতে চান, আমাকে রক্ষা করুন প্রভু। আপনি মঙ্গলময়। তিনি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে করতে একেবারে তখন দাসানুদাস হয়ে যান। মনেই থাকে না একটা জাহাজের ওপর অপরিসীম ক্ষমতা তাঁর। তখন বনির কথা লিখলেও কিছু আসে যায় না। নিজের কথা লিখলেও আসে যায় না। তাঁর বয়স তাঁকে নিজের ওপর আরও বেশি যেন প্রভুত্ব দিয়েছে। তিনি অবহেলায় সব কেটেকুটে যা সত্য তাই লিখলেন। জবাবদিহি তিনি গ্রাহ্য করলেন না।

আর তখনই দেখলেন জাহাজ বন্দরে ঢুকছে। জাহাজ বাঁধাছাদা হচ্ছে। এ্যাম্বুলেন্স রেডি। ছোটবাবুকে স্ট্রেচারে নামানো হচ্ছে। ভাবলেন সঙ্গে যাওয়া দরকার। বনি এবং সেকেন্ডকে সঙ্গে ডেকে নিলেন। সারেঙ, এনজিন-বড়-টিন্ডাল যাবে। এজেন্ট-অফিসের লোক এবং একজন ডাক্তার ওর সিঁড়িতে তখন উঠে আসছে।

একটা লেগুনের মতো সরু খালবিল যেন এ-বন্দরে ঢুকে গেছে। সমুদ্র থেকে এই লেগুন ধরে এলে দু'পাশে সব পাহাড়, এবং গাছপালা। ওরা তখন এত বেশি সবাই চিন্তিত ছিল যে এমন সুন্দর দৃশ্য কারো চোখে পড়েনি। একটা লম্বা ব্রীজ চলে গেছে দু-পাড়ের শহরের ওপর দিয়ে। লেগুনের জলে জাহাজ এস এস সিউল ব্যাঙ্ক বাঁধা। লেগুনের নীল জল, এবং দুপাশের গাছ পালা পাহাড় মিলে এ-জাহাজ কটা দিন বন্দরে কাটিয়ে দিল। হিগিনস এখানে কিছু মেরামতের কাজ সেরে নিলেন। ছোটবাবুর মাথার খুলিতে জঙ-ধরা পেরেক সামান্য ঢুকে গেছিল এবং অপারেশনের পর তাড়াতাড়ি আরোগ্য লাভে সবাই খুশি। হাসপাতালে একমাত্র এনজিন-সারেঙ এবং সেকেন্ড অফিসার বাদে কেউ যেতে পারছে না। ওরা ছোটবাবু

কেমন আছে দেখতে যায়। ওরা ফিরে এলে জ্যাকের কোনো আর অস্বস্তি থাকে না। সে কখনও এত বেশি অধীর থাকে যে হাঁটতে হাঁটতে চলে যায় ব্রীজের নিচে। এবং বাদামী রঙের মানুষ, চুল কোঁকড়ানো, ঠোঁট পুরু মানুষ দেখে দেখে যখন ক্লান্ত তখনই হয়তো দূরে ব্রীজের ওপর দিয়ে সে দেখতে পায় সেকেন্ড অফিসার ডেবিড আসছে।

তখন জেটিগুলোতে কি সব অতিকায় শব্দ, আকরিক লোহা সব জাহাজে বোঝাই হচ্ছে। এবং এমন সব অতিকায় শব্দ যে জ্যাক যতই জোরে চিৎকার করুক, কাছে না এলে ডেবিড কিছু শুনতে পায় না, অথবা তখন হয়তো কোন মোটর-গাড়ি পেছনে দাঁড়িয়ে প্যাঁক প্যাঁক করছে, জ্যাকের কানেই যাচ্ছে না, পেছনে কোন মোটর-গাড়ি থাকতে পারে, পৃথিবীতে এখন একটা খবর বাদে অন্য কোন খবর আছে সে জানে না।

জ্যাক বলল, আমরা কবে যেতে পারব?

—কাল।

—সত্যি!

জ্যাক আনন্দে ডেবিডের পিঠে ঘুসি বসিয়ে দিল।

—ও লাগছে।

॥ ষোল ॥

সারেঙসাব জ্যাককে দেখে অন্য দিকে চোখ ফেরালেন। বড়লোকের ছেলে যা হয়, যা খুশি মনে আসে করে বেড়ায়। এখন জ্যাককে দেখলে কে বলবে, সেই ছোটবাবুকে এ-ভাবে জব্দ করেছে। আসলে, দুর্ঘটনার জন্য জ্যাক দায়ী ছিল না। সেই অতিকায় ব্রেকার, যার কার্যকারণ কেউ ব্যাখ্যা করতে পারে না কারণ কখন সমুদ্রে কি হয়, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণি এবং এমন সব ভূকম্পন, অগ্নুৎপাত হতে থাকে যে তার কার্যকারণের ব্যাখ্যা একমাত্র সেই মহামহিমের কাছেই থেকে যায়। কাপ্তান তখন বুকে ক্রস টেনে শুধু বলতে পারেন, হে মহামহিম আপনি মঙ্গলময়। কারণ কোনও বেতার সংকেত ছিল না। অটোএলার্ম ঠিক ছিল। ব্রীজে ডিউটি-অফিসার অটো-এলার্ম বাজলে ঠিক শুনতে পেতেন। যাই হোক, সারেঙ যেন ছোটর এই দুর্ঘটনায় জ্যাককে বাদে আর কাউকে দায়ি ভাবতে পারেন না। সেই জ্যাক যখন আনন্দে শিস্ দিতে দিতে হাঁটছে তখন কেন জানি তাঁর ভাল লাগল না। জ্যাক কাল যাবে, গেলেই যেন তার ছেলের আবার মন্দ কিছু হয়ে যাবে। সে ডেবিডকে ডেকে বলল, আপনি যান। আমি পরে যাচ্ছি। জ্যাক সঙ্গে গেলে যেন মাথা ঠিক রাখতে পারবেন না।

তখন চুপি চুপি জ্যাক বলল, ছোট কি বলে?

—বলে না কিছু।

—কেন!

—কথা বলতে দিচ্ছে না।

—কাল গেলে আমরা কথা বলতে পারব না?

—না।

তারপর ডেবিড পাইপে ধোঁয়া উঠছে না দেখে বুড়ো আঙ্গুলে টিপে কি দেখল। তখন লম্বা ব্রীজ পার হয়ে সারেঙ অন্যদিকে চলে যাচ্ছেন। জ্যাকের ভারি ইচ্ছে হল, ব্রীজ পার হয়ে বড় পাহাড়ের মাথায় উঠে যায়। এবং ডেবিডকে বলার ইচ্ছে, আচ্ছা এখান থেকে কতদূর!

—বেশি দূর না।

—পাহাড়টার মাথায় উঠে গেলে ছোটবাবুর হাসপাতাল চোখে পড়বে?

—পড়তে পারে।

—উঠবে ওপরে?

—পড়ে যাবে।

—তুমি এস না। বলে সেই যেন ডেবিডকে নিয়ে সেই নিকটবর্তী পাহাড়ের গাছপালার ভেতর দিয়ে ওপরে উঠে গেল। তখন সূর্য অস্ত যাবার মুখে। লেগুনের জলে নানাবর্ণের শালতি। লম্বা কোনোটা সাদা রঙের, কোনোটা নীল রঙের। আর কোনোটার মাথায় পাল, ছোট ছোট এই সব শালতির পাটাতনে বসে রয়েছে যুবক যুবতীরা। ওরা নৌকা-বাইচ দিচ্ছে। এবং পাশাপাশি সব জাহাজ। পাহাড়ের ছায়া লেগুনের জলে। আলো জ্বলছে বড় গম্বুজের মাথায়। অনেক দূরে সেই হাসপাতালের মাঠে লাল গীর্জা। ডেভিড গীর্জার মাথায় ক্রস দেখিয়ে বলল, ওখানে ছোটবাবু থাকে।

পরদিন জ্যাক, কাপ্তান, মেজ মালোম, সারেঙ, মৈত্র সবাই—এক দঙ্গল যেন। এ-সব জাহাজে একজন কোলবয়ের জন্য এটা বাড়াবাড়ি। কথা থাকে অসুস্থ হলে জাহাজ বন্দরে লাগলে নামিয়ে দেওয়া, কিন্তু বোধ হয় ছোটবাবুর জন্য বনির যেমন মায়া, তেমনি কাপ্তান থেকে সবাই। ছোট, বিনীত ভদ্র। অসহায় চোখ। কম বয়সে সবারই চোখ এমন থাকে, তাঁর নিজেরও এমন ছিল। আর তা ছাড়া কি যেন আছে ছোটর ভেতর। যখন সাদা এম্বুলেন্সে নিয়ে যাওয়া হয় কাপ্তান নিজের ভেতর কেমন অস্থির হয়ে পড়েছিলেন। ছোটবাবুর মুখে নীল

দাড়ি। শরীরের লাবণ্য কোনো দূরবর্তী এক বনভূমির কথা অথবা কোন মরুভূমিতে একজন মুসাফিরের নিত্য হেঁটে যাওয়ার কথা মনে করিয়ে দেয়। ছোটবাবুর মুখের ছবির সঙ্গে দূরবর্তী কোন মরুভূমির মহামহিমের কথা কেবল মনে পড়ে যায়। তখন কিছুতেই তাকে ফেলে তিনি জাহাজ সমুদ্রে ভাসিয়ে দিতে সাহস পান না।

এবং এ জন্য কাপ্তান এখানে নানারকম মেরামতের কাজ বের করে যেমন, চক্ মেরামত, এনজিন রুমের বালকেড পাল্টে ফেলা, এবং ব্রীজে কিছু কাজকর্ম তাছাড়া স্মোক-পাইপ বসানের কাজ আছে এবং এসব কাজের ভিতর বন্দরে পড়ে থাকার প্রয়োজনীয়তা—যেন তিনি ছোটবাবুর জন্য অপেক্ষা করছেন না, অপেক্ষা করছেন, জাহাজের এইসব মেরামতের জন্য। মেরামত শেষ হলেই জাহাজ ছাড়া হবে।

ওরা যখন নেমে যাচ্ছিল, মেজ-মিস্ত্রি অর্থাৎ সেকেন্ড-এনজিনিয়ার তখন দু-পা ফাঁক করে দাঁড়িয়ে আছে ডেকে। সাদা বয়লার স্যুট পরেছে সে। ওর পাতলা চুল মাথায় এবং চোখে-মুখে কঠিন এক তাচ্ছিল্য, কোথাকার কে এক নেটিভ ইন্ডিয়ান তার জন্য এত সব। মুখে খুবই দাম্ভিকতার ছাপ। জ্যাকের জন্য সে মাঝে মাঝে আকুলতা বোধ করে থাকে। এমন নাবালকের মুখ এবং জাহাজে যা সব হয়ে থাকে, কখনও অধিক পানীয় পেটে পড়লে সে ঠিক থাকতে পারে না। জ্যাকের কেবিনের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। মাঝে মাঝে ইচ্ছে হয় নরম পাখির মতো রোস্ট—জ্যাকের শরীর যেন সুস্বাদু খাদ্য—সেই জ্যাক পর্যন্ত এমন বিশ্রী একটা লোককে দেখতে যাচ্ছে। জ্যাক এ-জাহাজে ওকে মাঝে মাঝে পাগল করে দেয়। জ্যাকের যতদিন দাড়িগোঁফ না উঠবে ততদিন একটা মেয়ের শরীর বাদে তার কাছে আর কিছু না। সে কেবল ফাঁক খুঁজেছে। জ্যাককে দেখলেই গলে পড়ছে। কথা বলছে গদগদ গলায়। ওর কেবিনে কতদিন আসতে বলেছে চুপি চুপি। সে বন্দর থেকে যা কিছু দুর্লভ জ্যাকের জন্য নিয়ে আসতে চায়। বন্ধুত্ব অসীম বন্ধুত্ব, তারপর কখনও সবাই যখন কেবিনে ঘুম যাবে জ্যাকের শরীরে জোরজার করে একটা কিছু করে ফেলবে। জ্যাক সাহসই পাবে না। বাপকে এমন নোংরা ঘটনার কথা বলতে সাহস পাবে না। ও তারপর যে কি মজা হবে! জ্যাক যদি অভ্যস্ত হয়ে যায়, এ-জাহাজ নিরবধিকাল চললেও ভাববে না, দেশে ফেরা দরকার। সে জিভ্ দিয়ে ঠোঁট চাটছিল আর ভেতরে ভেতরে ফুঁসছিল।

জ্যাক সবার পেছনে। হাসপাতালের ভেতর বড় রাস্তা এবং সুন্দর ফুলের বাগান, গোলাপ ফুলই বেশি। ওর ইচ্ছে হল একটা ফুল তুলে নেয় ছোটবাবুর জন্য। এবং সে সবার অলক্ষ্যে একটা গোলাপ ফুল তুলে ফেলল। তারপর রুমালে ঢেকে সে যখন ঢুকে গেল ভেতরে, দেখল সারি সারি বেড। এবং শেষ দিকে বাবা এবং সেই ওল্ড-ম্যান অর্থাৎ সারেঙ। সে দেখতে পেল ছোটবাবু শুয়ে আছে পাশ ফিরে। ওর মাথায় ব্যান্ডেজ এবং ও-পাশে মুখ ফিরিয়ে শুয়ে আছে। জ্যাক কিছুতেই সাহস পেল না সামনে গিয়ে একবার দেখে। সে তার বাবার পেছনে প্রায় যেন লুকিয়ে দাঁড়িয়েছিল। যেন ছোটবাবু দেখতে না পায়। সে দেখছিল ছোটবাবু বাবার দিকে তাকিয়ে আছে। বাবাকে ছোটবাবু ভীষণ ভয় পায়। বাবা থাকলে ছোটবাবু ভীষণ অস্বস্তিতে পড়ে যায়। সারেঙ শিয়রের দিকে। এনজিন টিন্ডাল সামনে—ও পাশের বেডে ঠোঁট পুরু চুল কোঁকড়ানো বাদামী মানুষ। পা টানা দেওয়া। চেহারা দেখলে ড্রাইভার মনে হয়। এবং এ-ভাবে এখানে কত বিচিত্র ব্যান্ডেজে পড়ে থাকা মানুষ! ওষুধের গন্ধ ছোটবাবু এখানে এভাবে একা পড়ে রয়েছে। সে কিছু বলতে পারছে না। রিপোর্ট ঝুলছে। বাবা ডাক্তারের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাইছেন, কবেতক তুলে নেয়া যাবে এবং এ-ভাবে জ্যাক দেখল বাবা করিডোর দিয়ে যখন হেঁটে যাচ্ছেন ছোটবাবুর মুখে সুন্দর হাসি। সে ডেভিডকে হাতের ইশারায় কাছে ডাকছে। ছোটবাবু ওকে চোখ তুলে একবার দেখেছে, কিন্তু যেন একেবারেই চিনতে পারেনি। জ্যাকের ভীষণ অভিমান। সে তেমনি পায়ের দিকে দাঁড়িয়ে আছে। ছোটবাবু জানে না, সে ছোটবাবুর জন্য চুরি করে একটা গোলাপ ফুল নিয়ে এসেছে।

ছোটবাবুর কথা শুনে সেকেন্ড হেসে ফেলল। বলল, ওরা ভাল আছে।

জ্যাক আর থাকতে পারল না। বলল, কারা ভাল আছে সেকেন্ড?

—মিস্টার য়্যান্ড মিসেস স্প্যারো।

—ওর ঘুম হচ্ছিল না বুঝি!

জ্যাকের কথা ছোটবাবু শুনতে পায়নি। মেজ-মালোম স্পষ্ট করে বললেন, ওদের জন্য তোমার ঘুম নেই চোখে?

ছোটবাবু আস্তে আস্তে বলল, না। সে সারেঙের দিকে হাত তুলে বলল, ভাল আছি। ভাববেন না। মৈত্রকে বলল, মৈত্রদা বসো। দাঁড়িয়ে থাকলে কেন? আমাকে তোমরা কবে নিয়ে যাবে। আমার ভাল লাগছে না।

মৈত্র বলল, ঠিক নিয়ে যাব।

—আমাকে ফেলে কিন্তু চলে যেও না তোমরা। তবে একেবারে একা পড়ে যাব। জাহাজ ছাড়ছে কবে?

জ্যাক কাছে এসে দাঁড়ালো। জ্যাক কাছে এলে মৈত্র এবং সারেঙ বেশ দূরে সরে দাঁড়াল। জ্যাক পাশে বসল। বলল, তোমাকে না নিয়ে আমরা যাব না ছোটবাবু।

ছোটবাবুর সব রাগ দুঃখ কেমন নিমেষে উবে গেল। —সত্যি যাবে না।

—না।

ছোটবাবু বলল, তুমি ভাল হয়ে যাও জ্যাক। সবাই তোমাকে খারাপ বলে। আমার ভাল লাগে না।

—আমি ভাল হয়ে যাব ছোটবাবু।

—ঠিক!

–ঠিক।

জ্যাক এবার ওকে ফুলটা দিল। বলল, তোমার জন্য এনেছি। জ্যাককে তখন কি যে ভাল লাগে। ছোটবাবু বলল, কত বড় ফুল! এবং জ্যাক ইচ্ছে করলে আরও কত ফুল এনে দিতে পারে। কিন্তু সে যে একটা দুঃসাহসিক কাজের ভেতর ফুলটা ওর হাতে দিতে পেরেছে তার জন্য খুশী। সে বাজার থেকে অনেক ফুল এনে দিতে পারে। ইচ্ছে করলে ওর চারপাশে ফুলের সমারোহ গড়ে তুলতে পারে। কিন্তু সে তো সে-সব কিছু আসার সময় একেবারেই ভাবেনি। সে এই হাসপাতালে ঢুকে আবিষ্কার করেছে হাসপাতালে সময়ে অসময়ে দুর্লভ সব ফুলেরা ফুটে থাকে। একটা ফুল ছোটবাবুকে দিতে পারলে কি যে ভাল লাগবে। এবং এমন মনে হতেই সে কাপ্তান স্যালি হিগিনসের মেয়ে একেবারে মনে থাকল না। মান-সম্ভ্রমের কথা মনে থাকল না। একটা ফুল চুরি করে ফেলল ছোটবাবুর জন্য ফুলটা ছোটবাবুকে দিতে পেরে শেষ পর্যন্ত একটা মহৎ কিছু করে ফেলেছে ভাবল।

এবং এ-ভাবেই জীবন কখনও মধুময়, কখনও এক কঠিন বাস্তবতা অথবা জ্যাক হয়তো জানে না, জাহাজে একজন হিংস্র মানুষ ওর শরীরে মেয়েমানুষের ঘ্রাণ পাচ্ছে। ওর অভিসন্ধির শেষ নেই। অন্ধকার গুহার মতো কেবিনে একজন মানুষ স্থির দাঁড়িয়ে আছে। তার চোখেও ভাল ঘুম নেই।

স্যালি হিগিনস ফিরে এসে সেকেন্ড অফিসারকে ডাকলেন। এবং পরামর্শ—অবশ্য জ্যাক, মৈত্র অথবা সারেঙ কিছুই শুনতে পেল না। তারপর দু-দিন যেতে না যেতেই আবার বন্দরে সেই সাদা এম্বুলেন্স। ছোটবাবু বসে রয়েছে। জ্যাক সাহায্য করছে তুলে আনতে। গ্যাঙ-ওয়ে ধরে ছোটবাবু উঠে আসছে। ব্রীজে দাঁড়িয়ে আছে সেই লোকটা। একজন নেটিভের সঙ্গে জ্যাকের মেলামেশা তার আদৌ পছন্দ না। সে দু-পা নিজের অজান্তেই ঠক ঠক করে নাচাচ্ছিল। বুড়ো বয়সে কাপ্তানের ভীমরতি ধরেছে।

তবু উঠে এলে, জ্যাককে মেজ-মিস্ত্রি আর্চি বলল, কেমন আছে?

জ্যাক বলল, ভাল।

এবং জ্যাকের যেন এখন কাজের শেষ নেই। বোধ হয় জ্যাক নিজের একগুঁয়েমির কথা ভেবে বিনয়ী হয়ে গেছে। এভাবে ছোটকে পাখি দুটোর পেছনে লেলিয়ে সে ঠিক কাজ করেনি। এখন সে ছোটবাবুকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। ওর ফোকসালে নিয়ে যাচ্ছে। জাহাজিরা ছোটবাবুকে ভীষণ ভাগ্যবান ভাবল। ছোটবাবুর সঙ্গে এমন যখন আচরণ তখন তারাও আর ছোটবাবুকে অবহেলা করতে পারে না। কেউ কেউ উদ্বিগ্ন চোখে মুখে কথাবর্তা বলল। শেষে এল অনিমেষ, বঙ্কু। ওরা ফলপ্তা ঝুলিয়ে জাহাজের বাইরে রঙ করছিল। শরীরে নীল পোশাক। মজুমদার এসেই হাত ঘুরিয়ে মেয়েদের মতো নাচতে থাকল আর গাইতে থাকল, ছোটবাবু ফিরে এসেছে, ছোটবাবু ভূত দেখেছে, আহা আমার কি যে মজা হয়েছে, রেতের বেলা বউ আমারে বাবা বলেছে। এবং এভাবে সবাই হো হো করে হেসে উঠল। জ্যাক এ সবের কিছু বোঝে না। তবু সে বুঝতে পারে ছোটবাবুকে ফিরে পেয়ে সবাই আনন্দ করছে। তারও ওদের সঙ্গে দাঁড়িয়ে আনন্দ করতে ইচ্ছে হল।

আর এভাবে জাহাজ ভিকটোরিয়া পোর্টে মাসাধিকাল থেকে গেল। মাসাধিকাল এ-জাহাজের বর্ণনা দিতে গেলে দেখা যাবে প্রতিদিন একই ছবি—বড় বড় গ্যাস সিলেন্ডার অথবা অক্সিজেন-সিলেন্ডার ডেরিকে উঠেছে নেমেছে। বড় বড় লোহার পাত জড় হয়েছিল এবং জোড়া তালি দেবার জন্য ওয়েলডিঙের কঠিন ধাতব শব্দ, কানে তালা লেগে যাবার মতো। আর ঝুলে ঝুলে রং করা ডেক- জাহাজিদের। চারপাশে বোল্ট লোহায় মুড়ে নেওয়া হচ্ছে। যতটা পারা যায় পুরানো জং-ধরা ঝরঝরে বালকেড মেরামত করে নেওয়া। আর পাশে সরু লেগুনের নীল জল। দু'পাশে শহরের ইট কাঠ সেতু। বিকেলে নৌকা বাইচ। এবং লম্বা লম্বা সালতিগুলো যেন শয়ে শয়ে লেগুনের জলে ভেসে যাচ্ছে—তখন ছোটবাবুর জন্য আর কিছুদিন অপেক্ষা করলে কি ক্ষতি ছিল। বনি, বাবার কথা শুনে সত্যি ভয় পেয়ে গেছে। বেশি কথা বললে, ছোট হয়তো কখনও আর নিরাময় হবে না। সে যে এখন কি করে!

তারপর আবার যা হয়ে থাকে, জাহাজ নোঙর তুলে ফেলছে। পাশের জেটিতে তেমনি জাহাজে আকরিক লোহা বোঝাই হচ্ছে। বোধ হয় কার্ডিফ অথবা হামবুর্গ যাবে জাহাজ। ওদের জাহাজ বাউন্ড ফর পোর্ট অফ সালফার। এখন আরও উত্তরে উঠে যাওয়া। জাহাজ সমুদ্রে পড়লে কার্সি ফ্ল্যাগ নামিয়ে ফেলা হল। জাহাজের সামনে শুধু কোম্পানীর ফ্ল্যাগ। পেছনে ইউনিয়ান জ্যাক। আবার সেই অসীম যাত্রা, নীল আলোময় অন্তহীন যাত্রা যেন। ঝ্যাক ঝ্যাক অবিরাম শব্দ এনজিনের। কেউ হয়তো অবসর সময়ে লম্বা তারের বঁড়শি ফেলে রেখেছে সমুদ্রে। তাজা মাছ উঠলে বেশ হয়। সুরমাই মাছ। বাসি খাবার খেয়ে মুখে রুচি নেই। একটু তাজা মাছের স্বাদ এবং যেদিন সত্যি বড় একটা মাছ, প্রায় ত্রিশ বত্রিশ সের ওজনের একটা মাছ উঠে আসে, তখন সবার কি যে হৈ-চৈ। তাজা মাছ। ডেক আর এনজিন ক্রু মিলে উৎসবের মতো দিনটা কাটিয়ে দেয়।

এবং জাহাজ বলতে গেলে বেশ যাচ্ছে। দু-এক দিনের ভেতর ওরা ক্যারেবিয়ান-সি পাবে। তারপর মিসিসিপি নদী। নদীর মোহনা এবং নদীর ভেতর দিয়ে বোধ হয় যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে ঢুকে যাওয়া। সেখানে সালফার বোঝাই হবে। যখন এমন সব ঘটনা, তখন জ্যাকের মনে হল বাবার দিন রাত কি যেন দুশ্চিন্তা মাথায়। ঠিক সেই দুঃস্বপ্ন দেখার পরে যেমন বাবা বলতেন, চিৎকার করে পরিচারকদের ডেকে বলতেন, দ্যাখো দ্যাখো ঘরের ভেতরে কে ঢুকে গেল। আমার সব কিছু তছনছ করে দিচ্ছে। আমার কিছু ঠিক রাখছে না। ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে অথবা যখন তিনি শান্ত হয়ে আসেন তখন তাঁর কন্ঠস্বরে দুঃখী মানুষের আভাস। তিনি ধীরে ধীরে বলেন, বনি দ্যাখতো কে গেল! ঘরের ভেতর কে ঢুকে গেল। চোখে মুখে বাবার কি যে ভীতির ছাপ থাকত।

—কৈ কাউকে তো দেখছি না! কে ঢুকল! ভেতরে কেউ নেই বাবা

—মনে হল যেন কেউ ঢুকে গেল।

আসলে বনি জানে বাবা মাঝে মাঝেই এমন করেন। বয়স যত বাড়ছে বাবার এটা বেশি হচ্ছে। যতক্ষণ সমুদ্রে ভেসে পড়তে না পারছেন, ততক্ষণ এটা থাকছে। কিন্তু এ সফরে বনি দেখছে, বাবা জাহাজেও মাঝে মাঝে সহসা বলে ওঠেন, দ্যাখতো চার্টরুমে কে ঢুকে গেল! বাকিটুকু বলতে যেন তিনি সাহস পান না। বনি মুখ দেখে বুঝতে পারে বাবা কথা সম্পূর্ণ শেষ না করেই ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। বনি আবার সব বুঝে ফেলছে নাতো এমন চোখ মুখ তখন তাঁর। বনি জবাব দিত, কেউ না। এই এস না, দ্যাখো কেউ না। কেবল বড় বড় চার্ট, ম্যাপ এবং সেকসটান, নানা রকমের বই। সব বইগুলো যেন বনি লকার থেকে নামিয়ে দেখাতে চায়, দ্যাখো কেউ কোথাও নেই। এমনকি জ্যোতির্বিজ্ঞানের সব বই, যার ভিতর বনি পর্যন্ত এই সৌরজগতের এক অসীমতার রহস্য খুঁজে পায়।

বাড়ির পুরানো পরিচারকের কাছে বনি শুনেছে, বাবার প্রথম পক্ষের মায়ের মৃত্যুর পর এটা হয়েছে। বাবা এবং প্রথম পক্ষের মার সুন্দর একটা ছবি সে বাড়ির একটা অব্যবহৃত সিন্দুকে খুঁজে পেয়েছিল। আশ্চর্য, ছবিটা এত অযত্ন সত্ত্বেও এতটুকু মলিন হয়নি। বাবার প্রথম বয়সের ছবি। কি যে রূপবান ছিলেন এবং মা আরও। সে ওটা সুন্দর করে ঝেড়ে মুছে দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছিল। বাবা ছবিটা দেখে বেশি উৎসাহ পেতেন না। যেন, আর ও বয়সের মুখ দেয়ালে টানিয়ে কি হবে! তিনি স্মিত হাসতেন। মানুষ তার অহঙ্কার নিয়ে বেশি দিন বাঁচতে পারে না। এবং এ-ভাবে যখন পুরানো স্মৃতির ভেতর ডুবে যান তখনই এমন হয় অথবা কখনও অন্যমনস্ক হয়ে গেলে মনে হয় পাশ কাটিয়ে কেউ চলে গেল। কে? কে?

পরে বুঝতে পারেন, কেউ না। বুঝতে পারলেই লজ্জা পান। বিষণ্ণ হয়ে যান তারপর ভীষণ সতর্ক নজর চারপাশে। আবার কি ভাবেন। এটা কি কোন ভৌতিক ব্যাপার, ভাবেন আর পায়চারি করেন। না না এটা তা হবে কেন। তিনি যে তখন এলিসের চুলের গন্ধ পান। চুলের গন্ধটা পাশ থেকে তখনও যেন ভেসে আসছে। তাড়াতাড়ি চুপি চুপি বড় সেই হলঘরে ঢুকে চারপাশে, যেমন লকার, সিন্দুক ওয়াড্রোব খাট বাতিদান সব টেনে টেনে হাঁটু মুড়ে কখনও হামাগুড়ি দিয়ে একেবারে ছেলেমানুষের মতো হারানো খেলনা খুঁজে বেড়াবার মতো অথবা দুষ্টু বালকের ঘুড়ি কেটে গেলে যে দুঃখ, ঘুড়িটা উড়ে চলে যাচ্ছে, ধরতে না পারলে যে দুঃখ, বাবার মুখে তেমনি দুঃখ ভেসে থাকত! মুখে হাতে ধুলো ময়লা লেগে বাবাকে শিশুর মতো লাগত। বনি তখন সহ্য করতে পারত না। কি এত খুঁজছ। আমাকে বলতে পার না।

তিনি বলতে পারেন না আমি খুঁজছি, আমার হারানো স্মৃতিকে। চুপচাপ হাত পা ঝেড়ে উঠে দাঁড়ান। মার কাছে শিশুর দুষ্টুমীর কথা লুকিয়ে যাবার মতো যেন বলা, লাঠিটা যে কোথায় রাখলাম বনি!

—এই তো লাঠি।

—দ্যাখো কি আশ্চর্য, সারা ঘর খুঁজছি। অথচ একেবারে সামনে লাঠিটা। ঠিক এই লুকোচুরি যেন ছোটবাবুকে নিয়ে। যেমন বাবা সময় পেলেই বলবে, বনি, ছোট কেমন আছে?

—ভাল।

—লাগে না আর?

—না।

—কথা ঠিক ঠিক বলে?

—হ্যাঁ।

—ঠিক ঠিক যে বলে বুঝতে পার?

—বুঝতে পারি।

সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠতে উঠতে কথা বলেন। পেছনে তাকান না তখন। নিচে দাঁড়িয়ে থাকে বনি। তিনি বলতে বলতে অদৃশ্য হয়ে যান।—ওকে বেশি কথা বলতে দেবে না। ওর মাথার আঘাত গুরুতর। ভাল হতে সময় লাগবে।

বনি আরও প্রশ্ন করতে পারে ভেবে তিনি চার্টরুমে ঢুকে গেলেন। বনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। বাবার ওপর রাগে দুঃখে ভীষণ কান্না পাচ্ছিল। কি দরকার ছিল তবে ওকে নিয়ে আসার। সে তো এখন পাখিদের খাবার দিতে ভালবাসে, সে তো এখন আবার কাজে নেমে যেতে চায়। সবাই কাজ করছে। ওর বসে থাকতে ভাল লাগবে কেন। অথচ বাবা এমন জেনেও ওকে পুরোপুরি নিরাময় করে তুললেন না কেন। কোম্পানীর টাকা বাঁচিয়েছেন। তাড়াতাড়ি জাহাজে তুলে এনে কোম্পানীর বিষয় বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ তিনি এমন হয়তো প্রমাণ করেছেন।

বঙ্কু এখন রং করছে। জাহাজের খোলে রঙ লাগাচ্ছে। খালি বলে খুব ওপরে ভেসে উঠেছে জাহাজ। বন্দরে খোলের রং করা শেষ করে উঠতে পারে নি। বাকি যেটুকু আছে ফলঞ্চা বেঁধে বঙ্কু রং করছে। সে ঝুলে আছে সমুদ্রের ওপর। ওর প্রতিবিম্ব জলে ভেসে চলে যাচ্ছে। দিন বড় বলে বেশ রোদ। ঘামে সে ভিজে গেছে। ক্রমে ইকুয়েডরে চলে আসছে জাহাজ। এবং রঙ্গিন ছবির মতো চারপাশের দৃশ্য। এসময়ে ছোটবাবু বঙ্কুর একটা ছবি তুলে রাখছে। জ্যাকের ক্যামেরা দিয়ে সে পরপর ছবি তুলে যেতে ভালবাসে। এবং এভাবে একটা জাহাজ অসীম সমুদ্রে জল কেটে যাচ্ছে, শুধু যখন চারপাশে থাকে নির্জনতা আর এনজিনের একটানা যাই যাই শব্দ এবং দূরে দিগন্ত রেখায় মেঘের ছায়া। তখন হয়তো একটা শুশুকের অবিরাম জলে ভেসে থাকা ভীষণ বিস্ময়ের। ছোটবাবু খুব সন্তর্পণে তাও ক্যামেরায় ধরে রাখে।

জ্যাকও এভাবে ছবি তুলতে ভালবাসে। যখন ছোটবাবু বসে থাকে চুপচাপ, যখন পাখি দুটো ওর পায়ের কাছে বসে থাকে অথবা মাথার ওপর উড়ে বেড়ায় তখন সে বোট-ডেক থেকে হাঁটু মুড়ে, জাহাজ, সমুদ্র ছোটবাবু পাখি দুটো মিলে একটা ছবি; আবার ছোটবাবু যখন বিকেলে ডেকে হেঁটে বেড়ায় তখনও ছবি এবং এভাবে অজস্র ছবি। জ্যাক যখন ফানেলের গুঁড়িতে চিপিং করতে বসে তখন ছোটবাবু ছবি তুলে রাখে জ্যাকের। জ্যাক যখন দূরবীণে সমুদ্র দেখে তখনও। ডেবিডের এভাবে অনেক ছবি উঠেছে। এভাবে ওরা কখনও বোট-ডেক থেকে, কখনও মাংকি আয়ল্যাণ্ড থেকে সমুদ্রের কখনও সমুদ্রে জেগে-ওঠা কোরাল আয়ল্যাণ্ডের যখন যেখানে ধরে রাখার মতো দৃশ্য থাকছে ক্যামেরায় ধরে রাখছে।

এখন ওদের জাহাজ উইণ্ডওয়ার্ড দ্বীপের কাছাকাছি। কিছু কিছু বর্ণময় দ্বীপের পাশ দিয়ে জাহাজ যাচ্ছে। বোধহয় এভাবে ক্যারেবিয়ান সমুদ্রে ছড়িয়ে রয়েছে অজস্র দ্বীপপুঞ্জ। কোনটার রং সোনালী, কোনটা রুপোলী, কোনটা আবার সবুজ। নানা বর্ণের ফার্ণ গাছ চারপাশে। এমন কি ওরা কোথাও সমুদ্রের বালিয়াড়িতে বড় বড় শঙ্খ, কচ্ছপের খোল দেখতে পেল। নির্জন দ্বীপে সমুদ্রের বালিয়াড়িতে কতকাল অথবা আবহমানকাল ধরে এভাবে মরা কচ্ছপের খোল শামুকের হাড় শঙ্খ মাছের কঙ্কাল পড়ে আছে। রোদে শুকুচ্ছে, বৃষ্টিতে ভিজছে। কেবল ডেবিড সময় পেলেই বসে থাকছে দূরবীণ নিয়ে। কোনো মেয়েমানুষের প্রতিবিম্ব যদি সমুদ্রের জলে ভেসে বেড়ায়।

জাহাজ পোর্ট অফ জামাইকাতে একদিনের জন্য থামবে। জল ও রসদ নিতে হবে। জ্যাক যখন এমন একটা খবর দিল তখন আবার সবার মাটিতে নেমে যাবার আকাঙ্ক্ষা।

ডেবিড তেমনি বসেছিল বোট-ডেকে। ছোটবাবু পাশে বসে আছে। ডেবিড খুব নিবিষ্ট মনে দ্বীপের ভেতর চোখ চালিয়ে দিয়েছে। এবং ওর দূরবীণে গাছপালা ক্রমে সরে যাচ্ছে। ছোট বলল, এনি ওম্যান।

—নো। সেকেণ্ড হতাশ গলায় বলল।

—আমাকে দিন, আমি দেখছি।

সেকেণ্ড বলল, তুমি খুঁজে পাবে না।

ছোট বলল, কেন?

—এত গাছপালা দেখতে দেখতে একসময় তন্ময় হয়ে যাবে। মেয়েমানুষের কথা তোমার মগজে থাকবে না।

—কাল তো সকালে বন্দর ধরছে।

—কেউ নামতে পারছে না।

কেউ নামতে পারছে না যখন, তখন আর কি করা। ভোর রাতে জাহাজ বাঁদাছাঁদা হয়েছে। আসলে এটা যেন ঠিক বন্দর নয়। কারণ ওরা আর কোন জাহাজ দেখতে পেল না। সমুদ্র পাশে ছড়িয়ে আছে। খুব দূরে শহর। একটা ফিতের মতো কাঠের সাঁকো সমুদ্রের ওপর দিয়ে জাহাজের কাছাকাছি চলে এসেছে। একটা সাদা রঙের মোটরকার সকালের দিকে কেউ কেউ দেখতে পেল সেই কাঠের সাঁকোর ওপর দিয়ে আসছে। আর কিছু নেই চারাশে। কেবল কিছু সি-গাল এবং তাদের কলরব। দূরে বালিয়াড়ি দিগন্ত-বিস্তৃত। মাঝে মাঝে লাল নীল কাঠের ঘর ইতস্তত দেখা যাচ্ছে। সামান্য হাওয়া উঠলে সেই সব লাল নীল কাঠের ঘরের চারপাশে জলের ঢেউ চলে যাচ্ছে। ছড়িয়ে পড়ছে। টাগ-বোটে রসদ আসছে। রসদ ওঠানো হচ্ছে। বাটলার হিসাব মিলিয়ে সব নিচ্ছে

তখনই এনজিন সারেঙ এসে ছোটর ফোকসালে উঁকি দিলেন। দেখলেন, ছোট নেই। কোথায় ছোট! ওপরে উঠে দেখলেন, ছোট মনু জব্বার বঙ্কু সমুদ্রের জলে ছিপ ফেলে মাছ ধরছে।

—তুই এখানে! শিগগির নিচে যা।

ছোট বলল, আমি যাব না চাচা, মাছ ধরছি। নিচে যেতে ভাল লাগছে না।

সারেঙ বললেন, তোকে বাড়িয়ালা ডেকেছে। জামাকাপড় পরে বের হতে হবে।

ছোটর মুখটা সহসা সাদা হয়ে গেল। সে কিছু বলতে পারল না! ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। তাকে এ অসময়ে বাড়িয়ালা কেন ডাকবে! সে জাহাজের কাজে উপযুক্ত নয় তাকে নামিয়ে দিতে পারে এখানে। সে বলল, আমাকে কেন ডাকছে চাচা?

—জানি না।

—আমি আপনাকে বলেছি না পরিতে ঠিক কাজ করতে পারব। আপনি কিছুতেই দিলেন না, যেন সারেঙসাবই এজন্য দায়ী। সে বলল কাল থেকে কাজ করতে পারব। কাল থেকে কাজ করতে পারব বললে, নিশ্চয়ই বাড়িয়ালা এবারের মতো ক্ষমা করে দেবেন।

সারেঙ বললেন, আমি কিছু জানি না, তোকে যেতে বলেছে, যা। ভাল জামা প্যান্ট পরে যাবি। বাড়িয়ালার সঙ্গে কিনারায় যেতে হবে তোকে।

ছোট বোকার মতো তাকিয়ে থাকলে ফের সারেঙসাব বললেন, দেরি করিস না, বুড়ো মানুষ ক্ষেপে যাবে আবার। ওর কত কাজ।

ছোট কেমন এবার বেয়াড়া হয়ে গেল। সে বলল, আমি যাব না। মৈত্রদা কোথায়। আঃ আমাকে কাজ দেবে না! বললাম, সব ঠিক, আমি ভাল আছি, ঠিক পরি করতে পারব, কিন্তু বাবুদের মাথাব্যথা। না, এখন না পরে। আমাকে ঠিক নামিয়ে দেবে এবার। আপনারা, সবাই এজন্য দায়ী হবেন।

সারেঙসাব বললেন, মাথা গরম করিস না। তাড়াতাড়ি যা। কেন ডেকেছে, কেন তোকে কিনারায় নিয়ে যাচ্ছে আমি জানি না।

—সঙ্গে কিছু নিতে বলেনি!

—নারে না।

কিছুটা ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতো, কারণ তাকে নেমে যেতে হলে সব নিয়ে এই যেমন, তার টিনের সুটকেস, বেডিং, পুরানো বুট জুতো এসব নিয়ে নেমে যাবার অর্ডার হত। সে বলল, আপনি যাবেন না?

—না।

—আমি ওর সঙ্গে একা যাব! ছোটর মুখ দেখে মনে হয় সে একা গেলে ভয়েই মরে যাবে। এত বড় মানুষের সঙ্গে যাবে কি করে!

সারেঙসাব বললেন, ঠিক জানি না। তুই একা যাবি, না আর কেউ সঙ্গে যাবে বুঝতে পারছি না। আমাকে কিছু কিন্তু বলেনি। সারেঙসাব আর দাঁড়ালেন না। ওঁর নামাজের সময় হয়ে গেছে। তিনি এখন সামান্য জলখাবার খেয়ে নামাজ পড়তে বসবেন। তারপর নানা রকমের কাজ। লোক এমনিতেই কম। একজন মাত্র ফালতু ছিল, সেও দুর্ঘটনার পর থেকে কিছু করতে পারছে না। ওকে কাজের সব দিক নানাভাবে সামলাতে হচ্ছে।

ছোটবাবু বের হবার মুখে দেখল, সবাই ভিড় করেছে ওর ফোকসালে। কাপ্তান ডেকে পাঠালে একটা সাংঘাতিক কিছু ঘটনা। ওরা যেন ছোটকে দেখে খুব বিষণ্ন হয়ে গেছে। কেন ডাকছে, কি ব্যাপার, নানারকম প্রশ্ন। ছোট কেবল বলছে, জানি না। সারেঙসাবও বলতে পারলেন না। সে একটা সাদা হাফ সার্ট, কালো রঙের প্যান্ট পরেছে। পায়ে সাদা কেডস্ জুতো! সে খুব সাফসোফ, এবং নীল রঙের সামান্য নরম অল্প অল্প দাঁড়ি এখন যেন আরও বেশি লাবণ্যময়। সবাই ছোটকে দেখতে দেখতে ভাবল ভারি বিড়ম্বনা ছেলেটার। ছোট রাগে এবং ক্ষোভে ভেতরে ভেতরে ফেটে পড়ছে। চোখ মুখ ভারি থমথম করছে। সে কিনারায় কেন যাচ্ছে জ্যাক বিন্দু বিসর্গ জানায় নি। সে কারো সঙ্গে একটা কথা বলল না। মৈত্রদা, অমিয়, বাদসা মিঞা, ছোটকে চিফ-কুকের গ্যালি পর্যন্ত এগিয়ে দিল। আর ভিতরে যাওয়ার সাহস তাদের নেই।

ছোট একা একা হেঁটে গেল। এলিওয়ে দিয়ে হেঁটে গেল। পাশের কেবিন বাঙালী সাহেবের। জাহাজে উঠে সে সবার চেয়ে বেশি সাহেব। যখন ছোটবাবু সবার সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছে, তখন বাঙালী সাহেব ফিফথ-এনজিনিয়ার ওদের সবাইকে বেশি নেটিভ ভেবে নিয়েছে। তারপর ফোর্থ এবং শেষেরটায় থাকে বড়-মিস্ত্রি। সেই রাস্তাটা, যেখানে সে এক রাতে লম্বাছায়া নড়ে উঠতে দেখেছিল। এখন সবই কেমন ফাঁকা। দু'পাশে কাঠের কারুকার্য করা দেয়াল। সে ডাইনিং হলের সামনে এসেই দেখল, সিঁড়ি ধরে দু'পাটি শাদা জুতো, তারপর ক্রমে হাঁটু পর্যন্ত এবং শেষে সে বুঝতে পারল, বাড়িয়ালা নেমে আসছেন। পুরো জাহাজী পোশাকে তিনি নেমে এলেন। চারটা লম্বা সোনালী স্ট্রাইপ এবং উজ্জ্বল এত বেশি সব যে, সে কেমন বিস্ময়ে মানুষটির দিকে তাকিয়ে শুধু বলল, গুড মর্নিং স্যার।

স্যালি হিগিনস বললেন, গুড মর্নিং। তারপর তিনি আরও কাছে এগিয়ে এলে ছোটবাবু যেন কি এক আশ্চর্য আকর্ষণে হাত বাড়িয়ে দিল। ভীষণ ভয় মনে মনে, এত বড় মানুষটা তার সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করবেন কিনা, সে নিজের মনুষ্যত্বের কাছে কেমন যেন তা না হলে অপমানিত হবে, যেই না ভেবে সে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে, কি এক সাধারণ মানুষ তিনি, স্যালি হিগিনস সত্যি হাত বাড়িয়ে ওর সঙ্গে হ্যাণ্ডসেক করলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে ছোটর যত ভয়, যা কিছু আতঙ্ক নিমেষে উবে গেল। মানুষটা তাকে নামিয়ে দিতে চাইলে সব খুলে বলতে পারবে। বলবে, আমি ঠিক পারব। আমার কোন অসুখ নেই। আমাকে জাহাজ থেকে দয়া করে নামিয়ে দেবেন না।

স্যালি হিগিনস বললেন, এস।

সে বাড়িয়ালার পেছনে পেছনে হাঁটতে থাকল। মেজ-মালোমের কেবিনের দরজায় হিগিনস স্টিকে দুবার ধীরে ধীরে টোকা মারলেন। বললেন সেকেণ্ড জলদি।

ডেবিড ভাবতেই পারেনি এত তাড়াতাড়ি তিনি নেমে আসবেন। সে তাড়াতাড়ি মাথায় টুপি গলিয়ে বের হয়ে এল। সাদা জুতো ডেবিডের সাদা হাফ-প্যান্ট, সোনালী ব্রেড কাঁধে কলারে। ওরা দু'জন আগে আগে, সে পেছনে। গ্যাঙ-ওয়েতে ছোটবাবু আরও অবাক হয়ে গেল। জ্যাক দাঁড়িয়ে আছে। জ্যাক হাতে সোনার ব্যাণ্ড দেওয়া খুব বড় মাপের ঘড়ি পরেছে। গায়ে লতাপাতা ফুল-ফল আঁকা ঢোলা জামা, ঢোলা তসরের প্যান্ট সে পরেছে।

তিনি নামতে নামতে কেমন নিজের মানুষের মতো বললেন, দেশে কে কে আছে তোমার ছোটবাবু?

–সে সবার কথা বলল।

—তুমি কি কিছু জানিয়েছ তাদের?

ছোট ঠিক বুঝতে পারল না। সে দেখল সেই কাঠের সেতুর ওপর সাদা রঙের মোটরকার। বাড়িয়ালা তাকে প্রশ্ন করে গাড়ির ভেতরে গিয়ে বসলেন।

ডেবিড বলল, বাড়িতে জানিয়েছ, ক্রোজনেস্ট থেকে লাফাতে গিয়ে যে পড়ে গিয়েছিলে?

ছোটবাবু বলল, না।

—এতদিন হাসপাতালে ছিলে, জানাও নি?

সে বলল, না।

আশ্চর্য! তিনি আর কোন প্রশ্ন করলেন না। তিনি কি ভাবলেন, তারপর বললেন, একজন বড় ডাক্তারের সঙ্গে পরামর্শ করতে যাচ্ছি। দরকার হলে এখানে একরে নেওয়া হবে। এবার তিনি আরও ধীরে ধীরে যেন বলে যেতে থাকলেন, প্রায় গীর্জার ফাদারের মতো, ছোটবাবু তোমার মাথার খুলি সামান্য ড্যামেজ হয়েছিল। বয়স কম বলে বোধহয় তেমন ভয়ের নেই। সেরে যাবে। মাঝে মাঝে এক্সরে নিলে ঘাবড়ে যাবে না।

ছোট খুব মনোযোগ দিয়ে শুনছে। মাস্টার তার মতো সামান্য মানুষের সঙ্গে সোজাসুজি কথা বলছেন! ওর মাথায় কোন জটিলতা থাকতে পারে সে বিশ্বাস করতে পারল না। এমন একজন বড় মানুষের এমন কথার পর সে মরে পর্যন্ত যেতে পারে। একটা সাদারঙের গাড়িতে তারা বসে রয়েছে। সবাই চুপচাপ, চারপাশে সমুদ্র, বালিয়াড়ি, লাল নীল কাঠের ঘর। এবং বহু দূরে শহরের সবকিছু কুয়াশার মতো অস্পষ্ট। সে কিছুই যেন দেখছিল না। বাড়িয়ালার সাদা চুল ঘাড়ের পেছনে এবং কোঁচকানো চামড়া সে শুধু দেখতে পাচ্ছে। এক পাশে জ্যাক একপাশে ডেবিড, এর চেয়ে জীবনে কি আর বেশি সৌভাগ্য থাকতে পারে সে বুঝতে পারছে না। ডেকের ওপর সবাই দাঁড়িয়ে দেখছে ওদের। সামান্য একজন কোলবয়ের এই গৌরবময় যাত্রা বোধহয় নানা কারণেই জাহাজি জীবনে বড় আনন্দের। সে হাত নাড়ল ওদের।

কাঠের সেতু পার হয়ে গেলে, সামনে পিচের রাস্তা। সমুদ্রে ঢেউ এসে মাঝে মাঝে টায়ার ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। যেন জলের সঙ্গে গাড়িটার ছলাৎ ছলাৎ খেলা চলছে। জলকণা উড়ে এসে গাড়ির ভেতর ওদের মুখ ভিজিয়ে দিচ্ছে। জ্যাক ছোটবাবুকে আড়চোখে দেখছে। ছোটবাবু পাখি দেখছে আকাশের। জলকণার জন্য মাঝে মাঝে কাচ ভীষণ ঝাপসা হয়ে উঠছে। ছোটবাবু আকাশ দেখতে পাচ্ছে না, অস্পষ্ট সমুদ্রে ছোট ছোট ঢেউ দেখতে পাচ্ছে শুধু। জ্যাক কেবল তখন দেখতে পায় তার পাশে, ছোট, ছোটবাবু। কি যে তার সুষমামণ্ডিত মুখ! সমুদ্রের মতো গভীর চোখ। দু'পাশে ঝাপসা কাচে চোখ রেখে কেবল কি যেন খুঁজে বেড়ায়। তাকে দেখে না। ছোটবাবু কি তার মতো বয়সের কাউকে ফেলে এসেছে দেশে! জ্যাক তখন ভিতরে ঝড়ের খড়কুটোর মতো ছটফট করতে থাকে। তার কিছুই ভাল লাগে না।

.

আবার পাল তুলে দেবার মতো সমুদ্রে সন্ধ্যায় জাহাজ ভেসে গেল। গভীর সমুদ্রে জাহাজ। কিনার আর দেখা যাচ্ছে না। কেবল সেই ছলাৎ ছলাৎ শব্দ জলের। এবং যেসব

পাখিরা উড়ে এসেছিল পেছনে, তারা আবার ডাঙ্গায় ফিরে গেছে। ছোটবাবু আর জ্যাক দাঁড়িয়েছিল রেলিঙে। সূর্য ক্যারেবিয়ান সিতে অস্ত যাচ্ছে। চারপাশে এক নীলাভ সোনালী আভা এবং একটা পাখি পর্যন্ত আকাশে নেই। শুধু সমুদ্রে দুজনের প্রতিবিম্ব ভাসছে। কেউ কোনও কথা বলছে না।

জ্যাক একসময় আর থাকতে না পেরে বলল, ছোট তুমি কাউকে ভালোবাসো না?

ছোট বলল, হ্যাঁ।

—কে সে?

—সে আমার লিটল গার্ল। মাই লিটল্ ডার্লিং। মাই প্রিন্সেস।

জ্যাক কেমন গম্ভীর হয়ে গেল! সে যেন এক্ষুনি আবার পায়ে হান্টার সু পরে বের হয়ে আসবে। এবং বলবে, কিল দ্যাট বার্ড। কিন্তু জ্যাক ভীষণ দুঃখী গলায় বলল, ওর জন্য তুমি কিছু নিয়ে যাবে না। এমন কিছু আশ্চর্য জিনিস......

ছোট বলল, হ্যাঁ, নিয়েছি তো।

—কি নিলে?

—একটা কম্বল নিয়েছি। শীতে বড় কষ্ট পেত। আর পাবে না। আমি বড় হয়ে গেছি। বলেই কেমন চোখ বুজে তার সেই ছোট রাজপুত্রীর কথা ভাবতে ভাবতে চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। শীতের রাতে কুপি জ্বেলে সে হয়তো গোপনে এখনও জেগে থাকে। কখন দরজায় ডাকবে, মা আমি এসেছি। দরজা খোল।

জ্যাক আর দাঁড়াল না। অভিমানে ওর চোখ ফেটে জল আসছে। সে তার কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

এবং রাতে, যখন জ্যোৎস্না উঠেছে সমুদ্রে তখন সবাই শুনল, খুব জোরে জোরে জ্যাক রেকর্ড বাজাচ্ছে। যেন কোন দূরবর্তী গীর্জায় কেউ ধর্মীয় সঙ্গীত পিয়ানোতে বাজিয়ে যাচ্ছে। কখনও উঁচু লয়ে, কখনও খুব নিচু লয়ে, একেবারে বৃষ্টিপাতের মতো। যেন কখনও সেই বৃষ্টিপাত, সমুদ্রে ধীরে ধীরে আবার ঝম্ ঝম্ শব্দ, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে অনেক দূরে। বৃষ্টিপাতের অস্পষ্ট নীরবতার মতো চুপচাপ সব কিছু আবার। ছোটবাবু জানে না, জ্যাক এখন গানের সঙ্গে সুন্দর এক মিউজিক বাজিয়ে যাচ্ছে। যেন বলছে, আমি ফুটে উঠছি দ্যাখো। সে তার দু'হাত গোপনে, পৃথিবীর কেউ দেখতে পাচ্ছে না, তবু গোপনে কি যে ইচ্ছে থেকে যায়, সে দু-হাত ছড়িয়ে নিজের ছোট্ট ঘরটিতে আপনমনে নেচে যেতে থাকল। যেন নাচের মুদ্রায় শুধু এক আকাঙ্ক্ষা। লেট মি ব্ল্যুম। আমাকে ফুটতে দাও। লেট মি ব্ল্যুম, ব্ল্যুম...... ব্ল্যুম.........

॥ সতেরো ॥

এখন জাহাজ ইউকাটান প্রণালীতে ঢুকে গেছে। পোর্ট-অফ জ্যামাইকা ছেড়ে আসার তিন চার দিনের ভেতরই জাহাজ ম্যাকসিকো উপসাগর পেয়ে গেল। পেছনে পড়ে থাকল নানারকম দ্বীপমালা। যেমন কিউবা এবং তার পাশাপাশি অসংখ্য সব দ্বীপ। দ্বীপের ছড়াছড়ি এ-অঞ্চলটাতে। কত বিচিত্র সব নাম। ভূগোল বইয়ে এদের হয়তো কোনও উল্লেখ নেই। কোনো জরিপমালাতে হয়তো একটা বিন্দুর মতো রয়েছে এদের অবস্থান। তবু কি যে সুন্দর লাগে এদের পাশ দিয়ে যখন জাহাজ যায়। কিছুতেই বিশ্বাস হয় না পৃথিবীর মানচিত্রে এদের কোনও উল্লেখ নেই।

এভাবে সমুদ্রের দু'পাশে জাহাজ ফেলে এসেছে নানারকম দেশ। পোর্টসাইডে রয়েছে বৃটিশ হণ্ডুরাস। অথবা গুয়াতেমালা, নিকারগুয়া এবং অন্যপাশে যেমন স্টারবোর্ডের কথাই ধরা যাক, আছে পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অসংখ্য নারকেল গাছ অথবা আনারস কিংবা আখের খেতের ছবিয়ালা দ্বীপ, কিংবা বড় বড় পিচের হ্রদ। কিউবার পাশ কাটিয়ে কিছুটা নাক উঁচিয়ে ঢুকে যাবার মতো জাহাজটা এল-কুইয়োর পাশাপাশি এসে গেছে। এখন সোজা নব্বই ডিগ্রি বরাবর ওপরে উঠে গেলেই নিউ- অর্লিয়নস্ বন্দর। মিসিসিপির মুখে এই বড় বন্দরে জাহাজ আপাতত যাচ্ছে।

ব্রীজে পায়চারি করছে তিন নম্বর মালোম। রাত তখন এগারোটা বাজতে দশ মিনিট। আর পুরো এক ঘণ্টা দশ মিনিট ওর ওয়াচের সময়। সময়টা যথেষ্ট, সে এ-সময়টুকুর ভেতর তার হাতের যা কাজ সেরে ফেলতে পারবে। লুক-আউট ডিউটিতে আছে পাঁচ নম্বর জাহাজি মান্নান। অস্পষ্ট অন্ধকারে আফটার-পিকের মাথায় ওর ছায়াটা নড়ছে। অন্ধকার রাত। চারপাশে কিছুই চোখে পড়ছে না। তবু মাঝে মাঝে কাচের ভেতর দিয়ে দূরবর্তী নিহারীকাপুঞ্জ দেখতে ভীষণ ভাল লাগে। আকাশ পরিষ্কার থাকলে এটা তার হয়। মন মেজাজ ভাল না থাকলে এটা হয়। সে সারাক্ষণ আকাশে নক্ষত্রমালা দেখে রাত কাবার করে দিতে পারে কারণ, তার মন ভাল না থাকলে চোখে ঘুম আসে না। সে যতদূর জানত, জাহাজ ভিকটোরিয়া পোর্ট থেকে নেবে লৌহ আকরিক। তারপরই জাহাজ হোমের দিকে মুখ ঘুরিয়ে দেবে কারণ কথা এমনই ছিল, কিন্তু জাহাজ বুয়েনএয়ার্স থেকে ছাড়বার সময়ই সে সব টের পেয়ে যায়। এবং সেই থেকে মন খারাপ।

সে বাণ্টির চিঠি পেয়েছে। বাণ্টির সঙ্গে দু'বছরের পরিচয়। এবং কথা আছে সেকেণ্ড মেটের পরীক্ষায় বসে তারপর ভেবে ঠিক করা যাবে বিয়ের দিন। বাণ্টির চিঠি চারদিন আগে এসেছে। ওর বাবা তেলবাড়িতে চলে যাচ্ছে। ও এখন আপাতত একা আছে ব্রিমিংহামে। সে ভেবেছিল, থার্ড ফিরে গেলে কিছুদিনের জন্য ইউরোপের দেশগুলোতে ঘুরে বেড়াবে। যদিও পছন্দ করে না থার্ড, বরং সে যে-কদিন হোমে থাকে, অন্তত সে-কদিন কোথাও নড়তে চায় না। কোন বড় রাস্তা ধরে ওর হেঁটে যেতে ভাল লাগে। অথবা ওর বাবার খামারে আলু কিংবা বাঁধাকপির চাষ কেমন হল, সে বাবার সঙ্গে তখন খামারে খাটতে ভালবাসে। এবং এভাবে সে হোমে ফিরে গেলে কি কি করত মনে মনে ভাবছে। বাণ্টিকে সে যেখানে খুশি চুমো খেত অথবা কোন রেস্তোঁরাতে বসে হৈ-চৈ অথবা যদি কোন গীর্জা থাকে তার পাশে চুপচাপ নীরবে বসে থাকা, কিন্তু জাহাজ হোমে যাচ্ছে না বলে, সে কিছুটা কর্তব্যে শীথিল, কাজ করতে ভাল লাগছিল না। তবু তাকে কিছু কাজ সেরে ফেলতেই হবে। সময় পিছিয়ে দেওয়া একটা বড় কাজ। তাকে ওয়াচে ত্রিশ মিনিট ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দিতে হবে। এ-ভাবে ঘড়ির কাঁটা পিছিয়ে দেওয়া এবং লগ-বুকে সব নোট করে রাখা তার কাজ। লুক-আউট- ডিউটির পাঁচ নম্বর জাহাজি তখন হঠাৎ দুম করে একটা বেল বাজিয়ে দিল।

থার্ড অফিসার তাড়াতাড়ি স্টাবোর্ড-সাইডে ছুটে গেল। এবং ঝুঁকে দেখল—অন্ধকারে একটা জাহাজ উঠে আসছে। কিছু সিগনালিঙের কাজ থাকে তখন। হোয়াট সিপ, বাউণ্ড ফর

দি পোর্ট, এ-সব জেনে নিতে হয়। কোথায় যাবে জাহাজ, কোন দেশের, কি লাইন। কোথা থেকে এল। এমন সব খবর নেওয়া দরকার। অথবা ওরা যে সমুদ্র পার হয়ে এসেছে, তার ওয়েদার রিপোর্ট—এবং এসব জেনে নেওয়া ভাল। অথচ মন খারাপ বলে সে কিছুই করল না। দুটো একটা সিগনালিঙ পাঠিয়ে যখন বুজতে পারল, না কোনোই জবাব পাওয়া যাচ্ছে না, জাহাজটা চলে যাচ্ছে, থার্ড মেট আর কোনও সিগনাল পাঠাল না। কাপ্তান বুড়ো মানুষ। এখন হয়ত তিনি জেগে থাকার নামে বেশ ঘুমোচ্ছেন। ওঁর কেবিনে সোজা তো ঢুকে যাওয়া যায় না। সে দু-একদিন দেখেছে, বেল বেজে উঠলে তিনি কেমন ফোলা ফোলা চোখে ওর দিকে তাকিয়ে দরজা টেনে বলেন, কাম ইন। বারোটা-চারটায় ডিউটি দিতে আসছে সেকেণ্ড-মেট ডেবিড। যদি লগ-বুকে কিছু নাও লিখে রাখে ডেবিড হয়তো কিছু বলবে না। কেমন ছেলেমানুষ ডেবিড। ডেবিড বয়সে বড় এবং সোজাসুজি কথা বলতে ভালবাসে বলে, থার্ড ডেবিডকে সবার চেয়ে বেশি মান্য করে থাকে। যত ঝামেলা বুড়ো কাপ্তানকে নিয়ে। ডেবিডকে তার ওয়াচ বুঝিয়ে যেতে হবে এবং যেহেতু এটা কাপ্তানের ওয়াচ, সে কাপ্তানের হয়ে কাজটা করে থাকে, তাকে বেশি ঝামেলা পোহাতে হয়। ওয়াচের পর প্রায় অনেকক্ষণ তাকে কাপ্তানের ঘরে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। যতক্ষণ তিনি সই না করে দিচ্ছেন, যতক্ষণ তিনি সবকিছু দেখে নিচে সই করে না দিচ্ছেন, ততক্ষণ সে যেতে পারে না।

এবং এজন্য তাকে সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে হয়। এত বার সে নির্ভুল করতে চেয়েছে রিপোর্ট, কিন্তু কেন যে সে দেখেছে, কোথাও না কোথাও তিনি ঠিক ভুল ধরে ফেলেন। আজ সে যেন একটু স্বাধীনভাবে দেখতে চাইল, কাপ্তান সত্যি ঘুমোন কিনা। বুড়ো হলে যা হয়ে থাকে, খুব খুঁতখুঁতে স্বভাবের, যেন সবদিকে ঠিক নজর আছে এমন দেখাতে চান। এবং সে জানে মাস্টার যতই বড় কথা বলুক এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকেন না; বরং তার পাশে ঘড়ি থাকে, ঠিক সময় হলে হয়তো তাঁকে জাগিয়ে দেয়। এবং এসব ভেবে যখন বেশ একটা মজা করা যাবে ভেবেছিল তখন কেন যে মনটা খচখচ করছে। কি জানি, যদি তিনি সত্যি জেগে থাকেন। সে তো বাণ্টির কথা ভাবতে ভাবতে কেমন অতলে ডুবে গেছিল। যেন লুক-আউট ডিউটির পাঁচ নম্বর জাহাজির সব দোষ। আরে বাবা সামনে পাহাড় কিংবা দ্বীপ-টিপ না পড়লেই হল। অন্ধকার। কিছু দেখা যায় না, চড়ায় জাহাজ আটকে গেলে ভয়াবহ ব্যাপার। দ্বীপ, পাহাড়, অথবা একেবারে নাক বরাবর জাহাজ এলে ভয়। কলিসান এড়াতে বেল বাজাও। কোথাও দূরে কি একটা জাহাজ নেমে যাচ্ছে—কি যে দরকার বুঝি না। আসলে ঘুম, এই মধ্যরাতে ভীষণ ঝিমুনি আসে এবং জেগে থাকার জন্যই কেবল যেন মাঝে মাঝে বেল বাজানো।

মধ্যরাতে এভাবে মনটা খিচে গেলে সে দেখল ঘুম ঘুম চোখে ডেবিড এসে দাঁড়িয়েছে। কোয়ার্টার- মাস্টার মহসীন চলে যাচ্ছে। তিন নম্বর কোয়ার্টার মাস্টার এসেছে ওয়াচ বদল করতে।

ডেবিড ঘুম ঘুম চোখেই বলল, কোনো খবর নেই?

—কিসের খবর?

—জাহাজ কোথায় যাচ্ছে।

—নিউ অরলিনস্ যাচ্ছে।

—সেটা আপাতত। তারপর কোথায়। পোর্ট অফ সালফার কথা ছিল, সেখানে যাচ্ছে না? সালফার বোঝাই হবে নিউ অরলিনসে। আবার শুনছি, জাহাজ আর চালাবে না কোম্পানী। জাহাজ এবার স্ক্র্যাপ করার অর্ডার হয়েছে।

—স্ক্র্যাপ! বলছেন কি! এত রাতে এমন খবরে থার্ড কেমন হতবাক।

—ভাঙ্গা জাহাজ! আর কতদিন চালাবে।

—সেতো শুনেছি আরও ক'বার স্ক্র্যাপ করার কথা হয়েছিল।

—হয়েছিল। এবারও হয়েছে। কিন্তু আমাদের কপাল যাবে কোথায়! শেষ পর্যন্ত হবে না। স্ক্র্যাপ করা যাবে না। অর্ডারে সই করবে কে!

-কেন, কোম্পানীর যারা মালিক!

—তুমি কিচ্ছু জান না। এ জাহাজে প্রথম সফর। জানবেই বা কি করে! পাইপে আগুন ধরাতে গিয়ে হাওয়ায় আগুন নিভে গেল ডেবিডের।

—জানি কিছুটা, বলে ডেবিডের পাইপে আগুন ধরিয়ে দিল। বলল, একটা দুর্ঘটনা ঘটে যায়, আর কর্তৃপক্ষ স্ক্র্যাপ করতে সাহস পায় না।

—তবে আবার কথা বলছ কেন! দেখে যাও। তবে যা অনুমান, সে যে অর্ডারই আসুক, আমরা বেঁচে থাকতে এর রহস্য উদ্ধার করতে পারব না। বেঁচে থাকতে এটা স্ক্র্যাপ করা হচ্ছে না।

আসলে ওরা রহস্যের কথা বলতে গিয়ে এই জাহাজের এতদিন টিকে থাকার রহস্যের কথা বলছে। জাহাজের বয়সকাল নির্ণয় করা যাচ্ছে না। তবে এটা যে প্রথম মহাযুদ্ধের আমলের জাহাজ তার রেকর্ড কোম্পানীর ঘরে রয়েছে। কোম্পানীর ঘরে এর আগের নাম সিনারা, জার্মান সিপ এবং কোন এক সি-ডেভিল ছিল জাহাজের কাপ্তান। তার সব নানারকম কাহিনী আছে, এবং সেই সি-ডেভিল বার বার বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েছে এমন সব ঘটনাও নাকি কোম্পানীর ঘরে লিপিবদ্ধ আছে। আর আছে ওর কনভয়ে ছিল, কিছু যুদ্ধে আহত মানুষ এবং জাহাজটাকে যখন ধরে আনা হয়েছিল, তখন দেখা যায় ক্যাপ্টেন লুকেনার নিহত। তিনি তাঁর কেবিনে মৃত অবস্থায় পড়েছিলেন। ধরা পড়ার আগে আত্মহত্যা করেছিলেন। এটা একরকমের ইতিহাস জাহাজ সম্পর্কে। লুকেনার ধরা পড়ার মুহূর্তে সব নেম প্লেট, এবং কবে কোথায় জাহাজের নির্মাণ হয়েছিল তার সব হদিশ মুছে দিতে আদেশ দিয়েছিলেন। সেই থেকে জাহাজটা নামগোত্রহীনের মতো, তবু যা হোক ব্যাঙ্ক লাইন খুব সস্তায় কিনে জাহাজটাকে ফের সমুদ্রগামী করে তুলেছিল।

সুতরাং জাহাজিদের মুখে নানা গুজবে শোনা যায় মাঝে মাঝে। যে জন্মায় না, সে মরে না। সিউল ব্যাংকের কোন জন্মসালই নেই, সে আদতে মরবে কিনা, অর্থাৎ তার কোন শেষ আছে কিনা কেউ বলতে পারে না। যদি জাহাজ নিউ-অরলিসে গিয়ে আর না চলে, অর্থাৎ স্ক্র্যাপ করার পাকা অর্ডার পেয়ে যায়—তবে কি যে মজা! ডেবিড তবে ঠিক একমাসের ভেতরই এবির কাছে চলে যেতে পারছে। বোধ হয় ডেবিড এমন একটা স্বপ্ন এতক্ষণ ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে দেখছিল। সে বলল, অল রাইট! অল-ও-কে? সে একটা স্বপ্ন দেখছিল তার চোখ মুখ দেখে তা বোঝা যাচ্ছে। স্বপ্নটা স্বপ্নই। তবে জাহাজ স্ক্র্যাপ করার কথা এখন উঠছে না। তবে উঠতে কতক্ষণ! সে স্বপ্নে দেখেছিল জাহাজের সব প্লেট খুলে দেওয়া হয়েছে। একটা কঙ্কালের মতো জাহাজের সব রিবগুলো বন্দরে ঝুলছে। ক্যাপ্টেন হিগিনস মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছেন জেটিতে; পাশে সে দেখতে পেয়েছিল ছোটবাবুকে। ছোটবাবু পুরো পোশাকে এবং বোধহয় কালো রঙের সুট এবং গোলাপী নেকটাই আর কি সুমহান চেহারা ছোটবাবুর। আর কি যেন স্বপ্নে, হ্যাঁ একজন ব্যালাড সিংগারের মতো মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, সাটিনের ফ্রক গায়, ছোটবাবুর পাশে সেও দাঁড়িয়ে আছে। আর একজন, সে কে? কিছুতেই মনে আসছে না। সাদা দাড়ি, সাদা চুল, লম্বা মানুষ, বেশ লম্বা, মাথায় সাদা টুপি এবং কিছুটা তীর্থযাত্রীর মতো দেখতে। ক্যাপ্টেন হিগিনসের পাশে সেও মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এতক্ষণে সে ধরতে পারল তিনি এনজিন-সারেঙ। প্রায় গোটা স্বপ্নটাই চোখের ওপর সত্য হয়ে দেখা দিলে ডেবিড উইংসের একপাশে গিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে গেল। থার্ড অফিসার নেমে যাচ্ছে। অন্ধকার রাতে, জাহাজের এমন একটা নীরবতার ভেতরও বোঝা যাচ্ছে, পাঁচ ছ'মাসেই সবার ভেতর ভীষণ একঘেয়েমি এসে গেছে। থার্ড- মেট নেমে যাচ্ছে, যেন ঘুমে টলতে টলতে নামছে। বড় শ্লথগতিতে সে নামছে। সে কি হাঁটতে হাঁটতে অথবা সিঁড়ি ভাঙতে ভাঙতে ঘুমুচ্ছে! সে কি কাপ্তানের ঘরে ঘুমের ঘোরে ঢুকে যাবে। ডেবিডের ইচ্ছে ছুটে গিয়ে থার্ড-মেটকে জাগিয়ে

দেয়। কিন্তু তখনই মনে হল, দরজা খোলার শব্দ। থার্ড-মেট কাপ্তানের ঘরে পৌঁছে গেছে। তার আর নিচে নামার দরকার নেই।

আসলে এটা হয় জাহাজিদের। সফরের সময় যত বাড়তে থাকে তত তিক্ততা বাড়ে। মেজমালোম ডেবিড যা জানত এখন তার উল্টো। সে ভেবেছিল জাহাজ যখন হোমে ফিরবে তখন, কিছুদিন হোমে থাকা, অন্তত ফের এই ভাঙা জাহাজে সফর করতে এক্ষুনি উঠতে হবে না। কিন্তু বুয়েনস্- এয়ার্সে চার্ট করতে গিয়ে বুঝতে পারল, জাহাজের গতি কাপ্তান পাল্টে দিচ্ছে। জাহাজ আপাতত আর হোমে ফিরছে না। কবে ফিরবে কেউ ঠিক বলতে পারবে না। স্বয়ং কাপ্তান নিজেও না। এমন এক কাজ নিয়ে জাহাজ ভেসে পড়বে যে, কেউ আর তখন হোমে ফেরার কথা ভাবতে পারবে না। এসব মনে হলেই মুখে ভয়ঙ্কর বিস্বাদ। আর তখন সারাটাক্ষণ সেই দূরবীণ, পোর্ট অথবা দ্বীপ দেখলেই যা হয়ে থাকে,একটু দেখে ফেলা এবং এসব দেখার ফলেই আজগুবি সব স্বপ্ন, না হলে জাহাজের নিচে কাপ্তান, এবং ছোটবাবু, অথবা ব্যালাড সিংগারের মতো মেয়ে এসব দেখার কি মানে! আর তারপরই যা হয়ে যায়, সে স্বপ্নে পাতলা কুয়াশার ভেতরে কি দেখতে পায়, এবং এভাবে তার রাতের পোষাক নষ্ট হয়ে গেলে মনে হয়, এক্ষুনি সে নিজে বড় একটা হাতুড়ি নিয়ে দমাদম ঘা মারবে জাহাজের বালকেডে। ভাঙ্গা জাহাজ সে একেবারে ভেঙ্গে দেবে।

আর তখন কাপ্তান লগবুকে নুয়ে কী দেখছেন! কি যে এত দেখেন, থার্ড-মেট বুঝতে পারে না। প্রায় তো ঘুরেফিরে একইরকম রিপোর্ট। যতক্ষণ মাথা তুলে লগ-বুক ওকে ফিরিয়ে না দেবেন ততক্ষণ সে সোজা সরল বৃক্ষের মতো দাঁড়িয়ে থাকবে। এবং প্রায় এক নাগাড়ে বিড় বিড় করে পড়ে যাবার মতো, তিনি প্রতিটি কলামের ওপর অর্থাৎ যা যা আছে যেমন—সঠিক কি কোর্স জাহাজের, জাইরো কমপাসের কি কোর্স, জাহাজের যদি কিছু ভুলভ্রান্তি থাকে তারপর স্ট্যাণ্ডার্ড কমপাসের কি কোর্স এবং কি ডিভিয়েশন, বাতাসের গতিপ্রকৃতি, ওয়েদার এবং তার ভিজিবিলিটি, যদি সমুদ্রে ঝড় থাকে তার সি-হাইট, অবশ্য এখন ঝড় নেই বলে, কলামটা তার কাছে তেমন জরুরী নয়, বরং বাদ দিয়ে যাবার মতো পরের কলামে কি আছে দেখার সময় একবার কি ভেবে চোখ তুলে থার্ড-মেটকে দেখলেন, কিছু বললেন না। তারপর আবার টিক, এই শালা ভাঙ্গা জাহাজে কাপ্তানের নক্কিপক্কি বিরক্তিকর। থার্ড-মেটের ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। অথচ মুখে হাসি হাসি ভাব। কি খুশী দাঁড়িয়ে থাকতে পেরে! কাপ্তানের জন্য সে এভাবে যে কতকাল দাঁড়িয়ে থাকতে পারে!

তখনই ট্যাংক এবং বিল সাউণ্ডিং-এর ঘরে এসে পেনসিলটা কানে গুঁজে ডান পাটা বাঁ পায়ের ওপর রেখে, ঠিক অনেকদিন আগের মতো যেন যৌবনেই আছেন হিগিনস্ এমনভাবে থার্ড-মেটকে দেখলেন। জাহাজের ড্রাফট ভীষণ কমে গেছে। খালি জাহাজ। ডিপ ট্যাংক নাম্বার ওয়ান, টু, থ্রিতে জল নেই বললেই চলে। এবং এভাবে জাহাজ নিয়ে চলা ভীষণ রিস্ক। এক নম্বর হোল্ডে দু নম্বর হোল্ডে জল যতটা থাকা দরকার তার চেয়ে কম। তিন নম্বর চার নম্বরে যতটা থাকা দরকার তার চেয়ে বেশি। এখুনি বড় মিস্ত্রি রিচার্ডের ঘরে রিপোর্ট পাঠিয়ে দিতে হবে জল কোথায় কি আছে! ওরা ওদের লগবুকে একবার দেখে নিক। কোথাও ভুলভ্রান্তি হতে পারে। এতসব খুটিনাটি দেখার পরে তার মনে হল কোর্স মেড গুড। তারপর তিনি নাবালকের মতো পাখি সব করে রব পড়ে যাবার ঢঙে পড়ে গেলেন—টোটেল আওয়ার্স ইউজড রাডার পাঁচ, ডি. এফ. —দুই তারপর দেখলেন ক্লক কতটা পিছিয়ে দেওয়া হল এবং ইফ এনি এংকোর বিয়ারিঙ। এতসব দেখেও শেষ হয় না, জাহাজের পজিসান ল্যাটিচুড লংগিচুড দেখলেন এবং পাশে দেখলেন অবজার্ভিং অফিসারদের সাইন।

এত কি যে দেখার আছে। থার্ড-মেটের চোখে কি যে ঘুম! সে তবু একেবারে সোজা। কোন কষ্ট হচ্ছে, বুঝতে দিচ্ছে না। জাহাজ ভাঙ্গা বলে কাপ্তান ভীষণ খুঁতখুঁতে স্বভাবের! না কি এই জাহাজই মানুষটার সব। জাহাজের হাল তবিয়ত সব ঠিক না থাকলে মানুষটারও বুঝি কিছু ঠিক থাকে না। তার তখনই বুকে কম্প দিয়ে জ্বর আসার মতো হৃৎপিণ্ডে ওর জ্বর এসে

গেল। যা খুব সাহসী মানুষের মতো মনে হয়েছে, এখন তাকে তাই হৃৎপিণ্ডে ঝড় তুলে দিচ্ছে। সিগনালিঙ না করে যেন ভালো করেনি। কাপ্তান আটটা বারোটায় সত্যি ঘুমোন না। আদৌ তিনি ঘুমোন কিনা এ মুহূর্তে বিশ্বাস করতে কষ্ট হল। মানুষটা কবে থেকে যেন এ-জাহাজে জেগেই বসে রয়েছেন। সে এখন কিভাবে যে পালাবে।

আর তখন তিনি চোখ না তুলেই বললেন, খারাপ লাগছে?

থার্ড-মেট মাথা চুলকাল।

তিনি বললেন, এ-কাজে আসা কেন!

থার্ড-মেট ভীষণ ঘেমে যাচ্ছে।

—শরীর ভাল নেই?

থার্ড-মেটের হাঁটুতে কাঁপুনি ধরে যাওয়ার মতো। এবং যেন এক্ষুনি মাস্টার চিৎকার করে উঠবেন, গেট এলংগ দেয়ার ইউ লোফার! কিন্তু তিনি তা না বলে শুধু বললেন, খুব শান্তভাবে, এ সেলর উইল এনডিউর মেনি এ হার্ডসিপ! সিগনেলিঙ সম্পর্কে তিনি একটা কথাও বললেন না, বললেন, ইউ মে গো, তিনি সই করে ছেড়ে দিলেন।

তারপর তিনি শুতে যাবার আগে একবার নিচে নামেন। ঠিক নিচেই বনি ঘুমোচ্ছে। বনিকে নিয়ে মাঝে মাঝে খুব অসহায় বোধ করেন। এখন হয়তো মেয়েটা পা মুড়ে শুয়ে আছে। হয়তো এমন গরমেও পাখা চালাতে ভুলে গেছে। এবং দরদর করে ঘামছে। নিচে নেমে তাঁর কিছু করার থাকে না। কারণ ভেতরের দিকে দরজা বন্ধ। দরজা না খুললে তিনি কিছু দেখতে পান না। তবু এটা অভ্যাসের মতো, শুতে যাবার আগে একবার নিচে নেমে দেখা। বনি যত বড় হচ্ছে এবং তিনি যত বুঝতে পারছেন বনি এই জাহাজে এখন মেয়ের মতো থাকতে চায়, তত যেন তিনি সতর্ক হয়ে যাচ্ছেন।

এবং এ ভাবেই হিগিনস আবার সিঁড়ি ধরে ওঠার সময় দেখতে পান, চারপাশে শুধু অন্ধকার, কালো সমুদ্র, কালো আকাশ, গভীর উজ্জ্বল নক্ষত্র, এবং সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাস এখন মাংকি-আয়ল্যাণ্ডের ওপর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। তিনি তখন বুঝতে পারেন শেষ রাতের দিকে সমুদ্রের বাতাস ঠাণ্ডা হতে আরম্ভ করেছে। এবং এখন গিয়ে শুধু শুয়ে পড়া। শোবার আগে একবার নাইট অর্ডার বুকটা চেয়ে নেবেন। সেকেণ্ড-মেটকে বলে দিতে হবে, রাত তিনটেয় একটা বাতিঘর দেখা যেতে পারে, তখন যেন তাকে ডেকে দেওয়া হয়। এসব ভেবে কেবিনের ভেতর যা যা তিনি এই মধ্য যামিনী অন্তে করে থাকেন হাঁটু মুড়ে বসা খৃষ্টের মূর্ত্তির সামনে এবং দেখলেই মনে হবে, মহামহিম ঈশ্বরের কাছে একজন রণক্লান্ত সৈনিকের আত্মনিবেদন —মাথাটা নুয়ে আছে, সাদা চুল মাথায় কদম ফুলের মতো ধবধবে, পাশেই জ্বলছে একটা স্তিমিত আলো, এবং নানারকম সব মোটা বই, কিছু মানচিত্র, যদিও একধারে ওগুলো সরানো, তথাপি মনে হয়'যে যী সাস নিরন্তর এই জাহাজের সীমাহীন নির্ভরতা, কারণ তাঁর মাথার ওপরে তিনি আছেন। এবং নিচে লেখা, ও দাই লর্ড, ইয়োর সি ইজ সো ভাস্ট, এণ্ড মাই বোট ইজ সো স্মল....এবং তখনই মনে হল, একটা চাপা গোংগানি কোথাও থেকে উঠে আসছে। মনে হচ্ছে একদল লোক ছুটে আসছে নিচে, কেউ দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছে এবং অন্ধকারে এত রাতে এমন কোলাহল ভাবতেই দরজার সামনে চিৎকার, ঘোস্ট!!

মিঃ হিগিনস কিছু বুঝতে পারছেন না! একেবারে হতভম্ব।

বড়-মিস্ত্রি রিচার্ড এখন এলিওয়েয়ের কার্পেটের ওপর সংজ্ঞাহীন। রিচার্ড কথা বলতে বলতে শেষ পর্যন্ত আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারেনি। চোখ গোল গোল, এবং লাল টকটকে। শরীরে কোন পোশাক নেই। আতঙ্কে বোধহয় ওর মাথা ঠিক ছিল না। সে বোধহয় কেবিন থেকে লাফিয়ে একদণ্ড দেরি করেনি। ছুটে আসার সময় বোধহয় চিৎকার করছিল ফলে কারো কারো ঘুম ভেঙ্গে গেছে। ওরা দরজা খুলে দেখছে এলি-ওয়ে ধরে বড়-মিস্ত্রি একপায়ে ছুটছে।

উলঙ্গ হয়ে ছুটছে। গরমকাল, গায়ে পোশাক রাখা যায় না। যে-যার কেবিন থেকে দেখছিল। এবং ওদেরও খুব একটা শরীরে পোশাক ছিল না। তাড়াতাড়ি কিছু জড়িয়ে সবাই যখন কাপ্তানের দরজায় হাজির তখন সবাই দেখতে পাচ্ছে, কাপ্তান নিচে নেমে একটা পাতলা চাদরে বড়-মিস্ত্রির শরীর ঢেকে দিচ্ছেন। এবং সবাইকে বলছেন, ওকে ওর কেবিনে রেখে আসতে। ব্যাপার কিছু স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে না।

আর তখনই বড়-মিস্ত্রি ফের ধড়ফড় করে উঠে বসল। সে শুনেছে মিঃ হিগিনস তাকে তার কেবিনে রেখে আসতে বলেছেন। সে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে বলল, নো, নো.....। সবাই ভাবল যাক জ্ঞান ফিরেছে। সবাই কিছুটা যেন আশ্বস্ত। এখন তবে সত্যি কেবিনে পাঠানো যায় না। কে যেন ছুটে বড়-মিস্ত্রির জন্য একটা হাফপ্যান্ট নিয়ে আসতে গেল। কেউ ওর মুখে মাথায় জলের ঝাপটা দিল। বনি পর্যন্ত চিৎকার চেঁচামেচিতে জেগে গেছে। সেও ভুল করে ফেলেছিল। তাড়াতাড়ি গাউন খুলে লম্বা ঢোলা জামা, আর পাজামা পরে ওপরে উঠে এলে, সে না হেসে পারল না। এমন ধাড়ি মানুষটা একেবারে খোকা! ভূতের ভয়ে কেবিন থেকে পালিয়ে এসেছে, আর এই নিয়ে ঠাট্টা সোরগোল যত এমন সব হচ্ছিল তত রেগে যাচ্ছে বড়-মিস্ত্রি। মেসরুম বয়কে দিয়ে এক কাপ গরম কফি এনে খাইয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং কাপ্তান এখন একটু ঘুমোবেন। জাহাজে বড়-মিস্ত্রির দায়িত্ব তাঁর চেয়ে কম নয়। অথচ এখন ছেলেমানুষের মতো ভয়ে ঘামছে। তিনি কিছুটা বিরক্ত না হয়ে পারছেন না। ঘোস্ট জাহাজে থাকে, এবং বয়স বাড়ার সঙ্গে এ-বিশ্বাসটা তার যে না হয়েছে তা না। তার জন্য এভাবে উলঙ্গ হয়ে ছোটা এবং চিৎকার চেঁচামেচি করে সবার ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেওয়া ঠিক না। সব কিছু জীবনে সহজভাবে মেনে নিতে না জানলে জাহাজে আসা এবং কাজ করা শক্ত। অবশ্য এতটা তিনি রিচার্ডকে বলতে পারেন না, বলতে পারেন শুধু, কি দেখেছো?

রিচার্ডের মুখ চোখ এখনও কেমন আতঙ্কে ডুবে আছে। সে শুধু বলল, ঘোস্ট! সে আর কিছু বলতে পারছে না। সাদা চোখে চারপাশে কি খুঁজছে!

—কোথায়? কাপ্তান প্রশ্ন করলেন।

রিচার্ড কিছু বলছে না আর। ওর টাকমাথা, গোলগাল ফুটবলের মতো চেহারা সত্যি ভারি হাস্যকর! কিছুটা এখন মানুষ না ভেবে, মানুষের ডামি ভাবা ভাল। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে থার্ড-মেট। ভেতরের দিকে চিফ-মেট। সেকেণ্ড-এনজিনিয়ার ওর ঘাম মুছিয়ে দিচ্ছে।

কাপ্তান জোরে পাখা চালিয়ে দিলেন, দরজা ফাঁকা করে দিতে বললেন, এবং বয়বাবুর্চি যারা ভিড় করেছিল, তাদের চলে যেতে বললেন। স্টুয়ার্ডের এখন অনেক কাজ, কখন কি লাগবে, কাপ্তান তাকে যেতে না বললে যেতে পারে না সে। সেও বাইরে বোট-ডেকে পায়চারি করছে। সেকেণ্ড-মেট এসে, ফিস ফিস করে কি বলে গেল বনিকে। বনি এবার হা-হা করে হেসে উঠল। এটা কাপ্তানের নিজেরও ভাল লাগল না, সবাই হয়তো একটু বেয়াড়া ভাবল বনিকে। কাপ্তান বনির দিকে চেয়ে বললেন, তুমি জেগে থাকবে না বনি। নিচে যাও।

সুতরাং বনি আর থাকতে পারে না, বনি এমনিতে রিচার্ডকে পছন্দ করে না, বন্দরে বনি দেখেছে, খোঁড়া লোকটা ভীষণ ধূর্ত। ধূর্ত না হলে সব বন্দরেই সে মেয়ে পাবে কি করে! কি সব সুন্দর সুন্দর মেয়েরা এই ধূর্ত লোকটার কাছে ধরা দেয়। সে টাকা দিয়ে ওদের পুষে রেখেছে। যেন লোকজন ঠিক করাই আছে, অথবা সে এই গোটা পৃথিবীর অধীশ্বর, যখন যে বন্দরে থাকবে, সেখানেই ভোগের নিমিত্ত উপাচার। উপাচার না হলে এই ধূর্ত মানুষটা আরও শয়তান হয়ে যায়। যত শয়তান হয়ে যায় তত বেশি দাবার ছকে ঝুঁকে থাকে। ভেতরের অদম্য আকাঙ্ক্ষাকে সে কেমন নিজের প্রতিপক্ষ ভেবে খেলায় মেতে গিয়ে ভুলে থাকে! বনির এমনই মনে হয় খোঁড়া লোকটাকে দেখলে। ওর ইচ্ছে ছিল ক্রাচ দুটো বন্দরে ঢোকার আগে সমুদ্রে সবার অলক্ষ্যে ফেলে দেবে। এবং এভাবে যদি লোকটাকে অন্তত একটা বন্দরে অকর্মণ্য করে রাখা যায়। কিন্তু কি আশ্চর্য সে তার বাবার টেবিলের পাশে, এলি-ওয়েতে এমনকি বোট-ডেকে কোথাও ক্রাচ দেখতে পেল না। সে তাহলে একপায়ের ওপর ভর করে

এতটা ওপরে উঠে এসেছে! সে নিজেই কেমন ভেবে ফেলল, রিচার্ড নিজেই একটা ভূত। ভূত না হলে সারাদিন সারামাস সমুদ্রে কারো সঙ্গে একটা কথা না বলে থাকা একেবারে অসম্ভব।

তারপরই মনে হল, সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। জাহাজে তবে এই রিচার্ডের চেয়েও বড় ভূত আছে। সে রিচার্ডকে খুব কাবু করে ফেলেছে। বনির খুব ইচ্ছে হল ফের জোরে হাসে। সেকেণ্ড- এনজিনিয়ার কর্তার মুখে আতঙ্ক দেখে কি ভালমানুষ! যেন কিছু জানে না কিছু বোঝে না! বনি দরজা বন্ধ করার সময় বলল, আর্চি তুমি আরও বড় ভূত। সব আমি বুঝি। আমাকে পুরুষ ভেবেই এত, মেয়ে জানতে পারলে না কি করতে!

সকালবেলা খবরটা জাহাজে ফের রটে গেল। বড়-মিস্ত্রি জাহাজে ভূত দেখেছে। এবং ভূত দেখে বড়-মিস্ত্রি সোজা এক পায়ে লাফিয়ে কাপ্তানের কেবিনের সামনে মূর্ছা গেছে। কাপ্তান এটা ক্রুদের ভিতর রটে যাক চাননি। তিনি বয় বাবুর্চিদের বলতে নিষেধ করে দিয়েছিলেন। স্টুয়ার্ডকে ডেকে বলেছিলেন, এসব ভূত টুত সংক্রামধ ব্যাধি। একজন দেখলে সবাই একে একে দেখতে থাকে। শেষ পর্যন্ত ভূতের ভয়েই জাহাজে বিদ্রোহ দেখা দেবে বিচিত্র কি! তিনি এই সব ভেবে শেষ পর্যন্ত স্টুয়ার্ডকে এমন বলেছিলেন। তাছাড়া রিচার্ড জাহাজে তার পরেই, এমন একজন মানুষের পক্ষে ভূত দেখা ঠিক না, দেখলেও আতঙ্কে হৈ-চৈ বাঁধিয়ে দেওয়া আরও বেঠিক। এবং তিনি নিজেও এ-বয়সে মাঝে মাঝে দেখতে পান এলিস তার পাশ কাটিয়ে কেবিনে ঢুকে যাচ্ছে, এমনকি মনে হয় গাউনের বাতাস শরীরে পর্যন্ত লাগছে! মাঝে মাঝে এলিসের শরীরে সঠিক আতরের গন্ধটা পর্যন্ত পান! কেবল মাঝে মাঝে খুব বেশি ভয় হলে বনিকে ডাকেন, তারপরই বুঝতে পারেন মনের ভুল। তিনি আগের মতো হয়ে যান। বনিকে বলেন, না কিছু না। আর কিনা রিচার্ড একটা আহাম্মকের মতো ভূতের ভয়ে মূর্ছা গেল!

রিচার্ডের কেবিন পাল্টে দেওয়া হয়েছে। আর বিস্ময়কর ঘটনা, জাহাজে রিচার্ডের পেছনে পেছনে লরেনজো-মরকুইসের ঘাট থেকে উঠে এসেছে তাজা একজন ভূত। অথবা বলা যায় ঘাটে ঘাটে সেই এক মুখ, সে ভেবে পায় না এটা কি করে সম্ভব!

রিচার্ড বলেছিল কাপ্তানকে, ডারবানে ওকে আমি ফের দেখি। শহরের একপাশে একটা অন্ধকার মতো জায়গায় সেই রেল ব্রীজ পার হয়ে, সেই এক মুখ, ওকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, ওর জন্য আমি জাহাজে ফিরে আসতে পেরেছিলাম, ও আমার জেব খালি না করে দিলে ঠিক কারো ঘরে চলে যেতাম। এসে দেখি মিলড্রেড আমার কেবিনে। ওকে ধন্যবাদ জানানো দরকার ভেবেছিলাম।

হিগিনস আর্চি অথবা ডেবিড এমন শুনে প্রথমে ভেবেছিল পকেটমার-টার হবে। বড় বেশি নেশা করে পোর্টে নামলে এমনতো হবেই। কিন্তু পরে যা বলল রিচার্ড, তাতে ওরা বোকা বনে গেল।

রিচার্ড বলেছিল, ধন্যবাদ জানাতেই দেখলাম অন্ধকারে মিশে গেল ছায়াটা। সঙ্গে সঙ্গে, বিশ্বাস করুন মিঃ হিগিনস ঈশ্বরের দোহাই, আমার কম্প দিয়ে জ্বর এসে গেল। কোথায় লরেনজোমরকুইস, কোথায় ডারবান, সেই লোকটা হুবহু এক রকমের দেখতে, আমি এতটুকু ভুল দেখিনি। মেয়েমানুষের দালালটা আমার পেছনে এভাবে কেন যে লাগল! কাকে আমি বোকার মতো ধন্যবাদ জানাতে গেলাম!

সবাই চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল। রিচার্ড শুয়ে আছে তখন। ওর পাশে সবাই জেগে। ওর কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে বোঝা যাচ্ছিল। কাপ্তান সবটা না শুনে যেন নড়তে পারছিলেন না।

—আমি কিন্তু কাউকে কিছু বলিনি। আমার সাহস তো কারো চেয়ে কম নয়, বলেই ফ্যাক ফ্যাক করে কেঁদে দিয়েছিল বড়-মিস্ত্রি। দোহাই আপনার মিঃ হিগিনস জাহাজ থেকে আমি নেমে যাব। আপনি অন্য কাউকে দেখুন।

কাপ্তানের চোখ কপালে ওঠার দাখিল তখন। তিনি বলেছিলেন, তারপর?

—তারপর ফের বুয়েনএয়ার্সে। বেশ কিছুদিন ভাল ছিলাম। শহরে বেশ ক'দিন যাওয়া-আসা হচ্ছে। আর কিছু দেখছি না। বেশ ভাবলাম, ঘাড় থেকে ভূত নেমে গেছে। কিন্তু হায়, ঐ সেদিন, মানে যেদিন আপনার শহরে বেশ গণ্ডগোল, আইখম্যান পালিয়ে আছে, তাকে ধরার জন্য কারা ফাঁদ পেতেছে এবং গণ্ডগোল, সেদিন তো আপনি জানেন মিঃ হিগিনস্, কি কুয়াশা সারা শহরময়। বন্দরে আমাদের নামতে উঠতে পর্যন্ত অসুবিধা হচ্ছিল, সেদিন সন্ধ্যায় দেখি কুয়াশার ওপর দিয়ে ভেসে ভেসে এল, এসে ঠিক আমার মুখের ওপর ঝুঁকে, আমি কি করি বলুন, একেবারে মুখের ওপর দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। সেই মুখ, নীল পোশাক, কামানো দাড়ি গোঁফ দেখতে ইণ্ডিয়ানদের মতো। হুবহু এক, এক চেহারা। জাহাজে কখনও কোন বড়-মিস্ত্রি দালালদের পয়সা মেরেছে বলে জানি না। আপনি জানেন স্যার? পয়সা মারলে মরার পর শোধ নিতে পারে। আমি তো এক পেনি কাউকে ঠকাইনি! তবে আমার কেন এমন হল। আবার কান্না।

কাপ্তান বিরক্ত হয়ে বললেন, মনের ভুল রিচার্ড। তুমি মনের ভুলে এ-সব দেখে যাচ্ছ। তারপর কাঁটার মতো ইণ্ডিয়ান কথাটায় খোঁচা খেলেন। তিনি তাকালেন চীফ-মেটের দিকে।— তুমি কিছু বুঝতে পারছ।

চীফ-মেট বলল, নো স্যার।

—তুমি? তিনি আর্চির দিকে তাকালেন।

—নো স্যার।

—আমাদের জাহাজের কেউ পিছু লাগেনি তো!

আর্চি হাসল। এত সাহস তারা পাবে কোথায়?

স্টুয়ার্ড ডাকল, স্যার।

হিগিনস স্টুয়ার্ডের দিকে তাকালে সে কেমন আমতা আমতা করে বলল, কিছু একটা জাহাজে আছে স্যার। বলেই সে তার অভিজ্ঞতার কথা বলল। কারণ সে, রাতে কখনও কখনও সহসা জেগে যায়। তার মনে হয়, ঠাণ্ডা ঘরের দরজায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে। সে উঠে দরজা খুলে দেখেছে স্টোর- রুমের দরজা তেমনি লক করা। সে তবু ভেবেছে ভেতরে যদি কিছু হয়ে থাকে! দরজা খুলে আলো জ্বেলে দিতেই ওপরে তেমনি কাপ প্লেট ডিস, নানাবর্ণের ক্রোকারিজ, এবং পাশে সিঁড়ি, নিচে নেমে গেছে। ডানদিকে সব্জির পাহাড়। ফল এবং ডিমের ঝুড়ি থাকে থাকে সাজানো। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা, আর সামনে কোল্ড স্টোরেজ, বড় বড় গরু ভেড়া মুরগীর মাংস আস্ত হুকে ঝুলছে। কেউ ভেতরে টেবিল টেনে বসে নেই। বাটলার তখন ভীষণ ঠাণ্ডা মেরে যেত। শাক-সব্জি এবং মরা মাংস মিলে একটা উৎকট গন্ধ থাকত, ভয়ে সে তাও টের পেত না।

ডেবিডও একবার ঘুরে গেছে, কেমন আছে রিচার্ড দেখার জন্য। সে এসে বলেছিল, কিছু হয়তো আছে জাহাজে। সে বলল, ছোটবাবুও ভূত দেখেছে। এবং তার সমর্থন চারপাশ থেকে। কাপ্তান জানেন, যে কেবিনে, রিচার্ড থাকে, ঠিক সেই কেবিনে, লুকেনার আত্মঘাতী হয়েছিল। যদিও এ-সব তিনি বাজে কথা ভেবে থাকেন, যদিও মাঝে মাঝে আবার মনে হয় হয়তো কোথাও এর সত্যাসত্য আছে, কারণ, তিনি এই সমুদ্র অথবা সৌরজগতের কতটুকু জানেন। তখনই রিচার্ড ফের উঠে বসেছিল, আপনি বিশ্বাস করুন মিঃ হিগিনস, বন্দরে না হয় হল, কিন্তু জলে, বিশ্বাস করুন আমার জন্য একটা ডিম একটা আপেল, অবশ্য ডিম একটা নয়, সে স্টুয়ার্ডের সঙ্গে বন্দোবস্ত করে একটার বদলে দুটো নেয়, দুটো নিতে পারে না, নেওয়ার নিয়ম নেই, সে সেজন্য একটা ডিমের কথা বলল।

সে বলেছিল মিঃ হিগিনস আমার সঙ্গে রোজ মেসরুম-বয়ের ঝগড়া হত। সকালে আমি ডিমের অমলেট খাই। নিজেই করে নিই। একটা আপেল খাই, খুব সকালে। তখন কেউ ঘুম থেকে ওঠে না। কিন্তু ক'দিন থেকে দেখি টেবিল থেকে সব উধাও।

হিগিনস মেসরুম-বয়কে ডেকে সব জেনে নিতে পারতেন। কিন্তু কি হবে! তিনি চুপচাপ শুনে যেতে থাকলেন।

রিচার্ড বলেছিল ফের, প্রথম মনে হতো অধিক নেশার জন্য আমি ভুল দেখছি। একটা লম্বা কালো হাত, গলে পড়ছে পোর্ট-হোলে। কি কালো! তারপর কেমন শূন্যে ঝুলে থাকত আপেলটা কিছুক্ষণ। চোখের ওপর এমন ঘটলে কতদিন আমি মাথা ঠিক রাখি বলুন!

রিচার্ড ফের বলেছিল, আজকে আমি কিছু খাইনি। মুখ শুঁকে দেখুন। সে প্রায় উঠে কাপ্তানের মুখের কাছে হা-হা করতে থাকল। কোনো গন্ধ আছে! নেই। তবে। আমি দেখলাম, পোর্টহোলে সেই মুখ, বীভৎস ভয়ঙ্কর। আমি নেমে যাব। আমি আর জাহাজে থাকব না। আপনি আমাকে কিছুতেই রাখতে পারবেন না মিঃ হিগিনস।

হিগিনসের মনে হয়েছিল অকেদিন থেকে রিচার্ড একটা ভয়ের ভেতর পড়ে গেছে। ভয়ের ভেতর পড়ে গেলেই নানাভাবে মন দুর্বল থাকে। সে তখন কখনও লম্বা হাত, এবং বীভৎস মুখ দেখতে পায়। আপেল অথবা ডিম চুরি যাবার ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য মনে হচ্ছে না। বয়-বাবুর্চিদের স্বভাব খুব ভাল না। বড়-মিস্ত্রি যখন সব সময় মৌজে আছেন, তখন তারাও একটু মৌজে থাকার জন্য ছল চাতুরী খেলতে পারে। তিনি মেসরুম বয়কে ডেকে ধমকে দিয়েছিলেন। তারপর তিনি ঘড়ি দেখে বুঝতে পেরেছিলেন, সকাল হতে দেরি নেই। অন্ধকারে তিনি বোট-ডেকে উঠে গিয়েছিলেন। চারপাশের নিস্তব্ধ অন্ধকারে, আকাশের নক্ষত্রমালার ভেতর কি দেখতে দেখতে ভেবেছিলেন এভাবে এত সব মৃত আত্মা এই জাহাজে কবে থেকে রয়েছে! যেমন এলিস, তাঁর প্রথম পক্ষের স্ত্রী তিনি যেখানেই যান, এলিস তাঁকে ছেড়ে থাকে না। এলিস বোধহয় তাঁকে ছেড়ে থাকতে পারে না।

সকালবেলাতে এটাও একটা খবর ছিল, কাপ্তান বোট-ডেকে ডেক-চেয়ারে ঘুমিয়ে আছেন। কেউ ডাকতে সাহস পায়নি। বনি এসে তাঁকে ডেকে তুলেছে এবং তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে। এমন- ভাবে তিনি কখনও ঘুমোন না। বোধহয় স্বপ্নটপ্ন দেখেছেন, কী স্বপ্নে দেখেছেন মনে করতে পারছেন না। কেবল খুব দূরে যেন এক কুয়াশাজালে কেউ দাঁড়িয়ে থাকে সব সময়। আর বলছে আমাকে চিনতে পারছ?

সে আর কেউ না। তার প্রথম পক্ষের স্ত্রী এলিস। কি করুণ আর বিষণ্ণ মুখ। হিগিনস কেমন ধীরে ধীরে তখন হাঁটতে থাকেন। বনি পাশে না থাকলে তিনি যেন চিৎকার করে বলতেন, না, আমি তোমাকে কখনও কোথাও দেখিনি। তুমি আমাকে প্লিজ কষ্ট দেবে না। প্লিজ প্লিজ.....!

॥ আঠার ॥

অমিয় চুপচাপ বাংকে শুয়ে আছে। খুব হৈ-চৈ চলছে ডেকে এবং সবাই বড়-মিস্ত্রির ভূত দেখার ব্যাপারে নানারকম মন্তব্য করছে। তখনও নির্বিকার অমিয়। সে শুয়ে শুয়ে কোত্থেকে একটা প্যান- আমেরিকান গাইড-বুক পেয়েছে তাই পড়ছে। পৃথিবীর কোন বন্দরে, অথবা কোন শহরে ভাল খাবার, ভাল দৃশ্যাবলী আছে, এখন এটা জানা যেন তার বেশি জরুরী। ছোটবাবু নিচে বসে রয়েছে, সেও বের হয়নি। মৈত্র মুখ গোমড়া করে রেখেছে। যেন এখুনি অমিয়র ওপর ফেটে পড়বে।

মৈত্র নিচে বসে রয়েছে বলে অমিয়র মুখ দেখতে পাচ্ছে না। সকাল সাতটায় সবার চা চপাটি খেয়ে পরীর জন্য ঠিকঠাক থাকার কথা, তখন অমিয় বই পড়ছে মনোযোগ দিয়ে। এবং ছুটির দিনের মতো অমিয় কখন উঠবে, কখন চা চপাটি খাবে ওরা যেন ঠিক বলতে পারে না। এই যে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেল, যে কোন সময় অমিয় ধরা পড়তে পারে, তার জন্য তার যেন কিছু আসে যায় না। মৈত্র এতে আরো ক্ষেপে যাচ্ছে। এখন তো ওর উচিত বসে কিছু একটা পরামর্শ করা। দুটো ডিম, একটা আপেল যদি অমিয় একা খেত, ওরা যদি সমান ভাগে ভাগ করে না খেত, তবে মৈত্রের কিছু আসত না। অমিয় একা হ্যাপা সামলাতো। এখন যে চুরির দায়ে ওরাও ধরা পড়েছে। আর কি সাহস পোর্ট-হোল দিয়ে হাত বাড়িয়ে বড়-মিস্ত্রির টেবিল থেকে ডিম আপেল চুরি করে আনা- না ভাবা যায় না। রাগও হচ্ছে আবার কোথায় যেন একটা মায়াও গড়ে উঠছে। অমিয়র সাহস আছে।

কিন্তু তারপরই যখন মৈত্রের মনে হয়, সেও আছে সঙ্গে, ধরা পড়লে ছোটবাবুও রেহাই পাবে না তখনই চিৎকার করে চুল ধরে টেনে নামাতে ইচ্ছে হয়। নামিয়ে দু লাথি, এবং চড়-থাপ্পড়। অথচ সে জানে, কোন গণ্ডগোলই করা যাবে না। চুপচাপ এখন হজম করে যাওয়া বাদে তাদের উপায় নেই। ব্যাপারটা কত দূরে গড়াবে কেউ বলতে পারে না। শুধু লক্ষ্য করে যাওয়া। অমিয়কে কতবার বলেছে, কিভাবে ম্যানেজ করছিস অমিয়, সে কিছু বলত না। কেবল বলত, খা শালা। হারামে পেয়েছিস খেয়ে নে।

জাহাজে বাসী গোস্ত আর ডাল, বাসী বাঁধাকপি ভাজা এবং খেতে খেতে মুখে এমন অরুচি যে এই দুটো ডিম এবং আপেল মধ্যরাত্রিতে ওদের কাছে ভীষণ লোভের। ছোটবাবু মাঝে মাঝে পরিজ অথবা কেক নিয়ে আসে, মৈত্র জানে, জ্যাক ছোটবাবুকে খুব পছন্দ করে। ওদের ভাল কিছু হলে জ্যাক ছোটবাবুর জন্য রেখে দেয়। কখনও কমলা, কলা আবার ফ্রাইড এগ যখন সে আনতে পারে, সবাই বসে ভাগ করে খায়। ডেকে যে দুজন আছে অর্থাৎ বঙ্কু আর অনিমেষ মজুমদার ওরাও তখন বাদ যায় না। মনু অথবা মান্নানকে একদিন ডেকেছিল খেতে, ওরা খায়নি। সাহেবদের গ্যালিতে শুয়োর রান্না হয় বলে, কিছুই ওরা খেতে চায় না। যত ভাল খাবার হোক ওরা খাবে না। সুতরাং জ্যাক আলাদা করে ভাল কিছু দিলে এক সঙ্গে পাঁচজন, এবং তখন অনিমেষ গ্যালিতে নেচে টব বাজাবে, দু-এক দানা খাবে, আর জাহাজ এবং জাহাজিদের জীবন সম্পর্কে ইতর রসিকতা। এভাবেই যখন দিন যাচ্ছিল, তখন অমিয়টা ওদের কি যে ফ্যাসাদে ফেলে দিল।

অমিয় এখনো উঠছে না। মৈত্র নিচে বসে রয়েছে। অমিয় ওপরের বাঙ্কে, রেলিঙে কম্বল বিছানো, কেবল অমিয়র দুটো হাত, এবং বইটা দেখা যাচ্ছে। ডান পাটা সে বাঁ পায়ের ওপর রেখে নাচাচ্ছে সেটা সে দেখতে পাচ্ছে। যত অমিয় পা নাচাচ্ছিল, তত মৈত্রের রক্ত টগবগ করে ফুটছিল। হারামজাদা কি বুঝতে পারছে না, তারা কতটা বিপাকে পড়ে গেছে। অমিয় কি ওদের বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে মজা দেখছে। সে আর তখন কি করে। সে ডাকল, অমিয়।

ছোটবাবুর মুখ দেখলেই বোঝা যায় সে খুব উদ্বিগ্ন। এবং যা খবর তাতে বোঝাই যায় সব এই অমিয় করেছে। বড়-মিস্ত্রিকে উলঙ্গ করে ছেড়েছে।

কোন সাড়াশব্দ না পেয়ে যেন একান্ত সোহাগে ডাকা—অমিয় তোকে ডাকছি আমি।

—আমাকে দাদা তুমি ডাকছ! বলে একেবারে সুবোধ বালকের মতো নেমে পড়ল।—বল।

—এখন কি হবে!

—কিছু হবে না।

—ওরা কি বুঝতে পারবে না বলছিস?

—বুঝতে পারলে কি হল!

—মাসতার দিতে বলবে। দ্যাখো এদের কেউ তোমার ডিম, আপেল চুরি করেছে কিনা!

—তা দিলে কি করা! বলেই সে আবার কিসব দৃশ্যাবলী দেখা যেন তার বাকি। সে এসব না দেখে ফালতু কথাবার্তা শুনতে রাজী না, সে ফের মনোযোগের সঙ্গে পাতা ওল্টাতে থাকলে মৈত্র আর ধৈর্য ধরতে পারল না। চিৎকার করে উঠল, রাসকেল তোমার জন্য আমরা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ি! সে উঠে গিয়ে হয়ত একটা ঘুঁসিই মেরে দিত। ছোটবাবু একটা কথাও এতক্ষণ বলেনি, এবার সে বলল, কি হচ্ছে মৈত্রদা! পাগলের মতো কি করতে যাচ্ছ!

মৈত্রের সত্যি খেয়াল হল, এটা করা ঠিক না। যা অমিয়র গোঁয়ার্তুমি, সে হয়তো মারামারি লাগিয়ে দেবে। এবং চিৎকার চেঁচামেচিতে সবাই ছুটে এলে, কিছু একটা বলতে হবে। সব কথা বলে দিতে পারে অমিয়। ও কেমন মরিয়া। জাহাজে ওঠার পরই মৈত্র এটা লক্ষ্য করেছে। কেবল কি ভাবে, আর বড় বড় কথা। এবং স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে অমিয়। সে যে জাহাজে খালাসির কাজ নিয়ে এসেছে এটা একটা অজুহাত মাত্র। অমিয় জীবনে বড় কিছু করতে চায়। এমন একটা কিছু করে দেশে ফিরবে, যা দেখে ওর বাবা এবং ভাইয়েরা ভেবে ফেলবে, বাড়ির জাহান্নামে যাওয়া ছেলেটা রাজপুত্র হয়ে ফিরেছে।

সুতরাং মৈত্র বাড়াবাড়ি কিছু করল না। চুপচাপ আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসে পড়ল।

অমিয় বলল, কি দাদা চা ফা খাবে না। খিদে পায় না?

মৈত্র কোন কথা বলল না। ছোটবাবু বলল, চাবি দাও।

মৈত্র চাবি ছুঁড়ে ফেলে দিল।

অমিয় সুড়সুড় করে উঠে গেল। লকার খুলে চা চিনি কনডেনস্ড মিল্ক বের করে সোজা ওপরে উঠে যেতে থাকলে, মৈত্র বলল, চা আমি খাব না।

অমিয় সিঁড়ির মুখে থামল। সামান্য হাসল। তারপর ঠোঁট বাঁকিয়ে বিড়বিড় করে বলল, কি আমার জাহাজিরে! ভয়ে টেঁসে গেছে! বড় বড় কথা যত!

আসলে মৈত্র নৌ-বিদ্রোহের সময় কি কি করেছিল, এবং কি কি কারণে সে দুবার জাহাজে ব্ল্যাক- লিস্টেড হয়েছিল তার ফিরিস্তি দেবার সময় দেখাতে চায় সে কতবড় জাহাজি, আর এখন!

চা, অমিয় তিনটে মগে আলাদা আলাদা করে এনেছে। মৈত্রের জন্য একটা বেশি চপাটি। মৈত্র চপাটি বেশি খেতে ভালবাসে। এখন তাকে যে করেই হোক মৈত্রের সঙ্গে সমঝোতা করতে হবে। সে এসেই পায়ের কাছে বসল, এবং কিছুটা নিবেদনের ভঙ্গীতে চা-এর মগ আর চপাটি তুলে দিল হাতের কাছে।

—খাব না বললাম!

—খাও গুরু। তুমি শালা গুরু রাগ করলে আমাদের কি হবে! আর এমন করব না। এই দ্যাখো কানমলা নাকমলা খাচ্ছি। আচ্ছা তবু রাগ যাচ্ছে না, সে মৈত্রের পা টেনে একটা কল্পিত রেখা টেনে বলল, এই দ্যাখো নাকে খত দিচ্ছি, আর কি চাই বল!

মৈত্র আর কি করে! তবু বুকটা ধুক্‌ধুক্ করতে থাকে, সিঁড়িতে কোনও পায়ের শব্দ দ্রুত নেমে এলে মনে হয়, এই বুঝি ফোকসালে ঢুকে সারেঙ বলবে, তোমরা বাপুরা বোট-ডেকে

যাও। মাসতার দিতে হবে। অথবা ওপরে কেউ চিৎকার করে কথা বললেই বুকটা ধড়াস করে উঠছে। কেউ বুঝি এতক্ষণে টের পেয়ে গেছে, ডিম এবং আপেল, বড়-টিণ্ডালের ফোকসালে মাঝে মাঝে দেখা গেছে—সব কিছুর দায় বড়-টিণ্ডালের। আমাদের সারেঙ ঝুটঝামেলায় টানবেন না। এসব ভেবে মৈত্র খুব মুষড়ে পড়েছিল আর কিনা অমিয় এখন ঠাট্টা তামাসা করছে। তবু কেন যে মৈত্র অমিয়র ওপর রাগ করে থাকতে পারে না। ছোটবাবুও চা হাতে নিয়ে বসে রয়েছে, সে না খেলে কেউ খাচ্ছে না, তখন মৈত্র মাথা নিচু করে চা চপাটি খেতে থাকলে, অমিয় বলল, কেবল তুমি আমার দোষই দেখছ!

ছোটবাবু বলল, এখন আর কথা না। যা বলার বাংকারে গিয়ে বলবি। জামাপ্যান্ট পাল্টে ওরা ওদের ওয়াচের পোশাকে তাড়াতাড়ি ওপরে উঠে গেল। সোজা বোট-ডেকে উঠে, আবার ফানেলের গুঁড়ি ধরে নিচে নেমে গেল। পেছনে ছোট। ছোটকে দেখেই জ্যাক দৌড়ে এসেছিল। রাতের এমন মজার ঘটনা, ছোটবাবুকে গোপনে বলতে না পারলে যেন ওর খাবার হজম হচ্ছে না। এতক্ষণ বোধহয় চিপিং হাতে কখন ছোটবাবু ওয়াচে নামবে তার জন্য অপেক্ষা করছিল জ্যাক। আর জ্যাকের যে কি করে ধারণা জন্মেছে, যত গোপন খবর, সব একমাত্র ছোটবাবুকে সে দিতে পারে। ছোটবাবু তার কোন ক্ষতি করতে পারে না।

যদিও জাহাজে এ-খবর গোপন থাক কাপ্তান চেয়েছিলেন, কিন্তু পৃথিবীতে কেন যে কোন খবরই নানা কারণে শেষপর্যন্ত গোপন থাকে না। স্টুয়ার্ড প্রথমে বলেছিল চিফ-কুককে, আর কাউকে কিন্তু বলবে না, বড় সাব উলঙ্গ হয়ে ভূতের ভয়ে ছুটেছে এটা ক্রুদের ভিতর জানাজানি হোক তিনি চান না। সাহেব মানুষ ভূতের ভয়ে উলঙ্গ হয়ে ছুটবে, ছিঃ কি যে প্রেস্টিজের ব্যাপার—এই প্রেস্টিজ কথাটা শেষ পর্যন্ত সবার কানে উঠে গেছে। সেকেণ্ড-কুক ধর্মভীরু মানুষ গোয়ানিজ, অল্প অল্প বাংলা জানে, সে সত্যিকথা গোপন রাখতে পারে না, এবং খবরটা যেহেতু ভারি মজার, সকাল হতে না হতেই সমস্ত ফোকসালে গুজবের মতো ছড়িয়ে পড়ল। ওরা ঘুম থেকে উঠেই তারপর শুনছিল, জাহাজে ভীষণ কাণ্ড, আবার ভূত। ছোটবাবু, আর বড় সাব দুজনেই তবে ভূত দেখেছে। ছোটকে কেউ কেউ প্রশ্ন করেছিল, তোর ভূত দেখতে কেমন।

সে বলেছিল, কি জানি মনে নেই। একটা লম্বা ছায়ার মতো দেখেছিলাম। কেমন ভয় পেয়ে গেলাম। আসলে মহসীন চাচা এজন্য দায়ী। এমন সব ভূতের গল্প জাহাজের করেছেন যে গভীর রাতে অন্ধকারে জাহাজের কোন গলিঘুঁজিতে দাঁড়ালেই মনে হয়, এই বুঝি একটা লম্বা হাত এগিয়ে আসছে। গা কেমন ছমছম করতে থাকে। আসলে বুঝতে পারি, কিছু না। মনের ভুল সব। কিন্তু অন্ধকার রাতে কিছুতেই সেটা বিশ্বাস করতে পারি না।

এবং দিনের বেলায় ছোটবাবু সব বুঝতে পারে। রাতের বেলা কত সব আলো চারপাশে। মাস্তুলে, ডেরিকে, সর্বত্র এ-ভাবে আলোর মালা দুলে দুলে জাহাজের সব ছায়া কখনও ছোট কখনও বড় করে দেয়। এবং নিজের ছায়াই সে কতবার দেখেছে, কখনও লম্বা হয়ে যায়, খাটো হয়ে যায়। কে কোথা দিয়ে হেঁটে বেড়ালে তার ছায়া নিচে সহজেই এসে পড়তে পারে, এবং অস্বাভাবিক কিছু ভেবে, ভূত ভূত বলে চিৎকার করে ওঠা অসম্ভবের কিছু না। জ্যাক তখন নামতে নামতে অজস্র কথা বলছে। ছোট আগে, জ্যাক পেছনে, সিঁড়ি ভেঙ্গে নামছে। জ্যাক সব ঘটনা কানে কানে বলছে, আর বলেই হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে। কি যে উচ্ছ্বল! আর সহসা সে কেন যে বলে ফেলল, আর্চি আমার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে, আমার ভয় করে ছোট।

ছোটবাবুর এ সব শোনার সময় নেই। সে জ্যাককে নিয়ে বাংকারে ঢুকে যেতে পারলে বাঁচে। জ্যাক আসল খবর দিতে পারবে। কাপ্তান এ ব্যাপারে কিছু ভাবছেন কিনা, অর্থাৎ কোনও ইনভেস্টিগেশনে যাবেন কিনা, যদি যান তবে সেটা কখন, অথবা সে কি গোটা ব্যাপারটা জ্যাককে বলবে, জ্যাক এ- ব্যাপারে যদি ওদের সহায় হয়, এভাবে নানা ভাবনা তাকে পেয়ে বসলে দেখল, অমিয়কে নিয়ে মৈত্র নিচে নেমে গেছে। ওরও নামার দরকার।

অন্য সব আগওয়ালারা এসে গেছে। সে ইচ্ছে করলে এখন নাও নামতে পারে। বাংকারে ঢুকে কথাবার্তা বলতে পারে জ্যাকের সঙ্গে। সে গাড়ি গাড়ি কয়লা ফেলবে, জ্যাক পাশে দাঁড়িয়ে কত অজস্র কথা বলবে তখন, আসলে সে আজ চায় শুধু একটা কথা জানতে, তারপর কাপ্তান কি করছেন?

সে বলল, জ্যাক, বড়সাব আসলে সত্যি ভূত দেখেছেন তো!

—কি যে বল না! সারাক্ষণ...বলেই মুখের কাছে দুহাতে এমন অঙ্গভঙ্গী করল যে, বেহুঁস, মাতাল, কি দেখতে কি দেখে থাকে, বাবার খেয়েদেয়ে কাজ নেই, ঐ নিয়ে পড়ে থাকবে। পাজি নচ্ছার মেস- রুম-বয়ের কাজ সব। বাবা নাকি খুব ধমকে দিয়েছেন, এসব ডিম-আপেল যেন আর কেউ চুরি না করে। আবার হলে কেলেঙ্কারি হবে।

কিছুটা ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতো যেন সে এখন অজস্র কথা বলে যেতে পারে, জ্যাক দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলতে ভালোবাসে। কখনও একটা বড় কয়লার চাঙের ওপর বসে কথা বলতে ভালোবাসে। আজ কথায় কথায় বার বার আর্চির কথা বলছে। আর্চিকে কি করে একটা বড় রকমের শিক্ষা দেওয়া যায়, সে তো এসব তার বাবাকে বলতে পারে না, বলতে গেলেই কাপ্তান ওর দিকে সংশয়ের দৃষ্টিতে তাকাবেন। তাহলে মেজ-মিস্ত্রি আর্চি কি টের পেয়েছে, বেঁটে-খাটো চৌকো মুখের লোকটা, কি টের পেয়েছে, জ্যাক আসলে মেয়ে। বনি, জ্যাক সেজে এ-জাহাজে ডঠে এসেছে। সুতরাং যা কিছু গোপন শলাপরামর্শ সে ছোটবাবুর সঙ্গে করতে পারে।

ছোটবাবু বলল, হাঁ করে দেখছে তো কি হয়েছে!

—না, এটা ভাল না ছোটবাব্!

—কেন ভাল না।

—সে তুমি বুঝবে না।

সত্যি ছোটবাবু এসব বুঝবে কি করে! সাহেবদের ব্যাপার-স্যাপার আলাদা। সে এই প্রথম এদের ' দেখছে। মফস্বল শহরে সে একজন সাহেবকে দেখেছিল, তিনি পাদ্রী, গীর্জায় থাকেন। কলকাতা শহরে এসে সে দূর থেকে এদের চৌরঙ্গীপাড়ায় দেখেছে। কিন্তু এভাবে দৈনন্দিন জীবনে, কাজের সঙ্গে যুক্ত থেকে দেখা এই প্রথম। ওদের সব কিছুই সে সেজন্য ভীষণ সমীহ চোখে দেখে থাকে। সে বলল, তুমি খুব সুন্দর জ্যাক। তোমাকে সবাই দেখতে ভালবাসে।

—তুমি ভালোবাসো না!

সে বলল, হ্যাঁ। তোমাকে দেখতে আমার ভীষণ ভাল লাগে।

—সত্যি!

–সত্যি।

জ্যাকের চোখ যে চকচক করছে ছোট টের পেল না। বাংকারে অন্ধকার। কয়লার ধূলো উড়ছে। এভাবে জ্যাকের এখানে বেশি সময় দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক না। তাছাড়া এখন মৈত্রদা এবং অমিয় আসবে। জ্যাক থাকলে, খোলাখুলি কথা বলতে পারবে না। সে বলল, জ্যাক খুব ধুলো উড়ছে। তুমি যাও। আমি এখন কয়লা ফেলব। অনেক কাজ।

যদিও ছোটবাবু জানে, জ্যাকের মর্জি হলে যাবে, মর্জি না হলে যাবে না। আবার এও দেখেছে, সেই দুর্ঘটনার পর থেকে জ্যাক আর ওর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে না। বরং জ্যাক আজকাল অতীব সুবোধ বালক যেন। ছোটবাবু যা পছন্দ করে না, জ্যাক তেমন কিছু করে না। জ্যাক এখন এ-বাংকারে থাকুক ছোটবাবু যখন চাইছে না, তখন জ্যাক কেমন মুখ ভার করে ওপরে উঠে যাবে ভাবল। দরজার মুখে এসে আবার ফিরে গেল। বলল, এই

–কী! ছোটবাবু বেলচার ওপর ভর করে দাঁড়াল।

—তোমার লিটল ডার্লিং তোমাকে চিঠি দেয় না?

—না।

—কেন?

—সে অনেক কথা।

—আমাকে বলবে না?

—বলব না কেন?

–কবে বলবে?

—যে কোনো দিন।

—তোমার লিটল ডার্লিংকে আমার ভীষণ দেখতে ইচ্ছে করে।

—দেখাব। আমার কাছে ওর ছবি আছে।

—তোমার কাছে ওর ছবি আছে।

—আছে।

জ্যাকের ভেতরটা গুড় গুড় করছে। ছোটবাবুর লিটল ডার্লিং দেখতে কেমন, নিশ্চয়ই বিশ্রী হবে। ওর মতো সুন্দরী হবে না, হে ঈশ্বর, সে যেন আমার চেয়ে দেখতে খারাপ হয়। ওর আরও কাতর প্রার্থনা, পৃথিবীতে ছোটবাবুর লিটল ডার্লিং না থাকলে কি হত! জ্যাক ইচ্ছে করলে ছোটবাবুকে ফোকসালে পাঠিয়ে এখনই সেই ছবি দেখতে পারত, কিন্তু সে কথাবার্তা বলে বুঝেছে, ছোটবাবু ভীষণ ব্যস্ত। তবু কেন যে ওর যেতে ইচ্ছে করছে না। সে বলল, এই।

–কী! আবার দাঁড়াল ছোটবাবু। সে কয়লার গাড়ি ঠেলে নিয়ে যাচ্ছিল। জ্যাক যাচ্ছে না। আবার কি বলবে। গাড়ি রেখে সে পাশে এসে দাঁড়াল। জ্যাক দেখছে, ছোটবাবুর চোখ লাল, কয়লার ধূলো পড়লে চোখ লাল হয়ে যায়, এবং চোখের ভিতর কালো মণি দুটোতে তার কোন প্রতিবিম্ব পড়ছে না। একেবারে নিস্পৃহ চোখ। এবং তখন ইচ্ছে করে জ্যাকের, ছোটবাবুর বুকের জামা রাগে দুঃখে ফালা ফালা করে দেয়। এমন নিস্পৃহ চোখ দেখলে, জ্যাকের মনে হয়, ছোটবাবু ভাল না। ছোটবাবু আর দশজনের মতো তার কাছে।

এবং এভাবে জ্যাক বাংকারে এলে আর সহজে যেতে চায় না। কেবল কথা বলতে ভালবাসে। কত রকমের কথা, মাঝে মাঝে ছোটবাবু না বলে পারে না, জ্যাক তুমি ওপরে যাও। কাপ্তান দেখতে পেলে রাগ করবেন। জ্যাক তার কথায় কর্ণপাত করে না। সে তার মতো অনর্গল কথা বলে যায়, এবং বাড়িটা ওদের কোথায়, আর কি গাছ আছে, কতসব গাছ, এই যেমন ইউকন গাছের কথা প্রায়ই জ্যাক বলে থাকে। কত লম্বা, আর কত বড় এবং কি গভীর নীলবর্ণের পাতা, তুষারপাতের সময় কখনও কখনও পাইনের জঙ্গল মনে হয় বাড়িতে গজিয়ে গেছে। নীলবর্ণের পাতার ওপর সাদা তুষারদানা, এবং তুলোর মতো পেঁজা পেঁজা ভাব গাছপালার চারপাশে, অথবা রিনরিন করে যখন তুষারপাতের শব্দ হয় জানালার কাঁচে, এবং যখন, নির্মল আকাশ থাকে ওদের বাড়ির মাথায়, দূরে লাইট-হাউসের আলো, সমুদ্রে নানা বর্ণের জাহাজ এবং সি-গালদের কোলাহল সমস্ত বন্দর জুড়ে তখন যদি কোন জ্যোৎস্না রাতে ছোটবাবু তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকত, তবে পৃথিবীর কোথাও বুঝি কোনও কষ্ট থাকত না। কেবলমাত্র ছোটবাবুর লিটল ডার্লিং তার সবকিছু কেমন বিষণ্ণ এবং দুঃখময় করে দিচ্ছে।

তাছাড়া সে তো আর পারে না—সেইদিন থেকে সে ছোটবাবুর কাছে কেমন ছোট হয়ে গেছে। ছোটবাবুর কাছে সে খুব নিষ্ঠুর, অন্ততঃ সে আর একবার প্রমাণ করে দিতে চায় ছোট, আমি মেয়ে, তুমি বিশ্বাস কর আমি মেয়ে। আমাকে বাবা বনি বলে ডাকে। রাতে আমি সুন্দর পোশাকে শুয়ে থাকি। আমার মাথার ওপরে থাকে অল্প সবুজ আলোর ডুম। সিল্কের চাদরে আমার শরীর ঢাকা থাকে। তখন যদি তুমি আমাকে দেখতে ছোট, আমার ওপর তোমার কিছুতেই রাগ থাকত না।

ছোট কখনও কখনও দেখত, জ্যাক নিরিবিলি চুপচাপ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। কথা বলছে না। কেবল দেখে যাচ্ছে ছোটবাবুর কাজ। এবং ছোটবাবুর তখনই খারাপ লাগে, ওর সঙ্গে ওর মতো কথা বলার জাহাজে কেউ নেই। সে তখন আবার কাছে এসে বলে, জ্যাক, আমার লিটল ডার্লিংকে দেখলে তুমিও ভালবেসে ফেলবে। আমি যেখানে যাই, ওর ছবি আমার সঙ্গে থাকে।

জ্যাক তখন বলত, আমি যাই ছোট।

ছোটবাবু এভাবে বুঝতে পারত না, জ্যাক তখন আর দাঁড়াত না কেন, সোজা চলে যেত। দুদিন তিনদিন কোন কথা বলত না। ছোট তখন আবার ভয় পেতে শুরু করত জ্যাককে। জ্যাক কথা না বললে, জ্যাক ইচ্ছে করে বাংকারে নেমে না এলে, কখনও জ্যাকের সঙ্গে তার কথাবার্তা হত না। এবং এমনকি সে দেখেছে তখন কথাবার্তা হলেও, জ্যাক তার সেই ছোট্ট ছবির কথা একবারও বলত না। জ্যাক এমন ভাবে কথা বলত, যেন কখনও সে লিটল ডার্লিং-এর নামই শোনে নি। ছোটবাবু ও তখন একেবারে সব ভুলে অন্য কথা, জাহাজ নিউ-অরলিনসে যাচ্ছে, মিসিসিপি নদীর ভেতরে জাহাজ ঢুকে যাবে কি মজা! এবং আলাদা রোমাঞ্চ, সে ভূগোল বইয়ে পড়েছে, মিসিসিপি পৃথিবীর দ্বিতীয় বড় নদী। মিসোরি ধরলে, এটাই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় নদী। আর মিসিসিপি সম্পর্কে ওরা সবাই এখন থেকেই দুটো একটা কিংবদন্তী শুনতে শুরু করেছে, জাহাজ যত এগুবে, মিসিসিপি সম্পর্কে সবাই তত কৌতূহলী হয়ে উঠবে। নদীর মোহনাতে জাহাজ ঢুকলেই বোঝা যাবে এসে গেছে, মিসিসিপি এসে গেছে! তখন সমুদ্রের জল আর নীল থাকবে না। একেবারে হলুদ রঙ, অথবা গৈরিক রঙ বলা চলে। ঘোলা জল, যেদিকে তখন তাকানো যায়, কেবল অজস্র পাখি, দলে দলে ওরা আকাশের ওপর হাজার হাজার, তারও বেশি, কত যে পাখি—সি-গাল, মিউল হগস্, সি-পিজিয়নস এবং এ্যালবাট্রসও আছে মাঝে মাঝে কেবল অনবরত ঘুরে ঘুরে মোহনার ওপর যেন চক্রকারে সেই কবে থেকে ওরা উড়ছে। এবং নতুন জাহাজ দেখলেই ঘুরে ঘুরে ওড়া, অথবা নদী তার মোহনায় কত সব খাবার ভাসিয়ে নিয়ে আসছে তাদের জন্য। আর নিচে বোধহয় অজস্র মাছ, যেন এক বিস্তীর্ণ জলাশয়ে পাখি মাছ মানুষ মিলে এক আশ্চর্য মিউজিক তৈরী করে ফেলে! মাছেরা নিচে সব ছোট ছোট দ্বীপের চারপাশে সাদা পাখনা মেলে ঘুরে বেড়াচ্ছে, ওপরে পাখিরা নীল নির্জনতার ভেতর, আর তার ভিতর এক সাদা জাহাজ যাচ্ছে, সাদা পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাক, পাশে নীল রঙের পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে ছোটবাবু। এভাবে একদিন সত্যি ওরা নদীর মোহনায় দূরের ছায়া ছায়া মেঘের মতো ভেসে থাকা কিনারার ছবি দেখতে দেখতে মুগ্ধ হয়ে গেল।

ছোটবাবু বলল, জ্যাক আমরা কাল বন্দর পাচ্ছি?

জ্যাক বলল, হ্যাঁ।

—আমরা ক'দিন থাকব?

জ্যাক বলল, জানি না।

—মাস্টার তোমাকে কিছু বলেন নি?

—না।

—তুমি বেড়াতে যাবে না?

—কোথায়?

—কিনারায়।

—জ্যাক বলল, বাবার সঙ্গে আমার কিনারায় যেতে ভাল লাগে না ছোট।

ছোট বুঝতে পারে, জ্যাকের দুঃখটা কোথায়। কাপ্তান বুড়ো মানুষ, বন্ধু-বান্ধব অথবা এজেন্ট অফিসের যারাই আসেন সবাই যেন প্রায় তার বাবার সমবয়সী, ওরা ওর বাবার সঙ্গেই

বেশি কথা বলতে ভালবাসে! সে চুপচাপ তার বাবার পাশে বসে থাকে মাত্র। হয়তো তখন রাস্তায় শীতের বিকেলে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা হৈ-চৈ করছে, কোনও বড় মাঠে, দেবদারু গাছের মতো দাঁড়িয়ে আছে অজস্র পাইন, অজস্র পাইনের জঙ্গল ভেদ করে একটা সরু রাস্তা অনেক দূরে সীমাহীন গভীরতায় ঢুকে গেছে, তখন সেই গাড়ি তার ড্রাইভার অথবা রিনরিন বাজনার মতো সেইসব পাহাড়ি রাস্তায় বোধহয় জ্যাকের ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগে। অথবা কোনও বড় কার্নিভালে হৈ-চৈ করা, মুখোশ মুখে লাগিয়ে ঘুরে বেড়ানো ভারি মজার—জ্যাক এসবই পছন্দ করে কিন্তু বুড়ো কাপ্তানের সঙ্গে গেলে জ্যাক বোধহয় সেসব পায় না। কেবল সব ভারি ভারি কথা। মজার কথা কেউ তার সঙ্গে বলে না। জ্যাকের তো ভীষণ একঘেয়ে লাগারই কথা তখন।

সে বলল, জ্যাক, তুমি তবে আমাদের সঙ্গে যাবে?

—কোথায়?

—তুমি আমি আর ডেবিড একসঙ্গে বের হবো। বেশ মজা হবে।

—কোথায় যাব আমরা?

—ডেবিড আমাদের যেখানে নিয়ে যাবে।

—সে কোথায় যাবে ছোট?

—তা তো জানি না। বলেছে, নিউ-অরলিনসে আমরা বেশ ক'দিন থাকব। ইচ্ছে করলে নাকি আমরা গাড়িতে বেটন-রুজ পর্যন্ত ঘুরে আসতে পারি।

—বাবাকে বলব।

তখনই মিঃ স্প্যারো বয়-কেবিনের মাথায় বসে ওদের দেখছে। আর মিসেস স্প্যারো বেশ হাওয়ায় দুলে দুলে উড়ছে। কোথা থেকে তখন উড়ে আসছে বড় একটা সি-গাল। সঙ্গে সঙ্গে পাখিদুটো ভয় পেয়ে একেবারে জালির ভেতর দিয়ে উড়ে গেল। এবং সাঁ-সাঁ করে বের হয়ে যাচ্ছে বড় সি-গালটা। জ্যাক পাখিটাকে তাড়িয়ে দেবার জন্য হাতে একটা ভাঙা লোহার টুকরো নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। বোধহয় জ্যাক অথবা ছোটবাবুর মারমুখো চেহারায় ভয় পেয়েছে পাখিটা। ওটা আর উড়ে এল না। এবং ছোটবাবু বুঝতে পারল, এই মোহনায় পাখি দুটো নিরাপদ নয়। ওরা এখন জালির ভেতর ঢুকে গেছে। নিরাপদে রয়েছে, ওরা বোধহয় মোহনা পার না হলে আর বের হবে না। এবং তখনই ছোটবাবু ফের বলল, আমরা ক্যারলটনে যেতে পারি, একটু দূরে গেলে বনেটকারে আরও দূরে গেলে কলেজ- পয়েন্ট। শেষ পর্যন্ত ডেবিড বলেছে, আর খুব দূরে গেলে বেটনরুজে। একদিন না হোক দুদিনে ফিরে আসা যেতে পারে। নদীর পারে আশ্চর্য সব জায়গা। মিসিসিপিকে যতটা পারি ভেতরে ঢুকে দেখে আসব।

আর তখনই হৈ-চৈ-প্রিয় ডেবিড ছুটে আসছে। সেই দূরবীন গলায় ঝুলছে। যত জাহাজ এগুবে, এই দূরবীনে ডেবিডের চোখ তত বড় হয়ে যাবে। আর যত রাগ জ্যাকের এই দূরবীনটাকে নিয়ে। ছোটবাবুকে ডেবিড নষ্ট করে দিচ্ছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সে বলল, আমি তোমাদের সঙ্গে কোথাও যাব না ছোটবাবু। তারপর এক মুহূর্ত দাঁড়াল না। সে সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে গেল।

এবং এখন বিকেল। চারটা বেজে গেছে বলেই ডেবিডের ছুটি। তার এখন শুধু আবার আগের মতো বসে থাকা। পশ্চিমে পাহাড়ের ওপাশে অথবা সানফ্রান্সিসকো কিংবা লস এঞ্জেলসের সমুদ্রে সূর্য অস্ত যাচ্ছে, কারণ যখনই সূর্য অস্ত যায় সে ভেবে থাকে, সমুদ্রে সূর্য ডুবে যায়। পৃথিবীর আহ্নিক গতি বার্ষিক গতির কথা তার ভাবতে ভাল লাগে না। সমুদ্রে সূর্য ডুবে গেছে না ভাবতে পারলে এমন একটা জাহাজের বোট-ডেকে দূরবীন চোখে বসে থাকার মানে হয় না। কারণ ওর কাছে পৃথিবীর সব যুবতীরাই তখন ভীষণ দামী। একবার দূরবীনে দেখে ফেলতে পারলে, তাদের সব কিছু যেন দেখে ফেলে, এবং তখন জিভ লালায় ওর মোটা হয়ে যায়। ঠোঁট সে জিভের লালায় ভিজিয়ে রাখতে ভালবাসে। স্ত্রী এবির কথা মনে থাকে

না। ছোট্ট মেয়েটি ফোলা ফোলা মুখে জানালায় দাঁড়িয়ে হাত যে নেড়েছিল, এবং রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিল, গাড়িটা যেখানে অদৃশ্য হয়ে গেল, দূরবর্তী বাড়ির জানালায় কেউ তখনও দাঁড়িয়ে আছে, চোখে জল, এসব মনে থাকে না। সে কেমন গাউন আর তার ভেতরে এক অহমিকাময় যুবতীর শরীরের সুন্দর সুদৃশ্য জায়গাগুলো ভেবে ভেবে স্ত্রীর মুখ একেবারে ভুলে থাকে। এবিকে পেলে সে বোধ হয় তখন বুকে মুখ লুকিয়ে বলত, জাহাজে গেলে আমি ভাল থাকি না। তুমি কেমন থাকো আমার খুব জানতে ইচ্ছে করে। কিন্তু এবি চিঠিতে তাকে কখনও এ-সম্পর্কে কিছু লেখে না। ওর ভীষণ রাগ হয়, অভিমান হয়। কেবল চিঠিতে, ওর শরীর, ওর নাওয়া-খাওয়ার কথা থাকে। ছেলে-মেয়েদের কথা থাকে। কে কি দুষ্টুমি করেছে, অথবা স্কুল ক্রিকেটে বড় ছেলে ক্যাপ্টেন হয়েছে বলে বাড়িতে কে কে নিমন্ত্রিত হয়েছিল এসব লেখা থাকে। জমিতে এবার ক্যাবেজ কেমন হয়েছে লেখা থাকে। মটরশুঁটির চাষ মনে হয় ভালই হবে। টমেটো খুব হয়েছে। গরুগুলোর খবর থাকে। গম চাষ বোধহয় ভাল হবে না খুব, এসব লিখে জানায়। ওর যে একটা শরীর আছে, এবিও যে একটা শরীর বয়ে বেড়ায় চিঠিতে তা কিছুতেই বোঝা যায় না। ছোট দাঁড়িয়েছিল। ওর রাতে ওয়াচ। সে এখানে এখন অনায়াসে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। ডেবিড একটু দূরে বসেছে। জ্যাককে দেখেই ডেবিড বোধহয় খুব আনন্দ প্রকাশ করেছিল, পোর্ট, আবার পোর্ট, কিন্তু জ্যাক চলে যাওয়ায় ডেবিড বোধহয় একটু আহত হয়েছে। সে চুপচাপ বসেছিল, পাশে ছোটবাবু রয়েছে এটা যেন সে দেখতেই পাচ্ছে না। সে নিজের মতো দূরবীনে নদীর মোহনায় পাখিদের ওড়া দেখছে। এবং পাখিগুলো যে খুব বড় আকারের হয়ে যায়, উড়তে উড়তে একেবারে মুখের ওপর মনে হয় হাওয়া কাটিয়ে ওপাশে চলে যায়, ছোটবাবু দূরবীন চোখে না দিয়েও এটা বুঝতে পারে।

ছোট ডাকল, এনি ওম্যান?

উত্তর এল, নো।

ছোট ভাবল, এ সময় হয়তো কিছু বলা ঠিক হচ্ছে না। এই মোহনায় মেয়ে পাবে কোথায়। কেবল দূরে দু-তিনটে জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে। ওদেরও এবার দাঁড়িয়ে পড়তে হবে। পাইলট-বোট আসবে। পাইলট এবার ভার নেমে জাহাজের এবং জাহাজ নদীতে ঢুকে গেলে, দু'পাড়ে হয়তো গাছপালার ফাঁকে ওম্যান দেখে ফেললেও ফেলতে পারে। এখানে শুধু পাখি, ঘোলা জল, এটা হয়তো সেকেণ্ড রসিকতা ভেবে থাকতে পারে। ছোটবাবুর ভয়ে বুকটা গুড়-গুড় করে ওঠে। ওর মুখটা ভীষণ ফ্যাকাশে হয়ে গেল ফের।

আর তখনই ওরা দেখল দূর থেকে পাইলট-সিপ বেগে চলে আসছে। কিনারার বার্তা বয়ে আনবে। চিঠি আনবে। সেকেণ্ড লাফিয়ে উঠে পড়ল। চিৎকার করে বলল, আসছে আসছে। ছোটবাবুকে দেখিয়ে বলল, ঐ দ্যাখো আসছে। ওটা আমাদের নিয়ে যাবে মিসিসিপির ভেতর। এখানে এলেই আমার মনে হয় ছোট, আমরা যেন মার্ক টোয়েনের জগতে এসে গেছি। তুমি পড়েছ লাইফ অন দি মিসিসিপি, পড়েছ?

ছোট খুব সহজ গলায় বলল, নো স্যার।

সেকেণ্ড পিটপিট করে তাকাল। বুঝতে চেষ্টা করল ছোটবাবু এত সম্মান দিয়ে কথা বলছে কেন। তারপরই কি বুঝতে পেরে হা হা করে হেসে ওর কাঁধে জোরে চাপড় দিল, কি জান ছোট, মনটা ভাল নেই। ভেবেছিলাম দেশে ফিরব। কিন্তু সব বাতিল। বাড়ির জন্য মনটা মাঝে মাঝে খারাপ হয়ে যায়। তারপর একটু থেমে সেই পাইলট-বোটের দিকে তাকিয়ে বলল, আমাদের মিসিসিপিতে নিয়ে যাবার জন্য সে আসছে। তুমি পড়বে। সেলরদের কাছে এটা ভীষণ পবিত্র গ্রন্থ। আমি যে কতবার পড়েছি বইটা। আমি কোথাও কোথাও মুখস্থ পর্যন্ত বলে যেতে পারি।

তারপরই একটু থেমে দেখে নিল, পাইলট-সিপ আর কতদূর। যতক্ষণ জাহাজের কিনারায় এসে না ভিড়ছে ততক্ষণ বোধহয় কথা বলা যাবে—আর সব কথাই একমাত্র এখন এই মহামহিম নদী, তার প্রাচীনতা এবং তার নাব্যতা কতটুকু, প্রাচীন কালে, কে প্রথম এই নদী

আবিষ্কার করেছিল, তার নাম, হ্যাঁ মনে পড়ছে ডি-সোটা।

—ওহে ছোটবাবু, তুমি ভাবলে সেই লোকটি কিনা একটা মহৎ কাজ করে ফেলেছে। কিছুই না। প্রথম ডি-সোটা মিসিসিপি দেখতে পান। এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। নদীর পাড়ে পুরোহিত ও সৈনিকেরা তাঁকে সমাধি দেয়। এবং বুঝতেই পারছ তারপরই আশা করা যায় সৈনিক এবং পুরোহিতরা ফিরে এসে বিশাল মহাকায় নদীর কথা সাধারণ মানুষকে বলবে। তারা বলেওছিল। কেউ আর এ- নিয়ে মাথা ঘামায়নি। শোনা যায় ঐ লোকটির মৃত্যুর পঁচিশ বছর পর শেকসপিয়ারের জন্ম। এবং প্রায় পঞ্চাশ বছর বেঁচে রইলেন, তারপর তাঁর ও মৃত্যু হল। আরও পঞ্চাশ বছর যখন তিনি কবরে থাকলেন আরামে তখন দ্বিতীয় শ্বেতাঙ্গ ব্যক্তির মিসিসিপির পাড়ে আবির্ভাব ঘটল। অর্থাৎ তুমি বুঝতেই পারছ ডি-সোটার মৃত্যুর প্রায় একশ ত্রিশ বছর পর আর একজন, তার নাম বোধহয় লা-সালে এবং এমনই একটা নাম মনে হচ্ছে, তিনি আবার জাতিতে ফরাসী, প্রথম মিসিসিপি সম্পর্কে তাঁর অনুসন্ধান করবার একটা স্পৃহা জাগল।

পাইলট-সিপটা বেশ ছুটে আসছে—সে আবার সেদিকে তাকাল। আরও কিছুক্ষণ ছোটবাবুর সঙ্গে এই নদী এবং তার প্রাচীনতা সম্পর্কে কথাবার্তা বলা চলে। এখন কোনও কাজ নেই, যে ভাবেই হোক এই সব চারপাশের নদী-নালার গুণকীর্তন করে সময়টা কেটে যাবে। সে বলল, যা বলছিলাম, আমাদের যুগে এমন একটা আশ্চর্য নদী দেখার পর দেড়শো বছর চুপচাপ কাটিয়ে দিতে পারি—ভাবা যায় না। কোথাও কোনও সমুদ্র উপকূলে এক খণ্ড ভাঙ্গা প্রাচীন শিলাস্তর খুঁজে পেলে অন্তত পনেরটি অভিযাত্রী দল ছুটে আসবে। একদল যাবে শিলাস্তরের রহস্যসন্ধানে। বাকি চোদ্দটি দল যাবে পরস্পরের সন্ধানে।

ছোটবাবুর মনে হল, সেকেণ্ড এই নদী সম্পর্কে অনেক খবর রাখে। এবং প্রথম প্রথম কথা বুঝতে ছোটবাবুর অসুবিধা হত। এখন একেবারেই তা হয় না। এবং ছোটবাবুও প্রায় ওদের মতোই একসেন্টে কথাবার্তা বলতে পারে। আর এটাই বোধহয় ওর আশ্চর্য ক্ষমতা, কত সহজে, সেও সাবলীল। ইংরেজিতে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারে। সে বলল, সব নদীর মোহনাই কিন্তু এক রকমের।

—মানে!

—সেই পাইলট-সিপ, কিছু জাহাজের প্রতীক্ষা, আর অজস্র পাখি এবং দূরে এই ছায়া ছায়া পাহাড় অথবা বনাঞ্চলের ছায়া। ওর ইংরেজিতে এমন শব্দেরই বেশি সমাবেশ ছিল বলে, সেকেণ্ড মনোযোগ দিয়ে শুনছিল, এবং পরে মনে হল, ঠিকই বলেছে ছোট—টেমস, গঙ্গা অথবা এই মিসিসপি, যদি আমাজনে যাওয়া যায়, সেখানেও হয়তো কিংবা ইউফ্রেটিস নদীর তীরে নীল নদের অববাহিকায়।

সেকেণ্ড বলল, যা বলছিলাম বুঝলে ছোট দেড়শো বছরের ওপর তখন এখানে সব সাদা মানুষেরা পাল তুলে তীরে বসতি গড়েছে। এদের সঙ্গে স্থানীয় আদিবাসীদের যোগাযোগ হয়েছে, দক্ষিণ দেশগুলোতে স্পানিয়ার্ডরা নির্বিচারে লুঠতরাজ চালাচ্ছে। নরহত্যা নারীধর্ষণ রোজকার ঘটনা। ওদের যেনতেন প্রকারেণ ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে। একটু ওপরের দিকে ইংরেজরা তাদের কাছে মালা কম্বল বিক্রি আরম্ভ করে দিয়েছে, হুইস্কি ধরিয়ে ওদের মগজে ফূর্তির বান ডাকিয়েছে, কানাডায় ফরাসীরা আর এক ধাপ এগিয়ে, ইস্কুল খুলে হাতেখড়ি দিচ্ছে, বিদ্যাদানের নামে সব আত্মসাত করার নয়া ফরমূলা। মনট্রিল এবং কুইবেকে পশম কেনাবেচার ভেতর দিয়েও বেশ যখন জানাজানি ভালভাবেই হয়ে গেছে তখনও কেউ জানে না, এই দেশের ভেতরে রয়েছে এত বড় একটা নদী। একেবারে জানে না বললে ভুল হবে, তারা ভাসাভাসা খবর শুনেছিল। নদীর আয়তন এবং অবস্থান সম্পর্কে কোন সঠিক ধারণা ছিল না। অথচ দ্যাখো, ওদের মগজে কোন দুঃসাহসিক ইচ্ছে ছিল না, কোথায় সেই নদী, তার উৎপত্তি কোথায়, কোনদিক থেকে নেমে কোথায় যাচ্ছে, একেবারে সোজাসুজি না ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে ঘুরে অশ্বখুর তৈরি করে চলেছে—কিছুই জানার ইচ্ছে ছিল না তাদের। আসলে কি

জানো ছোট, নদীটা যে ওদের কোন কাজে লাগবে ভাবতেই পারেনি। নদী তারা চায়নি। তাদের জীবনে নদীর কোন প্রয়োজন ছিল না। অথচ প্রায় দেড়শ বছর পর যখন লা-সালে এই নদী আবিষ্কার করলেন, তখন পড়িমরি করে কে আগে যাবে, কার আগে প্রাণ কে করিবে দান, আসলে কি জানো, তখন সবার মনে জেগেছিল, নদীটাকে কিভাবে যে কাজে লাগানো যায়! তখনকার দিনে কেউ কেউ বিশ্বাস করত, ওটা গিয়ে পড়েছে ক্যালিফোর্ণিয়া উপসাগরে, এবং এখান থেকেই চীনে যাবার একটা সংক্ষিপ্ত পথ খুঁজে পাওয়া যাবে। অথবা কেউ কেউ ভাবত, ওটা গিয়ে পড়েছে ভার্জিনিয়ার সমুদ্রে। যাই হোক সে অনেক ইতিহাস বুঝলে ছোট, ঐ দ্যাখো পাইলট উঠে আসছে। তোমার চিঠি এলে দিয়ে দেব। তুমি এস। তখন ছোটবাবু হাসল। ওর চিঠি কখনও আসে না হেসে যেন বলতে চাইল। মেজ-মালোম ডেবিড ওর দিকে তাকিয়ে থাকল। ভারি কোমল স্বভাবের ছেলেটা। একটা চিঠি না এলে কী যে খারাপ লাগে! এখানে ছোটবাবুকে একা রেখে যেন যাওয়া ঠিক না। সে ফের বলল, এস আমার সঙ্গে।

সে বলল, সেকেণ্ড, আমার চিঠি আসে না, আমাকে কেউ চিঠি দেয় না। আমারও আর কাউকে চিঠি লিখতে ইচ্ছে হয় না। কাকে লিখব! যাঁকে লিখলে খুশি হতেন, তাঁকে জানাতেই পারছি না, জাহাজ মিসিসিপিতে ঢুকে যাচ্ছে। অবশ্য আমার মা জানেনও না পৃথিবীতে মিসিসিপি বলে একটা নদী আছে। তারপর বলার ইচ্ছে হল—তাঁর পৃথিবী ভীষণ ছোট। সেই ছোট পৃথিবীতে শুধু তাঁর আমরাই আছি। আর কি আছে না আছে তার জন্য তাঁর কিছু আসে যায় না।

॥ উনিশ ॥

হেই হেই আর গুম গুম একটা শব্দ। ওরা নদীর ভেতরে ঢুকে গেলে এমন সব শব্দের ভিতর পড়ে গেল। দু'পাড় দেখা যাচ্ছে। প্রায় মাইলের ওপর চওড়া নদী, প্রায় সাত-আট ফেদম জল আছে। এবং গভীর নদীর ওপরে রয়েছে বড় বড় স্টিম-বোট। ওরা কেউ উজানে যাচ্ছে, কেউ নেমে আসছে। মাছ ধরার ছোট ছোট জাহাজ—ওরা কেউ মাছ ধরতে যাচ্ছে, কেউ মাছ ধরে ফিরছে। আর কখনও নদীর পাড় ভীষণ খাড়া। পঞ্চাশ ষাট ফুট খাড়া পাড়। নদী যেন অবলীলায় গর্জন করতে করতে লাফিয়ে নামছে। জাহাজটা তার ভেতর দিয়ে একটা ছবির মতো উঠে যাচ্ছে। দূর থেকে কখনও মনে হচ্ছে নিশ্চল জাহাজ, কাছে এলেই বোঝা যায়, না, বেশ যাচ্ছে জাহাজ। পাইলট চোঙ মুখে মাঝে মাঝে নদীর টেক সম্পর্কে বোধ হয় ব্যাখ্যা করে যাচ্ছে। এবং এভাবে জাহাজ চললেই মনে হয় সেই যেন কোনো অভিযাত্রী দল নদীর ভেতর দিয়ে ঢুকে যাচ্ছে। তখন দেখা যায় কেবল জাহাজিদের অহংকারী মুখ। ওরা ডেক ধরে হেঁটে গেলেই টের পায় নদী ভীষণ গর্জাচ্ছে, ফুঁসছে। তার সব কিছু অহংকার অবলীলায় ভেঙেচুরে জাহাজ ক্রমে দামাল হয়ে উঠছে। আর কি যেন তখন ভাল লাগে, নদীর পাড়ে কখনও বন, কখনও ছোট শহর, কখনও শুধু বার্চ আর দিওদর জাতীয় গাছ, অথবা বিরাট বাওবাব বৃক্ষের অন্তরালে দেখা যায় এক ফালি আকাশ, সেখানে চাঁদ উঠছে।

এমন সব দৃশ্য দেখলে মনে হয়, পৃথিবীতে এভাবে জাহাজে জাহাজে ঘোরা ভারী রোমাঞ্চকর। তখন হয়তো যাদের ওয়াচ নেই তারা ফল্কার ওপর বসে তাস খেলছে। কেউ হয়তো রেলিঙে চুপচাপ দাঁড়িয়ে অনেক দূরে দেখতে পায় একটা দেশ, তার ছোট্ট একটা নদী, নদীর পাড়ে তার গ্রাম এবং মসজিদে যে লোকটা আজান দিতে যায় তার মুখ। গভীর রাতে বিবির অপেক্ষা, মানুষটার জাহাজ থেকে চিঠি আসার কথা, ঘুম নেই তার চোখে। আর সেই মানুষ এখন একাকী রেলিংয়ে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর অপর প্রান্তে নদীর মোহনায় এক ফালি চাঁদ দেখতে দেখতে অবাক হয়ে ভাবছে মসজিদের মাথায় চাঁপা ফুল গাছের ডালের ফাঁকে যখন চাঁদ ওঠে, ঠিক একরকম দেখতে। সব তেমনি ঠিক আছে, গাছপালা, বন, মাঠ, নদীর জল এবং জ্যোৎস্না। কেবল নেই সরল নোলক-পরা মেয়েটি যে পাশে থাকলে তার মনে হত, এটাও তার দেশ। আলাদা করে কিছু আর ভাবা যায় না।

তখন ভাণ্ডারি খাবার এগিয়ে দিচ্ছে! তাজা মাছ। মাছের ঝোল। ম্যাকরল মাছ তুলে নিয়েছে কিনার থেকে। তাজা মাছ, মাছের ঝাল, ঝাল গন্ধ সারা ডেকময়। আর ভাত এবং কেউ কেউ আগে থেকেই বলেছে ভাত বেশি খাবে। মাছের বেশ বড় টুকরো, প্রায় ইলিশ মাছের মতো খেতে স্বাদ, দেখতেও কিছুটা কাছাকাছি, ওগুলো হেরিংও হতে পারে। তবে জাহাজিদের কাছে নামে কিছু আসে যায় না। এবং গুম গুম শব্দের ভেতর জাহাজের ক্রমে এগিয়ে যাওয়া বেশ আরামদায়ক। ছোটবাবু, মৈত্র আর অমিয় অথবা অন্য যারা এখন ওয়াচে রয়েছে—ওপরে উঠতে পারছে না। তবু ছোটবাবু এক ফাঁকে উঠে তীরের গাছপালা, এবং কখনও আলোর বিন্দু দেখে দূরে, কেমন মুগ্ধ হয়ে গেছিল। সে ভুলেই গেছিল নিচে তার কাজ, সুট খালি হয়ে যাচ্ছে। কাপ্তান নিজেও ঠিক নেই, কারণ তিনি লাফিয়ে লাফিয়ে বোট-ডেক পার হয়ে যাচ্ছেন। কোথাও ঠিকমত দাঁড়িয়ে থাকতে পারছেন না। চীফ- অফিসারের সারাদিন বেশ খাটুনি গেছে। সারেঙ সারা দিনমান ডেক-জাহাজিদের দিয়ে সব কটা ফল্কা সাফসোফ করছে। এখন কাপ্তান নিজে নিচে যাচ্ছেন। আলো ফেলে দেখছেন, কোথাও কোনও ফুটাফাটা রয়েছে কিনা।

সকাল থেকেই জাহাজে মাল উঠতে শুরু করবে। ওয়াচ ভেঙ্গে দেওয়া হবে। এবং সবাই যে যার মতো বিকেলে নেমে যাবে বন্দরে। বন্দর এলেই এই এক উত্তেজনা। ঠিক তখনই খবরটা সবাই শুনেছিল। সারেঙ বলে যাচ্ছে, প্রায় ফুঁকে ফুঁকে বলে যাবার মতো, আমরা ভারতীয় নাবিকরা বন্দরে নামতে পারছি না। দাঙ্গা, কালো-সাদাতে দাঙ্গা। কোথাও লঙ-মার্চে কার বের হবার কথা, সারেঙ সে-সবও বলে গেল। এমন একটা সুন্দর রাতে, এ-ধরনের

দাঙ্গার খবর! কেউ আর তখন মন দিতে পারছে না কাজে! যারা তাস খেলছিল, ওরা তাসফাস ছুঁড়ে দিল হাওয়ায়। যারা খেতে বসেছিল, তারা বিষম খেল খেতে খেতে। যাঁরা নামাজ পড়ছিল ডেকে, তারা কিছুক্ষণ আরও বেশি আল্লার কাছে প্রার্থনা করবে বলে চুপচাপ বসে থাকল যেন। জাহাজের সব কিছু তখন কেমন একেবারে চুপ মেরে গেল। যেন একটা মরা জাহাজ নিয়ে কিছু অদৃশ্য আত্মা নদীর জলে ভেসে যাচ্ছে। কেউ কোনও কথা বলতে পারছে না।

বন্দরে নামতে না পারলে জাহাজিদের কি যে ব্যাজার মুখ—এখন এ-জাহাজটাকে না দেখলে বোঝা যাবে না।

তখন ডেবিড দেখল মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন জাহাজি। অস্পষ্ট অন্ধকারে সে তাদের ঠিক চিনতে পারল না। জায়গাটা আফটার-পিকের চার নম্বর ফল্কার কাছে। ওরা যেন কি গুজ-গুজ- ফুস-ফুস করছিল। এদের ভিতর ছোটবাবু নেই। অবশ্য এখন আর ওয়াচ নেই তার। জাহাজ বন্দরে পৌঁছে দেওয়ার দায়দায়িত্ব পাইলটের। কেবল তার একটা বড় কাজ রয়েছে, জাহাজ বাঁদা-ছাঁদার। সে তো ভোর রাতের দিকে। তবু যেন কিছু একটা অছিলায় চলে আসা। ছোটবাবুকে সে খুঁজছে এটা কাউকে বুঝতেই দিচ্ছে না। উইচের নিচে ঝুঁকে কি দেখছে! আসলে কিছুই দেখছে না। সে অহেতুক আফটার-পিকে আসতে পারে না, একটা কাজ চাই হাতে। জাহাজ বাঁধার আগে সব কিছু পরীক্ষা করে দেখা যেন। হাসিল ঠিক আছে কিনা, উইনচ কাজ করছে কিনা, হারিয়া হাপিজ ঠিক মতো বললে দড়িদড়া ঠিকমতো নেমে যাবে, উঠে আসবে কিনা, এ-সব দেখেই যেন চলে যেত। তবু একবার নিচে নেমে বাঁ পাশে ঢুকে গেল। দরজায় ঝুঁকে বল, হেই!

কিন্তু কেউ নেই। ফোকসাল ফাঁকা। থাকা উচিত ছিল। ডেকে, মেসরুমে, গ্যালিতে কোথাও ছোটবাবু নেই। এবং মনে হল, সেই গুজগুজ যারা করছিল তাদের ভিতর যদি থাকে। সেখানেও নেই। ওরা বঙ্কু, অনিমেষ, মান্নান, মনু এবং ডেক-টিণ্ডাল হাসান। যদিও ওদের একটা করে প্রত্যেকের নম্বর আছে, কিন্তু ডেবিডের স্বভাব অন্যরকম। সে নম্বরে চেনে না, সে নামে চেনে। অন্য সবাই জাহাজিদের নম্বরে চেনে,

কি নাম, যদিও নাম মনে রাখা ভারী কষ্ট, তবু ওর মনে হয় মানুষের সম্মানের জন্য নামে চেনা ভাল। ওরা তো জেল-কয়েদী নয়, জেল-কয়েদী হলেই বা মানুষ মানুষকে নামে চিনবে না কেন সে বুঝতে পারে না। অবশ্য এ নিয়ে তার এখন দায় নেই। ছোটকে না পেলে চলছে না। একটা মজার ট্রিপ, আহা দিনের বেলা হলে কি যে ভারি মজা হত, তবু রাত জেগে দূরবীন নিয়ে বসে থাকা। একা ভাল লাগবে না বলে একমাত্র সে ছোটবাবুকে সঙ্গে নিতে পারে।

লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে ওপরে ওঠার মুখে দেখা মৈত্রের সঙ্গে। সে বলল, টিণ্ডাল, ছোটবাবু কোথায়?

–সে তো ঘুমোচ্ছে।

—ঘুমোচ্ছে?

—হ্যাঁ। বলেই সে নেমে যেমন দেখে থাকে, ঠিক ছোটবাবু অমিয়র বাংকে শুয়ে আছে। ওপরের বাংকে বলে মেজ-মালোম ছোটকে দেখতে পায় নি। সে ডেকে বলল, এই ছোট তোকে মেজ-মালোম ডাকছে।

ছোটবাবুর ঘুম ভীষণ। জাহাজের দুলকি চালে বেশ শরীরে আমেজ এসে যায়। খুব এখন নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে পারে। মৈত্র দু-তিন বার ডেকেও সাড়া পেল না। সেকেণ্ড এসে দেখল খুব জোরে জোরে নাড়ছে মৈত্র। কিন্তু ওঠবার নাম নেই।

সেকেণ্ড বলল, থাক।

—থাক মানে। আপনি দাঁড়ান। বলে সে ওপরে উঠে দু-হাতে টেনে তুলল, এই ছোট! ছোট শুনতে পাচ্ছিস! ছোট তখন চোখ মেলে তাকাবার চেষ্টা করল।—মেজ মালোম তোকে

ডাকছে!

–মেজ-মালোম কে?

—কি হারামজাদা! মেজ-মালোমকে চেন না! সে বলল, মেজ-মালোম ডেবিড।

–ডেবিড এখানে কেন?

—আরে তুমি মেজাজ দেখাচ্ছ!

সেকেণ্ড তখন বলল, ছোট কি বলছে!

মৈত্র বলল, বলছে একটু বসতে। মেজ-মালোমকে একটু বসতে বল। তারপর আর কি করে—সেকেণ্ড কাছে এসে বলল, ওম্যান।

ছোট বলল, ওম্যান! কোথায় সেকেণ্ড?

—তাড়াতাড়ি এস।

দু-লাফে নেমে গেল ছোট। ওর ঘুম একেবারে ভেঙ্গে গেল। মৈত্র এবং অন্য সবাই, পারলে যেন এই জাহাজের যত জাহাজি রয়েছে সবাই এখন এই ডেবিডের পেছনে পেছনে বোট-ডেকে উঠে যাবে।

ডেবিড ঠিক সিঁড়ির মুখেই বলল, নো ওম্যান।

ছোট বলল, তবে!

—এস কথা আছে।

—এত রাতে কি কথা!

—অনেক কথা।

—মানে!

—মানে, দু'পাড়ের শহর ঘরবাড়ি তেলের পিপে, স্টিম-বোট, মোটর-বোট, লাল নীল রঙের আলো, কোথাও ব্যাণ্ড বাজবে, এস দেখবে। আমরা এক ফাঁকে ঠিক ওম্যান দেখে ফেলব কোথাও।

সুতরাং আর কি করা। সকালে ওয়াচ থাকছে না। হাল্কা কাজ থাকবে। সুতরাং এমন একটা জাহাজে যখন ক্রমে উজানে উঠে যাচ্ছে, দু-পাড়ের গাছপালা ছায়া অন্তহীন ক্রমশ সরে সরে যাচ্ছে, অথবা এক ফালি চাঁদ জাহাজটার সঙ্গে সঙ্গে উজানে ভেসে চলেছে, তখন রাত জেগে অন্তহীন দৃশ্যমালায় ডুবে যেতে ভালই লাগবে।

পাশেই জ্যাকের কেবিন। পোর্ট-হোলে এখনও আলো আছে। জ্যাক তবে ঘুমোয় নি? সেকেণ্ড আগেই ঠোটে আঙ্গুল ছুঁয়ে বলেছে, কিছু দেখে ফেললে খুব যেন হৈ-চৈ না করে ছোট। ওতে জ্যাকের জেগে যাবার সম্ভাবনা। চুপচাপ বসে থাকা ডেক চেয়ারে, আর ডেক খুব সাফ বলে ছোটবাবু ডেকে কাত হয়ে হাতে মাথা রেখে শুয়ে থাকতে পারে পর্যন্ত। এবং ছোট দেখল, মেজ চকোলেট কালারের বড় একটা বোতল এনেছে, দুটো গ্লাস। কেবিন-বয় ইলতুতমিস টিপয়ে কাঁচের প্লেটে রঙিন মাংস রেখেছে। ছোট ছোট টুকরো প্রায় স্যালাডের মতো করে রাখা।

সেকেণ্ড বলল, চলুক।

ছোটর ভীষণ ইচ্ছে হল। বেশ ঝাঁঝ। সে ঠিক সহ্য করতে পারে না। তবু বলল, কেউ দেখে ফেলবে নাতো!

—দেখে ফেললে কি হবে!

—খারাপ ভাববে।

—যা, খারাপের কি! ওম্যান-ওয়াইন-ওরসিপ ভারি পবিত্র ব্যাপার মানুষের। খাও খাও।

পবিত্র যা কিছু তার থেকে দূরে থাকার কোনো মানে হয় না। বলেই ছোটকে দূরবীনটা দিয়ে সে উঠে গেল। দূরবীনে সে কিছুই দেখতে পেল না। পাগল। রাতে, এই সামান্য চাঁদের আলোতে পাড়ের কিছুই স্পষ্ট নয়। বরং ভোঁ ভোঁ শব্দ করতে করতে যে সব স্টিম-বোট নেমে যাচ্ছে উঠে আসছে, অথবা যদি কোন জাহাজ উঠে যায়, পাশাপাশি এলে তাদের রঙীন ছবির মতো দেখায়। জাহাজে সে কোনো মেয়ে দেখতে পাচ্ছে না। তবু জেগে থাকা, এভাবে একটা রাত মিসিসিপি নদীর বুকে জেগে থাকা ভারি আনন্দের। সে তো আর কখনও আসছে না, আবার যদি আসেও, সে কবে আসবে বলতে পারবে না। তখন আজকের মতো সব কিছু তার ঠিকঠাক নাও থাকতে পারে।

সে দু'টুকরো মাংস মুখে ফেলে দিল। ভাজা ভাজা মাংস। সেকেণ্ড এসে সামান্য মদ ওর গ্লাসে ঢেলে দিল, তারপর সোডা দিয়ে হাল্কা করে দিল, নিজে রাখল একেবারে নির্জলা, সে একেবারে সবটা গলায় ঢেলে দেবার মতো ঢেলে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বলল, হাই— বলে সে দু'হাত ওপরে তুলে, কি মজা, এমন একটা ভঙ্গী করলে ছোট বলল, এই জ্যাক জেগে যাবে।

সেকেণ্ড বলল, জ্যাককে 'ডাকো না! সেও এসে বসুক।

—তুমি পাগল। জ্যাক আমাদের সন্ন্যাসী বালক। তোমার দূরবীণ দেখলেই চটে যাবে।

—তা অবশ্য ঠিক। আচ্ছা কেমন ভাল লাগছে না! এত বড় নদীতে ভেসে যেতে ভাল লাগছে না!

—খুব।

—এখন তোমার নাচতে ইচ্ছে করছে না! ছোট বলল, নাতো।

—বারে ভেতরে তোমার ডিং ডিং করে বাজনা বাজছে না!

—নাতো।

—বলছ কি, এ-সময়ে ডিং ডিং করে বাজনা বাজছে না!

—নাতো।

—বলছ কি, এ-সময়ে ডিং ডিং করে ভেতরে বাজনা না বাজলে আবার কবে বাজবে, নদীতে এলেই আমার বাজনা বাজতে থাকে। নদীতে ডিং ডিং বাজনা না বাজলে লা-সালে প্রাণ হাতে করে মিসিসিপিতে আসত না।

—ডিং ডিং করে বাজনা বাজলেই প্রাণ হাতে করে আসা যায় না।

—আরে সে খুব সেয়ানা মানুষ ছিল। তখন ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দশ লুই। তার ইলিয়ানের কেল্লা থেকে মনট্রিলে যেতে ভীষণ কষ্ট। ডাঙ্গায় প্রায়ই লুঠতরাজ হত। রাস্তা বলতে কিছু ছিল না। কেবল জঙ্গল, মাঠ, অকারণ বনানী পাহাড় আর সব রেড় ইণ্ডিয়ানদের ভয়াবহ আক্রমণ, কিন্তু নদী দেখেই বুকের ভিতর বাজনা বাজতে থাকল। চতুর্দশ লুইকে লিখে পাঠাল কিছু সুযোগ-সুবিধার জন্যে। এবং সেটা আদায় হলে বেশ নদীপথে সে মনট্রিলে পৌঁছে গেল। পয়সা কম, লাভ বেশী।

—তুমি যে বললে ডিং ডিং করে বাজনা না বাজলে.....

সেকেণ্ড কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকল। ভুলে গেছে মতো, তারপর বলল, আমার কখনও কখনও এটা মনে হয়। মানুষ যতই স্বার্থপর হোক ছোট, কিন্তু কিছু ভাল কাজ করে থাকে কি না বল! মোষের চামড়ার ব্যবসাটা লা-সালে আদায় করে নিলেন বটে, বিনিময়ে তিনি কেল্লা নির্মাণ, কেল্লা দখল, জায়গা জমি যা কিছু দখল করলেন, সব চতুর্দশ লুইয়ের নামে। কেবল তাঁর ব্যবসা নদীর পাড়ে অথবা বনভূমির ভেতর হাজার হাজার মোষের। মোষের চামড়ার। ইজারা নেওয়া দেওয়ার কারবার।—তুমি ঠিক দেখছ তো!

ছোট বলল, দেখছি, ডান দিকে একটা স্টিম-বোট উঠে আসছে।

—তোমাকে আর একটু দেব! ছোট তখন ওর দিকে তাকালে, সে ছোটর গ্লাস তুলে দেখল। ছোট এক সিপও খায় নি। এই খাচ্ছ না কেন!

ছোট বলল, দেখি, সে প্রায় হাত বাড়িয়ে নিল, এবং ঠোঁটের কাছে নিয়ে খুব কষ্টে এক সিপ খেল, তারপর আর এক সিপ। এবং কিছুক্ষণ পর আরও এক সিপ। বেশ ঝিম-ঝিম্ করছে। সেকেণ্ড বলে চলেছে তখন। আর একটা দলে এসেছিলেন, জোলিয়েত এবং পুরোহিত মার্কুয়েট। তারা সারা দেশ পার হয়ে ঠিক এক সময় মিসিসিপির তীরে এসে পৌঁছাল। তারা ঠিক লা-সালের মতো যায় নি। ওরা বড় বড় হ্রদ পার হয়ে গিয়েছিল। ওরা হরিৎ উপসাগর থেকে ডিঙ্গি নৌকায় রওনা হয়েছিল। সঙ্গে ছিল মাত্র পাঁচজন লোক। ওরা উইসকনসিন এবং মিসিসিপি যেখানে মিশেছে ঠিক সেখানে পৌঁছে দেখল, সামনে শুধু অরণ্য—গভীর, যেন হাজার হাজার তিমি মাছ আকাশ থেকে অদৃশ্য সুতোয় কেউ ঝুলিয়ে রেখেছে। নদী পাশ দিয়ে বয়ে গেছে বোঝাই যাচ্ছে না, আরও কত সব কিংবদন্তী রয়েছে, ওরা শুনতে পেয়েছিল, নদীতে একটা বিরাট দানব রয়েছে। মাঝে মাঝে তার গর্জন আরম্ভ, হয়। চারপাশের গাছ-পালা থেকে সব পাখিরা পালিয়ে যেত। বুনো মোষেরা লেজ তুলে দিক-বিদিক ছুটতে থাকত। সমস্ত চরাচর একেবারে কাঁপিয়ে দিত।

সেকেণ্ড-এর মনে হল, ছোট ঝিমুচ্ছে। সেকেণ্ড কেমন ক্ষেপে গেল। সে ধাক্কা মরল ছোটকে। বলল, তুমি সেলর!

—ইয়েস স্যার।

—নো।

—কেন নো স্যার?

—তুমি ঝিমুচ্ছ আমি কি বলছি, শুনেছ?

—ধুস! আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে সেকেণ্ড। আমি উঠব। তোমার বক্ বক্ আমার ভাল লাগছে না।

—আরে শোন শোন, এই ছোট ঐ দ্যাখো। সত্যি ছোটর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। একটা স্টীম- বোট যাত্রী বোঝাই—নিচে নেমে যাচ্ছে। আলোতে সাজানো। মার্দিগ্রাস উৎসব কি এখানে আরম্ভ হয়ে গেছে! সে বলল, দ্যাখো দ্যাখো কেমন নাচছে জোড়ায় জোড়ায়।

দূরবীন না হলেও দেখা যায়। খুব কাছে এবং দ্রুত নেমে যাচ্ছে স্টিম-বোটটা। –আচ্ছা ছোট, ডেবিড ছোটকে ঠেলা দিয়ে বলল, ওরা আমাদের সঙ্গে ওপরে উঠে যায় না কেন! নিচে নেমে যাচ্ছে কেন!

ছোট বলল, আমি আর খাব?

সেকেণ্ড বলল, খাবে। একশবার খাবে। রাত এখনও অনেক জাগতে হবে।

—কটা বাজে?

—এগারোটা।

—জ্যাক জেগে যাবে না তো!

—জাগলে আমাদের কি! ডেবিড খুব উত্তেজনার মাথায় কথা বলছে। আহারে! এমন একটা সময়ে সুন্দর স্টিম-বোটে আমরা কেন থাকলাম না।

ডেবিড কি এখন বসে বসে মরাকান্না জুড়ে দেবে! সে বলল, ডেবিড, তুমি মরাকান্না জুড়ে দিলে আমি এখানে থাকব না। আমি চলে যাব। বলেই ছোট হুড়মুড় করে উঠে বসল। জাহাজ যে যাচ্ছে বোঝা যাচ্ছে, কারণ তীরের গাছাপালা যদিও এখন আর কিছুই তেমন স্পষ্ট নয়, ছায়া-ছায়া এবং নদী ক্রমে প্রশস্ত হয়ে যাচ্ছে, কেবল কলকল জলের শব্দ। ওর তখন দূরের কোথাও আর একটা নদী পাড়ের কথা মনে পড়ে যায়, ঠিক যেন সেখানে ড্যাং ড্যাং করে দুর্গাপুজোর বাজনা বাজছে, কবুতর উড়ছে আকাশে এবং অজস্র কাশফুল নদীর পাড়ে

তুষারপাতের মতো বাতাসে উড়ছে। সে উঠেই যেতে পারল না। মাথাটা কেমন ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। সেকেণ্ড পুরোহিতের মতো নদী সম্পর্কে যা মাথায় আসছে বলে যাচ্ছে।

সেকেণ্ড বলল, মার্কুয়েট ভীষণ চালাক লোক ছিল হে। রাতদিন নদীর জলে ডিঙ্গা ভাসিয়ে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, নদী কখনও বাঁক নিয়েছে। দ্বীপের মতো মাঝখানে ডাঙ্গা। এতদিন চালিয়েও ওরা একটা মানুষের পায়ের দাগ দেখতে পেল না, কেবল যেখানে মাঠ, মাঠে বড় বড় ঘাস সেখানে হাজার হাজার বুনো মোষ কি যে আনন্দে ঘোরাফেরা করছে!

তারপর সেকেণ্ড কেমন মোহভঙ্গের মতো বলে ফেলল, প্রায় দু'হপ্তা চলার পর ওরা মানুষের পায়ের দাগ দেখতে পেয়েছিল, যেন সেই এক রবিনসন ক্রুশোর ব্যাপার। ওরা নদীর দু'পাড়ে কোথাও বড় বড় পাহাড় পর্যন্ত দেখেছিল। রবিনসন ক্রুশোর ব্যাপারটা ভয়াবহ, কেউ তখন আক্রমণ করে বসবে, ভয়ে বুক গলা শুকিয়ে তাদের কাঠ। কারণ তাদের নানাভাবে হুঁশিয়ারি ছিল, নদীর দু-পাড়ের আদিবাসীরা নদীর মতোই হিংস্র, নির্মম। তারা সব আগন্তুকদের মেরেই ফেলে। এক মুহূর্ত তারা অপেক্ষা করে না। মার্কুয়েট তাদের সহজেই খুঁজে পেয়েছিল। তাদের সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে মার্কুয়েট অবাক। সর্দার রেড ইণ্ডিয়ান ওর শেষ কম্বলখানি খুলে দিয়েছিলে মার্কুয়েটকে। পরম সমাদরে আদর অভ্যর্থনা, এবং কুকুর নিয়ে ঘাসের ওপর বড় বড় গাছের ছায়ায় খেলা পর্যন্ত দেখিয়েছিল। উপহার দিয়েছিল পর্যাপ্ত মাছ, জই-এর পায়েস। সকাল বেলায় নদীর পাড়ে সর্দার তার ছশো অনুচরসহ ওদের বিদায় জানিয়েছিল।

সেকেণ্ড বলল, তুমি ঘুমোচ্ছ!

—না।

—তবে এভাবে চিৎপাত হয়ে শুয়ে পড়েছ কেন?

—মাথাটা ঝিমঝিম করছে।

সেকেণ্ড প্রায় কানের কাছে মুখ এনে চিৎকার করে বলল, এখন যেখানে আলটন শহর আছে না, সেখানে মেয়েদের কিছু নগ্ন মূর্তি তারা খুঁজে পেয়েছিল। তার নিচেই ওরা দেখেছিল নদীর জল ঘোলাটে কেমন হলুদ রঙ জলের। মিসিসিপির শান্ত নীল জলস্রোতকে কোথা থেকে প্রচণ্ড গতিতে জলের ঘূর্ণি এসে একেবারে হলদেটে করে দিচ্ছে। ওরা জানত না, ওটা মিসৌরি। মিসৌরি এসে এখানটায় মিলে নদীকে করেছে দুর্বার অশান্ত। পাগলা হাওয়ায় যেন নদীর জল অনেক ওপরে উঠে লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে যাচ্ছে। পাগলাচণ্ডীর মতো অশান্ত গর্জনে নদী ক্ষিপ্ত হয়ে গেছে।

হঠাৎ তখন মনে হল পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। সেকেণ্ড দেখল, জ্যাক। জ্যাক এসে গেছে ছোটবাবু।

ছোটবাবু উঠে বসল না, এমন কি তাকিয়েও দেখল না। বলল, আঃ

জ্যাক বলল, কি করছ তোমরা?

সেকেণ্ড ওর দূরবীন বগল থেকে একেবারে নামিয়ে নিচে লুকিয়ে ফেলল। বলল, নদী দেখছি। ছোটবাবুকে নদীর কথা বলছি।

–ছোট তো ঘুমোচ্ছে।

–না ঘুমোচ্ছে না।

জ্যাক উপুড় হয়ে বসল মাথার কাছে। দেখল চোখ বুজে আসছে। খেয়েছে! আজ আবার খেয়েছে! চোখ দুটো টেনে ফাঁক করলে আবার খুঁজে যাচ্ছে। জ্যাক বলল, কাকে বলছ।

—কেন ছোটকে।

—কিছু শুনতে পাচ্ছে না।

—মানে!

—দ্যাখো না।

—এই ছোট তুমি কিছু শুনতে পাচ্ছ না?

—আমি বাড়ি যাব ডেবিড।

—এই তো কথা বলছে।

—ঠিক বলছে? ওতো এখন স্বপ্ন দেখছে।

—স্বপ্ন!

—তা ছাড়া কি!

সেকেণ্ড এবার উপুড় হয়ে পড়ল, এই ছোট তুমি স্বপ্ন দেখছ?

জ্যাক বুঝল দুজনেই বেশ টেনেছে। ছোটর খাবার অভ্যাস নেই এটা সে জানে। এ-ব্যাপারে ছোটর ভয়ও আছে। ছোট খায় না! অথচ ডেবিড ওকে খাওয়া শেখাচ্ছে। সে এবার দু-হাতে জামা ধরে তুলে বলল, ছোটবাবু তুমি কোথায় যাবে?

—বাড়ি যাব।

সেকেণ্ড তখন চোখ বুজে বলছে, ছোট কি বলছে জ্যাক?

—বাড়ি যাবে বলছে।

—কাল সকালেই তো বাড়ি পৌঁছে যাব।

জ্যাক আর সহ্য করতে পারল না। বলল, তুমি ওকে আর দেবে না।

—পাগল! ক্ষেপেছ ওকে আর দি। আমার একটা ইজ্জত নেই।

ছোট এবার কাউকে যেন গ্রাহ্য করছে না—আমারও ইজ্জত আছে সেকেণ্ড। আমাকে তোমরা যখন-তখন অপমান করতে চাও। আমি কিছু সহ্য করব না। আমি বাড়ি যাব। তুমি আমাকে বাড়ি পৌঁছে দেবে। ভীষণ জড়ানো কথা এবং অস্পষ্ট।

—দেব। ওঠো।

—কিন্তু —

—না আর কিন্তু না।

—আমি উঠতে পারছি না।

জ্যাক বলল, নাও ধরো। ডেবিড বলল, ধর। দুজনেই টলছে। জ্যাক দেখল, সিঁড়ি ধরে নামার সময় দুজনেই হুড়মুড় করে পড়বে। সে এবার বলল, তুমি বস ডেবিড। ওকে আমি রেখে আসি।

জ্যাক জানে এখন বাবা ঘুমোচ্ছে। রাত অনেক। ওর ঘুম আসছিল না। সেই কখন থেকে সে পোর্ট-হোল খুলে চুপচাপ গোপনে দেখে যাচ্ছিল। ওরা কিছু খাচ্ছে সে সেটা টের পাচ্ছিল। গোপনে ওরা চুরি করে মদ খাচ্ছে বুঝতে পারে নি। ওদের কথাবার্তা সেই কখন থেকে শুনছে। অস্পষ্ট বলে বুঝতে পারছিল না। সে কিছুতেই কেবিনে শুয়ে থাকতে পারে নি।

সে ক্রমে বুঝতে পারল, ছোটর ভীষণ নেশা হয়েছে। আর কেউ নেই এখন জেগে। জেগে থাকলেও ঐ যেমন এরা আছে তেমনি, পোর্টের কাছাকাছি দায়-দায়িত্ব সব পাইলটের। একটু বেচাল হলে তেমন ক্ষতির কিছু নেই। তবু সকালে জাহাজ বাঁধাছাঁদা আছে। ডেবিডের অনেক কাজ। কেবিনে একটু চোখ বুজতে পারলেই ডেবিড একেবারে ঠিকঠাক। আর এখন এই ছোটবাবু—সে ছোটবাবুকে নিভৃতে দাঁড় করিয়ে বলল, আমার কাঁধে হাত রাখো, ছোট। আস্তে আস্তে পা ফেল। ভয় নেই। পড়বে না।

ছোটবাবু বলল, তুমি খুব ভালো ডেবিড

জ্যাক বলল, আমি ভাল না। আমি ভীষণ খারাপ। আস্তে। লম্বা পা ফেলবে না।

—আমাকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছ ডেবিড?

—হ্যাঁ বাড়ি। একবার বলার ইচ্ছে হল, আমি জ্যাক, ডেবিট বোট-ডেকে শুয়ে আছে। কিন্তু কিছু বলল না।

—জানো, আমার দুটো ভাই আছে। একটা বোন আছে।

—জানি।

—তুমি জানো আমরা এত গরীব ছিলাম না।

—জানি।

—আমরা দুর্গাপুজোতে মোষ বলি দেখতাম।

মোষ বলি ব্যাপারটা জ্যাকের জানা নেই। সে বুঝতে পারল না। ছোটবাবু যাই বলুক সে হুঁ-হাঁ করে যাচ্ছে। খুব সন্তর্পণে সিঁড়ি ধরে নামানোর সময় কেমন হড়কে গিয়ে জ্যাককে ছোটবাবু পুরোপুরি জড়িয়ে ধরল। আহা ছোটবাবুর শরীর কী নরম! জ্যাক চোখ বুজে রয়েছে। মাতাল ছোটবাবু তার শরীরের ওপর ভর করে সোজা দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। জ্যাকও ছোটবাবুর কাঁধে মুখ লুকিয়ে একেবারে একটা লতার মতো জড়িয়ে থাকতে চাইল। যেন বলতে চাইল, ছোট তুমি কি টের পাচ্ছ না! তুমি কিছু বুঝতে পারছ না?

আর তখনই ছোটবাবু বলল, আমাকে এভাবে দাঁড় করিয়ে রাখলে কেন? আমি বাড়ি যাব না? জ্যাক বোধহয় ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদত। ছোটবাবু তুমি কি! তুমি কি ছোটবাবু? তুমি আমাকে একটু লতার মতো জড়িয়ে থাকতে দাও। কেউ নেই। ছোট, আমি বড় হয়ে গেছি। সত্যি বড় হয়ে গেছি।

ছোটবাবু বলল, আমার দাঁড়াতে ভাল লাগে না।

জ্যাক বলল, তুমি তো হাঁটতে পারছ না।

—খুব পারছি।

জ্যাকের ইচ্ছে, সে যতটা পারে দেরি করে নিয়ে যাবে। এই নীল দাড়ি এবং চুল বড় মহিমময়। আশ্চর্য ঘ্রাণের মতো এক সৌরভময় জগতে সে আছে। সে যেন এক সুন্দর পৃথিবীর বাসিন্দা হয়ে যায় তখন। কেউ জানে না, এই যে যুবক অথবা কাজ করে করে ছোটবাবুর ঋজু চেহারা, আর শরীরে কি উজ্জ্বল রঙ আর ঘাসের মতো নরম বাহুর ভেতরে হারিয়ে যাবার কি যে অশ্চর্য প্রলোভন কেউ তা বুঝতে পারবে না। জ্যাক যেন নিরবধিকাল এভাবে জড়িয়ে থাকবে ছোটবাবুর শরীরে। সে বারবার মিশে যেতে চাইছে অথবা ছোটবাবুর শরীরে সে হাত দিয়ে দেখার এমন সুযোগ আর পাবে কিনা জানে না। যেন জ্যাক এক পাথরের মূর্তির পাশে দাঁড়িয়ে আছে। অকারণ চারপাশে ওর নরম আঙুলগুলো ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে শরীর এবং কি ভেবে হাঁটু গেড়ে বসে ওর দু পায়ের ফাঁকে মুখ রেখে ফিস ফিস করে বলছে, ছোটবাবু আমি মেয়ে। তুমি বিশ্বাস কর আমি মেয়ে। আমি জ্যাক নই ছোটবাবু। আমি বনি।

ছোটবাবু বুঝতে পারল না, ডেবিড তাকে এভাবে কেন দাঁড় করিয়ে রেখেছে। সে তো কিছুই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে না। সব কিছু সামনের ঝাপসা। ডেবিডের মুখ ঝাপসা। কখনও কুয়াশার ভেতরে মানুষের মুখ দেখলে যেমন লাগে তেমনি। সে বুঝতে পারছে না হাঁটুর ভেতর মাথা রেখে ডেবিড কি করছে? ওকে কী জুতো পরিয়ে দিচ্ছে? ঠোটে কি একটা পোকা উড়ে এসে বসেছে? সে কোনরকমে পোকাটা মুখ থেকে তাড়িয়ে দেবার জন্য হাত-পা ছুঁড়ে বলল, আমি বাড়ি যাব না? আর যা হবার, হাত-পা ছুঁড়তে গিয়ে প্রায় পড়তে পড়তে বেঁচে গেল। কারণ জ্যাক বুঝল এভাবে দাঁড় করিয়ে রাখা খুব রিস্কি। সে আবার হাঁটতে থাকল। একটা কথাও বলল না। একেবারে হুঁস নেই ছোটবাবুর। চুরি করে সে ছোটবাবুর ঠোটে চুমো খেয়েছে। ছোটবাবুর গালে গাল লাগিয়ে রাখছে। কেউ চলে আসতে পারে! এবং সে

চারপাশে যখন দেখছে কেউ নেই সামনের ডেকে দু-একজন জাহাজি মাদুর পেতে ঘুমুচ্ছে, এবং পাশে সেই ছোটবাবুর দুটো পাখি, ওরাও বাকসের ভেতর ছোটবাবুর তৈরি ঘরে বেশ আছে, তখন সে বলতে চাইল, আহা ছোটবাবু তুমি কি মিষ্টি আহা তুমি কি সুইট। তোমার ঠোঁট দুটো ভীষণ ভারী। ভীষণ আদুরে। আমাকে তুমি কেন বুঝতে পার না।

ছোটবাবু বিড় বিড় করে বকছে, আমার মুখে তুমি থুথু মাখিয়ে দিচ্ছ কেন? একটা পোকা!

—কৈ, পোকা কোথায় দেখছি না তো?

—ভিজে ভিজে কেন? জোঁকের মতো কেন?

জ্যাক বলল, আস্তে ছোট। তুমি নেশা করে জাহান্নামে গেছ। কি যে হচ্ছে না! যেমন ডেভিড! আমার কেবিনের পাশে এমন হলে কি করে ঘুমোই? বোধ হয় ছোট টিণ্ডাল বাদশা মিঞা, ওয়াচের ফাঁকে উঠে এসেছে। ওকে দেখেই একেবারে বিরক্তিকর মুখ জ্যাকের। এই দ্যাখো তোমাদের ছোটবাবুর কাণ্ড। নিয়ে যাও তো।

টিণ্ডাল বলল, ছোটবাবু তুমি সোরাব খেয়েছ? তোবা তোবা!

জ্যাক বলল, আচ্ছা তুমি যাও টিণ্ডাল। আমিই দিয়ে আসছি।

—না সাব। আপনি যান। আমি নিয়ে যাচ্ছি। সে দু-হাত জোড় করে বলল, কাউকে বলবেন না। ছোটবাবুর কি যে হয় মাঝে মাঝে।

—আরে না না, আমি বলব না।

জ্যাক বলল, মদ খেতে বারণ করবে। আমি যে এখানে দিয়ে গেছি, কাউকে বলবে না।

—জী সাব। কেউ জানবে না। জানলে ছোটবাবুর ক্ষতি হবে।

জ্যাক তারপর লাফিয়ে লাফিয়ে ডেক পার হয়ে গেল। সে ঘুরে ঘুরে বোট-ডেকের ওপর দিয়ে হাঁটতে থাকল। সে চুলে হাত রেখে নক্ষত্রের ভেতর, অথবা এই নদীর জলে যে আবহমান কাল ধরে কলকল শব্দ সারা মাস কাল ধরে ক্রমান্বয়ে নেমে যাচ্ছে সমুদ্রে, তাদের কাছে সে যেন ছুঁড়ে দিচ্ছে তার আশ্চর্য অনুভূতির খবর। তার কিছুতেই ঘুমোতে ইচ্ছে হল না। সারা রাত সে জেগে থাকবে। যেন ঘুমিয়ে পড়লেই সকালের বাসি ফুল হয়ে যাবে সব। আহা! তাজা কি টাটকা আর কি মনোরম এই বেঁচে থাকা। সে কেবিনে ঢুকে তার প্রিয় গান, ইয়েস সেলর গো অন, মুভ অন, পা ফেলে পা তুলে, গো অন, মুভ অন। ইউ সি দি.সি, দি মুন, এ্যাণ্ড দি লিটল স্টার। তাজা টাটকা রক্তের ভেতরে সে নাচতে থাকল। গমগম করে বাজছে। তার রেকর্ডের বাজনা সমস্ত মিসিসিপির জলে তরঙ্গ তুলে ক্রমে কুয়াশার ভেতর হারিয়ে যাচ্ছে।

আর তখনই মনে হল দুটো চোখ পোর্ট-হোলে। সঙ্গে সঙ্গে ওর শরীরের রক্ত হিম হয়ে গেল। গোপনে ওকে কেউ এতক্ষণ দেখছিল। পোর্ট-হোলের কাঁচ বন্ধ করতে কখন ভুলে গেছে। উত্তেজনায় সে যখন অধীর, তখন গোপনে কেউ পোর্ট-হোলে দাঁড়িয়ে দেখতে পারে তার মনেই ছিল না। চোখ দুটো ভীষণ জ্বলছিল লোকটার। অস্পষ্ট আলোতে সে বুঝতে পারেনি, কে, তবু যখন মনে করতে পারল, তখন তার শরীরে আর বিন্দুমাত্র সাহস থাকল না। আর এই নাচ দেখে কেউ ভেবে ফেলতে পারে সে মেয়ে, বুঝে ফেলবে, সে বনি। লোকটা আর্চি বাদে কেউ নয়। শয়তানের মতো জাহাজে উঠেই তাকে অনুসরণ করে চলেছে।

সে পোর্ট-হোলের কাঁচ বন্ধ করে দিল। পর্দা ফেলে দিল। তারপর দাঁড়িয়ে থাকল—কি করবে বুঝতে পারল না।

জাহাজটা তখনও যাচ্ছে। নদীতে নানারকম বয়ার লাল নীল বাতি জ্বলছে নিভছে।

॥ বিশ ॥

আর আশ্চর্য, সকালে সবাই দেখল বড়-মিস্ত্রি বাক্স-পেটারা নিয়ে জাহাজ থেকে নেমে যাচ্ছে। বড়- মিস্ত্রির চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে। আর্চি এবং ফোর্থ এনজিনিয়ার ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। যেন একটা এম্বুলেন্স ডাকলেই ভাল হত। জাহাজ বাঁধাছাঁদার পর পরই বড়-মিস্ত্রি রিচার্ড নেমে গেল।

সবাই অবাক। জাহাজে বিন্দুমাত্র খবর রটেনি। সত্যি সত্যি বন্দর এলে বড়-মিস্ত্রি নেমে যাবে। যেন গোপন রাখা হয়েছিল ব্যাপারটা। কাপ্তান নেমে যাবার আগে হ্যাণ্ডসেক করেছেন। ডেক-অফিসার, এনজিন-অফিসাররা মিলে ওকে গাড়িতে তুলে দিয়ে এল।

এনজিন-সারেঙ ওর চোখ মুখ দেখে ঘাবড়ে গেছেন। এমন শক্ত সমর্থ মানুষটা কি পাতলা হয়ে গেছে! ভেতরে কি এমন কঠিন অসুখ তিনি বুঝে উঠতে পারলেন না। মাঝে একবার এই কদিন আগে ভূত দেখেছিলেন বড়-মিস্ত্রি। জাহাজে এ জন্য কেউ ভাবে না। পুরানো ভাঙা জাহাজে এ-সব সংস্কার থেকে থাকে। সাহসী মানুষও মধ্যরাতে ঠাণ্ডা ঘরের ভেতর ঢুকতে ভয় পায়। অথবা সেই এলি-ওয়ে ধরে গেলে গা ছমছম করতে থাকে! ভূতের ভয়ে বড়-মিস্ত্রি জাহাজ ছেড়ে চলেছেন বিশ্বাস হয় না! আরও বড় কিছু কারণ। লক্কড়মার্কা জাহাজ, জাহাজে থাকতে ভাল লাগার কথা না। অথবা বাড়িতে কোনও দুর্ঘটনা। তিনি যতটা জানেন বড়-মিস্ত্রির নিজের বলতে ছোট এক ভাই আছে। রাউদ- এনজিনিয়ারিং ডকে কি একটা বড় কাজ করে। এবং স্ত্রী বলতে তিনি জেনেছেন, বন্দরে বন্দরে যারা তাঁর সঙ্গে রাত কাটিয়েছে তারাই।

সুতরাং কোনও খবর না দিয়েই বড়-মিস্ত্রি যেন নেমে গেল। দুটো একটা প্রশ্ন সবাই করেছে, কিন্তু কেউ কোনও উত্তর পায়নি। বোধ হয় গোপন রাখার কথা বলা হয়েছে, আসলে যে বড়-মিস্ত্রি সেই রাত থেকে আর ঘুমোতে পারেনি, বুকের ভেতর রাত বাড়লেই মনে হত, একটা কালো হাত 'পোর্ট-হোল দিয়ে গলে পড়বে। এবং সেই ভয়ে মানুষটা সারারাত জেগে বসে থাকত। একটা আশ্চর্য ম্যানিয়া হয়ে গেল। কাপ্তান নিজে ওর কেবিনে এক রাতে দেখেছেন, পোর্ট-হোলের দিকে সবসময় চোখ বড়-মিস্ত্রির। হাত ঝুলে পড়ছে ভেবে মানুষটার ভেতরে এক ধরনের ক্রমে অসুস্থতা গড়ে উঠছে। সে জাহাজের সবাইকে অবিশ্বাস করছে। তাকে সবাই চক্রান্ত করে জাহাজে তুলে এনেছে এমন একটা ভাব যেন, এবং কি করে যে ওর কি হয়ে গেল! এ-জাহাজে থাকলে সে ভয়ে মরে যাবে। এমন মনে হলে, কাপ্তান বেতার সংকেতে জানিয়ে দিলেন বড়-মিস্ত্রি ভীষণ অসুস্থ। নিউ-অরলিনসের ঘাটে সে নেমে যাচ্ছে। যদিও ব্যাপারটা একবার ভেবে দেখবার দরকার ছিল, কেন এমন হল, কিন্তু পরে মনে হয়েছে, জাহাজ থেকে নেমে গেলে যদি সে ভাল হয়ে যায়, তবে আর এতগুলো লোককে ঘাঁটিয়ে লাভ নেই।

জাহাজে এরপর দুটো বিশেষ ব্যাপার দেখা গেল। যেমন মৈত্র কেন জানি অমিয়র সঙ্গে কথা বন্ধ করে দিল। তাছাড়া জ্যাককে আর বেশি ডেকে দেখা যেত না। জ্যাক সারাটা দিন প্রায় কেবিনেই থাকত। কাপ্তানের সঙ্গে কখনও বের হয়ে যেত। নিজের কেবিনে দরজা বন্ধ করে বসে থাকত। আবার তিন চারদিন দেখা গেল, জ্যাক সব সময়ই কেবিনে। বেরই হচ্ছে না। কাপ্তান-বয়, গরম জল দিয়ে আসছে মাঝে মাঝে। একটা হট-ওয়াটার ব্যাগ নিয়েও দু-তিন দিন দেখেছে কাপ্তান ওপরে উঠে গেছেন। বোধহয় জ্যাক অসুস্থ। কিন্তু কি অসুখ কেউ বলতে পারল না। এবং জাহাজ সালফার বোঝাই হয়ে যখন ফের মিসিসিপি ধরে নেমে যাচ্ছিল, তখন আরও তাজ্জব খবরে জাহাজের সবাই অবাক হয়ে গেল।

সারেঙ এসে বললেন, তোকে ছোটবাবু, কাপ্তান ডেকেছেন

ছোটবাবুর হাঁটুতে কাঁপুনি লেগে যায়। কাপ্তান এ-ভাবে কেন যে বার বার অযথা ডেকে পাঠান। কি কারণ, সে জানতে চাইলে সারেঙসাব বললেন, তুই যা না। তোকে তিনি খারাপ কিছু বলবেন না। খারাপ বললে মনে রাখবি, আমাকে বলতেন। ভাল জামা কাপড় পরে যাবি।

যা অগোছালো তুই।

ছোটবাবু তখন কেমন মানুষটাকে জাহাজে বাপ-পিতামহের মতো না ভেবে পারে না। এবং যা হয়ে থাকে জাহাজে কাপ্তান ডেকে পাঠালেই খুব বড় খবর। আবার ছোটবাবু লকারের আয়নায় নিজের মুখ দেখে নেয়। গরম বলে সে সাদা ট্রাউজার পরেছে, আর নীল রঙের ঢোলা গেঞ্জি। চুল বড় বড় বলে মাথাটা বেশ বড় এবং নীল দাড়ি। সে টের পেল জাহাজে সে সত্যি ভীষণ সুপুরুষ। সে খুব সহজভাবে কাপ্তানের সঙ্গে কথা বলবে। যেমন সারেঙসাবকে নিজের ভালমন্দের অভিভাবক ভাবলেই তার আর ভয় থাকে না। শুধু শ্রদ্ধা, সমীহ থাকে। সে কাপ্তানের সঙ্গে ব্যবহারে শ্রদ্ধা এবং সমীহের ভাবটুকু বজায় রাখবে।

বের হবার মুখে দেখল সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। বঙ্কু, অনিমেষ ছুটে এসেছে। মনু, মান্নান সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে আছে। কাপ্তানের ডেকে পাঠানো একটা ভয়ঙ্কর ব্যাপার তাদের কাছে। ওদের মুখ খুব শুকনো দেখাচ্ছে। প্রায় যেন ফাঁসির আসামীর মতো মুখ। ছোটবাবু বের হয়ে ওদের মুখ দেখেই হেসে ফেলল। বলল, কিরে কে মারা গেছে! সে ব্যবহারে বেশ সহজ স্বাভাবিক দেখাতে চাইল।

—বাড়িয়ালা তোকে ডাকল কেন?

—কি করে বলব।

—তুই কিছু করেছিস?

—কি করব! কেবল ডেবিডের সঙ্গে পালিয়ে মদ খেয়েছিলাম। আর তো কোন দোষ করেছি বলে মনে হচ্ছে না।

—যখন তখন কেন যে ডেকে পাঠায়। এবং কথা বলতে বলতে সবাই গ্যালি পর্যন্ত এগিয়ে গেল। আর কেউ নামল না নিচে। সারেঙসাব আগে আগে যাচ্ছেন। পেছনে ছোটবাবু। পর পর দুটো ফল্কা তারপর চিফ-কুকের গ্যালি, পাশে এলি-ওয়ে, ভেতরে ঢুকলেই কার্পেট পাতা। কার্পেটের ওপর দিয়ে ছোটবাবু হেঁটে গেল। এবং দেখতে পেল, পাঁচ নম্বর মিস্ত্রির ঘর খালি। এ-ভাবে অন্য সব কেবিন বাইরে থেকে লক করা। সে হেঁটে গেল। সে দেখল, ডাইনিং-রুমে সবাই বসে রয়েছে। প্রায় সব অফিসারেরা।

এনজিন-অফিসাররা একদিকে, ডেক-অফিসারেরা একদিকে। মাঝখানে কাপ্তান। এনজিনসারেঙ ছোটবাবুকে ডাইনিং-হল পর্যন্ত এগিয়ে দিয়েই চলে গেলেন। সারেঙ চলে যেতেই সে ভীষণ ঘাবড়ে গেল। তবু কোনরকমে ডাইনিং হলে ঢুকেই বলল, গুড মর্নিং।

সেকেন্ড অফিসার ডেবিড মুচকি হাসছে। সে তাকাল ডেবিডের দিকে। তারপর কাপ্তান, এবং শেষে একে একে সবাইকে দেখল। জ্যাককে আশা করেছিল। জ্যাক নেই। সবাই যে যার পুরু ইউনিফরম পরে বসে আছে। এবং সবাইকে মনে হচ্ছিল, ভীষণ জাঁকজমকের ভেতর রয়েছে তারা। সে এ- সব দেখে আরও ঘাবড়ে গেল। মুখে আবার সেই রক্ত চাপ, মাথাটা ঝিম-ঝিম করছে। সে বুঝতেই পারছে না এ-ভাবে সবার সামনে কাপ্তান তাকে ডেকে কি বলতে চান। অথবা এমন কি সে কিছু করেছে, যা সবার কাছে এখন বলা দরকার।

কাপ্তান ওকে তখন বললেন, প্লিজ সিট দেয়ার মাই বয়। তিনি পাশের একটি চেয়ারে ওকে বসতে বললেন।

ছোটবাবু সত্যি এত ভাবতে পারে না। তার পক্ষে এসব কথা খুব সম্মানের। সে জানে, চারপাশে ক্রুদের ভেতর এখন ভীষণ উত্তেজনা। এ-ভাবে ডেকে নেবার কি কারণ! ছোটবাবুর জন্য কি কোন দুঃসংবাদ আছে! ওর দেশ থেকে কি কোন মারাত্মক খবর এসেছে! কেন এ-ভাবে ডেকে আনা, এবং এমন একটা পরিবেশের ভেতর তাকে এ-ভাবে বসিয়ে রাখা! সে একেবারেই বুঝতে না পেরে হতবাক হয়ে গেল। নানাভাবে চেষ্টা করেও সে তার মুখ সহজ স্বাভাবিক রাখতে পারল না। মুখে চোখে ওর কেমন দুশ্চিন্তা ফুটে উঠেছে।

কাপ্তান বললেন, মাই বয়, ভয়েজ কেমন লাগছে?

—খুব ভালো স্যার।

–একঘেয়ে লাগে না?

—তা লাগে। মাঝে মাঝে লাগে।

মাস্টার তার পাইপের ছাই টিপে টিপে আবার আগুন ধরাবার সময় বললেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। বলেই তিনি তাকালেন মেজ-মিস্ত্রি আর্চির দিকে। যেন আর্চিকেই এ-কথাগুলো বলা। তিনি বললেন, তোমাকে সব বলেছি মিঃ আর্চি। এখন থেকে তবে ছোটবাবু তোমাদের ছ'নম্বর

আর্চি কোনোরকমে অষুধ গেলার মতো বলল, হ্যাঁ ছ'নম্বর।

—ছোটবাবু ভাল কাজ জানে না। তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে নাও।

মেজ মিস্ত্রি বলল, তাই হবে।

ছোট এ-সব কি শুনছে! সে কেন পারবে এমন সব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অথচ সে কাপ্তান হিগিনসের দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারছে না। মানুষটা সত্যি যেন অনেক বড়। তিনি যা বলবেন, সবাই মাথা পেতে নেবে, তাকে নিতে হবে। তবু যেন সে বুঝতে পারল, এনজিনে কাজ করার মতো বিদ্যা- বুদ্ধি তার নেই।

তখনই আবার হিগিনস বললেন, উইনচ-রিপেয়ারের কাজগুলোতো তোমার মোটামুটি জানা?

ছোটবাবু বলল, সামান্য স্যার।

—আপাতত এভাবে চালিয়ে যেতে পারলেই হবে।

ছোট্ট বলল, কিন্তু স্যার……। কিন্তু কাপ্তান ওকে কথা বলার সুযোগ দিলেন না। ডেবিড আগের মতোই ওর দিকে চেয়ে আছে। খুব খুশি ডেবিড। সবাই চেয়ে আছে। কেবল আর্চির গোমড়া মুখ চোখ তাকে ভয় পাইয়ে দিচ্ছে। আর্চি কিছুতেই নিজের এই অবমাননা যেন সহ্য করতে পারছে না। কোথাকার একটা অনভিজ্ঞ নেটিভ জাহাজে উঠেই সবার মন জয় করে ফেলল। এখন যেন ইচ্ছে করলে এই ছোটবাবু জাহাজে অনেক কিছু করতে পারে। আর্চি কিছুতেই কাপ্তানের বিরুদ্ধে যেতে পারছে না। চিফ জাহাজ থেকে নেমে যাওয়ায় ওরও একটা প্রমোশন কোম্পানীর ঘরে হয়তো হয়ে যাবে। কাপ্তান হিগিনিস বাদ সাধলে তার কিছুই হবে না। এবং তেতো ওষুধ গেলার মতো সে বলল, একবার পরীক্ষা করে নিলে হত না। ওর চেয় বেশি অভিজ্ঞ অনেকে আছে। কশপ ভাল কাজ জানে, ওকে দেখা যেতে পারত।

কাপ্তান বললেন, জাহাজের অবস্থা ভাল না। বয়সী মানুষ দিয়ে হবে না। আমাদের এখন ইয়াং এনারজেটিক লোকের দরকার।

মেজ-মিস্ত্রি আর্চি বুঝল, কাপ্তান নিজের সিদ্ধান্তে স্থির। সুতরাং সে চুপ করে থাকল।

কাপ্তান বললেন, নাউ বয়, এখন থেকে তুমি ডাইরেকট মেজ-মিস্ত্রির আন্ডারে। তাঁকে তুমি ভক্তি শ্রদ্ধা করবে। তিনি এখন তোমার বস। তাঁর মর্জি মতো তোমাকে এখন থেকে চলতে হবে। তারপর থেমে বললেন, তুমি এমন কিছু করবে না যাতে তিনি এতটুকু দুঃখ পান।

ছোটবাবুর এখন আবেগে গলা বুজে আসার মতো। সে ভাবতেই পারেনি এনজিন-রুমের ছ'নম্বর সে কখনও হতে পারবে। আজ থেকে সে জাহাজের একজন দায়িত্বশীল লোক।

তার খাবারের মেনু আলাদা। সে ভাল পোশাক পরতে পাবে। স্যাবি পোশাক পরে থাকতে হবে না। মাইনে সে পাবে অনেক বেশি। কত পাবে এখনও ঠিক জানতে পারেনি, তবু এখন যা আছে তার চেয়ে কুড়ি গুণ বেশি। সে এখন থেকে ডাইনিং হলে খেতে আসবে। তার জন্য একটা কেবিন থাকবে। মেস-রুম-বয় তাকে দেখলেই সেলাম ঠুকবে। জাহাজিরা তাকে দেখলেই ছ'নম্বর বলবে। জাহাজে সে এ-খবরটা কতক্ষণে সবাইকে যে দিতে পারবে!

আর তখনই কাপ্তান সবাইকে বললেন চলে যেতে। এবং সারেঙকে ডেকে পাঠাবার জন্য বললেন। বোধহয় এখন ওঠার দরকার এমন ভেবে ছোটবাবু উঠতে যাবে, কাপ্তান হিগিনস এসে ওর সামনে দাঁড়ালেন। বাঁধানো দাঁত জিভের ওপরে তুলে আবার মাড়িতে ফিট করে চারপাশে দেখলেন। কেউ নেই। তখন ধীরে ধীরে বললেন, মাই বয়, ফেস এনি হিউমিলেশান এ্যান্ড পানিশমেন্ট লাইক এ সেলর। ছোটবাবু বুঝতে পারল না এতে হিউমিলেশানের কি আছে! তারপরই যেন আর্চির চোখ তাকে অনুসরণ করতে থাকল। সে বলল, আই উইল ডু স্যার।

তিনি ফের বললেন, মাই বয়, অলওয়েজ রিমেম্বার, ওয়ান হ্যান্ড ফর ইউরসেলফ, এ্যান্ড ওয়ান ফর দা শিপ।

সে বলল, ইয়েস আই উইল।

তারপর তিনি বললেন, সো দিস ইজ দা লাইফ এট সি। তুমি যেতে পার।

কেমন কিছুটা টলতে টলতে ছোটবাবু বের হয়ে যেতে থাকল। পৃথিবীতে এ-কাজটা তাকে এমন অহংকারের চূড়োয় তুলে দিতে পারে সে কখনও ভাবে নি। সে যেন হেঁটে যাচ্ছে না, দৌড়ে যাচ্ছে, সে যেন দু-হাত ওপরে তুলে বলতে চায়, আমার কি হয়েছে দ্যাখো, আমি কত বড় দ্যাখো। কিন্তু কিছুটা এসেই সে থমকে দাঁড়াল। সব ক্রুদের জটলা একেবারে ভান্ডারি-গ্যালির সামনে। ওরা অপেক্ষা করছে। কি খবর! কোন দুঃসংবাদ। সে বলল ভীষণ ভীষণ দুঃসংবাদ, সে উঠেই প্রথম দেখল মনু সামনে, সে মনুর গলা জড়িয়ে ধরল, ভীষণ ভীষণ দুঃসংবাদ, সে বলল, মৈত্রদা কোথায়, চাচা কোথায় অমিয়, এই অমিয়—চাচা কোথায় গেল!

সকলে অবাক। ভেবে পাচ্ছে না ছোটবাবু এমনভাবে সবাইকে খুঁজছে কেন!ওরা বলল, কি হয়েছে! মৈত্র ছুটে এসেছে নিচ থেকে। যেন বড় রকমের একটা দুঃসংবাদ বয়ে আনবে ছোটবাবু। ওরা নিচে নিঃশ্বাস বন্ধ করে বসেছিল। ছোটবাবুর হাঁকডাকে ওরা লাফিয়ে ওপরে ওঠে এল। আর সঙ্গে সঙ্গে মৈত্রের গলা জড়িয়ে ধরে বলতে বলতে কেঁদে ফেলল ছোটবাবু, আমাকে কাপ্তান এনজিনরুমের ছ'নম্বর করে দিয়েছে। আমি অফিসার হয়ে গেলাম দাদা। কাল থেকে তোমাদের সঙ্গে আর থাকতে পারব না।

ততক্ষণে সারেঙও ফিরে এসেছেন। এসেই বললেন, বাড়িওয়ালা কালই ওর কেবিনে সব সামান রেখে আসতে বলেছে। ওর কেবিন দেখে এলাম। রঙ করতে হবে। আজই করতে হবে।

মৈত্র বলল, এই অমিয়! এমন একটা খবরে মৈত্র গলে জল হয়ে গেছে। অমিয়র উপর রাগ নেই।

অমিয় বলল, কি! মৈত্র ফের কথা বলায় সে খুব খুশি।

—রঙ করতে হবে।

মান্নান বলল, আমরা রঙ করব।

মনু বলল, কি কন!

মান্নান বলল, আমি আর ইয়াসিন রঙ করব।

—ক্যান। আমরা কি করতে আছি। ছোটবাবু এনজিন রুমের। ছোটবাবু আমাদের লোক।

এনজিন-সারেঙ বলল, মৈত্রমশাই ছোটবাবু আর আপনার হেপাজতে থাকল না। বলতে বলতে কেমন গলা ধরে এল তার।

আসলে এনজিন-সারেঙ নিজের দুঃখটা এই বলে ঢাকা দিতে চাইছেন। ছোটবাবুর ওপর আজ থেকে তাঁর আর কোন দাবী থাকল না। ছোটবাবুর ভাল-মন্দের জন্য তার যা কিছু দায়িত্ব—বাড়িয়ালা এক কলমের খোঁচায় তা কেড়ে নিলেন। ছোটবাবুর জন্য ভেতরে কি যে মায়া! কারণ ছোটবাবুকে আর এদিকে বেশি আসতে দেখা যাবে না। আজ থেকে ছোটবাবুর জাত-

মান বেড়ে গেল। অথচ সারেঙ-সাব খুব খুশি, ছোটবাবুকে এমন একটা কাজই মানায়। খুব-খাটুনির কাজ, আর মেজ-মিস্ত্রি আর্চির কথা মনে হলেই সারেঙ-সাব কেমন শক্ত হয়ে যান। ডেকের ওপর মেজ মিস্ত্রি যেভাবে পাঁচ নম্বরকে হেনস্থা করে থাকে, কিল চড় ঘুষি মেরে থাকে, পাঁচ নম্বর কাজে ভুল করলে, লাথি মেরে ফেলে দেয়, যদি ছোটবাবুকে এ-ভাবে এবং এভাবে যেন একটা কিছু হয়েও যাবে—ভয়ে সারেঙের বুকটা কেঁপে উঠল। যেন একটা হাঙ্গরের মুখে বাড়িওয়ালা ইচ্ছে করেই ছোটবাবুকে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। এখন থেকে মেজ-মিস্ত্রি ছোটবাবুর সব। তিনি তার কেউ না, তিনি ফালতু।

সারেঙ-সাব বললেন, আমার সঙ্গে মনু অমিয় আয়। অর্থাৎ সারেঙসাব আর দেরি করতে পারছেন না। বোধহয় বেশি কথা বললে, আবেগে চোখ ঝাপসা হয়ে যেতে পারে ভেবে অমিয় এবং মনুকে নিয়ে চলে গেলেন। নিজে দাঁড়িয়ে ছোটবাবুর কেবিনে রং করবেন। সাদা, নীল যেখানে যে-রং লাগালে মানায় এবং এমন চাকচিক্যময় করে তুলতে হবে, যেন ছোটবাবুর কেবিনের পাশে আর সব কেবিন ভীষণ ম্যাড়ম্যাড়ে, ছোটবাবুর কেবিনে অন্য অফিসাররা এলেই যেন বুঝতে পারে—এ কেবিন ছাড়া ছোটবাবুকে মানায় না।

ছোটবাবু তারপর ফোকসালে নেমে গেল। সবাই এখন ছোটবাবুর চারপাশে। ওরাও নেমে গেল। কত বড় সম্মান! যেন এখন এই সাধারণ জাহাজিরা বলতে চায়, আমরাও কম কিসে, আমাদের আর এত ছোট ভেব না। আমাদের লোক ছোটবাবু। তোমাদের ধার দিচ্ছি। এবং এর ভেতরই সেজে এল মজুমদার। সে যা করে থাকে, ঘুরে ঘুরে নাচে, এবং পায়ে ঘুঙুর। কারণ, এছাড়া ছোটবাবুকে ওরা কি দিয়ে বিদায়বেলার উৎসবে বলতে পারে তুমি আমাদেরই লোক। ছোটবাবু আমাদের ভুলে যেও না।

কেবল মৈত্র পাশে বসে ভাবছে। সে এই নাচ গান হল্লা শুনছে না। চা আসছে, চপাটি আসছে, এরই ভেতর চপাটি সবাই খাচ্ছে যেন ওরা ভেবে ফেলেছে রঙ-বেরঙের কাগজের মালা, ফুল এবং সব নানা রঙের ফেস্টুন ছোটবাবুর বিদায় উৎসবে উড়ছে, ঝুলছে। তার ভেতরই তারা চা খাচ্ছে। আসলে এটা চা নয়, যেন পানীয় এবং মাথার ওপরে ছাদ, সাদা রঙের। একটা মরা আলো ফোকসালে। এতে ওদের আসে যায় না। ওরা ভেবে ফেলেছে এখানে এখন জ্বলছে হাজার রকমের নীল বাতি, উজ্জ্বল বর্ণমালার ভেতর ওরা নেচে গেয়ে ছোটবাবুকে হেইল করছে।

কেবল ছোটবাবু চুপচাপ। এবং মৈত্রদা ছোটবাবুকে দেখছিল। ওদের এখন থামা উচিত। মৈত্র ওদের বলল, এবার তোরা যা। ছোটকে একটু একা থাকতে দে।

ছোটবাবু বলল, না, না। ওরা থাক না। জান মৈত্রদা, আমার ভাল লাগছে না। কেমন ভয় ভয় করছে। তোমাদের ছেড়ে যেতে আমার ভাল লাগছে না।

—ভয়ের কি আছে!

—আমি তো কিছু ঠিক জানি না। ট্রেনিঙে যা শিখেছি, আর এই পাঁচ ছ মাসে পাঁচ নম্বরের সঙ্গে কাজ করে করে যা বুঝেছি।

মৈত্র বলল, কি বা কাজ, উইনচ ঠিকঠাক রাখা, ফিলটার পরিষ্কার করা, টিউবে বয়লারের জল রোজ একবার টেস্ট করা—আর কি, তবে তুই কিছু বইটিই কিনে ফেলবি। তোর কাজে অনেক সুবিধা হবে।

মৈত্র অবশ্য জানে কিসের জন্য ছোটবাবুর মুখ ব্যাজার। এতদিন একসঙ্গে থাকলে একটা মায়া গড়ে ওঠে ওদের ছেড়ে থাকতে ছোটবাবুর ভাল লাগবে না। এবং ছোটবাবু বোধহয় মনে মনে টের পেয়েছে—মেজ-মিস্ত্রি আর্চির নিষ্ঠুরতার শেষ নেই। মৈত্র বলল, ভয় কি আমরা তো আছি।

ফোকসাল এখন ফাঁকা। কেবল ছোটবাবু আর মৈত্র বসে রয়েছে। অন্য ফোকসালে সবাই এখন ছোটবাবুর গুণগান করছে। আসলে যখন জাহাজে ছোটবাবু উঠে এসেছিল, তখনই

সবাই টের পেয়েছে, ওদের মতো এমন ছোট কাজ করার লোক ছোটবাবু নয়। বাদশা মিঞা বলেছে, জানো ছোটবাবু কত লেখাপড়া জানা ছেলে। আমাদের মতো সে কেন ডেকে এনজিনে পড়ে পড়ে মার খাবে। ঠিক লোক এবার থেকে ঠিক জায়গায় চলে গেল। এতদিন ছোটবাবু তাদের সঙ্গে কাজ করেছে এই যথেষ্ট। এমন যে হবে সেটা এখন কে বেশি টের পেয়েছিল তা নিয়ে কোথাও কোথাও ঝগড়া বচসা পর্যন্ত আরম্ভ হয়ে গেল। এবং তখন বারোটা বাজলে, ওয়াচে মৈত্র একবার নেমে দেখে এল, সব ঠিকঠাক আছে কিনা। জাহাজ ভীষণ আস্তে চলছে বলে, কয়লা কম হচ্ছে। আর আমেরিকান কোল, খুবই কম কয়লায় বয়লারে স্টীম উঠে যায়। ছাই একেবারেই হয় না। যেন তেলের মতো জ্বলতে থাকে। তখন কোলবয়ের তেমন কাজ থাকে না। দু-চার বেলচা কয়লা মারলেই হয়ে যায়। সুতরাং তিনজন ফায়ারম্যান নিচে ঠিকঠাক কাজ চালিয়ে নিচ্ছে। তবু একবার দেখা দরকার ভেবে বোটডেকে উঠে যাবার সময় দেখল, সারেঙ-সাব এলি-ওয়ে ধরে বের হয়ে আসছেন। আর অবাক, বিচিত্র রং- এ সারেঙ-সাবের সাদা বয়লার স্যুট অদ্ভুত দেখাচ্ছে। চুলে দাড়িতে রঙ লেগেছে। নাকে কিছুটা সাদা রঙ। সারেঙ-সাবকে একজন বুড়ো জোকারের মতো দেখাচ্ছে। ওর হাসি পাচ্ছিল। অনেক কষ্টে হাসি চেপে বলল, সারেঙ-সাব মুখটা মুছে ফেলুন।

সারেঙ-সাব বললেন, বুড়ো হলে কি হবে, কাজ কাম হাতে অনেকদিন করি না বলৈ কি হবে, এখনও পারি, রং লাগাতে পারি। অমিয় মনু পারে না। যত বলি ঠিক হচ্ছে না, তত বলে আর কি হবে সারেঙ-সাব। তখন কি করি বলুন, বুরুশ হাতে নিলাম। বললাম, দ্যাখ, দেখছিস —বুরুশের দাগ কোথায় ভেসে উঠছে!

মৈত্র বুঝতে পারল, ছেলের জন্য নিজে রঙ করে দিতে না পারলে সারেঙ সাবের মন ভরছে না। সারেঙ-সাবের কি এখন গর্ব। ছেলে তার মান-সম্মান যখেনি শুধু, সবার ইজ্জত বাড়িয়ে দিয়েছে। তিনি আবার ছেলেমানুষের মতো বললেন, আসুন না, দেখবেন কি রকম রঙ করলাম। কেমন দেখাচ্ছে। বলে প্রায় জোরজার করে মৈত্রকে ধরে নিয়ে গেল। মৈত্র এদিকে কখনও আসেনি। কার্পেটের ওপর দিয়ে সে কেন যেন দ্রুত হাঁটতে পারে না। সে তবু সারেঙ-সাবের সঙ্গে প্রায় দৌড়ে গেল। সারেঙ- সাব দরজা খুলে দিয়ে বললেন, দেখুন। ছাদে নীল রং, কশপকে বলেছি রং এক নম্বর দিতে হবে, দেয়ালে একটু ব্লু আর মেজেন্টা মিলিয়ে কি রং এনেছি দেখুন। কোথাও বুরুশের দাগ ভেসে উঠেছে? তবে!

অমিয় মনু রং-এর টব আর বুরুশ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। মৈত্র অমিয়কে বলল, তোরা কি! মনুকে বলল, সারেঙ-সাবকে তোরা রং করতে দিলি?

—আমরা দিয়েছি!

অমিয় বলল, সাবান জল দিয়ে যত ধুই তত বলেন, না সাফ হচ্ছে না। ঠিক হচ্ছে না। রং লাগালে চিৎকার করছেন, হচ্ছে না। বুরুশের দাগ ভেসে উঠছে। আমরা কি করব বল? একা একা সবটা করলেন।

সারেঙ-সাব বললেন, কেমন হয়েছে বললেন না তো?

—খুব ভাল!

মৈত্র আর দাঁড়াল না। নিচে এক্ষুনি নেমে যেতে হবে। এবং যেতে যেতেই বুঝতে পারল, ছোটবাবু ফোকসাল ছেড়ে আসায় সবচেয়ে অসহায় যেন এই মানুষটা। এমনিতে তিনি কম কথা বলেন, কাজকামে ডুবে থাকেন। জাহাজের কোথায় কি করার দরকার, সবার আগে তিনি বোধহয় টের পান। ভীষণ সতর্ক নজর। এতদিন একবারও মনে হয়নি, জাহাজে মৈত্রের চেয়ে ছোটবাবুর জন্য কেউ বেশি ভেবে থাকে। ছোটবাবুর জন্য আরও একজন মানুষ এই জাহাজেই নিরন্তর মহামহিমের কাছে প্রার্থনা করে থাকেন সে জানত না। সে বলল, ছোটবাবু, তোমার কপাল দেখে আমার হিংসে হচ্ছে।

আর এভাবেই পরদিন ছোটবাবু তার নিজের বলতে সবকিছু ছেড়ে অর্থাৎ ছোটবাবুর

শরীরে এতদিন যে খোলস ছিল, এখন একেবারে ভিন্ন রকমের, এবং এভাবে স্বভাব পালটাতে সবারই কষ্ট হয়। ছোটবাবুরও হয়েছিল। ফোকসালটা এ-ক'মাসে এত প্রিয় হয়ে গেছল সে বুঝতে পারেনি। যেন কথা ছিল চিরদিন সে এখানেই থাকবে। মৈত্র এবং অমিয় অথবা অন্য জাহাজিরাই তার সব, আর কেউ আছে পৃথিবীতে ক্রমে যখন ভুলে যাচ্ছিল, ঠিক তখন জীবনে এই পরিবর্তন খুব হকচকিয়ে দিল।

.

প্রথম দিন সে কেবিনে ঘুমোতে পারেনি। পাঁচ নম্বর, ওয়াচে নেমে গেছে। চিফের কাজকর্ম মেজ- মিস্ত্রি চালাচ্ছে। মাঝে মাঝে মেজ-মিস্ত্রি ওয়াচেও নেমে যাচ্ছে। এবং উইনচের স্ট্রেপার বিয়ারিং, ওঠানামায় ক্ষয়ে গেছে। ভেতরে লাইনিং দিয়ে মেরামত করতে হবে। ফাইলের কাজ বেশি। পাঁচ নম্বর কুঁড়ে প্রকৃতির বলে, ফাইল সে ছোটবাবুকে দিয়ে অনেকবার করিয়েছে। এখন সে নিজে দু-দিকে সমান চাপ দিয়ে ঘসে ঘসে লোহার পাত, তামার পাত অথবা ব্রাশ ঘসে ঘসে ঠিক যত মিলিমিটার পাতলা দরকার করে ফেলতে পারে। এবং যখন ওপরে উঠে আসে, তখন দেখতে পায় নদী ক্রমশ আবার বিস্তৃর্ণ হয়ে যাচ্ছে। বিকেলের দিকে মোহনা পাবার কথা।

তখন কাপ্তান বনির কেবিনে। জাহাজ মোহনা ছাড়িয়ে আবার সমুদ্রে ভেসে চলেছে। বনির শরীরে একটা রঙবেরঙের সিল্কের চাদর। বনি শুয়ে আছে। চোখ কনুই দিয়ে ঢেকে রেখেছে। তার কেবিনে যে হিগিনস এসেছেন সে যেন টের পায়নি। অথবা এমন এক অতলে ডুবে আছে যে মনে হচ্ছে বনি ঘুমোচ্ছে।

হিগিনস মেয়ের মাথার কাছে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। যেন তিনি তাঁর এই একমাত্র জাতকের কাছে ক্ষমা চাইতে এসেছেন—এমন চোখ মুখ! অর্থাৎ বনির শরীরে সুহাস সুবর্ণ সব বাতিঘরেরা যে খেলে বেড়াচ্ছে তা তিনি বুঝতে পারছেন। এ-ভাবে পুরুষের মতো সেজে থাকতে বনির ভাল লাগছে না। অথচ উপায় নেই বলে থাকতে হচ্ছে। তবু ইচ্ছে করলেই হিগিনস সবাইকে বলে দিতে পারেন, আসলে বনি মেয়ে, সে জাহাজে মেয়ের মতোই থাকতে ভালবাসে—কিন্তু জাহাজের একঘেয়েমি এবং নিষ্ঠুরতা বনিকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিতে পারে। বনিকে তিনি মেয়ে বলে কিছুতেই জাহির করতে পারছেন না। এটা তাঁর ভয়। ভয় বলেই জোরজার করে তিনি সহজ সরল সত্যকে বিকৃত করছেন। মনে মনে বনির কাছে এখন খুব ছোট হয়ে যাচ্ছেন। যেন বলার ইচ্ছে, বনি আর কিছুদিন, এই যতদিন জাহাজ ফের হোমে না ফেরে ততদিন তারপর আর কখনও তোমাকে এভাবে থাকতে হবে না। তোমার জন্য আমি সুন্দর সুন্দর পোশাক কিনে দেব।

তিনি ডাকলেন, বনি।

বনি চোখ থেকে হাত সরাল না। বলল, এখন আমরা কোথায় বাবা?

মোহনা ছাড়িয়ে গেছি। কিছু আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না।

—বনি আর কিছু বলল না। সে যেমন চুপ করে জেগেছিল তেমনি আবার অতলে ডুবে গেল।

—কাপ্তান বললেন, ব্যথাটা কেমন?

—নেই।

—ভাল লাগছে?

—ঘুম পাচ্ছে বাবা।

—তুমি ভয় পাওনি তো?

—না বাবা।

—এখন এ-সব তোমার হবে। তুমি হয়ে বড় যাচ্ছ বনি।

বনি বলল, বাবা, আমার কেবল ঘুমোতে ইচ্ছে করছে।

হিগিনস মেয়ের কপালে হাত রাখলেন, সুন্দর ছোট্ট কপাল বনির। চুল ঘন এবং নরম বলে ভারি মনোরম লাগছে হাত বুলাতে। তিনি কপাল থেকে বনির চুল সরিয়ে দিলেন। এবং ইচ্ছে হল আস্তে চুমু খেতে। বনির ঘুম আসছে, ঘুমোক। এই বিকেলে, সূর্য যখন সমুদ্রে নানা বর্ণমালার ভেতর অস্ত যাবে, তখন বনি, এই সাদা জাহাজের ভেতর ঘুমিয়ে পড়বে। তিনি বললেন, কিছু খাবে?

—না বাবা।

হিগিনস বললেন, আমরা নিউ-প্লাইমাউথ যাচ্ছি।

—কোথায় বাবা?

—আমরা পানামা খাল পার হয়ে যাব। তারপর পঁচিশ-ছাব্বিশ দিন জাহাজ একনাগাড়ে চলবে, একদিনের জন্য তাহিতিতে থামবে। রসদ এবং জল নেওয়া হবে। নিউ-প্লাইমাউথ, নিউজিল্যান্ডের ছোট্ট বন্দর।

তাহিতি দ্বীপের কথা শুনেই—কবে যেন কার কাছে বনি দ্বীপের সব সুন্দর সুন্দর গল্প শুনেছিল। পৃথিবীর সব সুখী মানুষেরা তাহিতি দ্বীপে একবার যেন না গিয়ে পারে না। সে বলল, আমরা নামতে পারব বাবা?

—তোমার খুব নামতে ইচ্ছে করে?

বনি কি বলবে, সে এবার মুখ থেকে হাত সরিয়ে তাকাল। বড় বড় চোখে বাবাকে দেখছে। কী সুন্দর তার বাবা!

কাপ্তান বনির চোখের দিকে তাকালে আর স্থির থাকতে পারেন না। বয়স হওয়ার জন্য এটা বোধহয় হয়েছে। তিনি না থাকলে বনির কেউ থাকবে না। বনি বড় হচ্ছে, আর কিছু বড় হলে ভাবনার থাকবে না। আর কিছুদিন তিনি পৃথিবীতে থাকতে চান। এই মেয়ে ঠিক ঠিক বড় হয়ে গেলে তিনি মরতে ভয় পাবেন না। কাজেই বনি এভাবে তাকিয়ে থাকলে, কারণ দেখতে পাচ্ছেন, বনির চোখ বড় অসহায়। কিসের একটা ভয় ওকে তাড়া করছে। চোখ দেখলেই টের পান সব। তিনি উঠে যাবেন ভাবছিলেন। কিন্তু চোখে যেন একটা আতঙ্ক বনির। তিনি বললেন, তুমি কি বনি কোন দুঃস্বপ্ন দেখেছ?

—না বাবা।

—মুখ চোখ দেখে মনে হয় কতদিন না ঘুমিয়ে আছ।

বনি বলল, না তো।

—তবে চোখ মুখ এত শুকনো কেন? একা থাকতে ভয় পাও?

বনি হেসে দিল। বলল, ভয় পাব কেন?

—তবু কেন যে তোমাকে দেখে ভাল লাগছে না!

—শরীর ভাল না থাকলে এমন হবে না!

যেন হিগিনস এবার স্বস্তি পেলেন। রিচার্ড জাহাজ থেকে নেমে গেছে। ওর কিছু ম্যানিয়া আছে। এসব ভারতীয়দের সঙ্গে কাজ করার অভ্যাস তার আগে ছিল না। প্রথম থেকেই সে খুব একটা খুশি ছিল না। কোম্পানী জোরজার করে ওঁকে পাঠিয়েছে। মনে হয় একটা অজুহাত দেখিয়ে শেষ পর্যন্ত নেমে গেল।

বনি উঠে বসল। বলল, তুমি খুব ভীতু বাবা।

হিগিনস মেয়ের এমন কথায় সামান্য হাসলেন। তাঁকে কেউ কখনও এভাবে কথা বলতে পারে না। এই মেয়েটা তাঁর ভাল-মন্দ সব কিছু। এমন কি তিনি দেখেছেন, আজকাল বনি তাঁকে মাঝে মাঝে ঠিক শাসনের সুরে কথা বলে থাকে। বেশি খাটাখাটনি করলে রাগ করে

খেতে যায় না। আচ্ছা আর হবে না, এই বলে অনেক বুঝিয়ে তবে বনিকে তখন খাওয়ানো যায়। আর বুঝতে পারছেন, ডাঙ্গার জন্য যা কিছু টান—এই 'ছোট্ট সুন্দর ফুলের মতো মেয়েটার জন্য।

হিগিনস বললেন, তুমি ঘুমোবে। ভুত-টুত জাহাজে, বাজে কথা।

বনি হেসে ফেলল। হেসে দিলে বনির ঝকঝকে দাঁত এত বেশি উজ্জ্বল হয়ে ওঠে চোখ দুটো এমন মায়াময় হয়ে যায়—যে মনেই থাকে না এই মেয়ে কিছুক্ষণ আগে মুখে অতিশয় আতঙ্কের ছবি এঁকে রেখেছিল। বনি বলল, আমি ভাল আছি বাবা। আমার জন্য ভাববে না। যেন বলতে চাইল ভয় আছে, আমি টের পাচ্ছি চারপাশে একটা ভয় ঘোরাফেরা করছে, কিন্তু যখন ছোটবাবুর কথা ভাবি তখন একেবারে ভয় থাকে না।

সে বলল, বাবা, ছোটবাবু ঠিকমতো কাজ করছে তো।

—পারছে না। আর্চি তো কাল বলল কি একটা পার্টস ভেঙে ফেলেছে ছোটবাবু।

আর তক্ষুনি বিষন্ন হয়ে গেল বনির মুখ। আবার সেই আতঙ্ক ক্রমে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল।

হিগিনস মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কি যেন বুঝতে পারলেন। বললেন, প্রথম প্রথম একটু এমন হবেই।

বনি বলতে পারল না, আর্চি তোমাকে ঠিক ঠিক রিপোর্ট করছে না বাবা। আমি আবার ডেকে বের হতে পারলে বুঝতে পারব। আর্চি তোমাকে বানিয়ে যত রাজ্যের রিপোর্ট করে যাবে।

এবং বোধহয় এ-ভাবেই জাহাজে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী এখন হেঁটে বেড়াচ্ছে। বনির কপালে হিগিনস যাবার সময় ধীরে চুমু খেলেন। বাবা চলে গেলে দরজা বন্ধ করে বনি আবার বসে থাকল ভেতরে। কিছু ভাল লাগছে না। ছোটবাবুর সঙ্গে যেন তার কতদিন দেখা হয়নি। এই তিন চারদিনেই মনে হয়েছে—কবে কোন দ্বীপে একবার যেন সেই মানুষটিকে সে দেখেছিল। তার শরীরে লম্বা আলখাল্লা। সমুদ্রের পাড়ে পাড়ে সে হেঁটে যাচ্ছে। শরীরে তার সুবর্ণ নদীর জলের ঘ্রাণ। সমুদ্রের নীল জল পায়ে তার আছড়ে পড়ছে। মানুষটাকে সে অনেকদিন ভেবেছে, সামনে দাঁড়িয়ে দেখবে। দেখতে পারেনি। যতবার সে হেঁটে আগে যাবার চেষ্টা করেছে ততবার মনে হয়েছে পারছে না। সে হেঁটে হেঁটে চলে যাচ্ছে। আলখাল্লায় পায়ের পাতা ঢাকা তার। সমুদ্রের নীল জলে তা ভিজে যাচ্ছে। এবং কোনো সম্রাটের মতো সে যখন হেঁটে যায় বনি যেন ছোট্ট মেয়ের মতো তাকে দেখতে ভালবাসে। এবং কতকাল থেকে, যেন সেই শিশুবয়েস থেকে, অথবা বলা যায় শৈশবের প্রারম্ভে কিংবা তারও পরে সে এমন একজন মানুষকেই ভেবে আসছে। নরম সবুজ নীল দাড়ি, মাথায় একরাশ নরম নীলাভ চুল আর বড় বড় চোখ, লম্বা, ঠিক সম্রাট সিজারের মতো অথবা মনে হয়, সে যাচ্ছে তো যাচ্ছেই, বনি পেছনে পেছনে ছুটেও তার নাগাল পাচ্ছে না। যেন সে তখন ডাকছে, হেই অহংকারী যুবক, তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ না! আমি বনি।

॥ একুশ ॥

এ-সময়ে এ-সমুদ্রে কিছু ঝড়ঝঞ্ঝা থাকে। এবং চার পাঁচ দিন ধরে আকাশ গরম সিসের মতো, বিদ্যুতের ফালা ফালা আকাশফাটানো গুম গুম শব্দ। জাহাজ আবার কিছুদিন লাফিয়ে লাফিয়ে প্রায় দ্রুতবেগে কোন অশ্বারোহী পুরুষের দুর্গম বনভূমি পার হয়ে যাবার মতো ছুটে যাচ্ছে। হিগিনস তখনই ভেতরে ভীষণ পুলক বোধ করেন। তিনি ঝড়ের দরিয়ায় দাঁড়িয়ে থাকেন। সিসের মতো আকাশের মেঘ এবং ঘন বৃষ্টিপাতের ভেতর নীল জলরাশির অজস্র সাদা ফেনা, এবং চারপাশে যেদিকে তখন চোখ যায় যেন, হাজার হাজার অতিকায় প্রাগৈতিহাসিক জীব জলের নিচে ফুঁসে বেড়াচ্ছে। জলের রঙ নীল থাকছে না। একেবারে সাদা। পঁচিশ ত্রিশ ফুট উঁচু ঢেউ সব ফুঁসে ফুঁসে ফুলে ফুলে যত জাহাজটার দিকে এগিয়ে আসে তত এক মজার খেলা, ওরা পারে না। তাঁর এমন বিশ্বস্ত জলযানের সঙ্গে পারে না। ঢেউ কাটিয়ে ছোট শশকের মতো ঘাসের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে যেন ছুটে যাচ্ছে জাহাজটা। তিনি বুঝতে পারেন, এ-ভাবেই এক আকর্ষণ, যেন এই জাহাজ তখন জাহাজ থাকে না। কোনো ইতিহাসের বিশ্বস্ত অশ্বের মতো। আর তিনি অশ্বারোহী পুরুষ। সেই অশ্বারোহী পুরুষটি লাগাম ধরে আছেন। সমুদ্রের এইসব ঝড়ঝঞ্ঝা, বিক্ষুব্ধ তরঙ্গমালার ভেতর দিয়ে বেগে চালিয়ে জাহাজ মুক্ত আকাশের নিচে চলে এলে তখন সমুদ্র বিজয়ের কি যে আনন্দ! আহা, আনন্দ, আনন্দ ধরে না প্রাণে। হিগিনস সারা দিনমান নিজের সেই প্রিয় ডেকচেয়ারে বসে জাহাজ আর সমুদ্রের খেলা দেখতে দেখতে চোখ বুজে ফেলেন।

তখন কেউ পাশে এসে দাঁড়ালেও টের পান না, কেউ দাঁড়িয়ে আছে। যেন এই যে চলে আসা, এবং জাহাজ, ঝড়ঝঞ্ঝা সবই মহামহিমের ইচ্ছায় চলে, তবু কেন যেন সব কিছুর ভেতর নিজেকেই খুব বড় এবং সর্বময় ভাবতে ভাল লাগে। যত বয়স বাড়ছে, তত ভাবছেন, নিজেকে সর্বময় ভাবার ভেতর কি আর আছে! তত তিনি বুঝতে পারেন, যতই বয়স বাড়ক, নিজেকে সর্বময় ভাবতে না পারলে, বেঁচে থাকার আনন্দ কোথায় যেন হারিয়ে যায়। এবং এ ভাবে যখনই চিন্তা-ভাবনা ক্রমে মগজ কুরে খায়, তখন রাতের অজস্র নক্ষত্রমালার ভিতর দাঁড়িয়ে সমুদ্র এবং আকাশের মাঝামাঝি হাত তুলে বলতে ইচ্ছে করে তাঁর—ঈশ্বর, আপনার এই অসীম সমুদ্রে, আমার ছোট্ট জাহাজ সিউলব্যাংকে রক্ষা করুন। তিনি তাঁর অহংকারের জন্য ঈশ্বরের কাছে এ-ভাবে আবার কখনও ক্ষমা প্রার্থনার সময় নতজানু হয়ে নীরবে চোখের জল ফেলেন।

ন'দিনের দিন সিউল-ব্যাঙ্ক লিমন উপসাগরে এ-ভাবে নেমে এল। সামনে দেখা যাচ্ছে পানামা ক্যানেল অঞ্চলের সব পাহাড় শ্রেণী। ক্রমে তা মেঘের মতো সমুদ্রে ভেসে উঠছে। বোঝাই যায় না পাহাড়ের মাথায় খাল কাটা আছে। পাহাড়ের এত কাছে এসেও জাহাজিরা কিছু বুঝতে পারছিল না। জাহাজের স্পীড কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। জাহাজ এগুচ্ছে কি সেই ছায়া ছায়া পাহাড়টা এগিয়ে আসছে বোঝা যাচ্ছে না। বিকেলের দিকে সিউল-ব্যাংক একেবারে পাহাড়ের নিচে এসে থেমে গেল। সমুদ্রের ঢেউ পাথর অথবা পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে। এবং সব সময় মনে হচ্ছে জলের গভীরে এ-ভাবে চারপাশে পাহাড় এবং পাথর ডুবে যাচ্ছে আবার ভেসে উঠছে।

আর সামনে, জাহাজিরা দেখল, লাইন দিয়ে সব জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে ও-পারে যাবে বলে। ছোটবাবু, জ্যাক কিছুতেই বুঝতে পারছে না, খালটা কোথায়। ডেবিড এলে বোঝা যেত। কিন্তু ডেবিডের এখন চব্বিশ ঘন্টা সতর্ক থাকতে হবে। কিনার থেকে সব মেকসিকান কুলি উঠে এসেছে। হাসিল এবং লোহার তার লম্বা করে ফেলে দিয়ে যাচ্ছে। সামনে পাঁচ-সাতশো গজ দূরে দুটো জাহাজ। তিনটে ছিল, এইমাত্র একটা কি করে যে হারিয়ে গেল। ঠিক যেন লাইন দিয়ে টিকিট কেনার মতো এবং হলঘরে ঢুকে যাওয়া। কিছু সময় গেলে অমিয় দেখতে পেল সেই হারিয়ে যাওয়া জাহাজটা ক্রমে এক আশ্চর্য যাদুবলে ওপরে উঠে যাচ্ছে। পাহাড়ের মাথায় উঠে যাচ্ছে। এবং ওরা দেখতে পেল পাশে তেমনি আর একটা জাহাজ

এভাবে পাহাড় থেকে নেমে আসছে। আর ওরা টের পাচ্ছে না, সেই সঙ্গে ওরাও যে এবার ধীরে ধীরে সেই বড় দুটো লোহার দরজা, প্রায় চিচিং ফাঁকের মতো, কোন এক যাদুবলে দরজা খুলে যাচ্ছে এবং সেই অতিকায় জাহাজ ঢুকে যাচ্ছে। দু'পাশে ট্রামলাইন বসানো। দু'পাশের ট্রাম জাহাজটাকে টেনে এক লক-গেট থেকে আর এক লগ-গেটে পৌঁছে দিচ্ছে। এবং এক সময় সূর্য অস্ত যাবার মুখে সিউল-ব্যাঙ্ক পাহাড়ের ওপর আশ্চর্যভাবে ঝুলতে থাকল। জলে ভেসে রয়েছে—সমুদ্র থেকে কিছুতেই বোঝা যায় না। যেন সহসা জাহাজটা পাখা গজিয়ে গেছে। এবং পাখায় ভর করে ভেসে রয়েছে ওপরে।

জাহাজিরা দেখল, অনেক নিচে আবার তিন-চারটে জাহাজ, লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা যে জাহাজটাকে পাহাড়ের ওপর থেকে নেমে আসতে দেখেছিল, সেই জাহাজ যেন খানিক সময় একটা বিপদের মুখে পড়ে চুপচাপ ছিল, পাহাড় থেকে নেমেই আবার তরতর করে সমুদ্রে ভেসে চলেছে। আর কি ছোট দেখাচ্ছে জাহাজগুলোকে। কাগজের নৌকার মতো ভাসতে ভাসতে সমুদ্রে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

এখন দু'পাশে শহর। কোলেন শহর। খুব বেশি সময় ওরা শহর দেখতে পেল না। ওরা একটা হ্রদের মতো অঞ্চলে ঢুকে গেল। ছোটবাবুর মনে হল তখন পূর্ববঙ্গের বর্ষাকালের মতো পানামা উপত্যকার এ অঞ্চলটা। চারপাশে ছোট ছোট ঢিবি, ঘাস বনজঙ্গলে সবুজ হয়ে আছে, এবং নীল জল, অর্থাৎ পাহাড়ের উপত্যকায় মনে হয়, এক বর্ষাকাল, যেন জাহাজিরা উঁকি দিলে জলে পুঁটিমাছ ডারকিনা মাছ পর্যন্ত দেখে ফেলবে। আর সব গাছপালা দেখলে মনে হবে, সেই লক্ষ্মীপুজোর দিনে ছোটবাবু যেমন টুনি ফুল খুঁজতে যেত তার মায়ের জন্য, এও যেন এক পৃথিবী যেখানে সে এই বড় জাহাজ নিয়ে টুনি ফুল খুঁজতে বের হয়েছে। হাত দিলেই প্রায় যেন সেই সব নানা বর্ণের ফুল সে তুলে আনতে পারে। মনেই হয় না জীবনে এমন দৃশ্য সে কোথাও আর দেখতে পাবে।

এভাবে কত কিছু মনে হয়। জাহাজিরা এখন সব রেলিঙে দাঁড়িয়ে আছে। এমন দৃশ্যাবলী কোথায় আর দেখা যাবে। সমুদ্র থেকে ওরা এখন অনেক উঁচুতে রয়েছে। ওরা যেন প্রায় বলতে গেলে ডাঙ্গার ওপর দিয়ে জাহাজ চালিয়ে নিচ্ছে। দু'পাশের কৃত্রিম হ্রদে সব জলাধার দেখলে বিশ্বাসই হবে না মানুষের তৈরী এমন একটা সমুদ্র পারাপারের ভেতর অজস্র গাছপালা আর তার ছায়ায় সিউল-ব্যাঙ্ক হেলে দুলে যেতে পারে। খুব ধীর গতি। বেশি স্পীডে চলতে পারছে না। এমন কি মনে হয় প্রপেলার খুব জোরে ঘুরলে নিচের ঘোলা জল উপরে উঠে আসবে। খুব ধীর গতিতে সুমহান জাহাজ সিউল-ব্যাঙ্ক যাচ্ছে। তার ভেতর রয়েছে কলকব্জার মতো জাহাজিরা। সে আছে বলেই যারা আছে, এবং রক্ত সঞ্চালনের কাজ যারা করে থাকে —সেই সব ছোট ছোট মানুষদের সুখ-দুঃখ এমন একটা গ্রাম গ্রাম জায়গায় না এলে টের পাওয়া যায় না। বোঝা যায় এখন, এরা সবাই প্রায় গ্রামের মানুষ, শাকান্ন এদের ভীষণ প্রিয়। এবং এই প্রথম জাহাজিরা দেখল সিউল-ব্যঙ্ক সার্চ লাইট জ্বালিয়েছে। রাতের বেলায়, ঠিক নদীতে স্টিমারের মতো দু-পাড়ের ঢিবি, বনজঙ্গল, আলো ফেলে দেখছে।

রাত আটটা পর্যন্ত ছোটবাবু দাঁড়াতে পেরেছিল। ডাইনিং হলে খাবার সাজানো হচ্ছে। এখন রাতের পোশাক পরে খেতে যেতে হবে। ছোটবাবুর রাতের পোশাক বলতে কিছু নেই। কোলন বন্দরে জাহাজ থামেনি। বলবোয়া বন্দরেও জাহাজ থামবে না। নিউ-প্লাইমাউথ না যাওয়া পর্যন্ত কিছু হবে না। ডেবিড ছোটবাবুকে কিছু পোশাক দিতে চেয়েছিল, কিন্তু ছোটবাবু যেই পরে বের হল, সঙ্গে সঙ্গে জ্যাক হেঁসে বাঁচল না। একেবারে জোকারের মতো। ঢোলা খাট বেঢপ পোশাকে নিজেই কিঞ্চিৎ বিমূঢ় হয়ে গেছিল।

খাবার টেবিলে ছোটবাবুর অসুবিধা হত। সে মাথা গুঁজে খেত। কেমন সঙ্কোচ হত। কাঁটা চামচের ব্যবহার সে জানত না। ডেবিড তাকে ভীষণ সাহায্য করে আসছে। এবং টেবিল ম্যানার্স বলতে যা কিছু জেনেছে সবই ডেবিডের সাহায্যে! এখন পোশাকের জন্য অথবা টেবিল ম্যানার্সের জন্য ততটা সঙ্কোচ বোধ করে না। কাপ্তান এখন প্রায় তার সঙ্গে কথা

বলেনেই না। জ্যাকও চুপচাপ খেয়ে উঠে যায়। খেতে বসলে মনে হয় না জ্যাক ছোটবাবুকে চেনে। আর এই যে ছোটবাবু জাহাজে ছ'নম্বর হয়ে গেল, তাতে জ্যাকের কিছু আসে যায় না। কেবল প্রথম দিন যখন ডেকে বের হয়ে জ্যাক হেঁটে যাচ্ছিল, কাকে যেন খুঁজছে চারপাশে এবং দেখে ফেলেই না দেখার মতো, কিছুটা সহজ স্বাভাবিক কথা বলার মতো, তুমি এখানে ছোটবাব!

তাড়াতাড়ি ছোটবাবু উইনচের নিচে থেকে বের হয়ে বলেছিল, জ্যাক আমি এখন এনজিন রুমের ছ'নম্বর। দেখা হয়নি বলে খবরটা দিতে পারিনি। জ্যাক কোন কথা বলল না। সামান্য হাসল।

—তোমার ঠিক নিচের কেবিনে আছি।

—সত্যি!

—সত্যি, তুমি জান না আমি যে নিচে রয়েছি?

—না, তুমি কী ছোটবাবু! তারপর বলার ইচ্ছে হয়েছিল, আমি জানব না তুমি কোথায় আছ! তোমার কেবিনে কোথায় কি আছে, লকারে তোমার কি আছে তুমি দেয়ালে কি টানিয়েছ, আমি সব জানি। দেয়ালে তোমার মায়ের ছবি টানিয়ে রেখেছ ছোটবাবু। তোমার কেবিনের কোথায় কি আছে, আমি তোমার চেয়ে ভাল জানি।

ছোটবাবু ডেকেছিল, জ্যাক

জ্যাক বলেছিল, কেমন লাগছে?

—বেশ ভাল লাগছে। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি।

জ্যাক বলেছিল, কি বিশ্রী ওয়েদার।

ছোটবাবু কেমন থতমত খেয়ে বলেছিল, তাই।

জ্যাক বলেছিল, মনে হয় আকাশে আর কখনও সূর্য উঠবে?

তখন বিশ্রী আকাশ, ঝড়-ঝঞ্ঝা, জলকণা সব বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল। ছোটবাবুর পোশাক প্রায় ভিজে গেছিল।

জ্যাক বলেছিল শুধু, এভাবে ভিজে জামা-প্যান্ট পরে থাকলে অসুখ করবে তো।

—শুকোয় না। নিউ-প্লাইমাউথ থেকে কিনে নেব।

—কেন তাহিতিতে কিনতে পারবে।

—নামা যাবে?

—খুব যাবে।

ছোটবাবুর দুটো কাজের পোশাক। বয়লার সুট সে তাহিতি থেকে কিনে নেবে ভেবেছিল। কিন্তু নামতে পারবে কি পারবে না সে জানত না। মাঝরাতে জাহাজ আবার খাল ধরে লক-গেট ধরে প্রশান্ত মহাসাগরে নেমে যাবে কথা আছে। তখন ডেবিড একা বোট-ডেকে, সে সারাক্ষণ দূরবীন নিয়ে জেগে থাকবে। ছোটবাবু খুব ছেলেমানুষ বলে সকাল সকাল ঘুম পায়। বেশী রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে পারবে না। ডেবিড কত বলেছে, আবার কবে পানামা খালে আসবে, কখনও আসতে পারবে কিনা তাও ঠিক কি, দেখে নাও। আমি তো যেখানে যতবার যাই বসে থাকি। রাত জেগে বসে থাকতে আমার ভাল লাগে ছোটবাবু। খালের পাড়ে পাড়ে প্রশান্ত মহাসাগরে নেমে যাবার আগে আবার আমরা শহর পাব। তুমি একটা দারুণ চান্স মিস করবে জেগে না থাকলে।

ছোটবাবু তবু ঘুমিয়ে পড়েছিল। যদিও ইচ্ছে হয়েছিল, ঘুমিয়ে পড়ার আগে একবার চুপি চুপি আফটার-পিকে যাবে। সেখানে গেলেই সে দুটো ভাত খেতে পায়। বাঁধাকপি ভাজা দিয়ে ভাত। কারণ অফিসার্স গ্যালিতে ইংলিশ মেনু। রাইস কারি সপ্তাহে মাত্র একদিন। সেদিন

ছোটবাবুর উৎসবের মতো ভোজ। তাছাড়া ওর মনে হয় বাকি ছ'দিন প্রায় না খেয়ে আছে। ভাত না খেলে তার কিছুতেই পেট ভরে না। কখনও কখনও গোপনে মৈত্র একটা প্লেটে ভাত মাংস দিয়ে যায়। সে নিজের কেবিনে চুরি করে দরজা বন্ধ করে কোনরকমে খেয়ে হাত মুখ সাবানে ধুয়ে ফেলে। আর প্লেটটা কাজে যাবার আগে জামার নিচে ভরে নেয়। অমিয়, সারেঙসাব, মনু, মান্নান যেই আসুক, কথা বলার অছিলায় দিয়ে দেয়। প্লেট বের করে চার পাশে সতর্ক নজর রাখে—এই তাড়াতাড়ি নিয়ে যা। মৈত্রদাকে দিবি। দিয়েই আবার উইনচের তলায়। স্ট্রেপারগুলো খুলে মেরামত করার দরকার। এবং তখন মনে হয় জ্যাক কিংবা ডেবিড এবং এমন কি পাঁচ নম্বর পর্যন্ত ভাত না খেয়ে থাকে কি করে! সে তো পেট ভরে দুটো ভাত খাবে বলে জাহাজের এমন একটা কাজে চলে এসেছিল। অথচ নসিব এমন, শেষ পর্যন্ত, সেই ভাত রোজ কপালে জুটছে না। সে নিজের নসিবের কথা উইনচের তলায় শুয়ে শুয়ে এভাবে কখনও ভাবত। চিল্ড গ্রেপ-ফ্রুট, ওটমিল-পরিজ, পরিজটা মন্দ লাগে না। এরা ঝাল-ঝোল একেবারে খায় না। খেতে কি যে বিস্বাদ। ব্রেক ফাস্টে ফ্রাইড-এগ খেতে তার ভাল লাগে। বেকন খাবার সময় তো প্রায় বমি আসার মতো। কি রকম সব গন্ধ—এত সুন্দর রং-বেরংয়ের খাবার খেতে এমন বিস্বাদ সে জানত না। পালিয়ে পালিয়ে ভাত, ভাত না খেলে রাতে ঘুম আসে না ছোটবাবুর। একটু রাত করে আজ অমিয় এক প্লেট ভাত, সারডিন মাঝের ঝোল, সরষে বাটা দিয়ে কি যে রেঁধেছে ভান্ডারী জ্যাঠা। সে এত খেয়েছে যে খাবার পরই চোখ জড়িয়ে আসছিল। ডেবিডের সঙ্গে কিছুতেই ডেকে জেগে থাকতে পারেনি। বড় বড় ঢেঁকুর তুলে জোরে পাখা চালিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ভীষণ গরমে এমন ঘুমটা মাটি হবার আশঙ্কাতে সে ফুল স্পীডে পাখা চালিয়ে শুয়েছে।

বেশ গভীর রাতে মনে হল, কেউ তাকে ডাকছে। খুব ফিসফিস গলায়।

—এই ছোটবাবু সে চোখ মেলে বুঝতে পারল না কে ডাকছে। দরজা লক করা। তার সুন্দর মেহগিনি কাঠের বাংক। রোজ সাদা দামী চাদর পাল্টে দিয়ে যায় মেস-রুম-বয়। মায়ের ছবিটা এ-ঘরে টানাতে পেরে সে ভীষণ খুশী। লকার কাঠের। বড় আয়না। শুয়ে থাকলে সবটা আয়নায় দেখা যায়। সে জেগে গেলে বুঝল, আলো জ্বালিয়ে সে ঘুমোচ্ছিল। আয়নায় সে দেখল তার পোশাক বলতে প্রায় খালি গা। ঘামে জবজবে ভেজা শরীর। সে উঠে বসল। কেউ ডেকেছে। দরজা বন্ধ। ভেতরেই কেউ আছে তার মনে হল, একেবারে যেন কানের কাছে কেউ এসে ডেকেছে, এই ছোটবাবু, তুমি ঘুমোচ্ছ!

তারপরই সে দেখে অবাক, পোর্ট-হোলের কাঁচ খোলা, পর্দা সরিয়ে জ্যাক ওকে দেখছে। ও প্রথমে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছিল এত রাতে জ্যাকের হঠাৎ এ-ভাবে ঝুঁকে থাকা পোর্ট-হোলে সত্যি ভয়ের। সে বলল, ওঃ তুমি!

সে ওর তোয়ালে দিয়ে সারা শরীরের ঘাম মুছল। সে খুব কাছে গিয়ে বলল, কী ব্যাপার!

—তুমি ঘুমোচ্ছ!

—কেন কি হয়েছে!

—আমি, ডেবিড বসে আছি। তুমি আসবে না?

—খুব ঘুম পাচ্ছে জ্যাক।

—সকালে তো আবার সমুদ্র। তোমার ডাঙা দেখতে ভাল লাগে না!

সে কি করে বলবে, কিছুদিন পর পর ভাত খেলে নেশার মতো হয়। সে যে ওর কেবিনে আজ পেট ভরে ভাত খেয়েছে। দুবার ভাত চেয়ে পাঠিয়েছে। এত লোভ ভাল না ছোটবাবু একবার বঙ্কু হেসে এমন বলেছে, তুমি আমাদের ভাতে কম ফেলে দেবে। আসলে সে আজ তিন চারদিন পর প্রায় ভাত খেয়েছে। আকন্ঠ খেয়ে কেবল ঘুমোতে ইচ্ছে করছে। ডাঙা সমুদ্র তার কাছে এখন সমান। সে বলল, কি আছে?

—আবার আমরা খালের ভেতর ঢুকে গেছি। শহর দেখা যাচ্ছে।

—আর কিছু না?

—না।

—তবে আর যাচ্ছিনে। বলেই সে লাফ দিয়ে ফের বাংকে শুয়ে পড়ল। বাংকে সে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল।

জ্যাক বলল, দূরবীনে সেকেন্ড কি সব চুরি করে দেখছে!

—তুমি দেখছ না!

—চাইলে দিচ্ছে না।

—ডেবিড তো ভারি স্বার্থপর।

—ভীষণ। তুমি গেলে তোমাকে দিতে পারে।

আর তখনই মনে হল জ্যাক তবে আর আগের মতো নেই। বড় হয়ে যাচ্ছে জ্যাক। তারও বুঝি মেয়ে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। এতদিনে যেন জ্যাক আরও লম্বা হয়ে গেছে। যত লম্বা হচ্ছে, তত সে তার পোশাক কিম্ভূত কিমাকার করে ফেলছে। জ্যাকের পোশাক দেখে তারও মাঝে মাঝে কম হাসি পায় না। সে বলল, দাঁড়াও ডেবিডকে একা একা দেখা বের করছি। বলেই সে বের হয়ে গেল। যেহেতু ওর কেবিনটা নিচে, ওকে সিঁড়ি ধরে বোট-ডেকে উঠে যেতে হল। জ্যাক আসছে ওপাশ দিয়ে। সে গ্যাঙ-ওয়ে ধরে সোজা ব্রীজের সামনে চলে যাবে। এবং জ্যাক ও-ভাবে সিঁড়ি ধরে উঠে আসার আগে সে ডেবিডের কাছে পৌঁছে যাবে। আর এটা ছোটবাবু দেখেছে, জ্যাক এলি-ওয়ে ধরে কখনও আসে না। জ্যাক তো ইচ্ছে করলেই ওর দরজায় নক্ করতে পারত। সে তা না করে, ও- পাশে, জাহাজের বাইরের দিকটায় সে দাঁড়িয়ে থাকে। এলি-ওয়েতে জ্যাক কেন যে আসে না! আসলে কি জ্যাক এলি-ওয়েতে ভয়ের কিছু দেখে ফেলেছে! সে যেমন দেখে ফেলে দৌড়েছিল!

ছোটবাবু ডেবিডের ঠিক সামনে গিয়ে বসল। জ্যাক সিঁড়ি ভেঙে ছুটে আসছে। ছোটবাবু বলল, তুমি ভারি স্বার্থপর ডেবিড। জ্যাককে দেখতে দাওনি।

—জ্যাক না দেখলে আমি কি করব।

—কিছু দেখলে?

—না।

—আমাকে দাও। যদি পেয়ে যাই।

সেকেন্ড বলল, দ্যাখো। এবং ওরা তিনজন পাশাপাশি বসে বলবোয়া বন্দরের শহর, ইট, কাঠ, গীর্জা, এবং গাছপালা, দূরের বিন্দু বিন্দু আলোর মালা, কখনও সামনে একেবারে সামনে ওরা দেখতে পাচ্ছে শহর ধরে একটা গাড়ি, ছায়া ছায়া অন্ধকারে ওরা কি করছে। ছোটবাবু বলল, আমি কিছু বুঝতে পারছি না। তুমি দ্যাখো।

সেকেন্ড দূরবীনটা চোখে লাগিয়েই চিৎকার করে উঠল, ওম্যান।

—যা!

—হ্যাঁ দ্যাখো।

ছোটবাবুর ইচ্ছে হল জ্যাক দেখুক। কারণ জ্যাক বড় হচ্ছে। সে বললে, তুমি দ্যাখো জ্যাক। জ্যাক বলল, না তুমি দ্যাখো।

ছোটবাবু তখন দেখল—একটা গাড়ি। দু'জন মানুষের ছায়া, পুরুষ না মেয়ে, কি দুজনেই মেয়ে, কি দুজনেই পুরুষ, বোঝা যাচ্ছে না। এবং নিভৃতে পার্কের পাশে রাস্তায় ওরা দুজন। ওরা এই এমন গ্রহে বেঁচে আছে, তারা যাই হোক, পুরুষ রমণী হওয়াই ভাল, কারণ, সে বুঝতে পারছে, নারীজাতি মানুষের বড় প্রিয়। প্রিয় বলেই পুরুষ রমণী ভাবতে ভাল লাগছে। সে বলল, আর দেখা যাচ্ছে না। আসলে জাহাজ ক্রমাগত দু-তীর পেছনে ফেলে চলে যাচ্ছে।

এবং এ-ভাবে জ্যাক যা চাইছিল, একটু ছোটবাবুর সান্নিধ্য। এটুকুর জন্য সে ওকে ডেকে এনেছে। ওর পাশে বসে থাকতে জ্যাকের ভাল লাগছে। কিছুক্ষণের ভেতর জাহাজ সমুদ্রে পড়বে। ডেক-জাহাজিরা জেগে রয়েছে। সেকেন্ড-অফিসার, ডেবিড এবং চিফ-অফিসার জাহাজিদের নিয়ে ছোটাছুটি করছে। এমন মধ্যরাতে জ্যাক দূরে সমুদ্রের গর্জন শুনতে পেল। সেই সব দ্বীপ, যেমন হনলুলু অথবা পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জমালা থেকে বাতাস দ্রুত ছুটে আসছে। বাতাসের সঙ্গে আসছে অজস্র সমুদ্রের ঢেউ, ওরা প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে কি যে সুহাস গতিতে ধীর গতিতে এগিয়ে আসছে। জ্যাকের মনে হল, প্রায় কাব্যগাঁথার মতো, নীল জলে ছোট একটা সাদা রঙের বোট, লাল রঙের পাল, একপাশে ওরা দুজন, এবং ক্রমে কি করে যে সে দেখতে পেল, বিন্দু বিন্দু হয়ে যাচ্ছে সব ঢেউ-এর জলকণা, তার ভেতর দিয়ে ছোটবাবু বোট এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এবং জ্যাক সহসা প্রায় আর্তনাদের মতো চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিল—ছোটবাবু তুমি মরে যাবে। কিন্তু তখনই মনে হল ছোটবাবু তার বনবাস সহজেই স্বীকার করে নিয়েছে। কি নিশ্চন্ত মুখ চোখ। ঢেউয়ের ভেতর বোট ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রে আর সেই ভাঙা জাহাজটাও দেখা যাচ্ছে না। কেবল জ্যাক কেন যে দেখতে পেল, দূরে একটা পাখি আকাশের নিচে চক্রাকারে উড়তে উড়তে নেমে আসছে। সেই বড় পাখি, অতিকায় যার ডানা, যেন আকাশ জুড়ে সে নেমে আসছে। সাদা রঙের অতিকায় এ্যালবাট্রস বোটের একপাশে বসতেই বোটটা কেমন নড়ে উঠেছিল।

যখন দূরবীনে ছোটবাবু শহর দেখছিল, তখন দু হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে দিয়েছিল জ্যাক। এবং মাথা গুঁজে সে কি আজগুবী দৃশ্য দেখে ফেলল। আর যা হয়, এমন কেন যে সব দৃশ্য সে চোখের ওপর ভাসতে দেখল! ছোটবাবুকে বললে, ছোটবাবু পর্যন্ত ভয় পেয়ে যাবে। সে জানে ছোটবাবু সহজ সরল মানুষ, সহজেই ভয় পায়। ছোটবাবুর মুখ দেখলেই এটা সে বুঝতে পারে। এবং ছোটবাবু ভয় পাবে বলেই যেন এমন একটা দৃশ্য সে দেখেছে বলা ঠিক হবে না। কেবল ডেবিডকে সে বলতে পারে।

কিন্তু সকালে যখন সিউল-ব্যাংক সমুদ্রে ভেসে গেছে আবার, তীর দেখা যাচ্ছে না, ঝিকঝিক শব্দে সিউল-ব্যাংক আপন গতিবেগে নির্ভাবনায় বেশ চলেছে, জাহাজিরা শেষ ডাঙা দেখবে বলে দাঁড়িয়ে আছে, আর দেখা যাচ্ছে না কিছু, কেবল নীল জল, নীল আকাশ এবং সমুদ্রের প্রশান্ত চেহারা তখনই জ্যাক দেখল, অনেক দূরে, প্রায় দিগন্তের কাছাকাছি দুটো বিন্দুর মতো সাদা রঙের কিছু ভাসছে। এমন নীল আকাশে দুটো বিন্দুর মতো সাদা রঙ নড়ছে দেখে, দৌড়ে সে চার্টরুমে উঠে গেল। এবং এই প্রথম সে বাবার দূরবীনটা গলায় ঝুলিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতে থাকল—হ্যাঁ নড়ছে। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না ও দুটো কি। তবু মনে হয় দুটো পাখির মতো। দুটো পাখি আকাশের গায়ে যেন ঢেউয়ের মতো কাঁপছে। আর উড়ে উড়ে ওরা এদিকে আসছে।

ছোটবাবু তখন চড়ুই পাখি দুটোকে খাওয়াচ্ছিল। সকালের চা এসেছে। চা, একটা আপেল, দু'টুকরো স্যান্ড উইচ এবং কলা। উইনচের ভেতর থেকে বের হয়ে সে ময়লা হাত ঝেড়ে নিল, এবং কোনরকমে কিছুটা খেয়ে পাখি দুটোকে শিস দিয়ে ডাকল। শিস দিলেই ওরা চলে আসে। জ্যাক এখন খাওয়ায় তাদের। সেও। কিন্তু জ্যাক ব্রীজে দূরবীনে কি দেখছে। সেই কখন থেকে জাহাজের পেছনের দিকে সে তাকিয়ে আছে। এত কি দেখছে জ্যাক। জ্যাক পরেছে সুন্দর হলুদ রঙের বয়লার স্যুট। চোখে দূরবীন। সকালের সূর্য এই সমুদ্রে এবং জাহাজের চারপাশে ক্রমে ওপরে উঠে যাচ্ছে। বোট-ডেক থেকে জ্যাকের দূরবীনে এ-ভাবে দেখা সত্যি বিস্ময়ের। আগে হলে সে চিৎকার করে বলত, জ্যাক আমি এখানে। ইচ্ছে করলে ছুটে চলেও যেতে পারত বোট-ডেকে, কিন্তু এখন পারবে না। কারণ আর্চি ক্রমে ওর ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। তার সব কিছু গোপনে যেন লক্ষ্য রাখছে আর্চি। এবং ক্রমে সে একটা ব্যাপার বুঝতে পেরেছে, সেকেন্ড এনজিনিয়ার আর্চিকে খুশি করতে না পারলে তার এই সমুদ্র সফর বৃথা। সে চেষ্টা করে যাচ্ছে। আপ্রাণ সে খেটে যাচ্ছে। তবু ঠিকমতো সে, দক্ষ কারিগরের মতো সব কাজ পারছে না বলে, আর্চি ভীষণ বিরক্ত। আর্চি কাছে এসে দাঁড়ালেই

বুকের রক্ত হিম হয়ে যায়।

সে নড়তে পারল না। কেবল পাখি দুটোকে সকালের খাবার খাইয়ে সে ফের উইনচের ভেতর ঢুকে গেল। এখন ওর সারা হাতে মুখে কালি। একটা বলতিতে নানা সাইজের স্প্যানার। নাট বোল্ট। কেরোসিন তেল। সে নাট খুলে—কারণ দু'চারদিন যেতে না যেতে এই যেমন কোন উইনচের গিয়ার খারাপ, বিয়ারিং লুজ, একজস্ট স্টীম ঠিকমতো ক্লিয়ার হচ্ছে না অথবা হুইল জ্যাম হয়ে যাচ্ছে, এ- সব কাজ তাকে করতে হয় বলে বেশ সময় লেগে যায় একটা কাজ শেষ করে উঠতে। যখন সে নাট বোল্ট ভেতর থেকে খুলে আনে তখন একটা সে বড়রকমের কাজ করতে পারল বলে ভেবে থাকে। এবং সে কাজটা খুব খেটে মনোযোগের সঙ্গে শেষ করে যখন অপেক্ষা করে মেজ-মিস্ত্রি এসে দেখবে, তখন কেবল প্রার্থনা, হে ঈশ্বর হাতের কাজ দেখে তিনি যেন খুশী হন। কিন্তু হলে কি হবে, আর্চি এলেই, ওর মুখ শুকিয়ে যায়! এবং নির্ঘাত এসেই গিয়ার টেনে বালব ছেড়ে উইনচ চালিয়ে হঠাৎ ক্ষেপে যান। একেবারে জ্যাম। ঘুরছে না। ছোটবাবু কিছুতেই বোঝে না, কেন এমন হয়। সে নিজে বালব্ ঘুরিয়ে দেখেছে—সব ঠিকঠাক, লুজ নেই। টাইট ফিটিঙ, আর মেজ-মিস্ত্রি এসে ধরতেই সব কেমন গুবলেট হয়ে যায়। তার তখন ভয়ে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। আর অকথ্য গালিগালাজ দু'একদিন থেকে সবে শুরু করেছে। ছোটবাবু এ-সব একেবারে গ্রাহ্য করে না। কেবল মৈত্রদা অথবা অমিয় না শুনে ফেলে। শুনে ফেললেই মেজ-মিস্ত্রিকে অপমান করে বসতে পারে। তা হলে কি যে একটা কেলেঙ্কারী হবে! ভয়ে মুখ এ-জন্য আরও বেশি শুকিয়ে যায়।

তখন জ্যাক দাঁড়িয়েই আছে। নড়ছে না। সিউল-ব্যাংক যাচ্ছে, ক্রমে জলে ভেসে যাচ্ছে। একটা প্রাচীন যান্ত্রিক দানবের মতো নীল জলরাশি ফালা ফালা করে ভেসে যাচ্ছে। এবং জ্যাকের পলক পড়ছে না। কাপ্তানবয় জ্যাকের আপেল কলা স্যান্ড-উইচ একটু বাদেই রেখে যাবে। এখন ওর চা খাবার সময়। আর একঘন্টা পরে ব্রেকফাস্ট। সে কেমন দূরবীনে চোখ লাগিয়ে মন্ত্রমুগ্ধের মতো কেবল পাখি দুটোর এগিয়ে আসা দেখছে। তার চা ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে, কাপ্তান বয় দাঁড়িয়ে রয়েছে পাশে, কিছুই লক্ষ্য করছে না।

জাহাজিরা যে যার কাজ করে যাচ্ছে, এই যেমন সারা ডেকে জল মারা। একদল জাহাজি কাঠের পাটাতনে হলিস্টোন মারছে। ডেক-টিন্ডাল হাঁকছে, মারো টান হাইয়, জোরে মারো হাইয়। ডেরিক মাস্তুলের কাছাকাছি ছিল, সব খুলে নিচে ফল্কার ওপর ফেলে রাখা হচ্ছে। এমনি সব টুকিটাকি কাজ সব চলছে। ডেক-ভান্ডারি এনজিন-ভান্ডারী খুব তাড়াহুড়ো করছে। ওয়াচের লোক উঠে আসবে। সকালের চপাটি এবং গোস্ত সেদ্ধ এ-সময়ের ভেতর করে না ফেলতে পারলে চিল্লাবে জাহাজিরা। চিফ-কুক লোহার গনগনে চুল্লিতে দুটো আস্ত মুরগী মাখন মাখিয়ে রোস্টের জন্য ভরে দিচ্ছে ভেতরে। লাঞ্চের মেনু দেখে দেখে সব ঠিক করতে হচ্ছে। স্টুয়ার্ড খাবারের স্টক—রেজিষ্ট্রার খুলে—কি আছে কি কমে আসছে, এখন জাহাজ হাজার মাইলের ওপরে এক নাগাড়ে চলবে, মোটামুটি তাহিতিতে পৌঁছবার আগে সব ঠিক ঠাক আছে কিনা দেখে নিচ্ছে। রেশন খুব সকালে বের করে দিয়েছে। জমাখরচ বসে বসে লিখছে। সমুদ্রের বুকে এখন এদের এ-সব কাজকর্ম দেখলে মনেই হয় না, দেশবাড়ি বলে কিছু আছে তাদের—এরা সবাই যেন সিউল-ব্যাংকের শিরা উপশিরা। এবং এ-ভাবে ওদের কাজকর্ম সিউল-ব্যাংকের রক্ত সঞ্চালনের মতো। নিচে আগয়ালাদের মুখ দেখলেই বুঝা যাবে কি কঠিন শ্রমে আপ্রাণ জাহাজের স্টীম ঠিক রাখার জন্য লড়ে যাচ্ছে।

ছোট-টিণ্ডালের ওয়াচ এখন। এনজিন-রুমে আলি তেল যোগাচ্ছে। বড় বড় সব পিস্টন রড একেবারে রুপোর পাতে মনে হয় মোড়া, কি উজ্জ্বল এবং আর কি দানবের মতো ওঠানামা, এরই ফাঁকে প্রতিটি জয়েণ্টে ভীষণ মনোযোগের সঙ্গে তেল ঢেলে দিচ্ছে আলি। একটু অন্যমনস্ক হলেই হাত টেনে নিচে ফেলে দেবে—এবং হাড় মাংস অস্থি পিণ্ডাকারে পড়ে থাকবে ক্র্যাংক-ওয়েভের নিচে। গ্রিজার আলির চোখ ভীষণ সজাগ। তার অয়েল ক্যান ঠিক

তালে তালে নিচে ওপরে নামছে উঠছে। একটু অন্যমনস্ক হলেই সব গেল।

আর তখনই আসছে। সেই দুটো সাদা মতো পাখি ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ওরা জাহাজের দিকে এগিয়ে আসছে। পাখি দুটো ক্রমে এত বড় হয়ে যাচ্ছে কেন! প্রায় আকাশ জুড়ে ডানা মেলে রেখেছে! যেন দুটো সি-প্লেন। তাড়াতাড়ি চোখ থেকে দূরবীন খুলে ফেলতেই দেখল, না এত বড় দেখাচ্ছে না। এখনও বেশ দূরে রয়েছে। এবং ওরা যে জাহাজের পেছনে উড়বে এটা বোঝাই যাচ্ছে। তবু মনে হয় পাখি দুটো ঠিক আর দশটা পাখির মতো নয়। এমন অতিকায় যে, জ্যাক সমুদ্রে কখনও এত বড় এ্যালবাট্রস দেখেনি। দূর থেকেই যা মনে হচ্ছে, কাছে এলে কি বড় না জানি মনে হবে! সে আবার চোখে দূরবীন লাগালেই কাপ্তান-বয় বলল, সাব টি।

জ্যাক বুঝতে পারল, কাপ্তান-বয় আবার চা এনেছে। সে তাড়াতাড়ি যেন কোনরকমে চা খেয়ে আবার দেখতে থাকল। ওরা আসছে। এবং প্রায় সে ওদের ঠোট, চোখ দেখতে পাচ্ছে। চোখ নীল রংয়ের। থাবা বেশ বড়। অতিকায় ঈগল পাখির মতো। ওরা জাহাজের চার-পাশে চক্রাকারে ঘুরতে থাকল। ওদের পিঠের রং সোনালী। তারপর ওরা জাহাজের পেছনে জলের ওপর একবার বসল, কি তুলে নিল মুখে। দুটো ছোট মাছ। প্রপেলার জল ভেঙ্গে গেলে দুটো একটা মাছ মরে যায়, জলে ভেসে ওঠে। ওরা দুটো-একটা মাছের লোভে চলে এসেছে। এবং জ্যাক আশ্চর্য, এমন সুন্দর দুটো পাখি আবার কেন উড়তে থাকল, এবারে উড়ে আসছে ঠিক মাস্তুলের ডগায়, আর তখনই সে দেখল চিৎকার করতে করতে যাচ্ছে ডেবিড, ওহো—নো নো। ছোটবাবু পাগলের মতো ছুটে আসছে—সেকেণ্ড দ্যাখো। সে হাত তুলে দেখাল সমুদ্রে।

সেকেণ্ড দেখে কি করবে ভেবে পেল না।

ছোটবাবু বলল, প্লিজ কিল দেম।

এখন একমাত্র ওদের গুলি করে নামান যায়। সে ডাকল নিচ থেকে, জ্যাক—শিগগির।

জ্যাক বুঝতে পারল না। আর সে ছুটে যাবার সময় আবার একটা ধূর্ত মুখ, সেই ধূর্ত চোখ, যেন আড়ালে ছুটে এসেছে ওপরে, টাংকির ওপাশ থেকে মুখ বাড়িয়ে বলছে, ইউ নটি গার্ল!

সঙ্গে সঙ্গে জ্যাক চিৎকার করে উঠবে ভাবল, নো, মি বয়। কিন্তু যত জোরে বলবে ভেবেছিল, ঠিক ততটা গলা আস্তে হয়ে গেল। বলল, নো, মি বয় আর্চি।

আর্চি দাঁড়িয়ে গেছে, একেবারে স্থবির। সে যেন আর কিছু শুনতে পাচ্ছে না। ইউ নটি গার্ল। গার্ল। নো, মি বয়। মি বয়।

জ্যাকের হাত-পা শক্ত হয়ে গেল। চোখ ঝাপসা। আতঙ্কে হাত-পা কাঁপছে। সে দেখতে পেল না, বড় এ্যালবাট্রসটা মরিয়া। মিসেস স্প্যারোকে থাবায় তুলে নেবে বলে নেমে আসছে। কি দ্রুত গতি! গ্লাইড করতে থাকলে, ছোটবাবু একটা বড় ঢিল নিয়ে ছুটছে পিছু পিছু। যেন মিসেস স্প্যারোকে ডানার ভেতর আটকে ফেলেছে। আর ডেবিড লাফ দিয়ে সেই পাখার নিচ থেকে ভাবল, চড়ুই পাখিটাকে ছিনিয়ে নেবে, সে নিলও, কিন্তু সে দেখতে পাচ্ছে, ওর পিঠের জামা ফালা ফালা করে কিছুটা মাংস তুলে নিয়ে গেছে। মুহূর্তের ভেতর এমন ঘটল। জাহাজিরা ছুটে এসেও কিছু করতে পারল না। সমস্ত শরীর রক্তাক্ত করে পাখিটা আবার কেমন নির্ভাবনায় উড়ে যাচ্ছে। চড়ুই পাখিটাকে কব্জা করতে পারল না বলে যেন আক্রোশে ডেবিডকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দিয়ে গেল।

ডেবিড হাঁপাতে হাঁপাতে বসে পড়ল। চারপাশে জাহাজিরা ঘিরে ধরেছে। মিসেস স্প্যারো রক্ষা পেয়েই একেবারে জালির ভেতর। মিঃ স্প্যারো বের হচ্ছে না ভয়ে। ডেবিডের জামা ছোটবাবু খুলে দিচ্ছে। চীফ-অফিসার ছুটে এসেছে, এবং ডেবিডের এমন ছেলেমানুষী দেখে হাসবে কি ধমক দেবে বুঝতে পারল না। পিঠের ওপর নখের ক্ষত। বেনজিন দিয়ে সব পুড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে এবং যন্ত্রণায় ডেবিডের মুখ বেঁকে যাচ্ছে।

চীফ-অফিসার তবু রুষ্ট মুখে বলল, কি দরকার ছিল ওর মুখের খাবার কেড়ে নেবার!

সেকেণ্ড মুখ বাঁকিয়ে রয়েছে তেমনি। ভীষণ জ্বলছে। সে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। সামান্য ব্যাণ্ডেজের দরকার। এবং কেবিনের ভেতর ডেবিডকে নিয়ে যেতে বললেন কাপ্তান।

—ম্যান এ্যালব্রাটস!

চীফ বলল, তাই মনে হচ্ছে।

–লক্ষ্য করেছেন ওর পিঠ সোনালী রংয়ের!

—না তো।

জ্যাক সব দেখে-শুনে অবাক। সেই পাখি দুটো বেশ দূরে এখন। উড়ছে। কখনও সমুদ্রের জলে ভেসে বেড়াচ্ছে, কখনও ডুবে ডুবে প্রায় সাঁতার কাটার মতো। খাবার তুলে নিতে পারে নি বলে আক্রোশে যেন সমুদ্রের জলে পাখা ঝাপ্টাচ্ছে।

জ্যাক বলল, আবার আসবে।

ডেবিড বলল, আমারও মনে হয়, আবার আসবে।

ছোটবাবু বলল, তা হলে কি হবে।

—কিছু একটা করতে হবে। মৈত্র পাশ দিয়ে যাচ্ছিল। সে আর অযথা কথা বলতে পারে না। তবু যেন বলে গেল।—কিছু একটা করতে হবে। এভাবে তো আর এমন একটা অসহায় পাখিকে ম্যান-এ্যালব্রাটসটার থাবার ভেতর ফেলে দেওয়া যায় না।

কি এক দুয়ে সত্যাসত্য আবিষ্কার-এর মুখে কেউ তখন আর কথা বলতে পারল না। মৈত্র কেমন একটা দৈত্যের মতো হেলে দুলে নেমে গেল।

আর আর্চি তখন নিজের কেবিনে হা-হা করে হাসছে। নো মি বয়! সে দরজা খুলেই হাসছে। এনজিনের বিরাট আওয়াজে ওর হাসির শব্দ কেউ শুনতে পাচ্ছে না—নো মি বয়! চার্মিং! কি সুন্দর মিষ্টি কথা। ওটা কে! আয়নায় সে যেন কি দেখতে পেয়ে অবাক হয়ে গেল।

সে কাছে গেল, আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে বলল, তুমি কে হে। ও হো বাছা তুমি! থু!

নো মি বয়! নো, ইউ নটি গার্ল! গার্ল! সেকেণ্ড জিভ দিয়ে ঠোঁট চেটে বলল, ইউ নটি গার্ল। কোন ভয় নেই! আমি কিছু করব না। কাপ্তানের মেয়ে তুমি। তোমাকে আমি কিছু করতে পারি! সে আনন্দের চোটে শিস দিতে দিতে চান করল। পৃথিবীতে এমন একটা গোপন খবর সে আবিষ্কার করতে কখনও পারবে বুঝতে পারে নি। ওর সন্দেহ, সংশয় সব ঘুচে গেছে। ডেকে ছোটবাবু আর জ্যাক দু'জন জড়াজড়ি করছিল। নেশার ঘোরে সে এতটুকু ভুল দেখে নি তবে!

আবার আয়নায় একটা সুন্দর মানুষ হেঁটে হেঁটে চলে আসছে। লকারের আয়নাটা মাথাসমান উঁচু। সে কাছে গিয়ে বলল, কে! না' কিছুই নেই। সে ভাল জামা প্যান্ট পরে দেখল, না, পছন্দ হচ্ছে না। জ্যাকের পাশে সে বড় বেমানান। সবচেয়ে দামী নাইটি পরে দাঁড়াল, না কেমন সেকেলে সেকেলে। কিছুতেই সে রূপবান হতে পারছে না। বয়সের দাগ সমস্ত মুখে, হাতে পায়ে, আর ঠিক তেমনি কেউ অনেক দূর থেকে সে দেখতে পাচ্ছে হেঁটে হেঁটে আয়নার ভেতরে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। সে চিৎকার করে বলতে গেল, হেল! তুমি কেন? ঘুসি মেরে কাঁচ ভেঙ্গে দিতে পারলে যেন ভাল করত।

নো, মি বয়,—ইয়েস ইউ বয় সে দেখল তখন সুন্দর পোশাকে কেউ হেঁটে আসছে। অ মাই গড। আবার তুমি!

এখনও লাঞ্চের দেরি আছে। এমন একটা গোপন আনন্দের জন্য সে এখন মদ্যপান করতে পারে। থ্রি চিয়ার্স। থ্রি চিয়ার্স কাকে উদ্দেশ্য করে। –না, কেউ জানবে না। জ্যাক, কাউকে বলব না। বলে জাহাজে দাঙ্গা বাধিয়ে দিই আর কি। সব পবিত্রতা, ঈশ্বর চিন্তা একেবারে মুহূর্তে ভেসে যাবে। না কেউ জানবে না তুমি মেয়ে।

আবার সেই কে যেন দূর থেকে হেঁটে আসছে। ওর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। তুমি তো খুব জ্বালাচ্ছ হে! সে বেশ বড় করে এক সিপ খেয়ে বলল, আঃ ভারি মজা। তারপর কি করা যায়। দুটো উলঙ্গ মেয়ের ছবি, না দুটোতে হবে না, সে খেতে থাকল। পর পর সব উলঙ্গ মেয়েদের ছবি তাস খেলার মতো সামনে সাজিয়ে রাখল। দেখতে দেখতে আবার বলল, নো মি বয়। ইয়েস ইউ বয়, কেউ জানবে না, কেবল একজন জানবে, এ-জাহাজে অসামান্য এক সুন্দরী বালিকা ক্রমে যুবতী হয়ে উঠছে। বালিকা এখন নিজের সৌরভে বিভোর।

তারপরই মনে হল, না, আর একজন আছে, ছ'নম্বর। তার আগেই সে টের পেয়েছে। নারীজাতি সুধা পারাবার। সে সুধা পারাবারে আগেই মুখ রেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে মুখটা ভীষণ শক্ত হয়ে গেল। এবারে সে স্পষ্ট দেখল, আয়নায় ছোটবাবু দাঁড়িয়ে আছে। হাসি হাসি মুখ। আর্চি এবার গ্লাস ছুঁড়ে মারল আয়নায়। কাঁচটা ভেঙ্গে গেল। কেউ নেই। ফাঁকা। সে ভয় পেয়ে প্রাণপণ চিৎকার করে উঠল, বয়!

মেস-রুম বয় এসে অবাক, অসময়ে মেজ-মিস্ত্রি মদ খেয়ে মাতলামি করছে। গ্লাস ছুঁড়ে আয়নার কাঁচ ভেঙ্গে ফেলেছে।

॥ বাইশ ॥

দিন যায় তবু পাখি দুটো উড়ে আসে। জাহাজের পেছনে পেছনে কেবল উড়ছে। দিগন্তে কখনও উড়ে যাচ্ছে। ঝড়ের সমুদ্র পেলে আনন্দের শেষ থাকে না। যখন জাহাজে কেউ বের হতে পারে না, বৃষ্টিপাত প্রবল, ঝড়ো হাওয়ায় অস্পষ্ট এক কালো ঝাপসা অন্ধকারে সিওল-ব্যাংক এগিয়ে যাচ্ছে তখনও সেই পাখি উড়ে উড়ে আসছে। অথবা কক কক করে ডাকছে। অনেক দূর থেকে সেই শব্দ কখনও ঝড়ের রাতে অথবা কুয়াশার রাতে শোনা যায়।

অথবা যখন আকাশ নির্মল থাকে সমুদ্র শান্ত থাকে এবং আবহাওয়া সুন্দর থাকে তখনও পাখি দুটো উড়ে আসছে। সকালের রোদ ডানা থেকে পিছলে যাচ্ছে। আর কি যাদু জানে, মাস্তুলের ডগায় পাখি দুটো ঠিক বসে না, একেবারে উঁচুতে দুটো বাজ-পাখির মতো গ্লাইড করতে থাকলে সবার আগে জ্যাক ছুটে আসে ডেকে। সে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়ায়। দেখে, চড়ুই দুটো ঠিক জালির ভেতর আছে কিনা। যদি না থাকে তাড়িয়ে নিয়ে যায়। হাতে বড় একটা লোহার রড। ছোঁ মারলেই আঘাত হানবে। এবং আর যারা থাকে সে ডেবিড। ছোটবাবু সতর্ক নজর রাখে চারপাশে—না নেই। আর্চিকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। সঙ্গে সঙ্গে দু'লাফে উইনচের তলা থেকে তেল কালি মুখে হাজির। সামনে যা পায় তুলে ঢিল ছুঁড়তে থাকে।

পাখি দুটো ভয় পায় না। হাওয়ায় ভেসে থাকে। আসলে পাখি দুটো বুঝতে পারে ছোটবাবুর ঢিল অত উঁচুতে উঠবে না। ওরা, পাখায় ঢেকে রেখেছে যেন জাহাজকে। নিশ্চিন্তে ওরা উড়ে বেড়াচ্ছে। জ্যাকও ঢিল ছুঁড়ছে। ডেবিড, মৈত্র এবং ইয়াসিন পর্যন্ত দাঁড়িয়ে গেছে। যদি নেমে আসে, অথবা কাউকে আক্রমণ করে।

কত বড় পাখি! ডেবিড ভেবে পায় না আসলে এ-দুটো এ্যালবাট্রস কিনা, না অন্য পাখি! প্রশান্ত মহাসাগরের দ্বীপগুলোতে যে-সব এ্যালবাট্রসদের আস্তানা রয়েছে তাদের ভেতর এ-জাতীয় পাখিগুলো বিরল। প্রশান্ত মহাসাগরে অতিকায় এ্যালবাট্রসদের আস্তানা আছে সে শুনেছে। কখন দেখা দেবে কেউ বলতে পারে না। দেখা দিলে জাহাজের পক্ষে ভাল। কিন্তু বড় হিংস্র এদের স্বভাব। পুরুষগুলো বেশী মারমুখো হয়। এ-সব তথ্য ডেবিড পাখি সংক্রান্ত কোন বইয়ে পায় নি। প্রাচীন নাবিকের মুখে শুনেছে, এবং শুনেছে আশ্চর্য সব তথ্য।

কাজেই ইচ্ছে করলেই সে কাপ্তানের কেবিন থেকে বন্দুকটা নিয়ে এসে এদের গুলি করে নামাতে পারে না। এদের হাত থেকে কোনরকমে তাহিতি পর্যন্ত চড়ুই দুটোকে রক্ষা করতে পারলেই হয়ে গেল। তাহিতি থেকে এরা প্রথম কিনবে একটা পাখির খাঁচা। চড়ুই দুটোকে খাঁচায় এবার ভরে ফেলবে। তারপর আর ভয় থাকবে না।

তখন ছোটবাবু দেখেছে, এ্যালবাট্রসের তাড়া খেয়ে চড়ুই দুটো আর কাছে আসতে চায় না। এমন কি দেখেছে ওর বাকসোটাতে ঘুমোয় না। এনজিন-ঘরে থাকে। কিন্তু ভাল লাগবে কেন। একটু মুক্ত আকাশের নিচে উড়তে না পারলে ভাল লাগবে কেন। আর ভয় এই দুই বড় পাখির। কখন কি হবে কেউ বলতে পারছে না।

জ্যাকের সেজন্য সব কিছুর ভেতর এই এক কাজ পাখি দুটোর দিকে লক্ষ্য রাখা। সে যখন দেখে এ্যালবাট্রস দুটো জাহাজের খুব কাছাকাছি, তখনই তার মাথা ঠিক থাকে না, লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে আসে, আর আর্চি তেমনি সেয়ানা, সেও কোথা থেকে বের হয়ে আসে, যেন আর্চি ঘুমোয় না, আর্চি সারারাত জেগে থাকে জ্যাক কোথায় কখন থাকে দেখার জন্য। দেখা হলেই জ্যাকের সব যেন গন্ডগোল হয়ে যায়। মাথায় কিছু থাকে না। সে সোজা হাঁটে না, ঠিক উল্টো মুখে নেমে গেলে মজা পায় আর্চি। আর আর্চি তার ছোটখাট চেহারা নিয়ে কিম্ভূতকিমাকার। জ্যাক তখন ছুটেও পার পায় না। পেছনে তাকিয়ে দেখে, না আসছে না। সে দম ফেলে দাঁড়ায়। আবার ডাকে, ডেবিড, আসছে, আসছে। ম্যান-এ্যালবাট্রসটা এগিয়ে আসছে।

চড়ুই দুটো না থাকলে তার নিচে না নামলেও হত। চড়ুই দুটো না থাকলে, সে চুপচাপ'

কেবিনে কাটিয়ে দিতে পারে। সন্ধ্যার পর ছোটবাবু আর ডেবিড ওর কেবিনের পাশে চুপচাপ বসে থাকে। বারোটা-চারটা ডেবিডের ওয়াচ। সুতরাং চারটা থেকে আটটা পর্যন্ত ডেবিড আর ছোটবাবু বসে থাকে চুপচাপ। পোর্ট-হোল খুলে জ্যাক তখন সারাক্ষণ গল্প করতে পারে।

কিন্তু ছোটবাবুর ভারী প্রিয় পাখি দুটো। এ-পাখি দুটো আসার পর ছোটবাবুর বিষণ্ণতা কেটে গেছে। ছোটবাবু পাখি দুটোর জন্য বিশেষ করে মিসেস স্প্যারোর জন্য কেমন এক মায়া অনুভব করে থাকে। জ্যাকের এ-সব আগে ভাল লাগত না। এগুলো অসভ্যতা। কিন্তু যত দিন যাচ্ছে তত মনে হচ্ছে ছোটবাবু যা ভালবাসে, সে তা ভালবাসে। এটা কেন হয় সে বুঝতে পারে না। পাখি দুটোকে রক্ষা করার কেমন একটা নৈতিক দায়িত্ব পেয়ে সে বেশ একটা ভাল কাজ করে যাচ্ছে জাহাজে—আর তখন সেই লোকটা, ও কি ভয়ঙ্কর, বাবাকে সে অনায়াসে বলে দিতে পারে, কিন্তু মনে হয় আবার নির্বাসনের দিনগুলি চলে আসবে! জাহাজিরা যদি টের পেয়ে যায় সে মেয়ে, তবে বাবা ঠিক পিসির কাছে পাঠিয়ে দেবেন। পিসির মুখ ভাবলেই ভয়ে তার রক্ত হিম হয়ে আসে—এবং সে বুঝতে পারে ভয় থেকে এক একটা আকস্মিক ঘটনা ঘটে যায়। সে রেগে গিয়ে পিসির সুন্দর চুল কেটে দিয়েছিল। পিসির পোশাকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। জাহাজে এমন সব খবর খুব একটা মিথ্যা না—এতে আসে যায় না জ্যাকের। কেবল এখন নির্বাসনে যাবার আতঙ্কে আর্চির সব সহ্য করে যাচ্ছে। বাবাকে কিছু বলতে পারছে না। আর বাবা পাঠিয়ে দিলেই সে যাবে কি করে! ছোটবাবুকে ফেলে কোথাও গিয়ে সে থাকতে পারবে না। তার ভীষণ কান্না পাবে।

সিউল-ব্যাঙ্ক যাচ্ছে তার সুহাস গতিতে। পাখি দুটো আকাশের ওপর সমান তালে ভেসে চলেছে। এবং এখন বেশ এই জাহাজ আর দুই বড় এ্যালবাট্রস ভেসে চলেছে। নীল জলধি বলা যায়, সাদা জাহাজ, সাদা পাখি আর বুদবুদ জলে, নীল জলে অসংখ্য প্রাচীন জীবেরা ঘোরাফেরা করছে। তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ কোথাও ভেসে উঠলে অসংখ্য বুদবুদ হয়ে যায়। সমুদ্রের বুকে জলরাশির ভেতর এই সব লক্ষ কোটি বুদবুদ দেখলে ছোটবাবুর এমনই মনে হয়। মনে হয় সমুদ্রেই তার নিবাস। এই সব অতিকায় হাঙ্গর অথবা তিমি কিংবা ধরা যাক যে সব সোর্ড ফিস ছুটে যাচ্ছে জলের নিচে এবং কখনও কখনও অতিকায় তিমিমাছকে গেঁথে ফেলছে—সেখানে যেমন এক যুদ্ধ রয়েছে ওপরেও তেমনি যুদ্ধ। পাখি দুটো উড়ছে, ওরা আহার খুঁজছে। চারপাশে সবাই আহারের জন্য নানাভাবে হত্যা চালিয়ে যাচ্ছে। কেবল মানুষ আহার বাদেও হিংসা চরিতার্থ করতে চায়। এ-সব মনে হলেই ফিসফিস গলায় কেউ যেন ডাকে—জ্যাক, আমি এখানে।

জ্যাক দেখতে পায়, এলি-ওয়ের মুখে, বড় একটা উইন্ডসেলের আড়ালে ছোটবাবু দাঁড়িয়ে আছে। জ্যাক অবাক। কি করে টের পেয়েছে ছোটবাবু, সে আসছে।

—কোথায়?

—এখানে।

—এখানে কি!

—দেখো না এসে।

জ্যাক দেখল, চড়ুই পাখি দুটো পরস্পর ঠোঁট থেকে কি কেড়ে খাচ্ছে।

—এখানে তোমরা! আর কত জায়গায় খুঁজে মরছি।

ছোটবাবু বলল, জ্যাক তাহিতিতে নেমেই একটা খাঁচা কিনে ফেলব।

—এ্যালবাট্রস জাহাজের পেছনে ততদিন উড়তে নাও পারে।

ছোটবাবু বুঝল, তার আগেই ফিরে যেতে পারে পাখি দুটো।

—তবে যাচ্ছে না কেন? জ্যাক বলল, কত বড় পাখি দুটো না!

—ভীষণ! দেখলে চোখ ফেরানো যায় না।

—কি নীল চোখ!

ছোটবাবু বলল, এই, আমি যাচ্ছি, মেজ-মিস্ত্রির ওয়াচ থেকে উঠে আসার সময় হয়েছে।

—মেজ মিস্ত্রি লোক ভাল না।

—খুব বাজে। আমাকে অযথা গালাগাল করে!

–ধরে থাপ্পড় লাগাতে পার না! ঘুষি, ঘুষি মারতে পার না।

—ঠিক মারবো—কি বাজে দ্যাখো, সব ঠিকঠাক করে রাখি আর মেজ-মিস্ত্রি এসেই কি যে করে না! তারপরই কি যেন অন্যায় করে ফেলেছে ছোটবাবু, মুখে ভীতির ছাপ। সে ফের বলল, এই জ্যাক।

—কী? সে চেয়ে থাকল। আর এমন সুন্দর চোখে সে যখন তাকিয়ে থাকে ছোটবাবু কেন যে বুঝতে পারে না।

ছোটবাবু বলল, তুমি কিন্তু আবার কাপ্তানকে বলে দিও না।

—কি বলব?

—এই যে বললাম—ঠিক একদিন মেরে বসব।

—বললে কি হবে?

—আমাকে ডেকে পাঠাবেন। বকবেন।

—জ্যাক বলল, তুমি কিছু করতে যেও না ছোটবাবু

—আমাকে অযথা খাটায়। রাত সাতটার আগে আজকাল ছাড়ছে না।

জ্যাক কি বলবে! জ্যাক জানে মেজ-মিস্ত্রি এখন থেকে অনেক অন্যায় কাজ করে যাবে। তবু সহ্য করা ছাড়া উপায় কি

জ্যাক বলল, ছোটবাবু, একটা কথা বলব?

—আমাকে?

—হ্যাঁ তোমাকে। তুমি মেজ-মিস্ত্রিকে কিছু বলতে যেও না। প্লিজ!

—আরে না না। আমার সাহসই হবে না। খুব রাগ হয়, জানো কাল আমাকে বয়লারের নিচে পাঠিয়েছে। স্কাম-বক্স ক্লিয়ার হচ্ছে না, কে করবে, ডাকো ছোটবাবুকে। কি যে দরকার বুঝি না, ওটা জ্যাম থাকলে এমন কি ক্ষতি বল!

জ্যাক এনজিনের কলকব্জা সম্পর্কে কিছু বোঝে না। কিন্তু বয়লারের নিচে, জাহাজ চালু অবস্থায় কেউ ঢুকতে সাহস পায় না। তা ছাড়া শীতের সমুদ্রে জাহাজ নেই। গরম, ভীষণ গরম। দু-চার দিন না গেলে জাহাজ আরও নিচে নেমে না গেলে গরম কমবে না। ওপরে টন টন কয়লা পুড়ছে, নিচে ছোটবাবু! ভাবতে বুক শুকিয়ে যায়। সে বলল, নিচে ঢুকলে কি করে?

ছোটবাবু হাসল। বলল, কি করব বল! বললাম, বড় একটা বস্তা দিতে। না হলে তো ঝলসে যাব। পিঠে মাথায় বস্তা চাপিয়ে ঢুকে গেলাম।

—পারলে করতে!

—হ্যাঁ। মেজ-মিস্ত্রি অবাক। ও ভেবেছিল, আমি রাজী হব না। খুব বোকা ভেবেছে আমাকে। দুঃখে চোখ ভার হয়ে এল জ্যাকের। কত সহজে বলে যাচ্ছে ছোটবাবু—যেন কিছুই না কাজটা। একটা মরণপণ কাজের ভেতর জীবন নিয়ে ছোটবাবু ছুটছে। সে মুখ ফিরিয়ে সমুদ্র দেখতে থাকল। ওর চোখে জল দেখলে ছোটবাবু ভাববে, জ্যাক খুব ছেলেমানুষ। সে সমুদ্র দেখতে দেখতেই বলল, কি দরকার ছিল ছোটবাবু তোমার ছ'নম্বর হওয়ার! কি দরকার ছিল তোমার জাহাজে আসার?

জ্যাক বয়সী মানুষের মতো কথা বলছে। এখন জ্যাককে কিছুতেই মনে হয় না নাবালক। বরং জ্যাক তরুণ। বিচার-বুদ্ধিতে জ্যাক তার চেয়েও প্রাজ্ঞ। সে বলল, বা কত ভাগ্য আমার! আমি দেশে যখন ফিরব ও তুমি বুঝতে পারবে না, আমার মা আমাকে দেখে আকাশের চাঁদ হাতে পাবেন। আমি তো এমনি চেয়েছিলাম। জ্যাক আমি খুব বড় হতে চাই। সবাই বলবে, ছোটবাবু খুব বড় মানুষ। বাবা, আমার ছোট ভাই-বোনেরা, জ্যাঠামশাই আমার জ্যাঠিমা আমাকে যখন দেখবে, আমার গায়ে জাহাজি পোশাক, সাদা হাফ সার্ট প্যান্ট, মাথায় এংকোরের নীল টুপি, আমি তাদের কাছে কি যে হয়ে যাব না!

জ্যাক মুখ ফেরাল না। সেই এক গ্রাম্য বালকের বড় হবার আশা। এই সামান্য কাজের ভেতরই ছোটবাবুর বড় হবার স্বপ্ন সার্থক হতে চলেছে। সে বলল, ছোটবাবু, আর কেউ খুশী হবে না?

—আবার কে হবে?

—বারে তুমি যে বলতে.......?

–কি বলতাম!

—তোমার লিটল প্রিন্সেস!

ছোটবাবু ভুলেই গিয়েছিল, সে তার মাকে লিটল প্রিন্সেস বলেছে। বলল, অঃ আমার মার কথা বলছ!

জ্যাক অবাক! সে ফিরে দাঁড়াল। দেখল, ছোটবাবুকে। ছোটবাবুর মুখে চোখে কি যে আশ্চর্য যাদু থাকে! সে ভাবল কিছু বলবে, কিন্তু কি বলবে, কিছু বলতে পারছে না। ঠোঁট কাঁপছে। এতদিন একটা ভীষণ চাপা অভিমান ছিল ছোটবাবুর ওপর। ছোটবাবু কি জানত না, জাহাজে বনি নামে একজন মেয়ের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে। সে কেন তার লিটল প্রিন্সেসের কথা ভাববে।

ছোটবাবু বলল, এই জ্যাক কি হয়েছে?

ছোটবাবু তুমিও ভাল না।

—আমি ভাল না কেন? আমি তো কিছু করি নি।

—তুমি ভীষণ ভীষণ.....

ছোটবাবু তারপরই দেখল জ্যাক দৌড়ে যাচ্ছে। ডেকের ওপর দিয়ে দৌড়ে যাচ্ছে। ছোটবাবু বুঝতে পারল না, জ্যাক এভাবে কেন দৌড়াচ্ছে।

কারণ ছোটবাবু তো জানে না আনন্দে জ্যাকের চোখ দিয়ে অজস্র বারিধারা নেমে আসছে। জ্যাক এখন সোজা নিজের কেবিনে ঢুকে গেছে। এবং বালিসে মুখ গুঁজে দিয়েছে। ছোটবাবু তুমি আমাকে কি যে ভয় পাইয়ে দিয়েছিলে! আমি আর কাউকে ভয় পাই না।

এবং পরদিনই সবাই ছুটে গেল মেজ-মিস্ত্রির কেবিনে। মেজ-মিস্ত্রি পড়ে গিয়ে আঘাত পেয়েছে। সে হেঁটে আসছিল বোট-ডেক ধরে, মনে হল পায়ে কেউ কি দিয়ে হ্যাঁচকা মেরেছে! সঙ্গে সঙ্গে একেবারে উপুড় হয়ে পড়েছে ডেকে। নাক দিয়ে অনেকটা রক্ত পড়েছে। কিন্তু কিভাবে কি যে হল কেউ বুঝতে পারে নি।

ব্যাপারটা কেউ বুঝতে পারল না। কেউ বলল, জাহাজের সেই অশুভ শক্তি। কেবল ছোটবাবু বুঝতে পেরে গুম হয়ে গেল। সে জ্যাকের সঙ্গে দু'দিন কথা বলল না।

জ্যাক থাকতে না পেরে বলল এই, তুমি কথা বলছ না কেন?

—কি বলব।

—যা খুশী।

ছোটবাবু বলল, জ্যাক তুমিও ভাল না

—আমি তো খারাপ সবাই জানে। নতুন কি দেখলে?

—তুমি কেন মেজ-মিস্ত্রিকে এভাবে ফেলে দিলে? যদি দেখতে পেত।

—ও দেখবে! তা হলেই হয়েছে। ও এখন কি দেখে তুমি তো জান না। কি খুঁজে বেড়ায় তুমি তা বোঝ না। কেবল এদিক-ওদিক চেয়ে দেখে। নিচে কি আছে, কোথা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ওর মাথায় যদি থাকত.......

ছোটবাবু বলল, কাউকে অহেতুক কষ্ট দিতে নেই।

—তোমাকে দিচ্ছে কেন?

ছোটবাবু আর কিছু বলতে পারল না। সে বুঝতে পারছে গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠছে ওর সঙ্গে। জ্যাক তুমি আমার জন্য এটা করেছ?

জ্যাক খুব সাদাসিধেভাবে বলল, হ্যাঁ।

—জ্যাক তুমি কি? ওতে ওর রাগ তো বেড়ে যাবে।

—টের পেলে তো। বলেই জ্যাক বলল, ঐ দ্যাখো আসছে। নেমে আসছে।

ছোটবাবু দেখল, অতিকায় এ্যালবাট্রস দুটো জাহাজের দিকে উড়ে আসছে।—কোথায় আছে ওরা? —দাঁড়াও দেখছি। জ্যাক দৌড়ে চলে গেল। ছোট কাজ ফেলে যেতে পারে না! সে জ্যাককে দেখে যেমন টুপ করে ভেসে উঠেছিল উইনচের তলা থেকে, ফের সে উইনচের নিচে ডুবে গেল।

এখন কে বলবে একটা মেয়ে জাহাজের সর্বত্র খুঁজে বেড়াচ্ছে পাখি দুটোকে। সে চিৎকার করছে, মিঃ স্প্যারো, মিসেস স্প্যারো তোরা কোথায়? ওরা উড়ে আসছে। ভেতরে ঢুকে যাও। কিন্তু কোথাও দেখতে পেল না। গেল কোথায়? কাপ্তান হুইলঘরে বসে দেখতে পাচ্ছেন, জ্যাক এংকোর ফেলার জিপসিতে উঠে পাখি দুটোকে খুঁজছে। বেশ আছে। জ্যাক, ছোটবাবু, ডেভিড বেশ আছে পাখি দুটোকে নিয়ে। এবং কাপ্তান নিজেও কতদিন দেখেছেন, চা-এর সঙ্গে সামান্য রুটি আপেল এলে উড়তে উড়তে চলে এসেছে তারা। তখন এই মহাসমুদ্রের শান্ত স্বভাবের ভেতর পাখি দুটো বড় বেশি ডাঙার খবর বয়ে আনে। পাখি দুটোকে খাবার ছুঁড়ে দিতে তারও কম ভাল লাগে না।

তা ছাড়া মেয়েটা এভাবে বেশ দিন মাস কাল জাহাজে কাটিয়ে দিচ্ছে। কিছু তো নেই। সব সময় বই পড়তে ভাল লাগবে কেন, এখন বয়স বাড়ছে। চারপাশের গাছাপালার ভেতর বড় হয়ে ওঠার কথা। কিন্তু কপাল মন্দ, সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরে মরছে। মেয়ের এই একাকীত্বের জন্য বেদনাবোধ যখন খুবই তীব্র হয়ে ওঠে, তখন আর বসে থাকতে পারেন না। একা একা পায়চারি করেন। মনে হয়, সেই ভয়ঙ্কর দিনে তিনি যেন শুনেছিলেন তুমি আমাকে এটা কি করলে! তোমার পাপ হবে না, তোমার শাস্তি হবে না, তোমার শাস্তি হবে না! আর বুড়োবয়সে মেয়েটার নির্জন একাকীত্বের ভেতর সেই শাস্তিকে তিনি অনুভব করতে পারেন। তাঁর তখন ঈশ্বর চিন্তা পর্যন্ত খারাপ লাগে।

তখন ছোটবাবু দেখল, জ্যাক হাসি হাসি মুখে ওর পায়ের কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দু-হাত একসঙ্গে করে কি দেখাল ইশারায়। ছোটবাবু উইনচের তলায় নাট-বোল্ট খুলছে। চিত হয়ে আছে। কিছুটা দেখা যাচ্ছে। এবং জ্যাক ইশারা করলে সে আর শুয়ে থাকতে পারল না। বের হয়ে বলল, কি ব্যাপার!

—তাড়াতাড়ি এস।

জ্যাক কিছু বলছে না।—কী? বলবে তো?

—এস। না দেখলে বিশ্বাস হবে না।

জ্যাক লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ধরে উঠে যাচ্ছে। এখন বিকেল। সূর্য এবার পলিনেশীয়

দ্বীপপুঞ্জমালার ওপাশে নেমে যাবে, এবং সূর্যাস্তের রঙ যেমন মনোহারিণী থাকে তেমনি, চারপাশে উজ্জ্বল লাল নীল হলদে আভা, কখন সমুদ্রে মিলিয়ে যাচ্ছে আর কখন ভেসে উঠছে কেউ বুঝে উঠতে পারছে না। আর এভাবে ওদের শরীরের রঙ পাল্টে যাচ্ছে। কখনও বেগুণী কখনও মেরুন, কখনও ক্রিসেন্থিমাম। ছোপ ছোপ রঙের ভেতর ওরা যখন বাক্সোটার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল তখন কে বলবে ওদের দুজনের কাছে পৃথিবীতে এর চেয়ে আর কিছু বিস্ময়ের আছে। পাখি দুটো হলদে নীল ছোট মারবেল গুলির মতো ডিম পেড়েছে। আর অহংকারে ওদের পা পড়ছে না। কেবল মাথার ওপর পাখি দুটো উড়ছে। আর কিচকিচ করছে।

ছোটবাবু বলল, কী?

জ্যাক বলল, কী?

ওরা দুজনেই পাখি দুটোকে প্রশ্ন করল।

তখন মৈত্র যাচ্ছে। সে বলল, কি করছিস রে ছোটবাবু?

—এসে দ্যাখো না।

মৈত্র এসে বলল, সাবাস!

সারেঙসাবকে ছোট ডেকে আনল, চাচা দেখে যান কি হয়েছে!

জ্যাক দু-লাফে একেবারে কোথায় চলে গেল। একটু পরে সবাই দেখছে, জ্যাক, তার বাবাকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে।

কাপ্তান এসেও উঁকি দিলেন। তিনি দেখলেন। দেখলেন ছোট্ট একটা কাঠের বাক্সের এক পাশে খড়কুটো দিয়ে বানানো ঘরে পাখি দুটো সুন্দর সুন্দর সব ডিম পেড়েছে। জ্যাকের দিকে তাকিয়ে বললেন, কে আবিষ্কার করেছে?

জ্যাক বলল, আমি। বাবা আমি খুঁজতে এসে দেখি দুজনে চোরের মতো এখানে পালিয়ে আছে। ও মা কাছে যেতেই দেখি ওরা উড়ে গেল তারপরে না বাবা....। আহা জ্যাকের চোখ কি উজ্জ্বল! এভাবে প্রায় সকলেই এসে দেখে গেল। কাপ্তান নিজে এসে দেখে গেলেন যখন, তখন জাহাজিরা না দেখে থাকে কি করে। চড়ুই দুটো এ-জাহাজের যাত্রীর মতো। প্রায় সবাই পাখি দুটোর ভালমন্দ নিয়ে ভাবতে থাকল। কাপ্তান পাখি সম্পর্কে নানারকম কথা বলতে বলতে উঠে গেলেন। পাশে চীফ- অফিসার, রেডিও-অপারেটর। এই সব পাখি দীর্ঘদিন সমুদ্রযাত্রায় নানারকম বৈচিত্র্য নিয়ে আসে। এরা যে সত্যি ডিম পাড়ে, জাহাজিদের কথাবার্তা শুনে একেবারে মনে হবে না। যেন সিউল-ব্যাংক জাহাজে চড়ুই দুটো প্রসব করল।

এই ডিম দেখার পর মৈত্রমশাই মুখ গোমড়া করে থাকল। সে টাকা পাঠাতে পারে নি বুয়েনএয়ার্স বন্দর থেকে। ভেবেছিল ভিকটোরিয়া থেকে মোটা টাকা পাঠাবে। কম্বল এবং কিছু উলেন জামা বিক্রি করে যা পেয়েছে পাঠিয়েছে। ওতে কি হবে। সন্তান হবার সময় কত কিছুর দরকার। সে লিখেছিল আমি ঠিক পাঠাচ্ছি। কাজ কারবার যা করেছে ওতো সব রেখে এসেছে বুয়েন-এয়ার্সে। এখনও মেয়েটির কথা ভাবলে চোখে ঘুম আসে না। বিজবিজে ঘা। ওর ক'দিন থেকে এই একটা ভাব, কুঁচকির নিচে বিজবিজে কি যে দেখা যাচ্ছে, জ্বলছে। বন্দর না এলে কিছু করতে পারছে না। পালিয়ে ডাক্তার দেখিয়ে আসবে। সে তো আর এ-সব কাউকে বলতে পারে না। কেবল টাকা টাকা। অমিয় কি সব এনে জড় করছে লকারে। অমিয় বলল, দাদা, আমি দ্যাখো ঠিক রাজা হয়ে বাড়ি ফিরব।

মৈত্র বলল, কচু।

—দেখ না। বলে লকার খুলে দেখাল।

—কি করেছিস? সারেঙসাবকে বলেছিস চাবি পাচ্ছিস না! আর এ-সব হচ্ছে!

—তুমি দেখ না। এই যে, বলে অমিয় একটা বড় তাল, প্রায় সোনার পিন্ডের মতো দেখতে,

মৈত্রকে দেখাল। কয়লার ছাই থেকে এ-সব উজ্জ্বল ধাতুপিন্ড সংগ্রহ করেছে। এখন তেমন বেশি হচ্ছে না। ইন্ডিয়ান কোল পুড়লে চকচকে এমন সব ধাতুপিন্ড—আর সবই মনে হয় অমিয়র, কিছু রয়েছে এর ভেতর—সে কুড়িয়ে আনে। আর যা ভেবে থাকে, এই সব সঞ্চিত ধাতুপিন্ড নিয়ে সে কোন বড় দ্বীপে নেমে যাবে। কেউ টের পাবে না। আসলে কয়লার ছাই বলে কেউ বুঝতেই পারে না, এর ভেতর এমন অমূল্য কিছু পড়ে থাকতে পারে। সেই যেন প্রথম এটা আবিষ্কার করেছে। একবার শুধু যাওয়া। লকারের নিচের তাকটা ভরে গেছে। যদি সত্যি সোনা হয়ে যায়, অথবা এমন ধাতুপিন্ড, যা আরও অমূল্য, সে তো এভাবে গলে গলে কয়লা থেকে হীরক হয়ে যাওয়ার গল্প শুনেছে। শুনেছে, কোন এক কয়লাবালা এক পিন্ড হীরক পেয়েছিল। কয়লা টানতে টানতে বড় বড় চাঁই ভেঙ্গে ফেলতেই উজ্জ্বল রত্নরাজি। এবং সে সারেংকে দেখিয়েছিল। সারেং কাপ্তানকে। কাপ্তান বলেছিল, কিছু না, কাচ। তারপর বলেছিল, ফেলে দাও। কোলবয় ফেলছে না, নিয়ে যাচ্ছে। তিনি ফের ধমক দিলে, সে ফেলে দিয়েছিল। তারপর চলে গেলে কাপ্তান কুড়িয়ে নিয়েছিল সাত রাজার ধন এক মাণিক, এবং জাহজে কেউ জানল না কাপ্তান বোকা বানিয়ে সব কেড়ে নিল। সে এমন বোকামি করছে না। মৈত্রেরও এমন একটা চালাকি মনে মনে থাকতে পারে। অমিয় বেশ ভাল করে তালা মেরে টেনে দেখল। না, এত সহজ নয় খোলা। কেবল একটা ভয় রয়েছে, যে কোনো সময় কাপ্তান সাফাইয়ে এসে এটা খুলে দেখতে পারেন। যা শোলার উপদ্রব হয়েছে! ওর লকারটার ভিতরে এখন যত আরশোলার রাজত্ব। রাজ্যের সব আরশোলা ওর লকারে জড় হয়েছে। চাবি পাচ্ছে না বলে খোলা যাচ্ছে না। গ্যাস দেওয়া যাচ্ছে না। সব আরশোলা তাড়া খেয়ে ওর লকারে পালিয়ে আছে।

এবং লকারটা খুললেই সারা ঘরময় সেই আরশোলা উড়তে থাকে। যেন একটা দুটো না, অজস্র এবং বেলুনের মতো হয়ে যায়, রং-বেরংয়ের বেলুন। বেশি উড়তে থাকলে বিপদ, সবার ঘরে উড়ে যাবে। কেউ তো জানে না, সব এসে এখন এই একটা লকারে আশ্রয় নিয়েছে। এত গ্যাসেও কোন ফল হচ্ছে না। এবং যেমন লকার খুলে দেখার একটা কাজ আছে অমিয়র, মালপত্র ঠিক আছে কিনা, না কেউ গেঁড়া মেরেছে, সবচেয়ে ভয় মৈত্রকে। যেভাবে টাকা টাকা করছে যে কোনো সময় ঠিক ফাঁক করে দিতে পারে—সুতরাং মাঝে মাঝে খুলে ফেলতে হয়, খুলে দেখার সময় আরশোলা উড়ে বেড়ালে আবার তাদের ধরতে হয়। ধরে ধরে একটা একটা করে ভরে রাখতে হয়! এখন তো কারো কেবিনে আর ছেড়ে দেওয়া যাচ্ছে না। আগে সে বড়-মিস্ত্রির কেবিনে এইসব আরশোলা মধ্যরাতে ছেড়ে দিত। আপেল ডিম তোলার সময় ওর হাত থেকে পাখির মতো একটা একটা করে আরশোলা উড়ে যেত, যেন অজস্র পাখি এবং বোধ হয় অজস্র চড়াই, ছোট ছোট পাখি, উড়ে উড়ে অল্প আলোতে নানাবিধ ছায়া ঘোরাফেরা করলে একটা হাত এবং ঝুলন্ত হাত, পাশে কি রয়েছে, নেশার ভেতর চোখের পলক পড়ত না—সে এভাবে একটা মহৎ কাজ করেছে জাহাজে উঠে। শালাকে ভাগিয়েছে। এমন ভাবে সুন্দরী মেয়েদের কাঁচা মাংস খেতে সে কাউকে দেখে নি। টাকার জোর থাকলে সব হয় না।

সব হয় না বললে কি হবে, লাফিয়ে লাফিয়ে একটা একটা করে খপ করে ধরছে, আর লকারে ঢুকিয়ে দিচ্ছে। খোঁয়াড়ে ছাগল ঢুকিয়ে দেবার মতো। সে ধরছে আর বলছে, টাকা! না টাকাই সব না। টাকা! টাকা আছে, সব আছে। প্রেমিকা আমার, মুক্তো আমার, আমি টাকা নিয়ে যাব। কত টাকার খাঁকতি দেখাব।

মৈত্র এ-সব দু-একদিন লক্ষ করছে, ছোটবাবুও লক্ষ্য করত। অমিয় বিড়বিড় করেছ বকছে। এখন মৈত্র ওপরে থাকলে, গোপনে লকার খুলে দেখলে এটা বেশি হয়। এক অদৃশ্য শত্রুর বিরুদ্ধে তার লড়াই। যতদিন লড়াইয়ে না জিতছে ততদিন অমিয়র যেন শান্তি নেই। এ-সব কারণে জীবনপণ করে সে সামনাসামনি সেই অদৃশ্য শত্রুর ডামি পেয়ে গেলে লোভ সামলাতে পারে না। কব্জা করে তবে ছাড়ল। ছোটবাবুরও উপকার হয়ে গেল। ছ-নম্বর হয়ে গেল। তাহিতিতে ছোটবাবুকে একটা ভোজ দিতে হবে। না হলে অমিয় ছোটবাবুর পিছনেও

লাগবে।

এ-সব মনে হলেই ওর মনে হয় অদৃশ্য সেই শত্রু মহান নায়কের মতো গোঁফ মুচড়ে মুচকি হাসছে। সে তখন স্থির থাকতে পারে না। জাহাজে উঠে এত দিন সে কাউকে বুঝতে দেয়নি, তার ভালবাসার মেয়েকে কেউ কেড়ে নিয়েছে। ঠিক কেড়ে নিয়েছে বললে ভুল হবে, যেন ইচ্ছে করেই সেই মেয়ে তাকে ছেড়ে চলে গেল। কারণ, অমিয়র কি আছে! শরীর বাদে ওর কিছু নেই। বাউন্ডুলে, চুল বড়, দাড়ি ঠিক মতো কামায় না, স্নান করে না, কেমন এলোমেলো, তারপর মদ্যপান, কোথায় যে টাকা পেত বাংলা মদের। এ-সব নানা অজুহাত দেখিয়ে ফুস করে উড়ে গেল।

সে খপ করে আরশোলা ধরত আর বলত, টাকা! টাকা কামিয়ে একটা দ্বীপ কিনে ফেলব। তারপর চাষাবাদ। চারপাশে সমুদ্র দ্বীপের। দ্বীপের একপাশে উঁচু পাহাড়, পাহাড়ে একটা আমলকি গাছ থাকবে। তার নিচে ছোট্ট কুটির। নিচে বেলাভূমি, মৎস্য শিকারের অবাধ সুযোগ, পাশে ফুলের রাজত্ব, এক পাশে আঙুর ক্ষেত, পাশেই আঙুর পচিয়ে মদ, পাশেই আপেলের বাগান, পৃথিবীর যাবতীয় সুদৃশ্য গাছপালা এনে সে লাগাবে, তারপর সুন্দরী রূপবতী মেঘবরণ চুলের কন্যার হাতে ফুল দিয়ে বলবে, আমি পৃথিবী জয় করলাম।

আসলে সে চায় প্রতিশোধ। সে যে কত বড় তা দেখাতে চায়। সে এভাবে চারপাশে নানারকম কারুকার্যময় জীবন দেখতে দেখতে মাঝে মাঝে ভীষণ উৎফুল্ল হয়ে ওঠে। তাহিতিতেই সে প্রমাণ করবে, এগুলো কি। সে বলল, এই যাবি মৈত্র!

—কোথায়?

—কি ভেবে বলল, না থাক। পরে বলব। মৈত্রকে অমিয় কিছু আর বলল না।

—কিছু বলছিস না যে?

—এই বলছিলাম ছোট নাই তো। খুব খালি খালি লাগছে।

—তা আর ভেবে কি হবে।

—ছোটর খারাপ লাগে না আমাদের ছেড়ে থাকতে?

—জিজ্ঞেস করে দেখ না।

—এখন তো কথাই বলতে পারি না। কোথায় যে থাকে!

—উইনচের নিচে পড়ে থাকছে।

এভাবেই জাহাজ যায়। আর ছোটবাবু উইনচের তলায় চিৎ হয়ে পড়ে থাকে। দুলে দুলে জাহাজ যায়। আসলে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকলে মনে হয় আকাশটাই দুলছে। রাত হয়ে গেলে মনে হয় নক্ষত্র দুলছে। উইনচের নিচে শুয়ে তার মা-বাবার মুখ এবং সেই দূরদেশে রয়েছে জন্মভূমি, সব তরমুজের লতা, এবং বড় অশ্বত্থ গাছ এ-সবের ভেতর মনে পড়ে ছোট্ট এক মেয়ে—সে তো এখন ওর মতো বড় হয়ে গেছে। নাকে ওর নথ ছিল। ঠিক দুর্গাপ্রতিমার সঙ্গে ওর মুখ এখন আকাশের গায়ে ভেসে উঠছে। কি বড় নথ, আর কি বড় চোখে ওকে দেখছে। সারা আকাশময় শুধু নক্ষত্র! এখন কি মাস, এ-মাসে কি তার আগে পুজো হয়ে গেছে! আকাশের গায়ে প্রতিবিম্ব ভেসে উঠলে সুদূরের সেই দুর্গাপুজোর কথা মনে হয়। চারপাশে ড্যাং ড্যাং বাজনা বাজছে। কি যে হয়, কিসের বাজনা, কেন এতদূর থেকেও সে স্পষ্ট শুনতে পায় বাজছে, দুর্গাপুজোর বাজনায় সারা শরীর ওর ফুলে ফুলে উঠছে।

আসলে মায়ের কথা ভেবে ছোটবাবুর কান্না পাচ্ছিল। সে উইনচের নিচে শুয়ে গোপনে মায়ের জন্য কাঁদছে।

রাত আটটায় ডাইনিং হলে খাবার সাজানো হচ্ছে। একে একে সবাই নেমে আসছে। ওভাল সাইজের টেবিল, ধবধবে সাদা চাদর বিছানো। টুপির মতো ন্যাপকিন সাজানো প্রত্যেক চেয়ারের সামনে। সুন্দর কারুকার্য করা দেয়াল। দেয়ালে বিখ্যাত সব কাপ্তানদের ছবি। নিচে

নাম। ব্যাংকলাইনের সব দুর্দান্ত কাপ্তানদের বড় বড় ছবি। মাঝখানে হিগিনসের ছবি। আর চারপাশে আলোর ফুলঝুড়ি। বিচিত্র সব আলোর বাহার। খেতে বসলে রেকর্ড চালিয়ে দেওয়া হয় কোনো দিন। মিউজিক বাজতে থাকে। ওরা নিভৃতে খায়। অথবা দুটো-একটা পুরানো কিংবদন্তী। সমুদ্রগামী জাহাজে দূর অতীতে কত কি সব সংস্কার ছিল, সে সব কথাবার্তা কাপ্তান সারাজীবন ধরে যেন মুখস্থ করে রেখেছেন সব। জাহাজি ঐতিহ্য এভাবে খেতে বসে কথাবার্তায় ধরা পড়ে। ছোটবাবু খাবার সময় কথা বলে না। কেবল শুনে যায়।

অথচ সবাই এসে দেখল, ছোটবাবু আসেনি। জ্যাকের খাবার এখন ওর কেবিনে যাচ্ছে। সে নিচে খেতে আসছে না। ডাইনিং হলে সে খেতে একেবারেই পছন্দ করছে না। জ্যাক যেভাবে পারছে মেজ- মিস্ত্রি আর্চিকে এড়িয়ে থাকতে চাইছে।

তখন ডেবিড খুঁজে খুঁজে আবিষ্কার করল ছোট উইনচের তলায় ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোটকে অহেতুক কাজ দিয়ে রাখে মেজ মিস্ত্রি। সে কিছু বলতে পারে না। ধীরে ধীরে ডাকল, এই ছোট। শিগগির ওঠ। তুমি ঘুমোচ্ছ!

ছোট উঠেই কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। সে তাড়াতাড়ি আবার স্প্যানার বসিয়ে দিতে গেল নাটের ডগায়! খুব অন্যায় করে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি নিজেকে সংশোধন করার সময় বুঝতে পারল না, ডেবিড এসেছে ওকে ডাকতে। সবাই ডাইনিং হলে ওর জন্য অপেক্ষা করছে। রাত আটটা বাজে।

এবং যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব সে ছুটে গেল। তাড়াতাড়ি তো সব হয়ে ওঠে না। যতটা পারল হাত-পা পরিষ্কার করে হলঘরে ঢুকে দেখল, আর্চি বিরক্ত মুখে ওর দিকে তাকিয়ে আছে। সে ভীষণ কুণ্ঠার সঙ্গে বলল, আমার দেরি হয়ে গেছে। দুঃখিত।

ডেবিড বলল, এত কাজ করছ, খেয়াল নেই!

ছোটবাবু বুঝতে পারল, ডেবিড ওর দোষ ঢাকছে। সে কিছু আর বলতে পারল না।

ছোটবাবু মেনু দেখল। ক্রিম ম্যাভি লোসে, ফিলেটস্ অফ হেক, ম্যাকসিকান রোস্ট, রিবস্ অফ বিফ্, রোফোর্ট, বয়েল প্যোটাটোজ, ফ্রেনচ্ বিনস, চকোলেট, পুডিং চিজ, কফি।

ছোটবাবু সব খাবার খেতে পারে না। সে বেছে বেছে খায়। বয়েলড্ প্যোটাটোজ চাক চাক কেটে নিল। ফ্রেন্চ বিন্স খেল সবটা। রোস্ট খেতে ও পছন্দ করে। সবশেষে সে খেল পুডিং কফি। খাবার পরও মনে হল, সে খায়নি। একটু ঝালঝোল ভাত ডাল কি যে প্রিয় তার। সে খেয়ে উঠে গেল। সে যে ভালভাবে খেতে পারে না ডেবিড বুঝতে পারে। যে ছেলেটা শৈশব থেকে অথবা জন্মাবধি একভাবে মানুষ, তাকে হঠাৎ অন্য জীবনযাপনে ফেলে দিলে যা হয়, এবং প্রায়ই দেখা যায়, খাবার টেবিলে ছোটবাবুর কোনও উৎসাহ থাকে না। যখন সবাই স্যুপ অথবা অন্য খাবার হুস-হাস খায়, তখন নীরবে ছোটবাবু এটা-ওটা বেছে খায়। কিছুটা খেয়েই প্লেট সরিয়ে রাখে।

এখন ছোটবাবুর কাজ একটু ভাতের ব্যবস্থা করা। ভাত-ডাল হলেই হবে। একটা শুকনো লংকা পুড়িয়ে নিলেও তার অমৃতের মতো মনে হবে। এবং যেটা স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে ছোটবাবুর ভাত না খেতে পেলে ঘুম আসতে চায় না। ভাল ঘুমোতে না পারলে, বেশি খাটতে পারে না। ভাঙা জাহাজে সারা দিনমান এটা-ওটা মেরামত লেগেই আছে। সাধারণ মেরামতের কাজগুলো সে-ই করে থাকে। কিছু কাজ আছে যেমন, বাল্ব ঘুরছে না, গ্যাস-পাইপ কাজ করছে না, উইনচের প্যানিয়ান জ্যাম, সেগুলো সহজ সাধারণ কাজ বলে সেই করে ফেলে। যত সহজ ভাবা যায়, পরিশ্রমের দিক থেকে তত সহজ নয়। সে সেই সকাল থেকে সারা দিনমান প্রায় ডেকে, বোটডেকে ছুটে ছুটে কাজ করে থাকে বলে, সব সময় মনে হয় পেট ক্ষুধায় জ্বলছে। আর ফাঁকে যদি আফ্ট-পিকে চলে আসতে পারে, তবে তো কথাই নেই, একেবারে চোরের মতো ভান্ডারিজ্যাঠার গ্যালিতে ঢুকে, জ্যাঠা তাড়াতাড়ি, একটু আলু ভাজা, ব্যাস, সে গোগ্রাসে খেয়ে প্যান্টেই হাত মুছে লাফিয়ে আবার কখন কাজে যায়, অফিসাররা

বুঝতেই পারে না, ছোটবাবু আড়ালে খালাসিদের খাবার খেয়ে এসেছে।

আর এভাবে খেতে পেলেই সে ভীষণ ছুটে ছুটে কাজ করতে পারে। খাটতে পারে বেশি। রাতে তাকে জেগে থাকতে হবে, যদি মৈত্রদা, অমিয়, মনু কেউ এদিকে আসে! সে এলি-ওয়ে ধরে হাঁটতে থাকল। কেউ আসছে না। ওরা হয়তো ভুলে গেছে, সে জেগে অছে দুটো ভাত খাবে বলে।

তখনই অনিমেষ এল। একটা ছোট কলাই-করা বাটিতে ভাত। একটু মাংসের ঝোল। ছোটবাবু ঢাকনা খুলে শুঁকে দেখল—আহা কি সুন্দর ঘ্রাণ। ওর জিভে জল চলে এসেছে। এবং কেবিনে ঢুকেই দরজা বন্ধ করে দিল। সে যতক্ষণ ভাল করে স্নান না করবে, যতক্ষণ পরিপাটি করে না খাবে, এবং চোখ বুজে বুজে হাড় চিবোবে, ততক্ষণ সে জাহাজ ডুবে গেলেও কেবিন থেকে নড়বে না। উদ্বাস্তু জীবনের মতো ভাত-ডাল, ভেড়ার মাংস তার কাছে আবার ভীষণ মহার্ঘ হয়ে গেছে।

সে কেবিনে ঢুকেই বেল টিপল। মেস-রুম বয় এসে ওকে সেলাম জানালে বলল, পানি। মেসরুম-বয় বড় কাচের জারে জল, গ্লাস, সব সাদা লতাপাতা আঁকা দামী তোয়ালে দিয়ে ঢাকা, টিপয়ে রাখল। বয় আসার আগে লকারে সে ভেড়ার মাংস আর ভাত লুকিয়ে রেখেছে। জলটাও চেয়ে নিল। নুন সে বেশি করে ছোট্ট একটা কাচের বোতলে রেখে দিয়েছে। ও, কি যে ভাল লাগছে! সে চারপাশে ভেড়ার মাংসের ঝাল-ঝাল গন্ধ পাচ্ছে। যেন এই কেবিনে অন্য ঘ্রাণ, কারণ সকালে স্প্রে করে দিয়ে যায় দামী সুগন্ধ, সব উবে গিয়ে শুধু মাংসের ঘ্রাণ, সে শিস দিতে থাকল। স্নান করল সাবান মেখে। জলের যখন যে-রকম দরকার, হট্, কোল্ড, সে শীত না পড়া পর্যন্ত ঠান্ডা জলের ট্যাপ খুলে স্নান করে। আয়নায় ওর শরীর, ওর স্বাস্থ্য ক্রমে ভীষণ মজবুত হয়ে যাচ্ছে। আয়নার সামনে দাঁড়ানোর অদ্ভুত স্বভাব হয়ে গেছে। কারণ, সে সব খুলে হাতের মাস, পায়ের মাল বিচিত্র অঙ্গভঙ্গীতে দেখতে দেখতে ভাবে, তুমি কি ছিলে ছোটবাবু কি হয়ে গেলে! ক্রমে দৈত্যের মতো হয়ে যাচ্ছ।

কখনও কখনও এভাবে স্নান করার সময় ছোটবাবুর শরীর দেখার নেশায় পেয়ে যায়। সে খুব কম সময় খালি গায়ে থাকে আজকাল। গরমেও সে পাঞ্জাবী-পাজামা পরে থাকে। বোধহয় আর্চি জানে না, ছোটবাবু শুধু লম্বাই নয়, মজবুতও। আর্চিকে তুলে সে জোরে আছাড় মারলে গুঁড়ো হয়ে যাবে।

সে এ-সব অবশ্য বুঝতে দেয় না। তোয়ালে দিয়ে চুল, ঘাড়, পিঠ, পেট এবং জংঘার জল ধীরে ধীরে শুষে নিল। পিঠে বুকে প্রায় নীলবর্ণের বনরাজিনীলা। ধীরে ধীরে প্রায় অঙ্কুর উদগমের মতো, নরম, বিন্দু বিন্দু জলকণা শরীরে লেগে থাকলে, সুন্দরী তরুণীদের কথা মনে হয়, পৃথিবীর কোথাও, সেই রূপবতী বালিকা বড় হয়ে উঠছে। চুল শ্যাম্পু-করা তার। লতাপাতা আঁকা ফ্রক গায়ে—এবং কোথাও হয়তো পাহাড়ের চড়াইয়ে সে সবুজ উপত্যকা দেখে থমকে দাঁড়িয়েছে। কেন জানি মেয়েটার তখন একা একা এমন সবুজ শস্যক্ষেত্র দেখতে ভাল লাগছে না। মা-বাবা-ভাই-বোন সব থাকতেও মনে হচ্ছে তার কি নেই। ছোটবাবু চোখ বুজে প্রায় খেয়ে যাচ্ছিল—আর এমন সব রঙীন এক পৃথিবী, যেন ইজেলে কেউ এসে ছবি এঁকে যাচ্ছে আর ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছে। জ্যাককে সে বলতে পারে এখন, জ্যাক, মাঝে মাঝে একজন ফ্রক-পরা মেয়েকে আমার ভালবাসতে ইচ্ছে করে। তোমার করে না!

ভাত খেলেই ছোটবাবু জাহাজে সুখী মানুষ হয়ে যায়। সে আর দুঃখী রাজপুত্র থাকে না। সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে সুন্দর স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে।

সে শুয়ে শুয়ে কখনও এভাবে সুখী রাজপুত্রের মতো স্বপ্ন দেখতে ভালবাসে। জাহাজে ওঠার পর স্বপ্ন দেখলে—যা দেখত, কখনও সে হাতীতে চড়ে যাচ্ছে। একটা মরা নদী পার হয়ে যাচ্ছে। পেছনে একটা কুকুর আসছে, হাতীর সামনে কেউ বসে রয়েছে, যেমন দীর্ঘকায় তিনি, তেমনি চওড়া, তাকে নিয়ে তিনি কোথায় যেন চলে যাচ্ছেন। আবার সে দেখতে পেত, নদীর চরে অনেক উঁচুতে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে আছে, কিংবদন্তীর মতো মানুষ তিনি, কখনও

মনে হতো, আসলে তিনিই সেই মোজেস, বাইবেলে বর্ণিত মানুষ। তিনি, যতদূরে নৌকা নদীতে ভেসে যাচ্ছে, ততদূরে যেন হাত তুলে দিতে পারছেন। যত দূরে চলে যাচ্ছে নৌকা, তত হাত ওপরে উঠতে উঠতে আকাশ ছুঁয়ে দিতে চাইছে। তত গাছ-পালা, বন-উপবন, এবং নদীর বাঁক পেরিয়ে ছোটবাবু স্বপ্নে দেখত, হাতটা অনেক দূরে অনেক উঁচুতে ঝুলে আছে। জ্যাঠামশাই চিৎকার করে বলছেন, এবারে ফিরে যাও। আর আসতে হবে না। অনেকটা সারেঙ-চাচার মতো তাঁর মুখ, সেই মানুষ ছিল ওদের পরিবারের একান্ত মানুষ। স্বপ্নে সে তাঁকেও কতবার যে দেখেছে!

ভোর রাতের দিকে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখে আজও ছোটবাবুর ঘুম ভেঙে গেল। জেগে গিয়ে স্বপ্নটার মাথামুণ্ডু বুঝতে পারছে না। আর কি যেন হয়ে গেল! শরীরে এক আশ্চর্য ঘ্রাণ আছে সে এই প্রথম টের পেল। সুন্দর শরীরে এসব নির্গত ধারা, শরীরের ভেতরে জেগে থাকে সে জানত না। আশ্চর্য উষ্ণতা সারা শরীরে রিন-রিন করে বাজছিল। তারপর মনে হয়, রঙের কোমল কণিকারা প্রায় ভূমিকম্পের মতো আলোড়ন তুলে বের হয়ে এসেছে। সে পাশ ফিরে শুতে গিয়ে জংঘার পাশে এবং উরুর কাছাকাছি জাঙ্গিয়ার ভেতরে কি সব এলোমেলো ব্যাপার, প্রায় নষ্ট হয়ে যাওয়ার সামিল- সে উঠে বসে—কেমন অবোধ বালকের মতো কি করবে ভেবে পায় না। মৈত্রদাকে দেখেছে, দেখে সাহস জন্মেছে। অমিয়কে দেখেছে, দেখে বুঝতে পেরেছে সত্যিকারের পুরুষ মানুষ হয়ে গেলে এটা হয়। কিছুতেই তাকে বাধা দেওয়া যায় না। নষ্ট হয়ে যাওয়ার কিছু নেই।

কিন্তু ছোটবাবু ঠিক ঠিক মনে করতে পারছে না, কি দেখে স্বপ্নে সে প্রথম নষ্ট হয়ে গেল। যতদূর মনে করতে পারে, অস্পষ্ট কুয়াশার ভেতরে কোনো বালিকার মুখ সে দেখেছিল। সে দু'হাঁটুর ফাঁকে মাথা গুঁজে আছে। স্বপ্নটা মনে করার চেষ্টা করছে। বালিকার কথা ভাবতে তার ভাল লাগছে। এবং খুব নিবিষ্ট হলে বুঝতে পারে প্রথমে এই জাহাজ কেমন ভাঙা পালবিহীন, এবং জাহাজটা ওর পূর্ববঙ্গের বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছে। বর্ষাকাল, ধান গাছে কীট-পতঙ্গেরা উড়ছে। সে আর কাপ্তান লগি মারছেন। ঠিক গাদা-বোটের মতো অতিকায় জাহাজটাকে বর্ষার ধান-খেতের ওপর দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে যাচ্ছে। ওর মা বাঁশঝাড়ের নিচে দাঁড়িয়ে আছে। জ্যাঠিমা জ্যাঠামশাই সবাই দাঁড়িয়ে আছেন। সে সেই পালবিহীন অতিকায় জাহাজ স্বপ্নে ঠেলতে ঠেলতে একটা খালের ভেতরে নিয়ে ফেললে, দুটো একটা ধান-পোকা, সোনা-পোকা এবং বর্ষায় কীটপতঙ্গ জাহাজের গলুইয়ে উঠে আসছে। আর কি হয়েছিল তখন, একটা সোনা-পোকা ধরতে গিয়েই কি যেন হয়ে গেল, আমারে দ্যান, আমারে দ্যান সেই বালিকার মুখ। ট্যাবার পুকুরপাড়ে জঙ্গলটা পর্যন্ত স্বপ্নে সে দেখে ফেলেছে। আর কি আশ্চর্য, দু-লাফে সোনা-পোকা নিয়ে সে দৌড়াচ্ছে। সেই আমারে দ্যান, আমারে দ্যান মেয়েটাও দৌড়াচ্ছে। দৌড়াতে দৌড়াতে কি যে হয়ে যায়, দৃশ্যাবলী পাল্টে যায়, সমুদ্রের ঢালু উপত্যকায় নেমে যাচ্ছে কেবল, কেবল গড়িয়ে সেই বালিকা আর সে পড়ে যাচ্ছে, আর তখনই স্বপ্নের ভেতর থেকে ফ্রক- পরা অন্য একটা মেয়ে উঠে আসছে। সাদা সার্টিনের ফ্রক, পায়ে স্কেটিং পরে একেবারে দ্রুতগতিতে ওকে লুফে নিয়ে চলে গেল। তারপর সেই সমুদ্রে তুষার-বৃষ্টি—সমুদ্রে তুষারপাত—রিন রিন করে বাজছে। নীল বরফের উপত্যকায়, তুষারপাতের ভেতরে সাদা পোশাকে মেয়েটা অনবরত ছোটবাবুকে নিয়ে নাচছে। ছুটছে। খেলছে। প্রায় মাতালের মতো পড়তে পড়তে ঠিক সোজা দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। আবার ঘুরে ঘুরে রিন রিন বাজনার মতো ধীরে, খুব ধীরে স্কেটিং করে যাচ্ছে। কখনও লাফিয়ে বরফের পাহাড় পার হয়ে, কখনও নীল জলের হ্রদ পার হয়ে সুন্দর একটা পাইন গাছের নিচে দাঁড়িয়ে গোপনে চুমো খাচ্ছে। ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে মনে করতে পারছে ছোটবাবু, ভূমিকম্পে সেই কোমল সাদা কণিকারা লাভার মতো ছুটতে ছুটতে বের হয়ে এসেছে।

কিন্তু ছোটবাবু বুঝতে পারছে না, সাদা সার্টিনের ফ্রক-পরা মেয়েটিকে কোথায় সে দেখেছে। চেনা, চেনা, খুবই চেনা মুখটা অথচ মেলাতে পারছে না। তারপরই সে ভয়ে গুটিয়ে গেল—সেই মেয়ে, সে মনে করতে পারছে, স্বপ্নে সেই মেয়ে সার্টিনের ফ্রক গায়ে পাইনের

নিচে তাকে নষ্ট করে দিল। আর মনে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুন্দর স্বপ্নটা তার কাছে ভীষণ দুঃস্বপ্ন হয়ে গেল। সে মুখ ব্যাজার করে উঠে গেল বাথরুমে। বাথরুম থেকে পোশাক পাল্টে, পোর্ট-হোল খুলে দিল।

তখনই সেই ভয়ঙ্কর ঘটনা জাহাজে ঘটে গেছে। ছোটবাবু টেরও পায়নি। জ্যাক এসে ছোটবাবুর দরজায় মাথা কুটছে প্রায়।—শিগগির ছোটবাবু। শিগগির উপরে এস। সব আমাদের শেষ হয়ে গেল।

ছোটবাবু পাগলের মতো ছুটে গেল দরজায়। তারপর দরজা খুলে দিলে শুনল, জ্যাক বলছে, মিসেস স্প্যারো ডেড। আর কিছু বলতে পারছে না। চোখ প্রায় স্থির। ছোটবাবুকে অবাক হয়ে দেখছে। ছোটবাবুর শরীরে নতুন ঘ্রাণ। আর সঙ্গে সঙ্গে চোখের ওপর থেকে সমস্ত কুয়াশা সরে যাবার মতো চেঁচিয়ে বলে উঠল, মিসেস স্প্যারো ডেড। তারপর কেমন ধীরে ধীরে বলে গেল জ্যাক, লেডি এ্যালবাট্রস ছোঁ মেরে তুলে নিল, আমরা কিছু করতে পারলাম না ছোটবাবু। সে বালকেডে হেলান দিয়ে মৃতপ্রায় দাঁড়িয়ে থাকল। আর কিছু বলতে পারছে না।

॥ তেইশ ॥

সেই এক দৃশ্য—চারদিকে যতদূর চোখ যায় শুধু জল, নীল জলরাশি। ঠাণ্ডা বাতাস ক্রমে সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে উত্তপ্ত হয়ে উঠবে। সমুদ্রে ছোট ছোট ঢেউ। বৃত্তের মতো ঘুরে ঘুরে ডুবে যাচ্ছে তারা। বেশি উঁচুতে উঠতে না পারলে, নিজের সামান্য বৃত্তে নিজেরা হারিয়ে যায়। আর কিছু থাকে না, আদিগন্ত শুধু সমুদ্রের এই জল নিয়ে খেলা।

সিউল-ব্যাঙ্ক আপন গতিতে তেমনি চলছে। মনেই হবে না, জাহাজে কোন দুর্ঘটনা ঘটেছে। মনে হবে না সেকেণ্ড মেট ডেবিড এখন বোট ডেকে হামাগুড়ি দিচ্ছে—হাতে বন্দুক, হামাগুড়ি দিয়ে ঠিক বোটের আড়ালে মরা সাপের মতো পড়ে রয়েছে। এ্যালবাট্রস পাখি দুটো এদিকে এলেই গুলি করে নামাবে।

তার পাশে আরও দুজন—জ্যাক আর ছোটবাবু। ছোটবাবুর সাতটায় কাজে নেমে যেতে হবে। কিন্তু সেই পাখি দুটোর জন্য ভেতরে ভীষণ একটা দুঃখ। মুখ ভার। পুরুষ চড় ইটা ভয়ে ফুলে ঢোল হয়ে গেছে। ওদের পায়ে পায়ে ঘুরছে। এবং জ্যাকের প্রায় কান্না পাচ্ছিল। ওরা এখনও কিছু করতে পারছে না। সেই থেকে ওরা নানাভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে, গুলিতে ফেলে দিতে। ডেকের ওপর মাংস ফেলে রেখেছে, যদি লোভে উড়ে আসে। কিন্তু সেই যে চড়ুইটাকে তুলে নিয়ে গেল আর এল না। অনেক দূরে পাখি দুটো উড়ে উড়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে জলে আর্শিতে রোদ পড়ার মতো চোখ ভীষণ ঝলসে দিচ্ছে। পাখি দুটোকে তখন আর দেখাই যাচ্ছে না। চোখ ঝাপসা হয়ে উঠছে।

এভাবে ডেবিডের রাগ বেড়ে যাচ্ছে—যেন ক্রমে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এভাবে বেড়ে যায়। পাখি দুটোর চাতুর্যের কাছে সে হেরে যাচ্ছে। ওর ভেতরে ক্রমে প্রতিশোধস্পৃহা এভাবে বেড়ে গেলে সে স্থির থাকতে পারছে না। পাখি দুটো সামান্য কাছে এলেই পর পর গুলি ছুঁড়ে যাচ্ছে। এসব ছেলেমানুষী—কাপ্তান ভেবে পান না, ডেবিড অথবা জ্যাক, জ্যাকের তবু মানে আছে, জ্যাক ছোটবাবু পাখি দুটোর জন্য অনেক করেছিল, আর বয়স কম বলে সবকিছুর জন্য তাদের মায়া, মিসেস স্প্যারোর জন্য জ্যাক ফুঁপিয়ে কেঁদেছে পর্যন্ত। ছোটবাবু আবার বুঝি বিষণ্ণ হয়ে গেল—ছোটবাবুকে দেখলেই বোঝা যায় মুখ থমথম করছে ছোটবাবুর।

তারপরই কাপ্তান মনে করতে পারলেন আসলে ডেবিডকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছিল ম্যান অ্যালবাট্রসটা। ডেবিড সুযোগ বুঝে বন্দুক নিয়ে বোট-ডেকে ঠিক বোটের নিচে, কিছুটা আত্মরক্ষার মতো, কারণ ছোঁ মারলেই যেন মাংস খুবলে না নিতে পারে—বলা তো যায় না, ডেবিডের হাতের বন্দুক ওদের ভয় পাইয়ে দিয়েছে, যে কোন মুহূর্তে সাঁ-সাঁ করে নেমে এসে পিঠের মাংস তুলে নিতে পারে। বোটের নিচে আছে তারা। বোটের নিচে শুয়ে নির্ভয়ে বন্দুক চালাতে পারবে ডেবিড।

ডেবিড সামান্য সুযোগটুকুও দিচ্ছে না। দেখলে মনে হবে, বোটের নিচে ওরা তিনজন পাশাপাশি শুয়ে। মুখ সমুদ্রের দিকে, পা পেছনের দিকে। কোথায় পাখি! পাখি দুটো দূর-সমুদ্রে ডুবে ডুবে স্নান করছে। ব্রিজে দাঁড়িয়ে পাখি এবং মানুষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখছে চিফ-অফিসার, কাপ্তান, রেডিও-অফিসার। জ্যাক মাঝে মাঝে বের হয়ে দেখছে কোথায় গেল। যেন মরণপণ লড়াই—এবং কাপ্তান, চিফ-অফিসার বেশ মজা পাচ্ছিলেন। জ্যাক মাঝে মাঝে মাংকি আয়ল্যাণ্ডে উঠে গেছে—কতদূরে আছে ওরা—আবার জ্যাক চিৎকার করে উঠল, আসছে ডেবিড, রেডি। আসছে। বাবা, ঐ দ্যাখো কেমন বেগে ধেয়ে আসছে। কি লম্বা ডানা, কি বিরাট আকারের পাখি দুটো ঠিক জাহাজের ওপরে এসে গেল। কোথায় ডেবিড আর তার বন্দুক, যেন ডেবিডকে নিয়ে মজা করছে, কিছুতেই বন্দুকের পাল্লায় পাখি দুটোকে পাওয়া গেল না। অথচ এমনভাবে নেমে আসছিল, যেন একেবারে কাছে এসে সাঁ করে ওপরে নাচতে নাচতে উঠে গেল। পাখা কাঁপল তির-তির করে। উড়তে উড়তে ঘাড় কাত করে দেখল নিচের সিউল-ব্যাংক জাহাজটাকে আর তার মানুষগুলোকে। এবং ঠিক ছোঁ মেরে ডেকের ওপর

থেকে মাংসের টুকরো নিয়ে গেল। চোখের নিমেষে ঘটে গেল। বন্দুকের নল ঘোরাবার সময় থাকল না, এত দ্রুত আর এমন ত্বরিতে ওরা উড়ে গেল। বোকার মতো বসে থাকল ডেবিড।

ছোটবাবু চুপচাপ নেমে গেল এনজিন-রুমে। সে একবার ভেবেছিল বাকসোটার কাছে গিয়ে বসবে। ডিমগুলো নষ্ট হয়ে যাবে, এবং পুরুষ-চড়াইটাকে সে নিচে এনজিন-রুমে তাড়িয়ে নিয়ে এল। তারপর ওর মনে হল, কশপের কাছ থেকে স্প্যানার তেলজুট হাতুড়ি সব নিয়ে ওপরে উঠে গেলেও সারাদিন সে কাজ করতে পারবে না। সব সময় চোখ লেডি-এ্যালবাট্রস, তার উড়ে যাওয়া, তার গতিবিধি লক্ষ্য রাখাই কাজ হয়ে পড়বে। অথচ দিন যত যাচ্ছে, কাজ বাড়ছে। রেলিং ভেঙে পড়ছে, সিঁড়ি খসে পড়ছে। কার্পেন্টার এবং সে মিলে সে-সবও মেরামত করছে। কেবল জাহাজে ভেঙে পড়ার খবর। এবং মেন-জেনারেটার ক'দিন থেকে গণ্ডগোল করছে। সকালে তেমনি খবর গেছে, যেমন প্রতিদিন রেডিও-অফিসার খবর পাঠায় এরিয়া-স্টেশনকে—সিপ এস এস সিউল-ব্যাংক, বাউণ্ড ফর নিউ প্লাইমাউথ। হল্ট একদিনের জন্য তাহিতিতে। পনের হাজার টনের জাহাজ সিউল-ব্যাংক। ভাঙ্গা পুরোনো, স্পেয়ার পার্টসের একটা লিস্ট বেতার সংকেতে পাঠানো হচ্ছে। খাবার, জল, সব এভাবে যখন বেতার-সংকেতে দিকে দিকে ইথারে ভেসে চলেছে তখন এ্যালবাট্রস পাখি দুটোও ভেসে আসছে কেবল জাহাজের পেছনে। উড়ে উড়ে আসছে।

যে যখন সময় পেয়েছে বোট-ডেকে পাহারায় থেকেছে—কখন কাছাকাছি দেখা যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সন্ধ্যা হলে সবাই দেখল, সমুদ্রে অন্ধকার নেমে আসছে। কিছু দেখা যাচ্ছে না।

গভীর অন্ধকারে সমুদ্রটা একেবারে টুপ করে ডুবে গেল। চারপাশে কিছু দেখা যাচ্ছে না। কেবল আকাশের নক্ষত্রমালা বাদে তাদের দেখবার কিছু থাকে না। সারাটা দিন একটা ভয়ঙ্কর উত্তেজনার ভেতর গেছে! পাখিদের স্বভাব সম্পর্কে কথাবার্তা, কে কোথায় কবে কত বড় এ্যালবাট্রস দেখেছে তার গল্প। এত বড় এ্যালবাট্রস তারা এই প্রথম দেখেছে এটা প্রায় একবাক্যে স্বীকার করছে সবাই। যারা প্রাচীন নাবিক, যাদের সফর বিশ-বাইশ-চব্বিশ, তারাও এত বড় এ্যালবাট্রস কোনো সমুদ্রে কখনও দেখেছে বলতে পারল না।

কাঠের বাকসোটা হাঁ করে পড়ে আছে। কাল হয়তো সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হবে। ডেক-জাহাজিরা জল মারার সময়, বাকসোটা রাখা অকারণ ভেবে ফেলে দিতে পারে। সন্ধ্যার সময় ডেবিড, ছোটবাবু পুরুষ পাখিটাকে খুঁজছে, পায়নি। ওটা যে কোথায় গেল! কখন ওটাকেও হয়তো ধরে নিয়ে গেছে। কেউ টের পায়নি। এসব ভাবলেই ছোটবাবুর কিছু ভাল লাগে না। দেশে ফিরে যেতে ইচ্ছে করে। কবে জাহাজ দেশে ফিরবে কেউ বলতে পারে না।

এবং এখন জাহাজের ফোকসালে অথবা কেবিনে সেই এক খবর। জাহাজটা স্ক্র্যাপ করার অর্ডার না আসা পর্যন্ত এভাবে উত্তেজনা প্রবল জাহাজে। যদিও সবাই জানে, এত পুরানো জাহাজ সমুদ্রে চলে না। এবং দু-দুবার স্ক্র্যাপ করার অর্ডার হয়েছিল। স্ক্র্যাপ করা হলে সিউল-ব্যাঙ্ক বলে একটা জাহাজ আছে, সমুদ্রে বিচরণ করছে, কখনও ছোটবাবু অথবা নতুন জাহাজিরা জানতেই পারত না।

অথচ কি আশ্চর্য সেই পঁয়তাল্লিশে একবার, আটচল্লিশে একবার, সব ঠিকঠাক, জাহাজ আর চলছে না, জাহাজ পুরোনো লোহা লক্কড়ের দামে বিক্রি করে দেওয়া হচ্ছে। অথচ কি এক অজ্ঞাত কারণে সব ভেস্তে গেল। কি এক অজ্ঞাত অদৃশ্য শক্তি জাহাজটাকে আবার সমুদ্রে ভাসিয়ে আনে। বন্দরে বন্দরে যায়, খরচ বাড়ে, কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিরা মুখ বুজে খরচের বহর সয়ে যাচ্ছে। তবু সিউল- ব্যাঙ্কের নাম ভাগাড়ে তুলে দিতে পারছে না।

এটা আবার সংস্কারবশেও হতে পারে, যদিও কোম্পানীর প্রথম জাহাজ এটা না, তবু এর আসার সঙ্গে সঙ্গে কোম্পানীর দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি প্রায় লক্ষ্মীর মতো, বড় পয়মন্ত এই সিউল-ব্যাঙ্ক। এবং যখন সারা পৃথিবী চষে কার্ডিফের রাউদ এনজিনিয়ারিং ডকে ফিরে যেত, কোম্পানীর কর্তাব্যক্তিরা ছুটে আসত, সিউল-ব্যাঙ্কের হাল তবিয়ত দেখতে। জাহাজটা ড্রাই-

ডক করা হচ্ছে, অতিকায় জাহাজ নয়, মাঝারি জহাজ, তবু যখন হেঁটে যেত কর্তাব্যক্তিরা মনে হত সিউল-ব্যাঙ্ক অতিকায় জাহাজ হয়ে যাচ্ছে। রণক্লান্ত অশ্বের মতো দাঁড়িয়ে আছে। যেন ওরা মাঝে মাঝে দেখে ফেলত, অতিকায় সেই অশ্বের চোখে মুখে ক্লান্তি, চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছে, মুখ দিয়ে লালা গড়াচ্ছে। এমন সব আধিভৌতিক দৃশ্য দেখে ফেললে তারা আর জাহাজটা স্ক্র্যাপ করার কথা ভাবতে পারত না। জাহাজটা সম্পর্কে সবার কেমন মায়া গড়ে উড়েছিল। তারপরে ড্রাই-ডকে, ফের যুদ্ধের দামামা বেজে ওঠার মতো, সব বড় বড় অক্সিজেন সিলেণ্ডার নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যুদ্ধের সাজে তৈরি করা হচ্ছে যেন যত খরচ লাগুক, অর্থাৎ এ যা খরচ হচ্ছে, তাতে আর একটা নতুন জাহাজ কেনা যেতে পারে, তবু খরচের বহরে কোম্পানী ভয় পায় না। কিন্তু হলে কি হবে কোম্পানী তো সব না, মেরিন বোর্ডের সার্ভেয়ার এসে শেষপর্যন্ত রায় দিলে, অচল জাহাজ সুতরাং আর এ চলবে না। তারপরই সেই এক দুর্ঘটনা, কোথায় বজ্রাঘাতে মৃত্যু, কেউ রাস্তায় যেতে যেতে দু-বার কি দেখে আঁৎকে উঠলে, কথা বলতে পারল না, ঘরে ফিরে যেতে পারল না, মৃত্যু। এবং এভাবে যখন সিউল-ব্যাঙ্ক জাহাজকে কেন্দ্র করে নানাভাবে সংস্কার গড়ে উঠেছিল, তখন উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সাল শেষ হচ্ছে। কোম্পানীর নতুন চেয়ারম্যান নিযুক্ত হলেন স্যার ম্যাথিউ দি সেকেণ্ড। পূর্বতন চেয়ারম্যান স্যার ম্যাথিউ ফেলের রহস্যজনক মৃত্যুর পরই তিনি যোগদান করলেন। তাঁর পুরো নাম রিচার্ড ফেল। বয়সে নবীন! লম্বা, ওয়েলসের লোক। স্বাভাবিকভাবে উজ্জ্বল স্বভাবের মানুষ। বাবার মৃত্যুর সঙ্গে সিউল-ব্যাঙ্ক জাহাজের স্ক্র্যাপ করার আদেশ পত্রের সঙ্গে কোনও সংযোগ রয়েছে বিশ্বাস করতে পারলেন না। তিনি এসেই এস এস সিউল-ব্যাঙ্কের নিজস্ব লাভ-লোকসানের একটা হিসাব চেয়ে বসলেন।

আশ্চর্য হিসেবটা ঘুরেফিরে হাতে আসতে তার দু'বছরের ওপর লেগে গেছিল। সংক্রামক ব্যাধির মতো ভয়। কোন অমঙ্গলের প্রতীক ভেবে সবাই সিউল-ব্যাঙ্কের কাজকর্মে এলেই কেমন ঢিলেঢালা ভাব দেখাত। মুখে কিছু বলতে সাহস পেত না। নতুন চেয়ারম্যান কেন এসব চাইছেন—বোর্ডের মেম্বারদের বছরে কত কড়ি গুনতে হচ্ছে জাহাজটার জন্য এবং জেটিতে ফেলে রাখার দরুন বন্দর কর্তৃপক্ষকে কত দিতে হয়েছে, অথবা জাহাজ চলতে চলতে ক'জন কাপ্তান কতবার অসুস্থ হয়ে ফিরে এসেছেন, কতবার কম্পাস রিডিং-এ ভুল হওয়ার দরুন কত হাজার হাজার মাইল জাহাজটা কাপ্তানকে নিশি-পাওয়া মানুষের মতো সমুদ্রে ঘুরিয়ে মেরেছে তার হিসাব এবং হিগনস্‌ই ছিলেন একমাত্র কাপ্তান যাঁর কাছে সিউল-ব্যাঙ্ক একেবারে শান্তশিষ্ট মেয়েটির মতো—হিগিনিস্ জাহাজ থেকে নেমে দু'মাস ও অবসর নিতে পারতেন না, আবার ডাক পড়ত। আর একজন ছিলেন ফোর্ড। বছর তিন আগে তিনি সমুদ্রেই মারা গেলেন।

স্যার ম্যাথিউ দি সেকেণ্ড যেহেতু কোম্পানীর অধিকাংশ শেয়ারের অংশীদার, স্ক্র্যাপ করার আগে একবার জাহাজটাকে দেখে যাবেন ভেবেছিলেন। দুদিন বাদে এ্যানুয়েল জেনারেল মিটিং। সব প্রস্তাব টাইপ হয়ে পড়ে আছে। তার ভেতর সিউল-ব্যাঙ্কের স্ক্র্যাপ করার প্রস্তাব। তিনি চেম্বারে বসে সইসাবুদ করতে করতে হঠাৎ কি ভাবলেন, জাহাজটা কতদিনের জাহাজ, তাঁর বাবার আমলের জাহাজ, বাবা জাহাজটার কিছু কিছু ইতিহাস বলে গেছিলেন, বিশেষ করে সেই লুকেনার ব্যক্তিটি, তাঁর মৃত্যু, আত্মহত্যা, এক জার্মান কাউণ্ট পরিবারের মানুষ ছিলেন লুকেনার, এসব কথা বলতে বলতে হঠাৎ বলে ফেলেছিলেন, আমার মনে হয় রিচার্ড, লুকেনারের মৃত্যুর এতদিন পরেও তাঁর প্রভাব রয়ে গেছে। রিচার্ড হয়তো হেসেই ফেলত। কিন্তু তাঁর বাবাকে তিনি জানেন। খুব গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, হবে হয়তো।

সুতরাং এসব ঘটনা যতটা ডেবিড জানে অথবা চিফ-অফিসার, আর কেউ তেমন জানে না। কাপ্তান বিশ্বস্ত মানুষ হিসেবে চিফ-মেটকে কথাপ্রসঙ্গে বলতেন। চিফ-মেটও কথাপ্রসঙ্গে বলত ডেবিডকে। ডেবিড কাউকে বলত না। কিন্তু জাহাজটাতে এ-দুটো এ্যালবাট্রস আসার পরই কেবিনে জটলা হচ্ছিল। একটু যে পানীয় না খাওয়া হচ্ছে তাও নয়। ডেবিডের কেবিনে ছোটবাবু বসে রয়েছে। ডেবিডের কেবিনে ওর ফ্যামিলির একটা গ্রুপ ফটো আছে। এবং সবার নাম ছোটবাবু জানে। বড় ছেলেটি ডেবিডের প্রায় ছোটবাবুর বয়সীই হবে। কতক্ষণ আর

চুপচাপ থাকা যায়। মিঃ স্প্যারো, মিসেস স্প্যারো না থাকায় জাহাজটা আবার একঘেয়ে লাগছে। ওদের দিন, আর কাটছে না যেন। জাহাজ কবে যাবে, কবে কখন হোমে সবাই ফিরবে এই নিয়ে কথাবার্তার সময় ডেবিড উঠে দাঁড়াল। এটা ডেবিডের স্বভাব, একটু উত্তেজিত হয়ে পড়লেই—সে দাঁড়িয়ে যায়। এবং পায়চারি করতে থাকে। তারপর যা হয়ে থাকে—গল্প বলার মতো বলা, আমরা আর ফিরব কিনা জানি না ছোটবাবু। আসলে জাহাজটা স্ক্র্যাপ না হলে বোধহয় ফিরতে পারছি না।

—তার মানে?

–সে অনেক কথা। কাপ্তান খুব সেয়ানা।

—কবে হবে স্ক্র্যাপ?

—কেউ বলতে পারে না।

—আমাদের কি হবে?

—এভাবে চলবে জাহাজ। আমরা সমুদ্রে ভেসে বেড়াব।

—ইয়ার্কি। জাহাজিরা সবাই বিদ্রোহ করবে না?

—তুমি জাহাজি নও। তোমার তো আর ওদের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। ওরা বিদ্রোহ করলে, ওদের নামিয়ে দেবে। কিন্তু তোমার কি হবে?

—ওদের নামিয়ে দিলে জাহাজ চলবে না। আমরাও ফিরে যাব।

—কলকাতা থেকে কোম্পানী উড়োজাহাজে ক্রু পাঠিয়ে দেবে।

—এত খরচা করবে!

—তাছাড়া কি। জাহাজটাকে এখন ওরা চাইছে যতদিন ইচ্ছে দক্ষিণ সমুদ্রে ঘুরে বেড়াক —বন্দর ধরবে না?

–এই ধরবে। বড় বড় বন্দরে আর পাঠাবে না।

—তার মানে?

—মনে হচ্ছে বড় বন্দরের নিয়মকানুন অনেক! হয়তো দেখা যাবে, ভাঙা জাহাজ দেখে ওরা আঁৎকে উঠছে। কার পারমিশানে জাহাজটা চলছে। বলেই একটু থামল। পাইপের ধোঁয়া দেখল, মাথা চুলকাল। লকার খুলে দুটো ছবি বের করে দেখল। দুটোই বড় হাঙ্গরের ছবি। ছবি দেখলেই বোঝা যায় ডেবিডের ফটোগ্রাফিতে হাত ভাল। ডেবিড ছবি দুটো একটু কাত করে দেখল, বলল, এই হচ্ছে আমাদের কর্তৃপক্ষ বুঝলে। হাঙ্গরের মুখ থেকে পালানো খুব কঠিন।

এমন একটা পরিবেশ কথাবার্তায় গড়ে তুলছে ডেবিড, যে ছোটবাবু কেমন হতাশ হয়ে গেছে। ভাঙা জাহাজ, জাহাজ চালানোর খরচ এত বেশি যে বছর বছর লাখ লাখ টাকা ক্ষতি স্বীকার করেও কেন যে জাহাজটাকে এভাবে দক্ষিণ সমুদ্রে ঠেলে দেওয়া, ভাঙ্গো তো, ভেঙ্গে ফেল, নতুন জাহাজ কেন, আমরা দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করে যাব। এত মেরামত জাহাজে থাকলে অবসর কখন, এখন তো কোনও কোনও দিন সন্ধ্যে সাতটা পর্যন্ত একনাগাড়ে কাজ।

অথবা এই যে দক্ষিণ সমুদ্রে জাহাজটা ভাসিয়ে দেওয়া হল, এবং কবে ফিরবে, কাপ্তান হিগিন্‌স নিশ্চয় জানেন, কবে ফিরে যেতে পারছেন, একবার জ্যাককে বলতে হবে, আমরা দেশে কবে পর্যন্ত ফিরতে পারব জ্যাক, অথবা এও হতে পারে, কেউ জানে না কবে ফিরবে। সবটাই এখন এই সিউল- ব্যাঙ্কের মর্জির ওপর।

তখনই বালকেডে হেলান দিয়ে ডেবিড অনেকক্ষণ ছোটবাবুকে দেখল। ছোটবাবু পাশের ব্যাঙ্কে সামান্য কাৎ হয়ে শুয়ে আছে। যত শুনছে তত সে বিমর্ষ হয়ে যাচ্ছে।

ডেবিড এবার কাছে এসে প্রায় হাঁটু গেড়ে বসল ছোটবাবুর পাশে। বলল, খুব ফিসফিস

গলায়- আসলে বুঝলে কতৃপক্ষ জাহাজটাকে ভয় পায়। ভীষণ ভয় পায়। কিছুতেই বে-অফ-বিসকে পার হতে দেবে না। জাহাজটাকে ইংলিশ চ্যানেলে ঢুকতে দেবে না। যেন জাহাজ ইংলিশ চ্যানেলে ঢুকছে শুনলেই ওদের জ্বর আসতে থাকে।

ছোটবাবুর ভয়ে বোধহয় জ্বর আসছিল। আবার মনে হচ্ছিল, আসলে, জাহাজের সফর যত দীর্ঘ হবে, তত এভাবে জাহাজ সম্পর্কে নিন্দাবাদ চলবে। এটা বোধহয় তারই সূত্রপাত। সে, এসব জানে মৈত্রদার কাছ থেকে। জাহাজ তখন প্রতিদিন অসহ্য ঠেকবে। ডেবিডের প্রায় ন'মাস হতে চলেছে। সে এবং আরও দু-একজন অফিসার এ-জহাজে বেশি সফর দিয়েছে। সুতরাং এভাবে এখন থেকেই হয়তো ডেবিড ঘোঁট পাকাতে শুরু করেছে। সবার মনে একটা বদ্ধমূল ধারণা সৃষ্টি করে দেওয়া, জাহাজ নিরুদ্দেশে ভেসে চলেছে। কাপ্তানও ঠিক জানেন না, কোথায় যাবে। সালফার বোঝাই হয়ে আপাতত নিউ-প্লাইমাউথ যাচ্ছে, কিন্তু তারপর। তারপর বললে, তিনি বলবেন, তারপর জাহাজ ফিজিতে। অস্ট্রেলিয়ায় নয় কেন? মেলবোর্ণ, সিডনিতে নয় কেন, নয় এজন্য, এসব বড় বন্দর এমন লক্কড়-মার্কা জাহাজ ঢুকতে দেখলেই ধেয়ে মারতে আসবে বন্দর-কর্তৃপক্ষ

—যদি ফিজি না যায়, তবে নিউগিনি, অথবা কিংস আয়ল্যাণ্ড, টোংগা। দরকার হয় ফের উঠে যাবে হাওয়াই। হনলুলুতে কিছুদিন। সামোয়াতে ফেলে রাখা চলে কিছুদিন। কিছু একটা কার্গো পেলেই হল। মাটি, মাটিই সই। এই যে সমুদ্র দেখছ, এ-সমুদ্রেই আমাদের এখন ঘুরে মরতে হবে। একটু থেমে ডেবিড বলল, এর পর কাজ কি হবে জান?

—কি?

—মাটি টানবে জাহাজ। আমি তোমাকে বলে দিলাম, মাটি টানা বাদে এ-জাহাজে আর কেউ কোন কার্গো দিতে সাহস পাবে না।

ছোটবাবুর বেশ মজা লাগছিল এমন সব কথা শুনতে। সে এ-জন্যেই এত সহজে এমন একটা দামী কাজ পেয়ে গেছে। জাহাজে এজন্য কেউ আসতে চায় না। একটু ভয় পেলেই বাড়িয়ে ভয়কে সাত কাহন করে ফেলে। তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে নেমে যায়। দরকার হলে ছোটবাবুও খোঁড়াতে থাকবে। যখন মনোটনিতে আত্মহত্যার প্রবণতা জাগবে, তখনই বুঝতে হবে, যত সত্বর সম্ভব, কিছু একটা অজুহাত দেখিয়ে নেমে যাওয়া ভাল।

ডেবিড ফিসফিস গলায় বলল, কাপ্তান হিগিনস্ আখের গোছাচ্ছে, বুঝলে!

ছোটবাবু অতসব বুঝতে পারে না। সে চুপচাপ শুনে যায়। চুপচাপ বসে থাকে! সে তো সবই কেমন নতুন শুনছে। এখন মনে হয় জাহাজে এটাই শেষ সফর তাঁর।—বুঝলে ছোটবাবু যত বেশি এখন তিনি থাকতে পারেন, তাই চেষ্টা করছেন। কোম্পানীর এমন একটা ভাঙ্গা জাহাজকে নিয়ে দক্ষিণ সমুদ্রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, আসলে ওর বলার ইচ্ছে ছিল, মতিচ্ছন্ন জাহাজ। পাগলা জাহাজ, না ঠিক পাগলা নয়, দুরন্ত দামাল, কিংবা সেই বেশি বয়সে শিশু সরল হয়ে যাবার মতো, লজেনচুস দিয়ে ভুলিয়ে রাখার মতো। হিগিনস এখন মাটি-ফাটি যা পাবেন ভরে নিয়ে সিউল-ব্যাঙ্ককে কার্গো দেবেন। লজেনচুস খাওয়াবেন। কর্তৃপক্ষ ভীষণ খুশি, গেলেই ঠিক বোর্ডের সদস্য করে নেবে। এডভাইস দাও, সুখে থাকো, গাড়ি চড়ো। হিগিনস এমনি এমনি করছে ভেবো না।

ছোটবাবু বলল, ডেবিড, আমার কিন্তু অন্যরকম মনে হয়।

ডেবিড কিছুই শুনতে চায় না। সেই সকাল থেকেই সে উত্তেজিত হয়ে আছে। সারাদিন কতভাবে চেষ্টা করেছে একটা পাখিকে অন্তত নামিয়ে আনা যায় কিনা, পারেনি। সে তারপর কি করেছে কে জানে। একটু রাত হলেই ছোটবাবুকে ডেকে এনেছে। সামান্য মদ দিয়েছে খেতে। সে নিজেও খাচ্ছে। চুক-চুক শব্দ হচ্ছে। এখন বেশ ছোটবাবু মজা পায়। ডাকলে সে না করতে পারে না। কিন্তু সে দু-চারদিন খেয়ে নিজের হিম্মত কতটুকু ধরে ফেলেছে। ডেবিড আর তাঁকে মাতাল বানিয়ে জব্দ করতে পারে না।

ছোটবাবু বলল, তুমি কিচ্ছু না শুনতে চাইলে আমি কি করব?

—কি শুনব? কি বলবে তুমি?

—এই বলছিলাম, কাপ্তান জাহাজটাকে ভালবাসে।

—হেল। কি যে বল না। জাহাজকে আবার ভালবাসাবাসি কি। আগলি। ননসেন্স। সব পরার্থ ভেবে করা নয় হে। সব স্বার্থে করা। আখের। আখের। বলেই আবার নুয়ে বলল, প্লিজ তুমি কিন্তু জ্যাককে কিছু বলবে না। বলে মদের গ্লাসটা ছুঁয়ে বলল, না। বলবে না, প্রমিস্ কেমন?

ডেবিড খুব গোপনে যেন বলছে, সে দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দিল, কি জানি কেউ যদি দেয়ালে কান পেতে রাখে। কে কিভাবে কাপ্তানের কাছে শেষপর্যন্ত লাগাবে আর কাপ্তান চোখ লাল করে ওকে দেখবেন তখন, ভয়ে তো বুক শুকিয়ে যাবে—সেই সব কারণে দরজাটা ভাল করে লক্ করে বলল, তোমাকে বলে দিলাম, জাহাজ মাটি টানার কাজ নেবে। জাহাজ ফিজি, নেরু, ওসেনিক, কাকাতিয়া আয়ল্যাণ্ডে যাচ্ছে। মাটি এনে অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে ঢেলে দেবে। এই কাজ হবে আমাদের। সব দ্বীপ, সব আদিবাসী দ্বীপের...বলেই সে গ্লাস নিয়ে কেমন ফ্রিজ হয়ে গেল।—ছোটবাবু, তোমার মুখ এত উজ্জ্বল দেখাচ্ছে কেন!

—দ্বীপ। দ্বীপে নেমে যাব।

—ছোটবাবু বুঝবে না, কষ্ট বুঝবে না। ভাল না। দ্বীপ ভাল না।

ডেবিড বুঝতে পারল, কথা সামান্য জড়াচ্ছে। ওটা ঠিক না। জাহাজ চালু অবস্থায় এটা ঠিক না। ওর বারোটা-চারটা ওয়াচ। এখন ওর খেয়েদেয়ে ঘুমানো দরকার। আসলে মনের কোণে এই যে গ্রুপ- ফটো দেয়ালে রয়েছে, তাদের জন্য সে পাগল হয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রে ঘুরে ঘুরে দেশে ফেরার জন্য মন ভীষণ আকুল হয়ে উঠেছে। সে এখন সেই ছোট্ট শিশুর মুখ, হাত নাড়া, সুন্দর হাসি, মনে করতে পারলেই পাগল হয়ে যায়। তখন সে আর দেশে ফিরতে পারবে না ভেবে ভীত হয়ে পড়ে। এবং সে বোধহয় টের পাচ্ছে, জাহাজ কোথায় যাচ্ছে। যেমন অন্যান্যবার করে থাকে, এবারেও তেমনি। ব্রিটিশ ফসফেট কোম্পানী সেই সব দূরবর্তী ভাসমান দ্বীপমালা সব, ইজারা নিয়ে বসে রয়েছে। মাটি তুলে নাও। খোলে ভর্তি করে মাটি চালান করার এমন অল্প পয়সায় আর ক'টা জাহাজ ভাড়া পাওয়া যায়। খবর রটে যায়, আসছে, আসছে—সেই প্রাচীন কালের আদিম রহস্যময় জাহাজটি মাস্তুলে লম্ফ জ্বালিয়ে অন্ধকার রাত্রির বুকে, সমুদ্রের ঢেউ ফালা ফালা করে চলে আসছে। মাটি কাটার কাজ তখন দ্বীপে বেড়ে যায়। উদ্দাম উন্মত্ত নৃত্যমালা। দ্বীপের অধিবাসীদের তখন মশাল জ্বেলে সারা রাত নৃত্যমালা—মেজ-মালোম ডেবিড এখন থেকেই বুঝি দেখতে পাচ্ছে সব। ডেবিড ভয়ে কেমন গুটিয়ে আসছে। সেই দ্বীপগুলোতে ডেবিড অনেকবার গেছে। পাঁচবার সাতবার। সেখানে জাহাজ যাবে ভাবতেই ডেবিড ভীষণ চঞ্চল হয়ে উঠছে।

ছোটবাবু বলল, দ্বীপগুলো খুব বড়!

—আরে না। কোনোটা এক মাইল, দু'মাইল, পাঁচমাইল তার বেশি না।

ডেবিড ফের বলল, কিভাবে যে ওরা থাকে! ভয় পায় না। দ্বীপটা যদি ডুবে যায়। কি যে মজা হয় না! তারপরই কেমন প্রাণ পেয়ে গেল ডেবিড, যখনই রাতের জ্যোৎস্নায় হেঁটে বেড়াবে, মনে হবে সমুদ্র থেকে কারা স্নান করে ফিরছে। সুন্দরী মেয়েরা জ্যোৎস্নায় যখন সমুদ্র থেকে স্নান করে ফিরে যায়, চুলের ডগা বেয়ে টপ্‌প্ জল ঝরতে থাকে, এবং মনে হবে যেন ওরা সমুদ্রে নোনাজলের তলায় এতক্ষণ কি খুঁজে এসেছে, আসলে জানো ওরা পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে মুক্তো খুঁজতে যায়। এবং শরীরে কোন পোশাক থাকে না ছোটবাবু। গাছপালার ভেতর লুকিয়ে দেখতে কি যে ভাল লাগে না!

—দেখে ফেললে?

—দেখব কেন। দালাল থাকে। দেখানোর বদলে পয়সা নেয়। রাজার জন্য ওরা মুক্তো খুঁজে আনে। কেবল অন্যমনস্কভাবে বলে গেল—আরে বুঝলে না, আমাদেরই ইজারা নেওয়া জায়গা। এখানে ছোটবাবু বুঝল, আমাদের বলতে ডেবিড বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের কথা বলতে চেয়েছে।—স্বজাতি আমার ভীষণ বুদ্ধিমান তো। দেশীয় নিয়মকানুন ঘাটায় না। যা আছে থাক, রাজার নিয়ম-কানুন মেনে চলার অভ্যাস ওদের হয়ে গেছে। আমাদের কেন হবে বল? জাহাজ থেকে নেমেই তুমি কোথাও কোনও রেস্তোরাঁতে চলে যাবে। দেখবে কার্ড নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দালাল লোক। কিভাবে নিয়ে গেলে, গোপনে দেখা যাবে ওরা ঠিক জানে। খুব পয়সা নেয়। রাজার জন্য মেয়েরা মুক্তো খুঁজতে যায়। কার না লোভ হবে দেখার। তুমি বলো, আমরা তো আর মহাপুরুষ নই।

ছোটবাবু বলল, মহাপুরুষদের একবার ধরে নিয়ে গেলে হয়, দেখালে হয়। কি করে, তখন দেখা যেত। বলে দুজনেই হেসে ফেলল,—রাত অনেক হয়েছে ডেবিড। ভীষর ঘুম পাচ্ছে। আমি যাই। বলে ছোটবাবু দরজা খুলে সোজা বের হয়ে গেল।

আর তখনই মনে হল ডেবিডের, মিসেস স্প্যারোর জন্য ছোটবাবুর মন খারাপ থাকতে পারে। তাকে একটু সান্ত্বনা দেবার জন্য ডেকে এনেছিল। কিন্তু এতক্ষণ কেউ মিসেস স্প্যারোর আকস্মিক মৃত্যু সম্পর্কে কোনও কথা বলে নি। ছোটবাবুর মন খারাপ বলে হয়তো কোনও কথা বলে নি। ছোটবাবুর এমনই স্বভাব। সব দুঃখ নিজের ভেতর লুকিয়ে রাখে। কাউকে বুঝতে দেয় না। সে তাড়াতাড়ি দরজা ঠেলে মুখ বাড়াল। ডাকল, ছোট।

ছোট যেতে যেতে মুখ ফেরাল। এলি-ওয়েতে কার্পেট পাতা বলে কোন শব্দ হয় না হাঁটা চলায়। এনজিনের হাহাকার শব্দটা ভীষণভাবে শুধু সব এলোমেলো করে দেয়। সুতরাং সে প্রথম বুঝতে পারেনি কে ডাকছে। পেছন ফিরে তাকালে দেখল গলা বাড়িয়ে হাতে ইশারা করছে ডেবিড।

সে ফের ফিরে গেলে বলল, এস। ভিতরে বোস। কথা আছে। স্বাভাবিক মানুষের মত কথা বলছে। মদ খেয়ে সামান্য কথা জড়িয়ে যাচ্ছে কিছুতেই বুঝতে দিচ্ছে না।

ছোটাবাবু বসলে, বলল—তুমি দুঃখ করো না।

কিসের দুঃখ সে প্রথমে বুঝতে পারল না।

—ঠিক উচিত শিক্ষা দেব মনে রেখ। আই মাস্ট কিল দেম।

ছোটবাবু হাসল সামান্য

—ওরা ভেবেছে কি! নিজেদের সম্রাটের মতো ভাবছে? যেন সমুদ্রে ওদেরই থাকার কথা। সামান্য দুটো পাখি, কিছুতেই ওদের জন্য বাঁচানো গেল না। ওরা রাজ্য জয় করে ফিরে গেল। মর্মান্তিক।

ছোটবাবু বলল, ওরা আর আমাদের জাহাজে উড়বে না, ভাবতে খারাপ লাগে।

—কি করা বল। যা ঘটে গেল তাতে আমাদের কোনও হাত নেই। আমরা তো কম চেষ্টা করি নি।

ডেবিডের পিঠের ঘা ভাল করে শুকোয় নি। বেশী বললে, জামা খুলে হয়তো ডেবিড ঘা বের করে দেখাবে। ছোটবাবু বলল, সকালে উঠেই দেখতাম পোর্ট-হোলে মিসেস স্প্যারো বসে রয়েছে। শিস দিলেই উড়ে এসে পায়ের কাছে বসত।

ডেবিড বলল, মিসেস স্প্যারো ঠিক বুঝতে পেরেছিল, তুমি ওকে খুব ভালবাস।

—এখন তাই মনে হচ্ছে। খিদে পেলে কি কিচকিচ করত। খাবার খুঁটে খেত না। ছড়িয়ে না দিলে বিবি মুখ গোমড়া করে রাখত।

—হবেই তো। এটা আমরা ঠিক বুঝতে পারি না আসলে পৃথিবীটার সব কিছু তারা। তুমি যেখানে যাবে মনে হবে, ওদের জন্য তুমি যাচ্ছ। মনে হবে—এরা তোমার কতকালের চেনা।

জেটিতে পার্কে মেয়েদের দেখলে কখনও মনে হয় না, তুমি ওদের দ্যাখো নি। মনে হয় কতকালের এরা পরিচিত। একটু হেসে কথা বললে জাহাজে আর উঠে যেতে ইচ্ছে হয় না। ঘরবাড়ি বানিয়ে বন্দরেই থেকে যেতে ইচ্ছে হয়। কি হবে এত বড় পৃথিবী দেখে। এমন সুন্দর একটা পৃথিবী কাছে থাকলে সমুদ্র, দ্বীপ, কত সামান্য মনে হয়।

—সত্যি।

—যাই হোক তুমি ভাল করে ঘুমোবে। সন্তানকে যেভাবে উৎসাহ দেয় তেমনি চোখ-মুখ ডেবিডের। সে যেন ছোটবাবুকে উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছে। সে বলল, জাহাজে ঘুরতে ঘুরতে কত রকমের অভিজ্ঞতা হবে, পৃথিবীর কত বন্দরে মনে হবে তোমার ভালবাসার মেয়েরা সব হেঁটে বেড়াচ্ছে, জাহাজ ছাড়ার সময় দেখবে আশ্চর্য একটা কষ্ট বুক থেকে বেয়ে উঠছে—তুমি টেরই পাও নি দু-দিন কি চার-দিন কি দু-সপ্তাহ যে সেলস গার্লটি তোমাকে হেসে কথা বলেছে, আপেল আঙ্গুর বিক্রি করেছে, মনে মনে তুমি তাকে ভালবেসে ফেলেছ। মেয়েরা যে কি! একটু হেসে কথা বললেই কেমন আপনার হয়ে যায়।

ছোটবাবু বুঝতে পারল, আসলে ডেবিড ঘুরে-ফিরে নিজের দুঃখের কথাই বলে যাচ্ছে। ঘুম আসবে না ডেবিডের। এখন সে হয়তো পোর্ট-হোলে অন্ধকার সমুদ্র দেখবে—আসলে সমুদ্রে অন্ধকার থাকলে সারাক্ষণ তার সেই বাড়ি, গীর্জার চূড়ো, ছোট্ট নদী যদি থাকে অথবা গ্রীষ্মের সময় মনোরম রোদের ভেতর গাড়ি চালিয়ে কোন বড় শহরে চলে যাওয়া, হৈ-চৈ, ছেলে-মেয়েদের দুটো-একটা আবদারের কথা, স্ত্রীর বড় বড় চোখে তাকিয়ে থাকা—সবই মনে পড়বে। মনে পড়লেই তার সারারাত আর ঘুম আসবে না।

ছোটবাবু বলল, যাচ্ছি।

ডেবিড তাকিয়েই আছে পোর্ট-হোলে। কিছু বলছে না।

—দরজাটা বন্ধ করে দাও।

ডেবিড নড়ছে না দেখে সে দরজা টেনে দিল।

তারপর ছোটবাবু ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকল। রাত দশটা বেজে গেছে, সে ওয়াচের ঘণ্টা শুনে বুঝতে পারল। যখন এভাবে সমুদ্রের বুকে কেউ ঘণ্টা বাজায় তখন তার ইন্চকেপ-রকের কথা মনে হয়, মঠের সেই সন্ন্যাসীর কথা মনে হয়। কোনো না কোনো ঘটনার সঙ্গে মানুষের স্মৃতি জড়িয়ে যায়। ছোটবাবুর স্মৃতি ভীষণ সতেজ বলে ঘণ্টা বাজলেই দেখতে পায় এক অতিকায় পাহাড় সমুদ্রের বুকে দাঁড়িয়ে আছে। ঝড়ের রাতে জাহাজ পথ ভুল করে ঠিক পাহাড়ের গায়ে ধাক্কা খেয়ে ভেঙ্গে যায়। জাহাজ ডুবির এমন অজস্র ঘটনা মনে হলেই কেবল সে দেখতে পায়, সেই...মঠাধ্যক্ষ একটা বড় ঘণ্টা ঝুলিয়ে দিচ্ছেন, ঝড় উঠলেই ঘণ্টা বাজতে থাকে। দূরবর্তী জাহাজের নাবিকেরা তখন সতর্ক হয়ে যায়।

ছোটবাবুর এই এক খারাপ স্বভাব। কিছু মাথায় এলেই সহজে যেতে চায় না। সে ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। হাঁটতে হাঁটুতে সে টেরই পাচ্ছে না ওপাশের এলি-ওয়ের দরজায় ধ্বস্তাধ্বস্তি হচ্ছে। ওটা মেজ-মিস্ত্রি আর্চির দরজা। কেবিনের পাশে বড়-মিস্ত্রি ছিল, এখন নেই। নির্জন এলি-ওয়েতে মেজ- মিস্ত্রি একাই থাকেন। এবং ছোটবাবুর মনে হল, কেউ ডাকছে, জ্যাকের সেই মেয়েলী গলা। কাতর। কিন্তু কোথায়? সে কেবল শুনতে পাচ্ছে, নো। মি বয়। আর মনে হচ্ছিল, যদিও এনজিনের হাহাকার শব্দে শোনার উপায় নেই, খুব কাছেই কিছু ঘটছে। সে একটু পিছিয়ে ডান দিকের এলি-ওয়েতে তাকাতেই, মনে হল জ্যাক দৌড়ে পালাচ্ছে। আর শিকারী বেড়ালের মতো থাবা উঁচিয়ে আছে মেজ-মিস্ত্রি। যেন তার হাত থেকে পাখি পালিয়েছে। ছোটবাবুকে দেখে হাত ছেড়ে তাড়াতাড়ি যেন দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে।

ছোটবাবু বুঝতে পারল না, জ্যাক এখানে এত রাতে কেন? আর্চিই বা দরজা খুলে খপ করে, ` ধরতে যাবার মতো হাত বাড়িয়েছিল কেন? ধ্বস্তাধ্বস্তি করে জ্যাকই বা ওদিকে ছুটে পালাচ্ছে কেন? সে তার কেবিনে ঢুকে যাবে ভাবল। নিচে এ সময় জ্যাকের নামার কথা না।

জ্যাকের কেবিনে সিঁড়ি ধরে সে উপরে উঠে যেতে পারে। কিন্তু এত রাতে সে যেতে পারে না। তাছাড়া সেও ভাল নেই। ছোটবাবুকে দেখে মেজ-মিস্ত্রি আর্চি এমন হিংস্র হয়ে উঠল, যেন খেয়ে ফেলার মতো। এবং শীতল করে দিচ্ছিল তাকে। সে আর তাকাতে পারে নি। মাথা নীচু করে চলে এসেছে।

যত দিন যাচ্ছে, ছোটবাবু রহস্যের ভেতর পড়ে যাচ্ছে। প্রথম মনে হয়েছিল জাহাজে শুধু পেটভরে খাওয়া আর দিনমান কাজ করা। আর কোনো দুঃখ নেই। বন্দর পাবে মাঝে মাঝে, পেলে নেমে যাবে বন্দরে। উৎফুল্ল হবে, বেড়াবে, এবং ফুলের গন্ধ নিতে নিতে কখনও ফুল ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে। কিন্তু এখন সে বুঝতে পারছে—জাহাজ অন্যরকম। কেমন অজ্ঞাত এক মঠাধ্যক্ষ মাঝে মাঝে তার মাথার ভেতর ঘণ্টা বাজিয়ে যাচ্ছে। ঝড়ের রাতে জাহাজ সতর্ক করে দেবার মতো তাকে সতর্ক করে দিচ্ছে কেউ।

॥ চব্বিশ ॥

জ্যাক যেন নেকড়ের মুখ থেকে পালিয়ে ছুটছে। সে এলোপাথাড়ি ছুটছে। সব কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেছিল—ছোটবাবুকে এলি-ওয়েতে ঢুকতে দেখেই শয়তানটা হাত ছেড়ে দিয়েছে। কেন যে মরতে সে নিচে নেমে এসেছিল। এবং সে যখন ওপরে উঠে প্রায় দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকে গেল তখন এত ঘামছে, যে মনে হয় বৃষ্টিপাতে সে ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে ভিজেছে। সে কিছু এখন আর ভাবতে পারছে না। দরজা লক করে সে চুপচাপ বসে থাকল কিছুক্ষণ। একবার পোর্ট-হোল খুলে দেখল, ও-পাশে ছোটবাবু দাঁড়িয়ে আছে কিনা। সতর্ক থাকল, যদি ছোটবাবু ভেবে অবাক হয়ে যায় এবং সংশয় দেখা দেয় মনে, তবে ওপরে ছুটে আসতে পারে। –কি ব্যাপার! তুমি এমনভাবে কেন ছুটে এলে। ভয়ংকর কিছু ঘটেছে ভেবে ছোটবাবু স্বাভাবিক কারণেই আসতে পারে। এলেও সে দরজা খুলবে না। কারণ সে এখন জানে তার মাথা ঠিক নেই। সে হয়তো ছোটবাবুর মুখের ওপর থুথু ছিটিয়ে দিতে পারে। আর্চির মুখের ওপর থুথু ছিটিয়ে দেবার মতো মনে হবে তবে।

এসব কারণে জ্যাক এতটুকু স্থির হয়ে বসতে পারছে না। মাথা সমান উঁচু আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখছে নিজেকে। সে যে মেয়ে এবং মেয়ের মতো। সে বলল, ছোটবাবু তুমি কেন বোঝ না জান না আমি বনি। শয়তানটা আমার সব টের পেয়ে গেছে। –আচ্ছা, ছোটবাবু আজ তোমরা এলে না কেন! কেমন কাতর গলায় সে নিজের প্রতিবিম্ব দেখতে দেখতে বলল। আমি সেই আটটা থেকে পোর্ট-হোলে দাঁড়িয়ে আছি, আসছ না তোমরা। নটা বেজে গেল। কতক্ষণ একা-একা থাকা যায়। রোজ আটটার পর বোট-ডেকে এসে বসো তোমরা অথচ আজ…!

বনি এবার এক এক করে পুরুষের পোশাক শরীর থেকে খুলতে থাকল। আর্চি আমাকে ঘাটাবে না। বাবাকে বলে জাহাজ থেকে নামিয়ে দেব! তুমি ভাল করছ না। তুমি খারাপ। তুমি বদমাস। পোশাক খুলতে খুলতে, এমন অজস্র কথা। সে প্যান্ট খুলে ছুড়ে দিল, যেন পারলে আগুন ধরিয়ে দেয়। সে যে কি করছে এখন! সে মেয়ে, এবং এই পুরুষের পোশাক তাকে কিছুতেই আর পুরুষ করে রাখতে পারছে না।—শয়তান অধার্মিক—আর ছোটবাবু তুমি তুমি…ভাঙ্গা রেকর্ডের মতো পুনরাবৃত্তি…তুমি….তুমি এবং তখনই কি যে হয়ে যায়, সে তার প্যান্ট তুলে একটা ব্লেডে ফালা ফালা করে কেটে ফেলে। জাঙ্গিয়া খুলে দাঁতে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়। লম্বা ঢোলা জামা খুলে দু-হাতে ছিঁড়ে উড়িয়ে দেয় সমুদ্রে। মোটা গেঞ্জি খুলে পোর্ট-হোলে ঝুলিয়ে দিল। তারপর দেশলাই কাঠি জ্বেলে আগুন ধরিয়ে ছুড়ে মারল আকাশের গায়ে। তারপর ব্রেসিয়ার। একটা একটা করে ভাঁজকরা তিনটে ছোট রুমাল খুলে ফেলতেই সে দেখল, দুটো স্তন রাবারের বলের মতো ফুলে উঠেছে। যেন পিন ফুটিয়ে দিলে স্তন থেকে রক্ত পিচকিরির মতো ছুটবে। সে দুহাতে দু-স্তন ধরে ব্যথায় গুমরে উঠল। টনটন করছে স্তনের চারপাশ। ক্রমে স্তনের চারপাশ থেকে শিরা-উপশিরা জেগে উঠলে সে দেখল, বেশ সুপুষ্টু স্তন, এবং চারপাশে মাখনের রং জেগে উঠছে আর শিরা-উপশিরাতে আশ্চর্য চঞ্চলতা সে টের পাচ্ছে। বিকেল থেকে সে এভাবে একই পোশাকে। আর ব্রেসিয়ারে আঁটা শক্ত স্তন এতক্ষণ খুবই মিইয়ে ছিল। সব খুলে ফেলতেই আবার সব সহজ স্বাভাবিক হয়ে গেল। ব্রেসিয়ারের দাগ শরীরের চারপাশে বসে গেছে। সে এখন ভীষণ হাল্কা বোধ করছে।

এবং তখনই মনে হল, পোর্ট-হোলের কাচ সে বন্ধ করেনি। তাড়াতাড়ি রাতের পোশাকে স্তন এবং নাভিমুখ ঢেকে পোর্ট-হোলের কাচ বন্ধ করে দিল। ছোটবাবু এলেও সে দরজা খুলবে না। দরজা খুলতে হলে আবার সব তাকে পরে নিতে হবে। এবং সে কেমন অধীর হয়ে উঠল আয়নায়। সে বুঝতে পারছে তার শরীরে ভারী সুন্দর গঠন, যা সে মাঝে মাঝে হাত তুলে এবং নুয়ে নিচু অংশ দেখার সময় কাউকে ভেবে থাকে। ভাবতে ভাল লাগে।

এই প্রতিবিম্ব তাকে কিছুক্ষণ মুহ্যমান করে রাখল। ছোটবাবু আসতে পারে, ডাকতে পারে মনে থাকল না। কাল সকালে সে ভেবেছে আর্চিকে সাবধান করে দেবে। আর্চি ওর দিকে

এখন হিংস্র লোভী জন্তুর মতো তাকিয়ে থাকে। তখন আর্চির মুখে কিছু ছুড়ে মারার প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে স্থির থাকতে পারে না।

বনি এমন সাত-পাঁচ ভেবে যাচ্ছিল। আলতো করে বেগুনি রঙের একটা নাইটি পরে নিল। সাদা চাদরে ঢাকা মখমলের মতো বিছানা। দুটো বালিশের একটাকে সে সব সময় পাশবালিশ করে নেয়। সবুজ রঙের আলো জ্বেলে শুয়ে পড়বে ভাবল। কিন্তু তেষ্টা গলায়। সে জল খেল এক গ্লাস। শুয়ে পড়বে ভেবে বাংকের কাছে গেল—কিন্তু কেন জানি ভেতরে এক অসহ্য জ্বালা। ছোটবাবুর ওপর আবার মন বিরূপ হয়ে উঠছে। আটটার পর ছোটবাবু এখানে এসে বসলে তাকে নিচে নেমে যেতে হত না। আটটার পর ছোটবাবু কি আজ শুয়ে পড়েছে! ওর শরীর ভাল নাও থাকতে পারে। পাখি দুটো না থাকায় ছোটবাবুর মন ভাল নাও থাকতে পারে। কখন কি যে হয়, মনের এই বিরূপতা কাটতে ওর সময় লাগেনি। সে আবার ছোটবাবুর জন্য কেমন এক কষ্টে ডুবে যাবার সময়, দরজা খুলে ফেলল। অন্ধকার রাত বলে উইংসের আলো দুলে দুলে জাহাজটাকে এক অলৌকিক জাহাজ বানিয়ে ফেলছে। এবং ভাবতে ভাল লাগল জাহাজে কেউ নেই। কেবল সে আর ছোটবাবু। নিরবধি কাল যেন জাহাজটা এভাবেই চলবে। থামবে না। সে বেগুনি রঙের নাইটি পরে ডেকচেয়ারে বসে থাকবে। পাশে ছোটবাবু, পৃথিবীর সব প্রাচীন ইতিহাস ছোটবাবুর মুখ থেকে শুনতে শুনতে সে ঘুমিয়ে পড়বে।

বনি আশা করেছিল ছোটবাবু ওপরে উঠে আসবে। এমন একটা ঘটনার পর চুপচাপ থাকতে পারে না ছোটবাবু। এবং সে এত অধীর যে ছোটবাবু এলে সে তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে দিতে বলবে, দ্যাখো আমি কে? আমার ঊরুমূল দ্যাখো, বাহু দ্যাখো, আমার সুন্দর স্তনের রূপলাবণ্যে তুমি ভালো হয়ে যাও।

বনি দরজা ফাঁক করে রেখেছে। চুপিচুপি দেখছে কেউ নিচ থেকে উঠে আসছে কিনা। জুতোর শব্দ উঠছে কিনা। কান সজাগ। যদি ছোটবাবু আসে তবে সিঁড়ি ভাঙ্গার শব্দে সে ঠিক টের পাবে—সে উঠে আসছে। ছোটবাবু ওঠার সময় যেন কি ভাবতে ভাবতে উঠে আসে। ওর পায়ের শব্দে সব টের পাওয়া যায়। অথচ ছোটবাবু আসছে না। সিঁড়িতে কোনও শব্দ নেই। নিঝুম সমুদ্রে অনেক নিচ থেকে সেই এনজিনের এক শব্দ, ক্রমান্বয়ে চারপাশে পরিব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকার সমুদ্র তখন আরও ভয়াবহ এবং গভীর মনে হয়। সমুদ্রের অতলে হাজার সেই প্রাগৈতিহাসিক জীবেরা সত্যি ঘোরাফেরা করছে মনে হয়। তারা এখনও তেমনি রয়েছে। তাদের স্বভাব পাল্টায় নি।

বনি দরজা বন্ধ করে দিল। ওর জন্য ছোটবাবুর এতটুকু কষ্ট নেই। ছোটবাবুর ওপর চাপা অভিমান এবং মাঝে মাঝে মনে হয় সে ছোটবাবুর সঙ্গে আর কিছুতেই কথা বলবে না। সে এভাবে কতবার ভেবেছে, এই শেষ, এবং ছোটবাবু যেমন আছে তেমনি থাক, কিন্তু মনের ভেতরে কি যে থাকে, যেন সে শিশুবয়স থেকে ছোটবাবুকে দেখে এসেছে, একসঙ্গে বড় হয়ে উঠেছে, বড় মাঠে বিকেলে তুষারপাতের সময় একসঙ্গে স্কি খেলেছে, একসঙ্গে কোথাও দুজন কেবল নাচ ঘরে নেচে যাচ্ছে অথবা হৈ-হৈ করে কতকাল একজন সমুদ্রগামী মানুষের হাত ধরে সে হেঁটে যাচ্ছে। ছোটবাবু তার কেউ নয়, সে কিছুতেই আর এটা ভাবতে পারে না।

বনি সত্যি শুয়ে পড়ল। সবুজ আলো জ্বেলে দু-পা ছড়িয়ে দিল। দু-হাতে মুখ ঢেকে রাখল। শরীরের সব পবিত্রতা আর্চি হরণ করে নিতে চাইছে। ছোটবাবু তুমি জান না, এ পবিত্রতা আমার সব। সহজে সে ঘুমোতে পারল না। পাশ ফিরে শুল। ঘুম আসছে না, কেবল হিজিবিজি ভাবনা তার, যেন সেই আশৈশব ক্যাসেলের পাশে ভ্রমণ—বাবার হাত ধরে ভ্রমণ। এখন বাবার হাত ধরে কোথাও আর যেতে ভাল লাগে না তার। মনে মনে কার্ডিফ-ক্যাসেলের পাশ দিয়ে হেঁটে গেলে কেবল ছোটবাবুর মুখ সে দেখতে পায়। বাবার মুখ আর কিছুতেই মনে করতে পারে না।

বনি আরও ভেবে অবাক হয়ে যায়, সে কত সহজে যে এই জাহাজে বড় হয়ে যাচ্ছে। তার চিন্তা ভাবনা কেমন পরিণত মানুষের মতো। সে আর ছেলেমানুষের মতো অকারণ ছোটবাবুর

কেবিনে ছুটে যেতে পারছে না। পারলে যেন ভাল হত। অভিমানে সে এমন ভেঙ্গে পড়ত না। শুয়ে শুয়ে ফুলে ফুলে কাঁদতে হত না।

ছোটবাবু তখনও জেগে আছে নিচে। সে চুপচাপ একাকী বসে রয়েছে। আর্চির মুখ অতিকায় হয়ে যাচ্ছে। কখনও মনে হচ্ছে সে নিজে সমুদ্রের নিচে ছোট রুপোলী মাছ, বেশ নেচে নেচে বেড়াচ্ছে। জলের ভেতরে কি আছে জানত না। কিন্তু সেই জলে এক ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ মুখ, হাঙ্গরের মতো লেজ নেড়ে নেড়ে ক্রমাগত তাকে অন্ধকারে লক্ষ্য করে যাচ্ছে যেন। আর্চিকে খুশী করার জন্য সে যা নয় প্রমাণ করতে চাইছে। সে নিজে বার বার মনে মনে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে, কিন্তু ব্যবহারে ভালমানুষ, মুখ বুজে কাজ করে যাওয়া স্বভাব। যখন আর পারে না, তখন কাপ্তানের কথা মনে হয়। মনে হয়, তাকে এভাবেই জীবনে বড় হতে হবে। সে তার ক্ষোভ অথবা উত্তেজনা ভুলে থাকার চেষ্টা করছে।

জ্যাকের কথা ভেবে আরও অবাক। এত রাতে জ্যাক নিচে নামে না। জ্যাক রাত হলে নিজের কেবিনে বসে থাকে। কখনও জ্যাক এবং সে আর ডেবিড বোট-ডেকে বসে থাকে। একটু রাত হলেই জ্যাক কেবিনে চলে যায়। দুটো-একটা কথা পোর্ট-হোলে দাঁড়িয়ে জ্যাক বলতে ভালবাসে। সে ভেবেছিল, জ্যাক ওর দিকেই ছুটে আসবে। কিন্তু জ্যাক গঙ্গাবাজুর দিকে ছুটে গেল কেন বুঝতে পারল না। কেবিনেই বা জ্যাক ঢুকে গেল কেন—তাও বুঝছে না। কাল দেখা হলে আর্চির কাছে ক্ষমা চেয়ে নেবে। এবারে সে ঘুম যাবে ভাবল।

কাপ্তান তখন নিজের কেবিনে বসে আছেন। সাদা জিন কাপড়ের ফুল প্যান্ট, সাদা হাফ-সার্ট এবং পায়ে সাদা জুতো। যতক্ষণ ডিউটি থাকবে, ততক্ষণ একেবারে পুরো ইউনিফরমে বসে থাকবেন। পোর্ট-হোল দিয়ে সামনের সমুদ্র দেখার স্বভাব। সালফার বোঝাই বলে জাহাজের ড্রাফট আটাশ। এর চেয়ে বেশি জাহাজে মাল তোলা যায় না। সামান্য ঢেউ উঠলেই জল উঠে আসে। খুব সতর্ক তিনি। এমন কি এখন যে মাঝে মাঝে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিলেন তাও যেন ঠিক না। জাহাজ আবার সেই একই রাস্তা ধরে যাচ্ছে। সেই মাস্তুলে লম্ফ জ্বালিয়ে জাহাজ আবার যাচ্ছে সেই দ্বীপগুলিতে—কোম্পানী থেকে যে-যে ভাবে জাহাজের কার্গো দেওয়া হচ্ছে তাতে করে কতমাস এই সব দ্বীপপুঞ্জে ঘুরে বেড়াতে হবে তিনি বুঝতে পারছেন না।

অথচ তিনি এই প্রশান্ত মহাসাগরে পড়ার পরই হঠাৎ অনুভব করলেন, বনি আর আগের মতো নেই। সে লাফিয়ে লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙ্গে না। সে রেলিঙ থেকে রেলিঙ-এ ঝুলে চলে যায় না। অথবা সে যে একটা দোল খাবার মতো ব্যবস্থা করে নিয়েছিল চিমনির পাশে সেখানে সে বসে না। বসলেও চুপচাপ, নিজের ভেতরে সে নেই, চোখে-মুখে কেমন এক আশ্চর্য উদাসীনতা। লাজুক, নম্র স্বভাবের হয়ে যাচ্ছে। বনির কথা ভেবেই তিনি অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। এবং তখনই মনে হল, তাকে দরজার বাইরে কেউ ডাকছে। বনির মতো গলা। দরজা খুলে বের হয়ে দেখলেন কেউ নেই। অবাক। তিনি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছেন বনির মতো কেউ ডেকে বলছে, দরজা খোল। ভিতরে ঢুকতে পারছি না।

হিগিনস সামান্য সময় দরজায় দাঁড়ালেন। বনি, না অন্য কেউ। অন্ধকার রাত বলে চারপাশে স্পষ্ট কিছু দেখা যায় না। চিমনির নিচে মনে হল গাউন পরে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। কুয়াশার মতো, ছায়া ছায়া! কি আশ্চর্য বনি এ-পোশাকে বের হয়েছে! কি সাহস মেয়ের! রাত গভীর। কেউ বোট- ডেকে এ সময়ে থাকবে না বলে, বনির এমন সাহস তিনি একেবারেই পছন্দ করছেন না। তিনি প্রায় দ্রুত নেমে যাচ্ছিলেন সিঁড়ি ভেঙ্গে। জোরে ডাকতেও পারছেন না বনি বলে। জ্যাক বলে ডাকলে, ব্রীজে যাদের ডিউটি তারা সতর্ক হয়ে যেতে পারে। অসময়ে কাপ্তান নিচে নেমে যাচ্ছেন কেন! আর যদি চিমনির ও-পাশে ছায়া ছায়া অন্ধকারে বনিকে আবিষ্কার করে ফেলেন, তবে কেলেঙ্কারি। তিনি যেন মরিয়া হয়ে ছুটছেন, এবং নেমে যাবার সময় পাইপে হোঁচট খেয়ে পড়তে পড়তে উঠে দাঁড়ালেন। আর দাঁড়াতেই অবাক, রেলিঙ ফাঁকা। অস্পষ্ট ছায়া ছায়া অন্ধকারে বনি কিংবা গাউনপরা কেউ নেই। যত দ্রুত নেমে

যাচ্ছিলেন, ঠিক তত দ্রুত তিনি বনির কেবিনে গিয়ে জোরে ডাকলেন, জ্যাক জ্যাক।

বনি বাবার গলা শুনে ধড়ফড় করে উঠে বসল। সে ঘুমোয়নি। তার কিছুতেই ঘুম আসছিল না। সে লাফিয়ে নিজের পোশাক পরে দরজা খুলে বলল, বাবা তুমি!

—বনি তুমি আমাকে ডেকেছিলে?

—নাতো বাবা।

—এই এক্ষুনি—মানে মিনিট চার-পাঁচ আগে।

—নাতো বাবা। কেন কি হয়েছে!

—কিছু না। তুমি ঘুমোও। সাবধানে ঘুমোবে। বনি তুমি ভয় পাও না তো?

—না বাবা। ভয় পাব কেন!

—ছেলেমানুষ তুমি।

বনি বলল, ভিতরে এস! তুমি এত ঘামছ কেন বাবা? বোস।

—ঘামছি! তিনি বসতে বসতে বললেন।

—হ্যাঁ। বলে বনি তোয়ালে দিয়ে বাবার কপাল মুখ মুছিয়ে দিতে থাকল। তারপর হেসে ফেলল, তুমি না বাবা যত বয়স বাড়ছে তত ছেলেমানুষ হয়ে যাচ্ছ। আমার কথা ভেবে তোমার ঘুম আসে না।

কাপ্তান কিছু বললেন না। বসে থাকলেন। দেখলেন, মেয়ের কিছু পোশাক ছেঁড়া। প্যান্ট, ঢোলা জামা, ব্রেসিয়ার একপাশে পড়ে আছে।

কাপ্তান দেখলেন সব। কিছু বলতে পারলেন না। এই বোট-ডেকে এলিস এইমাত্র তবে এসেছিল, তার গলা। এলিসই বনির গলা নকল করে ডেকেছে। তারপর ভাবলেন, হয়তো তিনি বনির কথা ভাবতে ভাবতে খুব বেশি অন্যমনস্ক হয়ে গেছিলেন। এবং মনে হয়েছিল, বনি তাঁকে ডাকছে। কিন্তু পরক্ষণেই আর একটা চিন্তায় তিনি ভীত হয়ে পড়লেন। দীর্ঘ বিশ বছর আগে এলিসকে নিয়ে এ জাহাজে উঠেছিলেন। ঠিক সেই এলিসের গাউন অন্ধকার রাতেও রেলিঙে ঝলমল করছিল! তিনি এবার ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। মেয়ের দিকে তাকাতে পর্যন্ত সাহস পেলেন না। কেবল বললেন, দরজাটা বন্ধ করে দাও। ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকলেন।

তারপর তিনি ঠিক সেই রেলিঙের কাছে গিয়ে বললেন, এলিস, আমি ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস. বলছি।

শুধু ওপরে অজস্র নক্ষত্রমালা, অন্ধকার সমুদ্রে একটা গুমগুম আওয়াজ, প্রপেলারের একটানা জল- ভাঙ্গার শব্দ, আর কিছু না। না, মনে হল, সেই এ্যালবাট্রস পাখি দুটো এখনও উড়ছে। দূরে কোথাও তিনি তাদের কক্ কক্ শব্দ শুনতে পেলেন।

এ-সব কিছুই তিনি এখন শুনতে চান না! তিনি ফের বললেন, আমি স্যালি হিগিনিস ক্যাপ্টেন এস-এস সিউল-ব্যাঙ্ক, বলছি। তুমি শুনতে পাচ্ছ।

না কোন জবাব নেই। পাখি দুটো জাহাজের মাথায়, বোধ হয় মাস্তুলের ডগায় বসার জন্য আবার এসেছে। তাদের অতিকায় ছায়া, তাঁকে মুহূর্তের জন্য ঢেকে দিয়ে চলে গেল।

তিনি বললেন, এলিস, আমি সব সহ্য করব। যে কোন শাস্তি। দোহাই তুমি বনির ছদ্মবেশে এসো না। বনির গলায় আমাকে ডেকো না। বনির কোন দোষ নেই। তারপর তিনি নিজেই অবাক হয়ে ভাবলেন, অদৃশ্য আত্মার সঙ্গে তিনি কথা বলে চলেছেন। ভয়ে তাঁর শরীর ফুলে উঠছে। একাকী নিশীথ অন্ধকারে দেখলেন, দূরে একটা নক্ষত্র এইমাত্র খসে পড়ল। তিনি ফিরে এসে কেবিনে ঢুকতে সাহস পেলেন না। ব্রীজে একটা ডেক-চেয়ারে চুপচাপ অন্ধকারে বসে থাকলেন। সামনে থার্ড-মেট, হুইলের সামনে কোয়ার্টার-মাস্টার। ওদের দুজনেরই চোখ

সামনের দিকে। পেছনে কেউ বসে আছে তারা টের পেল না।

আবার কোন নক্ষত্র যদি সমুদ্রের অতল থেকে ভেসে ওঠে এবং ভাসতে ভাসতে আকাশের গায়ে টুপ করে লেগে যায় বুঝতে পারবেন, এই নক্ষত্র বেয়ে কেউ কখনও এ-জাহাজে নেমে আসে। বোধহয় এলিসও তাই করছে। জাহাজ থেকে আকাশে, আকাশ থেকে সমুদ্রের গভীরে ডুবে যায়। এভাবে জাহাজের পিছু পিছু অথবা যেখানে তিনি থাকছেন, এলিস সঙ্গে সঙ্গে রয়েছে। এমন মনে হতেই ফের স্বাভাবিক হয়ে গেলেন। উঠে থার্ড-মেটের কাঁধে হাত রাখলেন। সেদিন থার্ড-মেটকে গালাগালি করেছেন। আজ কেন জানি মনে হল থার্ড-মেট সত্যি খুব কর্তব্যপরায়ণ অফিসার। তিনি বললেন, থার্ড-মেট, তোমার কি মনে হয়?

—কী স্যার?

—ওই ভূতটুতের ব্যাপার সম্পর্কে!

—আমার এতে বিশ্বাস নেই স্যার!

—অথচ দ্যাখো রিচার্ড নেমে গেল। চোখ-মুখের কি অবস্থা হয়েছিল!

—আমি তো জাহাজে কিছু কখনও দেখি না।

—আমিও না। বলেই তিনি লগ-বুকের পাতা উল্টাতে থাকলেন। তারপর বললেন, কম্পাস রিডিং ঠিক দিচ্ছে তো।

—সামান্য গণ্ডগোল করছে।

সামান্য বলতে কতটুকু তিনি তাড়াতাড়ি অঙ্ক কষে সেই হিসেবটা বের করলেন। জাইরো কম্পাসের সঙ্গে হিসেব মিলিয়ে দেখলেন, ঠিকই আছে। একটু এদিক-ওদিক সব জাহাজেই হয়। তিনি এবার যেন তার পুরানো সাহস ফিরে পেয়েছেন। বললেন, তবু কখনও কখনও এমন হয়। কি হয়, কিছু বললেন না। থার্ড-মেট প্রশ্ন করে, কি হয় জানতে পারল না। কাপ্তান তাঁর কেবিনের দিকে চলে যাচ্ছেন। কাপ্তান যে ঘুমোন না, জেগে থাকেন এটা বোধহয় দেখিয়ে গেলেন। কাপ্তানের দরজা বন্ধ হলেও থার্ড-মেট তেমনি সামনে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে থাকল। দুরের দুটো একটা আলো দেখে মনে হল অন্ধকারে একটা দ্বীপটিপ এগিয়ে আসছে সামনে। র‍্যাডারে সে দেখতে পেল—ওটা দ্বীপই। সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম পাঠাল নিচে, স্লো। জাহাজের গতি কমিয়ে দিন। সামনে একটা দ্বীপ দেখা যাচ্ছে। এবং দ্বীপের পাশ কাটিয়ে জাহাজ ফের নেমে গেলে সে টেলিগ্রাম পাঠাল ফের—ফুল। পুরোদমে চালান। নিচে ডিউটি এনজিনিয়ার চার নম্বর, টেলিগ্রামে ঘণ্টা বাজতেই জাহাজের গতি বাড়িয়ে দিল। তারপর টুলের ওপর একটা পা রেখে সামান্য ঝুঁকে থাকল নিচে। কখনও পায়চারি করল। কখনও ব্যালেস্ট পাম্প চালিয়ে ময়লা জল বের করে দিতে থাকল। বয়লারের ওপাশে তিনজন ফায়ারম্যান, টিণ্ডাল। ওরা উইণ্ডসেলের নিচে দাঁড়িয়ে গেজে স্টিম দেখছে। এবং নানারকমের সব বালব, কক, গেজ। কক থেকে ফ্যাচ ফ্যাচ শব্দে স্টিম এবং জল একসঙ্গে বের হয়ে আসছে। আবার কোথাও হিসহিস শব্দ এবং নিচে ওরা প্রায় সমুদ্রের সারফেস থেকে আটাশ ফুট নিচে। ওরা কয়লা মেরে যাচ্ছে, ফার্নেস-ডোর খুলে আগুন ঘেঁটে দিচ্ছে। বড় বড় স্লাইশ, র‍্যাগ টানছে তুলছে এবং ভেতরে প্রায় সমস্ত শক্তি দিয়ে ঠেলে দিচ্ছে—এবং এভাবে শরীরে ওদের আগুনের হলকা এসে প্রায় সারা শরীর ঝলসে দেবার মতো। তখনই এয়ার বালব না টেনে পারা যায় না। না হলে আগুন লেগে পুড়ে মরার কথা।

আর এই হচ্ছে নিশীথের জাহাজ। সমুদ্রে নিশীথে জাহাজ এভাবেই চলে। আফট্-পিকে যে জাহাজি ডিউটিতে থাকে এখন সে কেন বেল বাজাল না! থার্ড-মেট ভেবে পেল না এটা। সবাই যখন সতর্ক, সজাগ প্রায় শরীরের শিরা-উপশিরার মতো সিউল-ব্যাংককে সচল রাখছে, তখন আফট্-পিকে দ্বীপ দেখে ঘণ্টা বাজল না, ভারি বিস্ময়ের। জাহাজে একটা বড় রকমের দুর্ঘটনা ঘটতে পারত, চড়ায় উঠে পড়তে পারত জাহাজ—তাছাড়া এত কাছাকাছি কোনও দ্বীপ তো থাকার কথা না। সহসা এমন মনে হতেই চার্টের ওপর ঝুঁকে বুঝতে পারল, অন্তত দুশো

মাইলের ভেতর কোনও দ্বীপ নেই। তবে এটা সে কি দেখল! সে যে টেলিগ্রাম পাঠাল, এবং মনে হল সামনেই একটা দ্বীপ, এমন কি র‍্যাডারে মনে হল দ্বীপ। এত সব হবার পর সে কেমন ঘাবড়ে গেল। ঘণ্টাখানেকও হয়নি কাপ্তান এসে নিজে কম্পাস রিডিং-এর ডিভিয়েসান দেখে গেছেন—জাহাজ দ্রাঘিমা অক্ষাংশ ঠিক রেখে এগিয়ে যাচ্ছে, অথচ সে একটা দ্বীপের পাশ কাটিয়ে জাহাজ নামিয়ে আনল।

সে বলল, কোয়ার্টার-মাস্টার, তুমি কি স্টার-বোর্ডে একটা দ্বীপ দেখতে পাও নি?

–না তো স্যার।

—না তো স্যার! তবে আমি টেলিগ্রাম পাঠালাম কেন নিচে!

—সে তো জানি না স্যার!

—তুমি ঘুমোচ্ছিলে?

—না স্যার।

থার্ড-মেট ভাবল, এ দুনম্বর ঠিক নেশাভাঙ করে। সে হয়তো কিছুই খেয়াল করেনি। কেবল হুইল ঘুরিয়ে যাচ্ছে কম্পাস দেখে। আর কাকে সে সাক্ষী রাখতে পারে। লগ-বুকে লিখতে হবে সব। এনজিন- রুমের লগ-বুকে এতক্ষণে লেখা হয়ে গেছে। কতটা সময় জাহাজ স্লো চলেছে—কার ডিউটি, ফোর্থ এনজিনিয়ারের! না ওকে ফের নতুন করে কিছু লেখানো যাবে না। সে তাড়াতাড়ি কাপ্তানের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, থার্ড-মেট স্যার।

—কাম-ইন।

থার্ড-মেট দেখল কাপ্তান টেবিলে বড় একটা চার্ট ফেলে কি মাপ-জোক করছেন। এবং ভীষণ নিবিষ্ট। বললেন, বোস।

—স্যার!

—তুমি ভুল করেছ ভাবছ!

—হ্যাঁ স্যার।

—না। ঠিকই দেখেছ।

—কিন্তু স্যার কোর্সে কোন দ্বীপের উল্লেখ নেই। দুশো মাইলের ভেতর নেই।

তিনি বললেন, চার্ট সেকেণ্ড-মেট ভুল করেছে। চার্ট অনুযায়ী জাহাজ চললে আমাদের ভীষণ ভুগতে হত।

থার্ড-মেট মাথা চুলকে বলল, তবে চার্ট অনুযায়ী জাহাজ চলছে না!

—না।

—কিন্তু স্যার, আমরা তো সাধ্যমতো করে যাচ্ছি। চার্ট অনুযায়ী জাহাজ চালাচ্ছি।

কাপ্তান বুঝতে পারলেন, থার্ড-মেট কিছু ভুল করেছে ভেবে ভীত। তিনি বললেন, ভয় পাবার কিছু নেই। ঠিকই যাচ্ছে জাহাজ। যেন বলতে চাইলেন, আমরা ভুল করলেও সিউল-ব্যাঙ্ক ভুল করে না। আর হবেই বা না কেন, কতবার সিউল-ব্যাঙ্ক পানামা ক্রশ করে ঠিক এই পথে তাহিতি হয়ে নিউ-জিল্যাণ্ড এবং শেষে সে এই সব দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপে ঘুরতে ঘুরতে প্রত্যেকটা দ্বীপকে চিনে ফেলেছে। ভুল কোর্সে চালিয়ে তাকে নিয়ে যাওয়া কঠিন। অবশ্য কেউ এ-সব বিশ্বাস করবে না, থার্ড-মেটও না, তিনি শুধু থার্ড-মেটকে বলে দিলেন, জাহাজ ঠিক যাচ্ছে। ভয় পাবার কিছু নেই। সেকেণ্ড-মেট এলে দেখা করতে বলবে।

সেকেণ্ড-মেট বারোটায় এলে কাপ্তান দেয়ালে একটা স্টিক তুলে ধরলেন। বললেন, কত দ্রাঘিমা অক্ষাংশ?

ডেবিড বলল, হানড্রেড এ্যাণ্ড ফাইভ ওয়েস্ট, ফিফটিন সাউথ।

কাপ্তান বললেন, ঠিক আছে?

ডেবিড দেখল, সে যে চার্ট করেছে, ওটা সোজা নিউ-প্লাইমাউথে যাবার কোর্স-লে। তাহিতিতে যেতে হলে আরও কয়েক ডিগ্রি সাউথ-সাউথ-ওয়েস্টে বেড়ে যাবার কথা। এবং আশ্চর্য জাহাজের এত বড় ভুলটা কারো নজরে আসেনি। আর ডেবিড অবাক, জাহাজ ঠিক পথেই চলেছে। চার্ট অনুযায়ী না চলে—কোথায় কম্পাস রিডিং-এ ভুল থেকে গেছে কেউ ধরতে পারেনি। তাহিতিতে যাবার পথে ওরা যে পরিচিত একটা ছোট্ট দ্বীপ দেখে থাকে সিউল-ব্যাঙ্ক তাও ভুল করেনি। এবং এমন সব হলেই ওরা কেমন বিমূঢ় হয়ে যায়। তখন কাপ্তান হিগিনস সহ গোটা জাহাজটা একটা শয়তানের আস্ত নিবাস তারা ভেবে থাকে। কাজেই ডেবিড আর কিছু বলতে পারল না। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। এত বড় একটা ভুলের জন্য সে দায়ী, যদিও জাহাজ ছাড়ার আগে সব অফিসাররাই চার্ট দেখে থাকে, অথচ দেখেও এমন একটা সহজ ভুল কেউ ধরতে পারল না—সুতরাং কাপ্তান ওকে অদায়িত্বশীল ভেবে তিরস্কার করবেন। এসব মনে হওয়ার দরুন সে যেতে পারছিল না।

হিগিনস খুব খুশি। যেন এটা তিনি আরও দেখেছেন। ভীষণ একটা প্লেজার, আনন্দে আর তিনি স্থির থাকতে পারছেন না। বলছেন, বুঝলে ডেবিড, জাহাজ আমাদের খুব বিশ্বস্ত। আমরা ভুল করলেও সে করে না। কেমন দেখলে তো! নিজের চোখে দেখলে।

ডেবিড কি বলবে? সে বলল, হ্যাঁ স্যার। এবার আমি তাহলে যেতে পারি?

—যাবে? যাও।

ডেবিড তাড়াতাড়ি বের হয়ে পড়ল। জাহাজটা সামান্য দুলছে। সমুদ্রে ঠাণ্ডা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে। শেষ রাতের দিকে সামান্য শীতও বেড়েছে। ডেবিড সেজন্য একটা মোটা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে এসেছে। জাহাজি পোশাক। মাথায় এংকোরের টুপি। সে প্রায় গটগট করে ব্রীজে ঢুকে গেলে থার্ড-মেট বলল, কি আশ্চর্য কাণ্ড!

ডেবিড বলল, বাজে। বাজে কথা।

—তার মানে!

—মানে কাপ্তান ভুলটা ঠিকই ধরতে পেরেছিলেন। প্রথমেই ধরতে পেরেছিলেন। তিনি তলে তলে কোথায় কিভাবে কি করেছেন কে জানে!

থার্ড-মেট বুঝল, ডেবিড এসবে পাত্তা দিতে চায় না। না দেওয়া স্বাভাবিক। একটা জাহাজ নিজের খুশিমতো চলে ভাবতে গেলেই শরীর শিউরে ওঠে। আর সত্যি সে যখন চোখের ওপর দেখতে পায়, একটা জাহাজ নিজের খুশিমতো পথ ঠিকঠাক করে নির্দিষ্ট বন্দরে ঢুকে যাচ্ছে তখন মাথা ঠিক রাখা যায় না। জাহাজটা তাদের নিয়ে তবে যা খুশি তাই করতে পারে। জাহাজটাকে তারা নিয়ে যাচ্ছে না, জাহাজটা তাদের নিয়ে যাচ্ছে। এ-সব মনে হলেই মাথায় প্রায় বাজ পড়ার মতো। মুখে ডেবিড বাজে বলে উড়িয়ে দিলেও মনে মনে ভীষণ ভয় পেয়ে গেছে। এবং এ-জাহাজটা যে খুশিমতো আর স্ক্র্যাপ করা যাবে না জাহাজের মর্জি না হলে স্ক্র্যাপ করার হুকুম যে দেবে সেই ভোগে যাবে এ-সব যখন ভাবছিল, তখ, চোখ ওর গোল গোল হয়ে যাচ্ছে। কখন থার্ড-মেট চলে গেছে, কখন আর একজন কোয়ার্টার-মাস্টার এসে হুইলের দায়িত্ব নিয়েছে সে যেন টের পায় নি। ওর কেন জানি মনে হল, জাহাজ থেকে নেমে যেতে না পারলে কারো রক্ষা থাকবে না। খুশিমতো চড়ায় উঠে বসে থাকবে, খুশিমতো সমুদ্রের অতলে ডুবে নিরুদ্দিষ্ট করে দেবে তাদের। কোন বেতার সংকেত কোথাও ওরা পৌঁছে দিতে পারবে না। সমস্ত এস-ও-এস ইথারে ভেসে ভেসে মহাকাশে বিলীন হয়ে যাবে। পৃথিবীর কোনো ট্রেনসমিটারে সিউল-ব্যাংকের এস-ও-এস ধরা পড়বে না। সে চিৎকার করে বলতে চাইল, নো নো। নেভার। কিন্তু পারল না। কোয়ার্টার-মাস্টার একটা মোমের পুতুলের মতো হয়ে গেছে। স্থির। চোখ এবং হাত-পা কোনো এক অদৃশ্য আত্মার প্রভাবে যেন চলছে।

সে কাছে গিয়ে নাড়া দিল—এই

কোয়ার্টার-মাস্টার ডেবিডের দিকে তাকাল।

—চোখ এমন করে রেখেছ কেন?

--কি করে রেখেছি সাব?

–একেবারে স্থির। চোখের পলক পড়ছে না।

—না সাব।

এমন নিশীথে, অর্থাৎ এত রাতে, কারণ এখন রাতদুপুর, সমুদ্রে কেউ জেগে নেই, পাখি দুটোও না, দ্বীপে হয়তো থেকে গেছে—তখন মোমের পুতুলের মতো কোয়ার্টার-মাস্টারের মুখ তাকে সীমাহীন অসহায়তার ভেতর টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বার বার নাড়তে থাকে, না, না—তুমি ঠিক নেই তিন নম্বর। তুমি কারো প্রভাবে চোখ এমন করে রেখেছ। তুমি নিজের ভেতরে নিজে নেই।

কোয়ার্টার-মাস্টার বলল, সাব ঠিক থাকা যায় না।

–কেন কেন?

—শরীরে কেমন রোমাঞ্চ হয়। কি যে হয় বুঝি না। কম্পাসের কাঁটা, হুইল যেন সব নিজের ইচ্ছায় চলে। আমার কিছু করার থাকে না।

ডেবিড হয়তো এবার সত্যি চিৎকার করে উঠতে পারলে বাঁচত—সব গাঁজাখোরি। সব মিথ্যা। সিউল-ব্যাংক সম্পর্কে সব শুনে শুনে এমন হয়েছে। তোমরা ভীরু, কাপুরুষ। বলে সে নিজে হুইল ধরলে থরথর করে কাঁপতে থাকল। হুইলের সঙ্গে সে কেমন বিদ্যুৎপৃষ্ঠের মতো সেঁটে গেল। হাত দুটো শক্ত হয়ে যাচ্ছে। আর হুইলটা যখন যেমন দরকার নড়ছে। কম্পাসের কাঁটার সঙ্গে ঠিক মিল রেখে একবার ডাইনে বাঁয়ে ঘুরছে।

সে প্রায় ছিটকে বের হয়ে এসে বলল, কি ব্যাপার। কখনও তোমরা বলনি তো!

—কোন ক্ষতি করে না সাব।

তারপরই কেমন তাকে এক অহংকারে পেয়ে বসে। সে, সব মিথ্যা অহমিকা জাহাজ-এর ভেবে জাহাজের মুখ উল্টোমুখে ঘুরিয়ে দিতে যায়। ঠিক ঘুরে যায়, কিন্তু পরে আবার নিজের মতো জাহাজ পথ করে নেয়। ডেবিড যা করতে চায় করে। সে যেভাবে চালাতে চায় চলে, কিন্তু পরক্ষণে কেমন সেই এক গতি, জাহাজ যাচ্ছে তাহিতিতে।

কোয়ার্টার-মাস্টার বলল, আপনি সাব ভয় পেয়েছেন।

ডেবিড বলল, না। তবু এটা কি যে হল!

—কী সাব?

—এই যে হুইল ধরলে হাত শক্ত হয়ে গেল।

—ভয় পেয়েছেন বলে।

—তুমি?

—আমরা জাহাজকে মান্য করি। লেখা-পড়া জানি না, সারেং-সাব যা বলেন তাই করে থাকি। এত বড় জাহাজটা যাবে, তার খুশি মোতাবেক যাবে। ভয়ের কি আছে। সে তো আমাদের ঠিক ঠিক নিয়ে যায়। হিগিনস থাকলে আমাদের কোন ভয় থাকে না সাব।

ডেবিড আর এ-নিয়ে ভাবল না। ভাবলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। জাহাজে উঠে সে অজস্রবার হুইল ঠিক ঠিক বেঁধে দিয়েছে, আজকের মতো অবস্থা তার হয়নি। মনে মনে সে ভীত হয়ে পড়ছে। সকাল হলে সব কেটে যাবে। এ-সব অনুভূতি থাকবে না। সে যতটা পারল হুইল থেকে দূরে দাঁড়িয়ে থাকল। ব্রিজের ভেতর থেকে আকাশ এবং সমুদ্রকে আশ্চর্য রহস্যময় মনে হয়। সে নক্ষত্র এবং অন্ধকার সমুদ্র দেখতে দেখতে বুঝল চারটে বাজতে দেরি নেই। একটু বাদেই সূর্য উঠবে। ঠিক পেরুর পর্বতমালার এপাশে সূর্য সে দেখতে পাবে। সমুদ্র

থেকে সহসা ভেসে ওঠার মতো, এবং সূর্য ওঠার আগে সেই সব রং-বেরংয়ের আভা পরিবর্তনশীল আকাশ এবং সমুদ্রের রং, আর যদি কোনও ছোট ফ্লাইং ফিস সে-সময় উড়ে উড়ে আসে, তখন তার এই জাহাজের অস্থিরতার কথা মনে থাকবে না। মনে হবে, জাহাজ তারা ঠিকই চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কোথাও কোন ভুল নেই। কাপ্তান জাহাজের নাম করে একটু বেশি বাহবা নিতে চাইছে। আর কিছু না।

সকালে সমুদ্রে সূর্য উঠছিল। সূর্য ওঠার সময় মনে হয় এই সামনে একেবারে সামনে সূর্য সমুদ্রের অতল থেকে ভেসে উঠল। ডেবিড বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে দাঁত ব্রাস করছিল। কোর্স এতটা কি করে ভুল হল সে কিছুতেই বুঝতে পারল না। জাহাজের আজগুবি বিশ্বাস অবিশ্বাসে সে কেমন মনমরা হয়ে আছে। এবং এভাবেই সে এখন ভেবে থাকে সমুদ্রে সূর্য উঠলেই এখন পেরুর পর্বতমালার নিচে উঠবে। যদিও তারা হাজার মাইলের ওপর দূরে রয়েছে। এবং কাছাকাছি কোথাও স্থলভাগ নেই বলে সূর্য পেরুর পর্বতমালার নিচে উঠছে ভাবতে ভাল লাগে তার। এও তেমনি মনে হয়, কাপ্তান হয়তো জানেন হিসেবে কোথাও ভুল করে জাহাজ ঠিক কোর্স-লে পেয়ে গেছে। ঠিক কোর্স-লে পেয়ে গেছে কথাটা কাপ্তান বেমালুম অস্বীকার করতে চাইছেন।

এ-নিয়ে সকালে কথাবার্তা হতে পারে, সবাই জানবে, ডেবিড মারাত্মক ভুল করেছে। কোর্স লে ঠিক করতে পারেনি। সে এজন্যও কিছুটা মনমরা ছিল। তখনই সে দেখলো এ্যালবাট্রস দুটো মাস্তুলে বসে রয়েছে। মাস্তুলের ডগায় এত বড় পাখি দুটো কেউ খেয়ালই করেনি। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে আর স্থির থাকতে পারল না। মনমরা ভাবটা একেবারে কেটে গেল। দু-লাফে কেবিনে ঢুকে বন্দুক হাতে নিয়ে হামাগুড়ি দিতে থাকল। তারপর সেই বড় পাখিটাকে, বড়-পাখিটাই ওর মাংস খুবলে নিয়েছে। এমন সুযোগ আর সে পাবে না। পাখি দুটোর বোধ হয় চোখে এখনও ঘুম জড়িয়ে আছে। ওদের ঠোঁট ডানার ভেতরে। সে সন্তর্পণে এগিয়ে যাচ্ছে। বুঝতেই দিচ্ছে না বোটের নিচে হামাগুড়ি দিয়ে কেউ এগিয়ে যাচ্ছে।

সকালে তখন ছোটবাবু মাত্র বাথরুম থেকে বের হয়েছে। এক কাপ চা রেখে গেছে মেস-রুম- বয়। একটু ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগছিল। শীত শীত করছে। একটা চাদর গায়ে চড়িয়ে চা খেল। পোর্ট-হোলের কাচ খুলে দিল। আর্চির কাছে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। তার এখন কিছু আর করণীয় নেই। নতুবা কাপ্তানের কাছে কি আবার মিথ্যা রিপোর্ট করবে, ভাবতেই সে বিষণ্ণ হয়ে গেল।

আর জ্যাক সারারাত অসহ্য জ্বালায় একেবারে ঘুমোতে পারেনি! আর্চি ওকে ভয় দেখিয়েছে। আর্চি সব জেনে এখন ওকে নানাভাবে খেলাবে। সে যে ছোটবাবুকে চুমু খেয়েছিল, আর্চি তাও দেখেছে। আর্চি ভয় দেখাচ্ছে, কাপ্তানের কানে কথাটা তুলবে। জ্যাক সহজভাবে সব মেনে না নিলে আর্চি তাকে সহজে রেহাই দিচ্ছে না। সারারাত ভেবেছে কি করবে! ছোটবাবুকে সব খুলে বলবে কিনা, না চুপচাপ সব হজম করে যাবে। বাবাকে বললে, সে যে বনি, বাবার একমাত্র আশ্রয় এবং বাবার আশা-ভরসা —এমন শুনলে বাবা আরও ভেঙ্গে পড়বেন। ওর বয়েস কম হলে কি হয়, গত রাতে বাবার মুখ দেখে টের পেয়েছিল, তিনি মাঝে মাঝে ভীষণ ভয় পেয়ে যান। এবং ছেলেমানুষের মতো মুখ করে বনির দিকে তাকিয়ে থাকেন। বাবাকে তখন ওর ছোট্ট শিশুসন্তানের মতো লাগে। সে, সব এখন থেকে সহ্য করতে পারবে, কিন্তু বাবাকে কষ্টের ভেতর কিছুতেই ফেলে দিতে পারবে না। এ-সব ভাবতে ভাবতে ওর চোখ ভোররাতের দিকে জড়িয়ে এসেছিল, তখনই এক ভয়ঙ্কর শব্দে সে চমকে উঠল। জাহাজে ফায়ারিং হচ্ছে। সে ছুটে বের হবার আগে পোশাক তাড়াতাড়ি পাল্টে নিল। বোট-ডেকে নেমে যা দেখল, তাতে সে হিম হয়ে গেছে। বড় পাখিটা অতিকায় ডানা মেলে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে। পাখা ঝাপটাচ্ছে। গল গল করে রক্তে ডেক ভেসে যাচ্ছে। আর লেডি এ্যালবট্রস জাহাজটার চারপাশে উড়ে উড়ে বেড়াচ্ছে। জাহাজটাকে ছেড়ে সে কিছুতেই দূরে চলে যাচ্ছে না। কেমন কান্নার মতো এক আর্ত বেদনা পাখিটার গলায়।

পাখিটা রক্ত ওগলাতে ওগলাতে মরে যাচ্ছে এবং এক ভীষণ অমঙ্গলের আশঙ্কায় বনি স্তব্ধ হয়ে গেল। পাখিটা মরে গেলে সে এতটা ভেঙ্গে পড়বে কখনও বুঝতে পারে নি। মনে হল মৃত্যুর আগে পাখিটার অসহায় চোখ তার ভারি চেনা। যখন মনে হল তখন আর স্থির থাকতে পারল না। ছোটবাবুর কেবিনে দৌড়ে গেল। –ছোটবাবু, ম্যান এ্যালবাট্রস ডেড।

ছোটবাবু ভারি খুশি। বলল, সত্যি! সে দরজা খুলে বলল, সত্যি। আর সঙ্গে সঙ্গে সেই বাচ্চা ছেলের মতো মরা-পাখি জাহাজ ডেকে দেখার জন্য ছুটতে থাকল। এলি-ওয়েতে জ্যাক দাঁড়িয়ে আছে। অমঙ্গল ভেবে মুখ ক্লিষ্ট। এবং ছোটবাবুকে অপলক দেখতে দেখতে চোখ ভারি হয়ে আসছে জ্যাকের। তখন কেমন নিজের আনন্দে আছে ছোটবাবু। রাতের ঘটনা বেমালুম ভুলে গেছে। ভুলে না গেলে সে এভাবে দৌড়াতে পারে না।

আর তখনই একটা ভয়ঙ্কর অহংকারী স্বর এদিকে ভেসে আসছিল।—ম্যান, ম্যান এদিকে এস।

ছোটবাবু একেবারে ফ্রিজ হয়ে গেছে। মুখোমুখি সেকেণ্ড-এনজিনিয়ার আর্চি। সে ছুটে যেতে পারল না। আর্চি তাকে এনজিনরুমে নেমে যেতে বলছে।

তখনও দূরে ঠিক ছোটবাবুর কেবিনের পাশে দাঁড়িয়ে আছে জ্যাক। সে দেখছে, আর্চি ছোটবাবুকে নিয়ে নেমে যাচ্ছে। কোথায় নিয়ে যাবে সে জানে। কত নিচে নামিয়ে তাকে টর্চার করবে তাও জানে। সে এখন কি করবে বুঝতে পারছে না। নিচে নামবে, না পাখিটার কাছে যাবে বুঝতে পারছে না।

॥ পঁচিশ ॥

—ম্যান, দৌড়ে কোথায় যাচ্ছিলে?

—টুইন ডেকে স্যার।

–ডেবিড পাখিটাকে একেবারে মেরে ফেলেছে?

—হ্যাঁ স্যার।

—ভাল করে নি।

—না স্যার, ডেবিড ভাল করে নি।

—ম্যান, জ্যাক তোমাকে কিছু বলেছে?

—না স্যার।

—ম্যান, তুমি জ্যাকের সঙ্গে মিশবে না।

ছোটবাবু কিছু বলল না। সে নামছে। সিঁড়ি ধরে নিচে নামছে। ক্রমে নিচে নেমে যাচ্ছে। সিলেণ্ডারের কাছে এসে নিচে নেমে আর্চি হিপ-পকেট থেকে দু-ব্যাটারীর একটা টর্চ বের করছে। ওয়াচের সময় আর্চির হিপ-পকেটে টর্চটা থাকে। ওয়াচের এনজিনিয়াররা টর্চটা না থাকলে কাজ করতে পারে না। আর্চিও পারে না।

টর্চ বের করতেই বুঝল, আর্চি তাকে ট্যাঙ্ক টপের নিচে ফের নামাবে। ওর কথাবার্তা শুনে মনে হয়েছিল, আর্চি ওর সঙ্গে বেশ ভাল ব্যবহার করছে। আর্চি আজ পর্যন্ত তার সঙ্গে এতগুলো কথা একসঙ্গে কখনও বলে নি। যদিও আর্চি ওকে নাম ধরে ডাকে না, অথবা ছ' নম্বর বলতেও তার বাধে—এক ধরনের অবজ্ঞা ওর কথাবার্তায়, এবং এই যে ম্যান বলে ওকে সম্বোধন করছে, এটা ভীষণ অপমানের। এ-সব অবজ্ঞা ছোটবাবু গায়ে মাখে না। সে জানে, সেকেণ্ড এনজিনিয়ার এ-জাহাজে না থাকলে কাপ্তান অসহায় বোধ করবেন। কেউ এ-জাহাজে আসতে চায় না। ইচ্ছে থাকলেও কাপ্তান, একজন চিফ-এনজিনিয়ার জাহাজে এখন আর তুলে আনতে পারবেন না। টুয়েন্টি-ওয়ান বারি স্ট্রীট লণ্ডনে খবর গেলেও কিছু করা যাবে না। জাহাজের নাম শুনলেই সবাই সিক-লিভ নিয়ে বসে থাকবে। নামতে নামতে ছোটবাবুর এ-সব মনে হচ্ছিল। যত নিচে নেমে যাচ্ছিল তত দেখতে পাচ্ছে আর্চি টর্চটা হাতে দোলাচ্ছে। জ্যাকের সঙ্গে মিশতে বারণ করছে আর্চি। সে উত্তর দেয় নি। ওর হাতের টর্চ দুলছে তেমনি। সেই ঘণ্টা বাজানোর মতো। যেন ঘণ্টা দুলছে। আর্চিকে সেই জলদস্যুর মতো দেখাচ্ছে। ঘণ্টার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। হাতে তরবারী। ঠিক ঠিক জবাব না দিলেই ঘণ্টা তরবারির আঘাতে নামিয়ে দেবে। পাহাড় থেকে ঘণ্টাটা ছিটকে সমুদ্রের জলে পড়ে যাবে।

ছোটবাবু শুধু অনুসরণ করছে। আর্চির পেছনে পেছনে যাচ্ছে। ওর নাকের কাছে আর্চির মাথা। গায়ে আর্চির সাদা বয়লার স্যুট, গলা থেকে পা পর্যন্ত একটাই পোশাক। ঢোলা। গত রাত্রে জ্যাকের সঙ্গে কিছু একটা মনোমালিন্য হতে পারে। আর্চি হয়তো ওকে পক্ষে টানতে চায়। আর্চিকে বলতে পারত, জ্যাক বুঝি এবার আপনার পেছনে লেগেছে! সে বলতে পারল না কারণ এত বড় কথা সে আর্চির মুখের ওপর বলতে সাহস পায় না। আর এত লম্বা কথা সে বলতে গেলে তোতলাতে থাকবে। সেজন্য সে কিছু না বলে চুপচাপ নেমে যেতে থাকল।

আর্চি নিচে নেমে লগ-বুক খুলে কি দেখল। বোধ হয় ওকে সময় দিচ্ছে। ম্যান তুমি ভেবে দ্যাখো কার পক্ষ নেবে। ছোটবাবুর এমন মনে হতেই বলল, আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার। কাল রাতে আমি ঠিক না বুঝে ছুটে গেছিলাম।

আর্চি বুঝতে পারল না, এই নেটিভ-ইণ্ডিয়ানটি তাকে যথার্থ কি বলতে চায়। ছুটে গিয়ে তুমি ঠিক কর নি, সে বলতে পারত। কিন্তু এখন আর্চি বুঝতে পারছে, এ-সবের কোন দাম নেই। ম্যানের প্রতি জ্যাকের অনুরাগ—তাকে পাগলা করে দিচ্ছে। আর্চি আয়নায় দেখেছিল

—তার যৌবন অটুট। সে এ-বয়সের মেয়েদের খেতে বেশী পছন্দ করে। এবং জ্যাকের বয়সের কিছু মেয়ে, যেমন জেনি, যেমন ওয়ালা মাত্র ফুটে ওঠা ফুলের কিছু মুখ পরপর চোখের ওপর ভেসে উঠতেই বুঝতে পারল, জ্যাককে তার ভীষণ দরকার। সমুদ্রে এখন জাহাজ ডুবি হলেও কিছু আসে যায় না। কাল হাতাহাতি করতে গিয়ে জ্যাকের আধ ফোটা স্তনে হাত লেগে গেছে। যতই শক্ত করে বেঁধে রাখুক, সে একেবারে নিশ্চিত হয়ে গেছে—জ্যাক মেয়ে। কাপ্তান এতগুলো ক্ষুধার্ত বাঘের মুখ থেকে তাঁর মেয়েকে রক্ষা করার একমাত্র এটাই উপায় ভেবেছেন।

ছোটবাবু দেখল, ঠিক স্টারবোর্ড-সাইডের বয়লারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে আর্চি। সে তার পেছনে দাঁড়িয়ে। যা বলবে, এখন তাকে তাই করতে হবে। কি করবে, সে বুঝতে পারছে না। ওপর থেকে ঝুরঝুর করে ছাই মাথায় মুখে পড়ছে। আর্চির মাথায় একটা গোলমতো টুপি। সে সাধারণত এ- ধরনের টুপি পরে না। কোথাও কোনো গোলমেলে কাজ থাকলে এটা পরে নেয় সে। সুতরাং ছোটবাবু বুঝতে পারছে, তাকে একেবারে খোলের নিচে নামিয়ে কিছু করাবে। নিচে নামতে সবার ভয়। জাহাজের জং-ধরা পাইপ, জং-ধরা স্কাম বকস জলের নিচে হয়তো বুক-সমান জলের নিচে রয়েছে। খুঁজে বের করতে হবে স্কাম-বকস। জলের নিচে ডুবে নাট-বোল্ট খুলে আনতে হবে। নতুবা এখানে আর্চির দাঁড়িয়ে থাকার কোন মানে হয় না।

আর্চি টর্চ মেরে চারপাশটা দেখছে। ছোটবাবু এতদিন জাহাজে কাজ করেছে জানেই না, জাহাজের এমন একটা জায়গা স্টারবোর্ড-সাইডের বয়লারটা তার পেটের নিচে লুকিয়ে রেখেছে। সে দেখল, অনেক উঁচুতে বয়লারের পেট, গড়িয়ে ওপরে উঠে গেছে। ছাই জমে জমে বয়লারের প্লেটে একটা পলেস্তারা পড়ে গেছে। একটু নড়লেই কুয়াশার মতো ছাই—চারপাশে শুধু ছাই, কিছু ভাঙ্গা র‍্যাগ স্লাইস, ব্যালচে ডাঁই মারা এবং মনে হয় এখন এটা একটা বিরাট উই-এর ঢিবি।

আর্চি তখন টর্চের আলো ঘুরিয়ে এনে ঢিবিটার ওপরে ফেলল। গলার স্বর ভীষণ ঠাণ্ডা। সে বলল, এগুলো স্টোক-হোলডে নিয়ে যাবে।

ছোটবাবু হাত ঢুকিয়ে দিতেই ফুল-ঝুরির মত ছাই চারপাশে ফুর ফুর করে উড়তে থাকল। অর্থাৎ ছোটবাবু আর্চিকে যাবার পর্যন্ত সময় দেয় নি। সে হামলে প্রায় ফুটখানেক নিচ থেকে একটা ভাঙা ব্যালচে তুলে আনল। সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের ছাই উড়ে উড়ে একেবারে জায়গাটা অন্ধকার হয়ে গেল। পেছনের দিকে দরজা ঠেলে দিতেই সে দেখল সারেঙ স্টোক-হোলডে দাঁড়িয়ে আছেন।

সারেঙ সাব বুঝতে পারলেন ছেলেকে তার আর্চি অনর্থক অত্যাচার করছে। স্টিমের খুব একটা মারামারি নেই। দুজন ফায়ারম্যান নিয়ে সারেঙ নিজে এগিয়ে গেলেন—বললেন, তুই বেরিয়ে আয়। আমরা করে দিচ্ছি।

ছোটবাবু বলল, না চাচা। এটা ঠিক হবে না। সে এসে যদি দেখে তোমরা আমার সঙ্গে হাত লাগিয়েছ তবে আরও ক্ষেপে যাবে। বলে সে নাকে মুখে রুমাল বেঁধে নিল। কেউ কিছু দেখতে পাচ্ছে না। সেই কুয়াশার মতো অন্ধকার কারো কথা কানেও যাচ্ছে না। কারণ এনজিনের অতিকায় ঝমঝম শব্দের সঙ্গে সে চিৎকার করে কথা বলছিল, আর ফুরফুর করে ছাই অনবরত শ্বাস প্রশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে ঢুকছে বের হয়ে আসছে—সারেঙ বুঝতে পারলেন—এভাবে আর কিছুক্ষণ ভেতরে থাকলে শ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যাবে ছেলেটা। তিনি তাড়াতাড়ি বালতি বালতি জল সেখানে ঢেলে দিলেন। দেখলেন, গুঁড়ো গুঁড়ো বৃষ্টির মতো ছাই ক্রমে হাওয়ায় থিতিয়ে আসছে। তখন এনজিনের দিক থেকে মাইজলা মিস্ত্রি এগিয়ে আসছে। রাগী চোখ। সারেঙ নিজেও এ-চোখকে সমীহ করেন। কারণ নলিতে মাইজলা মিস্ত্রি ভাল-মন্দ লিখবে—তারপর কেন জানি মনে হয় বয়েস হয়ে গেছে। সিউল-ব্যাঙ্ক জাহাজ থাকলে তিনি থাকবেন, না থাকলে তাঁকেও আর দশজন সারেঙের মতো মাথা নিচু করে রাখতে হবে—তিনি একেবারে পরোয়া না করে ছোটবাবুর সঙ্গে হাত লাগিয়ে কাজটা করে ফেললেন। এ-

কাজগুলো সাধারণ কোলবয়দের কাজ। জল মেরে সারেঙ ঠিকঠাক করে দিলে তবে এ-সব টেনে বের করা যায়।

আর্চির চোখ দুটো শয়তানের মতো ঘুরছে। ছোটবাবুকে জব্দ করার জন্য যেন পাষাণ ভার চাপিয়ে দেখা, কতটা সহ্য করার ক্ষমতা। ছোটবাবু কাজ সেরে যখন বের হতে যাবে, তখন ওকে আর চেনা যায় না। মুখে শরীরে শুধু ছাই আর ছাই, এরই ভেতরে চোখ দুটো লাল রক্তবর্ণ, তখনই ফের সেই ঠাণ্ডা গলা, ম্যান তুমি ভীষণ সাহসী। তুমি পারবে।

তারপর ছোটবাবু দেখল সেই টর্চ ফের দুলছে। ঝড় উঠলে যেমন ঘণ্টাটা পাহাড়ের ওপর দুলে দুলে সতর্ক করে দিত, সামনে মৃত্যুর বিভীষিকা, এখনও সময় আছে কোর্স পাল্টে দাও, তেমনি টর্চ দোলাচ্ছে আর্চি।

ছোটবাবু দাঁড়িয়ে থাকল। এই অকারণ টর্চার কেন যে করছে আর্চি!

আর্চি কাছে এসে মুখ উঁচু করে দেখল ছোটবাবুকে। তারপর দু' পাটির দাঁত শক্ত করে বলল, জ্যাক কিছু বলে নি!

—না, বলে নি।

আর্চি বিশ্বাস করতে পারল না। ম্যানের মুখে চুমো খেয়েছে জ্যাক। সে পোর্ট-হোলে দাঁড়িয়ে দেখেছে। না, ঠিক পোর্ট-হোল থেকে বললে ঠিক হবে না, আসলে সেও নেশার ঘোরে চুপি চুপি ডেকে বের হয়ে গেছিল এবং উইণ্ড-সেলের আড়াল থেকে দেখেছে, জ্যাক পাগলের মতো চুমো খাচ্ছে।

সুতরাং ছোটবাবুর মুখ দেখেও আর্চি বিশ্বাস করতে পারল না, জ্যাক গত রাতের ঘটনা না বলে থাকবে। জ্যাক তার বাবাকে বলতে সাহস পাবে না, কারণ সে তাকে ভয় দেখিয়ে রেখেছে—কিন্তু ছোটবাবু। এবং যখন সে জ্যাককে টেনে নেবার চেষ্টা করেছিল কেবিনের ভেতরে তখন একমাত্র জ্যাক আর্ত গলায় ছোটবাবু, ছোটবাবু বলে চেঁচাচ্ছিল। এ-সব কারণে আর্চির ভেতরে রক্ত টগবগ করে ফুটছে। ক্রমশ এক বিদ্বেষ, ঈর্ষা ছোটবাবুর প্রতি। ছোটবাবুর চোখ রক্তবর্ণ, এবং এটা আর্চির কাছে শয়তানের চোখের মতো। সে না পেরে আবার টর্চ দোলাতে দোলাতে এক জায়গায় থামিয়ে দিল।—ওখানে। ওখানে নেমে যাও। হেল!

ছোটবাবু ঠিক টর্চের আলোতে পায়ে পায়ে যেখানে গিয়ে দাঁড়াল সেটা সেই ঢিবির নিচে ভাঙ্গা লোহার একটা পাটাতন। একটা রোগা মানুষ ঢোকার মত ফাঁক রয়েছে। আর্চি আলো দুলিয়ে নিচে নামতে বলছে ছোটবাবুকে।

ছোটবাবু প্রথম দুটো পা নামিয়ে দিল। সে ধীরে ধীরে দু'পা, তারপর ভাঙ্গা প্লেট বলে, ধারালো অংশে পা লেগে সামান্য কেটে যাচ্ছে—খুব সাবধানে সে জানে গোটা শরীরটা এই হোলের ভেতর দিয়ে নামিয়ে দিতে হবে। নিচে কি অন্ধকার! ঠিক হাতের কাছে একটা রবারের তারে মোড়া ল্যাম্প। সেটা নিয়ে ঠিক খাদের অতলে নেমে যাবার মতো। এবং কাপ্তানের কথা মনে হচ্ছে তার। উত্তেজিত হলে চলবে না। মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করে যেতে হবে—কারণ এ-দিকটায় আর বাতিল ব্যালেস্ট পাম্প জল তুলে ফেলতে পারছে না—ব্যালেস্ট-পাম্পের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। তবু স্কাম- বকস যেন কত পুরাকালে এখানে কেউ এটা ফিট করে রেখে গেছে, তারপর আর মেরামত হয় নি। জাহাজের সব তেলকালি জল, পচা দুর্গন্ধ সব একাকার হয়ে জায়গাটা কৃমির বাসস্থানের মতো হয়ে আছে। ছোটবাবু কিছুটা নেমেই গলার কাছে আটকে গেল। প্রায় বঁড়শিতে ঝোলার মতো—ওর পা হাটু কোমর জলে ডুবে আছে। মুখটা কিছুতেই টেনে নামাতে পারছে না। গলার কাছে প্লেটে আটকে গেছে। আর্চির পায়ের ডগা ওর নাকের কাছে। মনে হচ্ছে ছোটবাবুর মাথা ভেতরে না ঢুকলে, মাথায় দু পা জড়ো করে উঠে দাঁড়াবে আর্চি। এবং তা হলেই হড়হড় করে নিচে ঢুকে যাবে মাথাটা।

আবার নাকের ডগায় টর্চ দোলাতে থাকল। সেই এ্যাবট অফ এ্যাবটব্রথকের ঘণ্টা এবারে

একেবারেই কেটে দেবে। তরবারীর মতো টর্চটা চোখের সামনে দুলছে। দুলতে দুলতে থেমে যাচ্ছে। তারপর চিৎকার, স্কাউন্ডেল।

ছোটবাবু বুঝতে পারছে না, অকারণ ওকে স্কাউড্রেল বলছে কেন! সে তো অনেক চেষ্টা করেও মাথাটা গলাতে পারছে না। সে তো ইচ্ছে করে মাথা বের করে রাখেনি। মাথাটা ঢুকিয়ে নিতে পারলেই সে ডুবে ডুবে সেই স্কাম বকসটা খুঁজে বের করতে পারবে। তারপর ডুবে ডুবে নাট-বোল্ট খুলে স্কাম বকস খুলে ফেলবে। ভেতরটা পরিষ্কার করে ফেললেই ব্যালেস্ট পাম্প এদিকে এই বুকসমান উঁচু জলটা সমুদ্রে ফেলে দিতে পারবে। বন্দরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না। কিন্তু আর্চি যেভাবে গোয়ার্তুমি করছে সে যে এখন কি করে!

তখনই আর্চি প্রায় নাকের ডগায় পা রেখে বলল, কি বলছি শুনতে পাচ্ছ?

—না স্যার! আসলে তো ওকে কিছুই বলেনি এখনও।

—জ্যাকের সঙ্গে মিশবে না।

—মিশব না স্যার।

—কথা বলবে না।

—বলব না স্যার।

—যা বলব ঠিক ঠিক তাই করবে।

—করব স্যার।

আর তখনই মাথাটা ঠিক কি করে যে হড়কে গেল। কানের নিচে সামান্য কেটে গেছে। জ্বলছে। পায়ের খানিকটা অংশ ছুলে গেছে। নোনা জল থাকায় ভীষণ জ্বলছে। সে এবার হাত বাড়িয়ে বলল, স্প্যানার হাতুড়ি দিন।

আর্চি বলল, উঠে এস।

কিন্তু স্যার? ছোটবাবু বাকিটা বলতে পারছে না। ঠিক আলাদিনের দৈত্যের মতো ওপরে বসে রয়েছে আর্চি। সে নিচে। তারের বাতিটা আর্চির হাতে। ওটা ধরে রাখলে, আর স্প্যানার দিলে সে ঠিক স্কামবকসটা খুঁজে বের করতে পারবে। যখন তখন নামা যাবে না। যখন নামা গেছে তখন কাজটা করে ফেলা দরকার। সে হাত দিয়ে জলে ঢেউ দিল। অন্ধকারে খোলের গায়ে জলের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। সে উঠে দাঁড়ালে ঝুপ ঝুপ জলের শব্দ এবং জলে সাঁতার কাটলে যেমন জলের তরঙ্গ চারপাশে ঘুরে ঘুরে ছড়িয়ে যায়, এও ঠিক তেমনি। ছোটবাবু বুঝতেই পারছে না,, স্প্যানার হাতুড়ি আর্চি দিচ্ছে না। কেন। ওকে উঠে আসতে বলছে। ছোটবাবু ভাবল আর্চি আসলে মাথা খারাপ লোক। সিউলি-ব্যাংক জাহাজে যখন সে ছ' নম্বর তখন সেকেণ্ড এনজিনিয়ারের নাট-বোল্ট একটু লুজ থাকবে সে আর বেশী কি। কথামতো সে না উঠলে আবার হয়তো মা-মাসী তুলে খিস্তি জুড়ে দেবে। সুতরাং সে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে মাথাটা কোন রকমে ওপরে গড়িয়ে দিল। তারপর একটা হাত, তারপর কাত হয়ে আর একটা হাত, এবং বুকসমান ওপরে উঠে এল প্রায়। সে তার শরীর এবার নিচে থেকে ওপরে তুলে অনতে পারল। জামা-প্যান্ট জবজবে ভিজে, নোংরা তেলকালি এবং জলে দুর্গন্ধময় শরীর। এখন সে ইচ্ছে করলেই ওপরে উঠে যেতে পারে না। আর্চি তারপর ফের কি বলবে, কে জানে!

আর্চি বলল, ম্যান তোমার ছুটি!

ছুটি! তাকে কি বলছে আর্চি! আর্চি সামান্য হাসল পর্যন্ত। আর্চির চোয়াল চৌকো এবং হাসলে দাবার ছকের মতো মুখটা মনে হয়—কোন ঘরে কি চাল আছে পাকা দাবাড়ু না হলে বোঝা মুশকিল। ছোটবাবু তো কিছুই বুঝছে না। সে দাঁড়িয়ে আছে। কারণ ছুটি বললেই ছুটি হয়ে যায় না, আসলে সে আবার একটা র‍্যাগিং-এর ভেতরে পড়ে গেছে। সেই টি এস ভদ্রা জাহাজে যেমন সিনিয়ার ট্রেনিজরা জুনিয়রদের ওপর অকারণ টরচার করত—এখানেও এই

মেজ-মিস্ত্রি আর্চি তাকে নিয়ে যা খুশী করছে। সে জানত, কোনো নালিশ চলবে না।

এবং সে এজন্যই ছুটি কথাটা বুঝতে পারেনি। ছুটি কথাটার যথার্থ মানে কি সে যেন ভুলে গেছে! এবং ওর মনে হচ্ছিল ছুটি বললেই সে দৌড়ে উঠে যাবে, আর তখন ধাঁই করে পাছায় লাথি মারবে আর্চি। সে উপুড়ে হয়ে পড়তে পারে ভয়ে, ছুটি বলা সত্ত্বেও দাঁড়িয়ে থাকল। মেজ-মিস্ত্রি ওর সামনে থেকে সরে না যাওয়া পর্যন্ত সে যাচ্ছে না। অথবা সে যখন দেখল মেজ-মিস্ত্রি কিছুতেই নড়ছে না, তখন পাশ কাটিয়ে, একেবারে এক দৌড়। এবং ঠিক ওপরে সিলেণ্ডারের সিঁড়িতে এসে থামল। একটু তেলজুট চেয়ে নিতে হবে। মুখে হাতে পিঠে সব কাদার মতো তেল-কালি। সে এই শরীরে এখন কারপেটের ওপর হেঁটে গেলে সব নোংরা হয়ে যাবে। সে কশপের কাছ থেকে বেশি করে তেলজুট নিয়ে নিল।

তারপর যা হয়, সিলেণ্ডারে পাশে লম্বা লোহার জালি, জালিতে বসে ঘসে পা হাত মুখ সাফ করে ফেলল। নিচে বোধহয় আর্চির ওয়াচ শেষ। ফোর্থ নেমে আসছে। ফোর্থ নেমে এলেই আর্চি উঠে যাবে। আর্চির সঙ্গে আবার দেখা হবে ভাবতেই সে আর সেখানেও বসল না। একেবারে দু- লাফে ওপরে উঠে গেল। ওপরে উঠেই অবাক! পোর্ট-সাইডে ঠিক তিন নম্বর ফল্কার পাশে বড় বড় কাঠ এনে ফেলছে ডেক জাহাজিরা। লম্বা কাঠ চিরে ফেলা হচ্ছে। কেন এসব হচ্ছে ছোটবাবু বুঝতে পারছে না। মৈত্রদা অমিয় নেই। ওদের হয়তো এখন ওয়াচ। সে একটু এগিয়ে গেল। সে তাড়াতাড়ি মরা পাখিটাকে দেখবে বলে দু-লাফে ফল্কায় উঠে গেল। এবং পাখিটার পাশে দেখল, জ্যাক দাঁড়িয়ে। সে আর জ্যাকের সঙ্গে কথা বলতে পারে না। জ্যাক তবু ছোটবাবুকে দেখছে। আর্চি ছোটবাবুকে খোলের ভেতর ফের ঢুকিয়ে দিয়েছিল। কষ্টে জ্যাক তাকাতে আর সাহস পাচ্ছিল না। সে মাথা নিচু করে রেখেছে। পাখিটার পাশে দাঁড়িয়ে। সব কাজের যেন তদারক করার ভার তার ওপর – ছোটবাবুর দিকে তাকালেই সে নড়তে পারবে না। আর্চির কথা মনে হলে চোখে আগুন জ্বলতে থাকে—এখন সে সেজন্য হাই করে ডাকল, কার্পেন্টার

কার্পেন্টার ছুটে আসছে।

সে আবার ডাকছে, কশপ।

ডেক-কশপ ছুটে আসছে।

সে ডাকছে, সারেঙ।

ডেক সারেঙ ছুটে এসে সালাম জানাচ্ছে।

সে এমন কি তার বাবাকে টানতে টানতে নিয়ে এল। ডেবিড এবং রেডিও-অফিসার আরও যারা আছে তাদেরও ডেকে নিলে হয়—কারণ এখন একটা কফিন তৈরি হচ্ছে জাহাজে। বড় বড় ফালা কাঠে হাতুড়ি ঠুকছে, পেরেক মারছে কার্পেন্টার। আর সেই লেডি এ্যালবাট্রস উড়ছে। উড়ে উড়ে আসছে। জ্যাক সবাইকে ডাকছে। সে এই পাখির মায়ায় এবং এটা তো ঠিক, সবাই যদিও এখন আর প্রাচীন নাবিকের মতো সংস্কারে ভোগে না তবু কেন যে এটা ওদের বিশ্বাস করতে ভাল লাগে পৃথিবীতে সব নাবিকেরা মরে গিয়ে এ্যালবাট্রস পাখি হয়ে যায়। মরার পরেও সমুদ্রকে ওরা ভুলতে পারে না। সমুদ্রের জন্য তাদের ভীষণ মায়া। তখন তারা পৃথিবীতে আবার এ্যালবাট্রস হয়ে ফিরে আসে। সমুদ্রে উড়ে উড়ে বেড়ায়। তাদের কোন অনিষ্ট করা জাহাজি মানুষের পক্ষে ঠিক না।

কেউ কেউ সামনে না হলেও গোপনে মেজ-মালোম ডেবিডকে যে ধিক্কার না দিচ্ছে তা নয়। আর এটা হয়তো কাপ্তানের ছেলেটা বুঝতে পেরে ঠিক সুমদ্রে একজন মৃত নাবিকের প্রতি যেমন সম্মান দেখানো হয়,—তেমনি সম্মান—আর কত বড় পাখি—প্রায় দশ বারো ফুটের ডানা মেলে সে চিৎ হয়ে পড়ে আছে। জ্যাক ঠোঁট দিয়ে রক্ত ওগলাতে দেখেছে। তারপর চোখ দুটো অসহায়, কি যে অসহায়, পাখিটা জ্যাকের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে ছিল মরে যাবার আগে। জ্যাকের মনে হয়েছিল তেষ্টা পেয়েছে। যেমন মানুষ মৃত্যুর আগে ভীষণ

তৃষ্ণার্ত বোধ করে। পাখিটাও হয়তো ওর দিকে করুণ চোখে একটু জলপানের নিমিত্ত তাকিয়ে আছে—সে ছুটে গিয়ে জল এনেছিল। জল খেতে দিয়েছিল। আশ্চর্য পাখিটা প্রায় বুক ভরে জল তেষ্টা নিবারণ করতে করতে চোখ বুজে ফেলেছিল।

জ্যাক শুধু ছোটবাবুকে বলেছিল, তুমি স্নান করে এস ছোটবাবু। ভাল প্যান্ট-জামা পরবে। ছোটবাবু কিছু বলল না। সে কথা না বললেই হ'ল। জ্যাক যা বলেছে এখন তাকে তাই করতে হবে। সে কেবিনে চলে গেল স্নান করবে বলে। তারপর সারাদিন ছুটি। অন্য সময় হলে সে জ্যাককে বলত, আমার সারাদিন ছুটি। আর্চি ভীষণ খুশি আমার কাজে। আমাকে সে ছুটি দিয়েছে জ্যাক। কিন্তু সে যখন কথা দিয়েছে আর্চিকে, তখন আর কিছু বলা যায় না। না হলে যেন বলা যেত, তোমার দুটো একটা বই জ্যাক আমাকে দেবে। সারাদিন বাংকে শুয়ে আজ শুধু বই পড়ব।

পাখিটার মৃত্যুর পর ডেবিডেরও খারাপ লাগছিল। যত না এই পাখিটার জন্য তার চেয়ে বেশি লেডি এ্যালবাট্রসের জন্য। কারণ লেডি এ্যালবাট্রস এখন সমুদ্রে একা। এবির মতো নিঃসঙ্গ। এবির কাতর চোখমুখ এখন যেন তাড়া করছে। সে একেবারে পাটভাঙ্গা ইউনিফরম পরে এসেছে।

এবং এভাবে প্রায় সব নাবিকেরা এখন গোল হয়ে দাঁড়িয়েছে পাখিটার চারপাশে। কাপ্তান কি ভেবে বাইবেল এনেছেন সঙ্গে। এনজিন-সারেঙ কোরাণশরিফ। বাইবেল থেকে কাপ্তান বেশ সুর করে দুটো একটা স্তবক—অর্থাৎ মৃত্যু জীব মাত্রেই শেষ কথা নয়, ঈশ্বরের দুটো একটা বাণী এমনভাবে পড়ে শুনিয়ে গেলেন। কোরাণশরিফ থেকে দুটো সুরা পড়ে গেলেন সারেঙ এবং সবই মৃত্যু সম্পর্কিত কথাবার্তা। দেখলে মনে হবে এই বিশাল সমুদ্রে তারা সত্যি সত্যি একজন মৃত নাবিককে সুমদ্রে সমাধিস্থ করছে। আর্চি দু-বার এদিকটায় এসেছিল, সে এসব দেখে ভীষণ ছেলেমানুষী ভেবেছে। জ্যাকের শরীরের প্রতি তার লোভ ভীষণ। সেও বেশ সেজে-গুজে মাথায় তার জাহাজি টুপি, পায়ে সাদা জুতো, সাদা মোজা একেবারে সব সাদা ইউনিফরমে জ্যাকের পাশে দাঁড়িয়ে গেল।

জ্যাক এত নিবিষ্ট যে কে তার পাশে কিভাবে দাঁড়িয়েছে খেয়াল নেই। সবার সঙ্গে সে পাখির ডানা ধরে কাঠের বাকসোতে শুইয়ে দিল। পেরেক মেরে সে নিজেই ঢাকনা বন্ধ করে দিল। কাপ্তান ঘুরে-ফিরে তদারক করার মতো কাজটা দেখছেন। কাঠ একটু বেশি বের হয়ে থাকলে কার্পেন্টারকে ডেকে কাঠ কেটে দিতে বলছেন।

এনজিন-সারেঙ কেমন মুহ্যমান পাখিটার মৃত্যুতে। তিনি পর পর সব বেছে বেছে সুরা আবৃত্তি করে যাচ্ছেন। যেমন বলছেন—যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন, তবে এমন কেউ নেই যে তোমাদের পরাভূত করতে পারে; আর তিনি যদি তোমাদের পরিত্যাগ করেন তবে কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে। আর আল্লার ওপরেই বিশ্বাসীদের নির্ভর করা উচিত।

এনজিন-সারেঙ নিবিষ্ট মনে সুর ধরে পড়ে যাচ্ছেন। জাহাজ চলছে না এখন। জাহাজ সমুদ্রে থেমে আছে। সবকিছু কেমন স্থির অবিচল, কেবল পাখিটা বাদে। ঘুরে ঘুরে কখনও একেবারে মাথার ওপর উড়ে আসছে সে। সে দেখছে তার সঙ্গী পুরুষ পাখিটা আর ডেকে নেই। নাবিকেরা তাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে। তবু সে মাথার ওপর এই ত্রিশ চল্লিশ ফুট ওপরে উড়ছে। উড়ে উড়ে অনেক নিচে নেমে আসছে। এবং পাখিটাই এখন শোকার্ত মানুষের মতো মৃত্যুর আবাহাওয়া তৈরি করছে। তখন সারেঙ বলে যাচ্ছেন। সবাই মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি বলছেন, প্রত্যেক প্রাণ মৃত্যু আস্বাদন করবে। আর তোমাদের প্রাপ্য যা তাই তোমাদের দেওয়া হবে পুনরুত্থানের দিনে। তখন বহুদূর যে অবস্থান করবে আগুন থেকে আর প্রবিষ্ট হবে উদ্যানে নিঃসন্দেহে সে সফলকাম।

তারপর তিনি বললেন, হে আমাদের পালনকর্তা সন্দেহ নেই যাকে তুমি আগুনে প্রবিষ্ট

করাও তাকে তুমি প্রকৃতই লাঞ্ছিত করেছ। আর যারা অন্যায়কারী তাদের সহায় কেউ থাকে না।

আর্চি আড়চোখে দেখছে জ্যাকেক। এখন বুঝতে অসুবিধা হয় না জ্যাকের স্তন উঁচু বলেই বুকের কাছটা বেমানান। শরীর জ্যাকের ঠিক রোগা বলা যায় না, যা আছে সবই ঠিক ঠিক মতো! সে এসবের ভেতরও জ্যাকের শরীর দেখতে দেখতে কেমন লোভী চতুর হয়ে যাচ্ছে। সারেঙ-এর শেষ কথা, সে যেন শুনতে পাচ্ছে না–আর যারা অন্যায়কারী তাদের সহায় কেউ থাকে না—সারেঙ এত সব কি বিড় বিড় করে কথা বলছেন বলে আর্চি কিছুটা বিরক্ত। সে এ-সময় একটা চুরুট ধরাতে পারলে বেঁচে যেত।

চিফ-অফিসার, রেডিও-অফিসার পাঁচ নম্বর এনজিনিয়ার মাথার দিকটায়। নিচের দিকে কাপ্তান, জ্যাক। আর্চি এনজিন-সারেঙ দু'পাশে আর সব জাহাজিরা। ছোটবাবু একপাশে সবার ভেতরে। সে একটু সবার আড়ালে পড়ে গেছে।

এবার কাপ্তান পড়ে শোনালেন—যীশুখৃষ্টের জন্ম এইভাবে হইয়াছিল। তাঁহার মতা মরিয়ম যোসেফের প্রতি বাগদত্তা হইলে তাঁহাদের সহবাসের পূর্বে জানা গেল তাঁহার গর্ভ হইয়াছে—পবিত্র আত্মা হইতে। আর তাঁহার স্বামী যোসেফ ধার্মিক হওয়াতে ও তাঁহাকে সাধারণের কাছে নিন্দার পাত্র করিতে ইচ্ছা না করাতে, গোপনে ত্যাগ করিবার মানস করিলেন। তিনি এই সকল ভাবিতেছেন, এমন সময় দেখ, প্রভুর এক দূত স্বপ্নে তাঁহাকে দর্শন দিয়া কহিলেন, তোমার স্ত্রী মরিয়মকে গ্রহণ করিতে ভয় করিও না। কেননা তাহার গর্ভে যাহা জন্মিয়াছে, তাহা পবিত্র আত্মা হইতে আসিয়াছে। আর তিনি পুত্র প্রসব করিবেন, কারণ তিনিই আপন প্রজাদিগকে তাহাদের পাপ হইতে ত্রাণ করিবেন। আর তাঁহার না রাখা যাইবে ইম্মানুয়েল। অনুবাদ করিলে ইহার অর্থ দাঁড়াল আমাদের সহিত ঈশ্বর।

জ্যাক তখনই কেন জানি ছোটবাবুর জন্য মনে মনে অধীর হয়ে উঠল। ছোটবাবু এখনও আসছে না। আসলে ছোটবাবু জাহাজিদের পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। জ্যাক বুঝতে পারেনি। সে বলল, সবাই এসেছে বাবা?

কাপ্তান বের হয়ে এলেন ভিড়ের ভেতর থেকে। সঙ্গে এনজিন-সারেঙ। চিফ-অফিসার ঘুরে ঘুরে দেখলেন। সবাই এসেছে। জ্যাক নিজে বের হয়ে যখন দেখল ছোটবাবু আছে, তখন আর কে এল না এল যেন আসে যায় না। এবারে ওরা একজন নাবিকের সলিলসমাধির মতো কফিনটাকে সবাই ধরে জলে ফেলে দিল। সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের প্রপেলার ঘুরে গেল। তিনবার সমুদ্রের বুকে চিমনি থেকে সাইরেনের আওয়াজ—ক্রমে সেই কফিন বড় বড় পাথর সহ সমুদ্রের অতলে ডুবে গেল।

জ্যাক রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকল।

যতদূর দেখা যায় জ্যাক রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে দেখল।

এখন বোঝাই যায় না কোথায় সেই পাখির মৃতদেহ ফেলে দেওয়া হয়েছে। সমুদ্র আবার আগের মতো নিরিবিলি। একটা অতীব পাপের কথা মনে হল জ্যাকের। চারপাশের কত কিছু ঘটনা জাহাজটাকে যে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে! সে চোখ তুলে ছোটবাবুকে খোঁজার সময় দেখল, বোট-ডেক খালি। আর্চি এখন বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে। যেখানে ছোটবাবু দাঁড়াত, ডেবিড ছোটবাবুর সঙ্গে বসে গল্প করত, আর্চি সেখানে দাঁড়িয়ে দূরবীনে লেডি-এ্যালবাট্রসকে দেখছে। ডেকে কজন জাহাজি। ওরা কাজ করছে। দড়িদড়া গোছাচ্ছে। আর কেউ নেই। বোট-ডেকে আর্চিকে দেখে সে সিঁড়ি ধরে উঠে গেল না। নিচে এলি- ওয়ে ধরে ছোটবাবুর কেবিনের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। সে ডাকল, ছোটবাবু।

কোন জবাব নেই।

সে সন্তর্পণে ডাকল, ছোটবাবু, আমি জ্যাক

ছোটবাবু ভেতরে পোর্ট-হোলে দাঁড়িয়ে আছে।

জ্যাক ডাকল, ছোটবাবু তুমি ঘুমোচ্ছ?

ছোটবাবু দরজা খুলে দিচ্ছে না। ছোটবাবু বোধহয় অসময়ে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু আর্চি ওকে ঘুমোতে দেখলে ভীষণ একটা কেলেঙ্কারী করবে। সে দৌড়ে বাইরে বের হয়ে পোর্টহোলে উঁকি মারল। ছোটবাবু ঘুমোয়নি। পোর্ট-হোলে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ

জ্যাক বলল, তুমি সাড়া দিচ্ছ না কেন?

ছোটবাবু বলল, আর্চি বারণ করেছে।

—বারণ করেছে মানে!

—তোমার সঙ্গে কথা বলতে বারণ করেছে। কথা বললেই খোলের ভেতর টেনে নিয়ে যাবে বলেছে।

জ্যাক মাথা নিচু করে চলে যাচ্ছিল।

ছোটবাবু জ্যাককে এভাবে চলে যেতে দেখে কেমন ঘাবড়ে গেল। জ্যাক রেগে গেলেও সে মুশকিলে পড়ে যাবে। এমন একটা অসহায় অবস্থা কি করে বোঝাবে জ্যাককে! সে ডাকল, জ্যাক শোন!

জ্যাক ফিরে এসে বলল, আমাকে কিছু বলবে?

ছোটবাবু বলল, জ্যাক চুল বড় রাখলে তোমাকে দেখতে ভাল লাগে।

জ্যাক বলল, তাই বুঝি

—তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।

জ্যাক পরেছে খয়েরী রঙের ট্রাউজার। নানাবর্ণের কারুকার্যময় মীনাকরা সাদা জ্যাকেট। ওর চুল ঘাড়ের কাছে বেশ লম্বা হয়ে গেছে। বোধহয় আবার জাহাজে কাপ্তানকে দেখা যাবে খুঁজে বেড়াচ্ছেন জ্যাককে। হাতে কাঁচি। জ্যাকের চুল এভাবে ক্রমে গভীর নীল রঙের হয়ে গেলেই বুড়ো কাপ্তান কেন যে চিন্তায় পড়ে যান! এমন সুন্দর চুল কেটে ফেললে, জ্যাককে ভীষণ বাজে লাগে দেখতে। এবং এই যে জ্যাক দাঁড়িয়ে আছে ওর সামনে, কেমন মেয়েলি ধরনের চোখ-মুখ, দুবার চোখ তুলে ছোটবাবুকে দেখেই আবার বলছে, আমি যাই ছোটবাবু। চোখ নামিয়ে নিতে পারলে যেন বাঁচে।

ছোটবাবু ভাবল, রাগ পড়েনি হয়তো। সে দেখেছে, জ্যাককে সুন্দর বললে ভীষণ খুশি হয়! এখন সে জ্যাককে খোসামোদ করছে। আর কিভাবে কি করা যায় সে বুঝতে পারছে না। সে বলল, আমরা পালিয়ে কথা বলব জ্যাক। আর্চিকে দেখলেই আমরা কেউ কাউকে চিনতে পারব না, কেমন

জ্যাক হেসে দিল। বড় কাতর হাসি। দু'গালে সেই হাসি একটা হাল্কা করুণ বিষণ্ণতা ছড়িয়ে দিয়ে গেল! সে বলল, তাই হবে ছোটবাবু। হয়তো জ্যাক আরও কিছু বলতে পারত, কি বলতে পারত অবশ্য জানে না। তবু জ্যাক নিজেকে ছোটবাবুর চেয়ে বেশি চালাক ভেবে থাকে। সে বলল, ছোটবাবু জাহাজে কাউকে বল না আর্চি কথা বলতে বারণ করেছে।

—কি দরকার বলার!

—তুমি যদি ডেবিডকে বলে দাও আবার...।

—আরে না! তারপর একটু থেমে বলল, আচ্ছা জ্যাক, আর্চি কি টের পেয়েছে তুমি ওকে ফেলে দিয়েছিলে!

—নাতো।

—গত রাতে আর্চির পেছনে লাগতে গেছিলে কেন?

—আর্চির পেছনে! বলে জ্যাক দু-হাতে এমন ভঙ্গী করল যে ছোটবাবুর মনে হল, আর্চিকে দেখলে এক্ষুনি কপালে ঢিল ছুঁড়ে মারবে জ্যাক। সে শেষে বলল, আমার ইচ্ছে। পোর্ট-হোলে

সে আর এক দণ্ড দেরি করল না।

তখনই আবার জ্যাকের কি যেন হয়ে যায়!

আসলে জ্যাক, পুরুষ পাখিটার মৃত্যুতে ভারি কষ্টের ভেতর পড়ে গিয়েছে। ছোটবাবুর অসহায় মুখ দেখলে কষ্টটা আরও বাড়ে।

সে ঘড়িতে দেখল দশটা বাজে। কেবিনে ঢুকে চুপচাপ বসে থাকবে ভাবল। জাহাজে সে ভীষণ বিপদের মুখে পড়ে গেছে। আর্চি তাকে ক্ষিপ্ত নেকড়ের মতো চোখে চোখে রাখছে। এবং তাকে কখনও কাছে সুযোগ মতো পেলেই হল! শিকার নিয়ে খেলার মতো বাঘটা তাকে নিয়ে খেলতে চাইবে।

এবং এভাবেই সে সব বুঝতে পারে। অভিজ্ঞতা ক্রমে তাকে অনেক বেশি পরিণত করে দিয়েছে। বাবার কাছে বসে থাকলে সে নিরাপদ ভাবে। বাবার কাছে না থাকলে মনে হয় ফিকির খুঁজছে আর্চি আর এভাবে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। সে কেবিনে না ঢুকে সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠতে থাকল। চার্টরুমের পাশ দিয়ে যাবার সময় নিচে দেখল না, কে আছে। আর্চি যে আছে সে না দেখেও বুঝতে পারে। লেডি এ্যালবাট্রসের ডানা ভেঙ্গে দেবার জন্য ওঁৎ পেতে বসে আছে।

তখন ডেবিড কিছু ভেবে পাচ্ছিল না। চোখে ঘুম ঘুম ভাব। সকাল থেকে সে দু-চোখ এক করতে পারেনি। কোর্স-লে ভুল হওয়ায় মনটা ভাল ছিল না। এ্যালবাট্রসের মৃত্যুর পর মনটা আরও খারাপ ছিল। এবং যখন বাইবেল থেকে তিনি পড়ে শোনাচ্ছিলেন, তখন ডেবিড ভেবে পেল না, কাপ্তান মৃত্যু সম্পর্কিত দুটো একটা কথা বলেই খৃষ্টের জন্ম সম্পর্কে এতটা বিস্তারিত বক্তৃতা ঝাড়লেন কেন! আর বার বার বলছিলেন, ইম্মানুয়েল, আমাদের সহিত ঈশ্বর। আমাদের সহিত ঈশ্বর আছেন। তিনি আছেন বেশ, তাকে ফলাও করে এত বলার কি দরকার! অহেতুক এমন একটা শোকার্ত সময়ে আমাদের সহিত ঈশ্বর, বার বার বলার কি যে দরকার। কাপ্তান হিগিনস কি ঈশ্বরের ভরসায় এবার সমুদ্র সফরে বের হয়েছেন! ওরা জাহাজ ঠিকঠাক চালাতে না পারলেও তার ঈশ্বর অর্থাৎ আমাদের সহিত ঈশ্বর চালিয়ে নেবেন!

যত এমন হচ্ছে তত ডেবিড সংশয়ের ভেতর পড়ে যাচ্ছিল। কাপ্তানের নিজের সাহসও ক্রমে কমে আসছে। অথচ জাহাজে তিনিই সবার ঈশ্বরের মতো। এবং এই প্রথম জাহাজে বোট-ড্রিল শুরু হয়েছে। প্রতি পনেরো দিন অন্তর নিজেদের সেফটির জন্য একবার অন্ততঃ বোট-ড্রিল যেখানে করার দরকার, সেখানে কাপ্তান মাসে দু'মাসে একবার করাতেন। আবার ছ'মাসও বন্ধ থাকত একনাগাড়ে। জাহাজ প্রশান্ত মহাসাগরে নেমে আসার পর কাপ্তান থার্ড-মেটকে ডেকে পাঠিয়েছেন। বলে দিয়েছেন, নিয়মিত বোট-ড্রিল হবে জাহাজে। সেফটির জন্য সব বোট তিনি নিজে দেখা-শোনা করেছেন। মাত্র চারটা লাইফ-বোট। লাইফ-বয়া প্রতি তিনজনের জন্য একটা। আর প্রত্যেকের আছে একটা করে লাইফ- জ্যাকেট। জাহাজ ডুবি হলে এ-চারটা বোটই তাদের একমাত্র সম্বল।

কাপ্তান বিশ্বাসই করতেন না, জাহাজ সিউল-ব্যাংক সমুদ্রে কখনও ডুবে যেতে পারে! না হলে ডেবিড যতবার জাহাজে এসেছে এই জাহাজে ততবার সে দেখেছে স্যালি হিগিনস এসব বোট-ফোটের পরোয়া করতেন না। রাজার মতো জাহাজ বন্দরে চালিয়ে নিতেন। সিউল-ব্যাংকের কিছু হতে পারে তিনি স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না।

তাই স্যালি হিগিনসের এসব নির্দেশ ডেবিডকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। গত রাতে যা সব ঘটল। এবং কোর্স-লে রহস্য নিয়ে কেউ ভাববার সময় পায়নি। এ্যালবাট্রসের মৃত্যু এবং জাহাজের ওপর একটা বিষণ্ণতা ঝুলেছিল বলে কেউ কিছু বলাবলি করেনি। আর জ্যাককে তো মোটামুটি সবাই সমীহ করে থাকে। সে যখন চায় এ্যালবাট্রস পাখিটার সমাধি হোক, তখন তারা এ-নিয়ে আর কথা বলতে পারে না। এ্যালবাট্রস হত্যার সময় কিছুই মনে হয়নি। কিন্তু সেই গোল হয়ে দাঁড়ানো, কফিনের ভেতর পুরে দেওয়া, ঠুকঠুক করে পেরেক মেরে দেওয়া,

এ-সবের ভেতর প্রত্যেকের বোধহয় কোন প্রিয় স্মৃতি জড়িয়ে থাকে। এ্যালবাট্রসের সমুদ্রে সমাধি প্রকৃত একজন জাহাজির সমুদ্রে সমাধি হচ্ছে এমন মনে হয়েছিল সবার। তারা একটা মৃত পাখির চারপাশে দাঁড়িয়ে আছে মনেই হয়নি। যেন কোন প্রিয়জনের কফিনের পাশে দাঁড়িয়ে তারা ঈশ্বরের কাছে মৃত আত্মার শান্তি কামনা করছিল।

ডেবিড এসব ভেবে পাশ ফিরে শুল। বারোটায় লাঞ্চ। সে এখন একটু গড়িয়ে নিতে চায়। বিকেলে বারোটা-চারটায় তার ফের ওয়াচ। জাহাজ বন্দরে না যাওয়া পর্যন্ত এভাবে চলবে। সামান্য গড়িয়ে নিতে পারলেই সব ফের ঠিক হয়ে যাবে ভেবেছিল। কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসছে না। কাপ্তানের কাজ- কর্ম সবই কেমন ক্রমে সংশয়ের ভেতর ফেলে দিচ্ছে তাকে।

আর তখন চুপি চুপি অমিয় পা টিপে টিপে ছোটবাবুর কেবিনের পাশে এসে সন্তর্পণে ডাকল, ছোট দরজা খোল।

ছোটবাবু তড়াক করে লাফিয়ে উঠে পড়ল ব্যাংক থেকে। দরজা খুলে তাড়াতাড়ি ওকে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দিল। কে কোথায় দেখে ফেলবে! সে বলল, কি ব্যাপার!

—বলছি। বলে অমিয় ছোটর কেবিনটা দেখল। ভারি মনোরম লাগছে। কি ঝকঝকে সব কিছু। নিচে কার্পেট পাতা। দুটো দু'পাশে বড় বড় কাঠের বাংক। সে রং করে যাবার পর আর আসেনি। ছোটবাবুর বিছানা ধবধবে সাদা। একটু গড়িয়ে নিতে ইচ্ছে করছে। দেয়ালে ওর মায়ের ছবি। একটা ক্যালেণ্ডার। তার পাতায় তারিখের ওপর ক্রস টানা। একটা করে দিন যাচ্ছে, ছোটবাবু দিনটার ওপর ক্রস টেনে দিচ্ছে। সে সব দেখতে দেখতে বলল, তোকে একবার ফোকসালে যেতে হবে ছোটবাবু।

ছোটবাবু বলল, কেন কি হয়েছে?

অমিয় বলল, মৈত্রকে নিয়ে আর পারা যাচ্ছে না।

—ঝগড়া বাঁধিয়েছিস ফের?

—ধুস, ঝগড়া করতে যাব কেন। ও বেটা মরবে।

—কি বলছিস যা তা!

অমিয় ফিসফিস করে বলল, সত্যি বলছি। এভাবে থাকলে ও ঠিক মরবে। বললাম মেজ-মালোমের কাছে যেতে। কিছুতেই যাচ্ছে না। দিনরাত যন্ত্রণায় কষ্ট পাচ্ছে। জ্বর ভীষণ। এই নিয়েই ওয়াচ করছে। চোখ মুখ লাল! কেবল পালিয়ে থাকছে। আলোতে বের হচ্ছে না। নিচে স্টক-হোলডে জবুথবু হয়ে বসে থাকে। কথা বলে না।

—কি হয়েছে বলবি তো!

—আর কি হবে? বললাম ছোটকে অন্তত বলি। তেড়ে এল। ছোটকে বলে কি হবে! ও হারামজাদা মানুষ নাকি। ওতো নিজেই অমানুষ। ওকে মেজ-মিস্ত্রি যা না তা করাচ্ছে। মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছে। বোধ বাসি্য থাকলে কেউ এভাবে সহ্য করতে পারে না!

ছোটবাবু হাসল। বলল, আমার জন্য মৈত্রদাকে মাথা গরম করতে বারণ করবি। কিন্তু কি হয়েছে বলবি তো!

অমিয়, পৃথিবীর কেউ যেন আর শুনতে না পায়, এত আস্তে কি যে সব বলল। তারপর বলল, আমাকে শাসিয়েছে। বলেছে, যদি দু-কান হয় তবে সে আমাকে খুন করবে।

ছোটবাবুর মুখ ভীষণ চিন্তিত দেখাল। সে বুঝতে পারল, এসব দু-কান হলে মৈত্রদাকে জাহাজ থেকে নামিয়ে দেবে। নামিয়ে দিলেই খুব অর্থাভাবে পড়ে যাবে। শেফালী বৌদির জন্য ওর অনেক টাকার দরকার। কফিনটাকে যখন সমুদ্রে ফেলে দেওয়া হয় তখন মৈত্রদা ছিল না। সে বোধহয় আসেনি। এলে ভাল করে দেখা যেত। ছোটবাবু কি ভেবে বলল, গিয়ে কিছু বললেই তো খেপে যাবে।

—তুই ওর কপালে হাত দিয়ে দেখবি। তুই ওর চোখ মুখ দেখেই টের পেয়েছিস

এমনভাবে বলবি—ওর গোঁয়ার্তুমি ভাল লাগছে না। এক ফোকসালে থাকি, আমার ভয় করছে।

ছোটবাবু বলল, মেয়েটা ওকে কতভাবে বারণ করেছে। শুনল না।

—নে, এখন মর। বলছে, তাহিতিতে নেমে ডাক্তার দেখাবে। পেনিসিলিন নেবে। নিলেই ঠিক হয়ে যাবে। আর কটা দিন তো।

ছোটবাবু বলল, লাঞ্চের পর যাব। আর্চি তখন খেয়ে ঘুমোয়।

অমিয় দরজা খুলে মুখ বার করল সামান্য! কোনো অফিসার এনজিনিয়ার এদিকে আসছে কিনা দেখল। না কেউ আসছে না। সে বের হয়েই পোর্ট-সাইডের গ্যাংওয়ের দিকে চলে গেল। দেখলে মনে হবে, সে এনজিন-রুম থেকে উঠে ডেকে হেঁটে যাচ্ছে। ছোটবাবুর কেবিন থেকে বের হয়ে আসছে সে কাউকে বুঝতেই দিল না।

বিকেলে ছোটবাবুও এভাবে গোপনে মৈত্রদার ফোকসাল থেকে বের হয়ে এসেছিল। যেন সে স্টিয়ারিং এনজিনের পেনিয়ান মেরামত করে উঠে আসছে। সে ভাণ্ডারিজ্যাঠাকে বলল, জ্যাঠা তোমাদের ছেড়ে থাকতে ভাল লাগছে না। আর তখনই এনজিন-সারেঙ ডেক-সারেঙ ডেকের ওপর চিৎকার চেঁচামেচি লাগিয়েছে। সবাই যে যার ফোকসাল থেকে বের হয়ে আসছে। অনেক দূরে দিগন্তে কি দেখে সবাই আঁৎকে উঠছে। কি যে আসছে সব মেঘের মতো! কুণ্ডলি পাকিয়ে ক্রমে কখনও সারা আকাশ জুড়ে পঙ্গপালের মতো অজস্র কালো বিন্দু বিন্দু। আবার এক হয়ে যেন ঝড় অথবা বনের হরিৎবর্ণ পাতারা উড়ে উড়ে এদিকে চলে আসছে। ব্রীজে সব অফিসাররা দূরবীন চোখে দেখছে। লেডি এ্যালবাট্রসকে জাহাজের চারপাশে অথবা দিগন্তের কাছাকাছি কোথাও দেখা যাচ্ছে না! এখন যা দেখা যাচ্ছে নির্মল আকাশের নিচে সেই অদ্ভুত এক চিরহরিৎবর্ণের গাছের শাখা-প্রশাখা একত্র ডাই মেরে যেন উড়ে আসছে। অথবা কখনও ভয়ংকর ক্রুব্ধ। মেঘের মতো তাদের ধাবমান শব্দ এবং ডেকের, ব্রীজে যে যেখানে ছিল স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। সূর্য তখন আকাশের নিচে হেলে পড়েছে। সূর্যকে ঢেকে দিয়ে জাহাজের পেছনে পেছনে কালো ক্রুব্ধ অতিকায় কিছু এগিয়ে আসছে।

এ-সবের ভেতর কেউ লক্ষ্য করছে না ফোর-মাস্টের নিচে জ্যাক দাঁড়িয়ে আছে। ওর পকেটে ছোট ছোট পাথর, লোহার টুকরো। সে দূর থেকে পাগলের মতো একের পর এক পাথর ছুঁড়ে যাচ্ছে! কোনোটা মাস্তুলের ডগায় লাগছে। কোনোটা লাগছে না। লাগলে ঠুং করে আওয়াজ হচ্ছে! এমন একটা ভয়ংকর বিপদের সামনে জাহাজ অথচ সে এতটুকু বিচলিত হচ্ছে না। সে ক্রমাগত পাথর ছুঁড়ে যাচ্ছে।

আর ছোটবাবুর যেন এসবে আসে যায় না কিছু। সে কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল।

॥ ছাব্বিশ ॥

ওরা এভাবে সবাই ডেকের ওপর দাঁড়িয়েছিল!

মাংকি-আয়ল্যাণ্ডে কাপ্তান, রেডিও-অফিসার, সেকেণ্ড-মেট। ব্রীজে চিফ-মেট, কোয়ার্টার-মাস্টার, থার্ড-মেট। কাপ্তান চোখ থেকে কিছুতেই দূরবীন নামাচ্ছেন না।

সেকেণ্ড-মেট কিছু বুঝতে পারছে না। জাহাজের পেছনে অনেক দূরে, কত দূরে হবে বুঝতে পারছে না, প্রায় যেন দিগন্তের কাছাকাছি ভলকানিক ইরাপসান অথবা কালো ধোঁয়া ক্রমান্বয়ে কুণ্ডলি পাকিয়ে ওপরে উঠে আসছে।

কাপ্তান বললেন, কি যে এগিয়ে আসছে?

—দেখেছেন স্যার, কেমন ওটা এখন একেবেঁকে দিগন্তে সার সার সমান্তরাল রেখা হয়ে গেল! রেডিও-অফিসার বলল, ঠিক যেন কোন চিত্রকরের ছবি

এবং এভাবে ওরা সেই দিগন্তে দেখতে পেল নানারকমের সব ছবি হয়ে যাচ্ছে। অতিকায় সব ছবি। কখনও একেবেঁকে ফুল লতা-পাতার মতো, কখনও ঘুরে ঘুরে জলস্তম্ভের মতো, কখনও উড়ে উড়ে বিন্দু বিন্দু আঙ্গুরগুচ্ছের মতো আকাশে ঝুলে পড়তে লাগল। তারপর ফের ছড়িয়ে পড়ল পেছনের আকাশে। এত দূরে যে দূরবীনে আসছে না। তবু ওরা যে এদিকে এগিয়ে আসছে এটা বোঝা যাচ্ছে। কারণ ক্রমশ ওদের এলোমেলোভাবে ছড়িয়ে আবার শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে এগিয়ে আসার ভেতর মনে হচ্ছিল, মেঘেরা সজীব হয়ে গেছে। এবং যেমন খুশি আকাশের গায়ে চিত্রকরের মতো অতিকায় সব বর্ণাঢ্য ছবি এঁকে দিচ্ছে। আবার মনে হচ্ছিল, বড় মাঠে সেই সুন্দর বালিকারা যেমন দ্রুত প্যারেড করার সময় হাত-পা কখনও উঁচুতে কখনও নিচুতে আবার রাইট টার্ন, আবার লেফ্‌ট টার্ন, আবার ঝুঁকে বসে পড়া একসঙ্গে এবং একসঙ্গে উঠে দাঁড়ানো, অথবা দু'হাত ছড়িয়ে ডানা মেলে দেবার মতো ঘুরে ঘুরে ছবি হয়ে যাওয়ার মতো কোনো বড় মাঠে প্যারেড হচ্ছে। এত বড় আকাশটা ওদের যেন হাঁটা চলার জন্য। ঘুরে বেড়ানোর জন্য, কখনও পোশাক সবুজ বর্ণের মনে হয়, অথবা ঘন নীল রং-এর সমুদ্রে এসব দৃশ্য সবাইকে ক্রমে অস্থির করে তুলছে।

তখনই সেকেন্ড-মেট বলল, স্যার বিন্দু বিন্দু কিছু একসঙ্গে জড় হয়ে এদিকে আসছে।

—বিন্দু বিন্দু! কাপ্তান দূরবীন নামিয়ে চশমা রুমাল দিয়ে খুব করে মুছে নিলেন।

—মনে হচ্ছে পাখির মতো।

—পাখি! কাপ্তান অতীব আতঙ্কে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন।

তারপর কাপ্তানের মনে হল, তিনি জাহাজের রক্ষাকারী এবং সর্বময়, সুতরাং পাখির কথায় এভাবে ভেঙ্গে পড়া ঠিক না। এবং তিনি যে আতঙ্কে চিৎকার করে উঠেছিলেন ওটাও ভাল ভুল হয়ে গেছে। স্বাভাবিকভাবে কথাবার্তা বলা দরকার। তিনি বললেন, তবে ওরা আসছে?

—হ্যাঁ, মনে হয় আসছে।

—আসতে দাও।

সেকেন্ড-মেট বলল, ওরা কেন আসছে?

–বোধ হয় খাবারের সন্ধানে।

সেকেন্ড-মেট এমন কথায় আশ্বস্ত হতে পারল না। এবং দেখল প্রায় দীর্ঘ এক অজগর সাপের মতো একটা গগনচুম্বী আঁকাবাঁকা কালো কিছু আকাশের গায়ে ঝুলে পড়ছে। মনে হচ্ছে বিশাল জলরাশির অতল থেকে ওরা দলে দলে একসঙ্গে ঝাঁকঝাঁক পাখি, একসঙ্গে জড় হয়ে ক্রমশ সমুদ্রে ছায়া বিস্তার করে উড়ে আসছে।

ওরা দেখতে পেল ওটা ক্রমশ বিস্তার লাভ করছে সাপের ফণার মতো। অথবা ছাতার মতো অনেক ওপরে জাহাজটাকে ঢেকে দিচ্ছে।

তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। অন্ধকার সমুদ্র তারপর। রাতে ওরা কোথায় কি করবে কেউ বুঝতে পারছে না। পাখিগুলো যে ধূসর বর্ণ এটা টের পাচ্ছে তারা। দূরবীনে ওদের এখন পঙ্গপালের মতো লাগছে দেখতে। ওরা বুঝল, পাখিগুলো আকারে খুব ছোট। একসঙ্গে ঝাঁকে ঝাঁকে এই সব পাখিরা দল বেঁধে উড়তে ভালবাসে। সুতরাং এরা জাহাজের ওপর প্রায় একটা প্রকান্ড ছাতার সামিল। শুধু ধূসরবর্ণ, আর একসঙ্গে ওরা কলরব করছে বলে, ঝমঝম বৃষ্টিপাতের মতো শব্দ। ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে, ছড়িয়ে পড়ছে। অনেক দূরে দিগন্তের কাছাকাছি সরু লম্বা লেজের মতো হয়ে গেছে ওদের শেষ প্রান্ত। একটা গোপন মৃত আগ্নেয়গিরির মুখ থেকে উঠে আসার মতো যখন গোটা ব্যাপারটা তখন কি করা যায়! জাহাজিরা কিছুই বুঝতে পারছে না। যে যার ফোকসাল থেকে উঠে এসে পিছিলে জড় হয়েছে। ওদের তীক্ষ্ণ শিস দেবার মতো শব্দে কানে তালা লেগে যাচ্ছে। জাহাজিরা পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে। ডেক-সারেঙ বার বার ব্রীজের নিচে দাঁড়িয়ে এখন কি করণীয় নির্দেশ চাইছে। কিন্তু ব্রীজ থেকে কেউ নামছে না। কিছু তাকে বলছে না। এমন একটা দৃশ্যে সবাই কেমন হতবাক হয়ে গেছে।

তখন একজন মাস্তুলের নিচে বলে উঠল, আমাদের পাপে এটা হয়েছে।

—কে এভাবে চিৎকার করে! এনজিন-সারেঙ দৌড়ে গেল।

–এটা কি এটা কি! বলেই সে তার হাত বাড়িয়ে দিল। সারেঙ দেখল, সামান্য মলমূত্র পাখির সে বলল, ভীষণ জ্বালা করছে সারেঙ-সাব।

সঙ্গে সঙ্গে এই দু-এক ফোঁটা যারা ডেকে দাঁড়িয়েছিল তাদের শরীরে এসে পড়তে থাকল। প্রায় ফোসকা পড়ার মতো জ্বালা। এবং যারাই দাঁড়িয়েছিল তাদের শরীরে এক আধ ফোঁটা পড়ছে, পড়ছে তো পড়ছেই। আগুনে ছ্যাঁকা লাগলে যেমন শরীর জ্বালা করে তেমনি ছটফট করতে করতে সবাই সিঁড়ির নিচে দৌড়ে যেতে থাকল। চিফ-মেট ব্রীজ থেকে চোঙে জোর গলায় বলে যাচ্ছেন, জাহাজিরা ভেতরে ঢুকে পড়। কেউ বাইরে বের হবে না। আমাদের জাহাজে সেই সব বিষাক্ত পাখিরা উড়ে এসেছে। আমরা জানি না এদের হাত থেকে কি করে রেহাই পাব।

দুটো একটা পাখি ততক্ষণে খুব নিচে নেমে এসেছে। এইসব হাজার হাজার পাখিদের এমন বীভৎস হাঁকডাক ভাবা যায় না। নিচে নেমে এলে জাহাজিরা দেখেছিল ওদরে চোখ রক্তবর্ণ। ঠোঁট সাদা, ডানা সবুজ রঙের, পেটের দিকটা একেবারে ধূসরবর্ণ। মলমূত্রে যাদের মুখ হাত-পা সামান্য বিবর্ণ হয়ে গেছে তারা বিছুটি শরীরে লাগালে যেমন দৌড়ে দৌড়ে জ্বালা নিবারণ করে, সেভাবে দৌড়ে দৌড়ে জ্বালা নিবারণ করছে।

আর্চি বাহবা নেবার জন্যে বাইরে এসে যেই না দাঁড়িয়েছিল আর অমনি ওর মুখে সেই সব তরল পদার্থ এবং সে পাগল প্রায় এখন ছুটছে। জ্যাক ছিল চিফ-কুকের গ্যালির ছাদের নিচে। সে তখন ছুটছে ওপরে—চিফ-মেটের তখন সতর্ক কথাবার্তা, নিচে যে যেখানে আছে সবাইকে বলে দাও, ডেক ধরে কেউ যেন হেঁটে না যায়। এনজিন-জাহাজিদের জন্য টানেল পথ খুলে দেওয়া হোক।

জাহাজে এখন অন্ধকার ক্রমে বসে যাচ্ছে, আর ব্রীজ থেকে চীফ-মেটের অসহায় গলা ভেসে আসছে। সেকেন্ড-মেট কোনরকমে হুমড়ি খেয়ে গড়িয়ে পড়ল নিচে, তারপর দু'হাত মুখের ওপর রেখে ভীতু কাপুরুষের মতো দৌড়ে পালাতে থাকল। কে কোথায় কিভাবে আছে দেখার সময় নেই।

কেবল জ্যাক কিছুটা ছুটে এলি-ওয়েতে ঢুকেই ভাবল, ছোটবাবু-কোথায়!

সে ফের ছোটবাবুর কেবিনের দিকে ছুটতে থাকল। ছোটবাবুর দরজা লক করা। আর্চি পাগলের মতো কেবিনে চিৎকার করছে। জ্বলে গেল বলছে, এবং যে যেখানে এভাবে মলমূত্রের ভেতর পড়ে গেছে তারা জ্বলে গেল বলছিল। অমিয়র হাতে, মজুমদারের কানের ওপর, ইয়াসিনের পায়ে, ডেক- কশপের বুকে, ডেক-সারেঙের গলায় এবং প্রায় সবাই এইসব

ধূসরবর্ণ বিষাক্ত পাখিদের আক্রমণের ভেতর পড়ে গেছিল। কেবল বেঁচেছে যারা এনজিন রুমে তখন কয়লা মারছিল, যারা এনজিন রুমে ডিউটি দিচ্ছিল, আর যারা ব্রীজে কিংবা মাংকি-আয়ল্যান্ডে দাঁড়িয়ে দেখছিল, ওরা আসছে।

আগেই সতর্ক করে দেওয়া দরকার ছিল। এইসব বিষাক্ত পাখিদের আক্রমণের ভেতর কোনো কোনো জাহাজ পড়ে থাকে, কাপ্তানের কাছে এমন খবর রয়েছে। ওরা কোথায় থাকে কোথায় কি ভাবে বসবাস করে কেউ হদিস করতে পারে না। প্রশান্ত মহাসাগরে এভাবে কোনো কোনো সময় দেখা গেছে, খুব ক্বচিৎ এটা ঘটে থাকে এবং অবিশ্বাস্য মনে হয়, তবু ঘটনা। যদিও এখন এটা ভেতরে ভেতরে সবার ধারণা ম্যান-এ্যালটাব্রসের মৃত্যু তাদের ভীষণ পাপের ভেতর ফেলে দিয়েছে। আর তাছাড়া তো প্রাচীন নাবিকদের মতো তাদের এখন তেমন সংস্কার নেই। তবু রাইম অফ দি এনসিয়েন্ট ম্যারিনারের কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক। সে সময় এসব পাপবোধ ভীষণ কাজ করত। তখন জাহাজিরা সমুদ্র সম্পর্কে তেমন অভিজ্ঞ ছিল না। সমুদ্রের দ্রাঘিমা অক্ষাংশের খবর ছিল সামান্য। কোর্স-লে তৈরি করার ব্যাপারে ছিল অনভিজ্ঞ। ওরা সমুদ্রে সহজেই হারিয়ে যেতে পারে। কিন্তু ওসেনোগ্রাফি এখন একটা যদিও কঠিন বিষয় তবু প্রায় হাতের কব্জায় আছে সব কিছু। ওরা ম্যান এ্যালবাট্রসের মৃত্যুর জন্য এমন ঘটেছে জোর গলায় কেউ বলতে পারল না। কেবল কাপ্তান স্থির দাঁড়িয়ে আছেন। ব্রীজের কাছে তিনি দেখতে পাচ্ছেন, পাখিদের ডানা লেপ্টে যাচ্ছে। ওরা কাচের ওপর ধাক্কা খেয়ে নিচে পড়ে যাচ্ছে। একটা পাখি কি করে ভেতরে ঢুকে ডানা মেলে পড়ে গেল। আলো একদম সহ্য করতে পারছে না। প্রায় বাদুড়ের মতো দেখতে ওরা। ওদের ধরা ঠিক না। একটা স্টিক দিয়ে পাখিটাকে ঠেলে নিচে ফেলে দিতেই আর একটা এবং এভাবে ওরা ভীষণ আলোর ভেতর পড়ে কেমন দাপাতে থাকল। বেশি আলোতে ওরা দেখতে পায় না তবে! এবং সকালে সূর্য ওঠা পর্যন্ত জাহাজের এখন এভাবে অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

আর তখন জ্যাক প্রায় দরজা ভেঙ্গে ফেলার মতো অবস্থা করে ফেলেছে। ছোটবাবু ছুটি পেয়ে ঘুমোচ্ছিল। ওর ঘুম ভাঙলে মনে হল জাহাজে আগুন লাগলে যে যে শব্দ হাওয়ায় নাচতে থাকে সমস্ত জাহাজের চারপাশে তেমন সব বীভৎস শব্দ। আর দরজায় জ্যাকের গলা। এমন একটা দুঃসময়ে সে যে কেবিনে কি করে ঘুমিয়েছিল!

সে দরজা খুলে ফেললে হুমড়ি খেয়ে ভেতরে এসে ছিটকে পড়ল জ্যাক। সে দেখল, জ্যাকের চোখ মুখ শুকনো।

সে বলল, জ্যাক কি হয়েছে!

শুকনো মুখে জ্যাক বলল, বিষাক্ত সব পাখিরা এসে জাহাজটাকে ঘিরে ফেলেছে। বাইরে একদম যাবে না।

জ্যাক এখন ওপরে উঠতে পারছে না। এনজিন রুমে দ্রুত কয়লা হাঁকড়াচ্ছে জাহাজিরা। যত দ্রুত পারা যায়, এ সমুদ্র থেকে জাহাজ নিয়ে পালাতে চাইছে সবাই।

জ্যাক ওপরে উঠলেই সেই বৃষ্টিপাতের মতো মলমূত্র এসে ওর মুখে শরীরে পড়তে পারে। সে একটা চাদর চেয়ে নিল ছোটবাবুর কাছ থেকে। সেটা মাথায় মুখে জড়িয়ে নিল। প্রায় যেন বোরখার মতো চাপিয়ে সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে যাচ্ছে। যাবার আগে ফের সাবধান করে দিল, সব জাহাজটাকে বিষাক্ত পাখিরা ঘিরে ফেলেছে। সমুদ্র দেখা যাচ্ছে না। আকাশ দেখা যাচ্ছে না। কুয়াশার ভেতর জাহাজ পড়ে গেলে যা হয়। সামনে পেছনে কেবল ওরা হাজার লক্ষ উড়ছে। আর জাহাজটা নোংরা করছে।

এটা যে কি হয়ে গেল! সে একটু এগিয়ে গেল সামনে। ওদিকের এলি-ওয়েতে আলো জ্বলছে না। চারপাশে সব দরজা লক করে দেওয়া হয়েছে। এলি-ওয়েতে এখন কোনও পাখি আর ঢুকে পড়তে পারবে না। পাঁচ-নম্বর, তিন-নম্বর, ছোটবাবু, ডেভিড একসঙ্গে জটলা করছে। পাঁচ-নম্বর এতক্ষণ আর্চির ঘরে ছিল। সমস্ত মুখে আর্চির সে মলম লাগিয়ে দিয়েছে।

ওপর থেকে কেউ আর নামতে পারছে না। ওর একবার আর্চিকে দেখে আসা দরকার। সে, ডেভিড, তিন নম্বর সবাই আর্চির কেবিনে ঢুকে গেল। ছোটবাবু বসল না। ওকে বসতে না বললে সে বসতে পারে না। জ্বালাটা বোধ হয় কমেছে। আর তখন ওপরে রেডিও-ট্রানসমিশান রুমে একের পর এক খবর ট্রানসমিট করে যাচ্ছে—জাহাজ সিউল-ব্যাঙ্ক কঠিন দুর্বিপাকে পড়ে গেছে। রেসকু আস, বলতে পারছে না। কাপ্তানের তেমন নির্দেশ নেই। তবু যা সব ঘটনা সে কাচের ভেতর দাঁড়িয়ে দেখেছে, ভাবতে পারে না, অজস্র পাখি জাহাজের মাস্তুলে দড়াদড়িতে জড়িয়ে একেবারে নিচে পড়ে যাচ্ছে এবং এভাবে যদি তিন-চার দিন চলে, দেখা যাবে সব মৃত পাখিদের ডাঁই এবং দুর্গন্ধ জাহাজে—ভীষণ অসুখে পড়ে যাবে সবাই অথবা মৃত পাখিরা এবং জীবিত পাখিরা মিলে কঠিন অসুখে ফেলে দেবে। ওরা কেউ নিস্তার পাবে না।

তবুও যা ঘটনা তাই জানানো হল। বিষাক্ত পাখিদের মলমূত্রের ছিটেফোঁটা যাদের শরীরে পড়েছে, জ্বালা করছে ভীষণ। এবং জাহাজ ভিড়লে বোধ হয় চিকিৎসার ব্যবস্থা করা দরকার। কাল কি হবে আমরা বলতে পারছি না। পাখিগুলো এখনও জাহাজের চারপাশে রয়েছে। যেখানে যেভাবে পারছে ঠোকরাচ্ছে। আমরা কি করব বুঝে উঠতে পারছি না।

কাপ্তান নিজেও চুপচাপ বসে নেই। তিনি চিফ-মেটকে নিয়ে সিঁড়ি ধরে নামছেন। শরীর মুখ ঢাকা। বনির কেবিন বন্ধ। তিনি ডাকলেন, বনি

বনি বলল, ভেতরে বাবা।

—বাইরে বের হবে না।

–বের হচ্ছি না।

তিনি তারপর আরও নিচে নেমে গেলেন। আর ভাবছিলেন, এরা কোত্থেকে এল! এমন পাখিদের আক্রমণে জাহাজ পড়বে ভাবতেও পারেন নি। গল্প গাঁথার মতো এসব খবর সমুদ্রে শুনেছেন। মনে হয়েছিল, যেমন সব জাহাজি গল্পে দিনকে রাত বানিয়ে ফেলতে পারে এও তেমনি। কিন্তু নিজে এমন ঘটনার সম্মুখীন হবেন, স্বপ্নেও ভাবতে পারেন নি। নিচে নেমে আর্চির কেবিনেই প্রথম ঢুকে দেখলেন, আর্চি শুয়ে আছে। কাঠপিঁপড়ের কামড়ের মতো মুখের দু-একটা জায়গা ফুলে গেছে। আসলে এটা এক ধরনের চুলকানি। ভীষণ, এবং জ্বালার মতো মনে হয়। অভয় দিয়ে বললেন, সকালে ঠিক হয়ে যাবে। আরও এভাবে সব ঘুরে ঘুরে দেখা। তারপর এনজিন রুমে নেমে টানেল-পথে ঢুকে গেলেন। প্রপেলার স্যাফটের গা ঘেঁষেঘেঁষে হেঁটে গেলেন। তারপর লম্বা খাড়া লোহার সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। দু'পাশের দেয়াল থেকে কিছুটা হামাগুড়ি দিয়ে ওঠার মতো তিনি দ্রুত উঠে যেতে থাকলেন। মনেই হয় না বয়েস হয়েছে মানুষটার। লাফিয়ে লাফিয়ে এখন সিঁড়ি ভাঙছেন। স্টোররুমের পাশে এসে সিঁড়িটা থেমেছে। ঢাকনা খুলে খোলের ভেতর থেকে উঠে আসার মতো গলা বাড়ালেন ওপরে। চিফ-মেট একটা হাত ধরে প্রায় টেনে তুলে নিলে তিনি দেখলেন, সবাই ছুটে এসেছে। ডেক-সারেঙ সামনে দাঁড়িয়ে সালাম জানাচ্ছে। সবার ঘরে ঘরে উঁকি দিলেন। যেখানে যার ছিটেফোঁটা পড়েছে হাতে, পায়ে, তা দেখে বললেন, মাস্টার অয়েল লাগিয়ে দাও। ভয়ের কিছু নেই।

তিনি অবশ্য জানেন না সত্যি কিসে কি নিরাময় হতে পারে। তবু একজন অভিজ্ঞ মানুষের মতো কথা বলে সবার সাহস ফিরিয়ে আনছেন। পাখিদের আর্ত চিৎকার চারপাশে। কান পাতা যাচ্ছিল না। সমুদ্রে শুধু অন্ধকার। জাহাজের আলো সব নিভিয়ে একবার দেখা যেতে পারে, ওরা কেবল আলোর দিকে ছুটে আসে কিনা। হাঁটতে হাঁটতে নানাভাবে উপায় খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কিভাবে এদের সঙ্গে মোকাবিলা করে যাবেন। ফোকসাল থেকে নেমে যাবার আগে কি কি দরকার, সকাল না হলে যে কিছু ভাবা যাচ্ছে না—এসব মোটামুটি চিফ-মেটকে বুঝিয়ে ফের সেই ঢাকনার পাশে এসে দাঁড়ালেন। চিফ-মেট ডেক-সারেঙকে সব বুঝিয়ে দিল। এনজিন সারেঙ ঢাকনা খুলে দিয়েছে। কাপ্তান আবার নেমে যাচ্ছেন। টর্চ মেরে মেরে

নামছেন

সারা রাত জাহাজিদের মনে হল, আগুন লেগেছে জাহাজটাতে। এমন শব্দ চারপাশে। এইসব হাজার হাজার পাখির ডানায় কোনো বনাঞ্চলে অগ্নিকান্ডের মতো—সাঁই সাঁই আওয়াজ। ডানায় অজস্র ঝটপট শব্দ, এবং এক করুণ কলরব। এ-সবের ভেতর মনে হল, লেডি-এ্যালবাট্রস সমুদ্রে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে।

ওরা পোর্ট-হোলে মুখ রেখে দেখল, এখানে-সেখানে সব পাখি। পাখিরা জাহাজের মাস্তুলে এবং দড়িদড়াতে আছড়ে পড়ছে, পাখির এমন নরম ডানা যখন, তখন এই জাহাজের চারপাশে উড়ে বেড়াবার কি যে অর্থ কেউ বুঝতে পারছে না। যত রাত বাড়ছে তত মনে হচ্ছে, অসহ্য। এভাবে চারপাশে পাখিরা মশার মতো বনবন করে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়তে থাকলে ওরা নিশ্চিন্তে ঘুমায় কি করে! সবাই ডেবিডের ওপর ক্ষেপে যাচ্ছে। মৈত্র নিজের জ্বালায় বাঁচছে না। তার ওপর এই সব পাখিদের শিস দেওয়া ডাক, যেন হাজার লক্ষ শুশুক মাছ সমুদ্রে ডেকে বেড়াচ্ছে। ওরা ডাঙ্গার মানুষ, সমুদ্রে ওরা চিরদিন থাকে না, সবাই ভুলতে বসেছে।

এবং এই নিয়েই মৈত্র, জব্বার এবং ইয়াসিন পিছিলে একটা দারুণ বিদ্রোহ গড়ে তুলতে পারে। আর ডেবিড বোধ হয় এটা আঁচও করেছিল মনে মনে ম্যান-এ্যালবাট্রসের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে—অর্থাৎ এক রাতও পার হয় নি, তখন কিনা এমন কঠিন সঙ্কট জাহাজের সামনে। বিষাক্ত পাখিরা এসে জাহাজে উপদ্রব আরম্ভ করে দিয়েছে। কাপ্তান ওকে যে-কোনো সময় ডেকে পাঠাতে পারেন—তাকে কৈফিয়ৎ দিতে হতে পারে। ম্যান-এ্যালবাট্রসের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে জাহাজে যখন একটা সত্যি অপরাধ ঘটে গেল—এবং তার প্রায়শ্চিত্ত পর্যন্ত আরম্ভ হয়ে গেছে তখন ডেবিডের কসুর কাপ্তান ক্ষমা করবেন না।

ডেবিড ঐ সব ভাবছিল আর কেবিনে পায়চারি করছিল। সে এক জায়গায় স্থির হয়ে বসতে পারছে না। প্রথম প্রথম সে অপরাধের গুরুত্ব বুঝতে পারে নি। যত রাত বাড়ছে নিশীথে যত পাখিদের আক্রমণ বাড়ছে তত সে অস্থির হয়ে উঠছে। বিশেষ করে এদের ভেতর অসন্তোষ দেখা দিলে মারাত্মক কিছু একটা হয়ে যাবে। সে দরজা খুলে এলি-ওয়েতে প্রায় ছুটতে থাকল, ছোট, ছোট—ঘুমোলে!

ছোট দরজা ফাঁক করে বলল, ঘুম আসে?

—তা আসে না। কিন্তু! কেমন ভীত চোখ মুখ ডেবিডের।

ছোট বলল, বোস।

ডেবিড় ভীষণ ঘামছিল। সে বলল, ডেবিড কি হয়েছে?

ডেবিড বলল, আমাকে কাপ্তান ঠিক এবারে ডাকবেন!

—কেন ডাকবেন? কি করেছ?

—ম্যান-এ্যালবাট্রস…সে বলতে পারল না আর।

ছোটবাবু বুঝতে পারছে না। ম্যান-এ্যালবাট্রসের কথা বলছে কেন ডেবিড। সে বুঝতে না পারলে কোন প্রশ্ন করে না। তাকিয়ে থাকে শুধু।

ডেবিড বলল, আমি মেরেছি!

ছোটবাবু এবারে নিঃশ্বাস ফেলল স্বাভাবিকভাবে। বলল, তার জন্য কি হয়েছে।

—যদি এ-জন্য হয়ে থাকে?

—তুমি কি! কেউ আজকাল এ-সব বিশ্বাস করে?

—কাপ্তান বুড়ো মানুষ তিনি…

ছোটবাবু এখানেই ছোটবাবু! সে বলল, এ যুগে এ-সব অচল ডেবিড। তোমরা পুরোনো নাবিক, আমি নতুন। আমার তো কিছুই মনে হচ্ছে না।

—নতুন বলেই হচ্ছে না। পুরোনো হলে তোমারও হত।

—না, হত না। তুমি ডেবিড এত বুদ্ধিমান, তুমি ডেবিড কাপ্তানের সিউল-ব্যাংকে কাজ নিয়ে কতবার এসেছ, সিউল-ব্যাংকের ভবিষ্যত সম্পর্কে তুমি এতো জানো—আর তুমি এতে ঘাবড়ে গেলে!

—যদি এরা বিদ্রোহ করে?

—কারা তারা?

–এই জব্বার, মৈত্র, এনজিন-সারেঙ…।

—কেউ করবে না।

—তুমি ঠিক বলছ?

—ঠিক। বলে সে বলল, এস। ওরা বাইরে বের হয়ে গেল। ছোটবাবু নিজের কেবিনের দরজা লক করে দিল! সে এবং ডেবিড একসঙ্গে বের হয়ে দেখল, সবার দরজা লক করা ভেতর থেকে। কেউ বাইরে বের হচ্ছে না। ওরা দুজন ধীরে ধীরে হাঁটতে থাকল। আর বাইরে তেমনি পাখিদের ডানার শব্দ, যেন লকলক করে আগুন জ্বলছে—যেন বড় একটা গঞ্জ পুড়ে যাচ্ছে। বাতাসের সাঁই সাঁই শব্দ, এমন শব্দে মাথা সত্যি ঠিক রাখা যায় না। ছোটবাবুও পারত না। কিন্তু ছোটবাবু জানে সমুদ্র সফরে বের হলে এমন হামেশা হবে। এনজিন-সারেঙ তাকে এ-জন্য বার বার সিউল-ব্যাংকে কাজ নিতে বারণ করেছিলেন। যেন সিউল-ব্যাংকে কাজ নিয়ে উঠলেই সমুদ্রে জাহাজডুবির আশঙ্কা থাকে। সে এতটা ভেবে জাহাজে এসেছে। সুতরাং সে পাখিদের আক্রমণের ভেতর পড়ে ঘাবড়ে যাবার ছেলে নয়। অন্তত ডেবিডের সঙ্গে কথাবার্তায় এটাই এখন প্রমাণ করতে চাইছে।

তা ছাড়া এমনই স্বভাব ছোটবাবুর। ডেবিড যখন ভয়ে কাহিল তখন সে একেবারে সোজা সরল, এবং যতটা সোজা সরল অথবা নির্ভয় মনে মনে, তার চেয়ে বেশি দেখানোর চেষ্টা। সে এমন কি লকার থেকে গ্লাস এবং বোতল বের করে নিজে সামান্য খেল, ডেবিডকে খেতে দিল। দেখে মনে হবে, ছোটবাবু এখন এ-জাহাজের সব চেয়ে সাহসী নাবিক

ডেবিড গ্লাস নিয়ে প্রায় সবটা একসঙ্গে গলায় ঢেলে দিল। ওর এটা অনেক আগেই করা উচিত ছিল। তবে সে এতটা ভেঙ্গে পড়ত না। সে খুব ছেলেমানুষী করে ফেলেছে। সে আরও কিছুটা গলায় ঢেলে বলল, চল।

—কোথায়?

–ক্রুদের আস্তানায়।

—এখন?

—হ্যাঁ এক্ষুনি। তুমি একবার ওদের হাবভাব দেখে আঁচ করে আসবে।

ছোটবাবু বুঝতে পারল ডেবিড এখনও নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। সে বলল, চল।

আর ছোটবাবুকে ফোকসালে এ-সময় ওরা পেয়ে কি যে করবে ভেবে পেল না। ওরা কেমন আছে জানতে এসেছে ছোটবাবু। মনু চা পর্যন্ত করে নিয়ে এল। সে বলতে পারল না ঢাকনার নিচে মেজ-মালোম বসে রয়েছে, বললে, ডেবিডকে অপমান করা হবে। কথা প্রসঙ্গে শেষ পর্যন্ত পাখিদের কথা উঠল। এবং অমিয় বলল, শালা শুঁয়োপোকার মত জ্বলছিল রে?

ছোটবাবু বলল, মৈত্রদা চুপচাপ এত?

—কিছু ভাল লাগছে না।

—তাহিতিতে গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

—আমাকে কিছু টাকা ধার দিবি ছোট?

এত লোকের সামনে মৈত্রদার টাকা চাইতে এতটুকু সংকোচ হল না। ফের বলল, তুই তো

অনেক টাকা পাবি। আমার কোম্পানীর ঘরে সামান্য পাওনা আছে।

ছোটবাবু বুঝতে পারল মৈত্রদা আর সে মৈত্রদা নেই। কেমন ভীরু কাপুরুষ হয়ে গেছে। অসুখটার জন্য এমন হয়েছে হয়তো। ভালো হয়ে গেলে সব ঠিক হয়ে যাবে। আজকাল এ-অসুখের তেমন ভয় নেই সে শুনেছে। সে বলল, বাইরে এস।

বাইরে এসে বলল, দেব। কাউকে বলবে না। যখন পারবে দেবে। তারপর ছোটবাবু বলল, যাচ্ছি। ওরা সঙ্গে আসতে চাইলে বলল, তোমরা যাও। নিচে ডেবিড বসে রয়েছে। তোমাদের দেখলে খুব অপ্রস্তুত হয়ে যাবে।

এনজিন-সারেঙ বলল, মেজ-মালোমকে ডাকলি না কেন?

ছোটবাবু বলল, ওই তো নিয়ে এল। তোমরা কেমন আছ আমাকে পাঠিয়ে খবর নিচ্ছে।

ওরা সবাই মেজ-মালোমের তারিফ করল। দু-একজনের মনে যা-ও একটু আতঙ্ক ছিল, ম্যান- এ্যালবাট্রসের হত্যার জন্য তারা পাখিদের ক্ষোভে পড়ে গেছে, ডেবিড নিজে এসেছে শুনে তাও ভুলে গেল। বলল, ডাক না একবার।

ছোটবাবু ঢাকনা খুলে ডাকল ডেবিডকে। বলল, ওপরে উঠে এস। কিছু ভাবনার নেই। সব ঠিক আছে।

সে উঠে এসেই দেখল, সবাই খুব প্রীত এবং কথাবার্তায় একেবারে নিজের মানুষের মতো। ওদের কথাবার্তা সে বুঝতে পারে না। কিন্তু মুখ দেখে বুঝতে পারছে, পরিণামে জাহাজের যাই হোক তাকে দায়ী করে ওরা জাহাজে বিদ্রোহ করবে না। ওরা বন্দর-পেলে জাহাজ থেকে নেমে পড়বে না। ছোটবাবু ওদের কাছে যাদুকাঠির মতো। এবং সে-রাতেই, কারণ রাতে কেউ ঘুমোতে পারবে না জানত, ডেবিড আর একবার আর্চি কেমন আছে দেখতে গিয়ে সব বলে ফেলল। বলল, আর্চি, তুমি ছোটবাবুকে আর র‍্যাগিং করবে না। তোমাকে সাবধান করে দিচ্ছি। আজ যা দেখাল ছোটবাবু। এবং সে কথাপ্রসঙ্গে ছোটবাবু এদের কতো নিজের মানুষ, সে ইচ্ছে করলে আর্চিকে নাকের জলে চোখের জলে এক করে ফেলতে পারে তাও বলল।

এবং ডেবিডের এভাবে যে কি হয়ে যায়। এখন সে খুব বেশি নিশ্চিন্ত। সারাটা দিন তার ভাল কাটেনি। মাথার ভেতর দুশ্চিন্তা। দুটো-একটা কথা, পাখিটা মেরে ফেলার পর যে কানে না এসেছে তাও নয়। এবং এভাবে সে সারাদিন ভীষণ দুশ্চিন্তায় ছিল। ভাল করে রাতে খেতে পারেনি। এবং সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে যখন পাখিরা এসে জাহাজটাকে ঘিরে ফেলেছিল, চোখে তার সর্ষে ফুল—যদিও সে কথায়-বার্তায় সব সময় ড্যাম-ডেয়ারিং গোছের, কিন্তু মনে মনে মরমে মরে যাচ্ছিল—তখন ছোটবাবু তাকে সব দুশ্চিন্তা থেকে বাঁচিয়েছে।

সে ফিস ফিস গলায় বলল, বুঝলে না সব অশিক্ষিত নাবিক। সংস্কার ভীষণ। ম্যান-অ্যালবাট্রসের জন্য এমন হয়েছে ওরা ভাবতে শুরু করেছিল।

আর্চি শুয়ে আছে। বালিশ উঁচু করা। মাথাটা ওপরের দিকে। জ্বালা-যন্ত্রণা একেবারেই নেই। সে কেমন দু-পাটির দাঁত শক্ত করে বলল তাই বুঝি!

—ছোটবাবুকে দিয়ে সব মিটমাট করা গেল। বাবাঃ এখন ঘুমোতে যাব।

এবং সকালে সবাই দেখল গোটা জাহাজে ভীষণ দুর্গন্ধ। মল-মূত্রে জাহাজের ডেক, বোট-ডেক, মাংকি-আয়ল্যান্ডের ছাদ,গ্যালির ছাদ, সামনে-পেছনে ঢাকা। কেউ বের হচ্ছে না। আর আশ্চর্য একটা পাখিও নেই। যাদের মনে হয়েছিল, ডানা ভেঙে ডেকে পড়ে আছে, একটাও তেমন পাখির সন্ধান পাওয়া গেল না। কেবল দুর্গন্ধে টেকা যাচ্ছে না। কাদার মত প্যাঁচ প্যাঁচ করছে—নাবিকেরা গামবুট পরে, হাতে দস্তানা লাগিয়ে নিয়েছে। এবং খুব সতর্কতার সঙ্গে সবাই কাজ করছে। ওপরে কাপ্তান দূরবীন লাগিয়ে চারপাশে যতদূর চোখ যায় দেখছেন। ডেবিডও দেখছে। সে কিছু দেখতে পেল না। না, একেবারে কিছু দেখতে পায়নি ঠিক না,

অনেক দূরে সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় লেডি-এ্যালবাট্রস বসে রয়েছে। দূর থেকে জাহাজটাকে অপলক দেখছে।

জ্যাক কেবিন থেকে বের হতে পারছে না। বোট-ডেকে জল মারা হচ্ছে। হোস পাইপে জল মারছে এবং এমন ভাবে মারা হচ্ছে যাতে ছিটে-ফোঁটাও কারো চোখে-মুখে গিয়ে না পড়ে। স্টিক ব্রুম ডেক জাহাজিদের হাতে। ওরা জল মেরে ব্রাশ চালাচ্ছে। এবং বোট-ডেকের কাজ সারতেই সকাল কেটে যাবে তাদের। ওরা প্রথমে একেবারে মাংকি-আয়ল্যাণ্ড থেকে কাজ আরম্ভ করেছে। ক্রমে নিচে নেমে আসবে। বোট-ডেকে পা মাড়িয়ে যাওয়া যাচ্ছে না। অথচ এমন একটা দুঃস্বপ্ন এত সহজে কেটে যাবে জ্যাক বুঝতেই পারেনি। প্রায় জাহাজ ডুবতে ডুবতে যেন বেঁচে গেল। মেজ-মালোমকে সে দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকছে। আর চেঁচাচ্ছে —কি দেখছ? ওরা কি দুরে কোথাও আছে?

ডেবিড ইশারায় বলছে—না। না নেই। কেবল লেডি-অ্যালবাট্রসকে দেখা যাচ্ছে। আর কিছু নেই।

কাপ্তান চিফ-মেট ভাল করে দেখে প্রায় যখন নিশ্চিন্ত, রেডিও-অফিসার তখন বেতার সংকেত পাঠাচ্ছে। অল ক্লিয়ার—বেতার সংকেতে সে এরিয়া-স্টেশনকে জানিয়ে দিচ্ছে।

যখন রেডিও-অফিসার অল-ক্লিয়ার জানাচ্ছে তখন একমাত্র একজন কেবিনে বসে অল-ক্লিয়ার ভাবতে পারছে না! সে তার মাথা সমান উঁচু আয়নায় দাঁড়িয়ে তোয়ালে দিয়ে মুখ ঘসছে। কালো দাগ। যেন কেউ সারা মুখে উল্কি পরিয়ে দিয়েছে। জ্বালা-যন্ত্রণা শেষ হয়ে গিয়ে ও-সব উল্কির মত কি ফুটে উঠছে! হাত দিলে জায়গাগুলো সামান্য অসাড় লাগছিল শুধু। সে বার বার বাথরুমে যাচ্ছে, সাবানে মুখ ঘষছে এবং কেবিনে এসে লকারের আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে উন্মাদের মতো চিৎকার করে উঠতে চাইছে। এটা কি হল? ঠিক উইচদের মতো মুখ? সাদা রঙের পাশে কালো কালো উল্কি পরানো? কোনোটা ইয়ারিংয়ের মতো, কোনোটা সমান্তরাল, অথবা ডিম ভেঙে চড়াৎ করে এসে পড়লে যেমন হয়ে যায়, যেখানে-সেখানে মুখে তারাবাতির মতো বিন্দু বিন্দু কালো ফুটকরি। সারা মুখে বিচিত্র সব ছবিতে একেবারে একটা সে মন্ত্রপুত মানুষ হয়ে গেছে। যেন এখন কোমরে সিংহের চামড়া থাকলে উট-পাখির পালক গুঁজে দিলে এবং নানারকমের পাথরের মালা গলায় পরলে হাতে বর্শা থাকলে সে আফ্রিকার কোন অরণ্যসর্দারের ভূমিকা নিতে পারে।

সে নিজেকে ভয় পাচ্ছিল। তার হাত-পা ঘামছে। সে ছুটে এলি-ওয়েতে বের হয়ে এল। মুখে এটা আমার কি হয়ে গেল! সে ছুটে ছুটে ডেবিডের কেবিনে ঢুকে বলল, ডেবিড সি, এই যে দেখছ! দ্যাখো দ্যাখো সারা মুখে কি আমার! কোন ব্যথা বেদনা নেই। একটু অসাড় লাগছে। সারা সকাল ধরে চেষ্টা করেছি এসব দাগ তুলে ফেলতে পারছি না। বলেই সে বাংকে দু-হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল।

আর্চিকে ডেবিড চিনতেই পারছিল না। সে প্রথম ভেবেছিল আর্চি ওকে ভয় দেখাবার জন্য মুখে রং কালি মেখে অথবা তামাসা করার জন্য ছুটে এসেছে। সে প্রথম খুব হকচকিয়ে গেছিল। তারপর মুখটা আর্চির এটা সে বুঝতে পেরেছিল। তারপর এই সাত সকালে এসব তামাশার কি মানে সে যখন বুঝতে পারছিল না, তখনই আর্চি বলতে বলতে ভীষণ ছটফট করছিল। অধৈর্য এবং প্রতিশোধের স্পৃহা সারা মুখে। সে বসতে পারছিল না, সে দাঁড়াতে পারছিল না—কেবল কি করা যায় ভাবছে। সে বিড় বিড় করে বলে যাচ্ছিল, তখন রাত দুটো, দুটোর পর মনে নেই কিছু, তার মানে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলামে। ঘুমোবার আগে মুখটা দেখেছি। ফোলা জায়গাগুলো তখন বসে যাচ্ছে। সব ঠিক হয়ে যাবে ভেবে ঘুমিয়ে পড়লাম। সকালে উঠে ডেবিড বিশ্বাস কর, বলে দু-হাত ঝাঁকাতে থাকল, আমি আয়নায় নিজেকে দেখে আঁতকে উঠলাম। আমার মুখটা...বলে সে থেমে থাকল। হাঁ-করা মুখ। মুখের দিকে তাকাতে ভয় করছে।

ডেবিড, আর্চির মুখের চামড়া দু-আঙুলে টেনে টেনে দেখল। পোর্ট-হোলের কাচ খুলে

ভালো করে আলোতে দেখে বুঝল, ভেতরে চামড়ার ভাঁজের অনেক গভীরে দাগ ঢুকে গেছে। এখন ভালো ডাক্তার না দেখালে হবে না। সে এ-সবের কিছু বুঝতে পারছে না। তবু ভালো জাতের ক্রিম অথবা হয়তো কিছুই না, সময় পার হলে আপনি নিরাময় হয়ে যাবে—এজন্য এমন মুষড়ে পড়তে বারণ করল ডেবিড। বলল, আসলে পাখিগুলোর মলমূত্রে ভীষণ এসিডিটির ব্যাপার রয়েছে! তোমার কি মনে হয়

আর্চির মুখে কঠিন বিরক্তি। সে এসব শুনতে চাইছে না। এ-মুখ নিয়ে বের হয়ে যাওয়া, এবং যদি দেখা যায়, জ্যাক দেখে ফেললে ভীষণ মজা পাবে। ছোটবাবু দেখলে, মুখ ব্যাজার করে ফেলবে। সে আরও বেশি এবার থেকে ছোটবাবুকে ভয় দেখাতে পারবে। ছোটবাবু ওর মুখের এই অমানুষসুলভ অবয়বে ঘাবড়ে যাবে!

আর্চির চোখ এভাবে লাল হয়ে যাচ্ছে ভীষণ। সে কাপ্তানের কাছে যেতে পারত। নিচে পাঁচ- নম্বর ওর হয়ে ডিউটি করছে। পাঁচ-নম্বর ওর এখন বিশ্বাসী লোক। ছোটবাবুকে সে পছন্দ করে না। কে কে এখন এই ছোটবাবুটিকে জাহাজে পছন্দ করে না তার একটা হিসাব হাতের আঙুলে গুনে দেখল, মাত্র তিনজন। সে নিজে, পাঁচ-নম্বর আর এনজিন-রুম-কশপ। ডেবিড এবং অন্যান্য সবাই তার পক্ষে। সে ডেবিডকে কিছু বুঝতে না দিয়ে দরজা খুলে বাইরে বের হয়ে এল। স্লিপিং গাউন ওর হাঁটু পর্যন্ত ঝুলছে। দু-পাশের বেল্ট খুলে আছে। মাতালের মতো সে হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে। সে এখন শুধু কেবিনে দরজা বন্ধ করে পড়ে থাকবে। মুখ দেখাতে—বিশেষ করে বন্দর এলে সে আর সুন্দরী মেয়েদের কাছে যেতে পারবে না, এমন একটা অমানুষের মতো মুখ জেব্রা অথবা ওরাং- ওটাং সে হয়ে গেল তাদের কাছে। অথবা হীন ব্যক্তি, মুখে উল্কি পরা থাকলে হীন শয়তান মনে করে ফেলবে সবাই। এবং কতদিন পর তার মনে হল—সে তার স্ত্রীর কাছে একমাত্র ফিরে গেলে সে তাকে ফিরিয়ে দেবে না। জাহাজে তার স্ত্রীর কথা আজ সে প্রথম মনে করতে পারল। স্ত্রী লরা একটা স্টেশনারী দোকানের মালিক। জাহাজ আসার খবরে লরা সেজেগুজে জেটিতে দাঁড়িয়ে থাকে। লরা দেখতে পায় জাহাজ থেকে আর্চি নামছে। আর্চি লরার সঙ্গে কথা বলে না। লরা কেবল দেখতে পায় তার সামনে আর একটি মেয়ে হাত নাড়ছে। লরা বুঝতে পারে এবার আর্চি এ মেয়েটির সঙ্গে যতদিন দেশে থাকবে রাত কাটাবে। সে যেসব ফুল নিয়ে এসেছিল সব নিয়ে ফিরে যেত। চার- পাঁচ বছর ধরে এমন চলছে। আর্চি জানে সফর শেষে হোমে ফিরে গেলে এবারেও সে জেটিতে ওর জন্য অপেক্ষা করবে। হয়তো সে তার ইয়ার বন্ধুদের, বান্ধবীদের কারো খোঁজ পাবে না এবার। লরাকে কেবল দেখতে পাবে একা দাঁড়িয়ে আছে।

লরার কথা ভেবে এতটা দুর্বল হয়ে পড়া ঠিক না। সে মনে মনে লরাকে ভুলে যাবার চেষ্টা করছে। লরা নিজের মতো থাকুক সে চায়। লরা এত ঢ্যাঙা আর এত পাতলা যে তার একেবারে ভাল লাগে না। ওর কিছু নেই। শুধু হাত-পা এবং আর যা আছে তাতে ওর মন একেবারে ভরে না।

তবু বার বার লরার কথা স্মৃতিতে এলে সে নিজে আর স্থির থাকতে পারছিল না। এতদিন পর আবার কেন। বিয়ে-টিয়ের ব্যাপারে তার বিশ্বাস-টিশ্বাস একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। বিশেষ করে তাদের মতো জাহাজি জীবন যাদের—বিয়ে করা একেবারে উচিত না। লরাকে সেজন্য আইন মোতাবেক পরিত্যাগ করেনি। আছে যখন থাক। ওর জীবন-যাপনে যখন লরা প্রতিবন্ধক নয় তখন লরা বৌ হিসেবে থেকে গেলে একদিকে মন্দ না। জাহাজি মানুষের বৌ অসুখে-বিসুখে টনিকের মতো। একজন অন্তত তখন পাশে রয়েছে ভাবতে ভাল লাগে।

এ সব কথা মনে হওয়া ঠিক না—সে এবার জোরে ডাকল, বয়। বয় ভেতরে ঢুকে বিস্মিত হল। চা কফি কি দেবে ঠিক করতে পারল না। আর্চি শুধু বলল, ছোটবাবুকে আসতে বল। বয় বুঝতে পারল না, মুখটা জেব্রার মতো দেখতে হয়ে গেছে কেন?

ছোটবাবু তখন এনজিন-রুমে কাজ করছে। অনেকগুলো লোহার রড তাকে কাটতে দিয়েছে। কিছু লোহার পাত। বাইশ টেবিলে সে রড বেঁধে কাটছে। হ্যাকসো বার বার টেনে

টেনে দু-হাতের পেশী ফুলে গেছে। পেশী এত শক্ত যে প্রায় লোহার মতো। সে প্রায় দু-লাফে ওপরে উঠে এসেছে এবং বাইরে দাঁড়িয়ে বলেছে, মে আই কাম ইন স্যার। কাম-ইন। গম্ভীর গলা। ছোটবাবু ভিতরে ঢুকলে আর্চি দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে। আর্চিকে সে সকালের দিকে এমন পোশাকে দেখেনি। বোধ হয় মুখের যন্ত্রণায় এখনও আর্চি কষ্ট পাচ্ছে।

ছোটবাবু কিছু বলতে পারল না। সে পরেছে সাদা প্যান্ট, সাদা সার্ট, পায়ে কেডস, মোজা সবুজ রঙের। সে পিছনে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে। প্রায় সৈনিকের মতো আজ্ঞাবহনকারী মানুষ মাত্র। আয়নায় ওর অবয়ব এত স্পষ্ট যে, সে এত সতর্কতার ভেতরও একবার নিজের মুখ, নীল রঙের দাড়ি, এবং কোথায় যেন এক পবিত্রতা মুখে, নিজেই যখন এসব টের পেয়ে যায় তখন নিজেকে নিজে দেখলে আজকাল ভীষণ সাহসী হয়ে যায়। কোন কিছুতেই ভয় পাবে না সে বিশ্বাস করতে ভালবাসে।

আর তখনই বাঘের মতো হালুম করে যেন আর্চি ডেকে উঠল। ফিরে দাঁড়াতেই ছোটবাবু আর্চির মুখে কদর্য সব উল্কি দেখল। যেন এ-সব উল্কি পরে আর্চি তাকে ভয় দেখাবে বলে এতক্ষণ এভাবে দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছিল।—ম্যান কোথায় কাজ করছ?

ছোটবাবু মুখ দেখবে না কথার জবাব দেবে। সে কোনরকমে বলল, এনজিন-রুমে

—নো। ইউ ম্যান, হোপলেস। তুমি ম্যান খুব ফাঁকিবাজ আছ। পুরো বাংলায় বলতে চেষ্টা করল আর্চি। তারপর যা বলল, তা আরও মারাত্মক। এক্ষুনি ছোটবাবুকে ডেকে কাজ করতে যেতে হবে। চার-নম্বর উইনচের পিস্টন রড খুলতে হবে। খুলে, এনজিন-রুমে নিয়ে যেতে হবে। ফাইলে মাজাঘসা আছে।

ছোটবাবু বলল, স্যার ডেকে এখন যাওয়া ঠিক না। স্যার আপনার মুখে এসব কি? খুব সহজভাবে বলে ফেলেই বুঝতে পারল মহামান্য সেকেণ্ড এনজিনিয়ার আর্চিকে সে অবান্তর প্রশ্ন করতে পারে না। কিন্তু স্বভাব যাবে কোথায় ছোটবাবুর। আর্চি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। কথার জবাব দিচ্ছে না। যত এমন হচ্ছে, ভেতরটা ছোটবাবুর গুড়গুড় করছে। মরতে কেন যে এসব বলতে গেল। অথবা আর্চি এভাবে রাতে সেজে শুয়ে থাকতে হয়তো ভালবাসে। আর্চির ভেতর একটা শয়তান আছে এই প্রথম সে যেন টের পেল। সে আর থাকতে না পেরে বলল, যাচ্ছি স্যার।

আর তখনই কঠিন এক অবজ্ঞার হাসি, ইয়েস ইউ গো।

ছোটবাবু জানত, এই মলমূত্রের ভেতর পড়ে গেলে সে জ্বলেপুড়ে যাবে। তবু সে যাবে। সে হাঁটতে থাকল। স্বভাবেই তার এটা আছে। তার এখন থেকে ভীষণ সতর্ক থাকা দরকার। অশরীরী আত্মার মতো অতিকায় হিংস্র আর্চি যে কোনো সময় তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। কিন্তু কেন যে এ সব হয়, সে তা বুঝতে পারে না, সে তো আর্চিকে মান্য করে থাকে। তবু শয়তানের মতো মুখ মানুষটার, ওর এ-সব ভেবে কষ্ট হতে লাগল। মানুষের মুখ শয়তানের মতো হয়ে গেলে ভারি দুঃখের।

জাহাজ এভাবে চলছে। নিরন্তর চলছে এমনই মনে হয়। চলতে থাকলে মনে হয় না জাহাজটা আর কখনও বন্দর পাবে। জাহাজের ভেতর মানুষগুলো নিরন্তর কাজ করে চলেছে, বিরাম বিশ্রাম বলতে সামান্য, কেবল তাদের ভাবনা জাহাজটাকে ঠিক ঠিক বন্দরে পৌঁছে দেওয়া। দিতে পারলেই কাজ শেষ। তখন যা খুশি করো, যেখানে খুশি যাও, দিনে হাজির থাকলেই হয়ে যায়। কাজে কর্মে তেমন তাড়া থাকে না।

সিউল-ব্যাংক জাহাজ একটু অন্যরকমের। এর কাজ লেগেই রয়েছে। কত সব উটকো কাজ। এবং সন্তর্পণে সবাই এখন জল মারছে। দুটো হোস পাইপে একসঙ্গে জল মারা হচ্ছে। জল মেরে দিলে সরে যাচ্ছে—চুনগোলা জলের মতো পাখিদের মলমূত্র। এবং জাহাজের সর্বত্র টক টক দুর্গন্ধ। আর জাহাজে যারা রয়েছে তারা পোর্ট-হোল খুলতে পারছে না। এলি-ওয়ের দরজাগুলো সব বন্ধ করে রেখেছে। কোনো কারণে দরজা খুললেই গন্ধে যখন টেকা

যাচ্ছে না তখন ছোটবাবু ডেবিডের কাছ থেকে তার গামবুট দুটো চেয়ে নিল। গামবুটের ব্যবহার ডেক জাহাজিদের নিরন্তর —ঝড়-বৃষ্টিতে, তুষারপাতের সময় বরফ জমে গেলে ডেকে জাহাজিরা পায়ে গামবুট পরে চলাফেরা করে। আর ডেক, ফল্কা, মাস্তুলের নোংরা জল মেরে তুলে ফেলার সময় গামবুট পরে না নিলে, প্যান্ট জলে ভিজে যায়। এনজিন-রুম জাহাজিদের এসব দরকার হয় না। ছোটবাবুর গামবুট ছিল না সেজন্য। সে ডেবিডের কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছে।

সে বালতিতে হাতুড়ি, চিজেল নিয়েছে নানা সাইজের। একটা ছোট টবে কেরোসিন তেল। এবং এই বালতি টব তাকে দেখলেই দেখা যাবে। কাজে ছোটবাবু আছে বালতিটা নেই টবটা নেই ভাবা যায় না। ছোটবাবু এলিওয়ে ধরে দরজা খুলে ফেললে, দেখতে পেল ডেকটার সাদা রং। ডেবিডের কাছে মনে হয়েছে তুষারপাত হয়েছে। ছোটবাবুর তুষারপাত সম্পর্কে কোন অভিজ্ঞতা হয়নি। সে দরজা খুলতেই নাকে এসে ঝাঁঝ লেগেছে। এবং বমি আসছিল। সব যেন ভেতর থেকে উঠে আসছে। সে সন্তর্পণে হেঁটে যাচ্ছিল। হাতে চামড়ার মোটা দস্তানা। মাথায় ছেঁড়া টুপি, কেবল মুখে কিছু নেই। সে গন্ধ থেকে বাঁচার জন্য ইউকেলিপটাস তেল নাকে তুলোয় গুঁজে নিতে পারত। কিন্তু দেরি হয়ে যাবে। রুমাল চার-পাঁচ ভাঁজ করে মুখে বেঁধে নিয়েছে। এবং এখন ওর দুটো চোখ কেবল দেখা যাচ্ছে। নাকে কেরোসিন তেল সামান্য লাগিয়ে রেখেছে। গন্ধটা সে আর তেমন টের পাচ্ছিল না।

তখন মান্নান বোট-ডেকে হোস পাইপে জল মারছে। ডেক-টিন্ডাল আর একটা হোস পাইপে জল মারছে। সূর্য বেশ ওপরে উঠে যাচ্ছে। মান্নানই প্রথম দেখতে পেয়েছিল ডেক ধরে কেউ হেঁটে যাচ্ছে। সে বুঝতে পারল না কে এমন মলমূত্র মাড়িয়ে যাচ্ছে। সাহস আছে মানুষটার। ডেকে যখন কেউ বের হচ্ছে না ভয়ে, জ্বালা যন্ত্রণার ভয়ে তাছাড়া সে তো শুনছে, কালো কালো দাগ হয়েছে হাতে পায়ে, তখন এমন কার দুঃসাহস! সে তখনই ভাবল হেই করে ডাকবে। কিন্তু অফিসারদের ভেতর যদি কেউ হয়। এই ভেবে সে যখন সামান্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, তখনই মনে হল আরে এ তো ছোটবাবু। ওর হাতে বালতি টব দেখেই সে চিনে ফেলেছে। আর তখুনি সে চেঁচিয়ে উঠল ওপর থেকে—হারে এডা যে ছোটবাবু।

ছোটবাবু পিছন ফিরে তাকাল। চার্ট-রুমের পাশে জ্যাকের কেবিন। তার ছাদে দাঁড়িয়ে মান্নান হা হা করছে—কোনে যাচ্ছ!

—পিস্টন খুলতে। চার নম্বর উইনচে যাচ্ছি।

—মরণের ওষুধ কানে বানতে চাও চঁইয়া।

ছোটবাবু হাসল। মান্নানের স্বভাব এভাবে কথা বলা। চঁইয়া কথার সঠিক মানে সে জানে না। তবু এটা কিছুটা কাঁচা খিস্তি জাতীয়। এবং মান্নানের এভাবে কথা বলার স্বভাব। সে বলল, দ্যাখেন টিন্ডাল, ছোটবাবুর কান্ড দ্যাখেন। মরণের ওষুধ কানে বানদনের লাইগা যাইতাছে।

সবাই এটা দেখে ঘাবড়ে গেল। ছোটবাবু সন্তর্পণে হেঁটে যাচ্ছে। পিছলে পড়ে যেতে পারে। তার চেয়েও ভয়াবহ পড়ে গেলে হাতে পায়ে কিছু হবে না, মুখে লেগে গেলে ভীষণ কষ্ট পাবে ছোটবাবু। ওরা বুঝতে পারছে এটা সেই আর্চির কাজ। ছোটবাবুকে আর্চি একদম সহ্য করতে পারছে না। ওরা ওখানে আর দাঁড়াল না। হোস পাইপ খুলে ফেলল। এবং নেমে যেখানে ছোটবাবু কাজ করবে দুটো হোস-পাইপে জল মেরে একেবারে সাফসোফ করে ফেলছে। ছোটবাবু দেখল, নিশ্চিন্তে নির্ভয়ে সে এখন কাজ করে যেতে পারবে। তবু চারপাশের মলমূত্রের ভেতর কাজ করা অসহ্য রকমের কষ্ট। সকাল থেকে দুর্গন্ধে কেউ কিছু খেতে পারছে না। সকালে খবর এসেছে, জ্যাক কেবিনেই বমি করেছে।

বিকেলের দিকে জাহাজ একদম পরিষ্কার। কেবল দুটো মাস্টের ওপরে ওরা উঠতে পারে নি। মাস্তুলের রঙ চেনা যায় না। সাদা হয়ে গেছে। ওগুলো চিপিং না করলে উঠবে না। এবং কড়া রোদ সারাদিন, সুতরাং বিকেলের দিকে গন্ধটা একদম থাকল না। কেবিনে কেবিনে

ইউকলিপটাস তেল স্প্রে করা হয়েছে। জাহাজের সর্বত্র। কেবল আশংকা আবার বিকেলে তেমনি, অর্থাৎ সূর্য অস্ত যাবার আগে ওরা যদি উড়তে থাকে। কারণ ওরা সমুদ্রের কোথাও যদি পালিয়ে থাকে, অথবা দিগন্তের নিচে অথবা সামনে যে-সব দ্বীপ রয়েছে, দ্রুত উড়ে গিয়ে জাহাজটাকে আবার আক্রমণের জন্য যদি ওৎ পেতে থাকে।

ব্রীজে একজন, চার্ট-রুমের রেলিঙে একজন। জ্যাকের কেবিনের ছাদে কাপ্তান নিজে দাঁড়িয়ে আছেন। আর ব্রীজের উইংসে চিফ-মেট। ওরা চারজন চারদিকে দূরবীন চোখে দাঁড়িয়ে আছে। যদি কিছু আবার দেখা যায়। ওরা যদি আবার কোথাও থেকে উড়তে আরম্ভ করে। সামান্য এক টুকরো মেঘ ভেসে উঠলে আতঙ্কে সবার চোখ কেমন সাদা হয়ে যাচ্ছে। যখন চারজন মিলে রায় দিতে পারছে, না ওটা একখন্ড মেঘ তখন সবাই নিশ্চিন্ত হতে পারছে।

কেবল লেডী-এ্যালবাট্রস জাহাজের পেছন ছাড়ছে না। এটা কাপ্তানের ভাল লাগছিল না। এবং যেন যতদিন এই পাখিটা জাহাজকে অনুসরণ করবে ততদিন একটা না একটা দুর্ঘটনার আশঙ্কা থাকবে। কাপ্তানের এমন বয়েস যে, তিনি পাখিটা সম্পর্কে বেশি কিছু ভাবতে পারছেন না। এই যে এমন একটা ভয়াবহ দুঃস্বপ্নের মতো রাত কাটল সমুদ্রে এটা যে এই পাখিটার জন্য হয় নি কে বলতে পারে! এ্যালবাট্রস পাখি সমুদ্রে মেরে ফেলা ভারি অমঙ্গলের ব্যাপার। যদিও আজকাল এ-সব মানা হয় না। জাহাজ যত বেশি নিপুণ হয়ে যাচ্ছে চলা-ফেরায় তত সংস্কার জাহাজিদের মন থেকে মুছে যাচ্ছে। কিন্তু এরা ভাবে না কেন সিউল-ব্যাংক জাহাজ আজকালকার দশটা জাহাজের মতো নয়। সে তার পুরনো সংস্কার নিয়ে বেঁচে আছে। পাখিটাকে তাড়িয়ে দেবার ব্যাপারেও হাতে কিছু এমন উপায় নেই। মাস্তুলে বসতে না দিলেও ওর আসবে যাবে না, কারণ সমুদ্রে সে খুশিমত বিশ্রাম নিতে পারে। লেডি-এ্যালবাট্রস হিগিনসকে সত্যি খুব দুর্ভাবনায় ফেলে দিল।

সূর্যাস্ত পর্যন্ত ওরা এভাবে দাঁড়িয়েছিল। চারজন পুরো জাহাজি ইউনিফরমে, প্রায় যেন একটা যুদ্ধ জাহাজ চালিয়ে নিচ্ছে। যে কোন সময় আক্রমণ হতে পারে, বিশেষ করে এই সূর্যাস্তের সময়। এ- সব দেখলে মনেই হবে না জাহাজ সিউল-ব্যাংক যাচ্ছে তাহিতিতে। ওখানে জল, বাংকার, রসদ নেবে জাহাজটা। জাহাজের ড্রাফট আটাশ ফুট, গ্রস-ড্রাফট বত্রিশ। জল, বাংকার নিলে জাহাজটা পুরো লোডেড। এবং মাল বলতে জাহাজে আছে সালফার। সেই মাটি। সালফার, ফসফেট, সবই মাটির সামিল। অথবা আয়রণ-ওর। এ-বাদে জাহাজে বেশি কিছু কার্গো দিতে এজেন্ট-অফিস ভরসা পায় না। একমাত্র ভারতবর্ষের বন্দরে গেলে কিছু ভাল মাল, যেমন জুট, চা এ-সবের পেটি তুলে নিতে পারে। ভারতবর্ষের বন্দরে সস্তা মালবাহী জাহাজের ভীষণ কদর। দু-দিকেই টাকা পয়সার লেনদেন চলে। কলকাতা বন্দরের মতো জাহাজটাও দুবলা বলে, বন্দরের সঙ্গে জাহাজটার বেশ ভালবাসাবাসি আছে। কলকাতা বন্দরে একবার ঢুকলে জাহাজ আর বের হতে চায় না। যত দিন যায় তত কর্তৃপক্ষ কাপ্তানের ওপর অধিক নির্ভরশীল হয়ে পড়ে

হিগিনস লেডি-এ্যালবাট্রসকে দূরবীনে দেখতে দেখতে কেবল এমন সব ভেবে চলেছেন। জ্যাক সারাদিন কিছু খেতে পারে নি। রাতে হয়তো পারবে। জাহাজ-ডেক খুবই পরিচ্ছন্ন। রাতে জ্যোৎস্না ওঠার কথা আছে। জ্যোৎস্না উঠলে, তিনি জ্যাককে নিয়ে বোট-ডেকে কিছুক্ষণ আজ চুপচাপ বসে থাকবেন।

কাপ্তান-বয় আটটায় নালিশ জানাল, ছোটসাব খাচ্ছে না।

খাচ্ছে না অনেকে। গন্ধটা সবার নাকে লেগে রয়েছে। আর্চির খাবার কেবিনে গেছে। সে সারাদিন কেবিন থেকে বের হয় নি। ওর মুখে কালো কালো সব দাগ হয়েছে। এমন বিচিত্র ব্যাপার পৃথিবীতে সত্যি তবে ঘটে, ওর মুখটা দেখতে জেব্রার মতো হয়ে গেছে। জ্যাক তো শুনে হেসে গড়িয়ে পড়ছিল। কাপ্তান জ্যাককে এ-সব বলে কিছুটা যেন ভুলিয়ে-ভালিয়ে খাওয়াচ্ছিলেন। জ্যাক ভাবল, কি করে আর্চির মুখটা দেখা যায়।

এবং আর্চি বিকেলে ছোটবাবুকে ডেকে পাঠিয়েছিল। ছোটবাবু সুবোধ বালকের মতো

দাঁড়িয়ে কথা বলেছে। কোথাও কিছু ঘটেছে ছোটবাবুকে দেখে মনেই হয় না। পিস্টন খুলে মেরামত করে ঠিক ঠিক লাগিয়েছে পাঁচ-নম্বর এসে খবর দিয়ে গেছিল আর্চিকে। সুতরাং আর্চি আর কিছু করতে পারে না। ছোটবাবু চলে গেলে আয়নার সামনে বসে কেবল মুখ দেখা ওর কাজ। এবং বন্দর পেতে আরও চার-পাঁচ দিন। এর ভেতর সে বের হতে পারবে না। ডাক্তার দেখালে ঠিক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

এভাবে ঠিক খবর রটে গেল, একমাত্র আর্চির মুখ জেব্রার মতো। সে এখন কেবিন থেকে বের হচ্ছে না। অফিসারদের সবাই আর্চির ঘরে গিয়ে দেখে এসেছে। কাপ্তানের সঙ্গে জ্যাকও গিয়েছিল। জ্যাক তারপর বের হয়ে হা হা করে হাসতে হাসতে ছুটেছে। জ্যাক কেবিন থেকে বের হয়েই হাসতে পারে নি, সে দু-হাতে মুখ চেপে রেখেছিল, তারপর ছোটবাবুর কেবিনে ঢুকে কেবল হাসছে। কেবল হাসছে। ছোটবাবু ওকে এভাবে হাসতে দেখে ভয় পেয়ে গেল। কাপ্তানের ছেলেটার কি যে হয় মাঝে মাঝে। অকারণ কি হাসছে দ্যাখো! সে বলল, এই যে কি হয়েছে! এত হাসছ কেন?

—সে। কেমন অবাক চোখে দেখল ছোটবাবুকে।

—এত হাসছ কেন?

আবার হাসি! হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যাবার জো। অথচ জ্যাক হাসছেই।

ছোট বলল, ইস তুমি না জ্যাক একেবারে ছেলেমানুষ।

জ্যাক বলল, হুঁ! আবার অবাক চোখে ছোটবাবুর মুখ দেখতে থাকল। বড় বড় চোখ ছোটবাবুর। কপাল কি সুন্দর। ঠোঁট দুটো ভারী, চিবুক ছোট, আপেলের মতো। নাক লম্বা, মনোরম চোয়াল।

ছোটবাবু বলল, এত হাসছিলে কেন?

—জেব্রা, জেব্রা।

ছোটবাবু বুঝতে পারল জ্যাক কি বলতে চায়। সে বলল, দেখলে?

—দেখলাম।

—ভাবতে কেমন লাগে সত্যি।

—কি?

—এই যে কোথা থেকে পাখিরা এল, কোথায় উড়ে চলে গেল। কেন এল, কেন এভাবে সারারাত উড়ে গেল, ডেক ফল্কা নোংরা করে গেল, তাজ্জব লাগে ভাবতে। আর আরও তাজ্জব, ওদের মলমূত্রে মানুষের কি হয়ে যায়। এমন পাখি পৃথিবীতে আছে আমি শুনি নি জ্যাক।

—জ্যাক বলল, তুমি দেখেছ?

–কী!

—বারে, জেব্রা।

ছোটবাবু চাইছে এ-ধরনের রসিকতা জ্যাক না করুক। আর্চি আর যাই হোক ওর বস। জ্যাক ওকে ছোট করলে সেও কিছুটা ছোট হয়ে যাবে। আর তাছাড়া বোধ হয় ছোটবাবুর এমনই স্বভাব, মানুষকে খাটো ভাবতে তার খারাপ লাগে। জ্যাক খুব ছেলেমানুষ। আর্চির কষ্টের কথা না ভেবে, তার মুখের কথা ভাবছে। এটা ঠিক না। তা ছাড়া জ্যাক ওর কেবিনে আছে আর্চি দেখলে ক্ষেপে যাবে। সে জ্যাককে বলতে পারছে না, আস্তে। বলতে পারছে না, জ্যাক তুমি এখন যাও।

জ্যাক বলল, কি তুমি জেব্রা দেখেছ?

—দেখেছি।

–কেমন শয়তান শয়তান লাগছে মুখটা।

ছোটবাবুর মনে হল, সেও আর্চিকে আজ সকালে দেখতে দেখতে শয়তান ভেবেছে। মানুষকে শয়তান ভাবা ঠিক না। আসলে ওর তখন মাথা গরম হয়ে গিয়েছিল। মাথা ঠান্ডা ছিল না। অথচ নাবিকের সবচেয়ে বড় পবিত্র কাজ মাথা ঠান্ডা রেখে জাহাজে কাজ করা। সে বলল, এমন বলতে নেই।

জ্যাক বলল, কেন?

–না বলতে নেই।

জ্যাক দেখল, ছোটবাবু ভীষণ গম্ভীর হয়ে গেছে। ছোটবাবুর এমন মুখ সে কখনও দেখে নি। যেন এ-মুখটা দেখলে সমীহ করতে ইচ্ছে হয়। সহজেই আর বলা যায় না, না বলব। বললে তুমি কি করতে পার।

জ্যাক বলল, ওপরে যাবে?

ছোটবাবু বলল, না।

—আর্চি দেখবে না। সে বের হচ্ছে না কেবিন থেকে।

—ভাল লাগছে না। আমি ঘুমোব।

এবার জ্যাক কেমন ভেতরে ভেতরে ক্ষেপে গেল। বলল, বাবা তোমাকে ডেকেছেন।

—আবার আমাকে!

জ্যাক উঠে দাঁড়িয়েছিল। বের হবার মুখে বলল, আমার কেবিনে।

ছোটবাবু যখন সেজেগুজে উঠে গেল, তখন নটা বাজে। সে জ্যাকের কেবিনে ঢোকার মুখে দেখতে পেল, জ্যাক ওকে ডাকছে। বোট-ডেকে জ্যাক বসে রয়েছে। পাশে ডেক-চেয়ারে কেউ আছে। এবং অস্পষ্ট আলোতে সে ঠিক বুঝতে পারল না কে তিনি। কাছে গেলে বুঝতে পারল স্যালি হিগিনস জ্যাকের সঙ্গে গল্প করছেন।

জ্যাক, ছোটবাবুকে দেখেই বলল, এই যে ছোটবাবু।

স্যালি হিগিনস কাছে গেলে বললেন, বোস।

ছোটবাবু জ্যাকের পাশে বসে পড়ল।

স্যালি হিগিনস বললেন, কেমন লাগছে কাজকর্ম?

—ভাল লাগছে স্যার।

—কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?

—অসুবিধা হচ্ছে না।

—এভাবে সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানোর একটা অনন্দ আছে।

—তা আছে স্যার।

—আমরা তাহিতি যাচ্ছি। বড় সুন্দর দ্বীপ। আচ্ছা জ্যাক বলতো তাহিতির রাজধানী কোথায়?

এই হয়েছে মুশকিল। জ্যাকের মুখ ব্যাজার হয়ে গেল। কবে কখন কি বলেছেন, এখন ঠিক তা ঝালিয়ে নিচ্ছেন, জ্যাক বলল, তুমি বলবে না। বলছি। ইস কি যে হয় না বাবা, সব কেমন ভুলে যাই।

—ছোটবাবু বলতে পার?

ছোটবাবুর এ-ব্যাপারে কোনো সঙ্কোচ নেই। এত খবর তার রাখার কথা না। না রাখলেও কিছু আসে যায় না। সে সোজাসুজি না বলল।

—মনে রাখবে। সব দেশের একটা ইতিহাস আছে। সব না জানলেও কিছুটা যে কোন নাবিকের পক্ষে জেনে রাখা ভাল। দেশে ফিরে গেলে, তোমাকে কত লোক কতভাবে জিজ্ঞাসা করবে, বলতে না পারলে ভারী অসম্মানের। তিনি বললেন, পিপিতি। পিপিতিতে জাহাজ যাচ্ছে। তারপর কেমন তিনি প্রাচীন গাঁথার মতো বলে যেতে ভালবাসেন—এই সব পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন একজন এশিয়াবাসী। এবং যেমন ফোনেশিয়ান এবং গ্রীকরা খৃষ্টজন্মের ছ'শ বছর আগে পূর্ব আটলান্টিক আর ভূমধ্যসাগরের সব খবরাখবর সংগ্রহ করেছিল, ফোনেশিয়ানরা পূর্ব-আফ্রিকার উপকূল আবিষ্কার করেছিল, তেমনি একজন এশিয়াবাসী সামান্য কাঠের জাহাজে ভেসে চলে এসেছিলেন তাহিতিতে।

তারপর তিনি বললেন, বলতো জ্যাক আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল কত সালে কে আবিষ্কার করেন?

জ্যাকের এটা মনে ছিল। সে বলল, খৃষ্টের জন্মের প্রায় চারশ বছর আগে হানো আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল আবিষ্কার করেন।

এভাবে কাপ্তেন আবার বলে যান ন'শ চুরাশী খৃষ্টাব্দে এরিক দি রেড আবিষ্কার করেছিলেন, গ্রীনল্যান্ড। চোদ্দশো ছিয়াশীতে ডিয়াজ, কেপ অফ গুড হোপ। চোদ্দশো সাতান্নব্বুইতে ভাস্কো-ডা-গামা ভারতবর্ষে যান। পনেরশো বিশে মেগালান সমস্ত পৃথিবী পরিভ্রমণে বের হন। টাসমান প্রথম অস্ট্রেলিয়া আবিষ্কার করেন। কাপ্তান কুকের প্রথম সমুদ্রযাত্রা সতেরোশ আটষট্টি থেকে একাত্তর। এভাবে তিনি আমুন্ডসেন পর্যন্ত বলে থামলেন।

ছোটবাবুর শুনতে বেশ ভাল লাগছিল। জ্যাকের পড়াশোনা বোধ হয় জাহাজে এভাবে হয়ে থাকে।

তারপর তিনি বললেন, পিপিতি ভারি সুন্দর ছোট্ট ছিমছাম শহর। আজকাল আর টিয়ারী হোটেলের চার পাশের ঘিঞ্জি বাড়ি-ঘর দেখতে পাবে না।

মনেই হবে না, এখানে এখনও দেড়শ-দুশো বছর আগে আদিবাসীদের সঙ্গে ফরাসীদের রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম হয়েছিল। ভ্রমণকারীরা শহরে ঢুকেই প্রথম চলে যায় গোগাঁর আর্ট গ্যালারী দেখতে। সুন্দর বন্দর রয়েছে। এবং বালিয়াড়ি, ছোট ছোট নৌকা দেখতে পাবে। শহরটাতে প্রায় ত্রিশ হাজার লোক বসবাস করে থাকে। প্রতিদিন পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসছে ভ্রমণকারীরা। নেমেই ওরা তাহিতিদের প্রিয় খাবার পিসান ক্রু খেতে ভারি ভালোবাসে। এদের প্রিয় ফিস্টের নাম ট্যামারা। গরম পাথরের ওপর লোবস্টার, চিকেন, মেরিল্ড ফিস উল্টে-পাল্টে নানারকম মসলাপাতি দিয়ে ভাজা হয়। খেজুর গাছের ছায়ায় সমুদ্র দেখতে দেখতে যখন কেউ খায় তখন জীবন বড় সুন্দর মনে হয়।

তিনি বললেন, পাহাড়ের ওপর তাহাড়া হোটেল। কতরকমের গাছপালার ফাঁকে ওপরে উঠে যেতে হয়। অধিকাংশ গাছ বলতে খেজুর তাল। ছোট ছোট এক রকমের ঝোপ রয়েছে, বন্য ফুলে ভরা। আর পাহাড়ের মাথা থেকে দেখতে পাবে অনেক দূরে একটা দ্বীপ, দ্বীপের নাম মুরিয়া। প্রায় বারো মাইল দূরে এই দ্বীপ। আসলে দ্বীপটাতে রয়েছে নানা বর্ণের পাহাড়। আর নীল রঙের লতাপাতা। পাহাড়ের চূড়ো একটা দুটো নয়, অনেক। প্রায় মনে হয় অসংখ্য ছোট ছোট পিরামিড—কোন প্রাচীন ফারাও নিজের জন্য এমন একটা নির্জন দ্বীপ যেন গড়ে রেখেছেন। পিপিতি থেকে মোটরবোটে গেলে নাইনটি মিনিটস লাগবে। ছোট ছোট বোট ভাড়া পাওয়া যায়। ইচ্ছে করলেই ঘুরে আসা যেতে পারে। তাহিতির উত্তর-পশ্চিমে প্রায় এক'শ চল্লিশ মাইল দূরে রয়েছে বোরা দ্বীপ। দু'হাজার লোকের বাস সেখানে। দ্বীপটা তার লেগুনের জন্য বিখ্যাত। সরু লম্বা লেগুন একেবারে দ্বীপের ভেতর ঢুকে গেছে। গ্লাস আঁটা মোটরবোটে অসংখ্য ভ্রমণকারী লেগুনে ঘুরে বেড়ায়। রাত কাটায়। জ্যোৎস্না রাতে জলের ধারে ছোট ছোট হোটেলে তারা থাকে। মাছ ধরে। সমুদ্র থেকে ঠান্ডা বাতাস চলে আসে। মাছ ধরার সময় ওদের খুব নিবিষ্ট লাগে দেখতে। গলদা চিংড়ি, হেরিং আর ম্যাকরোল মাছের

জন্য জায়গাটা খুব বিখ্যাত

তারপর তিনি ছোটবাবুর দিকে তাকালেন—কেমন মনে হয় ছোটবাবু, কেবল দু'পাশে উঁচু পাহাড়, নিচে নীল জল, ছোট ছোট উপত্যকা পাহাড়ের কিনারায়। সেখানে ছোট ছোট কাঁচের ঘর, বাতিদান, লাল-নীল চেয়ার, এবং পানীয় বলতে প্রিয় মদ হিনা, মানুই। বেশ গরম পাথরের বাটিতে চিংড়ি মাছ ভাজা আস্ত।

ছোটবাবুর ভাজা চিংড়ি মাছ আস্ত শুনে প্রায় জিভে জল এসে গেল। বাবা হাট থেকে বড় গলদা চিংড়ি আনলে চিংড়ি মাছের মুড়ো ভাজা, নরম আতপ চালের গোলাতে ভিজিয়ে এবং মাথার ভেতরের অংশটা কি লাল, মুড়ো ভেঙ্গে ভাত মেখে নিলে ভাতটা একেবারে লাল হয়ে যেত। কতদিন সে ভাত এবং চিংড়ি মাছের মুড়ো ভাজা না খেয়ে আছে। যেন দেশে ফিরে গেলে সে প্রথমেই হাট থেকে বড় গলদা চিংড়ি কিনে আনবে।

আর তখনই কাপ্তান হিগিনস পাইপ ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছেন। দামী টোবাকো বোধ হয় খান। বেশ গন্ধ টোবাকোর। টাকা-পয়সা জমলে সেও একটা লম্বা পাইপ কিনবে, লম্বা গোঁফ রাখবে, এবং পাইপে টোবাকো টানবে। জ্যাক কিছুই বলছে না। সে এ-সব শুনছে কিনা তাও বোঝা যাচ্ছে না। জাহাজটা চলছে—আকাশের নক্ষত্র সব পেছনে পড়ে থাকছে, কখনও কখনও মনে হয়—না কেউ পেছনে পড়ে থাকছে না। জাহাজটার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তারাও সবাই তাহিতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। নক্ষত্র, সমুদ্র, আকাশ, এ্যালবাট্রস পাখি, জাহাজ, জাহাজের নাবিকেরা সবাই যেন তাহিতির এমন সব সুন্দর দৃশ্যাবলীর কথা শুনে স্থির থাকতে পারছে না। একসঙ্গে সবাই তাহিতি দর্শনে যাচ্ছে।

ছোটবাবু বলল, আমরা তো মাত্র একদিন থাকব স্যার?

—একদিন থাকবে, আর এক রাত। সেদিন সবার ছুটি থাকবে। তোমরা যতটা পার দেখে নিও।

ছোটবাবুর ভীষণ আশ্চর্য লাগছে—আগে হিগিনসকে মনে হত অন্য গ্রহের মানুষ। তিনি গঙ্গাবাজু ধরে আসছেন শুনলে সে হাঁটত যমুনাবাজু ধরে। যেন সামান্যতম বেয়াদপি দেখলেই তিনি সমুদ্রে তাঁকে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন। জাহাজে কিসে কি বেয়াদপির সামিল সে জানত না। এখন এই জাহাজে চলতে চলতে তিনি কি যে আপন হয়ে যান কখনও কখনও। ঠিক পিতা, পিতামহের মতো মনে হয়। পৃথিবীতে সব পিতা-পিতামহেরা বোধ হয় এভাবে বেঁচে থাকে। সে বলল, আপনি কিনারায় নামবেন না? বলেই ভাবল, এটা কি বলা ঠিক হল। এটা অবান্তর কথা। একজন কাপ্তানের কিনারায় নামা না নামা সম্পর্কে সে কোনই প্রশ্ন করতে পারে না। সে প্রায় মরমে মরেই যেত।

তখন হিগিনস খুবই অবাক হয়ে বললেন, নামব না! তাহিতি আমার খুব প্রিয় জায়গা। এইটুকু বলে তিনি অন্যমনস্ক হয়ে গেলেন। মনে হচ্ছে সবই সেদিনের কথা। এলিস তাহিতিতে নেমে ছেলেমানুষের মতো হৈ-চৈ বাঁধিয়ে দিয়েছিল। সমুদ্রের ধারে ধারে পিচের রাস্তা কত রকমের রং-বেরংয়ের গাড়ি, এবং আশ্চর্য বাজনা—গাড়ি চালাতে চালাতে সেই অদৃশ্য মিউজিক চারপাশে বেজে উঠেছিল।

॥ সাতাশ ॥

গাছপালা, সবুজ গাছপালার ভেতর দিয়ে, তারপর আনারসের ক্ষেত মাইলের পর মাইল, কোথাও কমলালেবুর বাগান এবং নীলকুঠি, পাশে স্যালি হিগিনস, সঙ্গে খাবার নানারকমের এবং কোনো উপত্যকায় গাড়ি উঠে গেলে নির্মল আকাশের নিচে উজ্জ্বল রোদে ওর বালিকার মতো হেঁটে যাওয়া, পর্বতগাত্রে নিজের নামের পাশে স্যালি হিগিনস এই সব বর্ণাঢ্য ছবি ভেসে উঠলে ভেতরে ভেতরে কেমন গুম মেরে যান। সে-বয়সে এলিসকে সত্যিই বালিকা ভাবা চলে। সমুদ্রে এলিসের ভীষণ একঘেয়ে জীবন, এই ডাঙ্গায়, কোন রেস্তোরাঁতে বসে সামান্য মদ্যপান, এবং চাইনিজ অথবা ফরাসী খাবার খেতে খেতে লাস্যময়ী হয়ে যাওয়া সবই সেদিনের কথা মনে হলে তিনি আর স্থির থাকতে পারেন না। এবং এসব ভাবলেই এলিস ওর সামনে এসে দাঁড়ায়, বলে, আমি এলিস। হিগিনস, আমাকে তুমি চিনতে পারছ না? তারপরই সেই পতনের শব্দ পান। জাহাজ থেকে সমুদ্রে কেউ পড়ে গেল। তিনি এলিসের ভাবনায় এ-জন্য কখনও মগ্ন হয়ে যান না।

ছোটবাবু, জ্যাক পায়ের কাছে চুপচাপ বসেছিল। হিগিনস কিছু না বললে, সে কিছু আর বলতে পারে না। বোধ হয় হিগিনস টের পাচ্ছিলেন, ছোটবাবু এভাবে বসে থাকতে বিব্রত বোধ করছে এবং জ্যাকও যখন আর কোনো কথা বলছে না, তখন ঠিক চুপচাপ থাকা ঠিক না। তিনি বললেন, পাখিগুলো কোত্থেকে যে এল!

ছোটবাবু যা হোক একটা কথা পেয়ে গেছে। সে বলল, এটা কেন যে হল?

—আমি এর কিছু জানি না। তিনি পায়ের ওপর পা রেখে দোলাতে থাকলেন। একবার চুলের ভেতর আঙ্গুল চালিয়ে চুল টানলেন। ওপরের পাটির দাঁত ঠেলে আবার ঠিক জায়গায় বসালেন। কথা শুরু করার আগে ঠিক তাঁর এমন সব অভ্যাস বজায় রাখেন। তিনি ফের বললেন, জাহাজের অনেক কাহিনী, গল্পগাঁথা হয়ে যায়। নাবিকের ডাইরী থেকে এমন সব আজগুবী কাহিনী অনেক পাওয়া যায়। যার কোনো সঠিক ব্যাখ্যা চলে না। তোমার মনে আছে হয়তো, কী ভয়ংকর ব্রেকারের ভেতর পড়ে গেছিলে। এর কার্যকারণ আমরা জানি না। ডাইরীতে লেখা থাকবে। এই যেমন অনেকের লেখা থাকে। নাবিকের ডাইরী থেকেই জেনেছিলাম, প্রশান্ত মহাসাগরে এ-সব পাখিদের আস্তানা রয়েছে। কিন্তু কেউ খুঁজে বের করতে পারে নি বলে কাল্পনিক ভেবেছে সবাই।

তিনি বললেন, এই যে জ্যাক। ঘুমোচ্ছ?

জ্যাক বলল, যাঃ ঘুমোব কেন?

—কথা বলছ না। হাটুর ভেতর মাথা গুঁজে রেখেছ?

জ্যাক যেন সমবয়সী বন্ধুর সঙ্গে কথা বলছে। সে তার বাবাকে একদম পাত্তা দিতে চাইল না। ছোটবাবুর ভারি মজা লাগছিল। জ্যাক কেমন অনায়াসে বলে ফেলল, বাবা আমার ঘুম পাচ্ছে। তোমার কোনো কথা শুনতে আর ভালো লাগছে না।

ছোটবাবুকে ভালো শ্রোতা পেয়ে বুড়ো মানুষটা বর্তে গেছেন। জাহাজে তাঁর কথা বলার লোক কম। ছোটবাবুকে প্রথম থেকেই ভালো মানুষ ভেবে ফেলেছেন। ছোটবাবুর সব সে জেনেছে—জ্যাক তো যত কথা বলে তার বেশির ভাগ ছোটবাবুকে নিয়ে। ছোটবাবুর পাশে বসে থাকতে জ্যাকের ভাল লাগার কথা। কিন্তু জ্যাক বসে থাকতে চাইছে না, এত তাড়াতাড়ি ঘুম পাচ্ছে—জ্যাকের কি ভাল লাগছে না বুড়ো মানুষটাকে—কেমন চাপা অভিমান তাঁর—জ্যাক বড় হয়ে গেছে বুঝতে পারছেন, ঠিক বালিকার মতো স্বভাব এখন আর তার নেই। মাঝে মাঝে জ্যাক এমন গম্ভীর হয়ে যায় যে, তিনি নিজে পর্যন্ত কথা বলতে ভয় পান।

সুতরাং ছোটবাবুই তার একমাত্র সময় কাটানোর মতো মানুষ। ওপরে থার্ড-মেট আছে। বারোটা পর্যন্ত তিনি জেগে থাকবেন। ওরা ছেলেমানুষ—ওদের বেশি রাত পর্যন্ত আটকে রাখা

ঠিক না। তবু যা বলছিলেন, শেষ না করলে ছোটবাবুর মনে তার সম্পর্কে সংশয় থেকে যাবে। সমুদ্র সম্পর্কে সঠিক ধারণা হবে না।

তিনি বললেন, সমুদ্রে কি হয় না হয় কেউ বলতে পারে না। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগের ঘটনা। জাহাজে তখন চিফ-মেটের প্রমোশন পেয়েছি। চীন উপসাগরে জাহাজ। সকালের দিকে আরও দুটো জাহাজ পাশাপাশি। এই ধর পঞ্চাশ মাইলের ভেতর। মাঝে মাঝে ঠিক বেতার সংকেত চলে আসছে। দুপুর পর্যন্ত আমরা খবরাখবর ঠিক রেখে যাচ্ছি। আর বিকেলে খবর এরিয়া স্টেশন থেকে—এস এস সিটি অফ পানামার খোঁজ নেই। কোনো এস-ও-এস ছিল না। সমুদ্রে কোনো ঝড় নেই। ঘন্টা তিনেকের ভেতর হংকং থেকে উড়ো জাহাজ ফ্লাই করল, আমরা এগিয়ে গেলাম—কিচ্ছু দেখা গেল না। জাহাজ মিসিং। জাহাজের কুটোগাছটি কোথাও আমরা ভেসে যেতে দেখলাম না। একেবারে রহস্যের অন্তরালে সে চলে গেল।

তিনি থেমে বললেন, এভাবে কত জাহাজ মিসিং হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। ওরা যে গভীর সমুদ্র থেকে উঠে আসা কোন প্রাচীন দানবের সাক্ষাৎ পায়নি কে বলবে। জাহাজটাকে যে নিমিষে কোন চম্বুকের পাহাড় অতল সমুদ্রে ডুবিয়ে দেয়নি কে বলবে, অথবা এইসব বিষাক্ত পাখিদের মতো আরও অতিকায় নাটকীয় কিছু ঘটেনি কে বলবে। সব তো লেখা থাকে না। লেখা থাকলেও কাল্পনিক ভেবে নিতে কতক্ষণ।

—কিন্তু আর্চির মুখের দাগ!

—সবাই বলবে, মারামারি করতে গিয়ে কেউ আঁচড়ে খামচে দিয়েছে। জাহাজ থেকে নেমে বেটারা বেশ গল্প ফেঁদেছে এ-সবও যে বলবে না তার বিশ্বাস কি! তবু তুমি যা দেখলে ভাববে, জাহাজ সমুদ্রে এভাবেই সব প্রতিকূলতার ভেতর পড়ে যায়। ওঁর ইচ্ছে থাকলে বাঁচেন, ইচ্ছে না থাকলে বাঁচেন না। সমুদ্রে তিনিই সব। বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। জ্যাক সত্যি ঝিমুচ্ছিল। তিনি ডাকলেন, জ্যাক শুতে যাও। এই জ্যাক তুমি ঘুমোচ্ছ? ঠিক ঘুমোচ্ছ।

—হ্যাঁ আমি ঘুমোচ্ছি। বলে জ্যাক যখন উঠে দাঁড়াল, জ্যাকের চোখ লাল। জ্যাক ঘুমিয়ে পড়েছে এটা ভাবতে সে লজা পাচ্ছে। সে বলল, তুমি যাচ্ছ?

—তোমরা যাও। বলে তিনি যুবক বয়সে যেভাবে সিঁড়ি ভাঙতেন, প্রায় তেমনি সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন। জ্যাকের কেবিন যেহেতু বোট-ডেকে সে দরজার পাশে এসে বলল, গুড-নাইট।

ছোটবাবু বলল, গুড-নাইট। কিন্তু জ্যাক দেখল, ছোটবাবু নিচে সিঁড়ি ধরে নেমে যাচ্ছে না। সে বোট-ডেক ধরে হেঁটে যাচ্ছে। সে ডাকল, এই ছোটবাবু কোথায় যাচ্ছ আবার?

—একটু পরে শোব। ঘুম পাচ্ছে না।

—এই যে বললে, ঘুম পাচ্ছে খুব। ওপরে উঠবে না।

—এখন আর পাচ্ছে না।

—আমারও পাচ্ছে না বলে সে দৌড়ে ছোটবাবুর কাছে চলে গেল।

—কোথায় যাচ্ছ? —কোথাও না।

—তুমি রাগ করেছ ছোটবাবু?

—রাগের কি আছে!

—না এই যে ডেকে আনলাম। মিথ্যে কথা বলে বাবার কাছে বসিয়ে রাখলাম।

—আরে না। তুমি যে কি না জ্যাক। ঘুমোও গে তো।

জ্যাক বলল, কি যে সুন্দর লাগছে না আকাশটা।

—কত নক্ষত্র! ছোটবাবু দাঁড়িয়ে গেল।

—দ্যাখো এরা সবাই জাহাজটার সঙ্গে এগিয়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে না, আমাদের সঙ্গে সবাই

যাচ্ছে তাহিতিতে।

—তাইতো!

ওরা বোটের আড়ালে দুজনে বসে পড়ল। জ্যাক তার পাশে বসেছে, একেবারে গা ঘেঁসে এবং পুষিবেড়ালের মতো করছে। জ্যাক কি যে ছেলেমানুষী করছে। এবং মাঝে মাঝে সে বিরক্ত হয়ে পড়ছে। বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, তুমি ঠিক হয়ে বোস। এভাবে গোটা শরীর ছেড়ে দিলে বসতে পারি। কিন্তু বলতে পারে না। জ্যাক এখন চুপচাপ আকাশ দেখছে। নক্ষত্র দেখছে। সাত-পাঁচ মুখে যা আসছে বলে যাচ্ছে। ওর বাবা রাতের পর রাত নক্ষত্র দেখে জেগে থাকতে পারত। ওর বাবা কোন্ আকাশে কোন্ সময়ে কি কি নক্ষত্রের সমাবেশ ঘটে বলে দিতে পারে। যেমন তার ইচ্ছে বাবার কাছ থেকে সে সব নক্ষত্রের নাম জেনে নেবে, এবং রাতে যখন কিছু ভাল লাগবে না, ছোটবাবুকে সঙ্গে করে বোট-ডেকে উঠে আসবে এবং এক-দুই করে সমস্ত আকাশের নক্ষত্রের নাম বলে যাবে ছোটবাবুকে। কি যে সব মাথামুন্ডু বলছে। ওর পিঠে হেলান দিয়ে জ্যাক বেশ সুখে বসে রয়েছে। জ্যাকের মুখ যমুনাবাজুর দিকে। ওর মুখ সমুদ্রের দিকে।

তখন মনে হল ঠিক নিচে আরও একজন একাকী এভাবে দাঁড়িয়ে আছে। উইন্ডসেলের পাশে, চুপচাপ, সমুদ্রের নির্জনতার ভেতর আকাশ দেখছে। প্রথমে ভূতটুতের ব্যাপার ভাবল, তারপর তড়াক করে লাফিয়ে দেখতে গেল কে এভাবে দাঁড়িয়ে? কাছে গিয়ে বুঝতে পারল, এনজিন সারেঙ। সাদা চুল সাদা দাড়িতে এমন সুন্দর চেহারা জাহাজে আর একটিও নেই। ছোটবাবু বলল, চাচা আপনি।

—তুই! তুই এখনও জেগে আছিস। শরীর খারাপ করবে।

—আমি একা না। জ্যাকও আছে।

—জ্যাক! কেমন গুটিয়ে গেলেন এনজিন-সারেঙ।

ছোটবাবু বলল, জ্যাক ভীষণ ভাল চাচা। জ্যাক এগিয়ে এস।

সারেঙ-সাব বললেন, থাক থাক। বলে টুইন ডেক ধরে হাঁটতে থাকলেন। ছোটবাবু কি করবে বুঝতে পারল না। পাশে পাশে হেঁটে গেল। মানুষটা পৃথিবীতে ভীষণ একা। এখানে দাঁড়িয়ে এত রাতে কি দেখছিলেন সে বুঝতে পারল না। গত রাতে ওরা একটা দুঃস্বপ্নের ভেতর ছিল, কেউ যেন এখন তা মনে করতে পারছে না। সে এগিয়ে গেল। বলল, চাচা আপনার শরীর ভাল তো? এমন একটা প্রশ্ন এত উদ্বিগ্ন গলায় জাহাজে কেউ তাঁকে করতে পারে তাঁর জানা ছিল না। তিনি দাঁড়ালেন। ছোটবাবুর মাথায় হাত দিয়ে বললেন, ভাল আছি। বুড়ো মানুষের সব সময় ভাল থাকা ছাড়া উপায় থাকে না ছেলে।

ছোটবাবু বলল, আপনাকে দেখে ভীষণ খারাপ লাগছে।

—কেন রে!

—আপনাকে বড় একা মনে হয়।

—আমি একা থাকব কেন। আমার আল্লা আছেন না। তিনি থাকলে আমার আর কিছু লাগে না ছেলে। আমি তাঁর কাছে আছি ভাবতে ভাল লাগে। সবাই ঘুমিয়ে থাকলে, জাহাজ ডেকে চুপচাপ দাঁড়াতে ভাল লাগে। এত বড় সমুদ্রে রাতে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকলে তাঁকে খুব কাছে পাওয়া যায়।

এবং এভাবে সারেঙ-সাবকে দেখলেই আর একজন মানুষের কথা সে না ভেবে পারে না। ঠিক যেন সেই মানুষ তাকে রক্ষা করতে জাহাজে উঠে এসেছেন। দেশভাগের সময় যে তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে গেলে মনে হত ওর পৃথিবীতে তার কিছু হারায় নি, তিনি ছিলেন তাদের একজন। জাহাজে উঠে ছোটবাবু অন্ততঃ সেই একজনকে আবার ফিরে পেয়েছে। সে বলল, চাচা আমি ঠিক পারছি তো!

চাচা বুঝতে না পেরে, ওর দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

–এই কাজ কর্ম। আপনি তো ভয়ে জাহাজে নিতে চাননি। আমি কিন্তু চাচা আপনার এতটুক অসম্মান হয় তেমন কাজ করি নি।

—তুই এ-সব বলছিস কেন?

—আমার কেবল ভয় হত, আপনি ছোট না হয়ে যান। হাতে ধরে আপনি আমাকে এনেছেন।

—আমাকে তো তুই অনেক বড় করে দিয়েছিস।

ছোটবাবু মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে থাকল।

এনজিন-সারেঙের চোখ ছলছল করছে। বললেন, পারবি। পারবি তুই। আর দাঁড়ালেন না। দ্রুত চার নম্বর ফল্কা পার হয়ে গ্যালির কাছে উঠে গেলেন। জ্যাক কিছু বুঝতে পারল না। সে দূরে দাঁড়িয়ে শুধু দেখছে। ছোটবাবু কেমন মুহ্যমান। এটা যে কি হয় মাঝে মাঝে ছোটবাবুর। মাস্তুলের নিচে মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। ছোটবাবু কি তার লিটল প্রিন্সেস-এর জন্য খোলা ডেকে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। সারেঙ-সাব কি তাকে কোনো খবর দিয়ে গেল। এবং কাছে গিয়ে ডাকল, এই ছোটবাবু, ছোটবাবু! তুমি এভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন?

ঘুম থেকে জেগে ওঠার মতো মুখ, নিমেষে, সে তার ছোট আর এক গ্রহ থেকে যেন ঘুরে এল। তাদের প্রিয় আশ্বিনের কুকুরের কথা মনে হল। বর্ণময় লতাপাতা ঘেরা এক পৃথিবী, সেখানে একজন মানুষ কেবল হেঁটে যাচ্ছেন। তাঁর মুখে কিটসের কবিতা। সে বলল, জ্যাক তুমি কিটসের কবিতা আবৃত্তি করতে পার?

—কিটসের কবিতা! কেন বলতো!

—এই এমনি। বলে সে হাঁটতে থাকল। সে বলতে পারল না, আমি যে গ্রহ থেকে এসেছি জ্যাক সে ভারি সুন্দর গ্রহ। এত দেশ-দেশান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছি, তেমনি সুন্দর ছোট্ট গ্রহ কোথাও খুঁজে পেলাম না। মানুষের জন্মভূমি বড় প্রিয়। প্রিয় তার সেই গাছপালা, শৈশব আর আশ্বিনের কুকুর। একজন মানুষের হাতীতে চড়ে মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া, তাঁর ফিরে আসা, তাঁর কবিতা আবৃত্তি এবং মাঝে মাঝে কি হয়ে যেত আমাদের সবার, তিনি না থাকলে আমাদের কিছু নেই এমন মনে হত। সে-সব তুমি বুঝবে না।

তখনই জ্যাক বলল, দ্যাখো দ্যাখো!

ছোটবাবু ওপরের দিকে তাকাল। সত্যি সে আশ্চর্য হয়ে গেল দেখে। লেডি-অ্যালব্রাটস ক্রোজনেস্টের মাথায় বসে রয়েছে। এবং নিচে আলো, আলোর ডুম দুলছে। যেন কতদিন পর সে ফিরে এসেছে। সমুদ্রে উড়ে উড়ে ক্লান্তিতে ঘুম পাচ্ছে পাখিটার। এবং এক আক্রোশ এই পাখিকে কেন্দ্র করে। যে-কোনো সময় যে কেউ বন্দুকের নলে পাখিটাকে নামিয়ে আনতে পারে। যেমন তার আশ্বিনের কুকুরের জন্য কষ্ট হত, তেমনি এই পাখিটার জন্য মায়া। সারেঙ-সাব, কাপ্তান, ওর সেই হাতীতে চড়ে মাঝে মাঝে নিরুদ্দেশ হয়ে যাওয়া পাগল জ্যাঠামশাইর সঙ্গে ভারি মিল পাখিটার। নিঃসঙ্গ সে। পাখিটাকে আজ আর তাড়িয়ে দিতে পারল না। বরং মনে হল, মাস্তুলের নিচে সে নিজে এবার থেকে বসে থাকবে। পাহারা দেবে পাখিটাকে। ভোররাতে সমুদ্রে উড়িয়ে ধীরে ধীরে চলে যাবে কেবিনে। তারপর ঘুম যাবে। পাখিটার জন্য নিশীথে এই গভীর সমুদ্রে এক আশ্চর্য ভালবাসা গড়ে উঠল। সে বলতে চাইল, হে মহান লেডি, আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোন। অধম নিচে পাহারায় থাকল।

এ-ভাবেই মানুষের কখনও কিছু একটা হয়ে যায়। কখন কার জন্য ভালবাসা গড়ে উঠবে সে জানে না। লেডি-অ্যালবাট্রসের জন্য ছোটবাবুর কাজ বেড়ে গেল। সে জ্যাককে তার কেবিনে পৌঁছে দিল। নিজে নেমে এল নিচে। এখন ঘড়িতে দশটা বেজে পঁচিশ। সে আসার সময় জ্যাককে বলে এসেছে, দোহাই কাউকে বলবে না, লেডি-অ্যালাবাট্রস, রাত গভীরে

জাহাজের মাস্তুলে এসে বসে থাকে, ঘুমোয়। সকালের দিকে জাহাজিদের ঘুম না ভাঙতে সে সমুদ্রে উড়ে যায়। কেউ টের পায় না, রাতে পাখিটা এই জাহাজের মাস্তুলে নিজের বাসভূমি তৈরি করে নিয়েছে। সবচেয়ে ভয় এখন আর্চিকে। সে যা কিছু ভালবাসবে, আর্চি জানতে পারলেই তা বিনষ্ট করবে। যদি কখনও পাখিটার ভোর রাতে ঘুম না ভাঙে...!

এখন যা করণীয়, একটা টাইমপিস ঘড়ি। ভোর রাতের দিকে সে এলার্ম দিয়ে রাখবে। এলার্ম বাজলে উঠে পড়বে বাংক ছেড়ে। এবং চারপাশে সতর্ক নজর রাখবে। খুব সন্তর্পণে গিয়ে দাঁড়াবে মাস্তুলের গোড়ায়। তারপরে হাতে তালি বাজিয়ে পাখিটাকে জাগিয়ে দেবে এবং উড়িয়ে দেবে।

জাহাজে দু'জনের দুটো টাইমপিস ঘড়ি আছে। একটা কাপ্তান স্যালি হিগিনসের, আর অন্যটা এনজিন সারেঙের। সে এনজিন সারেঙের কাছ থেকে অনায়াসেই চেয়ে নিতে পারে। কারণ জাহাজে ওয়াচের পর ওয়াচ চলে। যেমন এনজিন-রুমে গ্রিজার ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় চলে। তার কাজ আধ ঘন্টা আগে পরবর্তী ওয়াচের লোকদের জাগিয়ে দেওয়া। তার কাজ যথাসময়ে পরবর্তী ওয়াচের সবাইকে সজাগ করা। সারেঙসাবের ঘড়ি না হলেও চলে। তবু তিনি ঘড়িটা কাছে রাখেন, মধ্যরাতে ওয়াচের সব লোকেরা মাঝে মাঝে ভীষণ ক্ষেপে যায়। মারামারি পর্যন্ত আরম্ভ করে দেয়। একটু আগে পরে হয়ে গেলে এমন হয়।

তবু যা মনে হল, সে সারেঙ-সাবের কাছে ঘড়ি চাইলে তিনি দেবেন। কিন্তু যদি তিনি ঘড়িটা না থাকলে সত্যি অসুবিধা বোধ করেন তাহলে কি হবে বুঝতে পারল না। ঘড়িটা নেই, অসুবিধা হচ্ছে, তিনি মুখ ফুটে কখনও বলবেন না। সে তো তাঁকে এতদিনে প্রায় জেনে ফেলেছে।

সবচেয়ে ভাল হয় ডেবিডের সঙ্গে কথা বলে রাখা। ওর ডিউটি বারোটা-চারটা। চারটায় সে যখন কেবিনে ফিরে আসবে, তখন তাকে ডেকে দিলেই চলবে। সে সোজা গিয়ে ডেবিডের দরজায় আঙুলে টোকা মারল। ডেবিড দরজা খুললে বলল, তোমাকে একটু বিরক্ত করতে এলাম।

ছোটবাবুর কথা বলার স্বভাবই এ-রকমের। ছোটবাবু ভেবেছিল, ডেবিড হয়তো ঘুমোচ্ছে। ওকে ডাকা ঠিক হবে কি হবে না বুজতে পারছিল না। তবু যখন না ভেবে চলে এসেছে তখন এভাবেই কথা বলা উচিত। ডেবিডের বোধ হয় চোখে ঘুম লেগে এসেছিল। স্লিপিং গাউনের দড়ি আঁটতে আঁটতে বলল, কি ব্যাপার বলবে তো!

—ব্যাপার কিছু না। আমার খুব সকালে ওঠা দরকার। ঘুম ভাঙতে দেরি হয়ে যায়। ওয়াচ থেকে ফেরার সময় আমাকে একটু ডেকে দেবে!

–দেব।

—রোজই দেবে।

—তা দেব।

—অন্ততঃ যতদিন না তাহিতিতে পৌঁছাচ্ছি।

—হবে হবে। কিন্তু এত সকালে!

ছোটবাবু চলে গেল। কিছু আর বলল না। কি যে দরকার সকালে ওঠার! পাগল! ডেবিড এ নিয়ে আর কিছু ভাবল না। সে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। জাহাজে উঠলে নানারকমের বাতিক দেখা দেয়। ছোটবাবুকে খুব সকালে ওঠার বাতিকে পেয়েছে।

এবং সে ওয়াচ থেকে ফেরার সময় ঠিক মনে রেখেছে। সে ডাকল, এই ছোট, ওঠো।

ছোট বলল, উঠেছি।

এক ডাকেই ছোটবাবু সাড়া দিয়েছে। ডেবিড ভেবে পেল না, ছোটবাবুর রাতে ঘুম হয়েছে কিনা। না আদৌ ঘুমোয় নি। সে সারারাত সকালে উঠতে হবে বলে জেগে বসেছিল। ডেবিড

বলল, ছোট, কফি খাবে?

ছোটবাবু বলল, না।

এলি-ওয়েতে সে এ-ভাবে দাঁড়িয়ে ফের বলল, তোমার সকালে কফি খেতে ভাল লাগে না?

—না সেকেণ্ড।

আসলে ছোটবাবু তো বলতে পারে না, তোমার সঙ্গে কফি খাওয়া মানে, তুমি গল্প আরম্ভ করে দেবে। অথবা আমি কি করছি না করছি তোমার জানা হয়ে যাবে। ছোটবাবু দরজা কিছুতেই খুলল না। ডেবিড দাঁড়িয়ে থেকে কিছুক্ষণ কি ভাবল, তারপর নিজের কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

দরজা বন্ধের অস্পষ্ট শব্দে সে বুঝতে পারল ডেবিড চলে গেছে। সে এবার খুব সন্তর্পণে দরজা খুলে মুখ বাড়াল। এলি-ওয়েতে কেউ নেই। কেউ থাকার কথাও না। পাঁচ-নম্বরের এখন নিচে নামার কথা। তিন-নম্বরের এনজিন-রুম থেকে ফিরে আসার কথা। এনজিন-রুমের ফায়ারম্যান, টিণ্ডাল ওয়াচ শেষ করে ফিরে যাবে। সে আর একটু সময় অপেক্ষা করল। দরজা বন্ধ করে বসে থাকল। কারণ ডেবিডের হাত মুখ ধোওয়ার ব্যাপার আছে, কফি না খেয়ে শুতে যাবে না, তিননম্বর এনজিনিয়ার এসেই শুয়ে পড়বে না, সেও কোনো না কোনো কারণে এলি-ওয়ে ধরে হেঁটে যেতে পারে। দেখা হয়ে গেলে দাঁড়িয়ে দু একটা কথা বলতেই হবে। অসময়ে ছোটবাবু এলি-ওয়ে ধরে কোথায় যাচ্ছে এ-সব প্রশ্ন স্বাভাবিক কারণেই ওদের মনে হতে পারে। সুতরাং একটু অপেক্ষা করে তবে যাওয়া ভাল।

সে যখন হেঁটে গেল—কেবিনের সব দরজা বন্ধ। শুধু আলো জ্বলছে, সরলরেখার মতো। অনেক দূরে—একটা খোলা সরু বাকসের মতো দরজা দেখা যাচ্ছে। সে চারপাশে সতর্ক নজর রেখে হেঁটে গেল ডেকে। অস্পষ্ট অন্ধকার। আলোগুলো দুলছে। দূরের সমুদ্রে কেমন সঙ্গীতের মতো একটা বাজনা বাজছে। সমুদ্রের এই সংগীত এবং ওপরে লেডি-অ্যালবাট্রস পাখার ভেতর ঠোঁট গুঁজে ঘুমিয়ে আছে —আর জাহাজের ওপর দিয়ে আকাশটা তার নক্ষত্রমালা নিয়ে একেবারে একটা নীল আচ্ছাদনের মতো হয়ে গেছে এসব দেখতে দেখতে সে দাঁড়িয়ে গেল। ওর শরীরে সাদা পোষাক। সাদা পায়জামা, সাদা হাফসার্ট এবং বাথরুম স্লিপার পায়ে। সে চটি পরে আসেনি, যদি শব্দে কেউ টের পায়, ছোটবাবু যাচ্ছে ডেকে। অসময়ে ছোটবাবু ডেকে যাচ্ছে কেন!

আসলে এইসব নিরিবিলি সমুদ্রের ভেতর দাঁড়িয়ে না থাকলে টের পাওয়া যায় না, জীবনে এক মুহ্যমান ব্যাপার থেকে যায় কখনও কখনও। তখন হিসেব করে পৃথিবী থেকে পাওনা গণ্ডা মিটিয়ে নেবার কথা মনে থাকে না। কি দরকার যে ছিল ওর, সে বুঝতে পারছিল না। সারারাত সে দুচোখ এক করতে পারেনি। যদি ডেবিড ডেকে দিতে ভুলে যায়। ডেবিডের ওপর সে বিশ্বাস রাখতে পারে নি। তারপর ভেবেছে, সে জেগে না গেলে পাখিটা ঘুমিয়ে পড়বে, সকালে কেউ ওপারে তাকালেই দেখতে পাবে—লেডি অ্যালবাট্রস মাস্তুলে বসে রয়েছে। এমন একটা প্রতিশোধের সুযোগ পাওয়া ভার—সুতরাং ছোটবাবু রাতে কিছুতেই ঘুমোতে পারল না। মাস্তুলের নিচে দাঁড়িয়ে সে শুধু পাখিটার অসহায়তার কথা ভাবছে। ভাবতে ভাবতেই সে জোরে তালি বাজাল। আর সঙ্গে সঙ্গে পাখিটা ঠোঁট পাখার ভেতর থেকে বের করে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখল। নিচে একজন মানুষ দাঁড়িয়ে। হাত তুলে হুঁশহাঁশ করছে।

লেডি অ্যালবাট্রস ডানা মেলে দিল আকাশে। তারপর উড়তে থাকল। সূর্য যেদিকে ওঠার কথা সেদিকে উড়ে উড়ে যেতে থাকল।

পরদিন সকালে ডেবিড আবার তাকে ডেকে দিল। সে উঠে সামান্য সময় বসে থাকল, এবং যখন সবাই যে যার কাজে ব্যস্ত সে পাখিটাকে উড়িয়ে দিল! সে বুঝতে পারছে আর দুদিন। ঠিক বন্দরের কাছে গেলে, পাখিটা আবার ডাঙ্গা পেয়ে যাবে। তাকে আর তখন এত

সকালে না উঠলেও চলবে। ডাঙ্গা পেলে পাখিটা আর একটা পুরুষ পাখিও খুঁজে পাবে। তখন আর পাখিটা অসহায় থাকবে না। নিজের মতো কেউ মিলে গেলে, পাখিটা আবার একটা জাহাজের পেছনে উড়তে উড়তে নিজের দ্বীপে ফিরে যেতে পারবে।

এ-ভাবে সে পাখিটাকে এখন সময় পেলেই—কারণ সে দেখেছে যখন পাখিটা দূরে দূরে উড়ে বেড়ায়, অথবা খুব কাছে এসে যায়, সে পাখিটাকে কিছু নরম মাংস, এই যেমন মাংসের হাড় এবং সে কখনও চিফ-কুকের গ্যালি থেকে উচ্ছিষ্ট হাড় মাংস পকেটে নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে কাছে এলেই সে মাংস হাড় ছুঁড়ে দিলে খুব সুন্দরভাবে পাখিটা নেমে এসে ধরে ফেলে। সমুদ্রে পড়ে যাবার আগেই হাড় মাংস তুলে নিয়ে যায় ঠোঁটে। এবং দূরে গিয়ে একটা হাঁসের মত জলে সাঁতার কাটতে থাকে, গলা উঁচু করে হাড় মাংস গিলে ফেললে বোধহয় পাখিটার সজীবতা বাড়ে—তাকে আর মনেই হয় না খুব অসহায়। বরং এ-ভাবে ছোটবাবুর হাতে তার খাবার প্রত্যাশা বেড়ে যায়।

এবং এ-দুদিনেই সে দেখেছে, ডেকে তাকে দেখলেই তার কাছাকাছি উড়তে ভালবাসে পাখিটা সবসময় খাবার থাকে না। তার ডেকে কাজ। উইনচে কাজ থাকার দরুন সে দেখেছে, কখনও তার মাথার ওপর দিয়ে উড়ে গেছে পাখিটা। সে তখন বুঝতে পারে পাখিটা কিছু খেতে চায়। হাতের কাজ ফেলে প্রায় দৌড়ে চলে যায় তখন ছোটবাবু। চিফ-কুকের গ্যালি থেকে যত উচ্ছিষ্ট খাবার, দু'পকেটে, যতটা পারে তুলে নেয়। তারপর সন্তর্পণে আবার চলে যায় স্টারবোর্ড-সাইডে। এদিকটায় কেউ বড় আসে না। ছোটবাবু একটা নিভৃত জায়গায় দাঁড়িয়ে পাখিটাকে খাওয়ায়।

মৈত্র এবং' অমিয়, ইয়াসিন, জব্বার, কখনও সারেঙ-সাব দেখেছে ছোট চুপচাপ দাঁড়িয়ে পাখিটাকে দেখছে। ওরা কেউ বুঝতে পারছিল না, ছোট এভাবে দু'দিন ধরে মাঝে মাঝে এখানে দাঁড়িয়ে থাকে কেন। সারেঙ-সাব বিকেলে বলেছিল, হ্যাঁ রে কি করিস মাস্তুলের নিচে।

সারেঙ-সাবের কাছে সে মিথ্যা কথা বলতে লজ্জা পেল। সে বলল, দেখবেন। বলেই পকেট থেকে এক টুকরো মাংস বের করে জোরে সমুদ্রে ছুঁড়ে দিল। কোথায় ছিল পাখিটা, ঠিক নজর আছে, বাজপাখির মতো শাঁ শাঁ করে উড়ে এল। জলে পড়ার আগে ঠিক ঠোটে তুলে উড়তে উড়তে দূরে চলে গেল।

সারেঙ সাব বললেন, আমাকে দে তো, আমি দ্যাখি একবার।

—একটু দাঁড়ান। এখন দিলে হবে না। দেখছেন না বিবি এখন পরিপাটি করে খাচ্ছে। সাঁতার কাটছে। জলে ডুবে স্নান করছে।

জাহাজের একঘেঁয়েমির ভেতর পাখির এই সমুদ্রে স্নান করা, উড়ে বেড়ানো, পাখায় সমুদ্রের জল নিয়ে ক্রমে এগিয়ে আসা, অথবা এই যে মনোরম হয়ে যাচ্ছে সমুদ্রটা, সমুদ্র আর খালি খালি লাগছে না, সমুদ্রে এভাবে সাঁতার কাটতে কাটতে পাখিটা সত্যি যে এক আশ্চর্য পৃথিবী গড়ে তুলছে—ছোটবাবুর সঙ্গে না দাঁড়ালে টের পাওয়া যায় না। ছোটবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে পাখিটার কাণ্ডকারখানা দেখে সারেঙ মুগ্ধ হয়ে গেলেন। বললেন, এবারে দেব।

—দিন, খাওয়া হয়ে গেছে। খাবারের লোভে দেখুন আবার কি কাছে এসে গেছে! কিন্তু এটা কেন হচ্ছে। সারেঙ দু'বার ছুঁড়ে দিলেন, দু'বারই পাখিটা দূরে সরে গেল। এসে ছোঁ মেরে তুলে নিল না।

—কি রে খাচ্ছে না কেন?

—ভয় পাচ্ছে।

—তুই দে তো আবার

ছোটবাবু জোরে ছুঁড়ে দিল।

পাখিটা ঠিক আসছে। জাহাজটা ক্রমাগত এগিয়ে যাচ্ছে বলে পাখিটা এসে যখন ধরে ফেলে তখন পিছিলের কাছাকাছি চলে যায় পাখিটা। ওরা ঠিক জাহাজের মাঝখানে রয়েছে। খাবার নিয়ে যখন উড়ে চলে যায়, তখন দুজনকেই পেছনে উঁকি দিয়ে দেখতে হয়। এবং খাওয়া হয়ে গেলেই আবার উড়ে এল। সারেঙ-সাব বললেন, দেব এবার!

—দিন।

তিন বারের বার পাখিটা সারেঙ-সাবকে আর ভয় পেল না। ঠিক তুলে নিয়ে গেল।

ছোটবাবু বলল, আপনাকে চিনে ফেলেছে। আপনাকে পাখিটা ভালবেসে ফেলেছে। আপনি দিলেই খাবে। আপনাকে দেখলেই পাখিটা আপনার মাথার ওপরে উড়ে আসবে। তারপর সে ফিসফিস করে বলল, চাচা কাউকে বলবেন না। বললে, মেজ-মিস্ত্রি জানতে পারবে। পাখিটার ওপর খুব রাগ। ভুলিয়ে এনে গুলি করতে পারে।

সারেঙ-সাব বললেন, মুখের দাগ ওর যাচ্ছে না।

ছোটবাবু বলল, উল্কি পরার মতো হয়ে গেছে মুখটা। তারপর বলল, ঐ দেখুন আবার আসছে। সারেঙ-সাবের নামাজ পড়ার সময় হয়ে গেছে। তিনি নামাজ পড়তে চলে যাচ্ছেন। তিনি এই ছেলেটার মায়ায় জড়িয়ে পড়েই কেমন জীবনে গণ্ডগোলে পড়ে গেছেন। আবার একটা পাখি! এখন এ-সব থেকে যত দূরে থাকা যায়। তিনি যেতে যেতে বললেন, কাপ্তানকে একবার বল না। এজেন্ট অফিসকে লিখে তোর বাড়ির ঠিকানাটা আনতে পারে কিনা?

—কি করে পারবে!

—ওরা না পারে এমন কাজ নেই। ইচ্ছে থাকলে ওরা সব পারে।

ছোট, সারেঙ-সাবের পাশে পাশে হেঁটে গেল। বলল, চাচা এটা হয় না। এতবড় মানুষটাকে আমি বলতে পারি!

—কাপ্তান তোকে খুব ভালবাসে ছোট। তুই জানিস তা।

—কি জানি, বুঝছি না।

—বুঝছিস না? বলে হাঁটতে হাঁটতে একবার ছোটবাবুকে পাশ থেকে দেখলেন। ওরা এখন ডেক- ভাণ্ডারির গ্যালিতে উঠে গেছে। সারেঙ-সাবের সঙ্গে কথা বলতে বলতে সে এদিকে চলে এসেছে। একবার সামনের দিকে তাকাল। না কেউ দেখছে না। সে বলল, ঠিকানা পাবে কি করে?

–কেন, আগে তোরা যে জায়গায় ছিলি, পাশাপাশি বাড়ির কেউ খবর দিতে পারে!

–যদি পারত, তবে ঠিকানা ওরা রি-ডাইরেক্ট করতে পারত। পোস্টাফিস থেকে নট ক্লেইমড় হয়ে ফিরে আসত না।

–পোস্টাফিসের দায় পড়েছে!

—আসলে কি জানেন চাচা, বলে সে এবার সিঁড়ি ধরে ধরে নিচে নেমে যাচ্ছে। বাঁ-দিকে সারেঙের ফোকসাল। তিনি এখানে একা থাকেন। সারেং ওকে একটা মোড়া এগিয়ে বসতে দিল।—আসলে কি জানেন, বাবা জ্যাঠামশাই এখানে এসে নিজেদের সম্মান বজায় রাখতে পারলেন না। না খেয়ে বাঁচা যায় বোধহয় বাবা জ্যাঠামশাই ভেবেছিলেন। তবু মান সম্মানটুকু থাকুক। সেটুকু বোধহয় শেষ পর্যন্ত ওঁদের ছিল না। ওঁরা যাবার সময় কাউকে কিছু ঠিকানা রেখে যান নি। ওঁরা অপরিচিতের মতো বাঁচতে চাইতেন। প্রতিবেশী বলতেও তেমন কিছু ছিল না। বন-জঙ্গল সাফ করে মাত্র আবাস তৈরি করেছিলেন।

—তোর এক কাকা আছেন না!

—আছেন! এ-দেশে এসে তিনি ভিন্ন হয়ে গেলেন। বাবা জ্যাঠামশাইর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন নি।

অনেকদিন পর যেন ছোটবাবুর মনে হল, সে ডাঙ্গার মানুষ। সারেঙ-সাব এক এক করে সব মনে করিয়ে দিচ্ছেন। ওর মুখটা আবার বেজার হয়ে গেছে। সে তবু বলল, চাচা আপনি, ডেকসারেঙের মতো কাঠের পুথিদান করে নিতে পারেন না!

সারেঙ-সাব দেখলেন, ওর ছেঁড়া বইটা বাংকে পড়ে আছে। তিনি সময় পেলেই যখন জাহাজে একঘেঁয়েমি মনে হয় ভীষণ, যখন একঘেঁয়েমির যন্ত্রণায় জাহাজিরা ফোকসালে মারামারি পর্যন্ত লাগিয়ে দেয় তখন এই পবিত্র কোরান শরীফ তাঁর একমাত্র শান্তি পারাবার। তিনি বুঝতে পারলেন, ছোট তার দেশ-বাড়ির কথায় কষ্ট পাচ্ছে। সে, তাঁকে অন্য কথায় নিয়ে আসতে চায়। তিনি ইচ্ছে করেই আর ওর বাড়ি সম্পর্কে কোন কথা বললেন না। বাংকের দড়ি থেকে গামছাটা নিলেন। বাংকের নিচ থেকে বদনা বের করলেন। এখন অজু করতে যাবেন। যাবার সময় বললেন, কাঠের পুথিদানে বইটা রেখে পড়তে আমার ইচ্ছে হয়। বার বার ভাবি একটা কিনব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত হয়ে ওঠে না। ভুলে যাই।

ছোট বলল, আমি একটা কিনে দেব আপনাকে।

সারেঙ-সাব বললেন, তুই আমাকে কিনে দিবি কেন? পয়সা বেশি হয়েছে!

ছোটবাবু চোখ তুলে তাকালে তিনি আর বলতে পারলেন না, না ছেলে, তোকে কিনে দিতে হবে না। তোর কোনো জিনিস আমি নেব না। আমাকে তুই এটা দিয়ে বলতে চাস, সব আপনার দিয়ে দিলাম। তোমাকে আমি ছোটবাবু সে সুযোগ দিচ্ছি না। কিন্তু মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। শুধু বললেন, দিস। আমাকে কিছু দিতে যাই তোর ভাল লাগে দিস। তারপর তিনি হাত মুখ ধুয়ে দুটো রুটি, একটু চা খেলেন। অজু করলেন শেষে। মেসরুমে তিনি নামাজ না পড়ে খোলা আকাশের নিচে হ্যাচের ওপর মাদুর বিছিয়ে নামাজ পড়তে বসলেন। মাথায় সাদা টুপি সাদা লুঙ্গি। লক্ষ্ণৌ কাজকরা সাদা পাঞ্জাবি। যেন এক সন্ত মানুষের মতো। সাদা দাড়িতে কি যে সুন্দর দেখাচ্ছে মানুষটাকে। কোনো কালে পৃথিবীতে মানুষটার আশা-আকাঙক্ষা ছিল, তিনি তাঁর স্ত্রীকে জাহাজ থেকে ফিরে গিয়ে দেখতে পাননি, বালিকা স্ত্রীর জন্য সেই তরুণ বয়সে কখনও শোক করেছিলেন, শান্ত সুষমামণ্ডিত মুখ দেখে এখন আর তা একেবারেই মনে হবে না। দেখে মনে হয় পৃথিবীতে তিনি সারা জীবন এ-ভাবেই বেঁচে ছিলেন।

আর পরদিন সকালেই ড্যাং ড্যাং আসছে, বন্দর চলে আসছে। ছোট দ্বীপমালা দূরে দূরে। সকাল হচ্ছে সমুদ্রে। সিউল-ব্যাঙ্ক ক্রমে এগিয়ে যাচ্ছে। পানামা থেকে প্রায় দু হাজার মাইলের যাত্রা-পথে কত ঘটনার সাক্ষী যেন জাহাজটা। সকালের রোদে দ্বীপের গাছপালা কেমন মায়াবী। দ্বীপের সবুজ গাছপালার পাশ কাটিয়ে সিউল-ব্যাঙ্ক ক্রমে এগিয়ে যাচ্ছে। ডেবিড ওয়াচ থেকে ফিরে এসেই দূরবীন নিয়ে বসে গেছে। আর চোখে কি যে হয়, চারপাশের গাছপালার ভেতর দূরে দূরে সব দ্বীপের অধিবাসীরা মনে হয় হেঁটে বেড়াচ্ছে। সে জানেও না, এইসব দ্বীপগুলোতে মানুষ আছে কিনা, কিন্তু সুন্দর গাছপালা, বালিয়াড়ি, রং-বেরঙের ঝিনুক চোখে পড়লে সে বিশ্বাস করতে পারে না, এমন একটা দ্বীপে মানুষের আবাস নেই। মনে হয় গাছপালা, লতাপাতার অথবা প্রবালের প্রাচীর পার হলেই সকালের সূর্য পৃথিবীতে যেমন কিরণ দেয় এখানেও তেমনি কিরণ দিচ্ছে।

এবং এসব ভাবতে ভাল লাগে। সিউল-ব্যাংক যাচ্ছে, দ্বীপ-টিপ সে জানে না, তাহিতিতে সে যাচ্ছে। সেই কবে, খৃষ্টপূর্ব চার হাজার বছর আগে মানুষের বিশ্বাস ভেলায় করে চার হাজার মাইল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে পেরু থেকে যে সভ্যতা এখানে বিস্তার করেছিল তার মতো তাদের এই অভিযান। বিশেষ করে জ্যাকের তো এমনই মনে হয়। যেন সেই প্রাচীনকালে সে তাদের একজন কেউ ছিল। এবং সঙ্গে আর যে যে ছিল মনে হয় এই ছোটবাবু, আর কে, আর বাবা, আর কে? আর-আর বুড়ো সারেঙ। ব্যাস এই চার জন হলেই সে ভেলায় করে, যত প্রাচীনকালই হোক, সেই ব্যাবিলিয়ান সভ্যতার আগে, কিংবা গ্রীক সভ্যতার আর আর যদি ভাবা যায় ফারাওদের আমলে সে আর ছোটবাবু ছিল সেই অভিযানের প্রথম নারী-পুরুষ এবং

এখানে তাদের বংশধরেরাই হাজার হাজার বছর পর ছোটবাবুর ফিরে আসার জন্য প্রতীক্ষা করছে। এ সব ভাবতে ভীষণ ভাল লাগছিল জ্যাকের। মনে মনে সে এভাবে কত রকমের যে আজগুবি স্বপ্ন ছোটবাবুকে নিয়ে ভাবতে ভালবাসে।

আসলে এখন তো আর মনে হয় না, জাহাজটা ছিল সমুদ্রে, গভীর সমুদ্রে, বিষাক্ত পাখিদের আক্রমণের কথাও মনে আসার কথা নয় তাদের। দ্বীপ, গাছপালা এবং মাটি দেখলেই নিমেষে সবাই সমুদ্রের সব দুঃখ ভুলে যায়। এখন ঠিক অমিয় টব বাজাচ্ছে। সবাই সুর ধরে গাইছে। তাদের গানের লহরি যেন সেই নৌকা বাইচের গান, দূর থেকে দূরে—হা-হা-হো, হা-হা-হো ক্রমে শব্দটা সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়ছে।

জাহাজ সিউল-ব্যাংক এখন আর মনে হয় না পুরোনো। মনে হয় আর দশটা হাল আমলের জাহাজের চেয়ে তার নৈপুণ্য বেশি। জাহাজিরা সব দুঃখ ভুলে যাচ্ছে। কাপ্তান এবং চিফ-মেট এখন ব্রীজে। হাওয়া উঠে আসছে। সামনেই সেই মূল ভূখণ্ডের উপকূল। শহর এখনও দেখা যাচ্ছে না, মাইল চার-পাঁচ এগিয়ে সামান্য সাউথ-সাউথ-ওয়েস্টে বাঁক নিতে হবে। তখনই চোখে পড়বে সুন্দর পরিপাটি বন্দরের ছবি, দুটো একটা স্কাই স্ক্র্যাপার। আর সেই বালিয়াড়ির ওপর দিয়ে প্রশস্ত পথ। ড্যাং ড্যাং করে লাল নীল রঙের গাড়ি কেবল এক গ্রহ থেকে অন্য গ্রহে যেন ছুটে যাচ্ছে, ভেতরে সুন্দরী সব রকমারী যুবতীরা পর্বতগাত্রের আড়ালে হারিয়ে যাচ্ছে।

সিউল-ব্যাংক ক্রমশ কক্স উপসাগর পাড়ি দিচ্ছে। জাহাজের মাস্তুলে কার্সিফ্ল্যাগ টাঙিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সামনে পেছনে জ্যাক-ফ্ল্যাগ, এনসাইন-ফ্ল্যাগ পতপত করে উড়ছে। পাইলট উঠে এসেছে জাহাজে, পাইলট জাহাজের ভার নিয়েছে এবং আবার ড্যাং ড্যাং। সমুদ্রে সিউল-ব্যাংক আর নেই, এখন বন্দরের ভেতর জাহাজ ক্রমে ঢুকে গেলে চারপাশে শুধু জাহাজ, মাস্তুল, সেই এক বন্দরের ছবি—চারপাশে সব নানা দেশের জাহাজ, নানা বর্ণের পতাকা, নানা রঙের চিমনি, এবং চিমনির রং দেখে, জাহাজের পতাকা দেখেই বলে দেয়া যায়, কোন দেশের জাহাজ, কোন কোম্পানীর জাহাজ।

টাকা কে কত তুলবে—যেমন একশ সি এফ পির সমান, এক দশমিক ষোল সেণ্ট। পাউণ্ড মূল্যে দাঁড়ায় দশমিক চুয়াল্লিশ পাউণ্ড। ছোটবাবুকে বোধহয় সবচেয়ে বেশি টাকা তুলতে হচ্ছে। সে তুলেছে ত্রিশ পাউণ্ডের মতো। ওতে ওর দুটো বয়লার স্যুট এবং এক প্রস্থ স্যুট হয়ে যাবে। আর অনেকে যে যা টাকা তুলবে, তার জন্য দাঁড়িয়ে আছে। এজেণ্ট-অফিস থেকে লোক এসে গেছে। সঙ্গে চিঠিপত্র। জাহাজিদের চিঠিপত্র কম

জাহাজে আবার বাঁধাছাদার কাজ। সেকেণ্ড-মেট, চিফ-মেট পেছনে সামনে। আবার সেই বাঁধা বুলি—হারিয়া হাফিজ। নিচে ছোট টাগবোটে এ-দেশের মানুষ—তাহিতিয়ান, চুল খাড়া খাড়া, শরীরের তুলনায় মাথাটা বড় মনে হয়, এবং শ্যামলা রং, আর পোশাক ঢিলেঢালা। ওরা হাসিল তুলে নিয়ে যাচ্ছে এবং কিনারায় নিয়ে হাসিল বেঁধে ফেলছে বিটে। মানুষগুলোর সঙ্গে ভারতীয় চেহারার ভারি মিল। যেমন ওরা বন্দরে ঢোকার আগে দেখেছে সব ছোট ছোট নৌকা। একজন দাঁড় ফেলছে। যে দাঁড় ফেলছে সে আছে মাঝখানে, আগে একজন বসে রয়েছে, হাতে ছিপ, পেছনে একজন হাল ধরে বসে আছে। হালে যারা আছে—অধিকাংশ মেয়ে। পোশাক বলতে ঘাসের স্কার্ট পরা, ওদের বুকে সামান্য ব্রেসিয়ার। কেউ লুঙ্গির মতো পরে আছে, খোপকাটা সব রং-বেরঙের চাদর। খালি গা। কেউ সামান্য জাঙ্গিয়া পরেই মাছ ধরছে নিবিষ্ট মনে। জাহাজটা ওদের পাশ কাটিয়ে চলে যাচ্ছে। জাহাজিরা কাজ ফেলে ওপরে উঠে এসেছে। জাহাজ জাহান্নামে যাক, তবু ওরা সমুদ্রে এমন সব সুন্দরী মেয়েদের দেখে হাত না তুলে পারবে না। মেয়েগুলোও জাহাজিদের হেইল করছে। ছোটবাবু ছেলেমানুষের মতো অবাক হয়ে দেখছে।

জাহাজ বন্দরে বেঁধে ফেললেই ছুটি। কাপ্তান ছুটি ঘোষণা করেছেন। কেবল একজন ফায়ারম্যান নিচে থাকবে। কোয়ার্টার-মাস্টার থাকবে গ্যাংওয়েতে পাহারায়। স্টুয়ার্ডকে

থাকতে হবে। রসদ আসবে। অর্ডারমাফিক রসদ ঠিক ঠিক স্টিভেডর দিয়েছে কিনা দেখতে হবে। এদিক ওদিক হলে রিপোর্ট রেখে যেতে হবে। আর থাকছেন কাপ্তান নিজে, চিফ-মেট। আর পিছিলে দুই সারেঙ। আর সবাই যে-যার মতো ছুটি ভোগ করবে।

জ্যাক বলল, বাবা আমি যাব?

—কোথায়?

—ডেবিডের সঙ্গে। ওরা এখন বের হচ্ছে।

কাপ্তান কিনারায় যাবেন না। তাহিতিতে কবে আর কে আসছেন! বনি তো কখনও আর সুযোগ পাবে না। তিনি ডেবিডকে ডেকে পাঠালেন। ডেবিড এলে বললেন, তোমার সঙ্গে জ্যাক যাচ্ছে।

ডেবিডের মুখটা সামান্য তেঁতো হয়ে গেল। কি যে দরকার—সে ভেবেছিল নেমেই লি-বেলভিডিয়ারে ফরাসী খাবার খাবে। ছোটবাবু যদি সঙ্গে যায়, যাবে বলে মনে হচ্ছে না, ওর পুরানো দোস্ত অমিয়, মৈত্র। ওর সঙ্গে যাবে বোধ হয়। সে দেখেছে, দু'বার মৈত্র এসে ঘুরে গেছে। কেউ না গেলেও তার ক্ষতি নেই এবং ওর মনে হল কেউ না গেলেই ভাল হয়। সে একা একা এভিনিউ প্রিন্স হ্যানয় ধরে অথবা ওরা-কিকিতে চাইনিজ খাবার অথবা সেই গোগাঁর মিউজিয়ামে, এবং মিউজিয়াম- কাম-বারে সুন্দরী রমণীদের কথাবার্তা—একটু অন্ধকার হলে, অবশ্য অন্ধকার না হলেও ক্ষতি নেই, দ্বীপের বালিয়াড়িতে ঘুরে বেড়ানো অথবা রোদে পিঠ দিয়ে পড়ে থাকা ভারি মনোরম। বড় গোল ছাতার নিচে দু'জনে বসে থাকবে। নীল রঙের চশমা থাকবে মেয়েটার চোখে, শুধু ব্রেসিয়ার বুকে, এবং হাল্কা সিল্কের জাঙ্গিয়া আর নরম উরু, নাভির কোমল ত্বকের নিচে গভীর উষ্ণতা। সামান্য মদ, সঙ্গে, পিসান- ক্রু, লোবস্টার অথবা মেরিও ফিস মশালায় ভাজা—কি যে সুস্বাদু! জ্যাক সঙ্গে গেলে সব মাটি। কাপ্তান যা একখানা চরিত্র করেছে জ্যাকের! মেয়েমানুষ দেখলেই ঘাবড়ে যায়। ঠিক ঘাবড়ে যায় না। কেমন বিগড়ে যায় জ্যাক।

ছোটবাবু এতসব দেখে লেডি-অ্যালবাট্রসের কথা একেবারে ভুলে গেছে। পাখিটাকে সে শেষ বারের মতো কোথায় দেখেছে মনে করতে পারছে না। ঠোঙার খাবার নিয়ে সে ঘুরছিল তখন। না, কাছে কোথাও পাখিটা নেই। নেই, নেই। বোধ হয় জাহাজ যখন সাউথ-সাউথ-ওয়েস্টে ঢুকে যাচ্ছিল, তখনই সে এটা বুঝতে পেরেছিল। জাহাজে সবার সঙ্গে পাখিটাও যাত্রী ছিল তাদের। পাখিটা নেই বলে চারপাশের সবকিছু বিস্বাদ ঠেকল। ওর বন্দরে নেমে যেতে ইচ্ছে করছিল না।

তবু একবার নামতে হবে। বোট দ্য ফেয়ারে একজন ভাল ডাক্তারের খোঁজ সে কিনারার লোক থেকে সংগ্রহ করেছে। মৈত্রদাকে নিয়ে ডাক্তারের কাছে একবার যেতে হবে। সে ভাবল, ফেরার পথে যা টাকা বাঁচবে তাই দিয়ে বয়লার স্যুট এবং বাঁচলে একপ্রস্থ স্যুট কিনে ফিরে আসবে। দ্বীপের ভেতর গাড়ি ভাড়া করে ঘোরার টাকা আর হাতে থাকবে না।

ছোটবাবু ঠোঙার খাবারগুলো ফেলে দিল না। ছোট ছোট চিড়িয়াপাখি দলে দলে মাস্তুলের মাথায় উড়ছে। জাহাজের চারপাশে তাদের কলরব। এবং ঢং করে কোথাও বড় লোহার পাত ফেলার শব্দ, অর্থাৎ বন্দরে ঢুকলে যেসব অতিকায় শব্দের ভেতর ডুবে যেতে হয়—পাখিদের কলরব তা থেকে আলাদা করা যায় না। সে খাবারগুলো পাখিগুলোকে ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিল। তারপর ফিরে আসার সময় দেখছে, ডেবিড কেমন অন্যমনস্ক ভাবে হেঁটে যাচ্ছে এলি-ওয়েতে। ছোটবাবুকে দেখেও সে কিছু বলছে না।

ছোটবাবু ডাকল, এই ডেবিড!

ছোটবাবুর এমন ডাকে মনেই হয় না ডেবিড তার চেয়ে বয়সে অনেক বড়। একেবারে অমিয় মৈত্রের মতো কাছের মানুষ হয়ে গেছে। ডেবিড বলে না ডাকলেই বরং সেকেণ্ড-মেট রাগ করে। সে বলল, আমাকে কিছু বলছ ছোটবাবু?

—মুখটা এত গোমড়া কেন?

—না, কিছু না।

—এমন তো কখনও তোমার মুখে দেখি না।

—আর বলবে না, প্রায় ফিসফিস গলায় বলল, অর্ডার হয়েছে জ্যাককে নিয়ে শহরটা দেখতে হবে, দ্বীপের ভেতরটা যতদূর সম্ভব দেখাতে হবে। গাড়ি ভাড়া করতে বলছে। টাকা সব কাপ্তানের। কিন্তু, বলেই সে থেমে গেল। ছোটবাবু জানে বাকিটা ঠিক বলবে। সে তাকিয়ে থাকল।

—আচ্ছা বলত, কতদিন পর বন্দর পেলাম, এখন এসব ভাল লাগে! এগুলো কাপ্তানের টরচার। এমন একজন বালককে নিয়ে আমি কোথায় যাই! বারে যেতে পারব না, মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে পারব না। কাপ্তান কি ভাবে আমরা মানুষ না?

ছোটবাবু কি বলবে! সে তো বলতে পারে না কাপ্তান এটা ঠিক করেন নি। সে বলতে পারত, আমি নিয়ে যেতে পারতাম, জ্যাক আমার কাছে দু'বার এসেছিল কিন্তু আমার কাজ অনেক। মৈত্রদাকে ডাক্তার দেখাতে হবে। কতক্ষণ লাগবে, তাতো জানি না ডেবিড, এবারের মতো তুমি নিয়ে যাও। কোথায় যাচ্ছে সে জ্যাককে বলেছে। কোন রাস্তায় কত নম্বর সব বলেছে। জ্যাক আর পীড়াপীড়ি করেনি। তাছাড়া সে জ্যাকের সঙ্গে জাহাজ থেকে নামতে পারে না। আর্চি দেখলে ক্ষেপে যাবে।

ডাক্তার দেখিয়ে বের হবার মুখে জ্যাক আর ডেবিড হাজির। এদিকটায় সব দোকানপাট চাইনিজদের। কাঠের বাড়িগুলো বেশ সুন্দর দেখতে। ছোট একটা উপত্যকার মতো জায়গাটা। বাড়িগুলোর লাগোয়া সব ফুলের বাগান। সমানে বড় খেলার মাঠ। এবং বেলা প্রায় তিনটে, বসন্ত কাল অথবা গরমের সময় বলে মানুষজনেরা পাতলা কটনের জামা নানা লতাপাতা আঁকা জামা গায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন জ্যাক তাকে বলল, কার অসুখ ছোটবাবু?

ছোটবাবু বলল, অসুখ কারো তেমন হয়নি। মৈত্রদাকে খুব মনমরা দেখাচ্ছে। মৈত্রদা এভাবে থাকলে জ্যাক এবং ডেবিড দুজনেই টের পাবে কিছু হয়েছে বড়-টিণ্ডালের। সে মৈত্রকে বলল, চল একটা শো দেখি কোথাও।

অমিয় বলল, তোরা যা। আমি একটু ঘুরে পরে যাচ্ছি।

ডেবিড বলল, এখন আবার শো দেখার কি হল, চল না বরং লা পয়েন্ট ভেনাসে প্রথম ইউরোপিয়ান সেলারদের মোমের সব মূর্তি রয়েছে, দেখে আসি।

ছোটবাবুর কোথাও যেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। মৈত্রদার অসুখটা ভারি খারাপ। ইনজেকসান পরপর দু'বার দিয়েছে। খুব ভিরুলেন্ট টাইপের অসুখ, এখানে মৈত্রদার থেকে যাওয়া দরকার। ক্রমান্বয় ইনজেকসান ওষুধপত্র পড়লে হয়তো সেরে যেত। কিন্তু উপায় নেই। কিছু ট্যাবলেট সঙ্গে নিয়েছে। নিউ প্লাইমাউথে গেলে বেশ অনেক দিন সময় পাওয়া যাবে। তখন থরো ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা করা যাবে মনে হচ্ছে। এতদিন কি যে হবে! সে এসব ভাবতে ভাবতে দ্বীপের এই ছোট্ট শহরটির মানুষজন, রাস্তাঘাট, উঁচু-নিচু টিলার গায়ে ছবির মতো ছিমছাম শহরটিকে একেবারে উপেক্ষা করল।

তখন জ্যাক যেন মরিয়া হয়ে বলল, এই যে অমিয়। আপনি বড়-টিণ্ডালকে নিয়ে যান। ছোটবাবু আমাদের সঙ্গে যাবে।

এসব কথা বললে অমিয়র সাহস নেই না করে। সে মৈত্রকে একটা ট্যাকসিতে তুলে নিয়ে চলে গেল।

ডেবিড বলল, ছোটবাবু আমি এখানে আছি। সন্ধ্যার পর এখানে তোমরা আমার খোঁজ করবে।

ছোটবাবু এবারে জ্যাককে ভাল করে দেখল। জ্যাক পরেছে হাফহাতা ঢোলা সিল্কের সার্ট।

দামী প্যান্ট ক্রিমসন কালারের। মোটা সাদা বেল্ট। একটা সবুজ টুপি মাথায়। হাতে লম্বা তরবারির মতো লাঠি। কোমরে চাবির রিং। হিপপকেটে লেদারের পার্স। চুলের নীলাভ রঙে উজ্জ্বল রোদ এসে একেবারে জ্যাককে কাউ-বয় বানিয়ে দিয়েছে।

ছোটবাবু বলল, জ্যাক তাহলে কোথায় যাবে?

—তাহারা হোটেলস্ হিলে যাব। ট্যাকসি ডাকলেই ঠিক আমাদের নিয়ে যাবে।

জাহাজ থেকে নামার আগে এ-দেশের দুটো একটা কথা ওরা জেনে নিয়েছে। যেমন মৌরুরা অর্থাৎ অনেক ধন্যবাদ। ছোটবাবু ট্যাকসিতে উঠে গেলে বলল, মৌরুরা।

ছোটবাবু বুঝতে পারল জ্যাককে ওর সঙ্গে ভিড়িয়ে দিয়ে ডেবিড রক্ষা পেয়েছে।

ছোটবাবু ট্যাকসিয়ালাকে বলল, টাহারা।

জ্যাক বলল, নো। এখন আমরা যাব মিউনিসিপাল মার্কেটে।

মিউনিসিপাল মার্কেট দুটো রাস্তার ক্রশিঙে। নাম জানে না ওরা রাস্তার। জ্যাক ছোটবাবুর জন্য কিছু কিনবে বলে লা-কাভেতে ঢুকে গেল। ওরা ফরাসী অথবা তাহিতিয়ান ভাষা জানে। ইংরেজি ওরা কিছু কিছু বুঝতে পারে। সুতরাং জ্যাক স্যুটের রং পছন্দ করতে গিয়ে সেলস-গার্লদের বিরক্ত করে মারছে। জ্যাক লক্ষ্য করছে সেলস্-গার্লগুলো হাঁ করে দেখছে ছোটবাবুকে। সে বুঝতে পারল বেশি দেরি করলে, ছোটবাবুকে ওরা কিডন্যাপ করতে পারে। নেভি ব্লু রঙের ভারি স্নিগ্ধ একপ্রস্থ স্যুট পছন্দ করে বলল, ছোটবাবু তুমি পরে এস। পরে এলে গলায় ওর পছন্দ মতো টাই কিনে পরিয়ে দিল। এবং এটা সে বুঝতে পারছে, এখানে বেশি দেরি করলে ছোটবাবুকে ওরা গিলে খেয়ে ফেলবে। ছোটবাবুর মোমের মতো শরীরে কেউ কেউ ছাতির মাপ নেবার সময় বড় বেশি ঝুঁকে পড়েছিল। আর ছোটবাবুও কেমন, ওদের দিকে তাকিয়ে বেশ হেসে মজে যাচ্ছে। সে যে এটা পছন্দ করছে না ছোটবাবু বুঝতে পারছে না। এত আগলে সে তাকে বেড়াবে কি করে? প্রায় টানতে টানতে ছোটবাবুকে বের করে নিয়ে গেল। যেন ছোটবাবু আর এখান থেকে নড়বে না—ওর রকমসকম দেখে তাই মনে হচ্ছিল।

ট্যাকসিতে জ্যাক ছোটবাবুর সঙ্গে কথা বলল না। নিজের খুশিমতো নামছে উঠছে। ছোটবাবুকে বসিয়ে রেখেছে ট্যাকসির ভেতর। সে ফরাসী পারফিউম কিনে এনেছে। ছোটর হাতে দিয়ে আবার লাফিয়ে লাফিয়ে রাস্তা পার হয়ে যাচ্ছে। ছোটবাবু এমন একটা গাড়ি পার্ক করার জায়গায় বসে বেশ নিরিবিলি মানুষজন দেখছিল। এখন চারটে বেজে গেছে। ওদের অফিসকাছারি ছুটি। গাড়িগুলো সব হর্ণ দিতে দিতে বের হয়ে যাচ্ছে। ফরাসী রাজকর্মচারীদের দেখলেই চেনা যায়। ওদের পোশাক ভীষণ বর্ণাঢ্য। তাহিতিয়ান সুন্দরীরা ঘাসের চটি, ঘাসের স্কার্ট পরে কি সুন্দর হেঁটে-হেঁটে যাচ্ছে। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল লাফিয়ে নেমে যায়। এবং এরা কোথায় যে থাকে!

ছোটবাবু দেখে অবাক, দুটো বেদিং স্যুট কিনে এনেছে জ্যাক। একটা মেয়েদের একটা ছেলেদের। জ্যাকের তবে দেশে ইতিমধ্যেই প্রেমিকা বড় হয়ে যাচ্ছে। সে যখন ফিরে যাবে তখন হয়তো ওরা দু'জনেই বেশ বড় হয়ে যাবে। তারপরই ফের জ্যাক ফিরে এল। দুটো বর্শা। সমুদ্রের নিচে ডুবে ডুবে মাছ ধরার জন্য এমন বর্শার দরকার। দু'জোড়া ফিন, দু'জোড়া অকসিজেন সিলিণ্ডার। এ-সব কিনে টাকা নষ্ট করার কি যে দরকার সে বুঝছে না। কিন্তু জ্যাক এমন মুখ গোমড়া করে রেখেছে যে সে একটা কথা বলতে সাহস পাচ্ছিল না। জ্যাক একটা ঝিনুকের মালা পর্যন্ত কিনে ফেলল। আর শেষে যা কিনা দেখে অবাক না হয়ে পারল না ছোটবাবু, সারা মিউনিসিপাল মার্কেট চষে সে কিনে ফেলল পাখির পালকে তৈরি এ-দেশের মেয়েদের ট্রাইবাল পোশাক। সে বলল, জ্যাক তোমার কি মাথা খারাপ!

—হ্যাঁ আমার মাথা খারাপ। তুমি আমার সঙ্গে একটা কথা বলবে না বলছি।

ছোটবাবু বলল, ঠিক আছে। সেও গুম্ মেরে বসে থাকল। এখন ট্যাকসি ড্রাইভার যাচ্ছে

তাহারা হোটেলস্ হিলে। সব শহরটা ঘুরিয়ে এবং এদিক ওদিক দেখিয়ে সন্ধ্যার আগে সে তাদের সেই তাহারাতে নিয়ে যাবে। জ্যাক বলেছে, ওরা পাহাড়ের ওপরে দাঁড়িয়ে সমুদ্রে সূর্যাস্ত দেখবে।

যেতে যেতে ইংরেজিতে সব বলে যাচ্ছে ট্যাকসিয়ালা।—আসলে আমাদের এ-দ্বীপটার দুটো ভাগ। বরং দুটো পাহাড় বলা যেতে পারে। সবুজ উপত্যকা নামতে নামতে সরু একটা জমিতে দুটো দ্বীপ ভাইবোনের মতো মিশেছে। বড় দ্বীপটার নাম তাহিতি-নু, ছোটটার নাম তাহিতি-ইতি। এমন সুন্দর দ্বীপ স্যার আর কোথাও দেখতে পাবেন না। দু'দিন থেকে যান, সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব। প্রায় বিজ্ঞাপনের ভাষায় ড্রাইভার কথা বলে যাচ্ছে। একটু ঘুরে গেলে দেখতে পেতেন আমাদের শেষ সম্রাট পামারা ফিফথ-এর স্মৃতিসৌধ। তিনি মদ খেতে ভীষণ ভালবাসতেন বলে সমাধির মাথায় রয়েছে এক অতিকায় গোল গম্বুজ, দেখতে প্রায় একটা মদের পিপের মতো। তার আর কিছুর সঙ্গে জীবনে প্রেম ছিল না স্যার। তার লাইফ-লঙ লাভ অ্যাফেয়ার উইথ দা ড্রিংকসকে আমরা ভুলিনি। সে বলল, দেয়ার আর অলসো এ নাম্বার অফ মিউজিয়াম—পিপিতি মিউজিয়াম, গঁগা মিউজিয়াম এবং লা পয়েন্ট ভেনাসে সতেরো'শ ঊনসত্তরে ক্যাপ্টেন কুক, ফার্স্ট ড্রপড্ এনকোর ইন দিজ আয়ল্যাণ্ড। অথবা যেতে পারেন বোটানিক্যাল গার্ডেনে—এ্যাণ্ড স্যার, হোয়েন ইউ আর টায়ার্ড অফ লুকিং এট দা গার্ডেনস, ইউ ক্যান টেক এ টু-আওয়ার গ্লাস বটড্ বোট টুর অফ দা লেগুন অ্যাণ্ড দা গার্ডেনস অফ দা সি।

ছোটবাবুর ইচ্ছে হল বলতে, এবারে থামো বাপো। অনেক হয়েছে। গাড়িটা শাঁ করে তখন মোড় ঘুরে ওপরে উঠে যেতে থাকল। দু'পাশে বিচিত্র সব গাছ, যেন দ্বীপবাসীরা সারা পৃথিবী খুঁজে খুঁজে সব দামী গাছপালা পাহাড়টার চারপাশে লাগিয়ে দিয়েছে। এবং কত সব গাড়ি গাছের ছায়ায়, যেমন বড় বড় ইউকন গাছের ছায়ায় গাড়িগুলো ঘুরে ঘুরে ওপরে উঠে যাচ্ছে। জ্যাক একটা কথা বলছে না। ছোটবাবুকে দেখলে মেয়েগুলো কি যে হ্যাংলার মতো চলে আসে। ছোটবাবু জানে না কেন, এটা ঠিকনা। জাহাজে বনি বড় হচ্ছে। ছোটবাবু কিছুতেই টের পাচ্ছে না। এসব ভেবে জ্যাক আরও গম্ভীর হয়ে গেছে। অধীর হয়ে গেছে। অধীর হয়ে উঠছে।

বোধহয় সেই পাহাড়ের মাথায় সূর্যাস্ত দেখতে দেখতে বনি একটা কেলেঙ্কারি করে বসত। কি সুন্দর দেখাচ্ছে সমুদ্রটাকে। একেবারে লাল এবং সবুজ দ্বীপমালা দূরে, আর নীলাভ অন্ধকার দ্বীপের আকাশে, যেন এক আশ্চর্য বর্ণমালা সমুদ্র, আকাশ এবং দ্বীপমালা মিলে গড়ে তুলছে। আর তখন যুবক যুবতীরা হেঁটে হেঁটে গাছের ছায়ায় অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। নিচে নেমে যাচ্ছে কেউ, ওপরে উঠে আসছে কেউ এবং পৃথিবী যখন বর্ণমালায় সেজে রয়েছে তখন ওরা ঠিক থাকে কি করে! ঘাসের ওপর ওরা শুয়ে পড়েছে। গাছের ছায়ায় ওরা চুমো খাচ্ছে, বনি দেখতে দেখতে অধীর হয়ে যাচ্ছে। এবং একসময় পাশে বসে ঘাস ছিঁড়তে ছিঁড়তে বলছে, ছোটবাবু এস আমরা নেমে যাই। কেউ টের পাবে না।

ছোটবাবু বলল, মেয়েরা তোমাকে মারবে জ্যাক। যাও না, গিয়ে একবার বলে দ্যাখো না। কি বলে দ্যাখো। তারপরই ছোটবাবু কেমন ক্ষেপে যাবার মতো বলে যেতে থাকল, জ্যাক, আমি কিছু জানি না। তোমার যা খুশী কর। আমি এখন জাহাজে ফিরব। তোমার মাঝে মাঝে কি যে হয়! তারপরই যেন বলতে ইচ্ছে হয়েছিল, জাহাজে মেয়ে সেজে বিপদে ফেলে দিয়েছিলে, আবার এখানে কিছু একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড করে ফেললে কাপ্তানের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না জ্যাক! তোমার এ-বয়সে এত সাহস ভাল না।

জ্যাকের কখন যে কি মর্জি—সে বুঝতে পারে না। জ্যাককে জোর করে তুলে নিয়ে না গেলে কিছুতেই যাবে না। জ্যাক এখন ঘাসের ওপর পাশ ফিরে শুয়ে আছে। ঘাসের ভেতর দু'হাতে মুখ ঢেকে রেখেছে। এবং জ্যাকের শরীরের গঠন মেয়েদের মতো। সে পাশে শুয়ে ওকে ডাকল, এই কি হচ্ছে!

—কিছু না। বলে ধড়ফড় করে জ্যাক উঠে গেল। এবং গাড়ির দিকে ছুটে গেল। সেও জ্যাকের পেছনে পেছনে ছুটতে আরম্ভ করল। বালিকার মতো মুখ, হাতে পায়ে লম্বা জ্যাক—জাহাজে থেকে থেকে ওর মতো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। জাহাজে থাকলে বোধহয় এটা হয়। সবাইকে নষ্ট হয়ে যেতে হয়। গাড়িতে বসে জ্যাকের বলতে ইচ্ছে হল, আমার কিছু ভাল লাগছে না ছোটবাবু। জাহাজে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি আমাকে কোথাও নিয়ে চল।

॥ আঠাশ ॥

সারা রাস্তায় জ্যাক আর একটা কথাও বলল না।

ছোটবাবু ক্যু দ্য কমার্সে লি জেসমিনে ঢুকে গেল। ডেবিডের এখানে থাকার কথা। একটা টেবিলে মেয়েরা ছেলেরা মদ খাচ্ছে। খাবার খাচ্ছে। কাগজের ফুল মাথার ওপর, রঙবেরঙের বেলুন, ডায়াসে একটা মেয়ে মাইকের সামনে হাত পা তুলে নাচছে। গান গাইছে। পোশাক বলতে সামান্য হাল্কা পোশাক এবং হাত তুললে, পা তুললে প্রায় মেয়েটার গাউনের ভেতর থেকে সব দেখা যাচ্ছে। সে এসব দেখলে ভেতরে ভেতরে মজা পায়, এবং ওপরে ওপরে কেমন একটা পাপবোধ কাজ করতে থাকলে সে ভালভাবে তাকাতে পারে না। যেন সে এসবের কিছুই দেখছে না। কেবল ডেবিডকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কোনো টেবিলে ডেবিড নেই। একটা টেবিলে মেয়েরা ছেলেরা গোল হয়ে বসে আছে। ওরা জাহাজি হয়তো। ওদের হাতে রঙবেরঙের তাস, আসলে ওগুলো তাস নয়, মেয়েদের ছবি। ছবির মেয়েরা এখানে এসে জড় হয়েছে। দু-একজন, মেয়েদের বগলদাবা করে বের হয়ে যাচ্ছে। সেই গর্বিনী তিমি শিকার করে ফিরে আসার মতো নাবিকের মুখে হিংস্রতা ফুটে উঠছে। ছোটবাবু বুঝতে পারল ডেবিড কাউকে বগলদাবা করে আগেই বের হয়ে গেছে তবে।

ছোটবাবু গাড়ির দরজা খুলে ঢুকে গেল ভেতরে। বলল, নেই।

জ্যাক হাঁ বা হুঁ কিছু বলছে না।

ছোটবাবু অগত্যা ড্রাইভারকে বলল, পোর্ট-এরিয়াতে চলুন।

ওরা পোর্ট-এরিয়াতে নেমে গেল। এখানে দু'পাশে ফাঁকা জমিন, পাহাড়। সি-ম্যান মিশনের পাশ দিয়ে ওরা জেটিতে নেমে গেল। সেই সব বড় বড় ক্রেনের ছায়া। দুটো একটা কুকুরের ডাক শোনা যাচ্ছে। জাহাজে কোথাও ব্যাণ্ড বাজছে। কোনো জাহাজে কাপ্তানের জন্মদিন হয়তো পালন করা হচ্ছে, অথবা দেশের কোনো উৎসবের ব্যাপার অথবা জাতীয় সঙ্গীত গাইছে কেউ।

ছোটবাবু গাড়ি থেকে গুনে গুনে সব নামাল। জ্যাক এবং সে একগাদা লট-বহর নিয়ে অস্পষ্ট অন্ধকারে ঠিক দুটো মাকড়সার মত সিঁড়ি ধরে জাহাজে উঠে যাচ্ছে। সারা রাস্তায় জ্যাক কোনো কথা বলল না। কথা না বললেই ভয়। জ্যাক আবার কি করে বসবে! সে জ্যাকের কেবিনে সব পৌঁছে দিল। এমন কি জ্যাক যে ওর জন্য দামী স্যুট কিনেছে তাও।

ছোটবাবু নিজের কেবিনে নেমে এল। জ্যাক একবার বলল না এটা তোমার, এটা নিয়ে যাও। বোধহয় এত রেগেছে জ্যাক, যে সে আর ওটা ওকে দেবেই না। দু-চার মাস গেলে জ্যাক আরও লম্বা হয়ে যাবে, তখন অনায়াসে সে নিজেই পরতে পারবে। ছোটবাবু এ-নিয়ে আর কিছু ভাবল না।

তখন আর্চি দরজা ফাঁক করে চেঁচাচ্ছে – বয়!

বয় এলে বলল, স্টুয়ার্ডকো মাংতা।

স্টুয়ার্ড এলে বলল, ওয়ান বটল্ মোর।

স্টুয়ার্ডের মুখ ভীষণ সাদা। সে এখন দেবে কোত্থেকে। সব তো সিল করা। কাস্টম দেখেশুনে সব সিল মেরে গেছে। তবু সে বুঝতে পারল, যে ভাবেই হোক ওকে দিতে হবে।

সে বলল, সাব বিয়ার মাংতা।

—আঃ ড্যাম ইয়োর বিয়ার!

এক কেস বিয়ার সে আলাদা রেখেছে। কিন্তু মুখের যা অবস্থা। মেজ-মিস্ত্রিকে যেন মদ না দিলে এক্ষুনি ওর পাছায় লাথি বসিয়ে দেবে। এবং মুখের যা গঠন! আর এইসব দাগ, এই মলমূত্রের দাগ আর ওর দাম্ভিকতা সব মিলিয়ে স্টুয়ার্ডকে ভাবনায় ফেলে দিল। সে পার্ক-

সার্কাসের মানুষ। তিন পুরুষ পার্কসার্কাসে। উর্দুভাষী মানুষ। বাঙালীদের সঙ্গে ভালো বাংলা বলতে পারে না, সাহেবদের সঙ্গে ভালো ইংরেজী বলতে পারে না, পারে না বলেই সাহেব ধরে আনতে বললে বেঁধে নিয়ে আসে। বাইরে কোথাও যদি পাওয়া যায়। পোর্ট-এরিয়াতে পাওয়া মুশকিল। সে আর কি করে! সাহেবকে খুশি না করতে পারলে রাতে সে ঘুম যেতে পারবে না।

সে তার অসুস্থ শরীরে ছোটবাবুর কেবিনের পাশ দিয়ে ছুটে যাচ্ছিল। অসুস্থ এই জন্যে, বোধহয় সামান্য হাঁপানি আছে। এবং একটা টান রয়েছে গলার কাছে। কি করে ছাড়পত্র পায় জাহাজে—এটা জানা থাকলে বোধহয় এখন এমন ছোটাছুটি করতে হত না স্টুয়ার্ডকে। যেমন জাহাজ তেমনি তার সব মানুষজন। সেকেণ্ড-কুক যদি না ঘুমোয়। সে খৃষ্টান মানুষ, বাল-বাচ্চা আছে। সস্তায় মদ দু-এক বোতল সে নিজের ঘরে রেখে দেয় এবং সময়ে সে অফিসারদের কাছে বেশি দামে বিক্রি করে থাকে। মিড- সিতে এটা প্রায়ই হয়, এবং এটা সেকেণ্ড-কুকের ভালো একটা ব্যবসা। সে সেকেণ্ড-কুকের ঘরে এসে বলল, সেকেণ্ড-এনজিনিয়ার ঝুটুমুট ঝামেলা কিয়া হায়। তোমরা পাশ একঠো পাঁইট হোগা?

স্টুয়ার্ডকে মান্য করতে হয়। সে সেকেণ্ড-কুক জাহাজের। স্টুয়ার্ডের মর্জি হলে অন্য সফরে ওকে চিফ-কুক বানিয়ে নিতে পারে। সে বলল, হায় লিজিয়ে। এবং প্রায় কাছা খিঁচে ছুটে যাবার মতো স্টুয়ার্ড যাচ্ছে। এবং মনে মনে আর্চির ওপর ভীষণ ক্ষেপে যাচ্ছে। বন্দরে এলে কেন যে এভাবে কেবিনে পড়ে থাকা, বাহার মে যেতনা জরুরৎ পিঁও—এতনা ঝামেলা জাহাজ মে কিঁও। সে তবু বোতলটা দিয়ে একেবারে কৃতার্থ মুখে দাঁড়িয়ে থাকল—যেন সে এতবড় একটা কাজ মেজ-মিস্ত্রির জন্য করতে পেরে খুব খুশী।

আর্চি এতসব ভাবে না, এত দেরি কেন হচ্ছে! সে যখন দেখল, স্টুয়ার্ড এনেছে তখন ওর প্রায় মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে বোতলটা তুলে নিল। স্টুয়ার্ডকে একটু হাসতে পর্যন্ত সময় দিল না।

এবং আর্চি চুপচাপ বসে আবার খাচ্ছে। সে আয়নার সামনে বসে ছিল। সে একবার দুপুরে বের হয়েছিল। ডাক্তার দেখে বলেছে—সময় নেবে। কত সময়? ডাক্তার তা বলতে পারেনি। এই মুখ নিয়ে সে বন্দরে যেন আর কখনও নামতে পারছে না। সব দামী দামী মলম এবং ওষুধ এনেছে। কিন্তু কিসে কি হবে সে বুঝতে পারছে না। এমন একটা বন্দরে তাহিতি মেয়েরা—আহা কি সুস্বাদু খাবারের মতো, তারপর কেন যে মনে হয়ে যায়—নো মি বয়। তারপর কেন যে মনে হয়ে যায়—ইউ নটি গার্ল, তারপর কেন যে মনে হয়ে যায় নীল চোখ, নীলাভ চুল, এবং ফুল ফুটছে। ফুল ফুটছে মনে হলেই সে কেমন আর বসে থাকতে পারে না। জাহাজে ক্রমশঃ ফুলটা তার পাপড়ি মেলে দিচ্ছে। পাপড়িতে সূর্যের আলো এসে পড়বে, সমুদ্রের বাতাস লাগবে এবং মধ্যযামিনীতে পাপড়িতে ফোঁটা ফোঁটা শিশিরবিন্দু পড়লে আহা শিশিরবিন্দু, সে উঠে হাল্কা তামাটে রঙের পানীয় মুখের কাছে এনে প্রায় সবটাই ঢেলে দিল গলায়- ঢোক গিলে বলল, শিশিরবিন্দু। ফোঁটা ফোঁটা শিশির বিন্দু। বেশ মনোরম, কচি ভেড়ার মাংসের মতো। শরীরে সুবাস থাকলে দু-হাত-পা ছড়িয়ে তারপর অবিরাম গতিতে সন্তর্পণে মজে যাওয়া। মজে যাওয়া কথাটা বলতে গিয়ে একটা হিক্কা তুলল। মজে যাওয়া, টু দাই হার্টইন দাই .....। এলোমেলো কথাবার্তা। সে পুরো কথা বলতে পারছে না। তবু বলতে হয় বলা। ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা। এবং জড়িয়ে আসছে কথা। সে আয়নার সামনে দু-আঙুলে নিজের চোখ ফাঁক করে দেখছে। বলছে, ফিল লোনলি। মাচ মাচ! আবার হিক্কা। ইউ নটি গার্ল বি হ্যাপি অ্যান্ড ড্রিঙ্ক। আই ড্রিঙ্ক মাচ, ভেরি মাচ্ সে এই বলে ঘুরে যেতে থাকল। এবং সে বুঝতে পারছে না, ওর পা হাঁটু মুড়ে আসছে কেন। আই লাভ, আই লাভ ইউ নটি গার্ল। অঃ ইউ লাভলি বয়। বয়। বয়। সে কিছুটা বাংকে, কিছুটা নিচের কার্পেটে, কিছুটা কদর্য মুখ ঢেকে রাখার মতো বিছানায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে থাকল। দরজা লক করা। অনেক রাতে হুঁশ হলে টের পাবে—সে যা-তা কি সব করেছে কেবিনে।

তখন মনে হবে, সে মেজ-মিস্ত্রি আর্চি। তার পজিসান প্রায় কাপ্তানের পরে। বড়-মিস্ত্রি

চলে গিয়ে তাকে এ সুবিধা করে দিয়ে গেছে। সে নিজের মাতলামি দেখে সামান্য ঘাবড়ে যাবে।

ছোটবাবু তখন মৈত্রদাকে খুঁজতে এসে দেখল সে কেবিনে নেই। অমিয়, মৈত্র জাহাজে এখনও ফেরেনি। তাকে দেখলেই পিছিলে সবাই জড় হতে থাকে। কথা বলার জন্য সবাই তাকে ঘিরে নানারকমের প্রশ্ন করে যায়। অসময়ে ছোটবাবু পিছিলে এসেছে—কি ব্যাপার। তখন ছোটবাবু, মৈত্র এবং অমিয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানল সেই যে গেছে ফেরেনি। ডেবিডের কেবিনে এসে দেখল সেও নেই। দু'বার ডেকে সাড়া পেল না। পোর্ট-হোল দিয়ে উঁকি মারল—না সেও ফেরেনি। এতরাতে না ফেরায় ছোটবাবুকে বেশ উদ্বিগ্ন দেখাল। ওরা শহরে এত রাতে কি করছে!

সে গ্যাঙ-ওয়ে ধরে নেমে এল। পোর্ট-এরিয়া একেবারে নিরিবিলি। শুধু জাহাজগুলো দাঁড়িয়ে আছে। সে একা একা হেঁটে গেল। অস্পষ্ট আলোতে ক্রেনের নিচে কাউকে যেতে দেখলেই কাছে এগিয়ে যাচ্ছে। অন্য জাহাজের নাবিক। বেশ মাতাল হয়ে ফিরছে। কারো গলায় লারে লারে গান। কি ভাষা, কোন দেশের মানুষ, বোঝার উপায় থাকে না। কেবল দেখলে মনে হয়, জাহাজে এসে সবাই বড় মনোটনিতে ভুগছে। মাতাল হয়ে সবাই সব ব্যর্থতা ভুলে এখন জাহাজে উঠে যাচ্ছে। সবার ব্যর্থতা সেই ডেবিডের মতো। কোনো গ্রহান্তরে স্ত্রী-পুত্র আত্মীয়-স্বজন ফেলে এসে কোনো মেয়ের সান্নিধ্যে সব ভুলে থাকতে চায়। এমন মনে হলে সবার জন্য ওর মায়া হয়। মৈত্রদাকে দুটো কড়া কথা বলবে, মনে থাকে না। এমন শরীর নিয়ে কি দরকার ছিল এ-সবের। এবং তখনই মনে হল, দুজন মাতাল মানুষ গলা জড়াজড়ি করে ফিরছে। সে বুঝতে পারল অমিয় এবং মৈত্র। সে ওদের কাছে গেল না। কাছে গেলে ধরা পড়ে যাবে এবং অস্বস্তিতে পড়ে যাবে ওরা। পরে এল ডেবিড। অনেক দূর থেকে ওর মাতাল গলায় গান সে শুনতে পেল। ভীষণ চেঁচাচ্ছে। আর এভাবেই এইসব নাবিকেরা, বন্দরে রাত যাপন করে থাকে। কাপ্তান হয়তো জেগে বসে থাকেন, লক্ষ্য রাখেন কে কে ফিরল। কেউ মাতাল অবস্থায় সিঁড়ি ধরে উঠতে না পারলে তাকে তুলে আনা হয়। চ্যাংদোলা করে সবাই তাকে তুলে এনে বাংকে ফেলে রাখে। ছোটবাবু দেখল, ডেবিড সিঁড়ির কাছে এসে ওপরে উঠতে ইতস্তত করছে। সিঁড়ি ধরে সে উঠতে পারছে না। এবং সিঁড়ি ধরে উঠতে না পারলে যা হয়, নিচে সিঁড়ির গোড়ায় চুপচাপ বসে থাকে। ডেবিডও বেশ জায়গা সাফ করে বসে পড়বে বুঝি। তখন ছোটবাবু ওর হাত কাঁধে তুলে নিয়ে বলল, এস।

–কে ও?

—এস। চিৎকার করবে না। ষাঁড়ের মতো এতক্ষণ চেঁচাচ্ছিলে কেন!

—চিৎকার করছি। ষাঁড়ের মতো! আমি! কখখনও না।

—বেশ, করছ না। এখন উঠে এস।

—কি উঁচু! আমি একটা পাখি হয়ে যেতে পারি। দেখবে!

—না দেখাতে হবে না। দেখাতে গেলে সে সত্যি পাখির মতো উড়তে চাইবে। অর্থাৎ দু-হাত মেলে ডাইভ দেবে, ডাইভ দিলে জাহাজ আর জেটির ফাঁকে পড়ে যাবে। আর জীবনে উঠতে হবে না।

এনজিন সারেঙ তখন ফোকসালে বসে তাঁর পবিত্র গ্রন্থের পাতা উল্টে যাচ্ছেন। এখন তাঁর সবই প্রায় মুখস্থ। তিনি চোখ বুজে সব বলে যেতে পারেন। উচ্চারণ এবং শব্দের ভেতর এক অলৌকিক ব্যাপার থেকে যায়। সারারাত তিনি এভাবে তার সব সুরা অথবা আয়াত এক এক করে গম্ভীর গলায় যেন বলার ইচ্ছে হে মানুষেরা বলো : আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সেসব কার জন্যে; তিনি নিজের ওপরে বিধান করেছেন করুণা; নিঃসন্দেহে কেয়ামতের দিন তিনি তোমাদের একত্রিত করবেন। বলো, আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ্ ভিন্ন আর কাউকে কি আমি রক্ষাকারী বন্ধুরূপে গ্রহণ করবো? আর যদি আল্লাহ্ তোমাদের

দুঃখ দিয়ে স্পর্শ করেন তবে তা সরিয়ে নেবার তিনি ভিন্ন কেউ নেই; আর যদি তিনি তোমাদের স্পর্শ করেন শুভকর কিছু দিয়ে তবে নিঃসন্দেহে তিনি সব কিছুর ওপরে। এভাবে সারেং-সাব নিজের ভেতরে ডুবে যান। তাঁর কোনো তখন আর আকাঙ্ক্ষা থাকে না। সারা দিনমান এই যে অমানুষিক পরিশ্রম সব মনে হয় তাঁর সেই জ্ঞানী ঐশী শক্তিকে স্পর্শ করার জন্য।

মজুমদার, বংকু, ইয়াসিন, মনু এখন ফোকসালে বসে তাস খেলছে। বাদশা মিঞা উপুড় হয়ে দেখছে তাস খেলা। চা আসছে মাঝে মাঝে। এখানেও রয়েছে এক ঐশীশক্তিসম্পন্ন মানুষ। নিজের সে একটা জগত তৈরি করে নেয়। মাথার ওপর ছাদ, তার ওপরে নীল আকাশ এবং নক্ষত্রমালার কথা মনে থাকে না। মনে থাকে না পৃথিবী একটা গ্রহ, লক্ষ কোটি গ্রহের ভেতর সে আছে এবং এই যে আকাশের নীহারিকাপুঞ্জমালা, তার ভেতর থেকে এখন এক নিরিবিলি বন্দরে চারজন মানুষ তাস খেলছে ভাবতে ভৌতিক লাগে। সব ক্রিয়াকলাপই এখন অর্থহীন।

অথবা যদি ভাবা যায় গ্রহ-নক্ষত্রের মতো পৃথিবী আপন অক্ষরেখায় ঘুরছে—পৃথিবীর বার্ষিকগতি আহ্নিক গতি আছে, একটা কমলালেবুর মতো ওর গড়ন—সমুদ্র-পৃষ্ঠে একটা সাদা জাহাজ, একটা এজন্য যে পৃথিবীতে যারা সিউল-ব্যাংকের নাবিক তারা পৃথিবীতে একটা জাহাজের কথাই ভেবে থাকে—আর কিনা সেই ছোট্ট জাহাজ, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পৃথিবীর সমুদ্র-পৃষ্ঠে ভেসে ভেসে তাহিতি নামক এক সুন্দর দ্বীপে এসে পৌঁছে গেছে। ওদের তাসখেলা দেখলে, কোনটা সত্যি কোনটা মিথ্যা বোঝা দায়। ইয়াসিন তখন ট্রাম বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল। কে বলবে পৃথিবী গ্রহ তখন। কে বলবে, এই সৌরজগতে ওরা প্রায় অস্তিত্বহীন। কিছু আসে যায় না এতবড় সৌরলোকে কোন ঐশীশক্তি কি ট্রামকার্ড হাতে রেখে খেলছে!

অবাক, ওদের খেলা, ওদের খেলায় নিবিষ্টতা এবং এই যে চা এল, কেউ শুকনো পান খাচ্ছে দুটো শুকনো সুপুরি দিয়ে, মনেই হবে না দেখে তারা কোনো অংশে কম সুখে আছে। সকালে জাহাজ ছাড়বে, ওদের খেলা দেখলে একেবারেই তা মনে হচ্ছে না। গ্রহ নক্ষত্র পৃথিবীর অবস্থান অথবা এই সমুদ্র তার বিশালতা ঝড় টাইফুন সবই অকিঞ্চিৎকর তাদের কাছে। তাস খেলার মতো প্রিয় আর কি আছে পৃথিবীতে তারা জানে না। এও এক ঐশীশক্তি—তাদের সব দুঃখ ভুলিয়ে দিচ্ছে।

তখন ডেক-সারেঙ, ডেক-টিণ্ডাল ঘুমিয়ে আছে বাংকে। ওদের নাক ডাকছিল। ভাণ্ডারী জ্যাঠা তখন লুঙ্গি পাল্টে নিচ্ছেন। সবার খাওয়া না হলে তিনি নামতে পারেন না। এখন হয়তো মুখ ধুয়ে সামান্য আফিং খাবেন। এক বিন্দু এই আফিং তাঁকে সারারাত কত রকমের স্বপ্নের ভেতর যে ডুবিয়ে রাখবে। যেন সারাদিন এই যে পরিশ্রম, এই সামান্য আরামটুকুর জন্য। কেউ এসে বিরক্ত করলে চিৎকার চেঁচামেচি লাগিয়ে দেবেন। অথবা মনে হবে কুরুক্ষেত্র, এমনকি সারেঙ-সাব পর্যন্ত এসময় ওকে ঘাঁটান না। তিনি খুব নিবিষ্টতার সঙ্গে সামনে জলের গ্লাস, এক বিন্দু আফিং রেখে পা ভাঁজ করে বসলেন। তারপর জল মুখে আফিং-এর বিন্দু গলায় ছেড়ে দিয়ে চোখ বুজে ফেললেন। যতক্ষণ ঝিমুনি না আসবে এভাবে বসে থাকবেন। ঝিমুনি এলে কাত হয়ে শোবেন। তারপর কি সব নানারকমের উদ্ভট সব দৃশ্য, এসব দৃশ্য দেখতে দেখতে তাঁর মনেই হয় না বেঁচে থাকার জন্য পৃথিবীতে আর কি লাগে!

এভাবে সব বাংকেই কিছু না কিছু হচ্ছে। কেউ হাসছে। কেউ ফিসফিস করে বন্দরে কিসব করে এল, পাশের জাহাজিটিকে বলছে এবং ঘুম আসছে না বলে বারবার হাই তুলছে।

ছোটবাবু একা দাঁড়িয়ে আছে। ওর হাই উঠছিল। ঘুম পাচ্ছিল। এবং সবার মতো এখন এ জাহাজে একটা পাখি একমাত্র তার ঐশী-শক্তি। কারণ ওর মনে হয়েছিল পাখিটা ঠিক ফিরে আসবে। হয়তো গোপনে মাস্তুলের ডগায় পাখিটা বসে রয়েছে। তার ঘুম পাচ্ছে, তবু সে এলি-ওয়ে ধরে হেঁটে গেল। মাস্তুলের নিচে দাঁড়িয়ে দেখল, পাখিটা নেই। পাখিটা সত্যি ফিরে গেছে। সে আর আসবে না। লেডি- এ্যালবাট্রস নিজের মতো আশ্রয় খুঁজে পেয়ে গেছে।

পাখিটার জন্য আর তাকে উচ্ছিষ্ট হাড়-মাংস সংগ্রহ করে রাখতে হবে না।

সে একা একা ফিরে গেল। জাহাজে উঠে অদ্ভুত স্বভাব গড়ে উঠেছে। ডাঙ্গায় তার এভাবে কোন পাখি না থাকলে এত একা একা লাগে ভাবতে পারত না। সে একা একা যখন যাচ্ছিল, যখন চারপাশে এলি-ওয়ের আলো, যখন মেন-এনজিন চলছে না বলে পায়ের শব্দে টের পাওয়া যাচ্ছে একজন অসহায় মানুষ একা একা হেঁটে যাচ্ছে, সামান্য শব্দেই মনে হচ্ছে অতিকায় ঘটনা ঘটছে জাহাজে তখন বনি ওপরে পোর্ট-হোলে দাঁড়িয়ে আকাশ দেখছে। বনির কিছুতেই ঘুম পাচ্ছিল না। তার শরীরে সুন্দর পোশাক। নীল রঙের গাউন পায়ের পাতা পর্যন্ত। হাল্কা গাউন। এত পাতলা যে ভেতরের সব কিছু স্ফটিক জলের মতো স্বচ্ছ। সে একা দাঁড়িয়ে আছে। সে ফিস ফিস করে নিজের সঙ্গে কথা বলছে, ছোটবাবু, আমি বনি। মি-গার্ল। আমার ঘুম আসছে না ছোটবাবু।

তখন কাপ্তান স্যালি হিগিনস একটা চিঠি বারবার পড়ছেন।

দুপুরে কাপ্তান স্যালি হিগিনস চিঠিটা পেয়েছেন। হেড-অফিস থেকে ওর নামে জরুরী চিঠি। দুপুরে তিনি চিঠির ভাঁজ খুলে দেখেছিলেন মিস্টার রিচার্ড ফেল ওকে একটা ব্যক্তিগত চিঠি লিখেছেন। চিঠিটা পড়ে তিনি তখন গুম হয়ে বসেছিলেন। সারাদিন চিঠিটার কথা ভেবেছেন। মিঃ ফেল প্রায় যেন অনুনয় বিনয় করে লিখেছেন এবং যা লিখেছেন এতে তাঁরও ঘাবড়ে যাবার কথা। মিঃ ফেলের পুত্রের কথা চিঠিটাতে ছিল না, কিন্তু বার বার মনে হয়েছে সেই হাসি খুশি মানুষটি আর তেমনটি নেই। জাহাজ স্ক্র্যাপ করার কথা তিনি আর ভাবছেন না। এখন শুধু একমাত্র স্যালি হিগিনসই ত্রাস থেকে তাঁকে রক্ষা করতে পারেন। মিঃ ফেল পুত্রের মৃত্যুর পর আর সিউল-ব্যাংকের লাভ লোকসান দ্বিতীয়বার খতিয়ে দেখেন নি। সিউল-ব্যাংক যদি সমুদ্রে ডুবে যেত, অথবা চড়ায় আটকে থাকত কোথাও—আচ্ছা আপনি স্যালি হিগিনস পারেন না, সিউল-ব্যাংককে কোন চড়ায় তুলে দিতে—এমন একটা অনুনয়ও যেন চিঠিটার ভেতরে পরোক্ষভাবে ছিল। মিঃ ফেল কোম্পানীর কর্তাব্যক্তি। সিউল-ব্যাংকের পরবর্তী সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কে কিছু খোলাখুলি খবর পাঠিয়েছেন।

প্রথমে তিনি জানিয়েছেন, মিঃ হিগিনস, আশা করি কুশলে আছেন। তারপর লিখেছেন আপনার জ্ঞাতার্থে জানাচ্ছি বৃটিশ ফসফেট কোম্পানীর সঙ্গে আমাদের এক বৎসরের পুরো একটা চুক্তি হয়েছে। সেই চুক্তি অনুসারে জাহাজ এখন সমুদ্রেই থাকবে। নারুদ্বীপ, কাকাতিয়া দ্বীপ, ওসানিকআয়ল্যান্ড, সামোয়া, টোঙ্গা, নিউক্যালেন্ডোনা, নিউ হেরিডস, গোয়াম—এসব দ্বীপ থেকে জাহাজ ফসফেট নেবে, এবং অস্ট্রেলিয়ার উপকূলে, নিউজিল্যান্ডের উপকূলের ছোট ছোট বন্দরে সেসব নামিয়ে দেবে। যদিও দীর্ঘ সফর হয়ে যাবে, তবু আমাদের এখন আর কি করণীয় বুঝতে পারছি না। আপনি আমাদের সুখে- দুঃখে দীর্ঘদিন আছেন, সিউল-ব্যাংক জাহাজ আপনার প্রিয় জাহাজ।

হিগিনস বুঝতে পারেন কর্তাব্যক্তিরা কখনও সহজ কথাটা সহজভাবে লেখেন না। ওঁরা যেন বলতে চান আমাদের দক্ষিণ সমুদ্রেই কাজকর্ম বেড়ে গেছে। সেখানে সিউল-ব্যাংককে না থাকলে চলবে না। এটা কিছুতেই স্বীকার করছেন না, জাহাজকে আর বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জের কাছাকাছি থাকতে দেবেন না। যত দূরে সম্ভব, জাহাজটাকে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। জাহাজ যত উত্তরমুখী উঠতে থাকে যত ইংলিশ-চ্যানেলের কাছে চলে যায় তত হেড-অফিসে উত্তেজনা দেখা দেয়। নানাভাবে সব এজেন্ট অফিসে তখন চিঠি, কি ব্যাপার জাহাজ কেন এভাবে উঠে আসছে। এশিয়া, আফ্রিকার বন্দরগুলোতে খোঁজ নিন। সিউল- ব্যাংকের জন্য ঠিক কার্গো পেয়ে যাবেন। যদি না পান দেখুন জাভা সুমাত্রা বোর্ণিওতে। সেখানে ঠিক কার্গো পেয়ে যাবেন। যত সত্বর সম্ভব জাহাজের কার্গো দিন। জাহাজ খালি ফেলে রাখবেন না। খালি ফেলে রাখলে কোম্পানীর আর্থিক ক্ষতি।

তারপর লেখা আছে দক্ষিণ সমুদ্র ছাড়া এ-জাহাজ কার্গো পাবে না। সুতরাং দক্ষিণ সমুদ্রে যতদিন সম্ভব বৃটিশ ফসফেট কোম্পানীর হয়ে জাহাজ ভাড়া খাটুক। আশা করি এতে আপনার

সায় আছে।

হিগিনস চিঠিটা ভাজ করে রাখলেন। রিচার্ড ফেল ওঁকে নিজে চিঠি লিখেছেন। এবং অফিসিয়াল চিঠি নিশ্চয়ই তিনি নিউ প্লাইমাউথে গিয়ে পেয়ে যাবেন। বোধ হয় মিঃ ফেলের ভয় ছিল কি জানি এত দীর্ঘদিনের সফর যদি হিগিনস করতে না চান এবং তিনি এভাবে জানেন তাঁর ব্যক্তিগত চিঠি অনেক বেশি কাজের হবে। .

হিগিনস ভেবেছিলেন, নিউ-প্লাইমাউথ থেকে খালি জাহাজ যাবে, পোর্ট-মেলবোর্ণে। তারপর কাছাকাছি বন্দর জিলাঙ, সেখানে গম বোঝাই হবে—এবং জাহাজ আবার ভারত মহাসাগর পার হয়ে সুয়েজের ভেতর দিয়ে ঠিক ভূমধ্যসাগর একদিন পার হয়ে যাবে। এবং বে-এফ-বিসকে পার হলে তিনি এতদিনের সমুদ্র-অভিযান, অভিযানই তাঁর কাছে, কারণ এমন একটা ভাঙ্গা জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে ঘুরে বেড়ানো ভেলায় চড়ে পাহাড়ী নদী পার হবার মতো। তাঁর কাছে যেহেতু অভিযানের সামিল তিনি অন্তত তাঁর জীবনের অভিযান সফল ভেবে বন্দরে দাঁড়িয়ে শেষবারের মতো জাহজাটাকে স্যালুট জানাতে পারবেন—কিন্তু যেটা সবচেয়ে দুর্ভাবনা, এবং যা নিয়ে তিনি সারাটা দিন ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলেন—বনি জাহাজে এতদিন থাকলে কিছু একটা দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। তিনি নিজে টের পাচ্ছেন এ জাহাজে কেউ কেউ যেন বাতাসে গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে। জাহাজে কোথায় যেন একটা মেয়ে মেয়ে গন্ধ। তখনই তিনি ভীষণভাবে মুষড়ে পড়েন। এই জাহাজ এবং বনি। বনি এবং এই জাহাজ। কার কথা এখন তিনি বেশি ভাববেন। অথচ চিঠিটা মিঃ ফেলের ব্যক্তিগত চিঠি। কিছুটা শেষদিকে অনুনয়ের মতো। আমাদের বিপদ থেকে ত্রাণ করুন—এমন একটা আর্ত সুর আছে চিঠিটাতে। শেষের দিকে যতই সতর্ক থাকুন মিঃ ফেল ধরা পড়ে গেছেন। লুকেনারের প্রেতাত্মা কোথাও কি সত্যি তবে জাহাজটাতে রয়েছে। কারণ লুকেনারের সেই প্রেতাত্মা চায় না মানুষের হাতে এই জাহাজের হাড়-পাঁজর খুলে নেওয়া হোক। তারপর তিনি নিজেই অবাক, জাহজাটার কথা ভাবতে গিয়ে জাহাজের মতো ভাবতে পারছেন না কেন! হাড় পাঁজরের কথা ভাবছেন। যেন সিউল-ব্যাংক তাঁর কাছে সত্যি মানুষের মতো অনুভূতিপ্রবণ। বোধহয় তিনি মরে গেলে তাঁর আত্মাও এ-জাহাজ থেকে নড়তে চাইবে না। আর তখন দেখতে পেলেন সামনে কে দাঁড়িয়ে আছে। এলিস! এলিস তুমি! তিনি এলিসকে ধরবেন বলে পাগলের মতো সিঁড়ি ধরে নেমে যেতে থাকলেন। তিনি যত এগিয়ে যাচ্ছেন তত এলিস সরে সরে যাচ্ছে। তখন ডাঙ্গায় কোথাও ঢং ঢং করে বারোটার বেল বাজছে। হিগিনস উন্মত্তের মতো ছুটে যাচ্ছেন।

হিগিনস ডাকলেন, এলিস শোনো।

এলিস ছায়ার মতো কেমন আগে আগে হাঁটছে। এবং আলো অন্ধকারে এত কাছে এলিস যে তিনি হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারেন, তিনি কেবল চাইছেন এলিস ওঁর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কথা বলুক। তিনি বললেন, এলিস তুমি বল, তোমার কোন দোষ ছিল না?

এলিস তবু চলে যাচ্ছে। কোন কথা বলছে না। সে টুইন-ডেকে নেমে যাচ্ছে। সে এবার স্টার বোর্ডের এলি-ওয়েতে ঢুকে গেছে। এলিস তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে! তারপর এলিস ঠিক ছোটবাবুর কেবিনের পাশ দিয়ে আবার ওপরে উঠে ঠিক বনির দরজার সামনে অদৃশ্য হয়ে গেল। এখানেই তিনি এলিসকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করার আগে মাথায় আঘাত করেছিলেন। এবং তখন রাত...আর সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঝিমঝিম করতে থাকল। চিৎকার করে উঠলেন, বনি বনি।

বনি দরজা খুলে দেখল বাবা এত রাতে তার দরজায়। বাবার ভীত সন্ত্রস্ত মুখ দেখে বলল, কি হয়েছে! তুমি এত রাতে নেমে এসেছ কেন?

বনির খেয়াল ছিল না। সে সেই হাল্কা পোশাকেই ঘুমিয়ে পড়েছিল। হিগিনসের হুঁশ হল। তিনি যা দেখলেন, বনি বড় হয়ে গেছে, খুব বড় হয়ে গেছে, । বনি ঠিক এলিসের মতো। ঠিক এলিসের মতো বনির রাতের পোশাক। হিগিনস আর চোখ তুলে মেয়েকে দেখছেন না। তিনি সিঁড়ি ধরে ধীরে ধীরে ক্লান্ত পায়ে উপরে উঠে যাচ্ছেন।

আর তখন বনি হতবাক! ছিঃ ছিঃ সে এটা কি করে ফেলল। বাবার সামনে সে একেবারে বে- আবরু। দরজা বন্ধ করে আয়নায় আর দাঁড়াতে সে সাহস পেল না। সংকোচে সে কেমন গুটিয়ে গেল। সে তো ছোটবাবুর কাছে যাবে। বার বার প্রতিদিন সে একবার মনে মনে এ-পোশাকে ছোটবাবুর সামনে বসে থাকে। ফুল ফুটতে থাকলে যে-সব আকাঙ্ক্ষা ফুলের যেমন ফুলেরা রাত জেগে শিশিরের শব্দের মতো ঘুমোয় না তেমনি বনি ঘুমোতে পারে না। ফুলের মতো ছোটবাবু চারপাশে তার ফুটে থাকে।

বনি এই প্রথম নানা কারণে সারারাত চোখ এক করতে পারল না।

আর সকালেই ড্যাং ড্যাং পূজোর বাজনার মতো জাহাজের দড়িদড়া আবার উঠে যাচ্ছে, নোঙর তুলে ফেলা হচ্ছে। কেউ বুঝতেই পারে না জাহাজটার ভেতরে অজস্র দুঃখ, জাহাজটা এইসব দুঃখ নিয়ে ফের সমুদ্রে পাড়ি দিচ্ছে।

বিকেলের দিকে তখন জাহাজ বেশ দূর সমুদ্রে এবং তখনই কেউ যেন হেঁকে যাচ্ছিল, লেডি- অ্যালবাট্রস উড়ছে।

ছোটবাবু উইনচের তলা থেকে বের হয়ে এল। এবং বোট-ডেকে উঠে সত্যি সে বিস্মিত পাখিটা আবার জাহাজের পেছনে উড়ে আসছে। পাখিটা হয়তো ভেবেছে ম্যান-আলবাট্রস এ জাহাজেই কাঠের বাক্সে বন্দী আছে। তাকে সে না নিয়ে ফিরে যাবে না।

॥ ঊনত্রিশ ॥

পর পর দু'রাত স্যালি হিগিনস ঘুমোতে পারলেন না। দেয়ালে ক্রাইস্টের মুর্তি। যতবার চেষ্টা করেছেন সোজা রাখার, ততবার কাত হয়ে গেছে। তার পায়ের নিচে তিনি সারারাত চুপচাপ বসে থেকেছেন। ভেবেছিলেন, সোজা করে রাখতে পারলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। জাহাজে কোন পিচিং নেই। সমুদ্র একেবারে শান্ত। জাহাজ দুলে দুলে চললে এটা হতে পারত। কিন্তু কি যে হয়ে গেল! কলকাতা বন্দর থেকে ছাড়ার সময় চীফ-মেট বেশ সোজা করে রাখতে পেরেছিল, কিন্তু আবার ঠিক আগের মতো। ইচ্ছে করলে দেয়ালে পেরেক ঠুকে প্রায় আবার যীশুকে ক্রুশবিদ্ধ করার মতো কিছু একটা করে ফেললে, মূর্তিটাকে সোজা রাখা যেত। কিন্তু তিনি তা করতে ভয় পাচ্ছেন।

আসলে একটা শঙ্কা এবং ভয় তাঁকে ক্রমে গ্রাস করছে। হয়তো যীশু ঠিকই আছেন, ঠিকভাবে সোজা সরলরেখায় ঝুলে আছেন কিন্তু মনের ভেতর শঙ্কা তাঁকে ক্রমে সব বিভ্রমের ভেতর ফেলে দিচ্ছে। স্যালি হিগিনস ঘুমের পোশাক পরেছিলেন—রাতের পোশাক ঢিলেঢালা হওয়া স্বাভাবিক—ঢিলেঢালা আছে ঠিকই তবু যতবার শুতে গেছেন মনে হয়েছে সমস্ত শরীরে পোশাকটা ফাঁসের মতো এঁটে যাচ্ছে। পাল্টে আর একটা পরেছেন—তাও সেই একরকমের। যতবার যত পোশাক পাল্টেছেন সবই যেন অন্যের মনে হয়েছে—নিজের মনে হচ্ছে না, এবং কি যে অস্বস্তি তখন, লাফিয়ে উঠে পড়েছেন, কখনও পোর্ট-হোল খুলে আকাশ দেখেছেন, ঠিক ঠিক সব নক্ষত্র আকাশে আছে কি নেই দেখেছেন, দরজা খুলে ব্রীজে যারা ডিউটিতে আছে তারা আছে কিনা দেখেছেন—না সবই ঠিক আছে। মাস্তুল, চিমনি, ব্রীজের উইংস, ডেবিড, কোয়ার্টার-মাস্টার সব তাঁর চেনা, তবু কেন যে মনে হচ্ছিল—জাহাজটা সিউল-ব্যাঙ্ক নয়, জাহাজটা কোনো ভুতুড়ে জাহাজ। ভুতুড়ে জাহাজে উঠে তিনি লুকেনারের পোশাক পরেছেন। পোশাকটা কেমন ভারি, যেন অনেক পোশাক—একটা দুটো নয়, অজস্র পোশাকের ভার তাঁকে একটা কিম্ভুতকিমাকার মানুষ বানিয়ে দিচ্ছে। যখন এসব ভেবে কুলকিনারা পান না, তখনই মাথা নিচু করে যীশুর পায়ের কাছে বসে থাকেন। তাঁর সারারাত ঘুম হয় না। বিড় বিড় করে বকেন, হ্যালেলুজা আই এ্যাম অন মাই ওয়ে।

তখন সমুদ্রের ভেতরে শুনতে পান দীর্ঘ শবযাত্রার মিছিল—তাদের নিথর পায়ের শব্দ, এবং শবাধারে ফুলের ভেতরে কীটের আস্তানা—কটকট করে তারা ফুলের পাপড়ি কাটছে। তাঁর দৃষ্টি দেয়াল থেকে উঠে সেই সমুদ্রের শান্ত প্রবাহের ভেতর আটকে গেলে বুঝতে পারেন, সকাল হয়ে যাচ্ছে। তিনি বুঝতেই পারেন না কেন সারারাত তিনি না ঘুমিয়ে ছিলেন। সব কিছু কেমন নিজের কাছে অবিশ্বাস্য ঠেকে।

তখন কাপ্তান-বয় এসে যায়। বাইরের ডেক চেয়ারে গিয়ে তিনি বসেন। এক কাপ কফি, কফি খেতে খেতে বুঝতে পারেন চোখ জ্বালা করছে—এভাবে পর পর দু'রাত না ঘুমিয়ে শরীরে অবসাদ। উঠতে ইচ্ছে করে না। বনিকে ডেকে পাঠাতে ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে হয় সব খুলে মেয়েটাকে বলেন—বনি, আমার এমন কেন হচ্ছে? বনি তুমি সত্যি করে বল তো, রাতে তুমি হাল্কা পোশাকে কোথায় গিয়েছিলে? এলিস না তুমি! এলিস এবং তুমি দুজনে মিলে ভীষণ আমাকে বিভ্রমের ভেতর ফেলে দিয়েছ?

মাঝে মাঝে তাঁর সহসা কেন যে মনে হয় এ-জাহাজে এলিস আসবে কোত্থেকে! হয়তো রাতে বনি, এই জাহাজে মেয়ে হয়ে যায়। সারাদিন ছেলের পোশাকে থেকে বনি যখন আর পারে না, রাতে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়ে, যে যার ওয়াচ ওপরে নিচে যখন করছে, তখন বনি গোপনে রাতের পোশাকে জাহাজে ঘুরে বেড়ায়। এবং তারপরই তিনি যা ভেবেছিলেন, বনি গোপনে ঘুরে বেড়াতে পারে, কিন্তু তাঁর চোখের ওপর দৃশ্যমান হলে বনির গোপনীয়তা কিছু থাকে না। আর তখনই ভেবে পান না, বনির এত সাহস কি করে সম্ভব। কিন্তু বনিকে তো তিনি বারবার এলিসের মতো দেখেছেন। বনির পোশাক দেখেছেন, হাল্কা পোশাক—যে-পোশাকে

এলিস ওঁর জন্য কেবিনে অপেক্ষা করত। বনি ঠিক সেই পোশাকে কেবিনের দরজা খুলে ওঁর সামেন দাঁড়িয়েছিল। বনি কি তবে রাতে তাঁকে সারা জাহাজ ঘুরিয়ে মেরেছে? বনির ভেতরে এলিস যদি আশ্রয় নেয় তখন! এমন তো ঘটনা তিনি ডাঙ্গায় কত শুনেছেন। এবং বুনি হয় তো তখন সজ্ঞানে থাকে না, মাথার ভেতরে তার এক অশুভ আত্মা ক্রমাগত পাক খেতে থাকে। বনি এলিস হয়ে যায়। আসলে এলিস তাঁকে নিষ্ঠুরতার ভেতর ফেলে ভীষণ মজা পাচ্ছে। এমন সুন্দর মেয়েটাকে নষ্ট করে দিচ্ছে।

এসব চিন্তা তাঁকে বেশ কাবু করে ফেলেছিল। আর সেই থেকে তিনি ঘুমোতে পারছেন না। একটা ঘোরের ভেতর পড়ে গেছেন তিনি। বনি রাতের পোশাকে সামনে দাঁড়ালে ঘোরের ভেতর মনে হয় এলিস দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজে বনি বলে তাঁর মেয়ে আছে, এবং জাহাজে মেয়ে থাকতে পারে ঘোরের ভেতর কিছুতেই মনে থাকে না। এই শেষ সমুদ্র সফরে এসব একে একে তাঁকে কঠিন অস্বস্তিতে ফেলে দিচ্ছে। তখন যিশুর পায়ের কাছে, বাইবেলের কোন পবিত্র সুরা পাঠ করে আত্মশুদ্ধির আকাঙক্ষা। মাথায় আর কিছু আসে না। অন্যান্য অনেক কাপ্তানের জাহাজ ছেড়ে দেওয়ার পেছনে বোধ হয় কিছু এমন রহস্যজনক ঘটনা থেকে গেছে। তাঁরা ভয়ে হয়তো জাহাজের নামে মিথ্যা দুর্নাম রটিয়ে বন্দরে নেমে গেছে। বার বার অসুস্থ হয়ে তাঁরা ফিরে গেছেন জানেন, কিন্তু আসলে কেন এটা হয়েছে—সঠিক কিউ-টি-জি মাঝে মাঝে পাওয়া যায় না কেন এবং জাহাজ নিশীথে সমুদ্রে ঘুরিয়ে মারলে পাগল হয়ে যাবার কথা ঠিক—তবু মনে হচ্ছে তাঁরা লুকেনারের মৃত আত্মা অথবা এলিসের মোহে পড়ে গিয়ে এক সময় অসুস্থ হয়ে পড়তেন। কিন্তু এসব কর্তৃপক্ষকে বলে তো আর তিনি তামাসার ভেতর পড়ে যেতে পারেন না।

তিনি কফি খাচ্ছিলেন। তাঁর পাইপ থেকে ধোঁয়া উঠছে না। কখন নিভে গেছে। দু'দিনে তিনি আরও বুড়ো হয়ে গেছেন। সূর্য সমুদ্রে ভেসে উঠছে। সেই যায় যায়, যেন সূর্য সন্ধ্যার আগে সমুদ্রে ডুবে পালিয়ে যায়, তারপর সারারাত সাঁতার কাটতে থাকে, এবং আবার সকালের দিকে সমুদ্রে একটা গোলাকার অগ্নিপিণ্ডের মতো ভেসে ওঠে। অথবা মনে হয় অতিকায় জাহাজের মতো রাজহাঁসটা একটা সোনার ডিম পেড়ে ওপরে উঠে গেল। যত সময় যায়, তত ডিমটা সেই নীল আকাশের নিচে সামান্য উষ্ণতার জন্য লেগে থাকে, এবং সন্ধ্যা হলেই ডিম ফুটে যায় কিংবা ডুবে যায়, আবার সকালে ভেসে ওঠে—এ সবের ভেতর মনে হল, বনিকে সামনের বন্দরে বরং নামিয়ে দেবেন। বনিকে তিনি ক্রমে একটা বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছেন। জাহাজ থেকে বনি নেমে গেলেই হয়তো এলিস প্রতিশোধ নেবার আর কোন অবলম্বন পাবে না। নিজের সম্পর্কে ভাবেন না। বয়স হয়েছে, সমুদ্রে যে-কোনোভাবে মৃত্যু অনিবার্যতার সামিল।

এবং আর যা ভাবলেন, বনিকে কিছু প্রশ্ন করার আছে। তা না হলে তাঁর অস্বস্তি কাটবে না। কফি খাওয়া হলে তিনি কাপ্তান-বয়কে বললেন, একবার জ্যাককে পাঠিয়ে দেবে।

জ্যাক ঘুমোচ্ছিল। সে দু'তিন দিন বাবার কাছে যায়নি। লজ্জায় সংকোচে সারাদিন কেবিনে কাটিয়ে দিয়েছে। ওর যে এটা কি করে হল? এবং বাবা মনে মনে বিরক্ত হতে পারেন। এত সকালে যখন সে শুনতে পেল, তাকে তিনি ডাকছেন, সে লাফ দিয়ে উঠে বসল। বাইরে কাপ্তান বয়ের গলা। সে বলল, যাচ্ছি।

হাত মুখ ধুয়ে ঠিক সেই ঢোলা পুরুষের পোশাকে জ্যাক যখন উঠে গেল ওপরে, বাবার পাশে যখন দাঁড়িয়ে ডাকল, আমি বনি, তখন কাপ্তান ধীরে ধীরে চোখ তুলে মেয়েকে অনেকক্ষণ দেখলেন। মুখ থেকে এক আশ্চর্য নীল আভা যেন বের হচ্ছে। গোলাপী রঙ এবং নীল চোখে কি যেন আশ্চর্য সজীবতা। পৃথিবী ফুলে ফলে ভরে গেলে এমন হয়। তিনি যে ডেকেছেন, ভুলেই গেছিলেন। মেয়েটাকে দেখতে দেখতে কেন তিনি ডেকেছেন মনে করতে পারলেন না। তারপর খানিকক্ষণ কি ভেবে যখন মনে করতে পারলেন—কেমন সংকোচ হল তাঁর। বনি সম্পর্কে কি যে আজেবাজে দু'রাত ধরে ভেবেছেন। শুধু বললেন, বোস।

তোমাকে ডেকেছিলাম! হ্যাঁ—মনে হয়েছে। আচ্ছা বনি, খুব সন্তর্পণে বললেন, তোমার শরীর ভাল যাচ্ছে?

এই সাতসকালে বাবার এমন কথা শুনে সে আশ্চর্য হয়ে গেল। বলল, কেন বল তো বাবা?

—না এমনি। দু'দিন দেখিনি। ভাবলাম...।

—আমার শরীর ভাল আছে বাবা।

—আচ্ছা বনি, তোমার কি কখনও—তারপরই কেমন সতর্ক হয়ে গেলেন। এ-সব তো বনিকে ভেবেছেন বলবেন না। আবার কেন সেই এক কথা।

বনি দেখতে পেল, বাবার মুখের দৃঢ়তা একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে। এখন আর যেন তার বাবা ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস নন, সামান্য একজন ডাঙ্গার মানুষ। সমুদ্রে দীর্ঘদিন থাকলে মানুষের যে আত্মপ্রত্যয় থাকে তাঁর মুখে বিন্দুমাত্র তার চিহ্ন নেই। সে যেন তার বাবার সঙ্গে কথা বলছে না, কেমন অপরিচিতের মতো তিনি। এবং তখনই সেই ভয়টা গুড়গুড় করে ওঠে। আর্চিকে দেখলে সে যেমন দৌড়ে পালায়, বাবাকে দেখেও তার এখন দৌড়ে পালাতে ইচ্ছে করছে।

তখনই স্যালি হিগিনসের যে কি হয়ে যায়। তিনি বললেন, বনি তুমি বড় হয়ে গেছ।

বনি এবার মাথা নিচু করে পায়ের কাছে বসে পড়ল।

জাহাজিরা তখন যে যার কাজ করে যাচ্ছে। ডেক-জাহাজিরা ডেক ধোয়ামোছা করছে। একদল জাহাজি ফল্কার ওপর মাদুর বিছিয়ে নামাজ পড়ছে। পিছিলে কেউ চর্বি ভাজা রুটি খাচ্ছে। ছোটবাবু বালতি হাতে, তেলের টব কোমরে গুঁজে মেইন-মাস্টের নিচে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ওপরে চিফ-মেট ব্রীজে পায়চারি করছে। ওরা দেখতে পেল, সাতসকালে বাপ-বেটাতে ব্রীজের পাশে চার্টরুমের বারান্দায়, কি সব গোপন সলাপরামর্শ চলছে।

স্যালি হিগিনস বললেন, জাহাজ খারাপ জায়গা। এখানে রাখতে তোমাকে আর সাহস পাচ্ছি না বনি।

বনির মুখ থমথম করছে। বোধ হয় চোখ ফেটে জল বের হয়ে যাবে। সে কিছু বলছে না। কেবল চুপচাপ শুনে যাচ্ছে।

বাড়ির পরিচারকদের লিখে দিচ্ছি, তুমি যাচ্ছ। তোমার পিসি এসে থাকবে। আমার ফিরতে আর এক বছর। এ কটা দিন দেখতে দেখতে তোমার কেটে যাবে।

বনির মুখ দেখা যাচ্ছে না। চুল বড় হয়ে গেছে বলে মুখ ঢেকে গেছে। তিনি চান বনি কিছু বলুক। কিন্তু বনি দু-হাঁটু মুড়ে অসহায়ভাবে বসে রয়েছে। স্যালি হিগিনস বুঝতে পারেন, বনির স্বভাব আগের মতো নেই। স্থির ধীর। বয়স হলে মেয়েরা এভাবে বসে থাকতে ভালবাসে। আগের বয়সে বনি এত সহজে এ কথাটা মেনে নিত না।

তিনি ফের বললেন, ভাল হয়ে থাকবে। তোমাকে আমি বাড়ি ফিরে সারপ্রাইজ দেব।

বনি এবার উঠে যাচ্ছিল। সে কিছুতেই বাবাকে যেন ওর মুখ দেখাতে চায় না। মুখ ঘুরিয়ে রেখেছে। বাবা তার এই দুঃখ টের পাক সে চায় না। সে ছুটে বের হয়ে গেল। এবং কেবিনের দরজা বন্ধ করে বিছানায় হাউ হাউ করে ভেঙে পড়ল।

তখন কি যে দ্রুতবেগে মেন-এনজিন ঘুরপাক খাচ্ছে। কি অতিকায় শব্দ মেন-এনজিনের। একেবারে যেন প্রপেলার স্যাফট ভেঙ্গে-চুরে দিতে চাইছে। দ্রুতবেগে ঘুরছে প্রপেলার স্যাফট। এনজিনের অতিকায় পিস্টন নেমে আসছে, উঠে যাচ্ছে। ক্রাংক-ওয়েভ ঘুরে ঘুরে নেমে যাচ্ছে, কনডেনসারে স্টিম ক্রমে ঠান্ডা হচ্ছে আর পাম্প চলছে অনবরত, তার কিট কিট শব্দ এবং বয়লারের গেজে লাল দাগ সঠিক স্টিমের জায়গায় কাঁপছে একটা কবুতরের পাখার মতো।

বনি বিছানায় ঠিক এমনি থরথর করে কাঁপছে। ফুলে ফেঁপে উঠছে ওর শরীর। সে

দু'হাতে বিছানার যাবতীয় বালিশ চাদর একসঙ্গে করে বুকের কাছে টেনে আনছে। সে কিছুতেই এই দুঃখ, ভেতরে যে এক আশ্চর্য ভালবাসা তার এ জাহাজে গড়ে উঠেছে—কাউকে বলতে পারল না। সে বলতে পারল না, বাবা জাহাজ ছেড়ে চলে গেলে আমি মরে যাব। যেন বললেই বাবা টের পেয়ে যেতেন, যা তিনি আশংকা করেছিলেন ঠিক। বনি এ-জাহাজে ভারি কষ্টের ভেতরে পড়ে গেছে। বনিকে তিনি কিছুতেই কষ্টের ভেতর ফেলে দিতে চান না।

ছোটবাবু তখন পালিয়ে পালিয়ে পাখিটাকে খাবার খাওয়াচ্ছিল। সেই সকাল থেকে সে চারপাশে সতর্ক নজর রেখে যায়। আর্চি অথবা পাঁচ-নম্বরের চোখে পড়লেই তাকে আবার নিচে নামিয়ে দেওয়া হবে। বয়লার-প্লেট তুলে ভেতরে নামিয়ে দেবে তাকে। এবং প্লেট ফেলে কতদিন যেন মনে হয় দীর্ঘকাল ওকে সেই অন্ধকারে—পচা জল আর তেল-কালির ভেতর ফেলে রাখতে চায়। সে ভয়ে ভয়ে থাকে। খুব ভালো ছেলের মতো কাজকর্ম করে এবং এই যে দু'দিন জ্যাকের সঙ্গে তার দেখা হয় নি —সেটা কপাল ভাল, দেখা না হলেই সে বেঁচে যায়। জ্যাকের জন্য অযথা এই কষ্টের ভেতর পড়ে যেতে তার ভয় হয়। কিন্তু পাখিটার বেলায় সে অন্যরকম। সে ফাঁক পেলেই পাখিটাকে খাবার খাওয়ায়। আর্চিকে তখন সে এতটুকু যেন গ্রাহ্যের ভেতর আনে না। তখন সে কেমন জেদী একগুঁয়ে।

তখন মৈত্র পরীতে নামবে। হাতে দস্তানা। গায়ে সেই নীল পোশাক। মাথায় ক্রিকেট ক্যাপ। এবং বোধ হয় সে এবং অমিয় ছোটবাবুকে মনে মনে খুঁজছিল। ছোটবাবু ক'দিন হল ওদের সঙ্গে কথা বলছে না। ছোটবাবুর সঙ্গে প্রায় দিনই দু-একবার ডেকে দেখা হয়, খুব কাজের মানুষের মতো ছোটবাবু উইনচের ভেতর মুখ গুঁজে রাখে। ডেক ধরে কারা হেঁটে গেল যেন ছোটবাবু টের পাচ্ছে না। ভীষণ নিবিষ্ট কাজে এমন একটা ভাব। আসলে ছোটবাবু রাগ করেছে।

মৈত্র দেখছে, ছোটবাবু পাখিটার খাওয়া হয়ে গেলে ফিরে আসছে। খুব খুশী ছোটবাবু। পাখিটাকে খাওয়াতে পারলে ছোটবাবুর আর কোন দুঃখ থাকে না এবং এই ঠিক সময়। অমিয় বলল, এই ছোটবাবু তুই আমাদের সঙ্গে কথা বলছিস না কেন? খুব গরম হয়েছে?

ছোটবাবু বলল, মৈত্রদাকে না নিয়ে গেলেই পারতে।

মৈত্র বলল, রাখ রাখ বাপু, আলগা দরদ তোর দেখাতে হবে না। কেমন আছি একবার তো খবর নিলি না।

—তুমি ভাল থাকলে আমার কি হবে? ছোটবাবু কেমন গম্ভীর গলায় কথা বলল। ছোটবাবুর এমন কঠিন মুখ মৈত্র কখনও দেখে নি। ছোটবাবু যেন নিজের ভেতর ক্রমে একজন সঠিক মানুষকে খুঁজে পাচ্ছে। আগে এই ছেলেটা ছিল একেবারে নরম মাংসপিন্ড, যা খুশি বানানো যেত। এখন ইচ্ছে করলেই আর ছোটবাবুকে যা খুশি বানানো যাবে না। এবং এভাবেই বোধ হয় ক্রমে এক সমীহ গড়ে ওঠে। জাহাজে ছোটবাবু উঠেছিল সবার অপোগন্ড হয়ে, এখন মৈত্রের মনে হল, জাহাজে অপোগন্ড সে নিজে। অমিয়, মনু এবং বংকু সবাই সুখে দুঃখে ছোটবাবুর কাছে পরামর্শ নিতে পারে। সে বলল, ছোট ভুল হয়ে গেছে। কিছু মনে করিস না। এখন ভাল আছি।

—এ-ভাল তোমার ভাল নয়। তোমাকে দাদা সাবধান হতে হবে। তারপর কেমন সহসা মনে পড়ার মতো বলল, শেফালী বৌদির চিঠি আর এল?

—না। বোধ হয় রাগ করেছে। করুক গে। আমি কি করব। টাকা থাকলে যদি না পাঠাতাম তবে বলতে পারত। কেমন মৈত্র মুখ গোমড়া করে রাখল।

—তাহিতিতে চিঠি লিখলে?

—লিখেছি। প্লাইমাউথে জবাব পাব আশা করছি।

—বাবা হলে কিন্তু আমাদের খাওয়াতে হবে।

—হ্যাঁরে খাওয়াব। বাবা হলে খাওয়াব না তো কখন খাওয়াবো। এত খাটছি কি জন্য। এবং ছোটবাবুর মনে হল এক্ষুনি মৈত্র চোখ বুজে তার সেই শিশুসন্তানের কথা ভাবতে ভাবতে নিবিষ্ট হয়ে যাবে।

মৈত্র বলল, বলত ছোট, "মেয়ে হবে না ছেলে হবে?

ছোটবাবু বলল, তোমার কি ভাল লাগে? মেয়ে না ছেলে?

অমিয় বলল, মেয়ে হোক মৈত্র। তোর মেয়ের সঙ্গে বড় হলে আমি প্রেম করতে পারব।

—খুব রস দেখছি।

—দ্যাখ মৈত্র, বলে ওরা স্টার-বোর্ড ধরে হাঁটছে। ছোটবাবু দাঁড়িয়ে এভাবে গল্প করতে পারে না। তবু এভাবে দেশ-বাড়ি অথবা ডাঙ্গার কথা ভাবলে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে ইচ্ছে করে। এবং অহেতুক কথাবার্তা—কোনো মাথামুণ্ডু নেই তবু বলে যাওয়া, আর বাজি রাখা, বারবার এভাবে বাজি রাখতে ভালবাসে নাবিকেরা। যেন মৈত্র বাজি ফেললে, ছেলে হলে অমিয় দেবে, চার পাউণ্ড, অমিয় রাজী কিন্তু মেয়ে হলে, মেয়ে হলে তুমি হেরে যাবে মৈত্র। তুমি তখন কত দেবে? সেও বলল, চার পাউণ্ড। চার পাউণ্ড যেই দিক এবং নিজেরা কিছু চাঁদা তুলে ফেললে বেশ ভোজ হবে কিনারায় এবং স্ফূর্তি সারারাত। অমিয় বলল, ছোটবাবু, তুই কিছু দিবি না?

—আমিও চার পাউণ্ড দেব।

—তাহলে চার চার আট হয়ে গেল। অমিয় দেখল বংকু, অনিমেষ কোথাও রঙ করে ফিরছে। এখন টিফিন, সকালের চর্বিভাজা রুটি চা খেতে ওরা পিছিলের দিকে যাচ্ছে। অমিয় ওদের জামা ধরে বলল, তুমি এক পাউণ্ড, অনিমেষ তুমি এক পাউণ্ড। মনু দেবে দশ শিলিং, জব্বার দেবে দশ শিলিং তা অনেক হয়ে যায়।

বংকু বুঝতেই পারল না কিসের পাউণ্ড আর কিসের দশ শিলিং। সে বলল, তোমার বাপের পয়সা! চাইলেই পাওয়া যায়।

অমিয় অন্য সময় হলে মারামারি লাগিয়ে দিত। সামান্য অহেতুক কথাবার্তায় সহজেই জাহাজে মারামারি লেগে যায়, এখনও যেত, কিন্তু ছোটবাবুর সামনে বংকু বাবা তুলে কথা বলে ঠিক করে নি। ছোটবাবু বলল, দিবি তো একটা পাউণ্ড, কথা বলিস একশো পাউণ্ড ওজনের। শোন, আমরা ঠিক করেছি মৈত্রদা বাবা হলে এক রাতে বেশ জমজমাট কাটাব। নিউ. প্লাইমাউথে খবর ঠিক এসে যাবে। তখন দশ মাস না এগারো? ছোটবাবু এত উত্তেজিত যে, বৌদিকে নিয়ে সামান্য রসিকতা পর্যন্ত করে ফেলল।

—তা ছোটবাবু কত মাস হবে, বৌদির কাছে চিঠি দিয়ে জেনে নিতে পারিস।

তখন ওয়াচ থেকে লোকেরা উঠে আসছে। অমিয় মৈত্র ওপরে। ওদের লোক নিচে নেমে গেছে। ওরাও নামবে এবার। সুতরাং মৈত্র, অমিয় আর দাঁড়াতে পারল না।

ওরা বলল, আমরা যাইরে। বলে লাফিয়ে সিঁড়ি ভেঙ্গে বোট-ডেকে উঠে গেল।

দুপুরে খাবার নিয়ে তখন ঝামেলা। বনির কেবিনে তখন কাপ্তান হিগিনস এবং কাপ্তান-বয়। দুজনের চেষ্টায় বনি সামান্য পরিজ খেল। বনি কিছুতেই খাবে না বলছে। ওর শরীর ভাল না থাকলে হিগিনস ভীষণ বিচলিত বোধ করেন। কি হয়েছে—কিছু জানতে পারছেন না। তিনি ভেতরে ভেতরে বিরক্ত বোধ করছেন। আর মেজাজ সামলাতে না পারলে বলছেন, কি হয়েছে বলবে তো?

—কিছু হয় নি বাবা। তুমি চিন্তা কর না।

—তবে খাচ্ছ না কেন?

—খেতে একদম ইচ্ছে করছে না।

হিগিনস মেয়ের মুখের দিকে তাকালেন। চোখ মুখ ফোলা ফোলা। খুব কান্নাকটি করলে এমন হয়। তিনি বুঝতে পারলেন না, বনি কেন কাঁদতে পারে। তাঁকে ছেড়ে বনির থাকতে কষ্ট হবে ঠিক, তবু সে তো সামান্য কয়েকটা মাস। আর তাছাড়া তিনি তো চিরদিন থাকছেন না। তখন কি হবে বনির? এ-সব মনে হলেই তিনি নিজেও আর জোর পান না, বনিকে ধমক দিতে পারেন না। বলতে পারেন না, মানুষ না খেলে বাঁচে!

বনি বলল, তুমি ভেব না বাবা। সব ঠিক হয়ে যাবে।

কিন্তু বিকেলে ফল, কফি সব এমনি পড়ে থাকল। রাতে একটু পোট্যাটো-অনিয়ন মুখে তুলেছে। সামান্য মাংসের রোস্ট মুখে দিয়েছে। আর কিছু না। পরদিন সে আরও কম। এবং এভাবে কমে গেলে সবাই জেনে ফেলল জ্যাক ক্যাবিনে অসুস্থ।

ছোটবাবু দেখছে, জ্যাক ক'দিন ডেকে একেবারেই বের হচ্ছে না। যতবার ওর কেবিনের পাশ দিয়ে গেছে ততবার দেখেছে দরজা বন্ধ। পোর্ট-হোলে উঁকি মেরে দেখেছে, পর্দা ফেলা। কিছু দেখা যায় না। কাপ্তান হিগিনসের ভীষণ দুঃখী মুখ! জ্যাকের তবে কিছু হয়েছে—এবং কিছু হয়েছে শুনলেই সে স্থির থাকতে পারে না। সেই যেমন সে লতিফ বাংকারে পড়ে গেলে কারো নিষেধ গ্রাহ্য করেনি, এখন তেমনি সে কিছুটা মনে মনে একগুঁয়ে। ইচ্ছে হল, রাতে একবার জ্যাকের কেবিনে যাবে। আর্চি তখন মাতাল থাকবে, তার হুঁস থাকবে না। সে সময় মত জ্যাকের কেবিনে উঠে গেল। দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকল, জ্যাক, আমি ছোটবাবু। দরজা খোল।

জ্যাক ভেতরে আছে বোঝাই যায় না। কোন সাড়াশব্দ নেই। সবাই ডাইনিং হলে রাতের খাবার খেয়ে নিয়েছে। এবারে যে যার মতো শুয়ে পড়বে। সকাল সকাল শুয়ে পড়া দরকার। রাত থাকতে ওকে তুলে দেয় ডেবিড। সে তার নিত্য দিনের কাজের মতো খুব সকালে পাখিটাকে আকাশে অন্ধকারে উড়িয়ে দেয়। সকাল সকাল শুয়ে না পড়লে রাত থাকতে উঠতে কষ্ট হয় ছোটবাবুর।

দরজায় দাঁড়িয়ে ফের ডাকল, জ্যাক, আমি ছোটবাবু। দরজা খোল।

জ্যাক দরজা খুলছে না।

কাপ্তান হিগিনসের দরজা খোলা। আলো জ্বলছে না। ব্রীজে এখন থার্ড-মেটের ডিউটি। ছোটবাবু একটা উইণ্ডসেলের আড়ালে দাঁড়িয়ে ডাকছে। খুব জোরে ডাকতে পারছে না। খুব সন্তর্পণে সে জ্যাককে ডাকছে। এবং এটা জ্যোৎস্না রাত বোঝাই যায়। মাথার ওপর চাঁদ। মায়াবী জ্যোৎস্নায় সমুদ্রের গর্জন সে শুনতে পাচ্ছে। অথচ জ্যাক এমন একটা সময়ে সাড়া দিচ্ছে না। ওর মনে হল,জ্যাক তবে সত্যি খুব অসুস্থ। বিছানা থেকে উঠতে পারছে না হয়তো। সে নিজেকে ভীষণ অপরাধী ভাবল। এই জাহাজে, ঠিক নিচে সে রয়েছে—সারাদিন কাজের পর জ্যাকের সঙ্গে বোট-ডেকে চুপচাপ বসে থাকা এবং কখনও কখনও জ্যাক আপনজনের মতো এমন কথাবার্তা বলে তাকে যে মনেই হয় না, জাহাজে উঠে জ্যাকের সঙ্গে পরিচয়। যেন জ্যাক কতকালের চেনা।

আসলে সে বুঝতে পারে জ্যাক যে সেই তাহিতিতে ওর সঙ্গে কথা বলা বন্ধ করে দিয়েছিল, তারপর থেকে কেমন চাপা অভিমান। জ্যাক নিজে এসে ডেকে না নিয়ে গেলে সেই বা যায় কি করে। জ্যাক একদিনও আর নিচে নামে নি। তাকে ডেকে নিয়ে যায় নি। তাকে ডেকে কথা বলেনি। সেও নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে কেমন সচেতন হয়ে উঠেছিল—জ্যাক ডেকে না কথা বললে যেন জীবনেও সে কথা বলবে না।

এর ফলে সে কাজের শেষে ডেবিডের ঘরে বসে আড্ডা দিয়েছে। অথবা ডেবিডের সঙ্গে মদ্যপান- এটা ওর সারাদিন পর বেশ ভাল লেগে গেছিল। সামান্য মদ্যপানের পর ডাইনিং হলে নানারকমের খাবার, তারপর আর সে দাঁড়াতে পারত না। সোজা কেবিনে ঢুকে দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ত। ওর চোখ জড়িয়ে আসত ঘুমে। জ্যাক ওপরে অসুস্থ, সে চিন্তাই

করতে পারত না।

সে এবার দরজায় ধীরে ধীরে টোকা মারল। বলল, জ্যাক, আমি ছোটবাবু। তুমি অসুস্থ শুনলাম। তোমাকে দেখতে এসেছি। কিছুটা সে অপরাধ স্বীকার করার মতো কথা বলল।

এবার মনে হল দরজাটা নড়ছে। দরজাটা ধীরে ধীরে খুলে গেল। জ্যাককে চেনাই যায় না। কেমন শীর্ণকায়, দুর্বল। জ্যাক এতটা যেন কেবল ছোটবাবুর জন্য হেঁটে এসেছে।

জ্যাক দরজা বন্ধ করে দিতে চাইল।

ছোটবাবু বলল, খোলা থাক না! এখন আর্চি এদিকে আসবে না।

জ্যাক তবু দরজা বন্ধ করে ধীরে ধীরে নিজের বিছানায় একটা চাদর টেনে শুয়ে পড়ল। তারপর ছোটবাবুকে অপলক দেখতে থাকল।

ছোটবাবু বলল, কি হয়েছে। তোমার চোখ-মুখ কোথায় গেছে জ্যাক!

জ্যাকের ঠোঁটে সামান্য হাসি ফুটে উঠল। আবার কেমন মিলিয়ে গেল সেই সুন্দর হাসিটুকু! তারপর সেই এক বিবর্ণ চোখমুখ জ্যাকের।

ছোটবাবু বসে থাকতে পারল না। ওর কপালে হাত রাখল। জাহাজ এখন ভিড়িয়ে দেওয়া দরকার। কিন্তু কাছাকাছি বন্দর বলতে নিউ-প্লাইমাউথ। ডেবিডের কাছে সে সব খবর নিতে পারত। আর সে ভেবে পাচ্ছে না, জ্যাক এত রুগ্ন হয়ে গেছে অথচ ডেবিড, একদিনও ওকে কিছু বলেনি। কাপ্তান কি ডেবিডকে ডেকে জ্যাকের সম্পর্কে কোনো পরামর্শ করেনি! জ্যাকের কপাল ঠাণ্ডা। সে থাকতে না পেরে বলল, কোনো ওষুধ খাচ্ছ না?

জ্যাক বলল, আমার কোন অসুখ করেনি ছোটবাবু। তুমি ভাববে না।

—তুমি কি হয়ে গেছ দেখেছ? একবার আয়নায় দেখেছো?

—এই তো দেখতে পাচ্ছি।

তা দেখতে পাবে জ্যাক। পায়ের কাছে বড় কাঠের আলমারিতে মানুষ-সমান উঁচু আয়না ফিট করা। জ্যাক শুয়ে শুয়ে ওর সব দেখতে পায়। জ্যাক এবার কেমন স্বাভাবিক গলায় বলল, লেডি-অ্যালবাট্রস আবার জাহাজে ফিরে এসেছে শুনলাম।

ছোটবাবু জ্যাককে স্বাভাবিক গলায় কথা বলতে দেখে সামান্য আশ্বস্ত হল। বলল, এসেছে। তোমাকে কে বলল?

জ্যাক বলল, আমি ওর কান্না শুনতে পাই ছোটবাবু।

—তুমি ওর কান্না শুনতে পাও!

—মাঝ-রাতে সে আমার কেবিনের ওপর দিয়ে উড়ে যায়। আর কেমন একটা শব্দ, ঠিক যেন কান্নার মতো। তুমি শুনতে পাও না ছোটবাবু?

ছোটবাবু বলল, না। তারপর বলল, তুমি ঘুমোও না?

—আমার ঘুম আসছে না ছোটবাবু।

—এ-বয়সে ইনসমনিয়া খুব খারাপ। জাহাজ বাঁধলেই ভাল ডাক্তার দেখাবে।

জ্যাক উঠে বসার চেষ্টা করলে বলল, শুয়ে থাকো। ওঠার কি আবার দরকার!

জ্যাক কোন কথা শুনল না। বেশি সময় এখানে বসে থাকা ছোটবাবুর ঠিক না। বাবা শুতে যাবার আগে আর একবার আসবেন। অবশ্য দরজা বন্ধ থাকলে, সে ঘুমোচ্ছে ভেবে তাকে আর নাও ডাকতে পারেন। তিনি ওপরে উঠে যাবেন। কিন্তু ছোটবাবু তো এ-সব জানে না। বাবা টের পেয়ে গেছে, সে জাহাজে বড় হয়ে গেছে। যখন বড় হয়ে গেছে তখন আবার ওর কেবিনে ছোটবাবুর গলা পাওয়া যায় কেন? ছোটবাবু বিপদে পড়ে যেতে পারে। ছোটবাবুর যা স্বভাব, সে তো বারবার কেবল জোরে কথা বলতে চাইবে। চুপচাপ বসে থাকার মানুষ না

ছোটবাবু।

জ্যাক ভালভাবে দাঁড়াতে পারছে না। দাঁড়াতে কষ্ট হচ্ছে। এখন আবার বিছানা ছেড়ে ওঠার কি যে দরকার! সে বলল, আমি ধরব জ্যাক! তুমি কোথাও যাবে? বাথরুমে গেলে দরজা খুলে দিচ্ছি। আমি ধরছি তোমাকে। এস।

ছোটবাবু জ্যাকের কাছে গেলে প্রায় মাথাটা ছোটবাবুর কাঁধে এলিয়ে দিল। ভারি আরাম বোধ করছে জ্যাক। ওর দু'চোখ ফেটে জল আসছে। ছোটবাবু ওর চোখে জল দেখে ঘাবড়ে যেতে পারে। সে বেশ আলগাভাবে মুখটা ঘুরিয়ে আলমারির দরজা খুলে ফেলল। এবং কি খুঁজে বের করার মতো উবু হয়ে বসল।

ছোটবাবু বলল, আমাকে বল না, বের করে দিচ্ছি।

জ্যাক এবার মুখে কোনরকমে আঙ্গুল ঠেকিয়ে আস্তে কথা বলতে বলল ছোটবাবুকে। সে তারপর একটা প্যাকেট, আরে সেই প্যাকেটটা জ্যাক টেনে বের করছে। তারপর আলমারির দরজা বন্ধ করে বাংকে উঠে এল। এবং তাকাল ছোটবাবুর দিকে।—তোমাকে খুব জ্বালিয়েছি জাহাজে? না ছোটবাবু?

–সে তো জ্বালিয়েছ। তার জন্য আমি ভাবি না।

—আর তোমাকে জ্বালাচ্ছি না। বলে সে উঠে ওর কাছে গিয়ে বলল, তোমার স্যুট। এটা পরবে। আমি যখন চলে যাব, তখন তুমি ডেকে এ-পোশাকটা পরে দাঁড়িয়ে থাকবে। কেমন! মনে থাকবে তো!

ছোটবাবু অবাক! সে বলল, তুমি চলে যাচ্ছ? তোমার অসুখের জন্য কাপ্তান তোমাকে নামিয়ে দিচ্ছেন!

জ্যাক বলল, হ্যাঁ। আমার খুব একটা বড় অসুখ, মানুষের যেন এটা না হয় ছোটবাবু! জ্যাকের কথাবার্তা কেমন অভিজ্ঞ মানুষের মতো। এ-বয়সে জ্যাক এত বুঝতে পারে কি করে। সে বলল, কি অসুখ আমরা জানতে পারলাম না।

—কাপ্তানের ছেলের অসুখ। সবাই জানলে আর সে কাপ্তানের ছেলে হবে কেন ছোটবাবু।

ছোটবাবু বুঝতে পারল, সে সামান্য অনধিকারচর্চা করে ফেলেছে। সে বলল, তা ঠিক। তুমি বাড়ি পৌঁছে আমাকে চিঠি দেবে কিন্তু।

আর তখনই হাহাকার শব্দে জ্যাক কেমন ভেঙ্গে পড়ল। জ্যাক ছেলেমানুষের মতো কাঁদছে। ছোটবাবু কি যে করে! সে বলল, কি হয়েছে জ্যাক! এই জ্যাক—আহাঃ, কি হয়েছে বলবে তো? সে তাড়াতাড়ি কিছু বুঝতে না পেরে কাপ্তানকে ডাকতে যাবে ভাবল, আর তখন নিষ্ঠুর গলা জ্যাকের। সে বলল, ছোটবাবু তুমি এবারে যাও। আমি ঘুমোব। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে। কাউকে ডাকতে হবে না। আমি ভাল আছি। তুমি ভাল থেকো। সাবধানে থেকো।

আর ছোটবাবু তখন কি করে। সে দ্রুত নেমে এল সিঁড়ি ধরে। শেষের কথাগুলো কেমন ভয়ের। ওকে জ্যাক সাবধানে থাকতে বলেছে। জাহাজে এবার কি কোন গণ্ডগোল আরম্ভ হবে। জাহাজে কি কোন বিদ্রোহ দেখা দেবে। জাহাজিরা এতদিন একনাগাড়ে জাহাজ চালিয়ে ক্লান্ত। দেশে ফেরার জন্য সবাই ক্ষেপে যাচ্ছে। জাহাজ হয়তো আর দেশের মুখে পাড়ি দিচ্ছে না। যা স্বাভাব এই জাহাজের, হয়তো সারামাসকাল দক্ষিণ সমুদ্রেই পড়ে থাকবে। ডেবিড ওকে তবে মিথ্যে বলেনি।

ঘুম এল না ছোটবাবুর। সে শুয়ে শুয়ে এ-পাশ ওপাশ করল, জ্যাকের কি যে চোখমুখ হয়েছে! এমন সুন্দর ছেলেটা ক'দিনে কি হয়ে গেছে! চেনাই যায় না। সে পোর্ট-হোল খুলে রেখেছে। বাইরে জ্যোৎস্না। প্রপেলারের শব্দ ভেসে আসছে। জল কেটে এত সব নির্যাতনের ভেতরও জাহাজ ঠিক যাচ্ছে। ওর ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসল এবার। বারোটার ওয়াচ শেষ

হয়েছে। শেষ ঘণ্টি থেকে সে তা টের পেয়েছিল।

ভোররাতে ডেবিড ছোটবাবুকে ডেকে সাড়া পেল না। অন্য সময় দু-তিন ডাকেই সে সাড়া দেয়। আজ আবার ডেকেও যখন সাড়া পেল না, তখন ডেবিডের মনে হয়েছিল ঘুমোক ছেলেটা।

এবং সকালে কে জানত, মাস্তুলের ওপরে পাখিটারও ঘুম ভাঙবে না। ঠোঁট গুঁজে সে-ও ঘুমিয়ে ছিল, সে তো জানত, ছোটবাবু রোজকার মতো মাস্তুলের নিচে এসে ওর ঘুম ভাঙ্গিয়ে দেবে। ছোটবাবু হাতে তালি না বাজালে ওর সকাল হয় না।

এবং তখনই খবর ছোটবাবুর কেবিনে, শিগগির ছোট, অমিয় এসে ওর দরজায় ধাক্কাচ্ছে। ওপরে গিয়ে দ্যাখ কি হচ্ছে!

ছোটবাবু লাফিয়ে দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজা খুলে বলল, কি হয়েছে?

মেজ-মিস্ত্রি বন্দুক নিয়ে ওপরে উঠে গেছে। পাখিটাকে হয়তো মারবে।

ছোটবাবুর তখন দিক-বিদিক জ্ঞান ছিল না। একেবারে পাগলের মতো। জ্যাকের কেবিন পার হতেই দেখল আর্চি ক্রলিং করছে বোট-ডেকে। সে বন্দুক নিয়ে বোটের নিচে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। পাখিটা বুঝতেই পারছে না, কেউ তাকে হত্যা করার জন্য আড়ালে এগিয়ে আসছে। ছোটবাবু এবারে সবকিছু অগ্রাহ্য করে আর্চির ওপর লাফিয়ে পড়ল। গুলি ছোড়ার মুখে বন্দুকের নল ঘুরিয়ে দিল। হয়তো বন্দুকের বাঁট দিয়ে মাথায় আর্চি বাড়ি বসিতে দিত, কিন্তু তখন ক্ষমাপ্রার্থনার ভঙ্গীতে ছোটবাবু বলছে, সি'জ দ্য ওনলি ওম্যান ইন দ্য সিপ, স্যার।

তারপর সে বলল, এ্যাণ্ড টু মোর ডেজ টু হ্যাভ দ্য পোর্ট এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্চির ভয়ংকর নিষ্ঠুর মুখ দেখে সে কেমন ঘাবড়ে গেল। বলল, প্লিজ একস্‌কিউজ মি স্যার!

মেজ-মিস্ত্রি আর্চি সোজা নেমে গেল। লেডি-অ্যালবাট্রস আবার উড়ছে। উড়ে উড়ে দিগন্তের দিকে চলে যাচ্ছে। বন্দুকের আওয়াজে যে যেখানে ছিল উঠে এসেছিল। ওরা দেখছে ছোটবাবু চুপচাপ একা দাঁড়িয়ে আছে বোট-ডেকে। মেজ-মিস্ত্রি বন্দুক হাতে নেমে যাচ্ছে। পিঠ কুঁজো মানুষটা কেন যে এত ফুঁসছে।

আর তখন কি যে হয়ে যায়—সেই শব্দতরঙ্গ, অথবা বলা যেতে পারে ঘণ্টাধ্বনি ছোটবাবুর মাথার ভেতর কেউ ঢং-ঢং করে বাজাচ্ছে—যেন সমুদ্রের গভীরে ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে, যেন আকাশে-বাতাসে এবং সমুদ্রের সব তরঙ্গমালায় সেই ঘণ্টাধ্বনি—তাকে সতর্ক হতে বলছে। অথচ ছোটবাবু কি বুঝতে পারে না, মাথার ভেতর ও-ভাবে কে তার ঘণ্টাধ্বনি করতে থাকে, কোন সে সন্ন্যাসী—সে তখন কেবল দেখতে পায়, এক জলদস্যুর পোশাকে তার সামনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। মুখে তার মুখোস। বাঘের মুখোশ পরে সেই জলদস্যু বোট-ডেকে হাঁটছে। তারপরই কেন যে সেই মখোশ সে দেখতে পেল আর্চির মুখে। মুখে ডোরাকাটা সব কালো কালো দাগ, চোখের পাশে, গোঁফের নিচে। হিংস্র মুখ আর্চির।

তার সঙ্গে আর্চি একটা কথা বলল না। আর্চির অহংকারী মুখ দেখে সে বুঝতে পেরেছে, আর্চি তাকে ক্ষমা করেনি। এবং পরদিন সকালে জাহাজ বন্দর পেলে সে সেটা ঠিক টের পেল। তখন সে উইনচে কাজ করবে বলে ডেকে হেঁটে যাচ্ছিল, মনে হল পেছনে কেউ ডাকছে—ম্যান ওদিকে নয়। এদিকে। ভীষণ অসহিষ্ণু গলা এবং দাম্ভিকতার যেন শেষ নেই। পেছনে তাকাতেই দেখল, আর্চি এলি-ওয়ের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। সিগারেট খাচ্ছে। আর্চির চোখদুটো বাঘের মতো জ্বলছে।

এতদিনে টের পেল ছোটবাবু, আসলে আর্চির মুখটা জিরাফের মতো হয়ে যায়নি। আর্চির মুখটা বাঘের মতো হয়ে গেছে। হিংস্র বাঘকে মানুষ অনায়াসে হত্যা করতে পারে। এবং তখনই ওর মনে হল, মাথার ভেতরে অথবা মগজের সব শিরা-উপশিরায় কেউ আর ঘণ্টাধ্বনি করছে না। সব ঠিকঠাক। বন্দরে জাহাজ বাঁধাছাদা শেষ।

সে নেমে যেতে থাকল।

॥ ত্রিশ ॥

মৈত্র জাহাজ বাঁধলেই সিঁড়ি ধরে নেমে গেল। সে যেন প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে হাঁটছে। কোথাও একজন ডাক্তারের সঙ্গে তার এক্ষুনি দেখা করা দরকার। ট্যাবলেটে কাজ হচ্ছে না। জ্বালা-যন্ত্রণা কমে গেছিল, মনে হয়েছিল সেরে যাবে। কিন্তু দুরাত থেকে আবার জ্বলছে। দু'রাত সে চোখ এক করতে পারেনি। মনে হচ্ছে ভেতরের সব রক্তে বিজবিজ করছে পোকা। এবং জ্বালায় অসহ্য যখন, সে নিজের ফোকসালে বসে বসে চুল ছিঁড়ছে। অমিয়কে একবারও ডেকে তোলেনি। ওয়াচের সময় দাঁত কামড়ে কাজ করেছে। এমন কি শেফালীর চিঠি আসার কথা। এজেন্ট-অফিস থেকে লোক এসেছে। সারেঙ চিঠি আনতে গেছে। একটু অপেক্ষা করলেই সে চিঠিটা দেখে যেতে পারত কিন্তু মনে হয়েছে একদণ্ড দেরি করলে সে মরে যাবে। রক্তের ভেতরে পর পর সুঁই না ফোটালে সে আর বাঁচবে না।

তখন একটা লোক কিনারায় দাঁড়িয়ে আছে। ঝুড়িতে সব গোলাপের গুচ্ছ। মৈত্র নেমে গেলে সে উঠে এল। সে এখন ডাইনিং হলে ফুল দিয়ে যাবে। সব দামী দামী ফুল। লাল সাদা গোলাপ। সবুজ রঙের অন্য সব কি ফুল। লোকটা ফুল বেচে খায়। সে জেনে ফেলেছে—আজ এ জাহাজে একটা উৎসব হবে। লাঞ্চে সবাই তাজা সুস্বাদু খাবার খেতে পাবে। চিফ-কুকের গ্যালিতে জাহাজ বাঁধা-ছাদার সঙ্গে শূকরছানা চলে এসেছে। তাছাড়া একেবারে এখনই কিলখানা থেকে আনানো। বড় টার্কি। ছোট ছোট মুরগীর ছানা, আর ডিম এবং ফলের রস। লোকটা শুধু স্টুয়ার্ডকে ডাইনিং হলের জন্য ফুল দিয়ে -গেল না। প্রত্যেক কেবিনে ফুল দিয়ে গেল।

কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। সবই কাপ্তানের মর্জি মতো হচ্ছে। স্টুয়ার্ড আদেশমতো কাজ করে যাচ্ছে। চিফ-কুক মেনু-মাফিক কাজকাম করবে ভেবেছিল, কিন্তু সবই কেমন গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। স্টোররুম থেকে কিছুই আসছে না। সব সদ্য বাজার থেকে কিনে আনা হচ্ছে। এবং যেন কোন উৎসবের আয়োজন হচ্ছে এ জাহাজে। কেক বানাবার জন্য দামী মসলাপাতি। দু'রকমের পুডিং। নিত্য যা খায় অফিসার মানুষেরা আজকের খাবার একেবারে আলাদা। ভেড়ার বাচ্চা শূকরছানা আস্ত, সব আস্ত রোস্ট—বড় বড় রেকাবীতে সাজানো থাকবে—টমাটো স্লাইস। স্যালাড একেবারে তাজা সব ফলের আর কি মনোহারিণী ভোজের তালিকা। চিফ-কুকের জিভে জল এসে যাবার মতো।

জ্যাক চুপচাপ কেবিনে বসেছিল। ও পরেছে প্রায় বেলবটমের মতো পোশাক। সে নীল রঙের প্যান্ট এবং দামী সিল্কের ফুল পাখি আঁকা সার্ট পরেছে। পায়ে হাল্কা সু। এবং চুপচাপ বাবাকে দেখছে।

হিগিনস মেয়ের পাশে বসে ওর বাকসো গুছিয়ে দিচ্ছেন। আর সব কথাবার্তা—এই যেমন বাড়ি ফিরে বাগানের যত্ন ঠিক হচ্ছে কিনা দেখা এবং পিসিমাকে ভালবাসতে হবে। দরকার হলে গ্রীষ্মের ছুটিতে কনটিনেন্ট ঘুরে আসতে পারে। ব্ল্যাক ফরেস্টে পিকনিক এবং প্যারিসের কোনো মিউজিয়ামে ঘুরে ঘুরে ছবি আঁকা ইচ্ছে করলে শিখতে পারে। ওর বন্ধু হামবোল্ট বাতিঘরে যখন আছে কিছু ভাল না লাগলে ছোট মোটর বোটে বিকেলে সেই পাহাড়ী দ্বীপে চলে যেতে পারে। বেশ ভাল লাগবে। ছোট ছোট সব কচ্ছপ দেখতে পাবে, আর সে গাছপালার ভেতর থেকে তখন দেখবে দূরে সব জাহাজ ভেসে যাচ্ছে, তখন সে তার বাবার কথা মনে করতে পারবে। আর ক'দিন। সে গুনে গুনে একবছর পার করে দিতে পারবে সহজেই। মানুষের জীবনে একটা বছর তেমন বড় নয়। হিগিনস মেয়েকে কাজের ফাঁকে ফাঁকে এসব বোঝাচ্ছিলেন।

তখন আর্চি বলল, ম্যান এখানে!

ছোটবাবু দেখল, আর্চি টর্চ মেরে বয়লারের পেটের নিচে ঢুকে যেতে বলছে। সে ঠিক টর্চের আলোর শেষ প্রান্তে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল।

—ম্যান দ্যাখো ওখানে ট্যাংক-টপের একটা ঘুলঘুলি আছে।

ছোটবাবু দেখল শুধু স্তূপীকৃত ছাই। প্রায় ফুটের ওপর এই ছাই ক্রমান্বয় পড়ে পড়ে কাদার মতো হয়ে আছে। এবং তিনটে বয়লারের পেটের নিচে এভাবে প্রায় একটা সমতলভূমি হয়ে গেছে। কখনও এনজিনের নিচে, কখনও পোর্টসাইডের বয়লারের পাশে, কখনও ঠিক জেনারেটরের পাশে প্লেট তুলে ফেললে একটা ঘুলঘুলি পাওয়া যায়। এসব ঘুলঘুলি দিয়ে ঢুকে গেলেই কোনো না কোনো বিলজ্ পাওয়া যায়। জল রাখার সব আধার। কিন্তু সে এমন একটা জায়গায় কখনও নামেনি। সে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকছে, নাকে মুখে ছাই লাগছে। সামান্য সোজা হলেই বয়লারের পেটে ঠাস করে মাথা লেগে যাচ্ছে। হামাগুড়ি না দিলে এদিক ওদিক ঠোক্কর খাচ্ছে। অন্তত সে যাতে জখম না হয়, তার জন্য খুব সন্তর্পণে এগিয়ে গেলে মনে হল দাঁত শক্ত করে আর্চি উচ্চারণ করছে—হেল। 'হেল' শব্দটি আর্চির ঠোঁটের ডগায় থাকে। হেল না বলতে পারলে সে যেন ঠিক কাজ করাতে পারে না। ছোটবাবু ঠিক জায়গায় ঢুকে সোজা হয়ে বসতে চাইল। পারল না। ঘাড় বাঁকিয়ে প্রায় হাঁটুর কাছে মাথা এনে বসে থাকল। আর্চি উঁকি দিয়ে দেখছে ছোটবাবুকে। ওর হাতে লোহার জালিতে রাবারে মোড়া বালব। সে সেটা ছোটবাবুর মুখের সামনে দোলাচ্ছে।

ছোটবাবু বলল, শুধু ছাই স্যার।

—সাফ করতে হবে ম্যান। সাফ করে দ্যাখো আছে।

এতবড় জায়গায় ছাই তুলতেই বারোটা বেজে যাবে। তারপর কি কাজ আছে বিল্‌জে সে জানে না। ওর দু'পা ক্রমে ছাইয়ের ভেতর বসে যাচ্ছে। বসে যাওয়ায় সামান্য সুবিধা সে পেয়েছে। মাথাটা সামান্য সে তুলতে পারছে। একটা টিনের হাতল এবং বালতি গড়িয়ে দিচ্ছে আর্চি। ওগুলো পরিষ্কার হলে—বাকি কাজের কথা বলবে।

আর একজন হলে কাজটা অনেক সহজে করা যেত। সে ভরে দিত, কেউ তুলে নিয়ে গেলে আর কষ্ট হত না। সে বারবার সন্তর্পণে যখন বালতি টেনে বাইরে বের হয়ে আসছে তখন কোথাও না কোথাও টুটা-ফাটা অ্যাজবেস্টরে লেগে হাত-পা মুখ কেটে যাচ্ছে। আর জ্বালা করছে এভাবে। সে তবু খুব যত্নের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছিল। এবং শরীরে শক্তি পাচ্ছে না। নুয়ে থাকার দরুণ ঘাড় কোমর ধরে যাচ্ছে। ওপাশে আছে একজন ফায়ারম্যান। সে বুঝতেই পারছে না, বয়লারের পেটের নিচে ঠিক ট্যাংক-টপের ওপরে বসে কেউ কাজ করছে। বালতি বালতি ছাই ওপরে জমা করে রাখছে ছোটবাবু। তারপর যখন আর পারছে না চিৎ হয়ে শুয়ে থাকছে ছাইগাদায়। এবং কখন এগারোটা বাজবে, ঠিক এগারোটা বাজলেই ছুটি, সে স্নান করবে, লাঞ্চে যাবে, আজ আবার সে শুনেছে, জ্যাক চলে যাবে বলে, জ্যাকের সম্মানে ডাইনিং হলে ভোজ দিচ্ছেন কাপ্তান। সে যখন গ্যালির পাশ দিয়ে আসছিল তখন অতি উপাদেয় সব সুস্বাদু খাবারের ঘ্রাণ পেয়েছে। যেন সে যে এখানে এখন লম্বা হয়ে শুয়ে আছে, এখানেও সেই ঘ্রাণ, এবং জোরে নাক টানলে সে ঠিক ঠিক টের পাচ্ছে। আর তখনই মনে হল সেই ঘুলঘুলি, সে আবিষ্কার করে ফেলেছে। নাট-বোল্টে মোড়া। প্রায় ডিম্বাকৃতি ঢাকনা।

আর্চি তখন তার টর্চ দুলিয়ে নেমে আসছে।

সে নিচ থেকে দেখতে পাচ্ছে সিঁড়িতে আর্চির পা। আর্চি বাদে আর কে হবে! এনজিন-রুমে এখন কোনো কাজ নেই। টুকিটাকি কাজ কিছু ওপরে আছে। সিলিণ্ডারের কাছে, যেখানে সার্কুলেটিং ফ্যান সিলিন্ডারের মাথার ওপর রয়েছে, সেখানে থার্ড-এনজিনিয়ার মেরামতের কাজ করছে। গোটা এনজিন- রুম ফাঁকা। বন্দরে প্রথম দিন বলে, কোনো কোলবয় অথবা ফায়ারম্যান এনজিন-রুমে মাজা-ঘসার কাজ করতে আসেনি।

আর্চিকে নেমে আসতে দেখে ভীষণ কাজে মনোযোগী হয়ে গেল ছোট। সে আর লম্বা হয়ে শুয়ে নেই। খুটখাট কাজ করছে।

তখন আর্চি বলল, ম্যান ওপেন ইট। বলে সে একটা নাইন-সিকস্টিনথ স্প্যানার ছুঁড়ে দিল।

এগারোটার ঘণ্টা পড়ে গেছে। সুতরাং এখন আর কিছু করতে হবে না। আবার লাঞ্চের পর এসে নামবে। তখন আর্চি বলল, ম্যান ওপেন ইট। ম্যান নেমে যাও। বিল্জ-পাম্প কাজ করছে না। নিচে নেমে ডানদিকে ঢুকে একেবারে পোর্ট-সাইডের কিনারায় চলে যাবে।

পেটে ভীষণ খিদে। তবু সে দাঁত শক্ত করে স্প্যানার নাটে বসিয়ে দিল। নাট খুলবে কেন! সেই কত যুগ আগে জাহাজ নির্মাণের সময় যে মুখ বন্ধ করা হয়েছিল বোধ হয় তারপর কেউ আর খোলেনি। নোনা জলে নাট-বোল্ট জাম হয়ে গেছে। জং ধরে এমন হয়েছে যে সে কিছুতেই কিছু করতে পারছে না। নাট-বোল্ট একটা দুটো নয়, চারপাশে ডিমের মতো আকারের ঢাকনার সর্বত্র এই সব নাট-বোল্ট। সে চিজেল আর হাতুড়ী না হলে একটাও খুলতে পারবে না। এবং এত ক্ষিদে পেটে যে এসব কাজ করলে ওর শরীরের সব রক্ত, পেটে কিছু না পড়লে হিম হয়ে আসবে।

সে বলল, একটা চিজেল স্যার।

সেকেণ্ড একটা চিজেল ছুঁড়ে দিল। এত জোরে দিয়েছিল যে সে যদি লুফে না নিতে পারত তবে কপালে এসে পড়ত। আর্চি কি ইচ্ছে করে এমনভাবে ঢিল মেরেছে! সে তো কত সামান্য ওর কাছে। আর্চি সহজেই তাকে অপমান করতে পারে। মা-মাসি তুলে গালাগাল করতে পারে। কপালে চিজেল ছুঁড়ে ওর কি লাভ!

আর্চি বলল,ম্যান কাজ না সেরে ওপরে উঠবে না। বলে সে চলে গেল।

ছোটবাবু শুনল ঢং ঢং করে বারোটা বাজছে। সে গোটা চারেক নাট কেটে কেটে খুলেছে। সে ঘেমে নেয়ে গেছে। ওর সাদা বয়লার স্যুট এখন আর সাদা নেই। জল-কাদায় মাখা সারা বয়লার স্যুট, হাতে, মুখে, মাথায় সর্বত্র, তেল চিটচিটে রং ধরেছে। এবং সে জানে সবাই স্নান করে ডাইনিং হলের দিকে হাঁটছে। এমন একটা সুন্দর ভোজে সে থাকবে না। সবাই গল্পগুজব করে খাবে—সে থাকবে না।

সে নামার আগে দেখেছে ডাইনিং হলটা আজ একেবারে নতুন করে সাজানো হয়েছে। প্রত্যেকের টেবিলে দামী গোলাপের গুচ্ছ। সবাই দামী পোশাকে একেবারে পরিপাটি মানুষের মতো খেতে যাবে। সে তখন কাজ করছে নিচে। জ্যাকের বিদায়-উৎসবে সে থাকবে না। ওর কেমন চোখ ফেটে জল আসতে থাকল। জ্যাক চারটায় জাহাজ থেকে নেমে যাবে। যা কাজ কি মর্জি আর্চির কে জানে, তাকে আর ওপরে উঠতে দেবে কিনা এখন এবং সে যদি না খেয়ে থাকে একমাত্র ডেবিড খোঁজ নেবে। কাপ্তান লক্ষ্য করতে নাও পারেন—ওর মন ভাল নেই! ছেলেটাই একমাত্র সম্বল, তাকে পাঠিয়ে দিতে হচ্ছে—বোধহয় জ্যাক আবার কি বিপদে ফেলে দেবে কাপ্তানকে সেই ভয়ে আর না পাঠিয়ে থাকতে পারছেন না। সে আর একটা নাট কেটে ফেলার জন্য নুয়ে খুব জোরে যেই না হাতুড়ির ঘা বসাতে গেছে—অমনি ফসকে একেবারে বুড়ো আঙুলের ওপর। গোটা হাতটা মনে হচ্ছিল অবশ হয়ে আসছে। কেউ নেই। সে আঙুল ধরে বসে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর রাগে দুঃখে দমাদম বকসে হাতুড়ি দিয়ে মারতে থাকল। যেন তার এত দিনের ক্ষোভ এই মুহূর্তে আগুনের ফুলকির মতো চারপাশে ছিটকে পড়ছে।

জ্যাক সবচেয়ে রঙ্গীন পোশাক পরতে পারত আজ। সবচেয়ে জমকালো পোশাক। কিন্তু তার কিছুই ভাল লাগছে না বলে যেমন সে অন্যদিন পোশাক পরে থাকে আজও তেমনি সাদাসিদে পোশাকে দরজার বাইরে এসে দাঁড়াল। হিগিনস মেয়ের দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন বনি ভীষণ সহজভাবে সামনে দাঁড়িয়ে আছে। ভেতরের রিক্ততা বাবা টের পাক সে চায় না।

বনি বলল, চল বাবা।

সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে দেখল, অন্য সবাই ওদের জন্য প্রতীক্ষা করছে। প্রায় প্যারেডের মতো আগে হিগিনস পরে জ্যাক তারপর চিফ-মেট, আর্চি, থার্ড এনজিনিয়ার, ডেবিড এবং

ক্রমে লাইন বেঁধে হেঁটে হেঁটে সবাই যাচ্ছিল তখন মাত্র একজন নেই। ছোটবাবুকে না দেখে জ্যাক মনে মনে যে ভীষণ ভেঙ্গে পড়ছে—কাউকে বুঝতেই দিচ্ছে না। ছোটবাবু বলে জাহাজে কেউ আছে সে যেন জানে না। এত বেশি হাসি খুশি এবং এমন মেজাজ শরিফ মনেই হয় না সে একমাত্র একজনের জন্য এত সব করেছিল!

স্টুয়ার্ড, কাপ্তান-বয়, মেস-রুম বয় এবং অন্য বয়-বাবুর্চিরা ঝকমকে পোষাকে যাওয়া-আসা করছে। রেডিওগ্রামে বাজনা বাজছে। নীল আলো এবং বর্ণমালা সব কাগজের ফুলের। যেন একটা ক্রীসমাস উৎসব এই জাহাজে। তখন জাহাজের তলায় কেউ রাগে ক্ষোভে দমাদম বয়লারের পেটে ঘা মারছে বোঝাই যাচ্ছে না।

কাপ্তান নিজে দাঁড়িয়ে সবাইকে বসতে অনুরোধ করলেন। একটা মাত্র আসন এক কোনায় খালি থাকছে। মনে হল একজন আসে নি। সে না এলে তিনি যেন বসতে পারেন না। চিফমেটও দেখল ছোটবাবুর আসন খালি। তিনি ডেবিডের দিকে তাকালেন। এটা ভীষণ বেয়াদপী ছোটাবাবুর —সময়- জ্ঞান ছেলেটার ভীষণ কম। কাপ্তান অপেক্ষা করছেন এবং চিফ-মেট নিজে দরজার বাইরে এসে এলি- ওয়েতে লক্ষ্য রাখছেন—ডেবিড বুঝতে পেরে বলল, স্যার, ছোটবাবু তো কেবিনে নেই। দু'বার খোঁজ করেছি। সে যে কোথায় বুঝতে পারছি না।

আর্চি চুরি করে তখন জ্যাককে দেখছে। জ্যাক, আর্চি এবং অন্য সবাই দাঁড়িয়ে আছে। হিগিনস না বসলে ওরা কেউ বসতে পারছে না। আর্চি শেষ পর্যন্ত যেন কৈফিয়ত দেবার মতো বলল, ছ- নম্বর নিচে আছে স্যার। ব্রিজে জল উঠে আসছে। পাম্প কাজ করছে না। সারভিস পাম্প চালিয়ে দেখা হয়েছে। কেবল হাওয়া টানছে।

হিগিনিস জানেন এনজিনের জরুরী সব কাজের দায়িত্ব এখন আর্চির। এনজিনের ভাল মন্দ সব ওর জিন্মায়। সুতরাং তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না। তারপর চড়া সুরে বাজনা বাজতে থাকল। টেবিলে সাজানো সব রঙ-বেরঙের খাবার। আস্ত চিকেন টার্কি এবং ভেড়ার বাচ্চার রোস্ট—দামী মদ।

হিগিনস দাঁড়িয়ে ছোটখাটো একটা বক্তৃতা করছেন। জ্যাক চলে যাবে বলে মন খারাপ বুঝতে দিচ্ছেন না। জ্যাক চুপচাপ মাথা নিচু করে শুনে যাচ্ছিল। বাবা সবই বাইবেল থেকে যেন পড়ে শোনাচ্ছেন। মানুষের ইতিহাস, বিশেষ করে সমুদ্রে মানুষ কত অসহায় এ-সব বলছিলেন। যেন তিনি বক্তৃতা শেষ করে বলতে চাইলেন—যতক্ষণ বেঁচে থাকো ঈশ্বরের পৃথিবীতে—খাও দাও, কাজ করো। আর আনন্দ করো। মানুষ এ-ভাবেই তার জীবন শেষ করে দেয়।

জ্যাক ভেতরে ভেতরে হাহাকারে ভুগছে। এতসব জাঁকজমকের ভেতর ছোটবাবু নেই। আর্চি তাকে বন্দী করে রেখেছে জাহাজের তলায়। ছোটবাবু খেতে খুব ভালবাসে। সে দেখেছে ছোট ভাল খাবার পেলে ভীষণ খুশী হয়ে খায়। ছেলেমানুষের মতো কোনটা আগে খাবে ঠিক করতে পারে না। কখনও কখনও দেখেছে ছোটবাবু টেবিলের নিয়মকানুন ভেঙ্গে নিজের খুশিমতো খেয়ে উঠে গেছে। কতদিন দেখেছে, ডেবিড এই নিয়ে পেছনে লেগেছে, ছোটবাবুকে এত করেও টেবিল ম্যানার্স শেখাতে পারেনি। আসলে ছোটবাবু খাবার লোভে পড়ে গেলে কাঁটা চামচের ব্যবহার একেবারে ভুলে যায়। সেই প্রাচীন মানুষের মতো দু'হাতে নিয়ে আকণ্ঠ পান করে। জ্যাক যত এ-সব মনে করতে পারছে তত হাহাকারে ভুগছে। সে একটা কথাও বলতে পারছে না কারোর সঙ্গে।

কিন্তু কথা না বললে তো চলবে না। বাবা এইমাত্র তাঁর বক্তৃতামালা শেষ করেছেন। এবার তাকে দুটো একটা কথা বলতে হবে। সে জাহাজের কেউ নয়, কেবল বাবার সঙ্গে সে জাহাজে উঠে এসেছে। এত বড় লম্বা সফরে সে এত বেশি বড় হয়ে গেছে, যে আর বড় না হলেও চলবে। সে বেঁচে থাকার সবচেয়ে বড় রহস্যের কথা এখানেই জানতে পেরেছে। সে তার বক্তৃতামালায় এ-সবই বলতে পারত। কিন্তু সে উঠে দাঁড়ালে বুঝতে পারল, মাথা ভীষণ

ঝিম ঝিম করছে। কেমন অন্ধকার দেখছে চোখে-মুখে

সে চোখ বুজেই যেন কোনরকমে সব রকমের দুঃখ হতাশা হজম করে শক্ত গলায় বলল, জাহাজে অনেকদিন আপনাদের সঙ্গে ছিলাম। এবারে চলে যাচ্ছি। যদি সামান্য দোষ-ত্রুটি কোথাও আমার আপনাদের চোখে পড়ে থাকে আশা করি ক্ষমা করবেন। বলেই সে একেবারে সোজা বসে পড়ল। আর একটা কথাও সে যে বলতে পারত না, বলতে গেলে একটা কেলেঙ্কারী করে ফেলত, এবং ধরা পড়ে যেত, এটা সে বসে পড়েই বুঝতে পেরেছিল।

তখন রিনরিন করে বাজনা বাজছে। স্টুয়ার্ড দরজার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। তার সার্ভিস দেখে মনে হচ্ছে কাপ্তান ভীষণ খুশী। কোথাও কোনো ত্রুটি রাখেনি সে। কিন্তু সে দেখল, কাপ্তান আবার উঠে দাঁড়িয়েছেন। খাবার আগে সামান্য সময় ঈশ্বরের নামে মাথা নিচু করে রাখলেন। ওঁর দেখাদেখি সবাই মাথা নিচু করে রাখল। তারপর তিনি সবার দিকে তাকিয়ে কি দেখলেন শেষে বললেন, কিছু খবর আপনাদের জানা দরকার মনে করছি। আমাদের জাহাজ এখন এক বছরের মতো সাউথ-সিতে ঘোরাফেরা করবে। আমরা মাটি টানার কাজে সেই-সব দ্বীপগুলোতে ফের চলে যাব।

সেইসব দ্বীপগুলো বলতে ওরা বুঝতে পারছে কোন সব দ্বীপ। কাপ্তান আর কিছু ভেঙ্গে বলবেন না ওরা বুঝতে পারছে। এমন একটা সময়ে এ-সব খবর দিচ্ছেন কেন কাপ্তান—ওরা বুঝতে পারছে না, এমন সব দামী খাবার টেবিলে, খাবার থেকে ধোঁয়া উঠছে—চারপাশের সবকিছু যখন ভীষণ মনোরম তখন তিনি কেন যে একটা এমন দুঃসংবাদ দিচ্ছেন। কারণ এটা দুঃসংবাদই বটে। ভাঙ্গা জাহাজে আরও এভাবে এক বছর ঘুরলে নির্ঘাত কেউ আর দেশে ফিরতে পারবে না।

কারণ এদের সবার জানা আছে, বড় বড় বন্দরে জাহাজ যায় না। ছোট ছোট বন্দরে কেউ খবর রাখে না—কি আছে জাহাজের কি নেই। বেশ যখন আছে, পত পত করে কার্সি ফ্ল্যাগ উড়ছে, তখন উড়তে দাও। বড় বড় বন্দরে সে-সব চলবে না। সার্ভে থেকে গণ্ডগোল বাধাবে। এবং কাপ্তান সব জেনে-শুনে এতগুলো জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। সামান্য ছোটখাটো মেরামত চলবে—বড় ধরনের মেরামত—যেমন এক্ষুনি আর্চি চিৎকার করে বলতে পারে—স্যার বয়লার চকের অবস্থা ভীষণ খারাপ। বয়লার-চক মেরামত করতে হলে ঠিক বড় বন্দরে দু-তিন মাস জাহাজ বসিয়ে দিতে হবে। এবং যখন সার্ভে থেকে লোক এসে দেখবে—ঠুকে ঠুকে দেখবে—বলবে, আরে এতো আর জাহাজ নেই মরে কবে ভূত হয়ে গেছে তখন কোম্পানীর ঘরে আর্চির নাম অনেক পেছনে চলে যাবে। সুতরাং সবাই এখন মুখ বুজে সব শুনে যাচ্ছে। কোনো প্রতিবাদ করতে পারছে না।

তারপর কাপ্তান সবাইকে বললেন, আপনারা বসুন। এবং কোনো শ্রেণীকক্ষে যেন তিনি দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছেন—এই যে জাহাজ সিউল- ব্যাংক—এতদিনের সফরে আপনারা তাকে আর নাও ভালবাসতে পারেন। দেশে ফেরার জন্য আপনারা এখন সবাই উদগ্রীব বুঝতে পারি—কিন্তু কোম্পানীর ক্ষতি হোক আমরা কিছুতেই চাই না। এতে আমাদের সুবিধা হবে না। আমরা যখন খেটে খাওয়া লোক—কোম্পানীর ভালমন্দের ওপর আমাদের জীবন, তখন আশা করি চোখ বুজে আমরা ঠিক সমুদ্রে একটা বছর কাটিয়ে দিতে পারব। বলেই তিনি কি ভাবলেন, মেয়েকে দেখলেন। জ্যাক একপাশে দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারছে না, বাবা এখন এ-সব কথা বলছেন কেন। সে দেখল, তখন বাবা আবার বলে যাচ্ছেন—

স্যালি হিগিনস গীর্জার পাদ্রীর মতো গাঢ় গলায় বললেন, জাহাজ এবং সমুদ্র সম্পর্কে কিছু কথা আপনাদের খুলে বলতে চাই। তিনি একটু নুয়ে এবার টেবিলের ওপর ঝুঁকে দাঁড়ালেন, কাঁধে ওর সোনালী স্ট্রাইপগুলো খুব ঝক ঝক করছে। নীল রঙের স্যুট এবং মাথায় টুপি থাকলে পুরোপুরি ইউনিফরমে থাকতেন। তিনি মাথায় একবার হাত বুলালেন এবং যেমন দাঁত ঠেলে ওপরে তুলে দেন তেমনি দিয়ে কথাবার্তা শুরু করার সময় বললেন, জাহাজ সিউল-ব্যাংক আর দশটা জাহাজের মতো নয়। সবার ভেতরে একটা গুঞ্জন উঠছে। কেউ অবশ্য

জোরে প্রতিবাদ করতে পারছে না। যেন বলার ইচ্ছে, আমরা বার বার এক কথা শুনতে চাই না।

তিনি বললেন, সিউল-ব্যাংক গেটস হার পোর্ট ইন টাইম।

তিনি বললেন, বেশ জোর দিয়ে বললেন, ভেরি ফেথফুল। ভেরি ভেরি ফেথফুল সি ইজ। সবাই বুঝতে পারল কাপ্তান সিউল-ব্যাংকের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে বলছেন।

তিনি বললেন, এটা আমার বিশ্বাস, যতই সে মরে ভূত হয়ে যাক আপনারা জানেন, সামান্য থেমে তিনি একটু মুচকি হেসে বললেন, সার্ভে থেকে আমাদের জাহাজটার অস্তিত্ব অনেক ক' বছর আগেই বেমালুন ধুয়ে মুছে গেছে। আপনাদের কে ছিল সেই উনিশশো সাতচল্লিশে, কেউ ছিলেন আপনারা? ডেবিড উঠে বলল, আমি ছিলাম স্যার।

তিনি বললেন, মনে আছে ইস্টার আয়ল্যাণ্ডের কাছে ভীষণ নিম্নচাপের ভেতর পড়ে গেছিলাম। সেই ঘূর্ণিঝড়ের কথা তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে ডেবিড, পানামা থেকে চারটা জাহাজ, পর পর, সব আধুনিক জাহাজ—তোমার তো মনে আছে ডেবিড, আমরা প্রায় একই লংগিচুড, ল্যাটিচুডে রান করছি—তিনটে জাহাজের একটাও পার পায়নি, কারও ব্রীজ উড়িয়ে নিয়েছে, একটা জাহাজ তো ডুবেই গেল—কি অন্ধকার আর বজ্রপাত, বোধহয় এনজিনে বজ্রপাতেই জাহাজটা ডুবেছিল—আর কি হতে পারে, আমরা তো ঘণ্টা তিনেকের ভেতর পৌঁছে দেখলাম পৃথিবী কালো করে সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা। সমুদ্রের রং সাদা এবং কুয়াশার মতো দিকচক্রবাল—কুটোগাছটি খুঁজে পাইনি—বাট দ্য সিপ এস এস সিউল-ব্যাংক মুভস অন।

তারপরই কিছুটা নাটকীয় ভঙ্গীতে বললেন, তথাপি এই জহাজ কিন্তু কারো অপরাধ ক্ষমা করে না। জাহাজের নাবিকগণ আপনারা মনে রাখবেন, সমুদ্রে কোন পাপ কাজেরই ক্ষমা নেই। আমার বয়স হয়েছে, এখন এটা আমি বুঝতে পারছি। আপনারা অনেকে এখনও যুবক আছেন, অথবা বয়স আপনাদের বাড়ছে, আপনারা সংস্কার ভেবে সব উড়িয়ে দিতে পারেন, কিন্তু বয়স বাড়লে এটা আপনিও বুঝতে পারবেন। আসলে কি কাপ্তান এতক্ষণ এত কথা আর্চিকে উদ্দেশ্য করে বলছেন। আর্চি গতকাল লেডি-এ্যালবাট্রসকে হত্যা করতে চেয়েছিল।

আর্চি, তখন মুখের চারপাশে হাত বুলিয়ে দেখছে। যেন বুঝতে পারছে দাগগুলো ক্রমে আরো প্রকট হয়ে উঠছে। ভেতরে তখন তার প্রতিশোধের স্পৃহা বেড়ে যায়। আর্চির মুখ থমথম করছে।

এবং এভাবেই কিছুটা এলার্মিং বেল বাজিয়ে দিয়ে কাপ্তান স্যালি হিগিনস বসে পড়লেন। সবাই যে যার ন্যাপকিন হাঁটুতে বিছিয়ে নিয়েছে। সবাই প্রায় উপুড় হয়ে পড়েছে। দু'একজনের ফিস ফিস গলায় কথা, কাপ্তানের বুড়ো বয়সে, নাতির বয়সী ছেলেকে নিয়ে দুটো একটা রসিকতা। খুব আস্তে আস্তে চিবিয়ে চিবিয়ে এ সব কথাবার্তা যখন চলছিল, তখন জ্যাক ভীষণ ঝুঁকে আছে টেবিলে। কি খাচ্ছে, কি খাচ্ছে না সে বুঝতেই পারছে না।

ডেবিড বুঝতে পারছে না, এভাবে এমন একটা সুন্দর লাঞ্চের সময় কাপ্তান এলার্মিং বেল বাজিয়ে দিলেন কেন? লেডি অ্যালবাট্রসের কথা ভেবে, না অন্য কোন দূরবর্তী বিদ্রোহের আশঙ্কার কথা ভাবছেন তিনি। অর্থাৎ মিড্-সিতে যদি শেষ পর্যন্ত কিছু হয়ে যায়—কারণ জানা আছে, সেই প্রাচীনকাল থেকে—নাবিকেরা দীর্ঘদিন সমুদ্রে ঘুরতে ঘুরতে পাগল হয়ে যায়—তারা ডাঙ্গায় ফেরার জন্য যে কোনো ইতর কাজ করে ফেলতে পারে। এবং পুরো এক বছর—মাটি টানার কাজ, সব খাবার ভেতর থেকে উঠে আসছে। কাপ্তান প্রথম থেকেই এলার্মিং বেল বাজিয়ে দিয়ে সবাইকে সতর্ক করে দিলেন। জ্যাককে নামিয়ে দিয়ে তিনি নিজে ঝাড়া হাত পা হয়ে যেতে চান

এবং এটা ডেবিডের কাছে ভীষণ স্বার্থপরতার ব্যাপার মনে হল। জীবন বলতে একমাত্র জ্যাক, আর সবাই যেন সিউল-ব্যাংকের কলকব্জা। স্ক্রু-নাট-বোল্টের সমান। জাহাজের সঙ্গে

তাদের ভাগ্য জড়িয়ে আছে। ডেবিডের খেতে ভাল লাগছে না।

আর ছোটবাবু না থাকায় ডেবিড কেমন ভালভাবে খেতে পারছে না। ছোটবাবুকে আর্চি নিচে এত কি জরুরী কাজ দিয়ে রেখেছে—একবার সে ভাবল খেয়ে উঠে দেখে আসবে।

এবং যখন সে নেমে গেল নিচে, দেখল কোথাও ছোটবাবু তখন নেই। সে মেন-জেনারেটারের পাশে দাঁড়িয়ে ডাকল, ছোটবাবু!

কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

সে পোর্ট-সাইডের বয়লারের পাশে দাঁড়িয়ে ডাকল, ছোটবাবু! কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

সে এভাবে প্রপেলার-শ্যাফট পার হয়ে গেল এবং ছোটবাবুর নাম ধরে ডাকলে কেবল গমগম করছে এনজিম-রুম। সব কলকব্জা বন্ধ জাহাজের। কেবল বিজ-পাম্প চলছে। তার কিট কিট সামান্য শব্দ। আর শব্দ বলতে দুটো একটা কক ফ্যাচ ফ্যাচ করছে। সামান্য স্টিম বের হচ্ছে ককের মুখ থেকে। এমন কি এনজিন-রুমে কেউ কাজ করছে না। একেবারে ফাঁকা। ছোটবাবু তবে কোথায়!

আর্চি ছোটবাবুকে এভাবে কেন জব্দ করছে বুঝতে পারছে না। আর্চি অমানুষের মতো ব্যবহার করছে ছোটর সঙ্গে! সে সিঁড়ি ধরে ওঠে যাবার সময় দেখল, থার্ড, এনজিনের ফিল্টার খুলছে। একেবারে ওপরে। সার্কুলেটিং ফ্যানের নিচে দাঁড়িয়ে কাজ করছে। সে বলল, থার্ড, ছোটবাবুকে দেখেছ?

সে বলল, ছোটবাবু তো নিচে কাজ করছিল।

–নেই

–তবে বোধহয় ওপরে উঠে গেছে।

তখন জ্যাক খুব স্বাভাবিক গলায় শিস দিচ্ছে ফানেলের গুড়িতে। চারপাশটা সে দেখছে। সে এবার নিচে নামবে। খুব সন্তর্পণে নামতে হবে। বাবা দেখে ফেললে টের পেয়ে যাবেন। সে এভাবে শিস দিয়ে যেন বোঝাতে চাইছে—ছোটবাবু বলে এ-জাহাজে সে কাউকে চেনে না।

যখন দেখল, কেউ নেই এবং এবারে নামা যাবে—সে টুপ করে সিঁড়িতে নামতে নামতে প্রায় অদৃশ্য হয়ে গেল বোট-ডেক থেকে। সে ক্রমে সিঁড়ি ধরে নেমে যেতে থাকল। দেখলে মনেই হবে না আর জ্যাকের উঠে দাঁড়ারার পর্যন্ত ক্ষমতা নেই। সে দ্রুত লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে গেল। তাকে ফের তাড়াতাড়ি উঠে যেতে হবে। ব্রীজে বাবা এখন জাহাজের অন্য অফিসারদের সঙ্গে কথা বলছেন। সকালে তিনি তাঁর সব গোছগাছ করে দিয়েছেন। এখন আবার নেমে এসে কি কি বাকি থাকল সব দেখেশুনে একেবারে ঠিকঠাক করে বিদায়ের আগে যেমন হাত তুলে দেওয়া, বাবা তেমনি সময় হলে হাত তুলে দেবেন। আর তখনই তাকে এজেণ্ট-অফিসের লোকদের সঙ্গে নেমে যেতে হবে।

ঘুরে ঘুরে সিঁড়িটা যত নামছে তত তার বুক কাঁপছে। সে আরও নিচে নেমে গেল। বয়লার রুম পার হয়ে এনজিন-রুমে ঢুকে গেল।

সে ডাকল, ছোটবাবু!

কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

সে ডাকল, ছোটবাবু আমি এখন চলে যাব, তুমি কোথায়?

না, কেউ সাড়া দিচ্ছে না।

—ছোটবাবু! সে প্রায় ফিসফিস গলায় ডাকছে। জোরে ডাকলে ওপরে থার্ড আছে, শুনতে পাবে।

থার্ড অনেক উঁচু থেকে বলল, হ্যাল্লো!

জ্যাক খুব স্বাভাবিক গলায় বলল, হ্যাল্লো। কোনো উদ্বিগ্নতা নেই গলায়। যেন জাহাজ থেকে নেমে যাবার আগে ঘুরে ফিরে এনজিন-রুমটা দেখছে।

থার্ড বলল, কি মজা! তুমি হোমে ফিরে যাচ্ছ।

জ্যাক বলল, ভীষণ মজা। হোমে ফিরে যাচ্ছি। কথা বলছে আর সন্তর্পণে দেখছে সে কোথায়! ওদিকটায় থাকতে পারে। ওখানে একবার আর্চি ছোটবাবুকে ট্যাংকের ভেতরে নামিয়ে দিয়েছিল। না ওখানে নেই। থাকলে প্লেট তোলা থাকত।

ছোট্ট জ্যাক এখন দানবের মতো এনজিনের চারপাশে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সে একটা পুতুলের মতো হেঁটে বেড়াচ্ছে যেন। তার কেমন চোখ-মুখ সাদা হয়ে যাচ্ছে। সে ঝুঁকে কখনও টানেল-পথে নেমে, কখনও সিঁড়ি ধরে ওপরে ওঠে, স্মোক-বকসের ভেতর যদি এবং এভাবে সে আবার নিচে ঘুরে ঘুরে স্টারবোর্ডের ভেতর ঢুকে যেতেই দেখল, বয়লারের পাশে ছোটবাবুর তেলের টব, বালতি। ছোটবাবু ঠিক এখানে কোথাও আছে। সে খুব সন্তর্পণে ডাকল, ছোটবাবু, আমি চলে যাচ্ছি। তোমার এখনও কাজ শেষ হল না!

না, কেউ সাড়া দিচ্ছে না। সে ফের বলল, ছোটবাবু, তুমি কী মানুষ না ছোটবাবু! আমি চলে যাব, এখনও তোমার কাজ শেষ হচ্ছে না! সে বয়লারের নিচে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে খুঁজল। ডাকল ফের, ছোটবাবু, তুমি কোথায়?

আর তখনই আশ্চর্য ফ্যাসফ্যাসে গলার আওয়াজ। শীতে ঠাণ্ডা লেগে ভেঙ্গে গেলে যেমন হয়ে থাকে অথবা মনে হয় নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে কেউ নিচে বোধহয় প্রাণপণ ওপরে উঠে আসার জন্য লড়াই করছে।

জ্যাক পাগলের মতো হয়তো চিৎকার করে উঠত ভয়ে। কিন্তু সে তো ছোটবাবুকে ভালবাসে না। সে তো ভেবেই নিয়েছে, ছোটবাবুর কথা আর ভাববে না। তবু চলে যাবার আগে সে একবার দেখা করে যেতে চায়। কিন্তু ছোটবাবু কি উঠতে পারছে না! উপরে উঠতে এত দেরি করছে কেন ছোটবাবু! ছোটবাবু কি এভাবে ব্রিজের ভেতর পড়ে থেকে একেবারেই ঠাণ্ডা হয়ে যাবে! আর তখন মাথায় কি যে হয়ে গেল তার। সে দ্রুত ছুটে গেল ওপরে সিঁড়ি বেয়ে। ওপরে উঠে বলল, বাবা সবাইকে ডাকো। এবারে আমি যাব।

তখন সব ঘরে খবর পৌঁছে গেল। জাহাজের ছোটসাব নেমে যাবে। সবাইর সঙ্গে নেমে যাবার আগে দেখা-সাক্ষাতের পালা প্রায় যেন ঐতিহাসিক ঘটনার মতো সবাই যে যার ভাল পোশাকে ওপরে উঠে যাচ্ছে। নিয়মমাফিক ছোটবাবু হাজিরা না দিলে আর্চির গাফিলতি—আর্চির অধীনে একটা ছোট ছেলে ছোকরা কাজ করে, নিয়ম-কানুনের ধার ধারে না, বেয়াদপ। এবং আর্চি নিজে নেমে এসে ডাকল, হেই বাস্টার্ড। ওপরে যাও, পোশাক পাল্টে বোট-ডেকে যাবে।

তখন ছোটবাবু প্রায় কোনরকমে সিঁড়ি ভেঙে উঠছিল। রাস্তায় দেখা কাপ্তান-বয়ের সঙ্গে। আপনার বড় দেরি, জলদি যান। ছোটসাব চলে যাচ্ছে। ছোটবাবু আর পারছে না। শীতে সে হি হি করে কাঁপছে। সে ওপরে উঠে যাচ্ছে। ফানেলের গুঁড়ি ধরে উঠে যাচ্ছে। উঠেই দেখল সবাই এসে গেছে। চিফ-মেট, সেকেণ্ড-মেট, 'থার্ড-মেট, রেডিও-অফিসার এবং এনজিনের সবাই। ডেবিড চেঁচাচ্ছে—ছোটবাবু, শিগগির নিচে নেমে যাও। এটা কি হয়েছে তোমার! কোথায় ছিলে? তোমাকে ভীষণ কুৎসিত দেখাচ্ছে।

ছোটবাবু কোনও কথার জবাব দিতে পারছে না। জামা-প্যান্ট জবজবে ভেজা। ভীষণ ঠাণ্ডা হাওয়া সমুদ্র থেকে উঠে আসছে। গরম দেশের মানুষ ছোটবাবু, শীতে একেবারে চোখ সাদা হয়ে গেছে। আর কালো ধূসর। যেন ভূতের মতো সে একটা ডামি। ফানেলের গুঁড়িতে পোকামাকড়ের মত লেপ্টে আছে। নিচে নেমে সাফসোফ হয়ে আসতে অনেক সময়। জ্যাকের সঙ্গে তবে ওর শেষ পর্যন্ত দেখাই হবে না। সে শীতে হি হি করে কাঁপতে থাকল।

আর্চি হিংস্র বাঘের মতো ক্ষেপে যাচ্ছে। যেহেতু ওপরে কাপ্তান, চার্ট-রুমের পাশে জ্যাক,

আর ফানেলের গুঁড়িতে বাস্টার্ড ছ'নম্বর। সব মিলে ওকে ভীষণ অস্থির দেখাচ্ছে। কাপ্তান অথবা জ্যাক না থাকলে পাছায় একটা লাথি মারতে পারত। এভাবে তাকে অন্তত অপ্রস্তুত করতে পারত না ছ-নম্বর।

জেটিতে তিনটে মনোরম দামী গাড়ি। একটাতে জ্যাক এবং কাপ্তান নিজে থাকবে। দু-নম্বর গাড়ি এজেন্ট-অফিসের খোদ কর্তার, তিন-নম্বর গাড়ি খালি। কেউ সঙ্গে গেলে যেতে পারে।

জ্যাকের সেই সাধারণ পোশাক। মনে হচ্ছে জাহাজেই সে আছে; কোথাও যাবার কথা নেই তার। সে খুব ধীরে ধীরে বাবার পেছনে নেমে আসছিল। সবার সঙ্গে হ্যাণ্ড-শেক করার একটা ব্যাপার রয়েছে। আসলে সে দূর থেকেই দেখে ফেলেছে। সে দেখে আর এক পা নড়তে পারেনি। মূর্তিমান ভূতের মতো ছোটবাবু ফানেলের গুঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে। শীতে কাঁপছে আর ফ্যাক ফ্যাক করে হাসছে। হেসে দু'হাত তুলে বিদায় জানাচ্ছে। দু'পাটি উজ্জ্বল সাদা দাঁত কেবল জ্যাক দেখতে পেল। একজন মানুষের অবয়বে এভাবে ক্রমান্বয়ে নিষ্ঠুরতার দাগ, এবং এই মানুষ অতীব সরল, যেন কিছু আসে যায় না, শীতে দাঁড়াতে পারছে না দাঁত ঠকঠক করছে, ঠোঁট বরফের মত সাদা, তবু অকপট সরল হাসিটুকু লেগে রয়েছে ঠোটে। যেন সেই এক জোকার হাসি ঠাট্টায় সব দর্শকদের উত্তেজিত করে রাখছে, নিজে মরে যাচ্ছে টের পাচ্ছে না।

এবং জ্যাক বোধহয় এভাবে বুঝতে পারে, ছোটবাবুর ভেতরে রয়েছে এক আশ্চর্য দুঃখী মানুষ। সেই দুঃখী মানুষটির সঙ্গে অন্তত নেমে যাবার আগে একবার দেখা হোক সে চেয়েছিল, সে জানত এই দুঃখী মানুষকে আর্চি বাঘের মতো থাবায় খেলাবে। যত দিন যাবে আর্চির থাবা হিংস্র হয়ে উঠবে। তবু সে স্থির ছিল, কিছুতেই ভেঙ্গে পড়বে না। স্থির ছিল, ছোটবাবুকে সে ভুলে যাবে। কিন্তু ক্রমে কি যে হয়ে যায়, দূর থেকে একজন সাধারণ জোকার, কত উঁচু ফানেলের গুঁড়িতে দাঁড়িয়ে হাত তুলে দিতে পারে, কত কষ্টের ভেতরও অকপটে হাসতে পারে তখন সে তো সামান্য জ্যাক। সেও সবার দিকে হাত তুলে দিল। কিছুটা বিদায়ের ভঙ্গীতে। ওদের দিকে সে আর এক পা হেঁটে গেল না। সে কেবিনের দিকে ফিরে যেতে থাকল।

কাপ্তান সারাদিন অস্বস্তিতে কাটিয়েছেন। কোনো রকমে ওয়েলিংটন পর্যন্ত গাড়িতে নিয়ে যেতে পারলে ভাবনা থাকবে না। বনিকে তিনি সুন্দর সুন্দর পোশাক কিনে দেবেন। দু-চারদিন বনির সঙ্গে থাকবেন। মেয়েদের পোশাকে বনি তখন এত বেশি উৎফুল্ল হয়ে যাবে যে মনেই থাকবে না তার বুড়ো বাপ জাহাজে কাজ করে। এবং বুঝতে পারেন সুন্দর পোশাকে বনিকে দু-দণ্ড একা থাকতে হবে না। সে তার ঠিক নিজের মতো কাউকে খুঁজে পাবে। খুঁজে পেলে সত্যি বনি আর বুড়ো বাপকে মনে রাখতে পারবে না।

আর তখন তিনি কেমন হতবাক। বনি কেবিনের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। কেবিনের দিকে ফিরে যাচ্ছে বনি। কেবিনে বনির কিছু পড়ে নেই তো! তাছাড়া মেয়েদের কোথাও যাবার আগে কাজ থাকে কিছু। ভাবলেন, বনি এক্ষুনি ফিরে আসবে।

বেশ সময় পার হয়ে যাচ্ছে। তিনি বার বার ঘড়ি দেখছেন। এত সময় লাগার কথা না। তিনি এগিয়ে গিয়ে দেখলেন বনি দরজায় ঠেস দিয়ে কেমন স্থির উদাস চোখে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি এত কাছে, তাঁকে যেন বনি দেখতেই পাচ্ছে না। হঠাৎ কেমন ভয় পেয়ে ডাকলেন, বনি!

বনির মনে হল কেউ তাকে ডাকছে। সে দেখল বাবা সামনে। বাবাকে দেখেই মনে হল কোথাও তার যাবার কথা। সে ভেতর থেকে তখন এক কঠিন দুঃখ সামলে নিচ্ছিল। স্থির নিশ্চিত গলায় এবং খুব শান্তভাবে বলল, আমি যাব না বাবা, তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না।

–কি বলছিস বনি! সবাই অপেক্ষা করছে।

—তুমি ওদের চলে যেতে বল বাবা। তোমাকে ছেড়ে থাকলে আমি মরে যাব বাবা। একেবারে শিশুর মতো বনি বাবার বুকে মুখ লুকিয়ে বলতে বলতে কেঁদে ফেলল।

তিনি নিজে এখন কি করবেন বুঝতে পারছেন না। দূরে ওরা দাঁড়িয়ে আছে। নিচে এজেণ্ট-অফিসের বড় কর্তা। সব ঠিকঠাক। বনি কাঁদছে। কতদিন যেন বনি এভাবে কাঁদেনি। তিনি সেই কবে যেন মনে করতে পারছেন না বনি ওঁর বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদত। এবারে মনে করতে পারছেন। বনি ওর মা চলে যাবার পর এভাবে ওর বুকে মুক লুকিয়ে কাঁদত। আর বলত বাবা আমি মা'র কাছে যাব। আমাকে মায়ের কাছে নিয়ে চল। এবং এভাবেই মনে হয়— তিনিই সব দুঃখের মূলে। বনিকে তিনি আর একটা শক্ত কথা বলতে সাহস পান না। এবং যেন এই মেয়ে এখন জোরে জোরে চিৎকার করে বলতে পারে বাবা, আমি কি অপরাধ করেছি যে জাহাজ থেকে তুমি আমাকে নামিয়ে দিতে চাইছ।

তিনি ধীরে ধীরে বোটডেকে-হেঁটে গেলেন। কারও দিকে তাকালেন না। কেমন মাথা নীচু করে রাখলেন এবং বলে গেলেন বন্ধুগণ আপনারা যান। জ্যাক জাহাজে থাকবে। এই ভাঙ্গা জাহাজে জ্যাক থাকছে। আপনারা আমাকে আর নিশ্চয়ই স্বার্থপর ভাববেন না।

তারপর ফের তিনি চিৎকার করে উঠলেন, হেই, হেই সেকেণ্ড। সেকেণ্ড বললেই সবাই বুঝতে পারে তিনি আর্চিকে ডাকছেন। ডেবিডকে ডাকলে তিনি বলতেন হেই সেকেণ্ড-মেট। তিনি আর্চিকে বললেন, বন্দুকটা আমার কেবিনে রেখে আসবে। ওটা আর ধরবে না। আর যখন আর্চি বন্দুকটা দিতে এসেছিল, তিনি ক্রোজ-নেস্টের একটা ঝুলন্ত বালব দেখিয়ে বললেন, হাতের টিপস্ দেখবে, বলেই বালবটা ক্রোজ-নেস্ট থেকে গুলিতে উড়িয়ে দিলেন। বললেন, কি মনে হচ্ছে। হাত ঠিক আছে তো!

তারপর থাকে সেই দ্বীপ সমুদ্র আর মানুষের অন্তহীন রহস্য। জাহাজটা আবার কবে সমুদ্রে যাত্রা করবে, এবং কি সব অঘটনের অপেক্ষায় আছে কেউ জানে না। তবু দেখা যায় জাহাজের মাস্তুলে কার্সি ফ্ল্যাগ উড়ছে। আর বনির পোর্ট-হোলে কত সব অপার্থিব নক্ষত্রমালা। ছোটবাবুর মুখ প্রতিটি নক্ষত্রে বিন্দু বিন্দু হয়ে জ্বলছে। কোথাকার এক ছোটবাবু জীবনের সব কিছু তার হরণ করে নিয়েছে। সে নিশীথে মানুষটার শুভাশুভের জন্য তার ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছিল।

॥ একত্রিশ ॥

নিউ-প্লিমাথ আসলে ভারি ছোট বন্দর। বন্দরে চার-পাঁচটা জাহাজ ভিড়তে পারে। ঠিক পাহাড়ের নিচে সমুদ্র। বাতাসে প্রবল ঢেউগুলো যেখানে ভেঙে খান খান হয়ে যায় তার পাশে এক যেন বিশাল দীঘি। নীল জল টলমল করছে। সমুদ্রের ভেতরই দীঘির মতো পাড় বাঁধানো অথবা সহসা দেখলে মনে হয় প্রবালের বলয়রেখা। একটু কাছে গেলেই বোঝা যায় সমুদ্রের নিচ থেকে কংক্রিটের দেয়াল তুলে এই ছোট্ট নির্মাণকার্য সুপটু হাতে সম্পন্ন করা হয়েছে।

ডিসেম্বর মাস। গ্রীষ্মের সময় বলে আয়ন বায়ু এখন নেমে আসছে। জোরে হাওয়া উঠছে। সমুদ্রের বড় বড় ঢেউ কনক্রিটের দেয়ালে এসে মাথা কুটে মরছে। প্রচণ্ড গর্জনে সব সময় এইসব ঢেউ ভাঙার শব্দ, অথবা এক অতীব গর্জন এবং মনে হয় যেন সদলবলে ছুটে আসছে অগণিত ঢেউ আর কংক্রিটের দেয়াল ভেঙে দেবার জন্য নিরন্তর কেবল ফুঁসে ফুঁসে মরছে।

ভেতরে সিউল-ব্যাংক জাহাজ ভিড়ে আছে। সঙ্গে আরও দু-তিনটে জাহাজ। দেখে মনে হয় অস্ট্রেলিয়াগামী। অথবা এরা সব দ্বীপটিপ পার হয়ে এখন নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিচ্ছে। জাহাজে তেমন ত্বরা নেই, তেমন মাল ওঠা নামার ব্যস্ততা নেই। বড় শান্ত জেটি। দু'টো-একটা ট্রাক এসে সকাল থেকে লাগছে। মাল নিয়ে আবার পাহাড়ী পথ বেয়ে উঠে যাচ্ছে। দূরে দেখা যাচ্ছে এগমন্ট হিলের শীর্ষদেশ। সাদা বরফে ঢাকা, আর জেটি পার হলে ঠিক এই বন্দর অথবা শহরের মতোই ছোট্ট বেলাভূমি—সকাল থেকে মানুষরা রোদে পিঠ দিয়ে বসার জন্য অথবা সমুদ্রে সাঁতার কাটবে বলে ছোট বর্শা এবং অক্সিজেন সিলিণ্ডার পিঠে বেঁধে বড় ছাতার নিচে অপক্ষো করছে।

আর রয়েছে সারি সারি পাইন গাছ। ঠিক পাইন বলা চলে না, পাইনের মতো সরু লম্বা নয়, অনেক ডালপালা নিয়ে গাছগুলো মাথায় উঁচু। নীল আকাশের নিচে এই সব সবুজ গাছ পাহাড়ময়। কৌরি-পাইনের জঙ্গল এভাবে সর্বত্র। আর ঠিক তারই পাশে জেটি থেকে কংক্রিটের পথ সোজা ওপরে উঠে বাঁদিকে মোড় নিয়েছে। উঁচু-নিচু পথের দু'পাশে ছোট ছোট উপত্যকায় লাল নীল কাঠের বাড়ি। সামনে ছোট সবুজ লন আর কারুকার্যময় গোলাপের বাগান। বোধ হয় এখন গ্রীষ্মের দিন বলে কেবল এই গোলাপ আর ক্রিসেন্থিমামের সমারোহ। এবং মনে হয় শান্ত নিরিবিলি আশ্রমের মতো এই বন্দরটি। কোথাও কোন ব্যস্ততা নেই। কেমন ছুটির দিনের মতো সব

তবু মৈত্র ফেরার পথে দেখেছিল, সব দোকানপাট নানাবর্ণের লাল নীল হলুদ কাগজে সাজানো হচ্ছে। মৈত্র বুঝতে পেরেছিল হপ্তা দুই পার করে দিতে পারলেই বড়দিনের উৎসব। ডাক্তার মানুষটি খুব ভাল। ইচ্ছে করলেই ধরিয়ে দিতে পারত। প্রথমে ভীষণ চেঁচামেচি করেছে। গালাগাল করেছে। ইংরেজী ভাষায় গালাগাল শুনতে মৈত্রের বেশ ভাল লাগে। আরও ভাল লেগেছিল, যখন ভদ্রলোক ওকে নানাভাবে বুঝিয়েছিল, কত খারাপ অসুখ এটা। সে এটা লুকিয়ে রেখে ভাল করেনি। তবু কথা আদায় করে নিয়েছে, বাপু তুমি কোথাও কিন্তু যাবে না। গেলে মরে যাবে। মানুষটি তাকে স্থানীয় মাউরি মেয়েদের সম্পর্কে এমন সব ভয়-টয় ধরিয়ে দিল যে বোধ হয় মৈত্র আর বাপের জন্মেও ওধার মাড়াবে না।

কিন্তু মানুষের জীবনে যা হয়ে থাকে, মৈত্র সুই ফুটিয়ে আরাম বোধ করছিল। যখন সে জাহাজ থেকে নেমে পিকাকোরার দিকে হেঁটে যায় তখন সে কিছু দেখেনি। ট্যাকসিতে সে প্রায় মৃগীরুগীর মতো পড়ে ছিল। ডাক্তার মানুষটি সত্যি সুমহান, ওকে সামান্য কিভাবে যে ম্যাসেজ করে দিয়েছে, শরীরে যেন আর বিন্দুমাত্র গ্লানি নেই। সে ভেবেছিল জীবনে আর কখনও খারাপ কাজ করবে না। সন্ধ্যার সময় ডাক্তার মানুষটি বলেছিল, এবারে যাও বাছা। যে ক'দিন থাকবে একবার করে আসবে এখানে। ডাক্তারের সুন্দর গোলাপ-বাগানটি তার ভাল লেগেছিল। সেখানে সে প্রথম সুন্দর একটি বালিকাকে দেখে থমকে দাঁড়াল। ছ-সাত বছরের বালিকাটি ওকে দেখে হাত নাড়ছে।

সেও হাত নাড়ল।

মৈত্র ভেবেছিল, ডাক্তারবাবুর মেয়ে। মানুষটির ওপর ওর ভীষণ কৃতজ্ঞতা তার ওপর গোলাপের বাগানে এমন ফুটফুটে মেয়ে—সে এক মুহূর্ত আর দেরি না করে প্রায় দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। কিন্তু বালিকাটি পরম ঔৎসুক্যে ওকে দেখছিল শুধু। ওর কাছে যেতে সাহস পায়নি। রেলিঙের ও- পাশে দাঁড়িয়ে কেমন বিরস মুখে বলছে, ইউ সেলর?

মৈত্র বলল, ইয়েস মি সেলর। মি মৈত্র।

—মাই ফাদার ওয়াজ অলসো সেলর।

—এখন?

—এখন নেই!

–কেন নেই। কি হয়েছে?

—জানি না।

মৈত্র বুঝতে পারল, সে ডাক্তারবাবুর কেউ নয়। পাশাপাশি বাড়ির কেউ হবে, আত্মীয়ের মতো হবে। আর কে আছে এমন সুন্দর কাঠের লাল নীল রঙের বাড়িতে? ছবির মতো ছিমছাম। সমুদ্র থেকে সামান্য ওপরে পাহাড়ের উপত্যকায়, একেবারে আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপের মতো ছোট্ট রহস্যময় জগত। মেয়েটি বর্ণাঢ্য ছবির মতো বাড়িটার যেন প্রাণ। সে বলল, তোমার নাম?

—আমার নাম ম্যাণ্ডেলা।

—খুব সুন্দর নাম। কোথায় থাকো?

ম্যাণ্ডেলা মৈত্রকে রেলিঙের ফাঁক দিয়ে উবু হয়ে দেখছে। ম্যাণ্ডেলা পরেছে পাতলা কটনের ফ্রক। পায়ে পাতলা স্লিপার। ঘন সোনালী চুলে রিবন বাঁধা। সে কোথায় থাকে কিছু বলল না।

মৈত্র বলল, মি সেলর কি করে বুঝলে?

ম্যাণ্ডেলা বলল, মামাবাবু তোমাকে খুব বকেছে।

মৈত্র বুঝতে পারল, ম্যাণ্ডেলা ভেতরে কোথাও তখন ছিল। সে আড়ালে সব শুনেছে।

ম্যাণ্ডেলা বলল—তোমার জাহাজে আমি যাব।

—আমার জাহাজ ভাল না। ভাঙা জাহাজ।

—ভাঙা জাহাজে থাক কেন?

—এবারে একটা ভালো জাহাজ কিনে ফেলব।

ম্যাণ্ডেলা বোধ হয় একা। ওর সঙ্গে কেউ বোধহয় কথা বলে না। –ম্যাণ্ডেলা, মামাবাবু তোমাকে খুব ভালবাসে?

ম্যাণ্ডেলা বলল—আমরা ওখানে থাকি। বলে পাশে এক ফার্লং-এর মতো দূরে ঠিক আর একটি ছোট্ট উপত্যকায় কিছু আপেল গাছের ফাঁকে মিকি-মাউসের মতো একটা বাড়ি এবং কি যে হয়ে যায় মৈত্রের, এখানে সব বাড়িগুলিই ছেলেবেলার বইয়ের ছবিতে দেখা বাড়ির মতো। বাড়িগুলো কুটীরের মতো। কাঠের দেয়ালে কাঁচের জানালা। ছাদ কাঠের মনে হয় এবং চিমনি কালো রঙের। একই রকমের সব বাড়ি। শহরের ভেতরে ইট কাঠের দালান, পাকা রাস্তা, ট্রাম গাড়ি সবই আছে। মৈত্র ম্যাণ্ডেলার সঙ্গে কথা বলতে বলতে দূরের বাড়িটা দেখল

—ওখানে কে থাকে?

—মা।

—মা।

—তোমার বাবা?

—আমার বাবা ভাঙা জাহাজে সমুদ্রে গিয়েছিল। অনেকদিন আগে—বাবার জাহাজ সমুদ্রে ডুবে গেছে।

মৈত্র বুঝতে পারছে এ পরিবারে সমুদ্র এবং জাহাজ আর তার নিরুদ্দিষ্ট জীবন নিয়ে একটা দুঃখের প্রাসাদ গড়ে উঠেছে। মৈত্রের কেন যে ম্যাণ্ডেলাকে কোলে তুলে নিতে ইচ্ছে হচ্ছে। সে বলল, কাল আবার আসব। তুমি যাও। মামাবাবু তোমাকে ডাকছে দ্যাখো।

মৈত্র ড. বুচারকে আর একবার দূর থেকে হাত তুলে কৃতজ্ঞতা জানাল।

মৈত্র এভাবে উঁচু-নিচু পথ ধরে এখন বন্দরের দিকে হাঁটছে। আকাশে দু'টো-একটা নক্ষত্র যীশুর জন্মদিনের কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে। ভীষণ ঠাণ্ডা বাতাস সমুদ্র থেকে উঠে আসছে। এদেশের মানুষদের কাছে এখন গ্রীষ্মকাল আর মৈত্রের মনে হচ্ছে তার দেশে শীতকালেও এত ঠাণ্ডা থাকে না। সে গরম উলেন কোট-প্যান্ট পরেছে। গলায় মাফলার জড়ালে কনকনে ঠাণ্ডায় সে এত বেশি শীতে ঠাণ্ডা হয়ে যেত না। সুন্দর সব আলোর ডুম খাড়া পাহাড় থেকে ঝলে পড়েছে রাস্তায়। মানুষের ভিড় নেই। সে একটা বাসে চড়ে বন্দরে নেমে যেতে পারত। কিন্তু কেন জানি ঠাণ্ডায় অথবা এই দেশের মনোরম গ্রীষ্মের সন্ধ্যায় হেঁটে যেতে তার ভাল লাগছিল।

আর যেন পড়ে আছে পেছনে সেই মিকি-মাউসের মতো বাড়িটা। ওখানে ম্যাণ্ডেলার মা থাকে। ওর মনে হচ্ছিল জানালায় ঠিক ম্যাণ্ডেলার মতো এক যুবতী মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ম্যাণ্ডেলা হয়তো এতক্ষণে বাড়ি ফিরে গেছে। মাকে সে তার গল্প করবে। ওর মার মুখে আকাশের দু'টো একটা নক্ষত্রের মতো বোধ হয় এখন নিঃসঙ্গতা। ওর বার বার সেই নিঃসঙ্গতার কথা মনে হতেই শেফালী অনেক দূরের এক যুবতী এবং প্রতীক্ষা অথবা সন্তান ধারণে শেফালীর মুখে ক্লিষ্টতার ছাপ এসব চিন্তা, একটু ভালভাবে বেঁচে থাকা ওর এখন দরকার—কিছু টাকার সংস্থান করতে পারলে শেফালীকে পাঠিয়ে দেবে।

সে বেশ দ্রুত হাঁটছে। ম্যাণ্ডেলা এবং তার মা অথবা শেফালী, শেফালীর কথা মনে হলেই সে বুঝতে পারে ঠিক পাঁচ-সাত বছর পর ওর সন্তান ম্যাণ্ডেলার মতো বড় হয়ে যাবে। সমুদ্রগামী জাহাজে সে হয়তো কোন দ্বীপের পাশ দিয়ে যাবার সময় মনে করতে পারবে—সেই সন্তানের মুখ। তখন তার, ইচ্ছে হবে পৃথিবী থেকে যাবতীয় খেলনা কিনে নিয়ে যাবে তার শিশু সন্তানের জন্য। ভারি মজা হবে দেশে ফিরলে। যতবার সমুদ্র ঘুরে দেশে ফিরে যাবে ততবার সে তার কাছে প্রথম প্রথম ভীষণ দূরের মানুষ। শেফালী নানাভাবে বোঝাবে, তোমার বাবা। বাবা বলে ডাকো। আচ্ছা তুমি কী? শেফালী হয়তো কপট রাগে মুখ গোমড়া করে থাকবে তখন, জোর করে কোলে তুলে নিতে পারছ না?

কিন্তু কি যে হয়ে যায় শেফালীর কাছ থেকে জোর করে তুলে নিলেই কাঁদবে ছেলেটা। যদি মেয়ে হয় সুন্দর ফ্রক-পরা মেয়েকে বুকে জড়িয়ে নানাভাবে বলতে হবে কাঁদে না। অথবা কাঁধে নিয়ে রাস্তায় বের হয়ে সব সুন্দর সুন্দর খেলনা কিনে দেবে ওকে। তারপর সামান্য চেনাজানা হয়ে গেলে এবং যখন বাবা বলে সত্যি ডেকে ফেলবে তাকে তখনই একটা চিঠি হাজির। ঠিক ঠিক পরিচয় হতে না হতেই আবার জাহাজে ভেসে পড়া। ভাবতে ভাবতে মৈত্রের মুখটা কেমন বিমর্ষ হয়ে গেল।

সে বন্দরে নেমে খুব আশ্চর্য হয়ে গেল। কোথায় তার জাহাজ! পর পর তিনটে জাহাজ। একটাও সিউল-ব্যাংকের মতো দেখতে নয়। সে ঠিক ঠিক চিনে আসতে পারেনি হয়তো। সারি সারি ক্রেন। দু'টো ট্রাক পর পর। দু-একজন মানুষ। জেটির ওপাশে বেলাভূমি শূন্য। আর অন্ধকার তারপর। সে ঘন অন্ধকারে ঢুকে যাচ্ছে। সামান্য জেটির আলোতে শেষ মাথায় এসে বুঝতে পারল অন্ধকারের ভেতর সিউল-ব্যাংক ঘাপটি মেরে আছে। মাস্তুলের আলো জ্বলছে না। সিঁড়িতে ওঠার মুখে অন্ধকার যেন চাপ বেঁধে আছে। জাহাজে আলো নেই।

আলো না থাকলে মরা এবং ভুতুড়ে মনে হয় জহাজটাকে মেন-জেনারেটর বোধ হয় গেছে। স্ট্যাণ্ড-বাই সমুদ্রেই খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

সে জাহাজে ওঠার মুখে গ্যাঙওয়েতে দেখল কোয়ার্টার মাস্টার মহসীন চুপচাপ অন্ধকারে বসে রয়েছে। সারাদিন প্রায় সে জাহাজে ছিল না এবং এখন এমন অন্ধকারে কোয়ার্টার মাস্টারকে বসে থাকতে দেখে ভাবল কিছু বলবে। জাহাজে আলো নেই কেন অথবা তোমরা সব জাহাজের আলো নিভিয়ে দিয়েছ কেন? সে কিছু বলতে পারল না। অন্ধকার এবং নিশীথে জাহাজের এমন দূরবস্থায় সে বিচলিত বোধ করছিল।

মহসীন বলল, যান ভেতরে যান।

ভেতরে সে কোথায় যাবে। মহসীন এভাবে কথা বলছে কেন। সে বলল—কি হয়েছে?

মহসীন বলল—জাহাজে আরও এক বছর।

—তার মানে!

—জাহাজ মাটি টানার কাজে লাগবে।

—জাহাজ এবার দেশে ফিরছে না?

—না। সাউথ-সীতে জাহাজ যাচ্ছে।

—সেই মাটি টানা।

—হ্যাঁ। আল্লা মুবারক।

অর্থাৎ মহসীন আল্লার নাম করে যেন জাহাজের সব কসুর ভুলে থাকতে চাইছে।

মৈত্র বলল—মেন-জেনারেটর গেছে—

—কি আর আছে জাহাজে। আপনি তো জানেন সব!

মৈত্র হাঁটতে থাকল ফের। কি মনে হওয়ায় ফের সে ফিরে দাঁড়াল।

—জ্যাক নেমে গেছে?

—না।

—তার চলে যাবার কথা।

—যাননি। বাপ বেটা যে কি ভাবে!

মৈত্র আর দাঁড়িয়ে থাকল না। তারও একটা দায়-দায়িত্ব আছে। সে বুঝতে পারছে এখন সবাই এনজিন-রুমে। সোজা সে ফোকসালে না ঢুকে বোট-ডেকে উঠে গেল। অন্ধকার পথে হাতড়ে হাতড়ে সিঁড়ি ধরে নামতে থাকল নিচে। এত অন্ধকার যে কিছু দেখা যাচ্ছে না। তবু সে প্রায় চোখ বুজে নেমে যেতে পারে। এতবার ওঠা-নামা করে এটা তার হয়েছে। নিচে একেবারে বয়লার-রুমে ঢুকেই বুঝতে পারল ওপাশে এনজিন-রুমে হল্লা শোনা যাচ্ছে। সে ঠিক তেমনি বয়লার ধরে ধরে সামনে এগিয়ে স্টারবোর্ড সাইডের ভেতরে ঢুকে গেল। কী অন্ধকার! একেবারে গভীর অন্ধকারের অতলে সে যেন ডুবে যাচ্ছে। এবং ও-পাশে গেলে দেখল অনেকগুলো টর্চ জ্বলছে। মেন-জেনারেটর খুলে ফেলা হয়েছে। এনজিন-রুমের প্রায় সবাই দড়িদড়া টানাটানি করছে। এবং সে বুঝতে পারল আর একটু বাদেই মেন-জেনারেটর ঠিক হয়ে যাবে।

মেজ-মিস্ত্রী ভীষণ চিৎকার চেঁচামেচি করছে। থার্ড ঝুঁকে আছে টর্চ হাতে। কয়েলের ওপর কি সব জড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আসলে টিণ্ডাল মৈত্র বুঝতে পারল তাপ্পি মারা হচ্ছে। এত তাপ্পি মেরে জাহাজ কখনও চলতে পারে বিশ্বাস হয় না। একটু দূরে কাপ্তান আর চিফ-মেট কি সলা-পরামর্শ করছেন। সে দূরে দাঁড়িয়ে শুধু দেখল। কাজে হাত লাগাল না। অন্ধকারে কেউ দেখতেও পাচ্ছে না। সে যদি ছায়ার মতো সিঁড়ি ধরে উঠেও যায় কেউ টের পাবে না। সারেঙ, ছোট-টিণ্ডাল, কিছু ফায়ারম্যান দড়িদড়া টেনে গলদঘর্ম। ওরা কেউ এনজিনের কলামে হেলান

দিয়ে আছে। কেউ এভাপরেটারের পাশে হাঁসফাস করছে। মৈত্র যেমন নেমে এসেছিল তেমনি চুপচাপ গোপনে ওপরে উঠে গেল। কেবল ছোটবাবু নেই মনে হল।

মেন-ডেকে এসে প্রায় হাঁপ ছেড়ে বাঁচল মৈত্র। চারপাশে আলো। বাতিঘরে আলো, জেটিতে আলো। সী-ম্যান মিশানের মাথায় বড় গম্বুজ—সেখানে আলো। পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে উঁচু-নিচু সব জায়গায় নক্ষত্রের মতো বাতিগুলো ঝকমক করছে। আর সেই মিকি-মাউসের মতো বাড়িটালনে সবুজ ঘাস, ঘরে সাদা রঙের কার্পেট পাতা, কাঁচের জানালায় দু'টো একটা জোনাকির মতো বড়দিনের উৎসবের বাতি জ্বলছে। অথবা কোথাও ক্রিসমাস ট্রি নানাবর্ণের সব জোনাকিতে ভরে আছে। পাশে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাণ্ডেলা। হাত ধরে আছে ওর মা। ম্যাণ্ডেলা দূর সমুদ্রে ঘুরে বেড়ায় এমন এক নাবিকের গল্প বলছে। ওর মা চুপচাপ শুনছে।

ওর কেন জানি মনে হল এভাবে নিশীথে একা এই অন্ধকার মেন-ডেকে দাঁড়িয়ে, আসলে ওটা ম্যাণ্ডেলা নয় অথবা ওর মাও নয়। শেফালী তার সন্তানের হাত ধরে সমুদ্রগামী এক নাবিকের স্বপ্ন দেখছে। শেফালী জানে না সেই নাবিক এখন এক কঠিন অসুখে ভুগছে। শেফালী এবং সেই অনাগত সন্তানের কথা ভেবে মৈত্রের চোখে জল এসে গেল।

তারপরেই সে হেসে দিল। চোখে জল আসে ওর এটা সে ভাবতে পারে না। ছোটবাবু দেখলে বলত, তুমি কাঁদতে পার দাদা, এটা তো জানতুম না। তোমার ব্যবহার দেখে তো মনে হয় পৃথিবীতে কিছু তুমি পরোয়া কর না। মায়া দয়া তোমার তবে আছে!

সে এবারেও অন্ধকারে সামান্য হাসল।—ওটা এমনি। কারো জন্য আমার কষ্ট হয় না।

শরীরের জ্বালা যন্ত্রণা বেশ কমে যাওয়ায় পৃথিবীটা আবার ওর কাছে মনোরম হয়ে যাচ্ছে। এ ক'দিন সমুদ্রে মনে হয়েছিল বেঁচে থাকা বড় কষ্ট। কখনও কখনও জ্বালা যন্ত্রণায় সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে ইচ্ছে হয়েছে। গোপনে ডেকে উঠে সমুদ্রে লাফিয়ে পড়লে কেউ টের পেত না ওর শরীরে এমন একটা নোংরা অসুখ আছে। অথচ শেফালী এবং যে আসছে, কি যে ভালবাসা জাগে প্রাণে, কিছুতেই সে তাকে অবহেলা করতে পারেনি। এবং বার বার তখন ওর চোখের সামনে দাঁড়িয়ে থাকে বুয়েনস আয়ার্সের মেয়েটা। কি নরম উজ্জ্বল শরীর। কি সুন্দর স্তন! আর নাভিমূলে রয়েছে সমুদ্রের এক অলৌকিক দ্বীপ। ছুঁয়ে দিলেই সুধা পারাবার। সে তার কথা ভাবলেও কষ্ট পায়। নোংরা অসুখটার জন্য সেই নচ্ছার মেয়েটা দায়ী এটা তার কখনও মনে হয় না।

আর তখন মনে হল অন্ধকারে দু'টো একটা ছায়া এদিকে এগিয়ে আসছে। সে বুঝতে পারছে না কে বা কারা। আলো না জ্বললে অন্ধকারে নিচে নেমে লাভ নেই। গ্যালিতে বোধ হয় রান্নাবান্না সব বন্ধ। এবং সবাই এখন আফট্-পিকে বসে রয়েছে হয়তো। সবাই থাকবে এটা সে ভাবতে পারে না। অন্ধকার ভাল না লাগলে কেউ কেউ বন্দরে নেমে যেতে পারে। এমনিতেও পারে। অমিয় নিশ্চয়ই নিচে নেমে গেছে। তখনই সে বুঝতে পারল, ছোটবাবু এবং ডেভিড। ডেভিড ফিসফিস করে কি সব বলছে। সংগোপনে জাহাজে কিছু এমন ঘটেছে যা তাকে আরও বেশি অস্বস্তির ভেতর ফেলে দিয়েছে। জ্যাকের জাহাজে থেকে যাওয়া, এক বছরের ওপর মাটি টানার কাজে, ফের জাহাজ দক্ষিণ সমুদ্রে থেকে গেল, মহসীন মিয়ার আল্লা মুবারক বলা—সবই কেমন রহস্যজনক। সে ভেবেছিল ছোটকে ডেকে জিজ্ঞাসা করবে, কিন্তু ছোট আর ডেভিড দেখতেই পায়নি পাশে ঠিক মাস্তুলের নিচে একজন মানুষ অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছে। ডেভিড সঙ্গে আছে বলে সে ডাকতে পারল না।

ডেভিড তখন বলছে, তোমার কি মনে হল, তিনি জানতে পেরেছেন?

—কি জানি! কি করে বলব।

—আমি মনে মনে কিন্তু কথাটা ভেবেছিলাম। জোরে বলিনি ওটা তোমাকে হলপ করে বলতে পারি। লাঞ্চে আমার কিন্তু মনে হয়েছিল কাপ্তান ভারি স্বার্থপর। ছেলেকে দেশে

পাঠিয়ে দিচ্ছে।

যত ফিসফিস করেই বলুক, মৈত্র কথাগুলো শুনতে পেয়েছে। ছোটবাবুর সঙ্গে ডেভিডের অন্তরঙ্গতা আছে জানে, কিন্তু ছোটবাবুর কাছে ডেভিড যেন স্বীকারোক্তির মতো কথা বলছে। ছোটবাবুকে সালিশ মানছে।

মৈত্র বুঝতে পারল এই সামান্য সময়ে জাহাজে একটা বিরাট পরিবর্তন ঘটে গেছে। সেটা কি ঠিক অনুমান করতে পারছে না। সকালের দিকে যখন যায় সে শুনেছিল, আর্চি আবার ছোটবাবুকে ব্রিজে নামিয়ে দিয়েছে। সে ভেবেছিল একবার এ-নিয়ে একটা গণ্ডগোল পাকাবে। হোক না সে অফিসার, কিন্তু সে তো বাঙালী। তাকে এভাবে র‍্যাগিং করলে সহ্য করা হবে না। তারপর মনে হয়েছে নিজের বিষের জ্বালায় সে মরছে, কে ছোটবাবু, কে আর্চি, কে বাঙালী, কে তার দেশের মানুষ চুলোয় যাক—আর এখন সে দেখছে ছোটবাবু এমন একটা দুর্ঘটনার ভেতরও বেশ ঘুরে বেড়াতে পারছে। যেন তার কিছুই হয়নি।

মৈত্র আরও শোনার জন্য উইণ্ডসেলের আড়ালে দাঁড়িয়ে গেল। তখন ছোটবাবু বলছে, আমার তো মনে হয় কাপ্তান এমনি বলেছেন

—তুমি বিশ্বাস কর ছোটবাবু, আমি স্বার্থপরতার কথা সহজে ভাবিনি। যা বলেছিলাম, মিলে যাচ্ছে?

ছোটবাবু চুপ করে থাকল। কিছু বলছে না।

—তোমার মনে নেই, বলেছিলাম, জাহাজ মাটি টানার কাজ নেবে। জাহাজটার মাথামুণ্ডু এখন বুঝতে পারছি সত্যি কিছু নেই। তুমি বিশ্বাস কর ছোটবাবু এ-সব বলা অবশ্য ঠিক না, তুমি কিন্তু কাউকে বলবে না, তাহিতিতে আসার সময় ভুলে, কোর্স-লে আমি নিউ-প্লিমাথের করে ফেলেছিলাম। জাহাজ সেই কোর্স-লে ধরেই যাচ্ছে জানি। কিন্তু চোখের ওপর দেখেছি—তারপর যা বলল ডেভিড, শুনে মৈত্র হাঁ। এই তবে জাহাজ! এর সম্পর্কে ওরা অনেক কিছু কিংবদন্তীর মতো শুনেছে, কিন্তু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা কিছু ছিল না। সে প্রায় উত্তেজনায় বলেই ফেলেছিল আর কি—মেজ-মালোম আপনি কী বলছেন!

ডেভিড বেশ জোরে জোরেই বলল, কারণ যখন কেউ নেই পাশে, তখন জোরে বললে কি আর ক্ষতি হবে। ক্ষতি যা হবার তো হয়ে গেছে। সে বলল, সেজন্য আমি ভেবেছিলাম, ভাঙা জাহাজের কথা ভেবে জ্যাককে তিনি পাঠিয়ে দিচ্ছেন। আমাদের আরও একবছর মিড়-সীতে, দ্বীপে দ্বীপে ঘোরা, যেন আমরা জাহাজের কলকব্জা। আমাদের বাড়ি যেতে ইচ্ছে হয় না। আমাদের ছেলে-বৌ নেই। তাই ভেবেছিলাম, কাপ্তান এটা স্বার্থপরের মতো কাজ করছেন। অথচ দ্যাখো কি বিস্ময়ের ব্যাপার বোট-ডেকে তিনি আমাদের বললেন, জ্যাক থাকছে। আপনাদের সঙ্গেই থাকছে। আশা করি আর আপনারা আমাকে স্বার্থপর ভাবতে পারবেন না।

তারপর ডেভিড কেমন বলতে বলতে ক্ষেপে গেল—সোয়াইন! দ্য বাস্টার্ড! ও থট-রিডিং জানে ছোটবাবু। ও শুয়োরের বাচ্চা নিজেই একটা ভূত! ভূত না হলে ভুতুড়ে জাহাজ কে চালাতে পারে বল!

ছোটবাবু বুঝতে পারছিল, ডেভিড কাপ্তানকে জুজুর মতো ভয় পায়। সামান্য কথায় না হলে কেউ এমন মুষড়ে পড়তে পারে না। সে বলল, তুমি অযথা ভয় পাচ্ছ ডেভিড। কাপ্তান এ-সব আদৌ হয়তো ভাবেনই নি।

—কি যে বলছ না ছোট? জ্যাক থাকল তো আমাদের কি এল গেল!

—কিছু না।

—তবে! অথচ দ্যাখো কি কথা! আশা করি আপনারা আমাকে আর স্বার্থপর ভাববেন না।

—ভাঙা জাহাজ, জাহাজ নিয়ে আরও এক বছর সমুদ্রে থাকা ভয়ের! জ্যাক নেমে গেলে এটা তো সবাই মনে করতেই পারে—কাপ্তান ভারি স্বার্থপর। তিনি হয়তো তাই ভেবে

বলেছেন।

—কি জানি। আমার ভাল লাগছে না জানো।

মৈত্র বুঝতে পারল, জ্যাক শেষ পর্যন্ত জাহাজে থেকে গেছে। জ্যাককে নিয়ে কিছু একটা গণ্ডগোল হয়েছে। জাহাজ এ-বন্দরে থাকছে মাসের মতো। মাল খালাস হবে। কাল থেকে জাহাজের চেহারা পাল্টে যাবে। জেটিতে কিনারার লোক, সারি সারি ট্রাক হারিয়া হাপিজ আর সারা ডেকময় সালফারের গুঁড়ো কুয়াশার মতো ভেসে বেড়াবে। যারা ফল্কায় কাজ করবে প্রত্যেকের মুখে কাপড় বাঁধা থাকবে। সালফার বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করলে হাত-পা ভীষণ জ্বালা করে। তারপর জাহাজ কোথায় যাবে, কোন বন্দরে কেউ জানে না। ভাঙা জাহাজ না বলে ভূতুড়ে জাহাজই বলা ভাল।

অন্ধকার জাহাজে হেঁটে যেতে পর্যন্ত গা ছমছম করছে মৈত্রের। সে আড়ালে আড়ালে উঠে যাচ্ছে। এখন সে যেন একা কিছুতেই অন্ধকারে নিচে আর নামতে পারবে না। ডেক-জাহাজীদের গ্যালিতে কেউ নেই। জাহাজে এমন অন্ধকার দেখেই হয়তো সবাই বন্দরে নেমে গেছে। আর তখনই মনে হল লণ্ঠন হাতে কেউ সিঁড়ি ধরে উঠে আসছে! এমন একটা বন্দরে লণ্ঠনের আলো দেখে সে আরও ঘাবড়ে গেল। কে উঠে আসছে! লণ্ঠনের আলোতে বন্দরে কেউ এভাবে উঠে আসে তার জানা নেই। গ্যাংওয়েতে মহসীন পাহারা দিচ্ছে। ওর চোখের সামনে মনে হল লণ্ঠনটা দুলছে।

এমন অন্ধকারে যা হয়ে থাকে, সামান্য আলো দেখে প্রায় যেন সবাই সেদিকে ছুটছে। এবং বুঝতে পারল ডেকের অন্ধকারে এতক্ষণ সবাই প্রায় গাঢাকা দিয়ে ছিল। গাঢাকা, না জাহাজ মাটি টানার কাজে যাচ্ছে শুনে সবাই দিশেহারা! সবাই হতবাক হয়ে এতক্ষণ যে যেখানে দাঁড়িয়ে সারেঙের হাঁক শুনেছিল, সেখানেই দাঁড়িয়ে গেছে। আর নড়তে পারে নি। আলো দেখে সবার হুঁশ ফিরে এসেছে। ওরা নড়েচড়ে উঠেছে।

ক্রমে লণ্ঠন পিছিলের দিকে চলে আসছে। দু'একজন ডেক-জাহাজি সঙ্গে। ঠিক পিছিলে উঠেই মৈত্রের মুখের ওপর লণ্ঠন তুলে বলল, জাহাজটা ভারতবর্ষ থেকে এসেছে না?

মৈত্র বলল, হ্যাঁ। কেন বলুন তো! এবং মৈত্র বুঝতে পেরেছিল, সঙ্গের দু' একজন ডেক-জাহাজিকে সে প্রশ্ন করেছে। ওরা ইংরেজী জানে না বলে কিছু বলতে পারে নি। মৈত্র অথবা অমিয়র কাছে শেষ পর্যন্ত ধরে আনতেই হত। ডেক-অফিসার, অথবা এনজিন-অফিসারদের কাছে নিয়ে যাবার সাহস নেই। কিংবা বেশ মজা করা যাবে, যখন এত সুন্দর ছিমছাম উজ্জ্বল বন্দরে সামান্য লণ্ঠনের আলোতে কেউ কিছু খুঁজে বেড়ায় নির্ঘাত মাথায় কিছু ছিট-ফিট আছে।

বুড়ো মতো মানুষটি কিছু না বলে সহসা নাম ধরে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। সে যেন কিছু হারিয়ে ফেলেছে এমন ভাব। আর তখন মৈত্র দেখল সোনালী চুলের মেয়ে অন্ধকার থেকে ছুটে এসেছে। এবং দেখে মনে হল, লজ্জায় অথবা সংকোচে সে বুড়ো মানুষটার সঙ্গে ছিল না। সে এসেই বলল, এই তো আমি।

—কোথায় ছিলি! আচ্ছা দ্যাখুন তো কি অন্ধকার। এমন অন্ধকার তো জাহাজে কখনও থাকে না।

মৈত্র বলল, জেনারেটর ফেল করেছে।

—আচ্ছা, আপনারা সবাই ভারতীয় তো?

মৈত্র বলল, আমরা সবাই। তারপরই বলল, না, সবাই না। আমরা দু'জন। আর একজন আছে। সে কেবিনে থাকে। তারপর কি হিসাব করে বলল, মোট ছ'জন। মৈত্র হিসেবের ভেতর ফাইভারকেও বাদ দিল না।

—ভাল। বেশ ভাল। কিন্তু বড় বেশি অন্ধকার। অন্ধকার জানেন আমার একদম সহ্য হয়

না।

মৈত্র বুঝতে পারছে না এই রাতে এমন একটা ভিন্ন পরিবেশে এই অপরিচিত বুড়ো মানুষটি কিসের আশায় জাহাজে উঠে এসেছে। যুবতী মেয়েটির ভীষণ সংকোচ, সে প্রায় সময় বুড়ো মানুষটার আড়ালে থাকতে ভালবাসছে। এতগুলো ক্ষুধার্ত নেকড়ের ভেতর যুবতীকে তার ভাল লাগল না। মানুষটি কি জানে না জাহাজে এভাবে এমন অন্ধকারে উঠে আসতে নেই। মানুষটিকে তো পুরো ইংরেজ মনে হচ্ছে। মাউরি সম্প্রদায়ের হলে তবু কথা ছিল, আর মানুষ সংগ্রহের জন্য এলে এখানে সে আসবে কেন। তার আরও বেশি আশা করা উচিত।

তখন বুড়ো মানুষটি বলল, আলো জ্বলবে না?

—বুঝতে পারছি না।

—একটু ভেতরে নামা যেত তবে!

অদ্ভুত সব কাণ্ড-কারখানার ভেতর মৈত্রের দিন কেটেছে। এখন আবার এই ঝামেলা। ওর শরীর তেমন মজবুত নয়। সে আগের মতো নেই। আগের মতো থাকলে এতটা বিরক্ত হত না। বরং এই যে যুবতী মেয়ে আড়ালে আড়ালে থাকতে চাইছে কখনও তার সাদা গাউন, হলুদ জ্যাকেট দেখা যাচ্ছে, কখনও যাচ্ছে না, কেমন মোহময়ী এবং এই অন্ধকারে এত বড় প্রলোভন থেকে সে কিছুতেই নিজেকে রক্ষা করতে পারত না। শুধু সেই মেয়ে ম্যাগুেলা আর মিকি-মাউসের মতো বাড়িটা এবং শেফালীর মুখ, তার জাতক তাকে এখন ভালো মানুষ হয়ে যেতে বলছে। সে তখন সামান্য ধমকের সুরেই বলল, নিচে নেমে কি হবে?

—কথা ছিল!

—কি কথা?

—এই বলছিলাম আপনারা যদি রোববার আমার বাড়িতে আসেন।

মৈত্র সত্যি খুব রেগে গেল। সে প্রায় বলেই ফেলেছিল, এখানে এ-সব চলবে না। যান। কিন্তু সে বলার আগেই মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়াল। বলল, আমার দাদু আপনাদের নেমন্তন্ন করতে এসেছেন। আজই পত্রিকাতে দেখেছে—সিউল-ব্যাংক পোর্ট ধরছে।

মৈত্র দেখল চারপাশে তখন আরও অনেক জাহাজি। সবাই প্রায় ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। যে যেখানে ছিল এসে গেছে। এই অন্ধকারে আর কারো যেন গা ছমছম করছে না। মনে হচ্ছে একটা আশ্চর্য জিনিস মিলে গেছে, জাহাজে এ-সব থাকলে বুঝি ভয় থাকে না, গা ছমছম করে না।

এবার কেন জানি যুবতীকে তেমন অবহেলা করার মতো মনে হল না। যুবতী ধীর স্থির। সহজভাবে কথা বলছে। মৈত্র বলল, চলুন বসবেন।

ভেতরে ঢোকার মুখেই আলো জ্বলে গেল। সবাই হাততালি দিয়ে উঠল। নিমেষে জাহাজটা যেন প্রাণ পেয়ে গেল। মৈত্র বলল, আলোটা এবার নিভিয়ে দিন।

মেয়েটি বলল, আলোটা থাক। সে আলোটা একটু কমিয়ে এক পাশে রেখে দেবার সময় বলল, এই আপনার কেবিন! মেয়েটি ছোটবাবু যে বাংকে থাকত দাদুকে নিয়ে সেখানে বসে গেল। বলল, আমার নাম মিস ক্যাথারিন উড। এবং সে তার দাদুর নাম বলে ফোকসালের চারপাশটা দেখতে থাকল।

মৈত্র দেখল ভিড় চারপাশে। বঙ্কু, মজুমদার, মনু এবং অন্য অনেকে দরজায় ভিড় করেছে। মৈত্র এক ধমক লাগাল।—এখানে কী। অসভ্যের মত দাঁড়িয়ে আছিস। যা, যা বলছি।

কেউ গেল। কেউ গেল না। মৈত্র তাদের ভিতরে বসতে বলল।

ক্যাথারিন তখন দাদুর দিকে তাকাল। এবারে বল।

মি. উড বললেন, ক’দিন জাহাজ থাকছে?

মৈত্র বলল, মাসখানেক হয়ে যাবে।

—ক্রিসমাসের উৎসব পর্যন্ত তাহলে আছেন?

—আছি।

—বেশ বেশ। খুব উৎফুল্ল দেখাল মি. উডকে। আমরা থাকি শহরের শেষ মাথায়। শহরের একটু বাইরে বলতে পারেন। খামার আছে, কিছু হাঁস মুরগী ভেড়ার পাল আছে। জায়গাটা আপনাদের ভাল লাগবে। এই আমার নাতনি আর আমি আছি। আমাদের আর কেউ নেই। আমি ভারতবর্ষের মানুষ। ঠাকুর্দার বাবা ভারতবর্ষে বিহারে সিংভূম অঞ্চলে খনির ইজারাদার ছিলেন।

মৈত্র আর খারাপ কিছু ভাবতে পারল না। অমিয় না থাকায় যেন ভালই হয়েছে। থাকলে ভীষণ ঝামেলা বাধাত। সে বলল। আপনারা এ-দেশে কবে এসেছেন?

মি. উড বলতে সংকোচ বোধ করছিলেন।

তখন ক্যাথারিন দাদুর হয়ে বলল, ভারতবর্ষ স্বাধীন হলে দাদু এখানে চলে আসেন। ক্যাথারিন ঘড়ি দেখে বলল, আপনারা রোববারের রাতে আমাদের সঙ্গে খাবেন। ভারতবর্ষের মানুষ এ-বন্দরে এসে ফিরে গেছে, একবেলা তিনি খাওয়াতে পারেন নি, এটা আমরা ভাবতে পারি না। আমাদের খামার, চাষাবাদ দেখলে আপনাদের ভালই লাগবে।

—একটু বসুন। আমি আসছি। সে ছোটবাবুকে ডাকতে গেল। ওর আবার সময় হবে কিনা। এই বলে সে কিছুক্ষণের ভেতরে ছোটবাবুকে নিয়ে এলে, ক্যাথারিন ছোটবাবুর দিকে তাকিয়ে থাকল। ছোটবাবু মেয়েদের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারে না। সে মেয়ে দেখে বরং একটু হকচকিয়ে গেল। মৈত্রদা কিছু ভেঙে বলে নি।

তখন মৈত্র বলল, এই আমাদের ছোটবাবু। ক্যাথারিন তুমি ওকে বলে যাও।

ক্যাথারিন বলল, আমার দাদুর ইচ্ছে রোববার রাতে আপনারা আমাদের সঙ্গে আহার করেন।

ছোটবাবু মৈত্রদার দিকে তাকাল। সে কি বলে।

মৈত্র বলল, আমরা যাব।

ছোটবাবু বলল, ভারি মজার ব্যাপার।

ক্যাথারিন বাংলা ভাষা বোঝে না। তবু অপলক তাকিয়ে ছোটবাবুর কথা যেন শুনছে। ছোটবাবু ফ্লানেলের বুকখোলা শার্ট পরেছে। ফ্লানেলের পাজামা। ছোটবাবুর, পুষ্ট শরীর এবং আশ্চর্য সজীব গন্ধ সমুদ্রের। দূর সমুদ্রের নাবিকেরা ডাঙা দেখলে যেভাবে আকুল হয়ে পড়ে, ছোটবাবুর কথাবার্তা শোনার তেমনি একটা তীব্র আকুলতা বোধ করছে ক্যাথারিন। ওর চোখ মুখ দেখে মৈত্র এটা ধরতে পেরেছে।

মৈত্র বলল, আমরা যাব।

ক্যাথারিন বলল, আমি আপনাদের নিয়ে যাব।

আর মৈত্র সে-রাতেই একটা আশ্চর্য স্বপ্ন দেখল। সারারাত সে একই স্বপ্নে যেন ঘুরে ঘুরে বৃত্তাকার চঞ্চলতার ভেতর ডুবে যাচ্ছিল। স্বপ্নে সে মৈত্র থাকল না। বাংলাদেশের নাবিক বসন্তনিবাস হয়ে গেল। সে বন্দরে এলেই ছোট ছোট শিশুরা টের পেয়ে যায়—শহরে বসন্তনিবাস এসে গেছে। পার্কে ছোট ছোট মেয়েরা ছেলেরা তখন সকাল সকাল খেলতে চলে আসে।

তার গায়ে লম্বা আলখেল্লা। লাল আর রুপোলী রঙের রাংতা আঁটা এবং রাংতার ওপর বিচিবর্ণের সব খেলনা সেপটিপিন দিয়ে আটকানো। সে নানারকম দ্বীপ থেকে খেলনা কিনে নিয়ে

যায়। মরিশাসের কাঠের হাতি, কলম্বোর উদ্‌বেড়াল আর হাবসী দ্বীপের কাঠবেড়ালি ওর বড় প্রিয়। যখন সে হাঁটে খেলনাগুলো নেচে বেড়ায় শরীরে। পাখিরা সব উড়ে আসে সমুদ্র থেকে। মাথায় থাকে তার নীল রংয়ের টুপি, টুপিতে ময়ূরের পালক। পালকটা বাতাসে নড়লে আশ্চর্য মানুষ হয়ে যায় সে। কিছু প্রজাপতি উড়ে আসে তখন বন থেকে। শিশুরা বালিকারা চারপাশে লাফায়। সে শরীর থেকে খুলে খুলে খেলনাগুলো ওদের দিয়ে দেয়। সে এভাবে ওদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে ভালবাসে। আর কোথাও যায় না। কাজ শেষ হলেই পার্কের কাছে একটা দেবদারু গাছের নিচে এসে বসে থাকে।

তার আর অন্য জাহাজিদের মতো সরাইখানায় খেয়ে দেয়ে ফূর্তি করতে ভাল লাগে না। বরং লম্বা বুটজুতো পরে সে যখন হাঁটে, নিজের ভেতরে এক আশ্চর্য মানুষ আছে, সে টের পেয়ে যায়। জাহাজে ফিরে এসে টুপিটা খোলার সময়, সন্তর্পণে পালকটা খুলে রাখে। ওটা খোয়া গেলে সে আর আশ্চর্য মানুষ থাকবে না। পাখিরা উড়ে আসবে না সমুদ্র থেকে। মাথার ওপর থেকে প্রজাপতিরা ফিরে যাবে বনে। তার প্রাণের চেয়ে বেশি মায়া হয় তখন পালকটার জন্য। পালকটা হারিয়ে গেলে সে ফের সাধারণ মানুষ হয়ে যাবে। স্বপ্নটা কিছুতেই শেষ হচ্ছে না।

সে জাহাজে ফিরে দেখল, মাথায় তার পালক নেই। সে বুঝতে পারল ওটা ওরা কেউ নিয়ে গেছে। সে ওদের নিয়ে সমুদ্রের ধারে ধারে গান গেয়ে বেড়াচ্ছিল। বাংলাদেশের গান গাইছিল। অথবা চারপাশে ওরা যখন হাত ধরে গোল হয়ে পা তুলে নাচছিল তখন কেউ চুরি করে নিয়ে গেছে।

সে আবার ফিরে গেল দেবদারু গাছটার নিচে। ওরা আসবে। সে সবাইকে পালকের কথা বলবে ভাবল। কিন্তু আশ্চর্য, সবাই এসেছে। কেবল ম্যাণ্ডেলা আসে নি। সে হাঁটতে হাঁটতে সমুদ্রের ধারে সেই মিকি-মাউসের মতো বাড়িটার দিকে চলে যেতে থাকল। সে পৌঁছে দেখল, ম্যাণ্ডেলাদের বাড়ির সামনে একটা সিলভার ওকের গাছ আছে। গাছটা দেখেই বাড়িটা চিনতে পারল। মনে হচ্ছে বাড়িটা খালি, কেউ নেই। কেবল ছোট ঝাউগাছের নিচে সে দেখতে পেল একটা ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা। সে ওকেই বলল, ম্যাণ্ডেলা বাড়িতে আছে?

ক্যাঙ্গরুর বাচ্চাটা কক-কক করে ডাকতেই একটা লাল রঙের জানালা খুলে গেল, ম্যাণ্ডেলার শুকনো মুখ ভেসে উঠল। তার কেমন মায়া বেড়ে গেল। যেন ম্যাণ্ডেলা সত্যি ধরা পড়ে গেছে।

সে বলল, কাউকে বলব না ম্যাণ্ডেলা। তুমি আমার পালক চুরি করেছ কাউকে বলব না। পালকটা আমাকে ফিরিয়ে দাও।

ম্যাণ্ডেলা কেমন কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, ওটা আমার মা'কে এনে দিয়েছি বসন্তনিবাস। আমার মা একটা ময়ূরের পালক স্বপ্নে দেখেছে। এক রাজা বিদেশ থেকে এসেছে, তার মাথায় ময়ূরের পালক। তোমাকে আমার সেই রাজা মনে হয়েছে। আমার মায়ের খুব অসুখ।

স্বপ্নটা কিছুতেই শেষ হচ্ছিল না।

একটু থেমে বলল ম্যাণ্ডেলা, রাতে মা'র স্বপ্নটা আমিও দেখেছি। দেখলাম, পালকটা এনে মায়ের শিয়রে রেখে দিতেই মা ভাল হয়ে উঠছে। তুমি আমার মাকে দেখবে?

সে ম্যাণ্ডেলার হাত ধরে ঘরে ঢুকে গেছে। সে দেখল, পাতলা মসলিনে শরীর ঢেকে ম্যাণ্ডেলার মা শুয়ে আছে। মুখ কেমন নীল হয়ে গেছে। চোখ দু'টো আশ্চর্য তাজা।

আর ওটা ফিরিয়ে নেবার ইচ্ছে হল না তার। যদিও সে জানে বন্দরে ওটা পরে বের হতে না পারলে বসন্তনিবাস পাগল হয়ে যেতে পারে। পালকটা যেন এক সন্ত-মানুষ তাকে দিয়েছিল। বলেছিল, বন্দরে যাবি ওটা মাথায় পরবি। নীল আকাশের নিচে হেঁটে গেলে দেখতে পাবি সমুদ্র থেকে সব পাখিরা, বন থেকে সব প্রজাপতিরা উড়ে আসছে। ওটা পরলে তুই এক দামী মানুষ হয়ে যাবি।

তবু কেন জানি ম্যাণ্ডেলার শুকনো মুখ, ওর মায়ের আশ্চর্য তাজা চোখ দেখে ওটা ফিরিয়ে নিতে ইচ্ছে হল না বসন্তনিবাসের। সে একা একা ফিরে এল জাহাজে। পাখিরা অথবা প্রজাপতিরা আর কেউ মাথার ওপর উড়ে এল না।

বসন্তনিবাস সাধারণ মানুষ হয়ে যেতেই মৈত্রের ঘুম ভেঙে গেল। স্বপ্নটা শেষ হয়ে গৈল। ধড়ফড় করে উঠে বসল। দেখল, অমিয় জাহাজে ফেরেনি। ওর বাংক খালি। খাবার ঢাকা পড়ে আছে। দরজা খোলা। সে দরজা বন্ধ করে ফের শুয়ে পড়ল। শুয়ে পড়ার সময় মনে হল ম্যাণ্ডেলার মা'র মুখ অতীব তার চেনা। কোথায় যেন তাকে সে দেখেছে। বুঝতে পারল স্বপ্নে সারাক্ষণ এলসা দ্য কেলিকে সে দেখেছে। শেফালী হয়তো। ঠিক তেমনি একজন সমুদ্রগামী মানুষের ঘরে ফেরার প্রতীক্ষায় শুয়ে আছে। এবং শেফালীর কথা ভাবতে ভাবতে সে আর সারারাত কিছুতেই ঘুমোতে পারল না।

॥ বত্রিশ ॥

সকাল থেকে ভীষণ কুয়াশা। চারপাশের কিছু দেখা যাচ্ছে না। আবার ঠাণ্ডা জোর পড়েছে। রবিবার বলে জাহাজিদের ছুটি। কুয়াশার আবছা অন্ধকারে গোটা বন্দর এলাকা একেবারে ডুবে আছে। পাশের মানুষটিকে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে না, কেবল জাহাজের ভোঁ ভোঁ শব্দ। মোটর-বোটগুলো ভীষণ হাঁকছে। আবছা অন্ধকারে কিছু দেখতে পাচ্ছে না বলে কেবল ভোঁ ভোঁ করছে। আর্চি জাহাজেই আছে। বের হচ্ছে না। গতকাল বিকেলে বের হয়ে সে ভীষণ ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিল। এমন হবে যদি জানত, তবে বের হত না।

বন্দর এলাকাতে সে টের পায় নি, সবাই ওকে দেখছে। সবারই চোখ ট্যারা কারণ মানুষের মুখ বাঘের মতো হয়ে যায় দেখতে, আর্চিকে দেখার আগে তারা তা জানত না। শহরে সে গিয়েছিল কিছু কেনা-কাটা করবে বলে। পিকাকোরা পার্কে ঘুরে বেড়াবে ভেবেছিল। যদি কোনও মাউরি মেয়ের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ হয়ে যায়। শুঁড়িখানায় ঢুকে মেয়েদের খোঁজ খবর নিয়েছিল, এমনকি বন্দর থেকে বের হবার মুখে দু-এক জায়গায় খোঁজ করতে গিয়ে দেখেছে বৃথা। খোঁজ খবর সে পায় নি, এবং দেখাসাক্ষাৎ হয় নি তা ঠিক না। ওকে দেখলেই—সবাই এত বেশি হাসাহাসি করেছে অথবা দরদামে এমন একটা ভাব দেখিয়েছে আর্চির পায়ের রক্ত মাথায় উঠে গেছে। যত পায়ের রক্ত মাথায় উঠে যাচ্ছে তত ক্ষেপে যাচ্ছিল। জাহাজে বালিকা যুবতী হচ্ছে, আর বালিকা যে তার হাত কামড়ে দিয়েছিল প্রায়, ছেড়ে না দিলে ঠিক কামড়ে দিত, এ-সব ভেবে সে আজ সকাল থেকেই মদ খাচ্ছে।

আর্চি দরজা বন্ধ করে বসে রয়েছে। মেস-রুম-বয় মাঝে মাঝে ডাকলে হাজিরা দিচ্ছে। আর কিছু না। জাহাজের কাজকাম শেষ হয় না। সবাইকে কাজ ভাগ করে দিয়েছে। ছোটবাবুকে বিল্‌জে পাঠাতে পারলে সে যেন প্রতিশোধ নিতে পারত। কিন্তু সে আর পাঠাতে পারছে না। সবাইকে নামতে হবে, একদিন ছ'নম্বর নামলে দ্বিতীয় দিন পাঁচ নম্বর, এভাবে ঘুরে ঘুরে সবাই কাজটা করবে। সে যত মদ খাচ্ছিল তত বুঝতে পারছে জাহাজে এভাবে সে সবাইকে ক্ষেপিয়ে তুলতে পারে না। কাপ্তান টের পেয়ে গেছে, ছোটবাবুকে অহেতুক ব্রিজের ভেতর সে ফেলে রেখেছিল। বিল্জ-পাম্প ঠিক কাজ করছে, কোথাও কোনো বাল্ব আর্চি ইচ্ছে করে এঁটে দিয়েছিল এবং ব্রিজে জল জমিয়ে এটা করেছে তিনি তা টের পেয়েছেন। এটা ওর উন্নতির পক্ষে ক্ষতিকর। সে এখন কিভাবে যে ছোটবাবুকে ফের নাজেহাল করবে বুঝতে পারছে না। উপায় উদ্ভাবনের জন্য সে কেবল পায়চারি করছে। গতকাল শহরের শিশুরা ওকে একটা অদ্ভুত জীব ভেবে পেছনে পর্যন্ত লেগেছিল।

আর তখন ছোটবাবু লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে ডেকে। কান খাড়া করে রেখেছে। বারোটার ঘণ্টা বাজলেই ছুটি। যা কাজ দিয়েছে মেজ-মিস্ত্রী সে আর চার নম্বর মিলে বারোটার ভেতর শেষ করে ফেলতে পারবে। রবিবারে কাজকর্ম কাপ্তান খুব একটা পছন্দ করেন না। অন্তত বন্দরে একটা দিন সপ্তাহে ছুটি থাকবে না, একটা দিন সপ্তাহে ডাঙায় নেমে হৈ-চৈ করবে না, তা হয় না। এত লম্বা সফরে জাহাজিদের মন-মেজাজ ঠিকঠাক রাখা চাই। মেজ-মিস্ত্রী খুব কাজ দেখাচ্ছে।

সুতরাং বারোটার পর তার ছুটি। সে ভাল করে স্নান করবে। বেশ গরম জলে স্নান। তারপর ডাইনিং হলে আহার। এবং বার বার মনে হচ্ছিল সে আসছে। ক্যাথারিন আসছে। তাদের নিতে আসবে ক্যাথারিন।

জ্যাকের সঙ্গে আবার কথা বন্ধ। সে তার বাবার কাছে অথবা কেবিনে থাকছে। মাঝে মাঝে ফানেলের গুঁড়িতে চিপিঙ করার ছুতোয় বসে থাকছে। সে পাশ কাটিয়ে গেলে আগের মতো ছুটে আসছে না। সে যদি কথা বলে সেই ভয়ে যেন জ্যাক কাজে বেশি মনোযোগী হয়ে যাচ্ছে। জ্যাক কাজে বেশী মনোযোগী হয়ে গেলে ছোটবাবু কথা বলতে আর সাহস পায় না। জ্যাকের চুল শুধু পেছন থেকে দেখতে পায়। চুল ঘাড় পর্যন্ত নেমে এসেছে। নীলাভ চুলে

সোনালী সূর্য মাঝে মাঝে কিরণ দিলে, সে থমকে দাঁড়ায়। বালিকার মতো কেন যে মনে হয় তখন জ্যাককে। সে দাঁড়িয়ে পড়ে।

এবং এভাবে ওর ভারি ইচ্ছে ছিল বলে, জ্যাক, ক্যাথারিন আসছে।

কিন্তু জ্যাক কোনো কথাই বলতে চায় না। সে বলতেই পারে নি, জ্যাক ক্যাথারিন আসছে। তুমি যাবে আমাদের সঙ্গে?

সে গতকাল সন্ধ্যায় নিচে নেমে যাবার সময় দেখেছে, জ্যাক বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে আছে। সারাদিন জ্যাক ওপরে ছিল। দিনের বেলাতে বাইরে বের হওয়া যাচ্ছে না, কেবল সারা ডেকময় সালফারের গুঁড়ো উড়ছে। সবাই মাথায় টুপি পরে এবং রুমাল বেঁধে মুখ ঢেকে কাজকর্ম করছে। জ্যাক বোধ হয় এত নোংরা ঘাঁটতে পছন্দ করে না। সে সারাদিন বাপের সঙ্গে ব্রীজেই প্রায় বসেছিল। একবার নিচে থেকে বলার ইচ্ছে ছিল, যাবে নাকি জ্যাক। আমরা পিকাকোরা পার্কে ঘুরতে যাচ্ছি। আগামীকাল মিস ক্যাথারিন আসছে। ভারী সুন্দর মেয়ে। কথা বললে বুঝতে পারতে ক্যাথারিন কত ভালো মেয়ে।

মিস ক্যাথারিন উড, ভারী সুন্দর নাম মেয়ের। সে একবার মাত্র মুখ তুলে দেখেছিল। ভাল করে দেখেও নি। ক্যাথারিন ওকে চুরি করে দেখছিল। সে যে কেন ভাল করে দেখতে পারল না। একবার সেও চুরি করে দেখবে ভেবেছিল। কিন্তু যদি চোখে চোখ পড়ে যায়। ওকে বেহায়া ভাবতে পারে। তারপর আর সে জানেই না ক্যাথারিন দেখতে কেমন। চার-পাঁচ দিনেই ক্যাথারিন ওকে ভীষণ চঞ্চল করে তুলেছে। এ-বয়সে মেয়েদের জন্য এমন, আরও বড় হলে সে কি না করে ফেলবে।

দুপুরের দিকে কুয়াশা পাতলা হয়ে যাচ্ছে। ছোটবাবু স্নানাহার শেষে বেশ পরিপাটি বেশভূষায় নিজের কেবিনে বসে রয়েছে। ক্যাথারিন আসছে, সে ডেভিডকে পর্যন্ত বলে নি। সে কেবিনের কোথাও এতটুকু অপরিচ্ছন্ন রাখে নি। যে লোকটা গোলাপ ফুলের তোড়া দিয়ে যায় সে তাকে আজ সবার চেয়ে বড় ফুলের গুচ্ছ দিতে বলেছিল। সাদা গোলাপের গুচ্ছ। ফলদানিতে গোলাপগুচ্ছ। শিশিরে ভেজা গন্ধ এত টাটকা যে সে মাঝে মাঝে নিশ্বাস টেনে নিচ্ছিল। ক্যাথারিন এলেই মৈত্রদা এখানে নিয়ে আসবে।

ছোটবাবু তার মায়ের ছবিটা মুছে ফের টানিয়ে রাখছে। একটা সুন্দর মেয়ের ছবি ক্যালেণ্ডারের পাতায় বেশ হাসছে। সে এখন যেন ছবির মেয়েটাকেই ক্যাথারিন ভাবছে। কেমন লাগছে কেবিনটা। ভাল লাগছে না। তোমরা মেয়েরা ভাল না বললে আমাদের কিছু ভাল লাগে না।

টিপয়ের ওপর কিছু বই। কোথায় কি রাখলে ভাল দেখাবে, একবার যদি জ্যাককে ডেকে এনে দেখাতে পারত। জ্যাক কি করছে! সে জ্যাকের সঙ্গে এ-ব্যাপারে কথা না বলে যেন স্বস্তি পাচ্ছে না। জ্যাকের কেবিনে ঢুকে দেখেছে যেখানে যা রাখলে ঠিক ঠিক মানায় জ্যাক ঠিক সেভাবে সব সাজিয়ে রাখতে জানে। বয়-বাবুর্চিদের কাজ তার পছন্দ না। সে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে ডাকল, জ্যাক।

জ্যাক কেবিনে নেই। জ্যাক বোট-ডেকে একটা ডেক-চেয়ারে চুপচাপ বসে বই পড়ছে। সে পেছনে দাঁড়িয়ে ডাকল, জ্যাক আমার কেবিনে একটু আসবে?

জ্যাক চারপাশে সন্তর্পণে কি দেখল। তারপর বলল, তুমি যাও। আমি যাচ্ছি।

সে নিচে নেমে ভেবেছিল, জ্যাকের আসতে দেরি হবে। অথবা জ্যাক এখন আসছে না। ওকে এড়িয়ে যাচ্ছে। মৈত্রদার ফোকসালে যেতে পারত। সকাল থেকে সে একবারও অমিয়কে দেখে নি। কে কে যাচ্ছে তাও ঠিক জানে না। বাংকের সাদা চাদরে ফুল-লতাপাতা আঁকা। এবং একেবারে পাটভাঙা বলে বেশ মনোরম। সে চাদরটা ভাল করে টেনে দিল। সাদা দেয়ালে সামান্য কালো দাগ, সে তাড়াতাড়ি সাবান জল এনে মুছে সবকিছু পরিচ্ছন্ন করে দেবার সময় দেখল, জ্যাক দরজা খুলে ঢুকছে। এবং ধীরে ধীরে কেবিনের দরজা বন্ধ করে

অনেকটা নিশ্চিন্ত গলায় বলছে, কী, আমাকে ডেকেছ কেন?

ছোটবাবু বলল, কেবিনটা দেখে কিছু মনে হচ্ছে না?

–কী মনে হবে?

ছোটবাবু কেমন দমে গেল। তার অগোছালো কেবিন এমন পরিপাটি জ্যাক কবে দেখেছে! জ্যাক কিছু বুঝতে পারছে না কেন? সে বলল, বারে, তুমি দেখছ না কোথাও এতটুকু ময়লা নেই। সুন্দর গোলাপের গুচ্ছ ফুলদানিতে!

—সে তো দেখতে পাচ্ছি।

—তবে! সব ঠিকঠাক আছে, তাই না?

জ্যাক বুঝতে পারল না ছোটবাবু কি বলতে চাইছে।

—এই যেখানে যা রাখা দরকার।

জ্যাক বলল, না। হয় নি। ফুলদানিটা তো ঠিক রাখো নি। আর ওখানে ওভাবে বই রাখে? লকারের মাথায় ওটা কি ঝুলছে!

ছোটবাবু প্রায় জিভে কামড় বসিয়ে দিয়েছিল।—তাই তো। ওর নোংরা বয়লার স্যুট, লকারের মাথায় ফুলে ফেঁপে থাকায় দেখা যাচ্ছে। জ্যাক যেখানে দাঁড়িয়েছে সেখান থেকে স্পষ্ট দেখা যায়! সে তাড়াতাড়ি লাফিয়ে বাংকে উঠে গেল। বয়লার স্যুটটা চাপা দিয়ে বলল, এবার?

জ্যাক নিজেই হাত লাগাল। এবং জ্যাক যেন এ-কেবিনে এসে প্রাণ পেয়ে গেছে। সে অজস্র কথা বলছে আর কাজে হাত লাগিয়ে এমন চেহারা করে ফেলল কেবিনটার যে ছোটবাবু দেখে অবাক। সে বুঝতে পেরেছিল কেবিনটাকে সে আগের মতোই এলোমেলো করে রেখেছে। কেবল জায়গা বদল ছাড়া এতক্ষণ সে কিছুই করতে পারে নি।

জ্যাক কাজ করতে করতে বলেছিল, হঠাৎ তোমার এমন সুমতি ছোটবাবু!

—আর বলবে না। ক্যাথারিন আসছে।

—ক্যাথারিন! কেমন সহসা কর্কশ গলায় জ্যাক বেঁকে দাঁড়াল। কাজে হাত নেই। সে যেন বজ্রপাতে স্থির।

—মিস ক্যাথারিন উড, ভারী সুন্দর মেয়ে। সে আজ আমাদের নিয়ে যাবে। এলে তোমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব।

জ্যাক চিৎকার করে বলল, না।

ছোটবাবু একেবারে থ। সে বলল, না কেন? তোমার ভাল লাগবে জ্যাক। আমার কি যে ভাল লেগেছে। ওর সঙ্গে কথা বললে তোমারও ভাল লাগবে।

জ্যাক সহসা যা কিছু আছে এই কেবিনে, সে যেভাবে যা কিছু সাজিয়েছিল, নিমেষে কেমন পাগলের মতো লণ্ডভণ্ড করে দিতে থাকল। আর বলতে থাকল, তুমি একটা নচ্ছার পাজি। তুমি নরক ছোটবাবু।

ছোটবাবু হতাশ। জ্যাক মেয়ের কথায় আবার ক্ষেপে গেছে। সেই ভয়ঙ্কর চোখ। যেন জ্যাক এক্ষুনি এ-কেবিনে আগুন ধরিয়ে দেবে এবং সে যখন দেখল জ্যাক মুহূর্তে ওর সুন্দর ফুলদানিটা আছাড় মেরে ভেঙে ফেলছে তখন আর স্থির থাকতে পারল না। সে বলল, জ্যাক প্লিজ। আমি আর তোমাকে ডাকব না। তুমি ওটা ভেঙে ফেলো না। এবং হাত ধরে ফেললে জ্যাক কেমন আরও পাগলের মতো হাত ছিনিয়ে নিল। তারপর দু'হাতে ছোটবাবুর ফ্লানেলের শার্ট ছেঁড়া কাগজের মতো ছিঁড়ে দরজা খুলে ছুটে বেরিয়ে গেল। ছোটবাবু পাথরের মতো স্থির। একটা আর কথা বলতে পারছে না। আয়নায় নিজের ছেঁড়া পোশাকের দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হল। জ্যাক তুমি পাগল। তুমি আমার এমন সুন্দর দিনটা এভাবে

নষ্ট করে দিলে!

তখন মৈত্রদার গলা—ছোট আছিস?

ছোটবাবু তাড়াতাড়ি বিছানার চাদারটা টেনে গায়ে জড়িয়ে ফেলল। বলল, একটু দাঁড়াও। তাড়াতাড়ি সে ভাঙা ফুলদানি গোলাপের পাপড়ি সংগ্রহ করার সময় দেখল ক্যাথারিনকে নিয়ে মৈত্রদা ঢুকে যাচ্ছে। ঢুকেই মৈত্র অবাক। ঘরটাতে যেন এখুনি একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়ে গেছে। মৈত্র বলল, ছোটবাবুর কেবিন।

ছোটবাবু বলল, এই আমার কেবিন। বস।

মৈত্র বলল, ফুলদানিটা হাত থেকে ফেলে ভেঙেছিস?

ছোটবাবু বলল, হ্যাঁ। পড়ে গেল।

—বাংকের এ অবস্থা কেনরে? ভারি নোংরা তুই। এমন সুন্দর কেবিনটাকে কি করে রেখেছিস? ছোটবাবু বলল, সময় পাই না দাদা। একবার ইচ্ছে হল বলে, নচ্ছার ছেলেটা আবার আমার পেছনে লেগেছে। চিৎকার করে বলতে পারলে যেন তার দুঃখ হতাশা লাঘব হত। কিন্তু সে বলতে গিয়েও থেমে গেছে। কাপ্তানের ছেলে জ্যাক। সারেঙসাব বার বার তাকে সতর্ক করেছেন। সে তার বোকামির জন্য ভুগছে—কে কি করতে পারে।

মৈত্র বলল, ক্যাথারিন তুমি কিছু মনে করবে না। আমাদের ছোটবাবুর ভারি অগোছালো স্বভাব।

—না-না। এ-বয়সে এটা হয়।

ছোটবাবুর বলতে ইচ্ছে হয়েছিল—হ্যাঁ হয়। তুমি আমাকে আর শেখাবে না। কিন্তু মুখে সামান্য হাসি ফুটিয়ে বলল, কখন এলে?

—এই এক্ষুনি।

মৈত্রদার দিকে তাকিয়ে ছোটবাবু বাংলায় বলল, ওকে তোমার ফোকসালে নিয়ে বসাও। আমি যাচ্ছি। ছোটবাবুকে ভীষণ রাগী দেখাচ্ছিল। মৈত্র কেন জানি ছোটবাবুর সঙ্গে আর একটা কথা বলতে সাহস পেল না। সে ক্যাথারিনকে নিয়ে ডেক পার হয়ে গেল। এবং ক্যাথারিন এসেছে, জাহাজে ডেকের ওপর তাকে দেখা গেছে, সবার মুখে তখন যেন একটাই শব্দ, মেয়ের নাম ক্যাথারিন। পাতলা ভয়েলের স্কার্ট, এবং হাঁটুর নিচে খালি পায়ের সুচারু দৃশ্য। হাতে সাদা দস্তানা। এবং সোনালী চুল। স্কার্টের ওপর মীনা করা রঙ্গীন কাঁচের প্রজাপতি। এবং চোখ ভারি সুন্দর মেয়েটার। নাক একটু চাপা। থুতনির এক পাশে প্রজাপতির মতো দ্বীপবাসীদের ছোট উল্কি আঁকা। আর সুগন্ধ শরীরে। তখন সব নাবিকেরা যে যার খাবার ফেলে উঁকি মেরে দেখছিল।

তারপর এক সময় ছোটবাবু, মৈত্র, বঙ্কু, অনিমেষ নেমে যেতে থাকল। অমিয় নেই। সকাল থেকে সে কোথায় বের হয়েছে। সংগোপনে সে কিছু একটা করছে। ওরা যেতে যেতে দেখতে পেল না, ঠিক ওপরে তখন বোট ডেকের কোনো কেবিনে দাঁড়িয়ে ওদের চলে যাওয়া লুকিয়ে কেউ দেখতে পারে। এবং ওরা বুঝতে পারছে না, জ্যাক পোর্ট-হল থেকে অপলক দেখছে। ছোটবাবুর পাশে সেই মেয়েটা। মেয়েটার মুখ সে দেখতে পাচ্ছে। ওরই মতো লম্বা। চুল সোনালী—কি সুন্দর পোশাক পরে এসেছে। ছোটবাবুকে নিয়ে যাচ্ছে মেয়েটা। কেমন যাদুমন্ত্রের মতো ছোটবাবুর পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছে। আর এক অতীব অধীরতা। ওর ভেতরে হাহাকার বাজছে। সে ছোটবাবুর কেবিনে যা সব করে এসেছে! আর এ-সব ভেবে সে ভীষণ ম্রিয়মাণ। কেবল ওদের চলে যাওয়া দেখছে। পোর্টের ওপাশে ওরা হারিয়ে গেল। ক্রেনের ছায়া পার হলে ছোট পাহাড়ী উপত্যকাতে ওরা উঠে গেল। আর জ্যাক একান্তে সে-সব দেখতে দেখতে কি করবে স্থির করতে পারল না।

আয়নায় সে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। নিজেকে দেখল। সে এবার ওর সবচেয়ে ভাল

পোশাক এবং দামী আতর, প্রজাপতি ক্লিপ কিছু রয়েছে কিনা, সোনালী দস্তানা অর্থাৎ ক্যাথরিন যে যে পোশাকে এ জাহাজে উঠে এসেছে ঠিক সেই সেই পোশাকে—যেমন সে হাতে শেষ পর্যন্ত সোনালী দস্তানা না পরে সাদা দস্তনা পরেছে। পাতলা ভয়েলের স্কার্ট এবং ওর শরীর এত বেশি সুচারু যে সব পোশাকই ভীষণ মানিয়ে যায়। জ্যাক জানত না মেয়েটার থুতনির নিচে ছোট্ট একটা প্রজাপতি উল্কি আছে। প্রজাপতির এই উল্কি ক্যাথারিনকে মায়াবিনী করে ফেলতে পারে। জ্যোৎস্না রাতে যদি ক্যাথরিন মাঠ পার হয়ে যায় ছোটবাবুর সঙ্গে তবে ঠিক ক্যাথারিনের উল্কিটা উড়ে উড়ে ছোটবাবুর চিবুকে বসে পড়বে। জ্যাক দুর থেকে দেখেছে ক্যাথারিনকে। অভিমানে সে প্রথম দেখতেই চায়নি। কিন্তু পরে কি মনে হয়েছে সে কেমন মেয়ে যার সঙ্গে ছোটবাবু অনায়াসে চলে যেতে পারে—জ্যাক শেষ পর্যন্ত স্থির থাকতে পারে নি। পোর্ট-হোলের কাঁচ খুলে দেখেছে ওরা হাসতে হাসতে তখন জেটি পার হয়ে যাচ্ছে। থুতনির নিচে প্রজাপতির উল্কি আঁকা আছে ক্যাথারিনের, জ্যাক এত দূর থেকে তা টের পেল না। প্রজাপতি আঁকা আছে দেখতে পেলে জ্যাক ঠিক পেনসিলে থুতনির নিচে সুন্দর একটা প্রজাপতি পর্যন্ত এঁকে রাখত। ছোটবাবুকে বলতে পারত, দ্যাখো থুতনির নিচে আমারও ছোট্ট প্রজাপতি আছে। আমাকে তুমি অবহেলা করে এত কষ্ট দিও না।

আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে ক্রমে ভীষণ অধীর হয়ে পড়ল জ্যাক। ভেতরে কি যে ভীষণ জ্বালা! ওর কিছু ভাল লাগছে না। সব ভেঙেচুরে দিতে ইচ্ছে করে। এবং নিজেকে সে ভেতরে বন্দী করে রেখেছে। সে দেখেছে রেগে গেলে তার মাথা ঠিক থাকে না। ওপরে উঠে বাবার পাশে বসে থাকতে পারত। যখন তার সবকিছু হারিয়ে যায় বাবার পাশে বসে থাকলে কেমন একটা নিরিবিলি শান্তি। সব শোক দুঃখ বাবার কাছে গেলে সে ভুলে যেতে পারে। কিন্তু এখন তার বাবার কাছে যেতে পর্যন্ত ইচ্ছে হচ্ছে না। সে বুঝতে পারছে ওর চোখে ভীষণ জ্বালা ফুটে উঠেছে। সে এখন কি করবে ঠিক বুঝতে পারছে না।

সে কতক্ষণ এভাবে ঠিক ক্যাথারিনের মতো পোশাক পরে দাঁড়িয়েছিল জানে না। সে কতক্ষণ এ-ভাবে নিজেকে দেখতে দেখতে নিবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল বুঝতে পারছিল না। সে এখন কি করবে! সে সহসা আর্তনাদ করে উঠল, আমি কি করব ছোটবাবু। আমাকে তুমি কেন বুঝতে পার না।

বোধহয় এই বুঝতে না পারার জন্য জ্যাক মরিয়া হয়ে উঠেছিল। কিছু একটা করার কথা ভেবে ছটফট করছিল। যেন ছোটবাবুকে ছিঁড়ে ফুঁড়ে দিয়েও তার শান্তি নেই। সে নিজেকে নানাভাবে ক্ষত- বিক্ষত করে এখন ছোটবাবুর কাছে ধরা দিতে চায়। ওর ইচ্ছে হচ্ছিল, ছোটবাবু ফিরে এলে, সে ছোটবাবুর কেবিনে ঢুকে যাবে। দরজা বন্ধ করে দেবে। তারপর দু'হাতে যে-ভাবে ছোটবাবুর ফ্লানেলের শার্ট দাঁতে ছিঁড়ে ফেলেছে, তেমনি নিজের পোশাক নাভিমূল পর্যন্ত ছিঁড়ে দেখাবে—এই দ্যাখো—আমি কি দ্যাখো। আমি বনি। কাপ্তানের একমাত্র মেয়ে বনি। বাবা আমাকে গোপনে জাহাজে ছেলে সাজিয়ে রেখেছে।

তারপর যখন মনে হয়, এ-ভাবে ধরা দিলে তার কাছে ভীষণ ছোট হয়ে যাবে বনি, তখন দুঃখ আর অবিমিশ্র কান্না। বালিকার মতো দু'চোখ ভাসিয়ে দিতে পারে গোপনে। কেউ জানল না, ক্ষোভে দুঃখে মেয়েটা নিজের কেবিনে একান্তে বসে কাঁদছে।

তখন ক্যাথারিন বলল, কেমন লাগছে ছোটবাব?

—খুব সুন্দর।

—এমন সুন্দর দেশ আর হয় না।

—তা হবে। ছোটবাবুর কথায় যেন প্রাণ ছিল না।

গাড়ি যাচ্ছে। গাড়ি চালাচ্ছিল ক্যাথারিন। শহর ছাড়ালেই বড় রাস্তা। ক্যাথারিন বলল, গাড়ি ওয়েস্ট কোস্ট রোড ধরে যাচ্ছে। দূরে এগমন্ট হিলের চূড়ো দেখতে পাচ্ছ?

ছোটবাবু কথা বলছে না। মৈত্র বুঝতে পারছে ছোটবাবুর রাগ পড়ে নি। রাগ পড়লে

ছোটবাবু ছেলেমানুষের মতো এটা কি ওটা কি করত। মৈত্র বলল, তোর কি হয়েছে রে ছোট?

—কি আবার হবে!

তখন অনিমেষ বলল, সত্যি ভারি সুন্দর জায়গা। ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না।

বঙ্কু বলল, এমন সুন্দর মেয়ে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে গেলে কারো ছেড়ে যেতে ভাল লাগে না।

ক্যাথারিন বুঝতে পারছে না, বাংলায় বললে না বোঝারই কথা। অনিমেষ, বঙ্কু ভাল ইংরেজী বলতে পারে না। একবার ইচ্ছে হয়েছিল মৈত্র বলে, বঙ্কু ক্যাথারিন তোদের কথা বুঝতে পারছে না। যতটুকু পারিস ইংরেজীতে বল। ও হয়তো ভাববে ওর সম্পর্কে কিছু বলছিস। কিন্তু মৈত্র জানে, তবে অনিমেষ, বঙ্কু একেবারে চুপ মেরে যাবে। একটা কথাও বলবে না। কথা বলতে ওদের সংকোচ হবে।

মৈত্র ক্যাথারিনকে বলল, বঙ্কু অনিমেষ ভাল ইংরেজী জানে না। ওরা কথা বললে তুমি কিছু মনে কর না।

ক্যাথারিন যেন কিছুই শুনছে না। সে সাদা রঙের গাড়ির ভেতরে স্টিয়ারিংয়ে হাত রেখে অনেক দূরে যেন কিছু দেখছে। আসলে কিছুই দেখছে না। বড় বড় ট্রাক বাস সব সাঁ সাঁ করে বের হয়ে যাচ্ছে। এবং যেন গাড়ি নিজের ইচ্ছেমতো গতিবেগ বাড়িয়ে প্রায় উড়ে চলেছে। ক্যাথারিনের চুল মাঝে মাঝে উড়ে এসে মুখে পড়ছে। সে ছোটবাবুকে এই দেশ সম্পর্কে কত কথা বলে যে যাচ্ছে।

ক্যাথারিন বলল, আসলে ছোটবাবু আমাদের ছোট শহরটা এগমন্ট ন্যাশানাল পার্কের ভেতরে। ডানদিকে ডসন ফলস্ ফেলে চলে যাচ্ছি। ঐ যে দেখছ পাহাড়ের ওপর বাড়িটা, ওটা ডসন ফলস্ টুরিস্ট লজ। দু'একদিন এখানে এসে থাকতে পার। এখন তত ভিড় নেই। ফেব্রুয়ারিতে ন'দিন ধরে আমাদের পাইন ফেস্টিভ্যাল। তখন তোমরা হয়তো থাকবে না।

মৈত্র বলল, থেকে যেতেও পারি। যা আমাদের একখানা জাহাজ।

ক্যাথারিন কেমন ছেলেমানুষের মতো বলল, থেকে গেলে কি যে মজা হবে না! দাদু একেবারে সে ক'দিন তোমাদের তার যা কিছু ভাল ভাল খাবার—এই যেমন ছোট ভেড়ার বাচ্চার রোস্ট আর তোহে রো স্যুপ। পৃথিবীর সবচেয়ে দামী ওস্টার থেকে তৈরি। দাদু ঠিক তোমাদের হোয়াইটবেইট না খাইয়ে ছাড়বে না। আরও কত সব খাবারের নাম যে বলে যেতে লাগল ক্যাথারিন। যেন দেশটাতে শুধু পর্যাপ্ত খাবার, এবং ফুলে ফলে ভরা। ওরা যেতে যেতে আপেলের বাগান দেখতে পেল মাইলের পর মাইল। আঙ্গুরের জমি, গমের ক্ষেত, ভেড়ার পাল পাহাড়ী উপত্যকাতে হাজারে হাজারে চরে বেড়াচ্ছে। আর কেবল সবুজ সমারোহ।

ছোটবাবুর যা স্বভাব, খাবারের নাম শুনলেই জিভে জল আসে। ওর যত রাগ জ্যাকের ওপর ছিল ক্রমে কমে আসছে। এই মেয়ে, ক্যাথরিন ওর সমবয়সী হবে, অথবা কিছু বড় হতে পারে, কি সুন্দরভাবে গাড়ি চালাতে শিখে গেছে। আর যেন কতকালের চেনা, কত সহজ কথাবার্তা। মনেই হয় না তিন-চার দিন আগে সামান্য সময়ের জন্য ওরা ক্যাথারিনকে দেখেছিল। ওর এখন কথা বলতে বেশ ভাল লাগছে। সে বলল, শীতকালে ঠাণ্ডায় খুব কষ্ট পাও না!

–কেন বল তো?

–এখনই যা শীত।

ক্যাথারিন হেসে ফেলল। কোথায় শীত! ছোটবাবু জ্যাকের দেওয়া গরম পোশাক পরে এসেছে। কারণ এর চেয়ে দামী স্যুট ওর নেই। ক্যাথারিনকে সে তার পোশাক এবং সৌন্দর্যে মুগ্ধ করতে চেয়েছিল। এটা ছোটবাবুর স্বভাব। মেয়েদের সঙ্গে সহজে কথা বলতে পারে না। কিন্তু ক্যাথারিন যেভাবে অতি সহজে কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে তাতে সে কিছুতেই আর চুপচাপ

থাকতে পারছিল না।

ক্যাথারিন বলল, আমাদের দেশটাতে খুব শীতও পড়ে না, খুব গরমও পড়ে না। দশের বেশি নামে না সাতাশের বেশি ওঠে না। এমন সুন্দর দেশ কোথায় পাবে বল।

–তুমি তো ভারতবর্ষে থাকতে। তোমার তো কষ্ট হবার কথা।

–বাবা মা মারা যাবার পর দাদু আমাকে এখানে খুব ছোটবয়সে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মামারা এখানে থাকতেন। বছর চার-পাঁচ আগে দাদু আসেন।

বাবা মার কথা বলেই মেয়েটা চুপ মেরে গেল। বুড়ো মানুষটার কোথায় দুঃখ ছোটবাবু এতক্ষণে ধরতে পারছে। মৈত্রও কেমন গম্ভীর হয়ে গেল। রাতের বেলা বুড়োকে দেখে এবং এই মেয়ে ক্যাথারিনকে দেখে সে যা সব ভেবেছিল!

বঙ্কু অনিমেষ পেছনে আছে। ওরা বোধহয় ক্যাথারিনের সব কথা ঠিক বুঝতে পারছে না। নিজেরা নানারকম কথা বলে যাচ্ছিল, কখনও ক্যাথারিনের চুল, কখনও সুন্দর মেয়ে রাস্তায় দেখলে অথবা এই ক্যাথারিন যে বেশ তাদের বাড়ি-ঘরের কথায় ভুলিয়ে রাখছে এ-সব সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত সব মন্তব্য। ভাগ্যিস ক্যাথারিন বুঝতে পারছে না। বুঝতে পারলে ক্যাথারিনের লজ্জায় গাল লাল হয়ে উঠত।

ছোটবাবুর মনে হল, বুড়ো মানুষটা তার সন্তান সন্ততি অথবা বাপ পিতামহকে এবং এ-ভাবে বলা যায়, ওর যা কিছু নিজের বলতে, সবাইকে ভারতবর্ষের মাটিতে রেখে এসেছে। যতই চলে আসুক দূরে, কখনও কখনও স্মৃতি তাকে অস্থির করে তোলে। সে তখন হয়তো কোনো জাহাজের সন্ধানে থাকে। ভারতবর্ষের নাবিকেরা বন্দরে এলে এই বুড়ো মানুষটা রাতের বেলা লণ্ঠন জ্বেলে তাদের খুঁজে বেড়ায়। শহরে বন্দরে লণ্ঠন জ্বেলে চলে আসা কিছুটা বিস্ময়ের। একবার ভেবেছিল বলবে, ক্যাথারিন, তোমার দাদু কি চোখে কম দেখতে পান!

ক্যাথারিন নিজেই এখন বলছে, বাবা মারা যাবার পর দাদু কেমন ভীতুগোছের মানুষ হয়ে গেছেন। সামান্য অন্ধকার দেখলেই ভীত হয়ে পড়েন। অন্ধকার একদম সহ্য করতে পারেন না। যতই আলো থাক, তাঁর ঘরে সব সময় রাতে লণ্ঠন জ্বেলে রাখা হবে। কখন কি তার-টার শর্ট হয়ে যাবে, অন্ধকারে ডুবে যাবেন ভাবতেই ওর মুখ নীল হয়ে যায়।

গাড়ি চলছিল আর এমন সব কথাই হচ্ছিল। ওরা অনেকটা পথ চলে এসেছে। কখনও সমতল ভূমি, কখনও নীল পাহাড়ী উপত্যকা পার হয়ে যাচ্ছে। আর সেই ড্যাং ড্যাং করে পুজোর বাজনার মতো কেবল কি যেন বাজছে ছোটবাবুর মনে। সে ক্যাথারিনকে চুরি করে দেখছিল।

মৈত্র বলল, বেশ দূর!

—কোথায়! ক্যাথারিন ঘড়ি দেখল, মাত্র চল্লিশ মিনিটের মতো এসেছি। আর চল্লিশ মিনিট। বেশ তবেই দেখতে পাবে আমাদের বড় কৌরি-পাইন গাছটা। তার ছায়ার ভেতর কিছুটা দূরে—বেশ জায়গা নিয়ে আমাদের বাড়িটা। ছুটির সময় আমি দাদুর কাছে থাকি। আমাদের এখন লম্বা ছুটি। ক্রিসমাস- ডে, বকসিং-ডে, এনিভারসারি-ডে পাইন-ফেস্টিভ্যাল সব এক সঙ্গে পড়েছে।

ছোটবাবু বলল, অমিয়র কি ব্যাপার বল তো!

ক্যাথারিন বুঝতে না পেরে তাকাল।

মৈত্র বলল, না তোমাকে না। আমাদের আর একটা অপোগণ্ড আছে। ওটাকে নিয়ে আসা গেল না। তারপর ছোটবাবুর দিকে তাকিয়ে বাংলায় বলল, ইয়াসিন গতকাল রাতে ওকে পিকাকোরা-পার্কে ঘুরে বেড়াতে দেখেছে। সঙ্গে সুন্দর মতো একজন মাউরি মেয়ে রয়েছে।

—খুব সুন্দর! ছোটবাবু কথাটা বেশ জোরে বলল।

—খুব সুন্দর! লক্ষ্য করেছিস মাউরি মেয়েরা একেবারে বাঙালী মেয়েদের মতো।

ছোটবাবু বলল, আসলে এরা কিন্তু পলিনেশিয়ান। আমাদের মা বোনদের সঙ্গে খুব মিল ক্যাথারিন এখন চুপচাপ। ওরা যা সব বলছে তার এক বর্ণও বুঝতে পারছে না।

মৈত্র বলল, আমরা মাউরি যুবক-যুবতীদের কথা বলছি ক্যাথারিন। ওরা ঠিক আমাদের মতো দেখতে।

ক্যাথারিন বলল, ছোটবাবু কিন্তু দেখতে তোমাদের মতো নয়।

ছোটবাবু বলল, আমি রাজার মতো দেখতে। সে হা হা করে হেসে উঠল।

ক্যাথারিন বলল, তোমাকে কেমন যেন লাগে। তোমার দাড়ি না থাকলে তোমাকে হয়তো এত ভাল লাগত না। তুমি খুব সুন্দর দেখতে ছোটবাবু।

বঙ্কু বুঝতে পেরে বলল, ছোটবাবু তোমার হয়ে গেল।

অনিমেষ বলল, এই আমরা নেমে যাব। তুমি যাও। তোমার জন্যই এতসব হচ্ছে।

মৈত্র বলল, কি সব হচ্ছে! তোরা কি সব জায়গায় এক রকম থাকবি।

ক্যাথারিন এবার বলল, আমরা এসে গেছি। ঐ দ্যাখো আমাদের সেই কৌরিপাইন গাছটা।

পাশেই ছোট ছিমছাম মাউরি গ্রাম। ঠিক বড় রাস্তার ওপরে। একজন মাউরি বুড়ো মতো মানুষ মাঠে ভেড়ার পাল চরাচ্ছে। প্রায় চারপাশটা যেন তৃণভূমি। ছোট ছোট কাঠের বাড়ি-ঘর এবং দু'পাশে ছোট্ট জলের রেখা, প্রায় পরিখার মতো খনন করা। ওপরে কাঠের পাটাতন। তার ওপরে গাড়িটা উঠে গেলে ওরা দূরে প্রায় ফার্লং-এর মতো দূরে দেখতে পেল সেই বুড়ো মতো মানুষটা সাদা পোশাকে রোদে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে।

.

তখন জ্যাক ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে যাচ্ছে। হিগিনস তখন জরুরী চিঠি লিখছেন হেড-অফিসে। জাহাজের অবস্থা জানিয়ে চিঠি দিচ্ছেন। মেন-জেনারেটর ঠিকমতো কাজ করছে না, বয়লার-চক বসে যাচ্ছে—যা সব মেরামত দরকার এ-বন্দরে সারা যাবে না, জাহাজের সব মেরামতের জন্য বড় বন্দরে দু' চার মাস বসিয়ে না দিলে চলছে না, এ-সব বিস্তারিত লিখে জানাচ্ছেন। জাহাজ ফসফেট নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার বন্দরগুলিতে যাবার কথা। পোর্ট মেলবোর্নে অথবা মেলবোর্ন বন্দরের সাউথ- ওয়ার্ফ জেটিতে ক'মাস ফেলে রাখা দরকার। সাউথ-ওয়ার্ফ জেটিতে সব ভাঙা জাহাজ মেরামতের কাজ হয়ে থাকে, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কিছু ব্যবস্থা করে ফেলতে পারলে হিগিনস জাহাজ নিয়ে বন্দরে ঠিক ঢুকে পড়তে পারবেন। সবই নির্ভর করছে এখন হেড অফিসের মর্জির ওপর।

খুবই জরুরী চিঠি। 'একান্ত গোপন' খামের ওপর লেখা। একমাত্র রিচার্ড ফেল চিঠিটা খুলে পড়তে পারবেন। তখন জ্যাক পাশের চেয়ারে চুপচাপ বসে রয়েছে। তিনি খেয়াল করেননি বনি চার্ট-রুমে ঢুকেছে। চার্ট-রুমের দেয়ালে সব চাবির রিঙ। জাহাজের সব কেবিনের এবং স্টোররুমের সব চাবি ঝুলছে। বনি চাবির গোছা হাঁটকাচ্ছে বসে বসে। বনিকে খুব নিরীহ এবং শান্ত স্বভাবের মনে হচ্ছিল।

হিগনিস বলল, আমার সঙ্গে তুমি বের হতে পার বনি। অকল্যাণ্ডে যাচ্ছি।

বনি বুঝতে পারছে বাবা এজেন্টের সঙ্গে দেখা করতে যাবেন। এখন বের হলে ফিরতে অনেক রাত হবে। গাড়ি যত জোরেই যাক তিন ঘণ্টার আগে বাবা অকল্যাণ্ডে পৌঁছাতে পারবেন না। ফিরতে অনেক রাত হলে আজ আর ছোটবাবুর সঙ্গে দেখা হবে না। ফিরে হয়ত দেখবে ছোটবাবু নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। ছোটবাবুর সঙ্গে সে আজই যা হয় হেস্ত নেস্ত কিছু করে ফেলবে। কারণ মাথার ভেতরে অস্থিরতা তার ক্রমে বাড়ছে। সে কোথাও দু'দণ্ড স্থির হয়ে বসে থাকতে পারছে না। কেবল সেই রাস্তাটা, যেখানে সে দেখতে পাবে হেলে দুলে নেমে আসছে ছোটবাবু, রাস্তাটার দিকে বারবার নজর চলে যাচ্ছে। কেন যে মনে হচ্ছে

জাহাজ ছেড়ে তাকে ছেড়ে, ছোটবাবুর কোথাও বেশি সময় ভাল লাগবে না।

বনি বলল, আমার ভাল লাগছে না।

কাপ্তান বললেন, যাবার সময় ওয়াতেমো গ্রামের ভেতর দিয়ে যাব। গ্রামটা পার হলেই আমাদের গাড়ি সুন্দর একটা গুহার ভেতরে ঢুকে যাবে। কিছুদূর গেলেই দেখা যাবে শুধু পাথর আর পাহাড়, পাহাড়ের ছাদ। মধুর চাকের মতো হিজিবিজি সব জোনাকিদের আবাস। লাল নীল হলুদ রঙ হ্রদের জলে ভাসছে। নৌকায় বেড়াচ্ছে কত সব মানুষ। তাদের দেখতে প্রায় রঙীন ছবির মতো। গ্লো- ওয়ার্মি—গ্রুতোতে হাজার হাজার লার্ভা পাহাড়ের ছাদে দেয়ালে জাদুকরের মতো আলোর মালা তৈরি করছে। এ-সব দেখার জন্য পৃথিবীর সব লোক চলে আসে। এত হাতের কাছে অথচ তুমি যাবে না, এটা ঠিক না।

বনি ততক্ষণে ঠিক চাবিটা খুঁজে বের করে ফেলেছে। সে চাবির গোছাটা পকেটে প্রায় গোপনে ভরে রাখল। বাবা নিরন্তর যেমন কথা বলতে ভালবাসেন, কাজও করতে ভালবাসেন। বনির দিকে তিনি তাকিয়ে কিছু বলছেন না। এই মাথার টুপিটা ঠিক করতে করতে অথবা কোনো মানচিত্রে লাল একটা টিক মারার সময়, অথবা স্টোররুমের স্টক দেখার সময় তিনি যে অনায়াসে গল্প করে যেতে পারেন, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। বনি বাবার এই অফিস-ঘরে চাবি চুরি করতে এসেছে তিনি তা টেরই পেলেন না।

বনি বলল, বাবা শরীরটা ভাল নেই

বনি বড় হয়ে যাচ্ছে বলে মাঝে মাঝে শরীর খারাপ হবে—সুতরাং আর পীড়াপীড়ি করা যুক্তিসঙ্গত নয় ভেবে বললেন, সাবধানে থেকো। বেশি রাত হলে ফিরতে নাও পারি। চিন্তা করবে না। চিফ থাকছে জাহাজে। অসুবিধা হলে ওকে বলবে। থার্ড-মেট সঙ্গে যাচ্ছে।

বনি সরল বালিকার মতো ঘাড় কাত করে দিল। বলল, আচ্ছা।

তারপর সে নেমে গেল। নিজের কেবিনে ঢুকে এখন শুধু অপেক্ষা করা, বাবা যতক্ষণ জাহাজে থাকছে, সে কিছু করতে পারছে না। এবং পোর্ট-হোলে দাঁড়িয়ে কখন বাবা নেমে যান, দেখার জন্য অপেক্ষা করতে থাকল। আর নেমে গেলেই সে সোজা সিঁড়ি ধরে নিচে নামতে থাকল। এ-সময়ে সবাই প্রায় বাইরে, কেবল আর্চি নিজের কেবিনে, অথবা ঘোরাঘুরি কখন একবার দেখা যাবে বালিকাকে। বনি এ-সব ভেবে খুব দ্রুত চারপাশ দেখে কেবিনের দরজা খুলে ফেলল। এলি-ওয়ে ফাঁকা খাঁ খাঁ করছে। ডাঙা পেলে যা হয় মানুষের, জাহাজে কেউ থাকতেই চায় না। সে ভিতরে ঢুকে খুব সন্তর্পণে দরজা লক করে ফেলল।

কেবিনে ঢুকে আলো জ্বেলে দিল জ্যাক। ভেতরে তেমনি সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ফ্লানেলের ছেঁড়া জামা প্যান্ট পড়ে আছে একপাশে। সে হাঁটু গেড়ে বসল। তারপর দু'হাতে খুব যত্নের সঙ্গে তুলে নিল ছেঁড়া জামা প্যান্ট। ভাঁজ করার সময় ছোটবাবুর অসহায় মুখ বার বার দেখতে পেল।

তার কিছু এখন ভাল লাগছে না। কেন যে তার মাথা এ-ভাবে মাঝে মাঝে খারাপ হয়ে যায়। মনে হয় পৃথিবীতে সবাই ওর সঙ্গে শত্রুতা করে যাচ্ছে। তখনই মাথার ভেতরে একটা তীব্র ঠাণ্ডা স্রোত বয়ে যায়। চোখ মুখ লাল হয়ে ওঠে। সে নিজেকে তখন আর কিছুতেই সামলাতে পারে না।

সে ভারি অসহায়। দুঃখী মুখ তার। সে এখন বাংকে বসে আছে চুপচাপ। কাঁধের ওপর সেই ছেঁড়া জামা প্যান্ট। এখনও যেন ছোটবাবুর গায়ের উষ্ণতা সে জামা প্যান্টের ভেতর টের পাচ্ছে। তারপর নিচু হয়ে ভাঙা কাচ, ফুলের পাপড়ি, ছেঁড়া কাগজের টুকরো একপাশে কুড়িয়ে জমা করতে থাকল। বিছানার চাদর বেশ টেনে টেনে বিছিয়ে দিল। আয়না সব জলের দাগ। সাদা মসৃণ তোয়ালে দিয়ে আয়নার কাঁচ ভাল করে মুছে, সে তার কেবিনের এক গুচ্ছ সাদা গোলাপ ফুলদানিতে ভরে রাখল। এবং ছোটবাবুর মায়ের ছবি দেয়ালে, সে লণ্ডভণ্ড করে দেবার সময় ওটাও কি করে নিচে পড়ে গেছে—তুলে, হাতের ভেতর কিছুক্ষণ ঝুঁকে

দেখতে থাকল। কাঁচ অথবা ফ্রেম কিছু নষ্ট হয় নি। একটা বড় টিপ কপালে। হাতে সাদা শংখের কিছু অলংকার পরেছে। শাড়ি-পরা মাথার প্রায় সবটা ঢাকা হুবহু ছোটবাবুর মুখ। ছোটবাবু মেয়ে সেজে থাকলে ওর মার মতো হয়ে যেত। অনেকক্ষণ এ-ভাবে সে দেখল ছবিটা। এখনও ছোটবাবু পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে এই যুবতীকে। ওর ভীষণ হিংসে হচ্ছিল, আবার কখনও অভিমান, যেন বলার ইচ্ছে ছোটবাবু কিছু বুঝতে পারে না কেন। দেয়ালে ভাল করে টাঙ্গিয়ে রাখল ছবিটা। তারপর সে যেখানে যা কিছু দাগ জলের অথবা ভাঙা কাচের সব মুছে যেমন চেয়েছিল ছোটবাবু তেমনি রেখে ওপরে উঠে গেল।

সারা বিকেল সে বোট-ডেকে বসে থাকল। কখনও পায়চারি করে বেড়াল। সন্ধ্যার সময় সে ফোনে জানতে পারল বাবা আজ ফিরছে না। কাল সকালে তিনি ফিরছেন। সঙ্গে সঙ্গে বনির সব অস্থিরতা কেটে গেল। রাত বাড়লে সে একটা ছোট এটাচি কেসে তার যাবতীয় সবকিছু—এই যেমন সাদা সাটিনের লম্বা গাউন, সাদা মোজা, সাদা জুতো, জরির মূল্যবান জ্যাকেট, সুগন্ধ আতর, পাতলা দুধের মতো নীলাভ ক্রিম নিয়ে নিচে নেমে গেল। সে সন্তর্পণে ছোটবাবুর কেবিনের সামনে দাঁড়িয়ে চারপাশটা দেখে বুঝল কেউ নেই। সে যত দ্রুত সম্ভব সতর্কতার সঙ্গে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকে গেল। ভেতর থেকে দরজা লক করে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর এক এক করে সে তার পুরুষের পোশাক শরীর থেকে খুলে ফেলতে থাকল। সব খুলে ফেলতেই নিজেকে সে খুঁজে পেল। সে বনি। তার সুন্দর স্তনে গভীর ভালবাসার কোমল উষ্ণতা ক্রমে জন্ম নিচ্ছে। জংঘার পাশে সোনালি রেশমে ঢাকা এক আশ্চর্য দ্বীপের বর্ণমালা। সে ক্রমে এ-ভাবে অধীর হয়ে উঠছে।

সে তার মূল্যবান পোশাক, এই যেমন মসলিনের ওপর কারুকার্যময় ফুলফল লতাপাতা আর গভীর উজ্জ্বলতা নিয়ে আছে তার রেশমের মতো নীলাভ চুল, গুচ্ছ গুচ্ছ চলে সে অলিভ পাতার সুগন্ধ মেখে আস্তে আস্তে নরম আঙুলে সারা মুখময় আশ্চর্য সব পারফিউম ছড়িয়ে বসে থাকল। মাঝে মাঝে চোখ মেলে আয়নায় সে নিজেকে দেখছে। যেন পা হাত এবং নাভিমূলে আছে প্রাচীন ফারাও-সম্রাজ্ঞীদের সব রহস্য আর শরীরে সেই সুদূর অতীত থেকে তেমনি প্রবহমান—নীল নদের অববাহিকায় অথবা ইউফেটিস নদীর তীরে যে যুবতী স্নান শেষে ফিরে গেছে খোঁপায় গমের শিস সে আছে তারই মতো। তারই মতো চুলে গোলাপ ফুল গুঁজে পোর্ট-হোলে ছোটবাবুর জন্য অপেক্ষা করছে। তখন আকাশের নক্ষত্রমালা প্রতিবিম্ব ফেলছে সমুদ্রে। অনেক দূরে গীর্জায় তখন ঘণ্টা বাজছিল। ওয়েস্ট কোস্ট রোড ধরে দূরন্ত গতিতে ছোটবাবুর গাড়ি ছুটছে তখন

ভীষণ ভীরু নিষ্পাপ এক পবিত্র প্রতীক্ষা বনির। ছোটবাবু আসছে। বাতাসে ফলের পাপড়ির মতো বনি উত্তেজনায় কাঁপছিল।

॥ তেত্রিশ ॥

তখন র‍্যাঁ রা লাঁ। ডিং ডিং।

তখন ছোটবাবুর চুল উড়ছে। আর জোরে জোরে গান গাইছে মাউরি যুবক। বেশ দ্রুতগতিতে খালি রাস্তা পেয়ে গাড়ি প্রায় সে উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ক্যাথারিন, ওর বুড়ো দাদু, মামা মামীরা বিদায় জানাতে কৌরি-পাইন গাছটা পর্যন্ত এসেছিল। ক্যাথারিনের মুখে ছিল ভীষণ বিষণ্ণতা। সে বলেছে আগামী রোববার আবার আসবে। সে ছোটবাবুকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে ওদের ডেয়ারিফার্ম, ওদের তৃণভূমি, ওদের গমের জমি, আপেলের বাগান আর আঙ্গুরের উপত্যকা

তখন র‍্যাঁ র‍্যা লাঁ। ডিং ডিং। মাউরি যুবক গাইছে। সুন্দর গান। হলুদ রঙের দামী গাড়ি, উজ্জ্বল কোঁকড়ানো চুল মাউরি যুবকের এবং সাদা উর্দি-পরা, একেবারে খুশীতে উপচে পড়ছে। সে এতগুলো বিদেশী মানুষকে বন্দরে পৌঁছে দিতে পারছে বলে ভীষণ খুশী। এবং সে জানে বুড়ো উড সাহেব ওদের সারাক্ষণ কি বলেছে। বলেছে আসলে এ-দেশটার যা কিছু বৈভব সব ইংরেজদের গড়া। এবং যা কিছু আজকের প্রাচুর্য সব আমরা না এলে হত না। আসলে খাবার নাম করে ধরে এনে এ-সব বলা ছাড়া আর কিছু কাজ নেই যেন মানুষটার। চার বছরের ওপর সে ওদের ফার্মে আছে। চিনতে বাকি নেই। কিন্তু সে গান গাইছে এবং পেছনে চারজন নাবিক ওরা বেশ হল্লা করছে। মাঝে মাঝে সুন্দর মতো মানুষটি ওদের থামতে বলছে। সে গান গাইছে, কারণ সেও কম যায় না। সে এতক্ষণ এই দেশের যা কিছু সৌন্দর্য অথবা প্রতিপত্তি বলা যায়—টাসম্যান না এলে যে কিছুই হত না অর্থাৎ তিনিই প্রথম পলিনেশীয় মানুষ যিনি জাহাজে চড়ে চলে এসেছিলেন এ-দেশে তারপর এমন সুন্দর দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো, দেশটি আবিষ্কার করে ফিরে গেলেন—সেই ডিং ডিং বাজনা, দলে দলে সমুদ্রে একেবারে জারি গান গেয়ে বৈঠা বেয়ে ওরা পাল খাটিয়ে চলে এসেছিল।

সে বেশ গর্বের সঙ্গে বলে যাচ্ছিল আসলে ওদের সবটাই পড়ে পাওয়া চোদ্দ গণ্ডা। বোঝলেন না স্যার, আমরা না এলে কোথায় থাকত এ-সব ফুটানি।

অনিমেষ বলছিল—তা ঠিক।

মৈত্র একটু বেশি খেয়ে ফেলেছে। অনিমেষ, বঙ্কু একটু খেলেই মাতলামি করতে ভালবাসে। ছোটবাবু চুপচাপ বসে রয়েছে। রাত এখন নটা বেজে সতেরো। জ্যোৎস্না এবার উঠবে। পূবের আকাশে কিছু পাইন গাছের ফাঁকে জ্যোৎস্না দিগন্তে ঝলমল করছিল।

খাবারের তালিকা ছিল বেশ লম্বা। যদিও ওরা কেউ খেয়ে খুব খুশী নয়। খেতে হয় খাওয়া। একেবারে অখাদ্য বানিয়ে রেখেছে সব। তবু ওরা খেয়ে ঢেকুর তুলেছে। খাবার শেষে সামান্য ড্রিংকস। কিন্তু যা হয় খেতে থাকলে কেবল খেতেই ইচ্ছে হয়। এত খাওয়ার পরও ওরা চার জন ভীষণ ভদ্র ছিল কথাবার্তায়। এমন কি যখন টলছিল আর জাতীয় সঙ্গীত গাইছিল সবাই তখনও কে বলবে ওরা জাহাজি। অনিমেষ বলেছিল, ধর, বলেই সে ষাঁড়ের মতো যেই না গাইলে, ধন ধাইন্যে আর তখনই মৈত্র হা হা করে উঠেছিল অনিমেষ, ওটা ধন ধাইন্যে হবে না ধন-ধান্যে বল। আর যতবারই ধন ধান্যে অনিমেষের গলায় ধন ধাইন্যে হয়ে যায় ততবার হা হা করে হেসে দিয়েছিল বঙ্কু আর মৈত্র। যদিও ক্যাথারিন অথবা ওর আত্মীয়েরা এর এক বিন্দু বুঝতে পারে নি, ওদের গান ওরা বেশ চেঁচিয়ে শেষ করেছে। ক্যাথারিন বড় একটা হলঘরে পিয়ানো বাজিয়েছিল। ওরা খালি গলায় গাইবে বলে তখন ক্যাথারিন পিয়ানোর ওপর ভর করে কেবল দেখছিল—ওরা চারজন দাঁড়িয়েছে। ওরা জনগণ গাইল না ওরা গাইল ধন ধান্যে পুস্পে ভরা কারণ এ-গানটাই বেশি শিখিয়েছে অমিয় ওরা কিছু ভাল না লাগলে গাইত জাহাজে এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।

তখন মাউরি যুবক গাড়িতে গাইছিল—রা র‍্যাঁ লাঁ। ডিং ডিং। সব দেশবাসীদেরই এক কথা এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি।

মাউরি যুবক তখন সাঁ করে গাড়ি ঘুরিয়ে বলল, বুঝলেন না স্যার, যত রাস্তা-ঘাট এই ধরুন না সেন্ট্রাল রোড ধরে যদি আপনারা কখনও অকল্যাণ্ড থেকে ওয়েলিংটনে যান, দেখতে পাবেন পৃথিবীর সবচেয়ে বিস্ময়কর দৃশ্য। রোতোঁরা কিন্তু পলিনেশিয়ান নাম। রেস্তোঁরার ভেতর দিয়ে চলে গেছে সেন্টাল রোড। ওয়েফোতো নদী পাবেন যেতে যেতে। দু'-পাশে দেখতে পাবেন সব সুন্দর সুন্দর গরম জলের প্রস্রবণ। রোতোঁরা হ্রদের মতো হ্রদ আর একটাও নেই পৃথিবীতে। জল বরফের পাতলা চাদরে ঢাকা। অথচ হ্রদের পাড়ে আপনি খালি পায়ে হাঁটতে পারবেন। ঠাণ্ডা নেই। এত বেশি উষ্ণতা। সুন্দর ইংরেজীতে লোকটা বলে যাচ্ছিল—রোতোঁরা ইজ দ্য সেন্টার অফ মাউরি লাইফ অ্যাণ্ড কালচার, উইথ এ মডেল ভিলেজ। সে তারপর বলল, আপনারা সেখানে গেলে মাউরি কনসার্ট শুনতে পেতেন। পারলে সে যেন এখন গাড়ি সেখানে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চায়। এবং সেই ডিং ডিং বাজনা। সে এতসব ওদের হয়ে বলতে পারায় খুব খুশী। সে কেবল গুনগুন করে জ্যোৎস্না রাতে গান গাইছিল।

জ্যোৎস্না রাতে গান গাইতে সবারই ভাল লাগে। অনিমেষ, বঙ্কুযা খুশি গাইছিল। ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকছে। শীত তেমন লাগছে না। দু'পাশের বাড়ি-ঘর উপত্যকা অথবা নির্জন বনভূমি ফেলে গাড়ি ক্রমে নিউপ্লিমাথের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। মাঠের পর মাঠ সব ফাঁকা জমিন। মাঝে মাঝে হাই-ওয়ে ধরে বাস ট্রাক যাচ্ছে, আর কিছু দেখা যাচ্ছিল না। কেবল চারপাশে পাইনের বনাঞ্চল। এবং তার ভেতর মরা চাঁদ কেমন শীতের জ্যোৎস্নায় স্থির হয়ে আছে দিগন্তে। ছোটবাবু কিছুই দেখছিল না। দেখতে ভাল লাগছিল না। মাথাটা বেশ ঝিম-ঝিম করছে। সে একপাশে মাথা কাত করে দিয়েছে। ক্যাথারিন যেন সারাক্ষণ ওকে কিছু বলতে চেয়েছিল। অথবা ওর সুন্দর রঙ এবং লাবণ্য শরীরে, কখনও চোখের তারায় সমুদ্রের নেশা। ছোটবাবুর কি যে ভাল লাগছিল। সেই তৃণভুমিতে ঘাসের ভেতর হারিয়ে গিয়ে ডেকেছিল, ছোটবাবু দ্যাখো কি সুন্দর ভেড়ার বাচ্চাটা। একটা সাদা ভেড়ার বাচ্চা কোলে নিয়ে ঘাসের ভেতর থেকে ক্যাথারিন উঠে এসেছিল।

ক্যাথারিনকে ছেড়ে আসার সময় তার ভীষণ খারাপ লাগছিল। আগামী রবিবার সে আসবে। সাতটা দিন তার এখন ক্যাথারিনের কথা ভাবতে ভাবতে কেটে যাবে। সে বুঝতে পারছিল এ-ভাবে তার সব এখন নতুন নতুন কষ্ট তৈরি হবে মনে। ক্যাথারিনকে দেখার আগে সে এটা কখনও বুঝতে পারত না।

এবং ওপরে অর্থাৎ জাহাজে ওঠার সময় মনে হয়েছিল ভারী একাকী সে। তার মাকে সে এসময় অন্যদিন মনে করতে পারত। কিংবা কখনও ঘুম ভেঙে গেলে সে ভাবত, মা তার জেগে আছে হয়তো। আজ সে কিছুই মনে করতে পারছে না। বরং জাহাজের একঘেয়েমী কাজ ভীষণ বিরক্তিকর। আর্চি তাকে অযথা কষ্ট দিচ্ছে। জ্যাক আজ যা করেছে! সব মনে হতেই সে ভীষণ ব্যাজার করে ফেলল মুখ। সামান্য নেশা এবং নেশায় টলছে, এটা সে যেন কাউকে বুঝতে দিতে চায় না। তবু ঠাণ্ডা বাতাসে এবং বেশ সময় পার হয়ে গেছে বলে এখন আর মাথা তেমন ভারি নয়। বরং এমন নেশাতে শুয়ে শুয়ে ক্যাথারিনকে ভাবতে তার ভাল লাগবে।

আর সে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে দু'বার চাবি ঘুরিয়ে অবাক। দরজা খুলছে না। সে হয়তো ছুটে ডেভিডকে চিৎকার করে ডাকত, দ্যাখো কে আমার কেবিন বন্ধ করে রেখেছে। এ-সব কি হচ্ছে! আমাকে জ্যাক কি ভাবে!

আর তখনই দরজা সামান্য খুলে গেল।

ছোটবাবু বুঝতে পারল নেশার জন্য এমন হয়েছে। চাবি ঘুরছিল না ঠিকমতো। চাবি সে ঠিকমতো লাগাতে পারে নি। শেষে চাবি ঠিকমতো ফের ঘুরিয়েছে বলেই হয়তো খুলে গেছে দরজা। ভেতরে ঢুকে

নিরিবিলি দরজা বন্ধ করার সময়ও লক্ষ্য করল না ওর কেবিনে সাদা গোলাপ গুচ্ছ। এবং

সুন্দর বিছানাতে অলিভ পাতার গন্ধ। যে গন্ধটা নিজের শরীরে আছে অথবা ক্যাথারিনের পাশে পাশে হাঁটলে যে হালকা আতরের গন্ধ ছিল এখনও যেন তেমনি এক গন্ধ। আসলে বুঝি সেই সুন্দর স্বপ্নটা সে মনের ভেতরে ভাসতে দেখছে। যে-ভাবে স্বপ্ন দেখলে শরীর ক্রমে হাল্কা সৌরভে ভরে যায়, ভাল লাগে, বেশ এক ভেতরে ভেতরে স্বপ্নের খেলা অথবা লুকোচুরি বলা যায় নিজের সঙ্গে নিজের, সে ঘরে ঢুকে নিজের সঙ্গে নিজের খেলা আরম্ভ করে দেবে ভাবল —এবং তখনই মনে হল সাদা মসলিনের ভেতর কেউ নীহারিকাপুঞ্জ হয়ে আছে। যা সে ধরতে পারবে না, ছুঁতে পারবে না, কেবল চুপচাপ বসে দেখতে পাবে। পোর্ট-হোলে দাঁড়িয়ে সে যেমন আগে সমুদ্রে নক্ষত্র দেখত আকাশে এও তেমনি। প্রায় সেই নীহারিকাপুঞ্জের মতো রহস্যময়ী।

সে চুপচাপ বসে তাকে দেখতে থাকল।

ওর ভালই লাগছিল। সে একটু নেশার ভেতর এমন দেখবে নাতো কি দেখবে! সেই সুন্দর নীহারিকাপুঞ্জ তেমনি পোর্ট-হোলে মুখ রেখে দাঁড়িয়ে আছে।

সে বলল, বেশ মনোহারিণী। তোমাকে আমি দেবী বলতে পারি। পোর্ট-হোলে মুখ রেখেছ কেন। একবার ফিরে দাঁড়াও। দেখি তোমাকে। বড় হতে হতে এমন একজনকেই চেয়েছি মেয়ে।

বেশ কুহেলিকা। ছুঁয়ে দেখবে নাকি। নড়ছে না। তালপাতার বাঁশির মতো তার তীক্ষ্ণ শরীর। বেশ লম্বা উঁচু সাদা জুতো মোজা, হাতে সাদা দস্তানা, নীলাভ চুলে গোলাপের কুঁড়ি, সাদা রিবন চুলে। মোমবাতির শিখার মতো জ্বলছে।

ছোটবাবু গলার টাই আলগা করতে থাকল। সে ভালভাবে দাঁড়াতে পারছে না অথবা সেই তৃণভূমিতে ছুটে ছুটে এখন হয়তো ক্লান্ত। বাংকের ওপর বসে টাই খুলে ফেলল। কোট খুলে প্যান্ট খুলে চুপচাপ ঘুমের পোশাক পরে ফেলল। মেয়েটা এখনও তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। নড়ছে না। সে বলল, এবারে, যাও। আমি ঘুমোব।

চোখেমুখে জল দিলে সব কেটে যেতে পারে। সে বাথরুমে ঢুকে চোখে ভাল করে জলের ঝাপটা দিল। ঘাড়ে জল থাবড়ে নিজেকে স্বাভাবিক করে তুলতে চাইল। সে তো আজ খুব একটা বেশি খায় নি। সামান্য খেয়েই এমন ভুল দেখতে শুরু করেছে! জাহাজে নানারকম কিংবদন্তী আছে। সে ভাঙা জাহাজে আছে বলে সবকিছু মেনে নিয়েছে। সব ভৌতিক ব্যাপার অথবা কিংবদন্তীর মতো এই জাহাজ চলেছে তো চলেছেই। জাহাজ তার সবকিছু নিয়ে এইসব ভৌতিক ঘটনার ভেতর চলছে। সে এখন আর এ-সবে কিছুতেই ভয় পাবে না।

তবু সে দরজা খুলতে সাহস পাচ্ছে না। খুললেই আবার হয়তো দেখে ফেলবে, কোনো রহস্যময়ীর মুখ। বরং সে ভেতরেই দাঁড়িয়ে থাকবে যতক্ষণ তার অন্তত নেশা ঠিকমতো না কেটে যাচ্ছে। এমন ভেবে একাকী গোপনে বাথরুমে পালিয়ে থাকছে। মাথা পরিষ্কার না হলে সব আজগুবি ছবি কেবল দেখতে পাবে কেবিনে।

তখন মৈত্র দেখল একটা চিঠি গড়াগড়ি খাচ্ছে ওর বাংকে। সে হাতমুখ ধুয়ে শুয়ে পড়বে ভেবেছিল। এ-বন্দরে পৌঁছেই তার একটা চিঠি পাওয়ার কথা। শেফালীর চিঠি। কিন্তু একটাও চিঠি আসে নি। এমন কি সে পানামা ক্যানেলে ভেবেছিল চিঠি পাবে, নিউ অরলিনসে ভেবেছিল ঠিক চিঠি পাবে, ভিকটোরিয়া বন্দরে যদি একটা চিঠি আসত—চিঠি না এলে যা হয় অভিমান, চিঠি না এলে যা হয় যেন শেফালী তাকে ভুলে যাচ্ছে। শেফালীকে বুয়েনস আয়ার্স থেকে টাকা পাঠাতে পারে নি বলে সেই যে রাগ করে আর চিঠি দিল না আজও তেমনি। চিঠিটা পেয়েই সে লাফিয়ে উঠল। চিঠি। চিঠিতে চুমো খেল। কে দিয়েছে, কোথাকার চিঠি, সে একবারও ভেবে দেখল না। কারণ পৃথিবীতে এখন একমাত্র একটি মেয়েই তার কথা ভাবে। মাত্র একজন যুবতীর চোখে ঘুম থাকে না, সে না থাকলে যুবতী ভারি একাকী এবং একঘেয়েমীর ভেতর এই চিঠি লেখা শুধু—আর কিছুই না। চিঠিটা পেয়েই সে ছেলেমানুষের

মতো কি করবে ভেবে পেল না। এমন একটা চিঠি এতক্ষণ অবহেলায় বাংকে পড়ে ছিল ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। সারেঙ-সাব ওর বাংকে চিঠি রেখে গেছেন। বিছানা ঠিকঠাক করে শুয়ে পড়ার সময় এমন একটা চিঠি! সে তাড়াতাড়ি চিঠিটা পড়তে আলোর নিচে দাঁড়িয়ে গেল। আর তখনই কেমন গণ্ডগোল হয়ে যায়। চিঠির ঠিকানায় শেফালীর হাতের লেখা জ্বলজ্বল করছে না। অন্য হাতের লেখা। সে তাড়াতাড়ি খামের ভেতর থেকে চিঠি বের করে নিল। না ভেতরেও অন্য কেউ কিছু লিখেছে। সে আরও দ্রুত শিরোনামা পড়ে অবাক হয়ে গেল। পরম কল্যাণবরেষু—এবং পিসিমা তাকে চিঠি লিখেছে। চিঠির ভেতর ওর জাহাজ কবে ফিরছে কারণ শেফালী মাস দুই আগে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করেছে এ-সব কথা—মৈত্র চিঠিটা পড়তে পড়তে কেমন পাথর হয়ে যাচ্ছিল। দিন-মাসের সে হিসাব ঠিক মেলাতে পারছে না। কেমন একটা গণ্ডগোলের ছবি গোটা চিঠিটাতে এবং সে হতবাক, এখন সে ভেবে পাচ্ছে না কিভাবে দিন-মাসের হিসেব করতে হয়। বার বার বোকার মতো কড় গুনে দেখছে সময়মতো সে তো শেফালীর কাছে ছিল না। শেফালীর ছলনা সে তবে ধরতে পারেনি।

জাহাজিদের ভাগ্যে এমন ঘটনা নতুন নয়। সে তবু বার বার কড় গুনে নিজের হিসেবের ভুল ধরার জন্য কেমন মরিয়া হয়ে উঠল।

এখন ফোকসালে কেউ নেই। এত রাত যে, বোধহয় অমিয় জাহাজে আর রাতে ফিরছেই না। অমিয় থাকলে তাকে বলা যেত, তোর অঙ্কে মাথা কেমন রে? আমার হিসেবটা মিলছে না। এত বার কড় গুনেও মেলাতে পারছি না। তুই দেখ তো মেলাতে পারিস কিনা।

তারপরই কেমন হুঁস ফিরে আসছে। সে কি ভাবছে সব! সে তো কাউকে হিসেবটার কথা বলতে পারবে না। সে কি ধীরে ধীরে পাগল হয়ে যাবে। কারণ বলা তো যায় না, সে এখন থেকে সামনে কাউকে পেলেই হয়তো বলবে, দেখুন তো মশাই, সময়মতো তখন আমি বাড়ি ছিলাম কিনা। না তখন আমি সমুদ্রে, শেফালীর একা একা ভাল লাগছিল না বলে বিমলবাবুর সঙ্গে চুপি চুপি দেখা করেছিল, কথা বলেছিল, তারপর আর ভাবতে পারে না। কেমন পা টলতে থাকল। মাথা ঘুরতে থাকল। তার সামান্য অবলম্বন তাও ক্রমে মুছে যেতে থাকল।

বাথরুমে তখনও ছোটবাবু চুপচাপ। দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলে মনে হবে শীতের রাস্তায় বিদেশ বন্দরে পথ হারিয়ে ফেলেছে। সকাল না হলে সে আর জাহাজে ফিরতে পারছে না।

অমিয় তখন হেঁটে ফিরছিল জাহাজে। মাউরি যুবতী তাকে কতরকমের স্বপ্নের কথা বলেছে! দূরগামী সমুদ্রের মানুষ অমিয়। মেয়েটা অমিয়কে সমুদ্রের বেলাভূমিতে আবিষ্কার করেছিল। এবং এইসব মেয়েরা সমুদ্র থেকে ঘুরে-আসা মানুষদের দেখলেই টের পায়—ওরা সমুদ্র-মানুষ। ওদের গায়ে সমুদ্রের গন্ধ লেগে থাকে। চোখে সমুদ্রের নেশা। ভাল করে চোখ তুলে দেখতে পর্যন্ত ভয় পায়।

এবং অমিয় বলেছিল, মেয়ে, আমার কাছে সাত রাজার ধন এক মানিক আছে। চল না কোনো দ্বীপে। আমরা একটা দ্বীপ কিনে ফেলতে পারব। আমার আর সমুদ্রে ঘুরে বেড়াতে ভাল লাগছে না।

.

তখন বনি ক্রমে অস্থির হয়ে পড়ছে। তার ভেতর কি যে অধীরতা, সে কিভাবে ছোটবাবুর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে বুঝতে পারছিল না। সে আশা করেছিল, ছোটবাবু তার পাশে এসে দাঁড়াবে, আদর করে ওকে বুকে টেনে নেবে—অথবা কখনও সে দু'হাত তুলে দিলে ছোটবাবু বুঝতে পারবে, সে বনি, সে মেয়ে। তার সব ছেলেমানুষী ছোটবাবু সহজেই ক্ষমা করে দেবে।

কিন্তু বাথরুমে যেন এখন কেউ নেই। জলের ঝাপটা কখন থেমে গেছে। ঝর ঝর করে জল পড়ার শব্দ পর্যন্ত হচ্ছে না। একেবারে চুপচাপ এবং দূরে সব পাহাড়ী উপত্যকাতে

নক্ষত্রের মতো আলোগুলো ক্রমে নিভে আসছে। ক্রমে এই শহর বন্দর এবং সমুদ্র শীতের ঠাণ্ডায় নিঝুম। সে হাত পা নাড়ালে পোশাকের খসখস শব্দ পর্যন্ত টের পাচ্ছে।

আর মেজ-মিস্ত্রি তখন স্থির চোখে শুয়ে আছে। ওকে দেখলেই বোঝা যাবে গায়ে সৌরভ মেখে যে বালিকা বড় হচ্ছে জাহাজে তার জন্য চোখে ঘুম নেই। কি নরম মাংস, আর অস্থিমজ্জায় লোলুপতা। সে শুয়ে শুয়ে ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো ঠোঁট চাটছে।

.

ডেভিড জাহাজে ফেরে নি। সে ফিরবে না। বন্দরে থেকে গেছে। শীতের জ্যোৎস্নায় কোনো সবুজ মাঠে সে এবং এক যুবতী পাহাড়ের নিচে জড়াজড়ি করে রয়েছে। এমন উষ্ণতা সে আর কোথাও পাচ্ছে না। সমুদ্রের গর্জন তাদের মাঝে মাঝে ভীষণ চঞ্চল করে তুলছে।

আর নিচে এনজিন-রুমে মাত্র একজন ফায়ারম্যান—মাত্র একটা বয়লার চালু, এই জাহাজে আলো জ্বেলে সব উষ্ণতা রক্ষা করছে সে। সেই কিট কিট শব্দ ব্যালাস্ট পামপের। সেই একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে মহাকায় যন্ত্রদানব। তার চার বড় লোহার থামের ওপর ঘোড়ার পিঠের মতো লম্বা সিলিণ্ডার। যেন সেই আবহমানকাল থেকে অহর্নিশ ছুটতে ছুটতে প্রাচীন অশ্বের মতো সে সহসা এখন স্থির। সমুদ্রে আবার কোথাও যুদ্ধ ঘোষণা না হলে সে আর ছুটছে না। সে এখন চুপচাপ কেবল বিশ্রাম নিচ্ছে, অথবা চোখ বুজে ঝিমুচ্ছে।

জেটিতে দাঁড়িয়ে এ-সব কিছুই বোঝা যাবে না। শুধু দেখা যাবে জাহাজ সিউল-ব্যাংক। সে কিনারায় লেগে রয়েছে। সমুদ্রের অতিকায় ঢেউ ভেঙ্গে সে এসে এখানে ভিড়েছে বোঝাই যায় না। তার আলো, ঘর, বাতি সবকিছু এত শান্ত আর এত নিরীহ

.

তখন ছোটবাবু দরজা খুলে বের হবে ভাবল। এ-ভাবে ভয়ে লুকিয়ে থাকা ঠিক না। সে সাহসী হতে চাইছে। সে চিৎকার করে সবাইকে ডাকতে পারত, সবাই এসে যখন দেখতে পেত, ভূতটুত কিছু নেই, তখন হাসি ঠাট্টা মশকরা, সে আর এ-জাহাজে জোকারের মতো কাজকর্ম করতে পারে না।

আর এ-ভাবে যা হয়, সে নিজেকে কাপুরুষ ভেবে ফেলল। সে সব অন্যায় মুখ বুজে সহ্য করে যাচ্ছে। যত সহ্য করছে তত সবাই তাকে পেয়ে বসেছে। সে বরং ভাবল, সকাল হলে, জ্যাকের জামা-প্যান্ট ঠিক ডেকে দাঁড়িয়ে যেমন দু'হাতে তার সবকিছু টেনে জ্যাক ফালা ফালা করে দিয়েছিল তেমনি, সে সব ফালা ফালা করে দেবে। কাপ্তানের কাছে নালিশ গেলে সে বলবে, সে অকপটে বলবে—স্যার আমার জামা-প্যান্ট দেখুন। আমি কি করেছি! আমাকে বার বার কতবার এ-ভাবে জ্যাক অসম্মান করবে!

দরজায় খুট করে শব্দ হতেই বনি মুখ ফেরাল।

ছোটবাবু দরজা খুলে আবার যেন ভূত দেখেছে। পাগলের মতো চিৎকার করে উঠল, আবার তুমি জ্যাক! এবং সেই ঘণ্টা-ধ্বনি মাথায়, যেন সীমাহীন অন্ধকারে এক অতিকায় ঘণ্টা নিরবধিকাল মাথার ভেতরে বেজে চলেছে। সে এ-ভাবে চোখে মুখে অন্ধকার দেখলে সহসা কেমন প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠতে থাকল। জ্যাক যে আবার চাতুর্যে মনোহারিণী—এসব তার কাছে ভীষণ মূল্যহীন। জ্যাক যে থর থর কাঁপছে চোখে মুখে পৃথিবীর যাবতীয় সুষমা নিয়ে সে তার কিছুই লক্ষ্য করছে না। যেন দীর্ঘকালের অসম্মান অপমান মুহূর্তে দু'হাতে ওর সুন্দর গাউন ছিঁড়ে ফেলে দিলেই শেষ হয়ে যাবে।

জ্যাক বলল, আমি বনি, আমি মেয়ে। তুমি এটা কি করছ ছোটবাবু!

ছোটবাবু কিছু যেন শুনতে পাচ্ছে না। কেবল ঘণ্টা-ধ্বনি, চোখ জ্বলছে ছোটবাবুর। কাণ্ডজ্ঞানহীন যুবকের মতো ছোটবাবু দু'হাতে ওর সাদা মসলিনের গাউন চেপে ধরেছে। গলার কাছে ছোটবাবুর শক্ত দু'হাত। বনি ছোটবাবুর চোখ দেখে কাতর, সে বার বার বলছে,

ছোটবাবু আমি মেয়ে। তুমি বিশ্বাস কর আমি মেয়ে।

আর ছোটবাবুর মাথায় তেমনি ঘণ্টা-ধ্বনি। সেই পাহাড়ের ওপর সে ঠিক জলদস্যুর মতো উঠে যাচ্ছে যেন। কোনো হুঁশ নেই। সে দেখতেও পাচ্ছে না ঠিক হাতের নিচে সেই অসংখ্য তরঙ্গ মালা সমুদ্রের, ছিঁড়ে দিলেই প্রলয়ঙ্কার ঘটনা ঘটে যাবে পৃথিবীতে। দু'হাতে পোশাকের ভেতর হাত চালিয়ে ক্রমে সে সুন্দর পোশাক ফালা ফালা করে দিতে গেলে—কি যে কাতর চোখ মুখ। বনি কিছুতেই ছোটবাবুর সঙ্গে পেরে উঠছে না। দু'হাতে সে তার পোশাক সামলাচ্ছে। আর সেই শক্ত হাতের ভেতর কখন যে নাভিমূলে, ছোঁড়া পোশাকের ভেতর নীলাভ বর্ণমালা অবিকল যুবতীর শরীর হয়ে গেল, ছোটবাবু বুঝতে পারছে না। মাথায় শিরা-উপশিরায় রক্তের চাপ, জোরে শ্বাস পড়ছে—সে পাগল হয়ে যাচ্ছে না তো! চোখের সামনে সে এ-সব কি দেখছে! ছেঁড়া পাল খাটানো জাহাজের অভ্যন্তরে সাগরের তাজা মুক্তোর মতো জ্বলজ্বল করছে সবকিছু। জ্যাক নড়ছে না। যেন জ্যাকের আর কিছু করণীয় নেই। জ্যাক কোনরকমে দু'হাতে তার রত্নরাজি বিছানার চাদর টেনে শুধু ঢেকে ফেলল। তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ল।—ছোটবাবু, তুমি এত নিষ্ঠুর।

ছোটবাবু চিৎকার করে উঠল, আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি জ্যাক। এ-সব আমি কি দেখছি! আমি কি দেখছি এ-সব!

বনি দেখছে ছোটবাবুর চোখে বিভ্রম। চোখে মুখে ভীষণ হতাশা। কেমন মায়া আবার বেড়ে যায়। বনির বলার ইচ্ছে হল, তুমি পাগল হয়ে যাও নি। তুমি আমাকে বিশ্বাস কর ছোটবাবু। ঈশ্বরের দোহাই। তুমি ছুঁয়ে ছুঁয়ে দ্যাখো আমি বনি। আমি মেয়ে। আমার সবকিছুর ভেতর আমি বনি। তুমি ঠিকই দেখছো। সে এ-সব কিছুই বলতে পারল না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেবল কাঁদছে। ছোটবাবু যদি সত্যি পাগল হয়ে যায়। ওর চোখের দিকে কিছুতেই তাকানো যাচ্ছে না। চোখে কেমন বিভীষিকা। ছোটবাবুর কি আবার সেই মাথার আঘাত অথবা মাথার ভেতর তার কিছু হচ্ছে! আঘাত ভীষণ প্রবল ছিল, জ্যাক বার বার প্রশ্ন করেও কোন সঠিক জবাব বাবার কাছ থেকে পায় নি। ছোটবাবুর চোখ এখন পাথরের মতো স্থির। বনি কি করবে ভেবে পাচ্ছে না।

ছোটবাবুর পাথরের মতো মৃত চোখ দেখতে দেখতে নিজের লাঞ্ছনার কথা বনি একেবারে ভুলে গেল। ছোটবাবুকে এখন নিরাময় করে তুলতে না পারলে সে মরে যাবে। সে ওর ছেঁড়া পোশাকে কোনরকমে শরীর ঢেকে উঠে দাঁড়াল। ছোটবাবুর ঠিক বুকের কাছে মুখ রাখার মতো ধীরে ধীরে বলল, তুমি এস। সে যেন সেই চিরদিনের যুবতীদের মতো স্নেহের স্বরে ডেকে নিয়ে গেল ছোটবাবুকে। ফিসফিস গলায় বলল, আমি মেয়ে ছোটবাবু। তুমি বিশ্বাস কর আমি মেয়ে। আমি বনি। বাবা আমাকে ভয়ে ছেলে সাজিয়ে রেখেছে।

ছোটবাবু নড়ছে না। স্থির। অপলক। জ্যাককে সে দেখছে।

বনি বুঝতে পারছে এখনও বিভ্রম কাটে নি। সে বলল, ছোটবাবু, আর্চি জাহাজে উঠেই টের পেয়েছে, আমি মেয়ে। তোমাকে আমি ভালবাসি বলে ওর ভীষণ হিংসে। সে তোমাকে বারবার ব্রিজে নামিয়ে কষ্ট দিচ্ছে।

আর এইসব কথাই তার মগজে বার বার ঘণ্টা-ধ্বনির মতো যেমন শব্দগুলো কখনও আর্চি আর্চি, ঘণ্টার শব্দ—আর্চি আর্চি, আবার কখনও বিল্জ বিল্জ, ঘণ্টার শব্দ—বিল্জ বিল্জ—এ-ভাবে সেই এক শব্দতরঙ্গ নিরবধিকাল ধরে বেজে বেজে তাকে কখন যেন আবার নিরাময় করে দেয়।

বনি বলল, তুমি পাগল হয়ে যাও নি। তুমি ভাল আছো।

ছোটবাবু বলল, তাহলে তুমি জ্যাক নও। তুমি বনি।

—আমি বনি ছোটবাবু। বলে, সে আবার তার বুকের ওপর থেকে দু'হাত বাতাসে ডানার মতো ভাসিয়ে দিল। চোখ মাটিতে রেখে সে যে মেয়ে তার প্রকাশ শরীরের সব চারুকলাতে

তুলে ধরতে ধরতে কখন কিভাবে যে ছোটবাবুর বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল নিজেও জানে না। ছোটবাবু অবোধ বালকের মতো যেন নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে তখন। ওপারে ওর ঘুড়ি উড়ে যাচ্ছে বাতাসে। সে কেবল সেই দূরন্ত বাতাসে ক্রমে দেখতে পাচ্ছিল, ঘুড়িটা অনেক দূরে, অনেক শস্যক্ষেত্র পার হয়ে চলে যাচ্ছে। যেন এই তার নিয়তি। কিছু আর করার নেই। এবারে সে বনিকে ভীষণ আবেগে জড়িয়ে ধরল। তারপর কি করতে হবে সে তো এখনও ভালো জানে না। সে ভীষণ ছটফট করতে থাকল।

বনি মুখ তুলে তাকিয়ে আছে।

ছোটবাবু বলল, আমি কি করব তারপর?

বনি বুকে মুখ লুকিয়ে ফেলল। ধীরে ধীরে বলল, আমিও ঠিক জানি না ছোটবাবু আমরা কি করব তারপর!

॥ চৌত্রিশ ॥

মৈত্র বলল, এই তোর নাম কিরে?

ছেলেটা বলল, আমার নাম ওয়াকা। তুমি আবার ভুলে গেছ!

—আচ্ছা ওয়াকা, তোর কি ভাল লাগে?

—আমার? সে কি ভেবে বলল, তোমাকে। তুমি পৃথিবীর সব দেশে গেছ?

—তা আমি গেছি।

—আচ্ছা আমাদের লায়ন-রকের পর কি আছে বসন্তনিবাস?

—সমুদ্র।

—তারপর?

—তারপর অস্ট্রেলিয়া। ওয়াকা তুই পড়াশোনা করিস না?

ওয়াকা বলল, ওদের আমি ডেকে আনছি। আমাকে একটা বেশী দেবে।

মৈত্র বলল, ম্যাগুেলাকে বলবি আমি এসে গেছি।

—বলব। বলে ওয়াকা ঘরে ঘরে যেন খবর দিতে চলে গেল।

এবং মৈত্র বসে থাকল। জায়গাটা বেশ সমতল। মসৃণ। চারপাশে ছোট সব পাহাড়ের ঢিবি। ঢিবিতে সব ছোট ছোট বাড়ি। নিচে ট্রামলাইন। একটু নিচে হাল্কা কুয়াশা জমেছে। এবং সূর্য অস্ত যাবে এবার। পাশে স্কুলবাড়ির মাঠ খালি। ফাদার মাঠে দাঁড়িয়ে দূরের পাহাড় দেখছেন। এবং মৈত্র বসে রয়েছে। সে পরেছে কালো রঙের জোব্বা। ওর শরীরে পৃথিবীর যাবতীয় খেলনা। ওর ইচ্ছে হচ্ছে একবার ম্যাগুেলার বাড়ি যাবে। সে প্রতিদিন এখানে চলে আসে। তার পকেটে সব চকোলেট। এবং ঝুমঝুমি। সে যেতে যেতে কখনও মাথায় লম্বা ফুলের টুপি পরে নেয়। সে সমুদ্রের ধারে ধারে ঘুরে বেড়াবার সময় ওয়াকা সঙ্গে থাকে। ওয়াকা নামটা সে কিছুতেই মনে রাখতে পারে না। প্রতিদিন ওর নামটা জেনে নিতে হয় এবং মৈত্র দেখল তখন ওয়াকা গাছের ফাঁকে, পাহাড়ের ছায়ায় দৌড়ে আসছে। ওয়াকার রঙ শ্যামলা, চোখ কালো, কালো চুল এবং ওয়াকা একটা পাতলুন পরেছে, একটা কোট, নিচে জামা নেই, সাদা কেডস জুতো ছেঁড়া। ওয়াকা এসেই আরো একটা চকোলেট চেয়ে নিল।

সবাই এসে যে যার নাম বলে মৈত্রের চারপাশে দাঁড়িয়ে গেল। হাত পাতল।

—ম্যাগুেলা এল না কেন রে? মৈত্র বলল।

—ম্যাগুেলা ওর মার সঙ্গে বেড়াতে গেছে।

ম্যাগুেলা না এলে কেমন সবকিছু অর্থহীন মনে হয়। অবশ্য ওয়াকা খুব আমুদে ছেলে। ওর বাবা মেষপালকের কাজ করে বেড়ায়। মা ফলের দোকানে কাজ করে। ওয়াকার পড়াশোনা ভাল লাগে না। সে সারাদিন বেলাভমিতে যারা আসে, তাদের ফাই-ফরমাস খাটে এবং জাহাজের নাবিকদের সঙ্গে আলাপ করার খুব ইচ্ছে। অনেক দিন থেকে সে ভেবেছে একজন জাহাজির সঙ্গেই বন্ধুত্ব করবে। সে তার মার সঙ্গে মাসখানেক হল এ-শহরে চলে এসেছে। এবং এসেই এমন সুন্দর বেলাভূমি আর সমুদ্র এবং পাহাড়, পাইনের বনভূমি দেখে একেবারে তাজ্জব। ওর ইচ্ছে সে বড় হয়ে নাবিকের কাজ করবে। ওয়াকার সঙ্গে আলাপ হবার পর এমন জানতে পেরেছে মৈত্র।

ওয়াকা সেদিন বলেছিল, গুড মর্নিং মিস্টার সেলার।

মৈত্র বলেছিল, আমি মিস্টার সেলার নই হে ছোকরা। আমি বসন্তনিবাস। ম্যাগুেলার কাছে যাচ্ছি। খুব সুন্দর মেয়ে। ওর জন্য এই দ্যাখো কি নিয়ে যাচ্ছি।

—দেখি কি নিয়ে যাচ্ছ!

—একটা সাদা ঘোড়া। এটা এনেছি জাভা দ্বীপ থেকে। তোমার কি চাই?

—আমায় একটা টুপি দিতে পার। নারকেল পাতার টুপি।

—কাল পাবে। এবং পরদিন মৈত্র সোজা ডেক-টিণ্ডাল হাসানের ঘরে ঢকে গিয়েছিল। ওর একটা তালপাতার টুপি আছে। সমুদ্রে যখন ভীষণ রোদ থাকে, হাসান মাথায় টুপি পরতে ভালবাসে। মৈত্র, ওয়াকার জন্য টুপিটা গোপনে চুরি করেছিল। এবং ওয়াকাকে সে টুপিটা পরিয়ে একটা ছবি তুলেছিল পর্যন্ত। মৈত্র ওয়াকার কাঁধে হাত রেখে দাঁড়িয়ে আছে ছবিটাতে।

ওয়াকা বলত, বসন্তনিবাস, তুমি তিমি মাছ দেখেছ?

—অনেক। তিমি মাছের একটা বাচ্চা ধরেছিলাম একবার। তারপর জাহাজে চৌবাচ্চা বানিয়ে রেখে দিয়েছিলাম। একদিন ভীষণ ঝড় আর বৃষ্টি। দেখি বেটা লাফিয়ে ডেকে পড়ে গেছে। আমরা ক'জন মিলে ওটাকে চৌবাচ্চায় রাখতে গিয়ে সমুদ্রে পড়ে গেছিলাম। সেই থেকে আর বাচ্চা পেলেও এখন আর ধরে রাখি না। বড্ড ঝামেলা।

—সত্যি ঝামেলা। ওয়াকা বলল, ওদের দাও। কখন থেকে হাত পেতে রয়েছে।

সে একটা একটা করে দামী চকোলেট দিল। ওদের মুখ দেখল। তোমাদের মা-বাবাকে কিন্তু আবার বলে দেবে না, বলল মৈত্র।

ওয়াকা বলল, ওরা তোমার সঙ্গে আজ খেলবে না।

—খেলবে না কেন?

—ওদের স্কুল খুলে যাবে। সকাল সকাল বাড়ি ফিরে যেতে হবে। পড়াশোনা না করলে ওরা বড় হবে কি করে?

—কাল খেলবে তো?

—তোমাকে আরও সকাল সকাল আসতে হবে বসন্তনিবাস। এখনতো সন্ধ্যা হয়ে যাচ্ছে।

মৈত্র বলল, কাল আমি ছুটি নেব ওয়াকা। সকাল সকাল চলে আসব। ওয়াকা শোনো। বলে কাছে ডাকল। ম্যাণ্ডেলাকে বলবে কাল আমি ওঁদের বাড়ি যাব।

ওয়াকা বলল—ম্যাণ্ডেলা দের ফিরতে দেরি হবে।

—কবে ফিরবে?

—তাতো জানি না। ওদের চাকরটা কিছু বলতে পারছে না।

আচ্ছা ওয়াকা, ম্যাণ্ডেলার মা'র সব সময় অসুখ-বিসুখ লেগে থাকে তাই না?

—সর্দি জ্বর হতে দেখেছি। একদিন খুব কাশছিল।

—আর কিছু না।

সব ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা তখন বলল—এই আমরা খেলব না।

ওয়াকা বলল—না, তোমরা বাড়ি যাও। রাত হলে তোমাদের মা-বাবারা বকবে।

বসন্তনিবাস বলল, ওরা থাক না। ওরাতো কোনো গণ্ডগোল করছে না।

ওয়াকা হাত ছুঁড়েফুঁ ড়ে বলল, আরে এদের মা-বাবাকে তো তুমি জান না, ভীষণ বাজে।

হয়তো তখন পাহাড়ের ওপরে কাঠের বাড়িতে কোনো জানালায় উঁকি দিয়ে কেউ দেখছে।

ওয়াকা টের পেয়েই বলছে, এই টিকি, তোকে তোর মা দ্যাখ খুঁজছে। তাড়াতাড়ি যা।

তখন হয়তো অন্য পাহাড়ের ছাদে দাঁড়িয়ে ডাকছে, টপু। টুপু কোথায় রে!

—যাই বাবা।

ছোট্ট এইসব মাউরি ছেলেমেয়েরা চারপাশে দাঁড়ালে মৈত্র সব কষ্ট ভুলে যেতে পারে।

ম্যাণ্ডেলার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি দিনের আলাপ। এবং ওর মামা ডঃ বুচার বলেছিল—বেশি আশকারা দেবে না, তবে তোমার রক্ষে থাকবে না।

মৈত্র, ম্যাণ্ডেলা আসেনি বলে কেমন গোমড়ামুখে বসে থাকল। ওয়াকা ওর পাশে ঠিক ওর মতো দু'পায়ের ওপর ভর দিয়ে বসে আছে। যেন কতদিনের বন্ধুত্ব দু'জনে। বসন্তনিবাস একটা বাচ্চা তিমি পুষেছিল। এর চেয়ে বড় খবর ওয়াকা পৃথিবীতে কি আছে জানে না।

টুপু, টিকি এবং অন্য সবাই দাঁড়িয়ে আছে। কেউ যাচ্ছে না। ওয়াকা খুব বিরক্ত হচ্ছে।—এই তোরা যা। আমরা এখন উঠব।

মৈত্র বলল—আচ্ছা ওয়াকা, ম্যাণ্ডেলার মা'কে কখনও হাসতে দেখেছ?

ওয়াকা মাথা চুলকাল। বলল—মনে করে দেখি। তোরা এখনও দাঁড়িয়ে! আর নেই। আবার যখন আসবে নিয়ে আসবে। তারপর কি ভেবে বলল—হ্যাঁ, হাসতে দেখেছি।

—কবে?

—এই তো সেদিন।

—যাঃ হতেই পারে না। জাহাজডুবির পর হাসতে দেখেছ?

—জাহাজডুবি! ওহো, আমাদের মনেই নেই। ম্যাণ্ডেলার বাবা জাহাজডুবিতে নিখোঁজ হয়েছে। জাহাজডুবির পরও হাসতে দেখেছি।

—মিথ্যে কথা। মৈত্র উঠে দাঁড়াল। রাগে ওর হাত-পা কাঁপছে।—ওয়াকা, তুমি মিথ্যে কথা বলছ।

—তা হবে। তুমি যাচ্ছ!

—জাহাজে ফিরছি।

—চল, সঙ্গে যাচ্ছি।

ওরা দু'জনেই লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে এল। পাথর কেটে সব রাস্তা। এখন চারপাশের সব বাড়ি- ঘরগুলোতে আলো জ্বলছে। কোথাও আলো জ্বেলে মেয়েরা টেনিস খেলছে। মসৃণ সবুজ ঘাসের ভেতর ওরা যখন দৌড়ায়—ওদের সুন্দর পা-হাত-মুখ এবং সাদা পোশাক দেখতে দেখতে মৈত্র কেমন তন্ময় হয়ে যায়। তখন ওয়াকা হঠাৎ ডেকে ওঠে, এই বসন্তনিবাস, তুমি জাহাজে যাবে না?

মৈত্র মনে করতে পারে জাহাজে তার কাজ। সে এদেশের কেউ নয়। ওয়াকা তার কেউ নয়। এই বাচ্চা শিশুরা ওর কেউ নয়। সে আপন মনে চুপচাপ হাঁটে। তারপর আবার সহসা অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে বলে, সত্যি বলছ হেসেছিল।

—আমার তো তাই মনে হয়। নামতে গিয়ে ওয়াকার মাথা থেকে টুপি পড়ে গেছিল। সে টুপিটা তুলে নিল, দু'বার ঝেড়ে ওটা আবার মাথায় পরে বলল—আমি দেখেছি। ওকে অনেকবার হাসতে দেখেছি।

—অনেকবার! মৈত্র কেমন মুখ গোমড়া করে ফেলল। স্বপ্নটার সঙ্গে ঠিক মিলছে না। সে বলল- আচ্ছা ওয়াকা, তা হলে যাচ্ছি। আসলে ওয়াকা ঠিক বুঝতে পারে না। ছেলেমানুষ, না বোঝারই কথা ম্যাণ্ডেলার মা হাসতেই পারে না। বরং মৈত্রের ইচ্ছে হল একবার বলে, জানো ওয়াকা, আমি যতদূর জানি তিনি লম্বা একটা মেহগিনি খাটে কেবল শুয়ে থাকেন। সারা শরীর নরম সাদা সিল্কের চাদরে ঢাকা। মুখের রং ফ্যাকাশে। কেবল চোখ দুটো তাজা। ভীষণ তাজা আর মাঝে মাঝে সেই ছোট্ট ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাটা বিদেশী লোক দেখলেই কুঁই কুঁই করে ওঠে।

ওয়াকা বলল—ওদিকে কোথায় যাচ্ছ! ওদিকে কোনো রাস্তা নেই। শুধু বন। গভীর বনের ভেতর ঢুকে গেলে আর বের হতে পারবে না বসন্তনিবাস।

মৈত্র তখনই একটা ভীষণ ঠাণ্ডা গলার স্বর শুনতে পেল। সে ভীষণ ভয় পায়। সেই

ছোটবাবু আর ডেভিড। হাতে তাদের টর্চ। ছোটবাবু বলছে, এদিকে এস ওয়াকা, তুমি ওকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে। সারাদিন তুমি ওর সঙ্গে ছিলে?

—কোথাও না স্যার।

ডেভিড, মৈত্রকে নিয়ে আগে যাচ্ছে। ছোটবাবু ওয়াকার সঙ্গে

ওয়াকা তখন বলেছিল—বসন্তনিবাস তো বিকেলের দিকে কুইনস পার্কে গেছে। তার আগে ওকে আমরা দেখিনি। সারাদিন আমি ওর সঙ্গে থাকব কি করে!

ছোটবাবু ভেবে পেল না সারাটা সকাল দুপুর মৈত্রদা কোথায় ছিল। জাহাজে এসে সে নানারকম ঝামেলায় ক্রমে জড়িয়ে যাচ্ছে। ক্যাথারিন এসে এক রোববারে ফিরে গেছে। বঙ্কু, অনিমেষ এক রোববারে সবার হয়ে গেছে। ছোটবাবু যেতে পারছে না। সেই যে সে জেনে ফেলেছিল বনিকে আর তখন থেকে সে একেবারে অন্য মানুষ। কেমন সে দায়িত্বশীল মানুষ, অথবা কখনও উইনচের নিচে বনি এসে যখন ওর এটা ওটা এগিয়ে দেয়, সে ভেবে পায় না বনিকে কি বলবে। বনি সহজেই অজস্র কথা বলতে পারে, বনির সঙ্গে সারারাত বোট-ডেকে বসে গল্প করতে করতে কখনও রাত কাবার হয়ে যায় এবং বনিকে নিয়ে সে ঘুরেও আসতে পারে যেন—বনি ভীষণ বুদ্ধিমতী। সঙ্গে ডেভিডকে নিতে ভালবাসে আর তারপর বনি ডেবিডকে কোন পাবে বসিয়ে গাড়ি ছুটিয়ে দেয়—কথা থাকে ফেরার সময় তুলে নেবে ডেবিডকে। ছোটবাবু চুপচাপ থাকে। বনির চুল বড় হয়ে যাচ্ছে। বনির চুল বাতাসে উড়তে থাকে। বনির ভারি খারাপ স্বভাব–সে কথা বলার সময় অযথা হেসে ছোটবাবুকে ঠেলে দেয় সামান্য। ছোটবাবু তখন না বলে পারে না, এই পড়ে যাব কিন্তু। পড়ে গেলে মরে যাব।

আসলে ছোটবাবু ওয়াকাকে বলতে চাইল, ওকে বেশি দুর নিয়ে যাবে না। আমাদের জাহাজ শিগগির ছেড়ে দেবে। আমরা সামোয়াতে যাব। ওঁকে নিয়ে আমরা খুব চিন্তায় পড়ে গেছি ওয়াকা! এমন হাসিখুশী মানুষটা হঠাৎ কি যে হয়ে গেলেন!

ওয়াকা বলল—যাচ্ছি স্যার।

ওরা হাঁটতে হাঁটতে সী-ম্যান মিশানের কাছে এসে গেছে। ছোটবাবু ওয়াকাকে বলতে পারত—তোমরা ওকে বেশি দূরে নিয়ে যাবে না। ওর মাথায় গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে। জাহাজে এটা হয়। বড় একঘেয়েমী কাজ জাহাজে। তুমি তো জানো না ওয়াকা—মৈত্রদার দেশে স্ত্রী আছে। মানুষটা তার বৌকে ভীষণ ভালবাসে। ওর ছেলে হবে। ছেলে হলে একদিন ভোজ দেবার পর্যন্ত কথা ছিল। এখন সেসব আর ভাবি না।

তরপর যেন বলতে পারত, তোমাদের কি কিছু বলে মৈত্রদা? এই যেমন তাঁর বৌর কথা বাচ্চার কথা। চিঠির কথা। চিঠি একটাও কেবিনে পাওয়া যাচ্ছে না। স্যালি হিগিনস চিফ্-মেট সবাই দুঃসংবাদে ওর ফোকসালে নেমে দেখেছিল, চুপচাপ মৈত্রদা বসে রয়েছে। চোখ ঘোলা। কাজে বের হয়নি। এবং সারেঙকে সারারাত অযথা খিস্তিখেউড় করেছে। সারারাত সব চিঠিতে আগুন জ্বালিয়ে হাত-পা সেঁকেছে।

ওয়াকা চলে যাচ্ছিল। ছোটবাবু বলল—তোমার সঙ্গে ফের দেখা হলে আমাদের খবর দেবে।

—আচ্ছা। সে এবার সত্যি চলে যাচ্ছিল।

ছোটবাবু বলল—তুমি কোথায় থাকো?

সে একটা পাহাড়ের টিলা দেখিয়ে বলল—ঠিক তার নিচে। রাস্তার নাম সাইমন স্ট্রীট। সে যে বাড়ির আউট-হাউসে রাতে শুয়ে থাকে তার ঠিকানা পর্যন্ত দিয়ে দিল।

ওয়াকা বুঝতে পারছিল না এমন ভালো মানুষটাকে তাঁরা খুঁজে নিয়ে যাচ্ছে কেন। বসন্তনিবাস তো জাহাজেই ফিরছিল। বেশি রাতও হয়নি। এর চেয়ে কত বেশি রাত করে জাহাজিরা বন্দরে ফেরে। আর সে দেখেছে বসন্তনিবাসের মতো সমুদ্রের গল্প কেউ বলতে

পারে না। ওরা দু'জনে অনেক দিন গল্প করতে করতে সারাটা দিন কাটিয়ে দিয়েছে। বসন্তনিবাস ওয়াকাকে ভাল ভাল খাবার খাইয়েছে দোকান থেকে। যেন বসন্তনিবাসের এর চেয়ে বড় কাজ পৃথিবীতে আর নেই।

বনি গ্যাংওয়েতে দাঁড়িয়েছিল। সে ছোটবাবুকে উঠে আসতে দেখে বলল—পেলে?

—পেয়েছি। আসছে।

বনি দেখল মানুষটা অন্ধকার থেকে উঠে আসছে। কালো পোশাক শরীরে। নানা রঙের রাংতা আঁটা। সেফটিপিনে সব লাল নীল ফিতে, হলুদ প্রজাপতি। বড়দিনের উৎসবে যেমন সবাই লম্বা টুপি পরে হৈ-চৈ করে বেড়ায় বড়-টিণ্ডালের মাথায় তেমনি লম্বা টুপি। টুপিতে সব হলুদ নীল ফুল। বোধহয় ওয়াকা বলে ছেলেটা বড়-টিণ্ডালকে ফুল দিয়ে এভাবে সাজিয়ে দেয়।

জাহাজে মৈত্রদা কারো সঙ্গে কথা বলছে না। কাজের সময় ঠিক কাজ করে যাচ্ছে। ছুটির দিনে সে সকালেই বের হয়ে পড়ে। কোনো কোনোদিন রাতে ফেরে না। একদিন ওয়াকা এসেই খবর দিয়েছিল, সমুদ্রের ধারে বালিয়াড়িতে শুয়ে আছে বসন্তনিবাস। ওয়াকা কিছুতেই জাহাজঘাটায় নিয়ে আসতে পারছে না।

এসব দিনেও ছোটবাবু, বঙ্কু অথবা অনিমেষকে নিয়ে খুঁজতে বের হয়। কোনোদিন ডেভিড থাকে সঙ্গে। অমিয় কেমন স্বার্থপরের মতো ব্যবহার করছে। মাঝে মাঝে তার হাতে থাকে লম্বা একটা থলে। থলের মুখ ঢাকা। দু'দিন গ্যাংওয়েতে কোয়ার্টার-মাস্টার ধরেছিল। সে ব্যাগ খুলে দেখালে কোয়ার্টার- মাস্টার অবাক। এসব ছাই পাশ সে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে! অমিয় একটা কথাও বলেনি। দীর্ঘ সমুদ্রযাত্রায় মাথা বোধ হয় কারো ঠিক নেই। আরো এক বছর থাকতে হবে জাহাজে, দেশে ফেরা যাচ্ছে না। এই সব শুনেই হয়তো ভয়ে বড়-টিণ্ডাল পাগল হয়ে গেল। এবং সে নিজেও ভাল নেই। জাহাজের এই হাল তবিয়ত—কখন কি হয় অথচ মুখ ফুটে বলার কারো সাহস নেই। কোয়ার্টার-মাস্টার তারপর অমিয়কে একটা প্রশ্নও করেনি।

একদিন ছোটবাবু অমিয়কে ডেকে খুব কথা শুনিয়েছিল।—তুই কিরে! মৈত্রদার কোন খোঁজ-খবর নিস না। কোথায় থাকিস!

অমিয় বলেছিল, ছোটবাবু, জাহাজের অবস্থা ভাল না তোমাকে বলে দিলাম। মৈত্রদা সেয়ানা লোক। পাগলামি করলেই ভেবেছে দেশে পাঠিয়ে দেবে। ও-সব আমরা বুঝি।

—তুই কি বলছিস যা তা!

—সত্যি কথা বলছি। তুমি তো আর জাহাজিদের খবর রাখো না। মন কারো ভালো নেই। এই যে এক বছরের জন্য কাপ্তেন সাউথ-সীতে ভেসে বেড়াবে সেটা কেন তুমি জান?

—ফসফেট টানবে জাহাজ

—ধুস, তুমি একটা আহাম্মক ছোটবাবু? ওটাতো একটা ওজুহাত। জাহাজ এখন কোম্পানির কর্তারা ডুবিয়ে দিতে পারলে বাঁচে। ওটা ওপরের দিকে উঠতে থাকলেই বাবুদের জ্বর আসতে থাকে।

ছোটবাবু একটা কথা বলতে পারল না। বেশ কানাঘুষা তবে জাহাজে যেই হোক প্রচার ভালই চালিয়ে যাচ্ছে।

ছোটবাবু বলল. আমার এসব বিশ্বাস হয় না। সব গুজব।

—তুমি নতুন ছোটবাবু। তোমার কেউ নেই। মা-বাবা-ভাই বোনের খোঁজ খরব রাখ না। তুমি কি করে বুঝবে আমাদের দুঃখ।

ছোটবাবু কেবিনে পায়চারি করছিল। অমিয় বসে রয়েছে। ছোটবাবু ভেবেছিল, কি করে এমন একটা গুজব থেকে জাহাজটাকে রক্ষা করা যায়। ডেভিড মাঝে মাঝে ক্ষেপে গেলে

এমনই বলত। তার তখন বিশ্বাস করতে ভাল লাগত। ডেবিড কি এখন সবাইকে একই কথা বলে বেড়াচ্ছে। কতবার জাহাজ পথ হারিয়েছিল, কিউ-টি-জি কতবার সঠিক পায়নি, কম্পাস রীডিং ঠিক না পেলে যা হয়, যতই মেরামত করা হোক অথবা নতুন কম্পাস জাহাজে উঠলেই সবাই কেমন গণ্ডগোলে পড়ে যায়। আসলে সবই গুজব সে বলতে পারত। ক' বার ক'জন কাপ্তান পাগল হয়ে নেমে গেছে জাহাজ থেকে তার একটা লিস্ট যেন এখুনি টানিয়ে দিতে পারে অমিয়! এবং ছোটবাবু এটা বুঝতে পেরেছে ফোকসালে নেমে। সবার চোখে-মুখে ভীষণ অসন্তোষ। সুযোগ পেলেই সারেঙকে যা তা বলছে। সুতরাং অমিয় তাকে তো স্বার্থপর ভাববেই।

ছোটবাবু বলল—মৈত্রদা তোকে কিছু বলেছে?

—কী বলবে?

ছোটবাবু বলল—এসব গণ্ডগোল হবার এমন কিছু কথা যা থেকে আমরা ধরতে পারি—অর্থাৎ কোনো ক্লু যদি আবিষ্কার করা যায়।

—তুমিও যেমন ছোটবাবু। মৈত্র কাঁচা ছেলে। সে আগে যদি কিছু বলতই তবে তোমরা তো সব ধরেই ফেলতে।

—আমার তো মনে হয় বাড়ি থেকে কিছু খারাপ খবর-টবর এসেছে।

—তুমি সেই ভেবে থাকো। আমি এখন উঠব। জাহাজ এবার ছাড়ছে। তুমিও সাবধানে থেকো। যা সব শুনেছি ওতে কারো নিস্তার নেই। কাপ্তান আস্ত একটা শয়তান। কাপ্তান মানুষ হলে এমন ভাঙা জাহাজ নিয়ে দরিয়ায় ভাসতে সাহস পেত না।

ছোটবাবুর মনটা কেমন দমে গেল। এ জাহাজে বনি আছে এবং কাপ্তেন জেনে-শুনে এত বড় দায়িত্বের ভেতর কেন যাচ্ছেন! ছোটবাবু কি ভেবে বলল—আচ্ছা ঠিক আছে, তুই যা।

অমিয় যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল।

ছোটবাবু তখনও পায়চারি করছে। বড়-মিস্ত্রির নেমে যাওয়া, বিষাক্ত পাখিদের উড়ে আসা, আর্চির ক্রুদ্ধ মুখ, বনিকে জাহাজে নতুনভাবে আবিষ্কার, মৈত্রদার সহসা পাগল হয়ে যাওয়া, তাকে খুবই চিন্তায় ফেলে দিয়েছে। এবং জাহাজে কাপ্তান নিজেও কিসব দেখতে পান। একজন মেয়ে সবসময় সোনালী গাউনের ভেতর জ্যোৎস্না রাতে জাহাজ- ডেকে পায়চারি করে বেড়ায়। এসব মনে হতেই সে সোজা মৈত্রদার ফোকসালে চলে গেল। শেফালীবৌদি সম্পর্কে কিছু বললে একটা কথা বলে না। আজ অন্যভাবে কথা আরম্ভ করবে ভাবল। গতকাল থেকে ওকে আটকে রাখা হয়েছে। কোথায় নেবে যাবে কে জানে। সারেঙের সঙ্গে পরামর্শ করে ছোটবাবু এছাড়া আর কোনো পথ খুঁজে পায়নি। জাহাজ ছেড়ে দিলে যদি আবার সব ঠিকঠাক হয়ে যায়!

ছোটকে দেখেই কেমন ছেলেমানুষের মতো বলল—তুই এলি!

ছোটবাবু বলল—আচ্ছা মৈত্রদা, তোমাকে যদি দেশে পাঠিয়ে দেয়া যায় কেমন হবে?

—আমাকে! দেশে! কি হবে!

—তবে তুমি এমন করছ কেন?

—কী করছি। তোরাই তো আমাকে যা তা করছিস। কাল আমাকে জাহাজ থেকে নামতে দিসনি। কোয়ার্টার-মাস্টার আমাকে নামতে দেয়নি। তোরা কী ভেবেছিস!

—আমরা কিছু ভাবিনি। তুমি যদি দেশে যেতে চাও সবাই মিলে আমরা কাপ্তানকে ধরব। সবাই বললে তিনি আমাদের কথা ফেলতে পারবেন না।

—তুই মাঝে মাঝে খুব সরল হয়ে যাস ছোট। আমার দেশে যাবার কী হল! এতগুলো লোক জাহাজে কাজ করতে পারছে আমি পারব না!

—সমুদ্রের বালিয়াড়িতে শুয়ে থাকো কেন! জাহাজে ফিরে আসো না কেন!

—সকাল হলেই চলে আসতাম। জাহাজে না ফিরলে আমার কাজ কে করবে! তোদের নিজেদের মাথা ঠিক নেই। কিসব গুজব জাহাজে ছড়ানো হচ্ছে খবর রাখিস!

ছোটবাবু বলল—জাহাজটাতো সত্যি ভাল না। সবাইতো বলছে ভুতুড়ে জাহাজ। কত কাপ্তান জাহাজটার পাগলামীতে নিজেরা পাগল হয়ে গেছে। আমরা তো ভাবলাম এ-সফরে তোমাকে দিয়ে বোধহয় এটা আরম্ভ হল।

মৈত্র খুব সরলভাবে হাসল।—তুই খুব ভয় পেয়ে গেছিস।

—ভয় পাব না বল! তুমিই তো বলেছিলে ছোট, আমরা আছি ভয় কি। এখন যদি তোমরা এমন করতে থাকো তবে আমি কি করি বলত!

দু' একজন জাহাজি দরজায় উঁকি দিয়েছিল। ছোটবাবু ওদের চলে যেতে বলায় কেউ ভিড় করে নি। সারেঙসাব সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে সব শুনছেন। ছোটবাবু, মৈত্রমশাইকে নানাভাবে বোঝাচ্ছে।

ছোটবাবু বের হবার মুখে হঠাৎ ছুটে গেল মৈত্র।

—এই শোন। ছোটবাবু ঘুরে দাঁড়ালে বলল, আমি কিন্তু কাল কিনারায় যাব একবার। কোয়াটার-মাস্টারকে বলে দিস যেন আমাকে ছেড়ে দেয়। ছোটবাবু বলল, আচ্ছা বলে দেব। ওপরে উঠে সারেঙসাবকে বলল, কাল যেতে দিন। আমি কাল ওর সঙ্গে থাকব। জাহাজতো এবার ছেড়েই দিচ্ছে।

পরদিন শেষবারের মতো সালফার গাড়িতে বোঝাই হচ্ছিল। টংলিং টংলিং করে সব মালগাড়ি একে একে চলে যাচ্ছে। ক্রেনগুলো এবার সরিয়ে নেওয়া হবে। ডেরিকগুলো সব নামিয়ে দেওয়া হবে। জল মারা হবে সর্বত্র। সব সালফার গুড়ো এখন ধুয়েমুছে একেবারে খালি জাহাজ এবং গ্যাংওয়েতে দাঁড়ালেই বোঝা যায় জাহাজ কত খালি, জাহাজের সিঁড়ি একেবারে সোজা হয়ে গেছে।

বিকেলে নেমে গেল মৈত্রদা। সেই জমকালো পোশাকে। মৈত্রদা সারাদিন কাজ করেছে। যেভাবে ছোটবাবু দেখে থাকত বয়লার-রুমে আজও তেমনি দেখেছে। কাজকাম কম বলে সকাল সকাল ছুটি। মৈত্রদা নেমে গেল। পেছনে পেছনে যেন মৈত্রদা বুঝতে না পেরে সে নেমে গেল। এবং বনি আবার তার পেছনে পেছনে নেমে গেল। তার পেছনে নেমে গেল আর্চি। আর্চি নেমে যেতে না যেতেই একদল বাচ্চা এসে ঘিরে দাঁড়াল আর্চিকে। বাঘের মতো মানুষটাকে ওরা এমন ক্ষেপিয়ে তুলল যে, আর্চি আর সাহস পেল না। সে উঠে এসে সারাক্ষণ পায়চারি করল বোট-ডেকে। সে এখন কি করবে স্থির করতে পারছে না। যতদূর জ্যাক চলে যাচ্ছে তত দূরে সে তাকিয়ে আছে। কাপ্তান চার্ট-রুমে ভীষণ ব্যস্ত। তিনি, ডেবিড, চিফ-মেট শেষবারের মতো জাহাজের কোর্স-লে ঠিক আছে কিনা দেখে নিচ্ছেন। ক্রমে স্যালি হিগিনস ভীষণ সতর্ক। চারপাশের বাতাসে গন্ধ শুঁকে ভয়ঙ্কর ঝড়ের আশঙ্কাতে আতঙ্কিত। অথচ চোখমুখ দেখে বোঝাই যাবে না, বরং তিনি আগের চেয়ে বেশী হাসিঠাট্টায় মজে আছেন। সরল সহজভাবে কথা বলছেন সবার সঙ্গে। একজন সফল কাপ্তানের মতো সবসময় চলাফেরা। শেষ সফরে তিনি তো ভেঙে পড়তে পারেন না। তিনি তো বলতে পারেন না সিউল-ব্যাঙ্ক সত্যি অচল জাহাজ। ওকে ফের এতদিন সমুদ্রে একনাগাড়ে কিছুতেই চালানো যাবে না।

আবার হয়তো কখনো কখনো মনে হয় সিউল-ব্যাঙ্ক এতদিন সমুদ্রে ঘুরে ঘুরে নিজের ভেতরেই সে সৃষ্টি করেছে এক ঐশী শক্তি। এর সামনে সব সমুদ্রঝড়, সাইক্লোন, টাইফুন অথবা বিষাক্ত পাখিদের আক্রমণ—অর্থহীন। ভারি বিশ্বস্ত জাহাজ। মানুষের চেয়ে অনেক বেশী, স্ত্রী এলিসের চেয়ে আরও বেশি, তিনি সবকিছুর ওপর বিশ্বাস হারালেও সিউল-ব্যাঙ্কের ওপর বিশ্বাস হারাতে পারেন না। তাঁর তখন সাহস বাড়ে। তিনি তখন অনায়াসে মাথায় টুপি

টেনে চঞ্চল বালকের মতো মাঠের শেষ গোলপোষ্টে দাঁড়িয়ে যেতে পারেন। দু'হাত তুলে প্রায় ঈশ্বরের সামিল সাহস এবং প্রতিযোগিতা, এই প্রতিযোগিতায় তিনি তো জীবনে কখনও হেরে যান নি। কর্তৃপক্ষের আস্থাভাজন মানুষ। শেষ সফরে হঠকারী কিছু করে ফেলতে পারেন না।

তখন বনি হাত তুলে ডাকল, ছাটবাবু দাঁড়াও। আমি আসছি।

ছোটবাবু পেছনে তাকিয়ে দেখল, বনি আসছে। বনির পুরুষের পোশাক বেশ মনেরম। এবং বনির ওপরে ওর খুশী হবার কথা। কিন্তু এখন সে ভীষণ রেগে যাচ্ছে। কি দরকার আসার। ওর ফিরতে ফিরতে কত রাত হবে কে জানে? আর মৈত্রদা কোথায় কতদূর যাবে সেতো জানে না। কেবল আড়ালে আড়ালে লক্ষ্য রাখা। সন্ধ্যা হলেই বলতে হবে, এবারে চল। ওয়াকা এবং সে মৈত্রদাকে জাহাজে নিয়ে আসবে। আর তখন কিনা বনি! সে বলল, কী, তুমি আবার কেন!

—কিছু হবে না। বাবাকে বলে এসেছি।

আর তখন ছোটবাবু দেখল, মৈত্রদা কোথাও নেই। সে যেই না অন্যমনস্ক হয়েছে, পেছনে তাকিয়েছে, কথা বলেছে বনির সঙ্গে, তখনই মৈত্রদা ভ্যানিশ! সে বলল, আরে মৈত্রদা কোথায়!

॥ পয়ত্রিশ ॥

তখন মৈত্র-হাঁটছে। বেশ পা চালিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। চারপাশের বাড়ি-ঘরের জানালা সব খুলে যাচ্ছিল। ছোট ছোট ছেলেরা-মেয়েরা দৌড়ে নেমে আসছে। চিৎকার করছে, বসন্তনিবাস। বসন্তনিবাস একটা কথা বলছে না। মাথায় সেই রাজার টুপি পরে সে হাঁটছে। পকেট থেকে একটা দু'টো দামী চকোলেট ছোটদের দিয়ে প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে সব পার হয়ে চলে যাচ্ছে। কখনও ট্রামে, কখনও বাসে, এবং যখন যেখানে যেভাবে উঠে যাচ্ছে সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখছে—মানুষটার পোশাক ভারি মনোরম। সে হেসে সবার সঙ্গে কথা বলছে—সবাইকে গুড আফটারনুন বলছে। বসন্তনিবাস মাথা নুয়ে কখনও সবাইকে অভিবাদন জানাচ্ছে। যেন সে এ-পোশাকে এখন এ-শহরের পার্কে অথবা যেখানে উইলো ঝোপ অথবা কৌরিপাইনের বনভূমি আছে হেঁটে সেখানে যাবে। আর চারপাশ থেকে সত্যি বুঝি প্রজাপতিরা উড়ে আসবে এবার। সমুদ্র থেকে পাখিরা।

সে আজ কোথাও থামছে না। কোথাও ছোট ছেলেমেয়েদের সঙ্গে ছুটছে না, অথবা সে যেন এখন হরেক রকম খাবারের ফেরিওয়ালাও নয়, সে বরং সোজা চলে যাবে ম্যাণ্ডেলাদের বাড়ি। জাহাজ ছাড়ার আগে একবার ম্যাণ্ডেলার মা'র সঙ্গে দেখা করা দরকার। কারণ সেই যুবতী মেয়ে জাহাজডুবির পর হাসতে পারে বিশ্বাস হয় না। ওয়াকা ঠিক মিথ্যে কথা বলেছে। সে নিজের চোখে না দেখে কখনও বিশ্বাস করতে পারবে না।

এবং তার মনে হচ্ছিল সেই ছোট্ট উপত্যকাতে উঠে গেলে ঠিক দেখতে পাবে, দু'টো উইলো গাছ, একটা সিলভার-ওক, সিলভার-ওকের নিচে ছোট্ট একটা ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা, ওকে দেখেই কুঁই কুঁই করতে থাকবে। আর তখন জানালা খুলে যাবে, ম্যাণ্ডেলা দু'হাত তুলে চিৎকার করবে—মা, বসন্তনিবাস! বসন্তনিবাস বলে সে ছুটে এসে ওকে জড়িয়ে ধরবে। আর তখন সেই ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাটা কেবল লাফাবে চারপাশে এবং ঠিক স্বপ্নে যেমন সে দেখেছিল ভারি চেনা মুখ, এলসা দ্য কেলির মতো দুঃখী মুখ ম্যাণ্ডেলার মা'র। মাথার ভেতর কেবল বারবার সেই স্বপ্নটা ঘুরে বেড়ায়। আসলে এটা স্বপ্ন কিনা সে বুঝতে পারে না। তার ভাবনায় এভাবে কিছু ইচ্ছে হয়তো কখনও স্বপ্নের মতো কাজ করে—তখন সে আর স্থির থাকতে পারে না। সেই ছোট্ট উপত্যকায় যেন কতকালের বিষাদ, সে ঠিক পৌঁছে গেলেই সব নিরাময় হয়ে যাবে। ম্যাণ্ডেলার মা হাসতে হাসতে বলবে, আপনি বুঝি বসন্তনিবাস। ম্যাণ্ডেলা এসে আপনার খুব গল্প করে। ঘুমোবার সময় আপনার কথা বলে ওকে ঘুম পাড়াতে হয়।

এভাবে জীবনটাকে ভাবতে ভীষণ ভাল লাগছিল মৈত্রের। সে আর মৈত্র থাকতে চাইছে না। শেফালী তার স্ত্রী ভাবতে ভাল লাগছে না, শেফালী বরং নষ্টচরিত্রের মেয়ে। বিশ্বাস রাখতে পারেনি। শঠতা বোধ হয় মৈত্রকে এভাবে পাগল করে দেয়। তার এখন যা ভাল লাগে, কোন পবিত্র নারী সুধাপারাবার এবং জাহাজডুবির পর সেই মুখ, কেবল যুবতীর মুখে বিষণ্ণতা থাকবে। নিজের মানুষ সুমদ্রে হারিয়ে গেলে কি আর থাকে। সে হাঁটছিল আর স্বপ্ন দেখছিল। ভাবছিল অথবা স্বপ্ন দেখছিল—দেখছিল অদ্ভুত সব দৃশ্য তার চোখের ওপর নৃত্য করে বেড়াচ্ছে। শহরের পাহাড়ে পাহাড়ে অথবা উপত্যকায় কিছু নেই যেন, কেবল সেই সুন্দর উপত্যকাতে কেউ চোখ মেলে তাকিয়ে আছে, সমুদ্রে কবে আবার বসন্তনিবাসের জাহাজ ভেসে আসবে।

মৈত্র স্বপ্নে দেখতে পায় সকাল হলেই ম্যাণ্ডেলা সমুদ্রের ধারে নেমে আসছে। ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাটা ওর পায়ে পায়ে ঘোরে তখন, মা তার জানালায় বসে থাকে। মা তার ক্রমে ভাল হয়ে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে কোনো সকালে ম্যাণ্ডেলার হাত ধরে মা তার সমুদ্রে নেমে আসে। বড় করুণ চোখে তাকায়। তার কা'কে কি যেন ফিরিয়ে দেবার কথা। মায়ের চোখ দেখলে ম্যাণ্ডেলাও তা টের পায়।

বসন্তনিবাসের মনে হয়, ম্যাণ্ডেলার মা'কে সেই যে এক বাংলাদেশের নাবিক পালক দিয়ে

গেল আর এল না। সাদা রঙের জাহাজ সমুদ্রে যেতে দেখলেই বুঝি মনে হয় তার মা'র, ওটা বুঝি বসন্তনিবাসের জাহাজ। সে আবার বুঝি এ বন্দরে আসছে। এ-ভাবে কখনও ভাবতে ভাল লাগে বসন্তনিবাসের।

আবার কখনও ভাবতে ভাল লাগে ম্যাণ্ডেলার মা সুন্দর একটা নীল রঙের গাউন পরে আছে। পায়ে সাদা রঙের জুতো। হাতে লাল রঙের দস্তানা। শীত নেই তবু যুবতী দস্তানা পরে বসে থাকতে ভালবাসে। দস্তানা পরে সমুদ্রের ধারে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু জাহাজটা বন্দরে ভিড়ছে না। ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে। যুবতীকে তখন পাইন গাছের নিচে সাদা পুতুলের মতো ভাবতে ভাল লাগে বসন্তনিবাসের। আবার কখনও মনে হয় ভীষণ শীত। তুষারপাত হচ্ছে কেবল। শীতে বরফ জমেছে পাইনের পাতায়। গাছগুলো থেকে পাতা ঝরছে। নেড়া গাছে বুড়ো মানুষের সাদা দাড়ির মতো তুষারকণা ঝুলছে। ম্যাণ্ডেলার হাত ধরে মা তার ঘরে ফিরছে। জানালা বন্ধ করে দিচ্ছে। শুধু সামান্য শার্শি খোলা থাকে অথবা বারবার তুষারপাতে জানালা আবছা হয়ে গেলে সাদা তোয়ালে দিয়ে মুছে দিচ্ছে কাঁচ। ঝকঝকে কাঁচের ভেতর দিয়ে সমুদ্র দেখছে। যদি জাহাজটা আবার ফিরে আসে।

কোনো কোনো রাতে ওরা দেখতে পায় বুঝি গভীর সমুদ্রে একটা জাহাজ নোঙর ফেলে আছে। জাহাজটা কিনারায় ভিড়তে পারছে না। ভীষণ ঝড় সমুদ্রে। খুব ঝড় উঠলে ওরা আর জাহাজটাকে দেখতে পায় না। বুঝি বসন্তনিবাসের জাহাজ সমুদ্রে ডুবে গেছে। বোধ হয় তখন ম্যাণ্ডেলার বুক কাঁপে। মা হাঁটু গেড়ে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করে তখন। বসন্তনিবাস হাঁটছিল আর এমন সব ভাবছিল যেতে যেতে।

সে ঠিক উপত্যকার নিচে এসে দেখল গোলাপের বাগান, বড় বড় গোলাপ। স্বপ্নের সেই সিলভার ওক-গাছটাও ঠিক আছে। ধূসর রঙের জানালা, ঝকঝক করছে জানালার কাঁচ। বাড়িটার পেছনে গভীর অন্ধকারের মতো দাঁড়িয়ে আছে রাশি রাশি পাইন, আর নীলবর্ণের পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সে এবার প্রায় মই বেয়ে ওঠার মতো উপরে উঠে যাচ্ছে। এবং গলা বাড়িয়ে সে দেখতে পেল দরজা জানালা বন্ধ। ম্যাণ্ডেলা নেই। বাড়িটাতে কেউ নেই। ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাটা নেই। গাছটা আছে। এবং সে দেখতে পেল, সুদৃশ্য সব বেতের চেয়ার। যেন এইমাত্র কেউ বসে বসে এখানে অপেক্ষা করে চলে গেছে। সে তখন চিৎকার করে ডাকল, ম্যাণ্ডেলা। আমি বসন্তনিবাস। কেউ কোন সাড় দিচ্ছে না।

তারপর সে আবার চিৎকার করে ডাকল, আমি বসন্তনিবাস। আমার পালকটা ফিরিয়ে দেবে বলেছিলে, আমি ওটা নিতে এসেছি। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে ভেবে পেল না এমন কেন বলছে, কিসের পালক! কার পালক! কি সে ফিরিয়ে নিতে চায়। স্বপ্নটার সঙ্গে সে জীবনের মিল এভাবে খুঁজে বেড়াচ্ছে কেন। এবং তখনই মনে হল দরজা খুলে এক অদ্ভুত প্রকৃতির মানুষ বের হয়ে আসছে। ওর চেহারা ভীষণ বন্য। চোখ দুটো জ্বলছে। ভেতরে যেন সে কি করছিল। বাধা পেয়ে রাগে চিৎকার করতে করতে বের হয়ে আসছে। আরে সেই ফেরিওয়ালা লোকটা! শহরে মাঝে মাঝে কিছুদিন থেকে দেখা যাচ্ছে। সে বলল, পালক! কিসের পালক? কি চাই তোমার?

বসন্তনিবাস বলল, ম্যাণ্ডেলা নেই?

—ম্যাণ্ডেলা মেলা দেখতে গেছে। মৈত্রের মনেই ছিল না এখানে এখন পাইন-ফ্যাস্টিভ্যাল আরম্ভ হয়ে গেছে। ছেলে-বুড়ো সবাই ছুটছে মেলায়। সে একা একা শুধু ঘুরে বেড়াচ্ছে। সে বলল, আমাকে ম্যাণ্ডেলা দেখলে চিনতে পারত। আমার সঙ্গে ওর ভারী বন্ধুত্ব।

তখন লোকটা হা হা করে হাসছিল। এবং ঘরের ভেতর থেকে আবার আর এক ঝলক হাসি। দরজার বাইরে এসে দাঁড়াতেই বুঝল এই ম্যাণ্ডেলার মা। চুল সোনালী এবং স্বপ্নে দেখা মেয়েটির মতো নয়। চোখে ভীষণ জ্বালা। যেন বসন্তনিবাস এসে সব গোলমাল করে দিয়েছে। এমন একটা সময়ে কোথাকার উটকো একটা লোক সব তছনছ করে দিচ্ছে। সে তার এলোমেলো পোশাক ঠিক করতে করতে বলল, তুমি এখানে কি চাও?

—ম্যাঙ্গেলাকে।

—ম্যাঙ্গেলা! বন্য লোকটা হাসতে হাসতে একেবারে সব উড়িয়ে দেবার মতো হাত নাড়ছিল। শরীরে তার সামান্য পোশাক। এটুকু না থাকলেও যেন কোন ক্ষতি ছিল না। জাহাজডুবিতে যে কেউ মারা গেছে এখানে, তার কোন চিহ্ন পেল না। বরং মনোরম বিকেলে ওরা সমুদ্র দেখতে দেখতে বোধ হয় বেঁচে থাকার নিরন্তর সুষমার কথা কেবল ভাবছিল। সে বলল, আচ্ছা ম্যাঙ্গেলাকে বলবেন আমি এসেছিলাম।

—বলব। বলেই ওরা ঘরে ঢুকে গেল। দরজা বন্ধ করে দিল।

.

বনি তখন বলল, এস আমরা এখানে বসি।

ছোটবাবু বলল, বনি আমার সবকিছু, কেমন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে।

বনি বিরাট একটা গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে আছে। সে ছোটবাবুর দিকে সোজা তাকাতে পারছে না। সে তাকালেই যেন ছোটবাবু ওর ইচ্ছের কথা ধরে ফেলবে। সে অন্যদিকে তাকিয়ে বলল, তুমি ভয় পাচ্ছ ছোটবাবু?

ছোটবাবু গাছের গুঁড়িতে কনুই রেখেছে। এত কাছে যে বনির চুলের ঘ্রাণ উঠে আসছে নাকে এবং সামান্য এলোমেলো হাওয়া উঠলে দু'টো-একটা চুল পর্যন্ত মুখে এসে সুড়সুড়ি দিচ্ছে। তবু তার কি যে হয়, সে কেমন ভয়ে ভয়ে বলছে, বনি, তুমি যদি কোনোদিন আবার জ্যাক হয়ে যাও। যদি কোনোদিন দেখি সবটাই ভুল। সবটাই মরীচিকার মতো কিছু। তারপর যদি আর্চি......

বনি এবার ওর গলা জড়িয়ে ধরল। তারপর যেমন এই পার্কে সব বড় বড় গাছের ভেতর জোড়ায় জোড়ায় সব ছুটে বেড়াচ্ছে কখনও বনভূমির ভেতর অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে তেমনি অদৃশ্য হয়ে যাবার ইচ্ছে হলে সে বলল, ছোটবাবু তোমার যে কি হয় মাঝে মাঝে। তুমি কেন এমন হয়ে যাও! আমাকে দেখলে গুটিয়ে যাও কেন? আমি কি করে বোঝাব আমি বনি! আর্চি! ফঃ!

ছোটবাবু দেখল বনির চোখ চিক চিক করছে। অথচ ছোটবাবু খুব সহজেই সবকিছু করে ফেলতে পারে না। তার নানাভাবে সব অভিজ্ঞতা জাহাজে গড়ে উঠছে কিন্তু নিজে তো জানে না, কতটা কি হলে শরীরের পবিত্রতা ঠিক থাকে। বারবার কাছাকাছি থাকলেই ভয় ছোটবাবুর —কখন কি অশালীন কিছু করে ফেলবে এবং মুখে সবসময় হতাশা জেগে থাকে। সে তখন প্রাণ খুলে হাসতে পারে না, প্রাণ খুলে ছুটতে পারে না। বনিকে দেখতে দেখতে কেবল তন্ময় হয়ে যায়। তখনই ছুঁয়ে দিতে ইচ্ছে করে, জড়িয়ে চুমো খেতে ইচ্ছে হয়। এবং কাছাকাছি এ-ভাবে যখন জ্যাক ঠিক এসে যায়, ছোটবাবু একেবারে শক্ত কাঠ। যেন সে ছুঁয়ে দিলেই বনি, বনি থাকবে না। আবার জ্যাক হয়ে যাবে। দুরন্ত জ্যাক পাটাতনে লাফিয়ে নামবে এবং তেমনি পায়ে থাকবে হান্টার সু, এবং জল দস্যুদের পোশাক শরীরে। ঝড়ের সমুদ্রে ওকে আবার মাস্তুলের ডগায় তুলে দিয়ে সবাইকে ট্রাপিজের খেলা দেখাবে।

বনি বলল, এস।

ছোটবাবু বনির সঙ্গে হাঁটতে থাকল।

বনি বলল, কত বড় গাছ!

ছোটবাবু ওপরে গাছের শাখা-প্রশাখা দেখল।

বনি বলল, চল ওদিকটাতে।

ওরা দু'জনে ঘুরে ঘুরে পার্কটা দেখল। রঙ্গিন সব গাছপালা। সোনালী রোদ এবং হ্রদের জলে ছোট ছোট স্কিপ। স্কিপ ভাড়া করে যুবক-যুবতীরা লেগুনের মতো খাল বিল ধরে চারপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পিকাকোরা পার্কে বোধ হয় এভাবে অনেক সব ছোট ছোট স্কিপ বড়

বড় গাছের ছায়ায় বেশ কিছু দূরে পাহাড়ের ঢালু চড়াইয়ে এখন লেগে রয়েছে। বনির খুব ইচ্ছে ছোটবাবু এভাবে ওকে নিয়ে কোনো নিরিবিলি জায়গায় চলে যাক। ছোটবাবুর শরীরে আছে এক আশ্চর্য ঘ্রাণ। পাশে পাশে হাঁটলে তার নেশা লেগে যায়। অথচ ছোটবাবু যেন বোঝে না কিছু, জানে না কিছু এবং বোধ হয় রঙিন জলে ডুব দিয়ে কিছু কুড়িয়ে আনতে তার ভারি ভয়। সে কিছুতেই ছোটবাবুর ভয় ভেঙে দিতে পারছে না।

বনি ডাকল, ছোটবাবু

ছোটবাবু তাকাল। ছোটবাবুর মুখ সহসা ভীষণ উজ্জ্বল দেখাল। সে বলল, বনি তুমি এত সুন্দর। একটু থেমে ধীরে ধীরে বলল, আমরা এভাবে নষ্ট হয়ে যাব!

বনির মুখ থমথম করছে। চারপাশে গাছপালা তেমনি আকাশ ছুঁয়ে দিতে চাইছে, পাতার ফাঁকে মনোরম রোদ, আর কোনো গভীর অরণ্যে যেন বাজনা বাজছে। পাতার কুটিরে সব সুন্দর সুন্দর যুবক-যুবতীরা বসে আছে, বিয়ার খাচ্ছে। ফুল ফল কাগজের রঙ্গিন পতাকার ভেতর ওরা কেউ হেঁটে যাচ্ছিল, অথবা কেউ ভারি কাছাকাছি। কিংবা দূরে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে যেন কানের কাছে ফিসফিস করে কথা বলে যাচ্ছে যুবক-যুবতীরা। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল না। ছোটবাবু তখন দেখছিল, বনি সরু রাস্তা ধরে জোরে হেঁটে যাচ্ছে। কোথায় যাচ্ছে বনি জানে না।

আর ছোটবাবু পেছনে পেছনে নানাভাবে বোঝাচ্ছিল, এই কোথায় যাচ্ছ, এই বনি কি হচ্ছে, এই আমি তো বুঝে কিছু বলি নি, বনি, শোন। সে যত জোরে হাঁটছে বনি তার চেয়ে বেশি দ্রুত হাঁটছে। এবং বনির জমকালো পুরুষের পোশাকের ভেতর অথবা শরীরে ছোটবাবু বুঝতে পারছিল কঠিন কিছু খেলা করে বেড়াচ্ছে অথচ ছোটবাবুর এমন কেন যে হয়—যেন বনি ভারি মনোরম পবিত্র অকাঙ্খা, ছুঁয়ে দিলে বনি অপবিত্র হয়ে যাবে। সে এ-সব কারণে বোধহয় বনিকে কেবল বুঝিয়ে যাচ্ছিল—কারণ সে বুঝতে পারছে বনি আর একটা কথা বলবে না। সে এবার বনির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল। বলল, সবাই দেখছে। দ্যাখো ওরা তোমার রাগ দেখে বোধহয় হাসাহাসি করছে।

বনি বলল, জাহাজে ফিরব।

ছোটবাবু বলল, এটা সে রাস্তা নয়।

—সে চিনে যাব।

—যেতে পারবে না।

—সে আমি বুঝব। ছাড়ো বলছি। তা না হলে ভাল হবে না।

ছোটবাবু হাত নামিয়ে দিল। বলল, ঠিক আছে, যাও। আর জাহাজে ফিরছি না।

বনি এবার তাকাল। তারপর বলল, তা হলে আমাকে কোথায় যেতে বলছ? একেবারে সমর্পণ করে দেবার মতো গলা বনির।

ছোটবাবু বলল, এস কিছু খাওয়া যাক।

বনি বলল, বাবা রাগ করবে।

—তুমি বসে থাকবে। আমি খাব। তুমি কোল্ড ড্রিংকস নেবে।

—আর কিছু না?

—না।

তখন ওয়াকা দেখতে পেল বসন্তনিবাস সমুদ্রের বালিয়াড়িতে হেঁটে যাচ্ছে। সে বসন্তনিবাসকে দেখেই ছুটতে থাকল। যত দূরেই যাক, বসন্তনিবাসকে সহজেই চেনা যায়। ওরা মেলা থেকে ফিরছিল। মাথায় ওরা সবাই পাইন পাতার টুপি পরেছে। ওরা রং-বেরংয়ের বেলুন হাতে ফিরছে। টুপু টিকি ওতাটুনু সবাই মিলে উৎসবের সাজে নেমে আসছে।

বসন্তনিবাসকে দেখেই বাড়ি ফেরার কথা ওরা ভুলে গেছে। ওদের কেউ পাতার বাঁশি বাজাচ্ছিল, কেউ ফুলের মালা গলায় পরেছে। মেয়েরা সবুজ পোশাক পরেছে, ছেলেরা সাদা পোশাক। সূর্য তখন সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে। এক মায়াবী আলো এখন এই সুন্দর শহরের ওপর। বসন্তনিবাস সমুদ্রের জলে নেমে যাচ্ছে। পায়ের পাতা ভিজে যাচ্ছে তার।

ওয়াকা ডাকল, বসন্তনিবাস আমরা এসে গেছি।

বসন্তনিবাস একটা কথা বলল না। সে তেমনি হেঁটে যেতে থাকল।

ওয়াকা বলল, বসন্তনিবাস তোমার পালক পেলে?

বসন্তনিবাস বলল, না। ওয়াকা, কে যে ওটা নিয়ে গেল!

ততক্ষণে ওরা সবাই সেই সমুদ্রের বালিয়াড়িতে বসন্তনিবাসকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। উৎসবের দিন বলে, কেউ আজ এখানে রোদ পোহাতে আসে নি। শহরের সর্বত্র অথবা রাস্তায় অথবা বনের ভেতরে সবাই এখন ঘুরে বেড়াচ্ছে। মদ খাচ্ছে, বেলুন ওড়াচ্ছে, কাগজের রঙ্গিন মালার ভেতর সব মানুষেরা যেন ক' দিনের জন্য তাদের হারানো পালক ফিরে পেয়েছে। জমকালো পোশাক পরে সবাই এখন পাতার বাঁশি বাজাচ্ছে।

বসন্তনিবাস বলল, আমাদের জাহাজ কাল ছেড়ে দিচ্ছে ওয়াকা।

—আবার কবে আসবে?

—জানি না ওয়াকা। আবার যখন আসব তখন হয়তো তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। তখন বড় হয়ে যাবে ওয়াকা।

ওয়াকা বলল, আমাদের সঙ্গে নাচবে?

বসন্তনিবাস বলল, কি নাচ?

—এই আমাদের নাচ। আমরা গান গাইব। তুমি পাতার বাঁশি বাজাবে। বলেই ওয়াকা একটা লম্বা প্রায় ক্ল্যারিওনেটের মতো একটা লম্বা পাতার বাঁশি ওর হাতে দিয়ে দিল। বলল, বাজাও।

বসন্তনিবাস বার বার ফুঁ দিয়েও কোন সুর বের করতে পারল না।

—এই দ্যাখো, বলে লম্বা পাতার বাঁশিতে ওয়াকা সুন্দর এক সুর তৈরী করে ফেলল। এবং সবাই তখন ঘুরে ঘুরে পা তুলে হাত তুলে নাচছে। মানুষটা কাল জাহাজে সমুদ্রে ভেসে যাবে, সেই প্রাচীনকালে, ভেলায় চড়ে যারা সমুদ্রে গিয়েছিল ঠিক তাদের মতো এখন বসন্তনিবাস। বসন্তনিবাস এ ক' দিনে নিজের মানুষ হয়ে গিয়েছিল। বসন্তনিবাসকে ছেড়ে দিতে ওদের বোধ হয় কষ্ট হচ্ছিল। বসন্তনিবাসকে ঘিরে এই সব ছোট ছোট ছেলে-মেয়েরা তারপর নাচতে থাকল গাইতে থাকল। এবং সমুদ্র থেকে তখন বাতাস উঠে আসছে। তারা তেমনি নাচছে গাইছে, সর্বত্র এক দুঃখ অথবা বিষণ্ণতা—কি যেন মানুষের এক সময় হারিয়ে যায়, তারপর আর খুঁজে পাওয়া যায় না। বসন্তনিবাসকে তারা সমুদ্রের ধারে ধারে এভাবে নিয়ে নাচতে নাচতে এগিয়ে চলল।

যা হয়ে থাকে, এ-ভাবে মানুষজনের ভিড় বেড়ে যাচ্ছিল। সবাই দেখল পাইন-ফেস্টিভ্যালে বেশ সং বের করেছে ছেলে-ছোকরারা। দ্বিগুণ উৎসাহে তখন মৈত্র বাঁশি বাজিয়ে যাচ্ছে। যেন সেই এক ব্যাণ্ড-মাস্টার—মঞ্চে দাঁড়িয়ে কখনও উঁচু লয়ে আবার কখনও একেবারে নুয়ে নানারকম স্বরের ভেতর মৈত্র নিজের সব জ্বালা ভুলে থাকতে চাইছে। শহরের মানুষেরা বুঝতেই পারছে না লোকটার একটা পালক ছিল সেটা তার অজ্ঞাতে কে চুরি করে নিয়েছে। সে যে এখন নেচে নেচে বাঁশি বাজাচ্ছে সেই হ্যামিলনের বাঁশিয়ালার মতো এবং সে যে ইচ্ছে করলে শহরের সব ছেলেমেয়েদের নিয়ে সমুদ্রে নেমে যেতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করা যাবে না। সব পাহাড়ী উপত্যকাতে দরজা জানালা খুলে যাচ্ছে। ওরা কেউ কেউ আবার বসন্তনিবাসকে উদ্দেশ্য করে সিল্কের রুমাল উড়িয়ে দিচ্ছে। এবং ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা

দলে দলে মিশে যাচ্ছিল।

তখনই ছোটবাবুর সেই শীতল কণ্ঠস্বর। ছোটবাবু মোড়ে এসে একটা ভীষণ জ্যামের ভেতর পড়ে গেছিল। বনি পাশে বসে রয়েছে। মৈত্রদাকে সে খুঁজছে গাড়ি নিয়ে। তখন সবাই হা হা করে হাঁকছিল, আসছে। সেই বিরাট মিছিল পাইন ফেস্টিভ্যালের সব ছেলে-ছোকরারা মেয়েরা এখন মিছিলে একে একে যোগদান করছে। সামনে ওয়াকা আর বসন্তনিবাস। ওরা দু'জনই বাঁশি বাজাচ্ছে। কখনও উঁচু লয়ে কখনও পেছন ফিরে আবার কখনও উপত্যকার দিকে মুখ তুলে। এবং সহসা যখন দেখতে পেল সে ঠিক ম্যাগুেলাদের বাড়ির নিচে দাঁড়িয়ে আছে, ওপরে ম্যাগুেলা হাত নাড়ছে তখনই পাশ থেকে কেউ ডাকছিল, মৈত্রদা জাহাজে চল।

গাড়ির পাশে মিছিলটা চলে এসেছে। আর এমন সময়ে ওয়াকা ছোটবাবুকে গাড়ির ভেতর দেখতে পেল। বসন্তনিবাসকে ছোটবাবু কিছু যেন বলছে। কি বলছে ওয়াকা বুঝতে পারছে না। ছোটবাবু এবং বসন্তনিবাস দাঁড়িয়ে কথা বলছে বলে লম্বা মিছিলটা থেমে আছে। যারা ড্রাম, ব্যাগপাইপ অথবা বিউগল বাজাচ্ছিল অথবা যারা ম্যাণ্ডোলিন বাজাচ্ছে তারা ব্যাপারটা বুঝতে পারছে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। আবার কখন বসন্তনিবাস ব্যাণ্ড-মাস্টারের মতো প্রায় ঘুরে ঘুরে কখনও উটের মতো মুখটি তুলে বাঁশি বাজাবে। তেমনি সবার মাথায় রং-বেরংয়ের পাতার মুকুট, গায়ে কেউ কেউ পাতার অলঙ্কার পরেছে। আর রং-বেরংয়ের গ্যাস-বেলুন মাথার ওপর উড়ছে।

বসন্তনিবাস বলল, ওয়াকা আমি যাচ্ছি।

ওয়াকা বলল, মানে! চলে গেলে এত বড় মিছিলটাকে লিড্ করবে কে?

বসন্তনিবাসের যেতে ইচ্ছে করছে না। কিন্তু কেন জানি ছোটবাবুর মুখের ওপর আর এখন কথা বলতে সে সাহস পায় না। দুষ্টু বালকের মতো সে এখন জাহাজে আছে। যেন অভিভাবকের মতো এই ছোটবাবু। সে ফাঁক পেলেই জাহাজ থেকে নেমে আসে। আর ছোটবাবু খুঁজে খুঁজে শেষ পর্যন্ত জাহাজে নিয়ে যায়। শক্ত চেহারা আর তার নেই। ছোট ছোট এই বালক-বালিকাদের সঙ্গে থেকে থেকে কেমন সরল সহজ হয়ে গেছে।

তখন ওয়াকা বলল, স্যার আমরা ওকে জাহাজে পৌঁছে দেব। আপনি ওর জন্য ভাববেন না।

ছোটবাবু বলল, জাহাজ কিন্তু ওয়াকা কাল ছেড়ে দেবে।

ওয়াকা বলল, জানি। তারপরই ওয়াকা আবার হাঁটতে থাকল। ছাড়া পেয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে মৈত্রদা বাঁশি বাজাচ্ছে। স্বরটা আশ্চর্য মেলডিতে ভরা। মৈত্রদা এ-ভাবে কবে বাঁশি বাজাতে যে শিখল! বুয়েনস আয়ার্সে মানুষটা সার্কাসে সিংহের খেলা দেখাতো, এখানে ব্যাণ্ড-মাস্টার। মৈত্রদার পক্ষে সবই বুঝি সম্ভব। অথবা অন্তরেই থাকে আশ্চর্য এক সুর, মাঝে মাঝে তা আপনি বেজে ওঠে!

মিছিলটা চলে যেতে থাকল আর পেছনে পেছনে গাড়ি ট্রাম বাস ছোটবাবুর গাড়ি ধীরে ধীরে এগুচ্ছে। বনি পাশে। এক সময় বনি বলল, এস না ছোটবাবু মিছিলের সঙ্গে হেঁটে চলি, বলে নেমে গেল গাড়ি থেকে। ছোটবাবুর হাত ধরে ঠিক এই শহরের বাসিন্দাদের মতো হেঁটে যেতে থাকল। এক সময় বনি বলল, বড়-টিণ্ডাল ভীষণ আমুদে লোক, না ছোটবাবু?

ছোটবাবু কি বলবে বুঝতে পারছে না। সে শুধু বলল, হবে হয়তো। এবং তারা এ-ভাবে যেতে যেতে এক সময় সুন্দর একটা গীর্জার সামনে থেমে গেল। বনি চিৎকার করে বলল, দ্যাখো দ্যাখো ছোটবাবু কত সাদা ফুল। ওরা দেখল গীর্জায় উঠে যাবার দু'ধারে বড় বড় গাছে সব সাদা ফুল। এবং বর-কনে উঠে যাচ্ছে। ওদের দু'হাতে অজস্র ফুলের গুচ্ছ। সিঁড়ি ধরে সবাই উঠে যাচ্ছে। ছোটবাবু আর বনি রেলিঙে দাঁড়িয়ে আছে। বনি সেই সব গাছের ভেতরে উঁকি দিয়ে আর মাথা তুলছে না। যেন হামাগুড়ি দিয়ে সেও উঠে যাবে। সিঁড়িতে কি দেখতে দেখতে বুকে ক্রস টানছে বনি। ছোটবাবু ক্রস টানছে না বুকে। বনির বোধহয় বুকে ভয়

গুড়গুড় করতে থাকে। সে নিজেই ছোটবাবুর বুকে ক্রস টেনে দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

ছোটবাবু বারবার ডেকেও কোনো সাড়া পেল না। বনি মাথা নুয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দূরে কোথাও ম্যাণ্ডোলিন বাজাচ্ছে কেউ। এবং মাইকে ঘোষণা হচ্ছিল আর ধর্মীয় সংগীত তখন গীর্জায়। জোনাকিরা সমস্ত গাছে গাছে ছড়িয়ে পড়ছে। ঘাসের ভেতর কুয়াশা, বিন্দু বিন্দু শিশিরপাতের শব্দে জেগে আছে। বনি বলল, ছোটবাবু জাহাজে ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে না। এস এখানে চুপচাপ বসে থাকি।

ছোটবাবু গীর্জার ঠিক সিঁড়ির নিচে ঘাসের ওপর বসে পড়ল। ওরও জাহাজে উঠে যেতে ইচ্ছে করছে না। গাছে গাছে সাদা ফুল। জোনাকিরা উড়ছে। নক্ষত্রেরা এবার আকাশে ভেসে বেড়াতে থাকবে। পাইনের বনে সমুদ্রের ঠাণ্ডা বাতাস সব এলোমেলো করে দিচ্ছিল। তখন ছোটবাবু বলল, মাকে তোমার কথা জানিয়ে যদি একটা চিঠি দিতে পারতাম বনি। যেন আরও বলার ইচ্ছে ছিল তবে আজ আর কোন দুঃখ থাকত না। সে কিছুই আর বলল না। ঘাসের ওপর দু'হাত ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল। ওর ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। ওর হাই উঠছিল।

ওদের জাহাজে ফিরতে বেশ রাত হয়ে গেল। বনি কখনও ওর পিঠে পিঠ দিয়ে কখনও ঘুরে ঘুরে ঠিক সবুজ লতাপাতার মতো শরীর তার এ ভাবে বড় হয়ে যাচ্ছিল। অথচ জাহাজে উঠে সে একেবারে জ্যাক। পুরুষের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে সে এখন সিঁড়ি ভাঙছে।

তারপর আবার সেই ড্যাং ড্যাং বাজনার মতো বাজনা। কেউ যেন মাস্তুলের ওপর দাঁড়িয়ে বিউগিল বাজাচ্ছে। জাহাজ বন্দর থেকে নেমে যাবার সময় এমনই মনে হয়। যেন সেই ক্রোজনেস্টে দাঁড়িয়ে আছে একজন মানুষ, গায়ে তার বিচিত্র পোশাক। দুরে সব পাইনের বনভূমি। আরও দূরে পাহাড়ের শীর্ষদেশ, বরফে রুপোলী কখনও সোনালী আবার কখনও আকাশের মতো গভীর নীল রঙ হয়ে যায়। অথবা সমুদ্রের তলদেশে যে সব ডলফিনের গায়ে থাকে বিচিত্র রঙ মনে হয় চারপাশে অথবা আকাশে তেমন রঙের ফোয়ারা। দেখতে দেখতে বড় বেশি তখন এই পৃথিবীকে ভালবাসতে ইচ্ছে হয়।

তখন জাহাজটা ডাঙার মায়া কাটিয়ে সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে। আর তখন কে বলবে হাজার হাজার বেলুন, এটা অবশ্য আজগুবি গল্পের মতো শোনাবে কারণ বন্দরে সকাল থেকেই একটা শিশুদের মেলা অথবা মিছিল বলা যেতে পারে এসে জড়ো হয়েছিল। সব ওয়াকার কাণ্ড। তাদের প্রিয় বসন্তনিবাস চলে যাচ্ছে। জাহাজ আবার কবে আসবে কেউ জানে না। জাহাজটা শেষ পর্যন্ত ডাঙায় ফিরে যাবে কিনা, জাহাজিরা দেশে ফিরতে পারবে কিনা যখন কেউ কিছু বলতে পারছিল না তখন এইসব ছোট ছোট ছেলেমেয়ে নানা রঙের বেলুন উড়িয়ে দিচ্ছে। মাথায় তাদের পাতার টুপি এবং ব্যাণ্ড বাজাচ্ছিল। ওয়াকা দৌড়ে দৌড়ে সবার সবকিছু ঠিক-ঠাক করে দিচ্ছে তখন। মৈত্রদা ওপরে উঠে সবাইকে হাত নাড়ছিল।

স্যালি হিগিনস্, বনি, রেডিও-অফিসার এবং যাদের ওয়াচ ছিল না অর্থাৎ যাদের কাজকর্ম জাহাজ সমুদ্রে নেমে গেলে আরম্ভ হবে কেবল তারাই দেখছিল। যারা নিচে নেমে গেছে, বয়লারে আগুন দিচ্ছে তারা দেখতে পাচ্ছে না। অথবা যাদের কাজ ছিল দড়িদড়া তুলে ফেলা, ডেরিক নামিয়ে রাখা, ফল্কায় কাঠ ফেলে ত্রিপলে ঢেকে দেওয়া, তারা কাজ করতে করতে দেখছে। জাহাজটা ছেড়ে দিলে বেলুনগুলো ঠিক জাহাজের ওপরে উড়ে আসছে এবং ওরা জাহাজ নিয়ে যত সমুদ্রে নেমে যাচ্ছে তত সেই সব শিশুর কোলাহল হাততালি অথবা 'গুড-বাই বসন্তনিবাস' ক্রমে স্তিমিত হয়ে আসছে। আর কি আশ্চর্য সেই সব বেলুন ক্রমে জাহাজ ছাড়িয়ে আরও গভীর সমুদ্রে উড়ে গেল। তীরের মানুষেরা তাজ্জব। এমন ঘটনা ওরা জীবনেও দেখে নি। একটা জাহাজ, সাদা রঙের জাহাজ, নীল সমুদ্রে কেমন জল কেটে ক্রমে দিগন্তের দিকে ভেসে যাচ্ছে। পাহাড়ের উপত্যকায় অথবা শীর্ষদেশে যে-সব ঘর বাড়ি আছে —সব ঘর-বাড়ির জানালা খোলা। ছেলে যুবা বুড়ো বুড়িরা দেখতে পেল একটা সাদা রঙের জাহাজ, জাহাজের ওপর আকাশের গায়ে সব বিন্দু বিন্দু জলকণার মতো ভেসে বেড়াচ্ছে অজস্র বেলুন এবং ক্রমে তা দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। প্রথমে জাহাজের মানুষ-জন তারপর

জাহাজ তারপর ডেরিক মাস্তুল এবং আরও পরে শুধু ক্রোজ-নেস্ট দেখা যাচ্ছে।

ক্রমে এভাবে স্বপ্নের ভেতর থেকে আসা জাহাজটা আবার স্বপ্নের দেশে চলে যাচ্ছে। ওয়াকা টুপু টিকি এবং ম্যাণ্ডেলা শেষ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে ছিল। যতক্ষণ চোখের ওপর জাহাজটা ছিল ততক্ষণ নিবিড়ভাবে দেখছে। এই জাহাজে বসন্তবিনাস চলে গেল। জাহাজ ভাঙা পুরানো, জাহাজটা ঠিক আর দশটা জাহাজের মতো তারা ভাবতে পারে না। যেন এ-জাহাজ চিরদিনের চিরনতুন। এবং এমন জাহাজেই আবার কোনোদিন হয়তো বসন্তনিবাস এ বন্দরে চলে আসবে। ওরা এমন ভাবতে ভাবতে ঘরে ফিরে গেল।

এখন আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না। একটু সময় পাওয়া যাচ্ছে। দুপুরের দিকে জাহাজ বন্দর ছেড়েছে। তীরের গাছপালা পাহাড় এখনও মেঘের মতো ঝুলে আছে। সমুদ্রে সামান্য পিচিং আছে বলে জাহাজ দুলছে। স্যালি হিগিনস রেলিঙে দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখছেন। জাহাজ সামোয়াতে যাচ্ছে। এ-বন্দরেও একজন নেমে গেল। বোধহয় ছোটবাবুর সেজন্য মন খারাপ। তাকে জাহাজ ছাড়ার সময় ওপরে দেখা যায় নি। তিনি দেখেছিলেন প্রথম থেকেই এরা তিনজন ছিল খুব কাছাকাছি। একই ফোকসালে ওরা থাকত। এখন তিনজন তিন রকমের। বড়-টিণ্ডলের মাথয় সামান্য গোলমাল। দেশে পাঠানো চলে। কিন্তু বড়- টিণ্ডাল কাজের সময় খুব দায়িত্বশীল আর এ ছাড়া এভাবে ক্রু নেমে গেল জাহাজ চলবে কি করে! এবং যা হয়ে থাকে, ক্রু নেমে গেলেই কিছু কাজকর্ম থেকে যায়। এজেণ্ট অফিসে খবর দেওয়া, স্থানীয় পুলিশ অফিসে খরব দেওয়া, এ-ছাড়া দায়িত্ব হিসেবে থেকে যায় ওর দেশবাড়িতে খবর পাঠানো। সকালটা নানা ঝামেলায় কেটেছে, রসদ দু'মাসের মতো নেওয়া হয়েছে। সকাল থেকে রসদ উঠছিল। বিফ, ভেড়ার মাংস, ডিম, মুরগী, লেটুস, টমেটো, বাঁধাকপি, ফুলকপি, চাল, ডাল, তেল, নুন, এবং নানা রকমের সস্ জেলি মাখন পাউরুটি এবং বরফ-ঘরে এখন সব বড় বড় আস্ত গরু ভেড়া মুরগী হুকে ঝুলছে। যেগুলো হালাল করা তাদের ভিন্ন নম্বর এবং আলাদা রাখা হয়েছে। জাহাজে অধিকাংশ মুসলমান ক্রু। তাদের জন্য এই সব আলাদাভাবে করা হয়ে থাকে। সব দিকে নজর তাঁর। এবং যদিও চীফ-মেটের কাজ এ-সব তবু তিনি নিজে ভাল করে বুঝে না নিতে পারলে স্বস্তি পান না।

এবং বন্দরের শেষ তিন-চারদিন তিনি ভীষণ উদ্বিগ্ন ছিলেন। কোন কারণে যেন কোথাও ত্রুটি থেকে না যায়। সফর যত লম্বা হবে তত জাহাজিরা অসহিষ্ণু হয়ে উঠবে। এবং অধিকাংশ সময় যা দেখা যায় খাবার-দাবার নিয়েই এই সব জাহাজিরা প্রথম ঘোঁট পাকাবার চেষ্টা করে। সেজন্য তিনি রসদ নেবার সময় বেশি বেশি সব নিয়েছেন। বরফ-ঘরের কুলিং মেশিন যাতে খারাপ না হয়ে যায়, এবং যে কোন কারণে খাবারে পোকা লেগে যেতে পারে—তিনি নিজে দাঁড়িয়ে থেকে সব দেখেশুনে নিশ্চিন্ত হয়েছেন এবং জাহাজের যতটা মেরামত দরকার সাধ্যমত যা করতে পেরেছেন করে নিয়েছেন। জাহাজের ধোয়া-মোছা হয়ে গেলে তিনি সব অফিসারদের নিয়ে হাল থেকে আরম্ভ করে, নোঙর ফেলার জিপসি ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিয়েছেন। কেবল এনজিন রুমের একটা জায়গা ভীষণ দুর্বল থেকে গেল। বয়লরের চক, বিশেষ করে মাঝখানের বয়লার চক সামান্য বসে গেছে মনে হচ্ছে, অবশ্য চোখে ঠিক ধরা যাচ্ছে না। তিনটে বয়লার একই লেভেলে থাকার কথা। মাঝখানের বয়লারটা যেন সামান্য নিচে বেশি ঝুঁকে আছে। অবশ্য সিউল-ব্যাংকের কোনো কিছুই এভাবে ভাল করে দেখলে ঠিকঠাক নেই। জাহাজ তবু যথানিয়মে চলছে। মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তায় মাথা ভার হয়ে গেলে তিনি এভাবেই ভেবে নিতে চান। এবং সব দুশ্চিন্তা মাথা থেকে সরিয়ে দিতে চান।

ক্রমে জাহাজ চারপাশে সমুদ্র নিয়ে জেগে থাকলে তিনি একটা ডেক-চেয়ারে বসে পড়লেন। জাহাজে এই একটু দিনের আলো আর তারপর অন্ধকার সমুদ্রে। এখন কি সময়, কি তিথি, কতটায় সমুদ্রে জোয়ার আসবে এবং কখন কোন জলের নিচে কোন পাহাড় অথবা উপত্যকা মিলে যাবে তিনি সব জানেন বলে বাইবেলের পাতা ওল্টাতে থাকলেন। সেই প্রাচীন নাবিক নোয়ার কথা মনে পড়ছে। একটা অতিকায় জাহাজে তিনি সব তুলে নিয়েছিলেন। এবং

এ তিন-চারদিন যা ধকল গেছে তাতে নিজেকে সেই প্রাচীন নাবিকের অনুসরণকারী ভাবতে ভাল লাগছিল। এমন কি তিনি পালিয়ে এ জাহাজে এক জোড়া পুরুষ-: মণীও রেখেছেন। মহাপ্লাবনে পৃথিবীর সব ডুবে গেলেও সিউল-ব্যাংক সমুদ্রে ভেসে থাকবে—কখনও কখনও সিউল ব্যাঙ্ককে এভাবে ভাবতে ভীষণ ভাল লাগে তাঁর। তখনই দেখলেন জ্যাক ও-পাশের সমুদ্রে দূরবীনে কি দেখছে। দেখতে দেখতে উত্তেজিত গলায় কাকে ডাকছে।

তিনি রেলিঙে ঝুঁকে ডাকলেন, জ্যাক। জ্যাক মাথার ওপরে ব্রীজের উইংসে দেখল বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে বাইবেল। জ্যাক কেমন অধীর গলায় বলল, বাবা দ্যাখো। দূরে দ্যাখো।

খালি চোখে তিনি সমুদ্রের দিগন্তে কিছু দেখতে পেলেন না। ঢেউ-এর সামান্য চড়াই-উৎরাই ভেঙে অনেক দূরে শুধু অনন্ত জলরাশি। তিনি বললেন, কিছু দেখা যাচ্ছে না।

সঙ্গে সঙ্গে জ্যাক দৌড়ে ওপরে উঠে গেল। বাবকে দূরবীনটা দিয়ে সোজা আবার নেমে গেল। সমুদ্রে সূর্যাস্তের সময় বলে জ্যাকের নীলাভ পোশাক ভারী উজ্জ্বল। খালি জাহাজ বলে সামান্য পিচিং- এ বেশ দুলছে। জ্যাক প্রায় টলতে টলতে এক সময় নেমে গেল এবং অদৃশ্য হয়ে গেল। এবং সে যখন ফিরে এল স্যালি হিগিনিস্ দেখলেন, ছোটবাবুকে টানতে টানতে নিয়ে আসছে।

স্যালি হিগিনস্ মেয়ের এমন কাণ্ড যেন দেখতে পান নি, অথবা হয়তো মনে কখনও অভিমান, যে কোনো অত্যাশ্চর্য ঘটনা এখন কোনো যুবকের জন্য, বনি তার আর কেউ নয়, ক্রমে মেয়েটা দূরে সরে যাচ্ছে, তিনি দেখেও না দেখার ভান করে দূরবীনে মগ্ন হয়ে থাকলেন। এবং তখনই দেখলেন, অনন্ত জলরাশি ভেঙে সে আসছে। সেই পাখিটা।

স্যালি হিগিনস্ এবার দূরবীনটা জ্যাকের হাতে ফিরিয়ে দিলেন। চশমাটা ঠিকঠাক করে নেমে গেলেন নিচে। ওপরে ওরা দু'জন সমুদ্রে একটা পাখি খুঁজছে।

তখন ছোটবাবু বলল, লেডী-অ্যালবাট্রস আবার আসছে। ও ভেবেছে আমরা ওর পুরুষ-পাখিটাকে বন্দী করে রেখেছি।

জ্যাক বলল, পাখিটার কথা ভুলেই গেছিলাম। আমাদের কথা কিন্তু পাখিটা মনে রেখেছে।

আর্চিও দেখল আবার সেই পাখিটা জাহাজের পেছনে আসছে। তার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। আসলে পাখিটাকে দেখে, না বোট-ডেকে ছোটবাবু এবং জ্যাককে কাছাকাছি দেখে বোঝা গেল না। সে চিৎকার করতে করতে ছুটছে, দ্যাট ভেরি আলি বার্ডস ফ্লাইং এগেন্। সে যেন জাহাজের সব নাবিকদের সতর্ক করে দিচ্ছে—ডেনজার এহেড্। তোমরা বাছারা সবাই সাবধান হয়ে যাও। কাপ্তানের পোষা শয়তানটা আবার উড়ে আসছে। এবারে কি ঘটবে কেউ বলতে পারবে না।

॥ ছত্রিশ ॥

আর্চি-র ঘুম আসছিল না। সে আজ এক ফোঁটা মদ পর্যন্ত খায় নি। সে মদ খেতে পারত, মদ খেলে এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়তে পারত। সকালে ঘুম ভাঙলে সে আবার সব ভুলে যেতে পারত। ঘুম ভাঙলে রাতের সব জ্বালা কেমন মরে যায়।

নেশা করলে সে নিজেকে ঠিক রাখতে পারে না। এবং তার মনে হয় মাঝে মাঝে নেশা না করে থাকলে সে ঠিক ঠিক যা ভেবে থাকে করে ফেলতে পারবে। সেজন্য জেগে থাকা। ঘড়িতে বারোটা বাজছে। একটা বাজছে। সে উঠে বসল। জাহাজের পিচিং বাড়ছে। নেশা না করে ভালই করেছে।

সে দরজা খুলে বের হয়ে পড়ল। টলে টলে হাঁটছে। পিচিং থাকলে জাহাজে ঠিকমতো হাঁটা যায় না। সমুদ্রে ঝড় ওঠার আশঙ্কা। বিকেলের দিকে রেডিও-অফিসার বলেছে, ঝড় উঠতে পারে।

গঙ্গাবাজুর গ্যাং-ওয়েতে সে নেমে গেল। রেলিঙে সে দাঁড়িয়ে থাকল। আকাশ অন্ধকার, সমুদ্রে কোনো প্রতিবিম্ব ভাসছে না। এবং চারপাশে এত বেশি অন্ধকার যে পাখিটা কোথায় কি ভাবে আছে সে বুঝতে পারছে না।

এ-জাহাজে একজন যুবতী এখন শুয়ে আছে। ঠিক যুবতী না, যুবতী হবার মুখে, ডাঁশা আপেলের মতো। আর্চির ঘুম আসছিল না। ওর চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে—ডেনজার এহেড্। পাখিটা অন্ধকারে উড়ছে না। কোথাও সে লুকিয়ে রয়েছে। যুবতী শুয়ে আছে, ওর হাত-পা গমের শীষের মতো পুষ্ট। আর্চি আর স্থির থাকতে পারছে না।

মনে হল কেউ আসছে। ওয়াচের লোক-টোক হবে। সে টুপ করে সিঁড়ির নিচে বসে পড়ল। এ সময় এভাবে চোরের মত ঘুরে বেড়ানো ঠিক না। দেখে ফেললে জাহাজিরা বলবে, আর্চি রাতে জাহাজে ঘুরে বেড়ায়! অহেতুক ঘুরে বেড়ানো ঠিক না। ভুতুড়ে জাহাজটা আরও তবে ভুতুড়ে হয়ে যাবে।

সিঁড়ি ধরে কোয়ার্টার মাস্টার নেমে গেল। হাতে মগ তার। চা করার জন্য চিফ-কুকের গ্যালিতে যাচ্ছে। সে এবার সামান্য পা চালিয়ে হাঁটল। তারপর ঠিক সোজা এলি-ওয়েতে ঢুকে গেল। বাঁ পাশের কেবিনগুলোর দরজা বন্ধ। লাল কার্পেটে ওর ছায়া দুলছে। সমুদ্রে পিচিং বাড়ছে। সামান্য ঝড় ঝঞ্ঝা সমুদ্রে সবসময় প্রায় থাকে। তার ওপর জাহাজ খালি। সমুদ্রে একটু বাতাস উঠলেই জাহাজের ভীষণ টাল-মাটাল অবস্থা। আর্চি দ্রুত এলি-ওয়ে পার হয়ে গেল। এবং ঠিক ছোটবাবুর দরজায় সে দাঁড়িয়ে গেল। চোখে-মুখে সংশয়। ভেতরে কেউ কথা বলছে না তো!

এটা আজকাল কি যে হয়েছে আর্চির। সংশয়, সে বুঝতে পারছে—ছোটবাবুর সঙ্গে জ্যাকের একটা হীন সম্পর্ক গড়ে উঠছে। এবং সে আর আজকাল এসব মনে হলে একেবারে স্থির থাকতে পারে না। প্রতিদিন ঈর্ষায় সে মদ খেয়ে বুঁদ হয়ে থাকে—আগের মতো ঝাল মেটাতে পারে না, কখনও কখনও সে আরও কি সব ভেবে পাগলের মতো কাজকর্ম করে ফেলতে চায়—কিন্তু সে জানে মাতাল মানুষেরা কিছু একটা শেষ পর্যন্ত করতে পারে না। সে এখন থেকে ভেবেছে মাতাল হবে না। এবং সে ঘুরে বেড়াচ্ছে যদি রাতে ছোটবাবুর কেবিনে জ্যাক নেমে আসে অথবা ছোটবাবু জ্যাকের কেবিনে উঠে যায়। সে একটা সুযোগের অপেক্ষায় আছে।

সে দরজায় কান পেতে দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর সে দু'বার আস্তে টোকা মারল দরজায়। যদি কথা থাকে জ্যাক আসবে, টোকা মারবে, তবে রাসকেলটা ঠিক উঠে এসে দরজা খুলে দেবে। আর্চি আবার খুব ধীরে ধীরে দু'বার টোকা মারল। না, রাসকেলটা ভীষণ সেয়ানা। কিছুতেই ধরা পড়বে না অথবা হয়তো আজ কথা নেই কারো নামার। সে সন্তর্পণে হেঁটে

যাচ্ছিল। কেউ টের পেলে সে খুব অস্বস্তির ভেতর পড়ে যাবে। দশটা ওজুহাত দাঁড় করাতে হবে সে কেন অসময়ে এভাবে জাহাজের অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আর্চি এবার দু-লাফে সিঁড়ি ভেঙে উঠে গেল। আর ঠিক ডানদিকে জ্যাকের কেবিন। পাশে ব্রীজে উঠে যাবার সিঁড়ি। সিঁড়ির মুখে কাপ্তানের ঘর। সে ওপরে উঠেই ডানদিকের উইণ্ড সেলের পাশে দাঁড়িয়ে গেল। ব্রীজ থেকে ওকে এখন কেউ দেখতে পাবে না। অথচ সে দেখতে পাচ্ছে ব্রীজে ডেবিড দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকার সমুদ্রে ঝুঁকে আছে ডেভিড। কাপ্তানের পোর্ট- হোলে অন্ধকার। বোধহয় শয়তানটা এখন আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে। আর্চি আজ যেন প্রথম টের পেল ওপরে কাপ্তান এবং নিচে রাসকেলটা, মাঝখানে জ্যাক, কড়া পাহারা। বাতাসে গন্ধ শুঁকে শয়তানটা টের পেয়েছে কিছু। ঠিক সিঁড়ির গোড়ায় একটা দৈত্যকে পাহারায় রেখেছে। ওর চোয়াল সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে গেল।

ধূর্ত বেড়ালের মতো আর্চির চোখ-মুখ জ্বলছে। সে ঘুরে বোটের দিকটায় হেঁটে গেল। এবং যেখানে সে দাঁড়িয়ে দেখেছিল জ্যাক হাত তুলে পা তুলে ব্যালেরিনার মতো নাচছে, ঠিক সেখানটায় দাঁড়িয়ে গেল। পোর্ট-হোল বন্ধ। পর্দা ঝুলছে। সে কিছু দেখতে পেল না আজ। তবু সে ভীষণ লোভে পড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। সে নড়ল না। দেয়াল ফুঁড়ে তার এখন ভেতরে ঢুকে যেতে ইচ্ছে করছে অথবা নৃশংস ঘটনা ঘটে যায়, যদি সে কিছু একটা করে ফেলে নিজের জন্য এবং লালসা বলা যেতে পারে—হাতে পায়ে কী যে শীতল অস্থিরতা তার, যেন সারা শীরর কেবল জ্বলে যাচ্ছে, খাঁ খাঁ করছে। এবং সে এতই কামুক যে তার রক্ত-মাংসে অথবা অস্থিমজ্জায় কেবল সেই নরম মাংসের প্রলোভন। ক্ষুধার্ত বাঘের মতো সে হন্যে হয়ে ঘুরছে। ঘুরতে ঘুরতে নরম হরিণের মাংস দেখেছে সামনে ঝুলে আছে। চারপাশে কাঁটাতারের মতো বেড়া। ভয়ে সে আর এগুতে পারছে না।

অসহ্য রাগে এবং ঈর্ষায় আর্চি এখন ফুঁসছে।

তখনই দু'টো একটা বজ্রপাতের শব্দ। আকাশটা গুম গুম করছে। ফালা ফালা করে দিচ্ছে কেউ আকাশ। অথবা মনে হয় হিংস্র থাবা উঁচিয়ে আছে কেউ। সারা আকাশময় বিদ্যুতের আলো সূর্যের মতো প্রখর। চারপাশের অন্ধকার, মুহূর্তে সরে যাচ্ছে। আবার অন্ধকার এবং সাঁ সাঁ করে বাতাস, ঠিক বাতাস বললে ভুল হবে, প্রায় ঝড়ের সামিল, সাদা ফেনা সমুদ্রে এবং তরঙ্গ-সংকুল জলরাশির ভেতর আর্চি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছিল।

জাহাজটা জল কেটে যাচ্ছে। লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে ঝড়ের সমুদ্র।

সহসা ঝড়টা মধ্যরাতে কেমন চাঙ্গা হয়ে উঠল। রেডিও-অফিসার হয়তো ট্রান্সমিটার-রুমে। আলোর ভেতর নানারকম না, ঘুরিয়ে ঝড়ের খবর দিচ্ছে। যদি ঝড় আরও বাড়ে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় ঝড়ের খবর পাঠাতে হবে। এবং ঝড় যে তেমন প্রবল নয় এক পশলা বৃষ্টিপাতের ভেতর সেটা সে টের পেয়ে জ্যাকের দরজার দিকে হেঁটে যেতে থাকল।

আর তখনই সেই শয়তান পাখিটা যা 'সে ভেবেছিল ঠিক লুকেনারের প্রেতাত্মা হবে, অদৃশ্য সেই প্রেতাত্মা একটা পাখির মতো মাথার ওপরে উড়ে যেতে থাকল। ঝড়ে পড়ে পাখিটা আনন্দে এমন করছে, না, সে সবাইকে জাগিয়ে দিতে চায়, আর্চি বুঝতে পারল না। পাখিটা সহসা আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

সে একটু সরে এসে পাখিটাকে খুঁজল। অন্ধকার। গভীর অন্ধকারে সে বুঝতে পারল না পাখিটা কোন দিকে উড়ে গেল। আবার কখন উড়ে আসবে মাথার ওপর সেটাও সে ঠিক জানে না। এবং কেন জানি মনে হল শুধু রাসকেলটাকেই কাপ্তান পাহারাদার রাখেনি, এই পাখিটাকেও সে পাহারাদার রেখেছে। জ্যাকের দরজায় হেঁটে গেলেই লুকেনারের প্রেতাত্মা ওর মাথার ওপর উড়ে এসে একটা পাখি হয়ে ভাসতে থাকবে। এবং কিছু করলেই চোখ খুবলে তুলে নেবে।

ঝড়-বৃষ্টিতে দু-একজন নাবিক তখন ভিজে ভিজে এনজিন-রুমে নেমে যাচ্ছে। কর্কশ

শব্দ বজ্রপাতের। সাঁ সাঁ বাতাসে সমুদ্র কেমন উত্তাল, এবং মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকালে নীলাভ আলোতে আকাশ পৃথিবী আর সমুদ্র কেমন অতিশয় অলৌকিক। পাখিটা মাথার ওপর ভীষণ কর্কশ গলায় ডাকছে। সে ভয়ে কিছুতেই দরজার সামনে এগিয়ে যেতে পারল না। পাখিটার চোখ ভীষণ জ্বলছে। আর একটু এগুলেই অন্ধকার সমুদ্র থেকে পাখিটা সহসা উড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়বে। অতর্কিতে ওর দু'চোখ খুবলে তুলে নেবে। আর এক পা এগুতে সাহস পেল না। সে নিচে ফের নেমে গেল। এবং দরজা বন্ধ করে আয়নায় দাঁড়ালে বুঝতে পারল চোখে মুখে তীব্র ঘৃণা। সে হেরে যাচ্ছে। সে কিছুতেই কিছু করে উঠতে পারছে না। আসলে ঝড়ে পড়ে পাখিটা জাহাজের চারপাশে ঘুরছে সে সেটা কিছুতেই ভাবতে পারছে না।

এবং এভাবে ভয় পেলে যা হয়ে থাকে, সে ভেবে ফেলল, কাল সে আর ভয় পাবে না। কাল, অথবা যে কোনো দিন যদি সে ঘুমোতে না পারে, এবং ওপরে উঠে যায়, এভাবে ভয় পেয়ে নিচে চলে আসবে না। ঘড়ি দেখে বুঝতে পারল সকাল হতে বেশি দেরি নেই। এখন ফের ওপরেও আর উঠে যাওয়া ঠিক হবে না। তাকে আরও বেশি সাহসী এবং চতুর হতে হবে। সে এবার শুয়ে পড়ল।

সকালের দিকে ছোটবাবু ঘুম থেকে উঠে বিস্মিত। রাতে বেশ ঝড় বৃষ্টি হয়েছে সমুদ্রে। এখন একেবারে সমুদ্র শান্ত এবং নিরিবিলি। এত নিরিবিলি যে মনেই হয় না রাতে ঝড় হয়েছে। আসলে সে স্বপ্ন দেখেছে কিনা বুঝতে পারছে না। রাতে দরজায় কেউ ওকে ডেকেছিল যেন, মৃদু আঘাত দরজায়, যদি বনি হয়ে থাকে, সে হাত-মুখ ধুয়ে ওপরে গেল। এবং বনির দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকল, জ্যাক, কাল রাতে আমাকে তুমি ডেকেছিলে?

জ্যাক দরজা খুলে বলল, না তো।

--কাল রাতে ঝড় বৃষ্টি হয়েছে?

—না তো!

—কিন্তু দুপুররাতে মনে হল জাহাজটা ভীষণ দুলছে!

জ্যাক বলল, কি জানি, আমি তো কিছু টের পাইনি!

—তুমি মেয়ে রাতে কিছু টের পাও না?

মেয়ে বলতেই জ্যাক কেমন লজ্জা পেল। বলল, যাঃ, তুমি যে কি না। কেউ শুনতে পেলে।

—কেউ শুনতে পাবে না। একটু থেমে বলল, আমার কিন্তু ভাল ঘুম হয় না। তুমি যে কি করে এত ঘুমোও!

—কেন, কি হয়েছে। বলেই জ্যাক বাইরে এসে দাঁড়াল। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে ছোটবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল। এবং সত্যি মনে হল ছোটবাবু রাতে ভাল যেন ঘুমোতে পারে না। ওর কেমন দুশ্চিন্তা হল। ছোটবাবুকে নিয়ে এমনিতেই জাহাজে দুশ্চিন্তার শেষ নেই। বাবাকে সে নানাভাবে বুঝিয়েছে, ছোটবাবুর ওপর আর্চির ভীষণ রাগ। এখন আর আর্চি তাকে ঘাঁটাতে সাহস পায় না। তবু কখনও কখনও মনে হয় আর্চি ছোটবাবুকে কিছু একটা করে ফেলতে পারে। তখন ভয়ে ওর বুক কাঁপে

ছোটবাবু ফানেলের ওদিকটায় হাঁটতে হাঁটতে চলে যাচ্ছে। কিছু বলছে না। সমুদ্র থেকে ঠাণ্ডা বাতাস উঠে আসছে। রোদ এখন জাহাজের সর্বত্র তেরচা হয়ে পড়ছে। এবং জাহাজ দুলছে, দুলবেই, কারণ খালি জাহাজে কখনও দুলোনি না থেকে পারে না, সমুদ্র যতই শান্ত হোক। ছোটবাবু রেলিঙে ঝুঁকে বলল, আমার রাতে কী যে আজকাল হয়!

—কী হয়? জ্যাক আরও বেশি ঝুঁকে দাঁড়াল। এবং ঝুঁকে ছোটবাবুর মুখ দেখতে চাইল'।

–মাঝে মাঝে মনে হয় তুমি আমাকে ডাকছ। দরজায় কড়া নেড়ে বলছ, ছোটবাবু আমি বনি, দরজ খোল।

জ্যাক বলল, ছোটবাবু, আমিও ঠিক এমন শুনতে পাই। আমারও কেমন মনে হয়, কেউ আমাকে ডাকছে, যেন দরজায় দাঁড়িয়ে বলছে, আমি ছোটবাবু, দরজা খোল বনি।

ছোটবাবু বলল, কেন এমন হয় বুঝতে পারছি না।

—হ্যাঁ ছোটবাবু, আমিও বুঝতে পারছি না। দুপুররাতে দু-একবার দরজা খুলে দেখেছি, না কেউ নেই। কখনও জ্যোৎস্নায় চুপচাপ কেমন হেঁটে গেছি। যদি কোথাও তুমি লুকিয়ে থাক। আমার মনে হয়েছিল, তুমি লুকিয়ে আছ কোথাও। ঠিক কোথাও লুকিয়ে আছ। প্রথমে ট্যাংকের ওপাশে উঁকি দিলাম, নেই। চারপাশে খুঁজে দেখেছি, নেই। তখন মনে হল কেউ আসছে। বোধহয় এনজির-রুমের কেউ। ওপরে জল নিতে এসেছিল ফিরে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে নেমে গেলাম। তারপর ছুটে ওপরে উঠে গেলাম। ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই কি ভয়! কেউ যদি দেখে ফেলত—কি যে হত না!

এই সাতসকালে বনি এ-সব বলছে। বনির সঙ্গে সে প্রতিদিন বিকেলে, কখনও কখনও রাতে আজকাল চুপচাপ বোট-ডেকে বসে থাকে। বনি কত রকমের গল্প করতে ভালোবাসে। যেন বনি তাকে নানাভাবে এক মনোরম জগতে নিয়ে যেতে চায়। বনিকে দেখলেই ভরা নদীর কথা মনে হয়। তীরের গাছপালা ফেলে যেন এক দুরন্ত নদী প্রবহমান—সেই বনি কখনও এ-সব বলেনি, অথচ সাতসকালে এ-সব কথা! সে বলল, তুমি তো আগে কিছু বলনি!

—তুমি ভয় পাবে বলে বলিনি।

—যদি রাতে তখন তোমাকে কেউ মেয়ের পোশাকে দেখে ফেলত!

জ্যাক এবার একটু একটু সোজা হয়ে দাঁড়াল। জ্যাক সাদা বয়লার স্যুট পরেছে। হিপ-পকেটে চিপিং করার হাতুড়ি। হাতে চামড়ার দস্তানা। পায়ে সাদা কেড্‌স্ এবং বয়লার-স্যুটে কোথাও কোথাও লাল নীল রঙের দাগ। চুল বড় হয়ে ঘাড় পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। ওকে অনায়াসে মেয়েদের মতো চুল রাখছে বলে ঠাট্টা করা যেতে পারে, এবং মুখে ডিমের মতো মসৃণতা আর এত বেশি লাবণ্য যে ছোটবাবুর এই সাতসকালে বনিকে চুমো খেতে ইচ্ছে হল। সে বনিকে একদিন চুমো খাবে ভেবেছিল, এবং মনের ভেতরে এমন সব কত রকমের ইচ্ছে যেমন কখনও কখনও সে ভেবে থাকে বনিকে নিয়ে নিরিবিলি একটা সাদা চাদরের নিচে শুয়ে থাকবে, কখনও ইচ্ছে হয় বনির শরীরের উষ্ণতা তাকে ভীষণ আরাম দেবে। কোনো পাইনের ছায়ায় সে আর বনি, বনির হাত ওর হাতে, এবং কপালে চুমো খেলে কোন নষ্ট হয়ে যাবার কথা মনে থাকে না।

বনি ভেবেছিল, ছোটবাবু আরও কিছু বলবে। কিন্তু একেবারে চুপচাপ। কেবল কি যে ভাবছে। ওর দিকে একবার চোখ তুলে তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। এমন কি ছোটবাবুর যে কাজে যাবার সময় হয়ে যাচ্ছে, ওর কেবিনে এতক্ষণে চা এসে গেছে এবং পোশাক পাল্টে বালতিটা নিয়ে উইনচের নিচে পড়ে থাকতে হবে—সে সবও যেন মনে করতে পারছে না। তখন বনি বলল, কেউ আমাকে দেখেনি ছোটবাবু। তুমি অযথা ভাববে না।

—এটা তোমার ঠিক না বনি।

—কী ঠিক না!

—এই যে হুট করে বের হয়ে যাওয়া।

—আমার জন্য তুমি ভাবো ছোটবাবু?

—না, ভাবি না।

বনি বলল, তবে আর কি! যখন ভাবো না… বনি চলে যাচ্ছিল।

ছোটবাবু বলল, এই, ভাল হচ্ছে না।

বনি বলল, আমি যাচ্ছি।

ছোটবাবু বলল, চল নিচে।

—নিচে নামব না। তোমার তো সাহস দেখছি খুব বেড়ে গেছে।

ছোটবাবু বলল, কেন জানি তোমাকে নিয়ে ভয় হয় বনি।

—আমার কিছু হবে না।

—রাতে হুট-হাঁট বের হবে না।

—আরে আমার বের হতে বয়ে গেছে।

—তবে বের হও কেন বলতো!

—তুমি ডাকলে বের হব না?

—আমি ডাকলেও বের হবে না।

—এসব বলছ কেন!

—কি জানি! কে যে আমাদের ডাকে! গলার স্বর অবিকল নকল করে ডাকে। দরজা খুলে দেখেছি, কেউ নেই। আজ রাতে দরজায় কেউ ঠিক টোকা মেরেছে, দরজায় কেউ টোকা মেরেছে আমি স্পষ্ট শুনতে পেয়েছি বনি।

তারপর ছোটবাবুর বলার ইচ্ছে হল, আসলে বনি আমি তোমার জন্য জেগে থাকি। ভাল ঘুম হয় না। কেবল মনে হয় তুমি ঠিক আর স্থির থাকতে পারবে না। নেমে আসবে। জাহাজে সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়বে তখন তুমি খুব সন্তর্পণে নেমে আসবে কেবিনে। শরীরে তোমার আশ্চর্য বাতিঘর, আমি টের পাচ্ছি বাতিঘরে তুমি আলো জ্বেলে রেখেছ। ঠিক ঠিক তুমি অথবা আমি কখনও এক জায়গায় পৌঁছে যাব।

দরজার কাছে এসে বনি বলল, আমার যে কী হয় মাঝে মাঝে, তুমি বিশ্বাস কর ছোটবাবু সবাই ঘুমিয়ে পড়লে মনে হয় তুমি ঠিক চলে আসবে। তুমি যেমন পছন্দ কর, এই যেমন লতাপাতা অথবা গোলাপ ফুলের রঙ নিয়ে সুন্দর দামী ফ্রক পরে বসে থাকি। আমি আর কিছু পারি না ছোটবাবু। তারপর ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে কেবল স্বপ্ন দেখি, তুমি চলে আসছ। কখনও নদীর পাড়ে হেঁটে হেঁটে কখনও ফসলের খেত মাড়িয়ে অথবা মনে হয় তুমি তুষারপাতের সময় শীতে মরে যাচ্ছ। আমি তোমাকে নিয়ে কোনো গরম বিছানায় শুইয়ে দিচ্ছি। নিজে শুয়ে পড়েছি তোমার পাশে। আরও যে কি সব করে ফেলি না! আমার ভারি লজ্জা করছে বলতে।

বনি কথা বললে কি যে আশ্চর্য সুন্দর কথা বলতে পারে! আর একনাগাড়ে এত কথা বোধহয় বনির এই প্রথম। এবং ছোটবাবু দেখল বনির মুখ লজ্জায় লাল হয়ে গেছে। চোখে মুখে অতীব ইচ্ছের এক খেলা। চুলে এখন বনির মুখ ঢাকা। কিছুটা দেখা যাচ্ছে কিছুটা দেখা যাচ্ছে না। ওর কত কাজ নিচে কিন্তু কি যে হয় ছোটবাবুর, বনিকে ফেলে ওর আর কোথাও যেতে ইচ্ছে করে না! কেবল বনির চারপাশে ঘুরে বেড়াতে ইচ্ছে হয়। এবং রাতে যখন বনি দরজা বন্ধ করে ঘুমিয়ে থাকে তখন ইচ্ছে হয় সেই সুন্দর কেবিনের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে। কিছুতেই তার নিচে নামতে ইচ্ছে হয় না। এতগুলো ইচ্ছের কথা সে বনিকে এখন বলতে পারত কিন্তু সে কিছুই বলল না। সে নেমে গেল। বনি দেখল ছোটবাবু চুপচাপ ধীরে ধীরে নিচে নেমে যাচ্ছে। এবং একসময় ওর আর কিছুই দেখা গেল না। বনি দরজা বন্ধ করে বসে থাকল। সে আজ কোনো কাজ করবে না ভাবল। ছোটবাবু কোথায় কাজ করবে সে জানে। যদি সময় এবং সুযোগ পাওয়া যায় সে ছোটবাবুর পাশে বসে এটা ওটা এগিয়ে দেবে ভাবল।

এবং সবাই দেখল উইনচে ছোটবাবু কাজ করছে। পাশে ঝুঁকে রয়েছে বনি। বনির হাতে নানা সাইজের স্প্যানার। ছোটবাবু যেটা যখন চাইছে বনি এগিয়ে দিচ্ছে। অথবা বনি কোনটা কি সাইজের স্প্যানার বুঝতে না পারলে ছোটবাবু বের হয়ে আসছে উইনচের নিচ থেকে। একটা একটা করে স্প্যানার হাতে নিয়ে এক একটা স্প্যানারের সাইজ এবং তার নাম মুখস্থ করাচ্ছে।

স্যালি হিগিনস ব্রীজ থেকে সব দেখতে পাচ্ছিলেন। মেয়ের ওপর জোর করার সাহস

কেমন তার কমে গেছে। অথবা তিনি হয়তো চান বনি সুখে থাকুক। বনি খুশী থাকুক। বনি যা পছন্দ করে তিনি তাতে বাধা দিতে দুঃখ পান। মেয়েটার জীবনে দুর্ভোগ এত বেশি যে সামান্য সুখ থেকে তাকে আর বঞ্চিত করতে ইচ্ছে হয় না। যদিও জানেন চিফ-মেট এটা পছন্দ করছে না। ছোটবাবুর যতই সাধুসন্তের মতো চেহারা হোক—ওর মায়াবী চোখ এবং শরীরের দৃঢ়তা যতই সবাইকে অবাক করে দিক, ছোটবাবু বছর শেষ হতে না হতেই প্রাচীন নাবিকের মতো অভিজ্ঞ হয়ে উঠবে।

আর তখনই জাহাজে এলার্মিং বেল বেজে উঠল। ট্রান্সমিটার রুমে কোনো জরুরী খবর। রেডিও- অফিসার ছুটে যাচ্ছে। এবং ফের তাকে দেখা গেল, খুব চিন্তিত মুখে সে ফিরে আসছে। প্রায় ছুটে এসে কাপ্তানের সামনে দাঁড়িয়ে গেল। কথা বলতে পারছে না ঠিকমতো। কেবল হাঁপাচ্ছে। কোনোরকমে ঢোক গিলে সে বলার চেষ্টা করল—সামথিং রং স্যার। ট্রান্সমিটারে অদ্ভুত সব খবর আসছে।

স্যালি হিগিনস সহসা চিৎকার করে উঠলেন—হোয়াটস্ রং ম্যান

চিফ্-মেট, ডেবিড এবং থার্ড-মেট পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। সাধারণত কাপ্তান এত সহজে উত্তেজিত হন না। বরং সবকিছু দেখেশুনে কথা বলার স্বভাব তাঁর। অবশ্য মাঝে মাঝে যে মাথা গরম না করেন' এমন নয় কিন্তু কোনো বিপদে তিনি এমনভাবে কখনও উত্তেজিত হয়ে পড়েন না।

রেডিও-অফিসার বলল, এস-ও-এস আসছে।

—এস-ও-এস। বলেই দু'লাফে উঠে গেলেন তিনি। ওর সঙ্গে অন্য সবাই ওপরে উঠে গেল। ওরা হাঁটু গেড়ে বসে এমন কিছুই বুঝতে পারল না যে এটা একটা এস-ও-এস! আর আশ্চর্য রেডিও- অফিসারও এমন কিছু বুঝতে পারছে না, সে বার বার এটা ওটা ঘোরাচ্ছে এবং কর্কশ শব্দ ভেতরে। কানে তালা লেগে যাচ্ছে—কিছু মানুষের হৈ চৈ শব্দ, যেন কোথাও আগুন লেগেছে। ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের ভেতর জাহাজ ডুবে গেলে যা হয় কখনও যেন কেউ হাত তুলে বাঁচাও বাঁচাও বলছে। ছুটোছুটি দাপাদাপি তেলের পিপে ফাটার শব্দ। হুড়মুড় করে কিছু পড়ে গেল। রেডিও অফিসার ঘামছে আর বলছে, শুনতে পাচ্ছেন স্যার! শুনতে পাচ্ছেন না! ঐ তো শুনুন আবার আর্ত চিৎকার—কাছাকাছি কোথাও জাহাজডুবি হচ্ছে মনে হচ্ছে।

অথচ জাহাজডুবি কোথায় হচ্ছে ওরা কেউ বুঝতে পারছে না। চিফ-মেট দূরবীনে দেখছে চারপাশটা। কাপ্তান নিজেও দেখলেন দিগন্তে কোথাও কিছু ভেসে নেই। রোদে এখন যেন সমুদ্র পুড়ে যাচ্ছে অথবা ইস্পাতের মতো রং সমুদ্রের। কোথাও কোনো জাহাজ দেখা যাচ্ছে না। এমনকি দিগন্তে ধোঁয়া উঠছে না। র‍্যাডারে কিছু আসছে না। ওরা কি করবে কিছুই বুঝতে পারছিল না।

কাপ্তান বললেন, এরিয়া-স্টেশন থেকে তো কোনো খবর আসছে না।

—তাই তো? কাপ্তানের কথায় সবাই কেমন একটা সূত্র পেয়ে গেল।

তিনি এবার বললেন, জলদি এরিয়া-স্টেশনকে ধরো। বলো, আমরা এমন একটা খবর পাচ্ছি যেন কোথাও সমুদ্রে কোনো জাহাজে আগুন লেগেছে। জাহাজ ডুবছে। ওরা রেসক্যু চাইছে। কিন্তু র‍্যাডারে কিছু আসছে না। চারপাশে কোথাও কিছু দেখা যাচ্ছে না।

তখন জ্যাক সহসা চোখ তুললেই দেখতে পেল ব্রীজে অফিসারদের ভিড়। সবাই সেখানে জড়ো হয়েছে। কাঁচের ভেতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে—মাংকি আয়ল্যাণ্ডে বার বার বাবা উঠে যাচ্ছেন আবার নেমে আসছেন। কখনও দূরবীনে কি দেখছেন। সে দেখতে পেল তখন লেডি-অ্যালবাট্রস মাথার ওপর উড়ছে। এবং বারোটার লাঞ্চে ওর কাজ লেডি-অ্যালবাট্রসকে খাওয়ানো। কাজটা সে ছোটবাবুর কথামতো করছে। এবং যেন এ-জাহাজে কিছুদিনের ভেতর সে ছোটবাবুর অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়ে যাবে। যেমন এখন ছোটবাবু তাকে খুব খাটাচ্ছে। একদণ্ড বিশ্রাম দিচ্ছে না। নানারকমের সব পার্টস খুলছে লাগাচ্ছে। ওর কাজ সব তেলের

ভেতর ভিজিয়ে রাখা, শিরীষ দিয়ে ঘসে ঘসে জং তুলে ফেলা। কখনও কখনও ধমকও খাচ্ছে। অর্থাৎ কখনও ভুল করে ফেললে ছোটবাবু দাঁত শক্ত করে, এই মেমের বাচ্চা বলেই হেসে ফেলছে।

তাছাড়া ছোটবাবু যতক্ষণ কাজের ভেতর থাকে খুব সিরিয়াস। বনি একবার ভুলে নাইনথ্ সিকস্টিন স্প্যানার হাতের কাছে দিতে পারেনি—আর কি ধমক! ইচ্ছে হয়েছিল সব মুখে ছুঁড়ে ফেলে চলে যাবে। কিন্তু সে কিছুতেই আর ছুঁড়ে দিতে পারে না। সে চলে গেলে জানে সবই ছোটবাবুর এক হাতে করতে হবে। বার বার উইনচের নিচ থেকে ওকে উঠে আসতে হবে, বারবার ধোয়ামোছা করতে হবে। এবং সবার ছুটি হয়ে গেলেও দেখা যাবে ছোটবাবুর ছুটি হয়নি। সে এসব ভেবে প্রায় যতটা সম্ভব রাগ সামলে কাজ করে যাচ্ছিল। কথা বলছিল না। ছোটবাবু বুঝতে পেরে বলেছিল, এই জ্যাক কথা বলছ না কেন!

জ্যাক জবাব দিচ্ছে না। গুম মেরে বসে আছে। ঠিক পায়ের নিচে। এবং নুয়ে তেলের টবটার ভেতর কি খুঁজছে। নাট-বোল্ট-বিয়ারিং সে সব ঘসে সাফ করছে। ছোটবাবু যে ডাকছে একেবারে শুনতে পাচ্ছে না।

ছোটবাবু এবার নিচে থেকে উঠে এল। উইনচের ড্রামে ভর দিয়ে বলল, রাগ করেছ মেয়ে জ্যাক চুল কপাল থেকে সরিয়ে চোখ তুলে তাকাল। তেলকালি মুখে এবং বিচিত্র রঙে বহুরূপী সেজে উইনচের নিচ থেকে ছোটবাবু উঠে এসেছে। সে হেসে ফেলল। বলল, না রাগ করিনি।

—তবে কথা বলছ না কেন?

—ভাল লাগছে না ছোটবাবু। আমার আর ভাল লাগছে না এভাবে থাকতে। আমি আর পারছি না। তারপর কেমন মাথা নিচু করে রাখল বনি। যেন শত চেষ্টাতেও আর ছোটবাবু বনির কোনো সাড়া পাবে না।

ছোটবাবু আরও নুয়ে প্রায় কানের কাছে ফিসফিস করে বলল, এই!

বনি তেমনি বসে থাকল। তেলের টবে সে যেন কিছু খুঁজছে। এবং সে আর কথা বলবে না স্থির করে নিয়েছে যেন। কথা বললেই ধরা পড়ে যাবে, ছোটবাবুকে নিয়ে সে কি করতে চায় ছোটবাবু বুঝে ফেলবে। বুঝে ফেললেই সে ছোটবাবুর কাছে খুব খাটো হয়ে যাবে।

ছোটবাবুর ইচ্ছে হচ্ছে দু'হাতে ওর নরম রেশমের মতো সব চুল এলোমেলো করে দিতে। হাতে তেলকালি, সে কিছু করতে পারছে না। দু-একজন ডেক-জাহাজি যেতে যেতে দেখতে পাচ্ছে কাপ্তানের ছেলেটা ছোটবাবুর পায়ের কাছে বসে রয়েছে। নিবিষ্ট মনে কাজ করছে। ছেলেটার মাথার কাছে ঝুঁকে আছে ছোটবাবু। এনজিন-সারেঙ একদম পছন্দ করেন না জ্যাককে। ছোটবাবুর এত কাছে জ্যাককে বসে থাকতে দেখে মুখ গোমড়া করে চলে যাচ্ছিলেন। তখনই ছোটবাবু ডাকল, চাচা।

সারেঙ বলল, আমার কাজ আছে ছেলে। এনজিন-রুমে যাচ্ছি।

ছোটবাবু সব টের পায়। সে বলল, চাচা জ্যাক আপনাকে ডাকছে। ছোটবাবু জানে জ্যাকের কথা বললে তিনি কাছে না এসে পারবেন না।

এনজিন-সারেঙ ভীষণ বিরক্ত। কি করবেন বুঝতে পারছেন না। কিন্তু কাপ্তানের ছেলে ডেকেছে তিনি চলেও যেতে পারেন না। কাছে গিয়ে বললেন, জী আমাকে.....

বনি বলল, আমি তোমাকে ডাকিনি সারেঙ। ছোটবাবু মিথ্যা কথা বলেছে।

জ্যাকের চোখ-মুখ দেখে কেন জানি তিনি তাকে আর খুব খারাপ ভাবতে পারলেন না। ছোটবাবুর মুখে সামান্য হাসি। সে যেন বলতে পারলে খুশী হত, জ্যাক আসলে ছেলে নয় চাচা, সে মেয়ে। সে আমাকে ভীষণ ভালবাসে। পুরুষের পোশাকে সে আর থাকতে পারছে না। এবং সঙ্গে সঙ্গে মনের ভেতর জ্যাকের কষ্টটা ভীষণ তোলপাড় করতে থাকলে বলতে

ইচ্ছে হল, জাহাজে যদি একজন মেয়ে থেকেই যায় তবে কি অপরাধ বলুন তো!

এনজিন-সারেঙ দেখল ছোটবাবু ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কিছু বলছে ন। সারেঙ বললেন, কিছু বলবি?

ছোটবাবু বলল, না।

—দেশে ফেরার জন্য মন খারাপ?

ছোটবাবু কি বলবে বুঝতে পারল না। দেশে ফেরার কথা আছে অথবা জাহাজে চিরদিন কেউ থাকে না এমন কথা সে যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। সে কতদিন যেন তার লিটল প্রিন্সেসকে মনে করতে পারেনি। সেই তাজা মণিমুক্তা আবিস্কারের পর এ জাহাজটাই মনে হয়েছে তার সব। জাহাজ ছেড়ে গেলে সে মরে যাবে। সে বলল, কবে যে আমরা ফিরব! বলতে হয় কিছু তাই বলা। আসলে সে যেন বলতে চাইল, একটা নূতন দেশের খবর পেয়ে গেছি চাচা। এখন কে আমার বেশি কাছের বুঝতে পারছি না।

এনজিন-সারেঙ বললেন, দেখতে দেখতে তোর এখন সময় কেটে যাবে। জাহাজে প্রথম সাত আট মাস খুব কষ্টের। যেন ফুরাতে চায় না। তারপর দেখবি সব সহজ হয়ে গেছে। একদিন দেশেও ঠিক ফিরে যাবি ছেলে।

সারেঙ-সাব এসব বলে যখন চলে গেলেন ছোটবাবুর মন খারাপ হয়ে গেল। সত্যি তো সে চিরদিন জাহাজে থাকছে না। বনির সঙ্গে সে আর একটা কথা বলতে পারল না। সে খুবই মিইয়ে গেল। সারেঙ-সাব যেন তাকে মনে করিয়ে দিয়ে গেলেন—তুমি ছেলে বেশি জড়িয়ে পড়বে না। সারেঙ-সাব কি সব বুঝতে পারেন! তিনি কি প্রথম থেকেই জানেন জ্যাক আসলে ছেলে নয় সে মেয়ে। কাপ্তানের নির্দেশমতো জ্যাক সম্পর্কে সব মিথ্যে প্রচার চালিয়ে গেছেন।

তখন বনি বলল, ছোটবাবু তুমি আজ আমার কেবিনে আসবে?

—কখন?

—রাতে। বাবা যখন ঘুমিয়ে পড়বে। ডেবিডের যখন ওয়াচ থাকবে।

ছোটবাবু কি ভাবল। সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলতে পারল না।

বনি ফের বলল, কোন ভয় নেই। আমি আর তোমাকে ক্লাউন বানাতে চাইব না। তুমি তো সব নিজের চোখেই দেখেছ?

—না না, আমি মানে বুঝতে পারলে ঠিক তা ভাবছি না।

—তবে কি ভাবছ?

—কেউ যদি টের পায়!

—পাক্। তুমি আসবে। কথা দাও।

—গিয়ে কি করব? বোকার মতো ছোটবাবু কী সব বলে ফেলে।

—গিয়ে আবার কি করবে! কেউ তো কিছু করতে বলেনি!

বনি হাসবে কি কাঁদবে বুঝতে পারল না। তবু ধীরে ধীরে বলল, কিছু করবে না। তোমার সামনে সুন্দর ফ্রক পরে আমি বসে থাকব ছোটবাবু। আর কিছু চাই না। এটা আমার স্বপ্ন বলতে পার। রোজ সেজেগুজে বসে থাকি মনে হয় কেবল তুমি আসবে। তারপর কখন ঘুমিয়ে পড়ি টের পাই না। সকাল হয়ে গেলে মনটা খুব খারাপ হয়ে যায়।

ছোটবাবু বলল, যাব।

আর তখনই রেডিও-অফিসার কানে ইয়ার-ফোন লাগিয়ে হেঁকে যাচ্ছে, হ্যালো হ্যালো এরিয়াস্টেশন জিরো টু টু থ্রি....হ্যালো সিউল-ব্যাংক বলছি। মুখ ক্রমশ হতাশায় সাদা হয়ে যাচ্ছে। পাশে স্যালি হিগিনস্ চুপচাপ বসে রয়েছেন—যত মুখটা রেডিও-অফিসারের সাদা

হয়ে যাচ্ছে তত ভেতরে ভেতরে অসহায় বোধ করছেন। অথচ একটা কথা বলছেন না। আশ্চর্য নির্বিকার তিনি।

সহসা চিৎকার করে উঠল রেডিও-অফিসার—হ্যালো সিউল-ব্যাংক বলছি। বাউণ্ড ফর সামোয়া এবং সে আরও জোরে দ্রাঘিমা অক্ষাংশের বিবরণ দিতে দিতে হাত পা- শিথিল করে ফেলল। বলল, নো রেসপনস্ স্যার। কোথাও কেউ রেসপনস্ করছে না।

চিফ-মেটের মুখ থেকে ফ্যাস করে কথাটা বেরিয়ে গেল, স্ট্রেঞ্জ!

স্যালি হিগিনিস তখন ধীরে ধীরে নেমে আসছিলেন। তেমনি নির্বিকার। চোখ মুখ দেখে মনে হচ্ছে ঠিক আর দশটা দিনের মতোই জাহাজ চালিয়ে নিচ্ছেন। কোথাও কোনো গণ্ডগোল নেই। কাপ্তানের এমন নির্লিপ্ত মুখ দেখে ওরা আরও ভেতরে ভেতরে ক্ষেপে যাচ্ছিল অথবা যা হয়ে থাকে অসহায় মানুষগুলো এখন কি করবে বুঝতে পারছে না। কেবল পিঁপ্ পিঁপ্ শব্দ ট্রান্সমিটারে। আশ্চর্য, এরিয়া- স্টেশনকে কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না। অবাক, সকালেও রেডিও অফিসার টি.আর. পাঠিয়েছে। অর্থাৎ জাহাজের নাম কোম্পানির নাম কত জি. আর. টি. কত এন. আর. টি. এবং কোন কোস্টে জাহাজ যাচ্ছে, স্পীড এবং নেকসট পোর্ট অব কল্ কি সব জানিয়েছে। অথচ দু'ঘণ্টা বাদে ফের এরিয়া-স্টেশনকে কিছুতেই ধরতে পারছে না। নানাভাবে চেষ্টা করেও পারছে না। এবং কি যে হয়ে গেছে! ওরা কি ভুল করে অন্য সমুদ্রে চলে এসেছে। কম্পাস কি ঠিক রিডিং দিচ্ছে না। কতসব আজগুবি ভাবনা যে মাথায় এসে জড়ো হচ্ছে। ওরা তখন দেখল, স্যালি হিগিনস চার্টরুমের দরজা খুলে ভেতরে অদৃশ্য হয়ে গেছেন।

চিফ-মেটের সামনে রেডিও-অফিসার প্রায় বলে ফেলেছিল বাস্টার্ড! কোনোরকমে নিজেকে সামলে নিয়েছে। এমন একটা সময়ে জাহাজের সর্বময় যিনি তাঁর চোখেমুখে এতটুকু উৎকণ্ঠা নেই। তিনি নিচে নেমে গেলেন! কিছু বললেন না!

কিউ. টি. জি. বার বার চেয়েও সে যখন বিফল তখনও দেখছে রিসিভারে সেই হাহাকার শব্দ। চারপাশে আগুন লাগলে জাহাজিরা যেভাবে আত্মরক্ষা করে থাকে অথবা চিৎকার চেঁচামেচি এবং বাঁচাও বাঁচাও বলে থাকে তারপর প্রচণ্ড দাবদাহের মতো বিস্ফোরণের শব্দ, যেন কোনও জাহাজের প্রচণ্ড বিস্ফোরণে একটা দিক উড়ে গেছে—তেমনি সব শব্দ পেয়ে ওরা সবাই ঘামতে থাকল। রেডিও- অফিসার মাংকি-আয়ল্যাণ্ড থেকে এখন ছুটে নামতে পারলে যেন বাঁচে।

স্যালি হিগিনস তখন বেশ আরাম করে পাইপে আগুন ধরাচ্ছেন। পোর্ট-হোল খুলে দেখছেন দুপুরের রোদে সমুদ্র ইস্পাতের চাদর গায়ে জড়িয়ে শুয়ে আছে দিগন্তে। চোখ ঝলসে যাচ্ছে। তিনি কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছেন না কেন এমন হচ্ছে! চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। ওপরে যারা আছে তারা এক্ষুনি হয়তো নেমে আসবে। পরামর্শ চাইবে, স্যার আমরা এখন কি করব? এখন কি করতে হবে তিনি নিজেও ঠিক কিছু জানেন না।

ওরা যখন এল, তিনি শুধু বললেন, আমাদের সামনে জাহাজ চালিয়ে নেওয়া ছাড়া কোনো উপায় নেই।

ওরা চলে যাচ্ছিল। তিনি ওদের ফের ডাকলেন। রেডিও-অফিসারকে বললেন, তুমি চেষ্টা করে যাও। চিফ-মেট এবং ডেবিডকে বললেন, এসব আজেবাজে ব্যাপার যত কম জানাজানি হয় ততই ভাল।

ডেবিডের বুঝতে অসুবিধা হল না এটা তাকেই উদ্দেশ্য করে বলা—কাপ্তান তাকে সর্তক করে দিলেন। এমনকি জ্যাক ছোটবাবু কেউ জানবে না। ওকে এখন খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। ছোটবাবুর সঙ্গে যত দেখা না হয় দেখা হলেই কি যে হয়ে যায়—গোপন কিছু থাকে না। এমন একটা অতিশয় খবর সে জানে সবার আগে সে তা ছোটবাবুকে জানাতে পারবে না ভাবলে কেমন যেন লাগে। সে সারাটা দিন ছোটবাবুর কাছ থেকে পালিয়ে বেড়াল।

দেখা হলেই এমন অতিশয় খবরটি ঠিক সে ছোটবাবুকে ফাঁস করে দেবে। এটা তার ভারি খারাপ স্বভাব। কাপ্তান ওর চোখমুখ দেখে ঠিক ধরে ফেলেছেন। এসব ভেবে নিজের ওপরই সে এবার ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। ছোটবাবু তার কে! তার কাছে সব বলতে না পারলে সে কেন এমন মনমরা হয়ে থাকবে। সে ফের আত্মবিশ্বাসী হয়ে উঠল মুহূর্তে এবং নিজের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এত বেশি সচেতন যে, কিছুতেই কিছু বলবে না। অথচ ঠিক ছোটবাবুর সঙ্গে সে হাজার রকমের কথা বলে যাবে ভেবে ছোটবাবুর কেবিনে ঢুকে বলল, হ্যাল্লো ছোটবাবু, তুমি কেমন আছ?

ছোটবাবু অবাক। ডেবিড যেন দূর দেশ থেকে ফিরে এসেছে। যেন কতদিন দেখা হয় নি। ডেবিড খুবই গম্ভীর এবং পাইপ টানছে ডেবিড। কিছুটা চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলছে।

ছোটবাবু বলল, ডেবিড তোমার শরীর বোধ হয় ভাল নেই। কারো ওপর তুমি ভীষণ রেগে গেছ।

—কেন? কেন? আমি কারো ওপর রেগে যাব কেন?

—আমার কিন্তু তাই মনে হচ্ছে।

—ও নো নো।

ছোটবাবু বলল, কফি খাবে না চা?

—তুমি যা বলবে।

ছোটবাবু হেসে ফেলল। বলল, আচ্ছা। বলে বেল টিপে বয়কে ডাকল। বয় এলে এক কাপ কফি দিতে বলল।

ডেবিড বলল, তুমি!

—আমার এখন খেতে ইচ্ছে করছে না। তুমি খাও।

ডেবিড বলল, কেন কি হয়েছে তোমার। মন ভাল নেই?

—না, মন বেশ ভাল আছে। তারপর সামোয়াতে নেমে কি প্রোগ্রাম?

—সামোয়া! তুমি পাগল ছোটবাবু। আমরা সামোয়াতে যাব! তার আগেই দেখো জাহাজের কি হয়! প্রোগ্রাম! ক্ষিপ্ত হয়ে গেল বলতে বলতে। তারপর সহসা চোখ বুজে নিজেকে কিছুটা সামলে বলল, আমার যে কি হয় মাঝে মাঝে ছোটবাবু বুঝি না। সামোয়াতে নেমে যাব, ফূর্তি করব, মদ খাব। সুন্দরী মেয়ে যদি পেয়ে যাই ওঃ মাই গড আমার এখন ওপরে কত কাজ! এখানে আমি বসে আছি! বলেই ডেবিড দু'লাফে উঠে গেলে ছোটবাবু বাইরে এসে দাঁড়াল। কফি এখন ব্রীজে পাঠিয়ে দিতে হবে। সে ওপরে উঠে ডেবিডকে কিছু বলতে গিয়ে দেখল ব্রীজে চারজন অফিসার অনবরত দূরবীনে কি দেখে যাচ্ছে। সব জাহাজিরা যে যার ফোকসাল থেকে বের হয়ে এসেছে। আবার কি সেই সব বিষাক্ত পাখিরা জাহাজ আক্রমণ করতে চলে আসছে। ছোটবাবু তাড়াতাড়ি নিচে নেমে গেল। দরজা বন্ধ করে দিল। জ্যাকের কেবিনে এসে ডাকল জ্যাক, তুমি ভেতরে আছো? জ্যাক তুমি কোথায়? এখন কেন জানি মনে হচ্ছে সবার আগে জ্যাক কোথায় আছে দেখা। সে খুঁজে বেড়াতে লাগল জ্যাককে, জ্যাককে দেখা হলেই বলতে হবে, কোথায় ঘুরছ! সামনে আমাদের কত বিপদ তুমি জান না! কেবিন থেকে কোথাও নড়বে না।

তখন জ্যাক ওপাশের আড়াল থেকে মুখ বার করে ডাকল, ছোটবাবু আমি এখানে। আর সঙ্গে সঙ্গে ছোটবাবুর মুখে হাসি ফুটে উঠল। জ্যাক কাছে থাকলে তার আর কোনো আতঙ্ক থাকে না। সে জ্যাকের পাশে দাঁড়িয়ে গেল। সমুদ্রে তখন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। কোয়ার্টার-মাস্টার জাহাজের পতাকা মাস্তুল থেকে নামিয়ে ফেলছে। তারপর মাস্তুলের মাথায় আলো জ্বালিয়ে ফিরে যাচ্ছে ফোকসালে। চারপাশটা ক্রমে ধূসর হয়ে উঠছে, ক্রমশ সূর্য সমুদ্রের নিচে ডুবে গেলে এক লালবর্ণের কুসুম কুসুম উষ্ণতা চারপাশে এবং সেই উষ্ণতা মরে গেলে নীলবর্ণের

সমুদ্রে কেমন ক্রমে ধূসর হতে হতে শূন্যতায় ডুবে যায়।

জ্যাক আর ছোটবাবু শূন্যতার ভেতর এক সময় কেমন মিশে গেল। ওদের আর দেখা গেল না।

॥ সাইত্রিশ ॥

এই জাহাজ যেন নিরবধিকাল এভাবেই চলবে। এর চলার শেষ নেই। স্যালি হিগিনস নিজের কেবিনে জেগে আছেন। বেতার সংকেতের জন্য রেডিও-অফিসার সেই যে বসে রয়েছে ওপরে, আর নামছে না। কোনো নতুন খবর বেতারে ভেসে এলেই কথা আছে তাকে জানানো হবে। তিনি পোর্ট- হোল খোলা রেখেছেন। বেশ গরম পড়েছে। তবু সমুদ্র বলে তেমন গরম মনে হচ্ছে না।। পোর্ট- হোল খোলা রেখে বসে থাকতে ভালই লাগে। জ্যোৎস্না রাত হলে তো কথাই নেই। অন্ধকার রাতেও তার বেশ ভাল লাগে। আকাশের গায়ে দু'টো একটা নক্ষত্র ক্রমে সরে যায়। এই বয়সেও কখনও মনে হয় সবকিছুই তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। ঘুমিয়ে পড়লেই সব শেষ হয়ে গেল। তিনি কি ভেবে চিফ-মেটকে ডেকে পাঠালেন। তার সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

চিফ-মেট এলে বললেন, বোস।

চিফ-মেট জেগেই ছিল। বিপদের সময় জাহাজে ওদের জেগেই থাকতে হয়। বার বার চেষ্টা করেও এরিয়া-স্টেশনকে শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল না! কাছাকাছি অন্য সব স্টেশনেও খবর পাঠানো হয়েছে—কোথাও থেকে কোন জবাব আসছে না। যেন জাহাজটার সব সংযোগ নষ্ট হয়ে গেছে। পৃথিবীর সবকিছু থেকে জাহাজটা ক্রমে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ছে। এখন জ্যাক নিচে কি করছে, কে জানে। হয়তো জ্যাক শুয়ে আছে। জ্যাক ঘুমোচ্ছে। পোর্ট-হোল সে খোলা রাখে না। দরজা বন্ধ থাকে। পাখা চালিয়েছে, না ভুলে গেছে। ওর তো স্বভাব দিন দিন ভারি মিষ্টি হয়ে যাচ্ছে। আগের মতো জ্যাক দুষ্টুমী করে না। কারো পেছনে লাগে না। জাহাজটা বিপদে পড়ে গেলে জ্যাককে কিভাবে যে রক্ষা করবেন এবং যা মনে হয় এ-সব সময়ে, একমাত্র সেই ঈশ্বর, করুণাময় ঈশ্বরের কথা বেশী করে মনে হতে থাকলে তিনি বললেন, চিফ-মেট তোমার কি মনে হয়?

চিফ-মেট বলল, স্যার কি বলব, ঠিক বুঝতে পারছি না। আমার জীবনে তো এমন দেখি নি।

স্যালি হিগিনসও এমন বলতে চাইলেন, আমিও চিফ-মেট এ ধরনের ঘটনার সম্মুখীন হই নি। যদিও মনে হচ্ছে আমরা ঠিকই যাচ্ছি। এবং চার্টের ওপর পেন্সিলে দাগ কেটে বললেন, জাহাজ এখন এখানে আছে। যদি বড় রকমের ঝড়ে পড়ে না যাই নেক্সট ফ্রাইডেতে বন্দর পেয়ে যাব।

চিফ-মেট বলল, সেই যেন হয় স্যার!

স্যালি হিগিনস মুখ দেখে বুঝতে পারলেন চিফ-মেট ভীষণ আতঙ্কে ভুগছে। এ-সব সময়ে সবারই বাড়ি ঘরের কথা মনে হবার কথা। তিনি 'চিফ-মেটের স্ত্রী এবং ছেলেপিলেদের কথা পাড়লেন। এবং বললেন, তোমরা নিশ্চিত থাকতে পার আমরা ঠিক ঠিকই যাচ্ছি। ট্রানসমিটারে কোথাও কোনো গণ্ডগোল হয়েছে। আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।

কেবিনে খুব কম-পাওয়ারের আলো জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে। খুব স্বাভাবিক দেখাচ্ছে না কাউকে। স্যালি হিগিনস দু' গ্লাসে সামান্য মদ ঢেলে নিলেন। বললেন, খাও।

চিফ-মেট প্রায় সবটাই খেয়ে ফেলল একসঙ্গে।

স্যালি হিগিনস বললেন, ডেবিড কি করছে?

—জানি না স্যার।

—চল সব ঘুরে ঘুরে দেখা যাক। ভাল কথা, ডেক-জাহাজি কাউকে পেছনে ডিউটি দিয়ে দাও। এখন চারপাশে লক্ষ্য রাখা দরকার।

চিফ-মেট বলতে পারত, ফরোয়ার্ড পিকে যখন ওয়াচ রয়েছে তখন আফটার-পিকে গিয়ে কি হবে? কিন্তু সে জানে তিনি না বুঝে কিছু বলেন না। সে বলল, এক্ষুনি খবর পাঠাচ্ছি তবে।

এবং ডেক- সারেঙ এলে বলল, পিছিলে ওয়াচ রাখবে। লক্ষ্য রাখবে দূরে কিছু দেখা যাচ্ছে কিনা।

এবং স্যালি হিগিনস, চিফ-মেট আর ডেবিডকে নিয়ে বের হয়ে পড়লেন। জাহাজের আলোগুলো যেন তেমন জোর নয়। চারপাশে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। কেবল গোটা জাহাজটা অন্ধকারে প্রবল বেগে ধেয়ে চলছে। নিচে বাংকার। কোল-বয় কেউ হবে জোরে জোরে নিচে কয়লা ফেলছে। মেডিসিন- কার টেনে নিয়ে যাচ্ছে আসছে তার শব্দ। ব্রীজে তখন কাঁচের ভেতর পায়চারি করছে থার্ড-মেট। কম্পাসের সামনে হুইল ধরে আছে মহসীন। তিনি প্রায় সবাইকে অভয় দিতে যেন বের হয়েছেন। নেভী ব্লু স্যুট এবং উজ্জ্বল সোনালী বোতাম, কালো স্যু পায়ে কাঁধে চার-চারটা স্ট্রাইপ। ব্যাণ্ড বাজলে মনে হতো তিনি এখন কোনো যুদ্ধজাহাজ চালিয়ে নিচ্ছেন। সামনে শত্রুপক্ষের জাহাজ।

জাহাজে যেহেতু মাত্র চার-পাঁচজন জানে, একটা কোথাও কিছু গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে জাহাজে এবং মনে হয় সেই হেতু অন্য সবাই খুব স্বাভাবিক। অন্তত স্যালি হিগিনস বয়লার-রুমে নেমে এটা বিশেষভাবে টের পেলেন।

ছোট-টিণ্ডালের ওয়াচ। সে উইণ্ড-সেলের নিচে বসে স্টিম-গেজের কাঁটা দেখছিল। অসময়ে কাপ্তানকে দেখে সে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিল। জোরে কয়লা মারতে বলল সবাইকে। কাপ্তানকে বলল, গুড-নাইট স্যার।

কাপ্তান ওর কথা বেশ দূর থেকে শুনেছেন, এবং বেশ সহজভাবে তাকিয়েই বললেন, গুড-নাইট। তিনি এই যে বয়লার-রুমে নেমে এসেছেন এবং এবার এনজিন-রুমে ঢুকে যাবেন, হয়তো দেখবেন, চার-নম্বর ঝুঁকে আছে টেবিলে, কারণ সে তো জানে না, জাহাজে এখন নানাভাবে সব দুর্ঘটনার খবর আসছে এবং সামনে কোথায় কি আছে সমুদ্রে কেউ বলতে পারছে না। অর্থাৎ যখন বার বার বেতার- সংকেত পাঠিয়েও কিছু জানা যাচ্ছে না তখন হয়তো অলৌকিক কিছু ব্যাপার সমুদ্রে ঘটে যাচ্ছে। অলৌকিক না বলে ভৌতিক বলাই ভাল। অথবা লুকেনার, সেই প্রাচীন নাবিকের অদৃশ্য আত্মার ছলনা হতে পারে, জাহাজে দীর্ঘদিন কাজ করলে এ-সব বিশ্বাস করতে ভাল লাগে। এবং যখন কোনো হদিস নেই কিছুর সব সংযোগ বিচ্ছিন্ন তখন আর কি ভাবা যায়! কলকব্জা সব ঠিক অথচ ভৌতিক সব কোলাহল, কি যে ব্যাপার—এবং অসময়ে নামা বোধ হয় ঠিক হল না। কারণ তিনি অসময়ে নেমে এসেছেন বলে সবাই কেমন সংশয়ের দৃষ্টিতে ওঁকে দেখছে। তিনি খুব স্বাভাবিক গলায় চার-নম্বরের সঙ্গে কথা বললেন। চার-নম্বর খুব সহজে ব্যাপারটাকে মেনে নিতে পারল না—কেউ ঠিক ঠিক কাজ না করলে কাপ্তান সেকেণ্ড এনজিনিয়ারকে ডেকে পাঠাতে পারতেন, জাহাজে এটাই নিয়ম অথচ অসময়ে চিফ-মেট, ডেবিড এবং স্বয়ং কাপ্তান নিজে। সে পেছন থেকে ডেবিডের হাত ধরে ফেলল। কাপ্তান এবং চিফ-মেট তখন লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙছেন। সময় বুঝে চার নম্বর বলল, কি ব্যাপার! হঠাৎ কর্তা নিচে নেমে এলেন!

ডেবিড হয়তো বলেই ফেলত, আমরা ক্রমে এক রহস্যের ভেতর ঢুকে যাচ্ছি। কিন্তু সামলে নিল নিজেকে। বলল, সব কর্তার মরজি। ঘুম আসছে না—বুড়ো মানুষ, ঘুম এমনিতেই কম, কি খেয়াল হল, বলল, জাহাজটা ঘুরে দেখব চল! ঘুরছি।

ডেবিড আর বেশী কথা বলল না। কি বলতে শেষে কি বলে ফেলবে! সে তাড়াতাড়ি সিঁড়িতে উঠে গেল। অনেক পেছনে পড়ে গেছে। এত পেছনে পড়ে গেলে কর্তার গোঁসা হতে পারে। সে সিঁড়ি ভেঙে দ্রুত ওপরে উঠে গেল। এবং হাত নেড়ে বাই বাই করল চার-নম্বরকে। ভালো থাকো, কোথায় যচ্ছো জনো না, না জানাই ভাল। কিছু হলে হঠাৎ কিছুর সম্মুখীন হবে, আমাদের মতো সেই সকাল থেকে দগ্ধাবে না। বেশ আছো, ভালো আছো।

ওপরে উঠে দেখল, সিউল-ব্যাংক অন্ধকারের ভেতর আলোর মালা পরে যেন দাঁড়িয়ে আছে। চারপাশে সীমাহীন জলরাশি, টেরই পাওয়া যাচ্ছে না। জাহাজটা চলছে না থেমে আছে বোঝা যাচ্ছে না।

ডেবিডের বুকটা ছাঁত করে উঠল। চোখের ওপর এটা কি দেখছে! জাহাজটা আর সে-জাহাজ নেই। ভাঙা এবং বুড়ো জাহাজ, অথচ সেজে আছে যুবতীর মতো। কিছুতেই পুরানো হতে চাইছে না। জাহাজের সব আলো কেউ আজ জ্বালিয়ে দিল। কোথাও কোনো অন্ধকার নেই। ডেকে যেন উৎসব হবে, না হলে সব আলো, যেমন করিডোর ধরে গেলে যত অলোর ডুম, সব জ্বালা হয় না কখনও অথচ এখন জ্বলছে। যেমন উইংসের দু-পাশে যেমন ডেরিকের গোড়ায় এবং গ্যালির দু- পাশে ক্রু-গ্যালির ছাদের নিচে অর্থাৎ সর্বত্র এমনভাবে সব আলো জাহাজে জ্বলছে, অথচ ওরা যখন এনজিন-রুমে নেমে যাচ্ছিল তখন জাহাজের সব আলো এভাবে জ্বালা ছিল না। জ্বালা থাকলে সে এতটা বিভ্রান্তির ভেতর পড়ে যেত না। কেবল মনে হচ্ছে, স্যালি হিগিনস সমস্ত জাহাজটা ঘুরে দেখবেন বলে সহসা কেউ সব আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। সামান্য অন্ধকারের ভেতর জাহাজে নিশীথে হাঁটতে গা ভারি ছম ছম করে।

আর তা ছাড়া এখন তো তারা আর কোনও কথা বলতে পারছিল না। ক্রু-গ্যালির দিকে যখন হিগিনস হেঁটে যাচ্ছিলেন তখন ডেবিড জাহাজের পাশে দাঁড়িয়ে একটু অন্ধকারে উঁকি মারবে ভেবেছিল। উঁকি দিয়ে দেখবে, সমুদ্রের জল কেটে জাহাজ সত্যি এগুচ্ছে না ভুতুড়ে দরিয়ায় জাহাজটা থেমে আছে। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি ওরা হেঁটে যাচ্ছে এত বেশী দ্রুত ওরা ডেক পার হয়ে গেল যে ডেবিড একা ডেকের ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে সাহস পেল না। সে প্রায় দৌড়ে ওদের নাগালে চলে গেলে। জাহাজটা এভাবে এত কিম্ভূতকিমাকার এবং আকাশে নক্ষত্রেরা এত স্থির যে ডেকে একা দাঁড়িয়ে থাকলে ভয়ে এমনিতেই মরে যাবে। সাদা ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। যেন কেউ ওর শরীর থেকে সব রক্ত শুষে নিয়ে ডেকে ফেলে রেখে গেছে মনে হবে। এবং এমন যে জাহাজে কখনও না হয়েছে তা নয়।

সে প্রায় দৌড়ে ক্রু-গ্যালির ছাদের নিচে চলে গেল। আগে আগে স্যালি হিগিনস, চিফ-মেট। কি যে কেবল দেখে বেড়াচ্ছে! ডেক-সারেঙ খবর পেয়ে নিচে থেকে উঠে এসেছে এবং সালাম জানাচ্ছে। স্যালি হিগিনস কিছুই লক্ষ্য করছেন না। তিনি ঝুঁকে এখন সুমদ্রে কি দেখছেন। ডেবিড সঙ্গে সঙ্গে সময় বুঝে রেলিঙে ঝুঁকে পড়ল। দেখল প্রপেলার ভীষণভাবে গজাচ্ছে। জাহাজ খালি বলে নীল জলে প্রপেলার অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। কুয়াশার মতো মনে হয়। প্রপেলার ঠিক ঠিক ঘুরে যাচ্ছে। জাহাজ থেমে নেই। ওর কিছুটা এখন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতো।

সে আবার ঠিক সহজভাবে হেঁটে যেতে থাকল। বরং হাঁটা-চালায় সে নিজেকে বেশী সাহসী প্রমাণ করার জন্য কিছুক্ষণ একা ডেকে দাঁড়িয়ে পাইপ টানল। যেন পৃথিবীতে সাহসী মানুষের মতো বেঁচে থাকা দরকার। আর দুরে তখন লেডী-অ্যালবাট্রস উড়ছে। কখনও জাহাজের মাস্তুলে এসে পাখা ঝাপটাচ্ছে, কখনও ওর কর্কশ চিৎকার ভেসে আসছে বাতাসে। অন্ধকারে মনে হবে কেউ গলা ছেড়ে কাঁদছে। এমন সব কর্কশ আওয়াজ যেন ওরা কখনও শোনে নি। লেডী-অ্যালবাট্রস কি টের পেয়েছে জাহাজের সামনে কোন কঠিন বিপদ এবং যদি জাহাজডুবির আশঙ্কা থাকে, অর্থাৎ সেই যে অন্ধকার সমুদ্রে সহসা কোনো বেতার-সংকেত থাকে না, সহসা দেখা গেছে, কোথাও কোনো চুম্বকের আকর্ষণে তলিয়ে যাচ্ছে জাহাজ কিম্বা কোনো অগ্নুৎপাতে পড়ে গেলে কারণ এই সমুদ্রের সীমাহীন জলরাশির নিচে অজস্র এমন সব অদৃশ্য ভয়, আর এও তো ঠিক যদি সেইসব সমুদ্রের প্রাগৈতিহাসিক জীবেরা কখনও সমুদ্রের সারফেসে চলে আসে, সময় বুঝে যদি টেনে নিচে নামিয়ে নিয়ে যায়, অথবা যে সব অলৌকিক ঘটনা সমুদ্রে মাঝে মাঝে দেখা যায়, যেমন একবার ডেবিড দেখেছিল, সমুদ্রের নিচ থেকে এক অগ্নিস্তম্ভ আকাশে উঠে যাচ্ছে, যেমন সে এটা কত দেখেছে, জলরাশির ভেতর অজস্র নক্ষত্র টুপটাপ যেন ঝরে পড়ছে। অর্থাৎ সমুদ্রে নিশীথে ডেকে দাঁড়িয়ে থাকলে এমন সব বিচিত্র অভিজ্ঞতা না হয়ে পারে না, তখন বেতার-সংকেতে গণ্ডগোল তেমন কিছু অস্বাভাবিক ঘটনা নয়। সে অনায়াসে কেবিনে ঢুকে এখন একটু ঘুমিয়ে নিতে পারে। সে এবার গিয়ে শুয়ে পড়বে ভাবল। সে খুব সাহসী মানুষ ঘুমিয়ে প্রমাণ করবে।

আর তখনই মনে হল মাস্তুলের নিচে কেউ বসে রয়েছে। সে লক্ষ্যই করে নি, কেউ এত রাতে মাস্তুলের নিচে বসে থাকতে পারে। এবং এভাবে কেউ মাস্তুলের নিচে বসে থাকলে ভয়ের কথা সে কাছে গিয়ে দেখল, বড়-টিণ্ডাল চুপচাপ বসে রয়েছে। ডেবিডকে দেখেও ওঠে দাঁড়াচ্ছে না। সে ডাকল, এবং ডাকলে বড়-টিণ্ডাল ঠিক সাড়া দিল, বলল, স্যার আপনি! ঘাবড়ে গিয়ে বলল, আমার এখন ওয়াচ।

—ওয়াচ! এখন তো নেকস্ট ওয়াচ আরম্ভ হতে আরও এক ঘণ্টার ওপর। এত আগে উঠে বসে আছ!

—স্যার নিচে ভীষণ গরম। গরমে ঘুমোতে পারছি না।

.

মৈত্র এবার উঠে দাঁড়াল। সে ওয়াচের পোশাক পরে আছে। হাতে দস্তানা। মাথায় কিছু ওর গণ্ডগোল ছিল। বন্দর থেকে জাহাজ ছাড়ার সময় অজস্র শিশুদের বেলুন উড়িয়ে দেওয়া, ওয়াকা বলে একজন মাউরি বালকের অবিরাম ব্যাণ্ড বাজিয়ে যাওয়া এবং বড়-টিণ্ডাল সেই যে ডেকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ওদে বিদায় জানিয়েছিল সব এখন মনে পড়ছে। বড়-টিণ্ডালকে বন্দরে রাজার মতো লাগছিল। এখন সেই বড়-টিণ্ডাল কেমন দুঃখী মানুষ। মাস্তুলের নিচে হেলান দিয়ে বসে আছে। বোধ হয় সে ঝিমুচ্ছিল। অথবা আকাশের নক্ষত্র দেখতে সে এখন ভালবাসছে। এভাবে তার স্ত্রীর কথা সে মনে করতে পারে হয়তো, হয়তো এইসব নক্ষত্র দেখতে দেখতে সে প্রায় সব শিশুদের কথা মনে করতে পারে—ফোকসালে শুয়ে থাকলে সে বোধ হয় কিছু মনে করতে পারে না, মাস্তুলের নিচে এসে সে- জন্য ওয়াচের অনেক আগে বসে থাকে। সে নিজের সঙ্গে জাহাজের সঙ্গে এভাবে ভেসে ভেসে যায়।

ডেভিডআর দাঁড়াল না। শুয়ে পড়বে ভেবেছিল, কিন্তু ওয়াচের খুব আর একটা দেরীও নেই। পাশের কেবিনগুলোতে পাঁচ-নম্বর, স্টুয়ার্ড এবং ছোটবাবু সবাই ঘুমোচ্ছে। ওরা বুঝতেই পারছে না বেতারে সব রহস্যজনক খবর আসছে। সে ভাবল, আরও কিছুক্ষণ জেগে থাকবে। তার ওয়াচের সময় চিফ- মেট কাপ্তান জেগে থাকবেন কিনা সে জানে না। সে যদি একা হয়ে যায়। সে একা ব্রীজে! রেডিও- অফিসার ওপরে থাকবে হয়তো, যতক্ষণ কোনো সঠিক খবর না পাচ্ছে ততক্ষণ রেডিও-অফিসার নড়তে পারছে না ভেবে ডেবিড কিছুটা আশ্বস্ত। কারণ স্যালি হিগিনসের মতো এই সব বুড়ো কোয়ার্টার- মাস্টারগুলো হাড়ে হাড়ে বজ্জাত। এদের ঠিক বিশ্বাস করা যায় না। রাতের বেলা মাঝে মাঝে ভীষণ সংশয়ের ভেতর ফেলে দেয়। ভেতরে প্রাণ আছে বোঝা যায় না, ঠিক একটা মমির মতো। অনেক সময় সে দেখেছে ডাকলেও সাড়া দেয় না। সুতরাং ভরসা মাত্র রেডিও-অফিসার। ও কি আর এখন মানুষ আছে? ওর চোখমুখ দেখলেই ভয় লাগছে! ওর মুখচোখ কি সাদা আর ফ্যাকাশে! তবু জাহাজে, একা ব্রীজে যখন সে ডিউটিতে থাকবে, অন্তত একজন তার মাথার ওপরে মাংকি-আয়ল্যান্ডে জেগে থাকবে। তার ভয়ে ঘাবড়ে যাবার কিছু নেই।

আর সে ঠিক যা ভেবেছিল তাই। ডিউটির সময় সে দেখল, স্যালি হিগিনস ধার্মিক নাগরিকের মতো বলছে, চিফ-মেট তুমি বরং একটু ঘুমিয়ে নাও। আমি আছি। আর চিফ-মেট চলে গেলে হিগিনস বললেন, ডেবিড দরকার হলে ডাকবে। দরজা বন্ধ করে দিলেন তিনি। এবার বোধ হয় তিনিও শুয়ে পড়লেন। সে বলল, হারামী।

মনে মনে হারামী কথাটা কতবার যে ইতিমধ্যে আর্চিও উচ্চারণ করেছে। সে সেই সকাল থেকে ভাবছে, ভাবতে ভাবতে মাথাটা ভার এবং প্রায় ঝিম ঝিম করছে। এবং রাত হলেই শরীরের রক্তপ্রবাহ ভীষণ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। গেল রাতে সে ভেবেছিল, দরজায় শব্দ করলে, ছোটবাবুর কথা ভেবে ঠিক দরজা খুলে দেবে জ্যাক। খুলে গেলে তার আর যা যা করার ইচ্ছে যেমন সে ঢুকেই বলত, খুব দরকারে হঠাৎ এসে গেলাম জ্যাক, তোমার ঘুমের কোনো অসুবিধা ঘটালাম না তো? সে এভাবে জ্যাকের সঙ্গে অসময়ে দেখা করে প্রাণপণ বোঝাতে চাইবে, তার কিছু খারাপ ইচ্ছে নেই। যদিও সে দু' একবার বলবে, জ্যাক তুমি যে

মেয়ে আমি আগেই টের পেয়েছি, আসলে জাহাজে আমার মতো তোমাকে কেউ বুঝতে পারে নি, কাপ্তান ভীষণ খারাপ কাজ করছেন, এ-ভাবে আর কতদিন তুমি থাকবে, জাহাজে একজন মেয়ে যদি থেকেই যায়, আহা যদি থেকেই যায়, জ্যাক আসলে মাথা আমারও ঠিক নেই, কেমন গন্ডগোল হয়ে যায় তোমাকে ভাবতে ভাবতে এবং তখন কোনটা করা ঠিক, কোনটা করা ঠিক না, বুঝতে পারি না। তুমি চিৎকার চেঁচামেচি করতে পার, কিন্তু ওপরে কেউ শুনতে পাবে বলে মনে হয় না। আমি অবশ্য এমন কিছু করব না, যে তোমাকে চিৎকার চেঁচামেচি করতেই হবে, শেষ পর্যন্ত বন্ধুত্ব যদি করে ফেলি, এই ধর তোমার খবরটুকু শুধু আমি রাখব আমার-টুকু, তুমি, আহা মুখ সরিয়ে নিচ্ছ কেন, তোমার কোমরে হাত রাখতে দাও, দ্যাখো না, নাভির নিচে, আহা কি যে গরম উলের মতো আরাম, আহা, কি হচ্ছে, আমি বুঝি দেখিনি—তুমি সেই ম্যানকে চুমো খেয়েছ, চিৎকার চেঁচামেচি করলে সব ফাঁস

করে দেব।

সে টুক করে দরজা খুলে ফেলল। সন্তর্পণে গলা বাড়িয়ে দেখল, এলি-ওয়ে ধরে কেউ হেঁটে যাচ্ছে কিনা। না, কেউ নেই। কেবল কে যেন এলি-ওয়েতে আজ সব উজ্জ্বল আলো জ্বালিয়ে রেখে গেছে। এত জোর আলো সাধারণত কখনও থাকে না। বাইরে বের হয়ে সে আলো সব নিভিয়ে দিল। অন্ধকারে কিছুক্ষণ প্রায় দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বুঝল সহজেই ওপরে উঠে যাওয়া যায়, সে আর দেরি করল না। ছোটবাবুর কেবিনের পাশ কাটিয়ে সিঁড়ির মুখে যেতে হবে। ওর এত কাছে সিঁড়ির মুখ, অথচ মনে হচ্ছে পথটা অনেক লম্বা আর বড় হয়ে গেছে। এক দৌড়ে সে কিছুতেই সেখানে পৌঁছাতে পারবে না।

তারপর কি ভেবে সে খুব সহজ হয়ে গেল। সে এত বেশি ভয় পাচ্ছে কেন? সে তো অনায়াসে মধ্যরাতে এনজিন-রুমে নামার জন্য স্বাভাবিকভাবে সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারে। সে স্বাভাবিকভাবেই সিঁড়ি পর্যন্ত হেঁটে গেল। ছোটবাবুর কেবিনের পাশে দাঁড়িয়ে কান পাততে ইচ্ছে হল, যদি গোপনে জ্যাক ছোটবাবুর কেবিনে নেমে আসে। তা হলে যেন তুরুপের তাস। সহজেই হাতে পেয়ে যায়। সবার কাছে সে গোপন রাখবে, জাহাজে কোন মেয়ে নেই। কোন ভালবাসা নেই। কেবল বিনিময়ে সে বাকি সফর যুবতীকে নিয়ে ফূর্তি করে যাবে। এবং যেন এই ফূর্তি তার হকের। সে যেমন বন্দরে নেমে মেয়েদের শরীরে তার হক খুঁজে পায়, জাহাজে তেমনি মাত্র ফুটে ওঠা কুঁড়ির পাপড়ি ছিঁড়ে খেতে খেতে যুবতী তার হকের ধন ভেবে ফেলেছে। তার প্রাপ্য সে বুঝে নিতে যাচ্ছে অথবা বুঝতে পারবে সে আর আহাম্মক নয়। এবং শরীরে কামুক গন্ধ তার। সে যথাযথ বিষয়ী মানুষ হয়ে গেছে বুঝতে পারবে। জাহাজে বালিকা যুবতী হবে, আর সে চিৎপাত হয়ে পড়ে থাকবে জাহাজে, আঙ্গুল চুষবে কেবল, তেমন মানুষ সে নয়। চোখের ওপর এমন ভোগ্যপণ্য বে-হাত হয়ে যাবে সে ভাবতে পারে না।

আর বোধ হয় এ-ভাবেই সব মানুষ সব কাজের পেছনে যুক্তি খাড়া করে থাকে। আর্চিও এটা যুক্তিযুক্ত কাজ ভেবেছে। কারণ সে দেখেছে ভাল কথায় মেয়েটি সব সময় চোখ ত্যারচা করে থাকে, তাকে গঙ্গাবাজুতে দেখলে, মেয়েটা যমুনা-বাজুতে পড়ি মরি করে ছুটতে থাকে—সে আর এ-ভাবে কতক্ষণ পারে? সে তো একটা মানুষ? ফুল ফুটবে, সে গন্ধ শুঁকবে না কি করে হয়!

আর তখন ছোটবাবু নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছে। দেখে কে বলবে কেবিনে দুরন্ত বালিকা যুবতী সেজে ওর জন্য অপেক্ষা করছে। বরং দেখে মনে হবে ছোটবাবুর কোথাও যাবার কথা নেই। ঘরে সবুজ আলো। বুকের ওপর ওর দু-হাত কিছুটা প্রার্থনার মতো। নীল দাঁড়ি সবুজ আলোর ভেতর মিহি ঘাসের মতো নরম। ওর চোখ ভারি। কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম। পাখার হাওয়া এত প্রবল যে, ঘাম হবার কথা নয়, কিন্তু কেন জানি দেখে মনে হবে ছোটবাবু স্বপ্ন দেখছে। ছোটবাবু এত রাত পর্যন্ত বোধ হয় জেগে থাকতে পারে না। সে ঘুমোবার আগে কেবল ভাবছিল কখন ডেবিডের ওয়াচ আরম্ভ হবে। ডেবিডের ওয়াচ আরম্ভ হলেই কথা থাকে

কাপ্তান তার কেবিনে ঘুমিয়ে পড়বেন। তখন দরজায় সামান্য কড়া নাড়া। সে কড়া নাড়লেই দেখবে বনি ফ্রক গায়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমন সর্ব মুহ্যমান দৃশ্যের কথা সে কেবল শুয়ে শুয়ে ভাবছিল, আর ঘড়ি দেখছিল। সে কি করবে অথবা কি ভাবে কথা বলবে বনির সঙ্গে, যেমন বনিকে বলা যেতে পারে, আচ্ছা বনি তোমাদের বাড়ির পাশে আমার কেন জানি মনে হয় খুব বড় একটা বন আছে। তোমাকে দেখলেই মনে হয়, বনের ভেতর তুমি খেলা করে বেড়াতে, সামনে সমুদ্র, দূরে বাতিঘর—বনের গাছাপালার ভেতর অজস্র পাখি আছে মনে হয়। রঙিন পাখিরা কখনও ঝাঁকে ঝাঁকে তোমার মাথার ওপরে উড়ে যাচ্ছে অথবা মনে হয় কখনও বালিয়াড়িতে তুমি দাঁড়িয়ে আছ, তোমার পায়ের পাতা জলে ডুবে আছে, ছোট ছোট মাছেরা খেলছে তোমার চারপাশে, জলে কখনও ফ্রক ভিজে যাচ্ছে, কখনও ফ্রক উড়ে যাচ্ছে বাতাসে, আবার মনে হয় তুমি চুপি চুপি দেখছ পাহাড়ের কোলে বসে আমি কি করছি, তোমাকে যুবতী ভাবলেই আমার এমন মনে হয়, যেন কতকাল থেকে তুমি কোনো ফুলের উপত্যকাতে হেঁটে বেড়াচ্ছ। কারো আসার কথা, তুমি ফুলের ভেতর অথবা ঘাসের ছায়ায় নিজেকে দেখতে দেখতে কখন বড় হয়ে গেছ টের পাও নি।

ছোটবাবুর আরও কি সব মনে হয়। তখন চোখ মুখ ওর জ্বালা করতে থাকে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়তে থাকে। কারণ সুন্দর মায়াবী শরীর বনির। লম্বা দু'হাত কারুকার্যময় ব্যালেরিনার মতো। ছোটবাবু বইয়ে সুন্দর সুন্দর সব ব্যালেরিনার ছবি দেখেছে, একেবারে দু'হাতে যেন দু'আকাশের সবকিছু নক্ষত্র সে পেড়ে আনতে চায় অথবা কখনও যখন মনে হয়.বনি দু'হাতে আবার সব নক্ষত্র আকাশের গায়ে লটকে দিচ্ছে তখন ওর পা এবং জংঘা, জংঘার পাশে কোমল অভিমানিনী তার, উজ্জ্বল সমুদ্রের তরঙ্গমালার মতো। ধেয়ে আসছে, প্রবল বেগে ধেয়ে আসছে। যেন ছোটবাবুকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, দূরে অনেক দূরে নিজের মতো নির্জন দ্বীপে তাকে নিয়ে কেবল ঘুরে ঘুরে কোনো পাহাড়শীর্ষে উঠে যাওয়া। এবং উঠেই যেন বলছে, আমি ঝাঁপ দিই ছোটবাবু। তুমি আমাকে তুলে আনবে। আর তো

আমার মরে যেতে ভয় করে না।

ছোটবাবুর বলতে ইচ্ছে হয়, মরে যেতে ভাল লাগে তোমার! –

—জানি না কেন মরে যেতে এত ভাল লাগে।

আসলে এখন ছোটবাবু বুঝতে পারে ওকে সামান্য জড়িয়ে ধরলেই আর ওর মরে যেতে ইচ্ছে করবে না। বুকের ভেতর মুখ লুকিয়ে বলবে, এই।

–কী!

—তুমি খুব খারাপ।

ছোটবাবুর তখন ইচ্ছে হয়, সে আরও দুষ্টুমী করে ফেলবে। কিন্তু তারপরই মনে হয়, সে তো বনির কেউ নয়, বনি কাপ্তানের মেয়ে, জাহাজ দেশে ফিরে গেলেই সে নেমে যাবে। হয়তো বনি হাত নাড়বে ডেক থেকে। চোখে বিন্দু বিন্দু জল। এবং তখন বনি ওর দিকে সোজা তাকাতে পারবে না। তখনই মনে হয় সেও ফুল ছিঁড়ে খেতে ভালবাসে। নিজেকে ভারী নষ্ট চরিত্রের মানুষ সে ভেবে ফেলে। এমন পবিত্র আকাঙ্ক্ষা অথবা ফুলের মতো তাজা প্রাণ সে বিনষ্ট করতে পারে না।

যদিও বিনষ্ট কথাটার সঠিক অর্থ সে এখনও ভালভাবে বুঝে উঠতে পারে না। তখনই বড় বড় হাই উঠতে থাকে, কেমন যেতে ইচ্ছে করে না আর ওপরে। ঘুমিয়ে পড়তে কেবল ভাল লাগে। অকারণ সে ফুল ছিঁড়ে খেতে পারে না।

এটা যে সংস্কার অথবা প্রাচীন গাঁথার মতো শরীরে আজন্ম লেপ্টে আছে—ছুঁয়ে দিলেই নষ্ট হয়ে যায় না, সে যদি জানত এবং বুঝতে পারত এ-সবে নষ্টামি বলে কিছু নেই বরং পবিত্রতা আছে, সে কিছুতেই ঘুমিয়ে পড়তে পারত না।

তখন আর্চি কেবিনের চারপাশে সন্তর্পণে হাঁটছে। সব দেখেশুনে সে দরজায় দাঁড়াবে।

তখন রেডিও-অফিসার প্রায় উবু হয়ে বসে আছে। কোনো খবর, অথবা আগুন আগুন এমন সব ভৌতিক গন্ডগোল থেকে যদি জাহাজটা রক্ষা পায়।

তখন ডেবিড প্রায় গভীর অন্ধকার সমুদ্রে তাকিয়ে আছে। চুপচাপ। তাকেই এখন কাঁচের জারে মমির মতো দেখাচ্ছে। সুতরাং আর্চি জ্যাকের দরজায় দাঁড়াতে পারে এবার। খুট খুট করে দরজায় শব্দ করতে পারে।

এবং কান পেতে থাকল আর্চি। নিচ থেকে এনজিনের শব্দ উঠে আসছে—কতটা জোরে অর্থাৎ সে কতটা জোরে কথা বললে অথবা জ্যাক কতটা জোরে কথা বললে ওপরে কাপ্তান জেগে যাবে না, যেন সেটা সে আন্দাজ করছে। সমুদ্রে ঝড়ো হাওয়া নেই। সামান্য হাওয়াতে যেমন সমুদ্র উত্তাল থাকার কথা এবং যে-ভাবে সব শব্দ সমুদ্রে তৈরি হয়—তার চেয়ে বেশি না, সে বুঝতে পারল এই ঠিক সময় এবং এমন ভেবে দরজায় দাঁড়িয়ে যেই খুট খুট শব্দ তখনই সমুদ্রে অগ্নিকান্ড। মুহূর্তে সারা আকাশ যেন আলোকিত হয়ে গেল, চারপাশে সমুদ্র লাল হয়ে গেছে। একেবারে কাছাকাছি একটা জাহাজে আগুন জ্বলছে। ধোঁয়া এবং পোড়া তেলের গন্ধ বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছিল। ডেবিড চিৎকার করতে করতে নেমে আসছে। আফটার পিকে ঢং ঢং করে এলার্মিং বেল বাজিয়ে দেওয়া হচ্ছে। যে যেখানে ছিল লাইফ-জ্যাকেট পরে উঠে আসছে। আর্চি দেখল স্যালি হিগিনস ব্রীজে উঠে যাচ্ছেন। চিফ-মেট সিঁড়ির মুখে উঠে আসছে। সে তাড়াতাড়ি প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে নিচে পালিয়ে যেতে থাকল। সমুদ্রে এমন ভয়াবহ অগ্নিকান্ড পর্যন্ত তাকে বিস্মিত করতে পারল না। সে উন্মত্তের মতো ছুটে যাচ্ছে নিচে। জোরে যতটা জোরে সম্ভব লাথি মারছে ছোটবাবুর দরজায়। হাঁকছে, লেজি বাগার। যেন ছোটবাবুই সময় বুঝে সুমদ্রে অগ্নিকান্ড এবং তার বাড়াভাতে ছাই দিয়েছে।

ছোটবাবু দরজা খুলে বিস্মিত। আর্চি সামনে। সে ভেবেছে সকাল হয়ে গেছে। কাজের সময় হয়ে গেছে। আর্চি তাকে সে-জন্য গালাগাল করছে। সে বলল, গুডমর্নিং স্যার।

আর্চি বলল, গুডমর্নিং। এবং তারপর কেমন অমায়িক হয়ে গেল কথাবার্তায়। তুমি ম্যান ঘুমোচ্ছ! তুমি তো আচ্ছা লোক হে! জাহাজে আগুন লেগেছে জান না।

তাহলে জাহাজে কিছু ভয়াবহ ঘটনা ঘটছে! এখনও এলার্মিং বেল বাজছে। সে তাড়াতাড়ি লাইফ- জ্যাকেট গায়ে জড়িয়ে নিল। এবং তখন দেখতে পাচ্ছে জ্যাক হাঁপাতে হাঁপাতে নেমে আসছে নিচে। সেই কাউ-বয়দের মতো পোশাক। শরীরে তার সোনালী লাইফ-জ্যাকেট। আর্চি ভীষণ খুশী যেন আর কি জ্যাক এসে গেছে! সে কত অমায়িক এমন দেখানোর জন্য বলল, তোমরা ওপরে যাও, আমি যাচ্ছি। বলেই সে প্রায় ছুটে কেবিনের দিকে চলে গেল।

ছোটবাবু বলল, কি হয়েছে জ্যাক। এলার্মিং বেল বাজছে! বলেই সে ওপরে ছুটে যেতে চাইলে জ্যাক খপ করে হাত ধরে ফেলল। এখন যে যার কাজে নিচে ওপরে ছুটছে। যেমন মেজ-মিস্ত্রি আর্চি নিচে নেমে গেছে। বোট ডেকে ডেক-জাহাজিরা জড়ো হচ্ছে। খুব চিৎকার চেঁচামেচি যখন এ-ভাবে হচ্ছিল তখন জ্যাক পাগলের মতো টলতে টলতে এলি-ওয়ের অন্ধকারে নিয়ে ছোটবাবুকে দাঁড় করিয়ে দিল। রাগে সে ফুঁসছে। আঁচড়ে কামড়ে দিচ্ছে ছোটবাবুকে। ছোটবাবু যত বলছে আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম বনি তত আরও ক্ষেপে যাচ্ছে। তারপর ঠিক পোকামাকড়ের মতো লেপ্টে যাচ্ছে শরীরে। ছোটবাবুর ঠোটে গালে কপালে পাগলের মতো চুমো খাচ্ছে জোর-জার করে। ছোটবাবু হতভম্ব। সে বাধা পর্যন্ত দিতে পারছে না! এমন একটা ভয়াবহ অগ্নিকান্ড সমুদ্রে, আর বনি এটা যে কি ছেলেমানুষী করছে!

॥ আটত্রিশ ॥

স্যালি হিগিনস এনজিন-রুমে টেলিগ্রাম পাঠালেন—স্ট্যান্ড বাই

জাহাজ থেমে গেল। কাপ্তান নিজে সব করে যাচ্ছেন। তিনি চিফ-মেটকে ডাকলেন। বোট হারিয়া করা দরকার। কে কে যাবে সব চটপট বলে দিতে হবে।

তিনি স্থির হয়ে দাঁড়াতে পারছিলেন না। কেউ পারছিল না। সবাই ওর চারপাশে ঘুরছে। বোট- ডেকে সব ডেক-জাহাজিরা এখন মাস্তার দিয়েছে। এনজিন-রুমের সিঁড়ি ধরে নামছে মেজ-মিস্ত্রি। এ- সময়ে ওকে সব সময় নিচে থাকা দরকার। সে পছন্দমতো পাঁচ-নম্বর এবং তিন-নম্বরকে কাছে রাখল। আগুন জাহাজটাতে তেমনি জ্বলছে। খুব বেশি দূরে মনে হচ্ছে না। মনে হয় মোটর-বোটে গেলে আধঘন্টার মতো লাগবে। তবু এই মাঝরাতে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না কতদূর হবে। বরং যখন আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে মনে হচ্ছে খুবই কাছে জাহাজ, আবার যখন কমে আসছে, মনে হচ্ছে জাহাজ দূরে ভেসে চলেছে। এ-সবের ভেতরই ওরা দেখতে পাচ্ছিল, আগুন ছড়িয়ে পড়ছে সমুদ্রে। জাহাজিরা রেলিঙে ঝুঁকে আছে। ওরা নিয়মকানুন মানতে চাইছে না। এক্ষুনি যদি কাপ্তান নেমে আসেন আর দেখতে পান সবাই এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে ভীষণ ক্ষেপে যাবেন। কিন্তু যা সব হচ্ছে সমুদ্রে ওরা তো সব দেখে হতবাক।

রেডিও-অফিসার কাছাকাছি সব স্টেশন ধরার চেষ্টা করছে। আশ্চর্য! একটা স্টেশন থেকে সে জবাব পাচ্ছে না। এতবড় সমুদ্রের এই দু'চারশ মাইলের ভেতর কি কোনো জাহাজ নেই! পাঁচ-সাতশ মাইলের ভেতর! সে ক্রমে ক্ষেপে যাচ্ছিল, আর যত দূরের সব স্টেশনে বার্তা পাঠিয়ে দিচ্ছে, ইয়েস, দি সিপ'স বার্নিং। না, কেউ জবাব দিচ্ছে না। হ্যালো, সিউল-ব্যাংক বলছি, নেকস্ট পোর্ট অফ কল সামোয়া —না কোথাওকেউ জবাব দিচ্ছে না। সে ফের বলল, মনে হচ্ছে এটা একটা তেলের জাহাজ। সে কাঁচের ভেতর দিয়ে সমুদ্র দেখছে আর বলছে, সে এত বেশি উত্তেজিত যে কেবল বলেই যাচ্ছে—কেউ শুনছে কিনা তার খেয়াল থাকছে না —হ্যাঁ মনে হচ্ছে হ্যালো ইয়েস, আনডার দ্য হরাইজন, কিন্তু কেউ কিছু সাহস দিচ্ছে না, একেবারে চুপচাপ। সে যেন আছাড় মেরে এবার সব ভেঙে দেবে। দরজার মুখে স্যালি হিগিনস চিফ-মেট দাঁড়িয়ে আছেন। পাশাপাশি কোন্ কোন্ জাহাজের সঙ্গে কথা বলা গেল জানতে চাইছেন। অথবা শেষ পর্যন্ত এরিয়া-স্টেশন থেকে কোনো খবর এসেছে কিনা। এবং সিউল-ব্যাংক যে এখন স্ট্যান্ড-বাই, দু'টো বোট নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে, এ-সব খবরও এরিয়া-স্টেশনকে পৌঁছে দিতে পারলে ভাল হত। স্যালি হিগিনস পুরানো কাপ্তান—জাহজাডুবি সম্পর্কে তিনি অভিজ্ঞ। এবং তিনি জানেন, কোথায় সামান্যতম ত্রুটি হলে কাপ্তানের ওপর এসে সব দোষ বর্তায়, আর কতটা বিবেচনার সঙ্গে কাজ করলে শেষ পর্যন্ত কাপ্তান স্যালি হিগিনস সাহসী, সমুদ্রে শয়তানের ঘাড় ঠিক সময়ে মটকে দিয়েছেন। এবং বোধহয় এভাবেই সব কিংবদন্তী তৈরি হয়ে যায়। যেমন স্যালি হিগিনস যখন উঠে যাচ্ছিলেন ওপরে অথবা নিচে নেমে আসছিলেন, জাহাজিরা তখন একজন মানুষের চলাফেরা দেখে সাহসী হয়ে উঠছে। এবং বোধ হয় এক্ষুনি তিনি নাম ঘোষণা করবেন —হাই

কার কার নাম থাকবে, অর্থাৎ বোটে কে কে যাবে। সবাই তো এমন একটা অগ্নিকাণ্ডের সামনে সহজে যেতে চায় না। কারণ কাছাকাছি গেলে, কখন খোল থেকে সব নানারকমের বিস্ফোরণ হবে কে জানে! তিনি এক এক করে নাম হেঁকে যাবেন, ঠিক নাম বললে ভুল হবে, নম্বর হেঁকে যাবেন, অবশ্য এ-ব্যাপারে পরামর্শদাতা ডেক-সারেঙ আর চিফ-মেট এবং সঙ্গে এনজিন-সারেঙ থাকতে পারেন। যারা কখনও দু-চার কথায় সারেঙের সঙ্গে বচসা করেছিল, কেন যে মাথা গরম করতে গেল, এবং ওদের মনে হচ্ছিল ঠিক ডেক-সারেঙ ওদের নাম দিয়ে দেবে। ওরা বোট-ডেকে চুপচাপ ছিল। এমন কি দূরে যে এতবড় একটা অগ্নিকান্ড ঘটছে তাও আর দেখতে সাহস পাচ্ছে না।

আসলে সমুদ্রটা তখন লাল হয়ে গিয়েছিল। চারপাশে, একেবারে মনে হচ্ছে দিগন্তব্যাপী এক উজ্জ্বল আলোকমালা গড়ে তুলছে জাহাজটা। নীলাভ নক্ষত্রমালায় যেন আগুন লেগে গেছে।

কেউ বলছিল, ওটা যাত্রী-জাহাজ হবে।

কেউ বলছিল, ওটা তেলের জাহাজ।

মান্নান কোথা থেকে এসে ভিড়ের ভেতর উঁকি মেরে বলল, দূর শালা ওটা মাছ ধরার জাহাজ তিমি মাছ ধরার জাহাজ হবে, বলে দিলাম। শালা তিমির চর্বি না হলে আগুন এত সাদা হয় না।

মনু বলল, তুই তো তিমি মাছ ধরার জাহাজে কাজ করতিস।

—না করলে বুঝি মিঞা হয় না।

—আরে রাখো বে, দ্যাখো না শালা জাহাজ কেমন ফুটছে। তিমি মাছ বেরিয়ে যাবে।

এবং সবাই উদ্বিগ্ন। কেউ কেউ খোঁড়াতে পর্যন্ত থাকল। এনজিন-সারেঙ তখন দেখলেন বাদশা মিঞা আসেনি। ওর তো, ওয়াচ নেই। এখন বড়-টিন্ডালের ওয়াচ। তিনি তাড়াতাড়ি খুঁজতে থাকলেন—এত চেঁচামেচি, কারো কথা কানে আসছে না। তিনি হেঁকে গেলেন, ছোট-টিন্ডাল। কোথাও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

পিছিলে এসে দেখলেন একেবারে খালি ফোকসাল। কেউ নেই। কারও থাকার কথাও নয়। মাস্তার বললে সবাইকে তো বোট ডেকে হাজিরা দিতেই হবে। তখন ছোট-টিন্ডাল যে কোথায় গেল। এবং তখনই মনে হল ভেতরে কেউ গোঙাচ্ছে। সে ভেতরে ঢুকে তাজ্জব। এমন গরমে বাদশা মিঞা কম্বল গায়ে শুয়ে রয়েছে। এবং কাছে যেতেই সে হাউ হাউ করে কাঁদছে।

সারেঙ-সাব জানেন, ভয় পেয়ে বাদশা মিঞা শুয়ে আছে, যদি বোটে ওকে নামিয়ে দেওয়া হয়। বাদশা মিঞার মুখ দেখে তিনি ক্ষেপে গেলেন। তবু তাঁর স্বভাবে আছে এক আশ্চর্য গাম্ভীর্য। তিনি বললেন, ছোট-টিন্ডাল, ওঠো। ওঠো বলছি।

সারেঙ-সাবের ভয় হচ্ছিল, এভাবে এখন এখানে তার থাকা ঠিক না। যে কোন সময় বাড়িয়ালা তার খোঁজ করতে পারেন। তিনি বাদশা মিঞাকে, তারপর মনে হল শুধু বাদাশা মিঞা নয়, আরও দু'একজন এভাবে লুকিয়ে আছে। সবাইকে প্রায় গোরুর পাল ঘরে থেকে মাঠে নিয়ে যাবার মতো উঠে গেলেন। এবং তখনই তিনি দেখলেন, আশ্চর্য সব আগুনের ফুলকি সমুদ্রে ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে। এবং হাজার হাজার এভাবে সারা সমুদ্রে ছড়িয়ে পড়তে থাকল।

স্যালি হিগিনস বললেন, চিফ-মেট দেখছ!

—দেখছি স্যার।

ডেবিড বলল, স্যার, সব মশাল জ্বলছে সমুদ্রে।

একজন জাহাজি তখন নিচ থেকে হেঁকে উঠল, স্যার, মনে হচ্ছে মশালের মিছিল। হাজার হাজার মশাল এভাবে জাহাজের চারপাশে ছড়িয়ে পড়ছে।

আর যখন এভাবে সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছিল, স্যালি হিগিনস বোট হারিয়া করার তোড়জোড় করছেন, এবং চারপাশে সেই সব আগুনের ফুলকি ভেসে বেড়াচ্ছে তখন ছোটবাবু প্রাণপণ চেষ্টা করছে জ্যাককে ওপরে নিয়ে আসতে। জ্যাক পাগলের মতো লেপ্টে রয়েছে শরীরে। কেবল ছোটবাবুর পিঠে বুকে মুখ ঘসছে। ছোটবাবুকে নিয়ে কি করবে সে যেন বুঝতে পারছে না।

ডেক-জাহাজি এলার্মিং বেল বাজিয়ে যাচ্ছে সমানে।

ছোটবাবু বলল, জ্যাক ছাড়ো বলছি। কি হচ্ছে এ-সব

জ্যাক একটা কথাও বলছে না। সে লতাপাতার মত জড়িয়ে আছে। এবং নানাভাবে ছোটবাবুর শরীরে উন্মত্তের মতো ঘাড়ে গলায় ঠোটে চুমো খাচ্ছে।

ছোটবাবু আর ধৈর্য রাখতে পারছে না। বোট-ডেকে ওদের না দেখতে পেলে কেউ খুঁজতে চলে আসতে পারে। তখন কি যে হবে না!

এবার সে প্রায় জোর-জার করে জ্যাককে ছাড়াতে চাইল। জ্যাক প্রায় পেছনে ঝুলে থাকার মতো! এবং এটা বড় অসম্মানের—ছোটবাবুর জন্য সে সারারাত প্রায় জেগে বসেছিল। এবং যেন সময় পাওয়া গেছে, সবাই একটা ভয়ঙ্কর ঘটনায় যখন ওপরে ছোটাছুটি করছে তখন ছোটবাবুকে নিয়ে ছেলেমানুষের মতো কখনও অভিমানে আঁচড়ে-কামড়ে দিতে চাইছে, কখনও চুপ-চাপ বুকে মুখ লুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে চাইছে, এমন একটা নির্জন অন্ধকার থেকে সে কিছুতেই যেতে চাইছে না।

সমানে এলার্মিং বেল বাজছে তো বাজছেই।

ছোটবাবুর মনে হল, সবাই ওপরে উঠে গেছে, এবং কেবল সে আর বনি এভাবে পালিয়ে রয়েছে অন্ধকারে। ওর ভয় ধরে গেল। বনিকে নিয়ে প্রায় টানতে টানতে সিঁড়ির মুখে চলে গেল। আর প্রায় টেনে-হিঁচড়ে বনিকে ওপরে তুলে হাত ছেড়ে দিল। বনি আক্রোশে তখন প্রচন্ড ফুঁসছে। সে যেন তার সব কান্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে।

ওপরে উঠে ছোটবাবু স্তম্ভিত। সে এ-সব কি দেখছে? আগুন, চারপাশে আগুন। দূরের জাহাজ থেকে সব আগুনের গোলা যেন ঝাঁপিয়ে পড়ছে জলে। আর পড়েই ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, বিন্দু বিন্দু হয়ে যাচ্ছে, তারপর আরও ছোট, আকাশের নিচে অজস্র প্রদীপের মতো ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে, কখনও মনে হচ্ছে আকাশের নিচে অজস্র সোনার পদ্ম সমুদ্রে ফুটে উঠেছে। এমন গভীর নিশীথে সে এ-সব দেখে কারো সঙ্গে একটা কথা বলতে পারল না। কি বলবে! সবার চোখেই ভীষণ ত্রাস। সবাই ব্যাপারটা রেলিং-এ ঝুঁকে বোঝার চেষ্টা করছে।

থার্ড-মেট দাঁড়িয়েছিল পোর্ট-সাইডের ঠিক দুটো বোটের মাঝখানে। বোট হারিয়া করার ভার তার ওপর! ডেক-সারেঙ, ডেক-টিন্ডাল বোটের ওপর উঠে গেছে। কপিকলে তেল ঢেলে দিচ্ছে। দড়ি টানাটানি করে কপিকল সহজ করে নিচ্ছে। অর্থাৎ যেন বোট নামতে নামতে মাঝখানে আবার আটকে না যায়।

সমুদ্রে বোট নামিয়ে দেবার সব রকমের প্রস্তুতি চলছে।

তখন ডেবিড ছোটবাবুর পাশে এসে কাঁধে হাত রাখল। ডেবিডকে দেখে কিছুটা সে আশ্বস্ত। সে বলল, দেখছ সমুদ্রটা কি ভয়ংকর দেখাচ্ছে। মনে হচ্ছে হাজার হাজার সোনার পদ্ম সমুদ্রে ভাসছে। আবার নিভে যাচ্ছে।

ডেবিড বলল, আসলে ওটা তেলের জাহাজ। তেলের জহাজে আগুন লাগলে এমন হয়। সমুদ্রে তেল যত ছড়িয়ে যায়, আগুন তত ছড়িয়ে যায়। ঢেউ এসে সেগুলো আরও ভেঙে দেয়। আগুন ক্রমশ বিন্দুবৎ হতে হতে কখনও আগুনের ফুলকি হয়ে যায়।

ছোটবাবুর আর কথা বলতে ভাল লাগছিল না। জাহাজটাতে সেই মানুষগুলি এখন কি না করছে! অথবা সবাই হয়ত পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। এবং এ-সব ভাবলেই ছোটবাবু ভীষণ ছটফট করতে থাকে। লেডি-অ্যালবাট্রস সমুদ্রে কোথাও উড়ছে না। সে পাখিটাকে খুঁজতে একবার গঙ্গা-বাজুতে ছুটে গেল, আবার যমুনা-বাজুতে—পাখিটাকে সে দেখতে না পেয়ে জোরে জোরে ডাকতে চাইল, এলবা। লেডি- অ্যালবাট্রসকে সে কখনও কখনও এভাবে ডাকতে ভালবাসে। না, কোথাও নেই। সমুদ্রে আর অন্ধকার একেবারে নেই। স্পষ্ট সবকিছু দেখা যাচ্ছে। আগুনের আভায় দাঁড়ালে যেমন শরীর মানুষের স্পষ্ট হয়ে যায়, তেমনি আকাশ, তার নক্ষত্রমালা এবং সমুদ্র খুবই স্পষ্ট। এমন কি যদি এলবা আকাশে উড়ে বেড়াতো এখন তার প্রতিবিম্ব জলে দেখা যেত, পাখিটা সমুদ্রে নেই তবে। পাখিটাকে না দেখা গেলেও ওর

প্রতিবিম্ব দেখে বুঝতে পারত, সমুদ্রেই আছে পাখিটা। কোথাও হারিয়ে যায় নি।

যখন সবাই বোট নামিয়ে দেবার জন্য হুড়োহুড়ি করছে তখন ছোটবাবু বোট-ডেক থেকে নিচে নেমে ডাকল, এলবা। বেশ জোরে গলা ছেড়ে ডাকতে ইচ্ছে হল। এটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে ভেবে সে ফোরমাস্টের নিচে এসে দাঁড়াল। এখানে পাখিটা কখনও আজকাল বসে থাকে। ওপরে তাকালে দেখল এলবা ঠিক বসে রয়েছে। এবং পাখার নিচে ঠোঁট গুঁজে ঘুমোচ্ছে। সমুদ্রে এমন সাংঘাতিক জাহাজডুবি অথচ পাখিটার এতটুকু ভ্রুক্ষেপ নেই। সমুদ্রে আর দশটা রাতের মতো সে যেন নিশ্চিন্ত। ছোটবাবু পাখিটাকে ঘুমোতে দেখে ঘাবড়ে গেল। এই সব ঘটনার ভেতর কোথাও যেন একটা আশ্চর্য রহস্যের গন্ধ পাচ্ছে সে। সে ধীরে ধীরে ফের ওপরে উঠতেই কাপ্তানের গলা পেল—হাই

স্যালি হিগিনস কাউকে ডেকে কিছু বলছেন। চার্ট-রুমের রেলিঙে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। দু'টো বোঁট ঠিকঠাক নামানো যাচ্ছে কিনা লক্ষ্য রাখছেন। ঠিক না হলেই মাঝে মাঝে চড়া গলায় হাঁকছেন—গালাগাল করছেন। এবং দু'টো একটা খারাপ কথাও মুখ থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। অবশ্য এ-সময়ে মাথা ঠিক রাখা মুশকিল। সবাই নির্দেশমতো কাজ করে যাচ্ছে। নিচে এনজিন-রুমে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন, জাহাজ স্লো চালাতে হবে। যতক্ষণ তিনি ফের নির্দেশ না দিচ্ছেন জাহাজ সামনের দিকে এগুবে। আরও কিছু এগিয়ে দেখা গেল, জাহাজটার সামনে আগুন, পেছনে লোক-লস্কর আবছা দেখা যাচ্ছে। ওরা নিচে ঝাঁপ দিতে চাইছে এমন অস্পষ্ট সব ছবি।

তখনই বোট হারিয়া করতে বললেন স্যালি হিগিনস।

দু'টো বোট ক্রমে নিচে নেমে যেতে থাকল। লম্বা দড়ি সব ফেলে দেওয়া হচ্ছে। কাপ্তান নাম বলছেন, অথবা নম্বর বলছেন, আর তারা লাফিয়ে দড়ি বেয়ে নিচে নেমে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। এক দণ্ড দেরি করতে পারছে না কেউ। আর তিনি নির্দেশ দিচ্ছেন—অর্থাৎ কাজ এবং কথা একসঙ্গে চলছে।

তিনি বললেন, দু'নম্বর বোটে চিফ-মেট, ফাইভার, তিনজন ক্রু। তিনজন ক্রুর তিনি নম্বর বলে গেলেন।

ওরা নেমে নিচে দাঁড়িয়ে আছে। বোট দুলছে ভীষণ। এখনও দড়ি ছেড়ে দেওয়া হয়নি। একটু শুধু এগিয়ে নেওয়া হয়েছে বোট। এক নম্বর বোট নেমে যাচ্ছে। কেউ একটা কথা বলছে না, এখন কে যাবে! তখনই তিনি চিৎকার করে বললেন, হাই। হাই বলতেই সবাই সতর্ক হয়ে গেল। তিনি হেঁকে গেলেন, ডেভিড, ছোটবাবু, সঙ্গে তিনজন ক্রু। তিনি ক্রুদের নম্বর বলে গেলেন। ওরা সবাই লাইফ- জ্যাকেট পরেই ছিল। কেবল এখন দড়ি ধরে নেমে যাওয়া। ওরা ঠিক এক একজন পুতুলের মতো যেন খেলনার দড়ি বেয়ে নেমে যেতে থাকল। বোট অনেক নিচে। প্রথম ডেভিডকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সে ঠিক জায়গা মতো নেমে যেতে পারে নি, কিছুটা ফসকে গিয়ে একেবারে সমুদ্রে পড়ে গেল। কিন্তু হলে কি হবে এসব সময়ে সবাই এত বেশী সতর্ক থাকে যে মুহূর্তে সে জল কেটে বোটে ঠিক ঝুঁকে পড়ল। ওপর থেকে চেঁচামেচিতে সে কিছু বুঝতে পারছে না। কেবল হাত তুলে সে ইশারা করল। সে ভাল আছে। তারপর ছোটবাবু এবং পাশে সে দেখল জ্যাক দড়ি ধরে আছে। কিছুতেই আল্গা করছে না। আবার চার্ট-রুমের রেলিঙ থেকে কাপ্তানের চড়া গলা, হাই

জ্যাক বলল, আমি যাব বাবা?

কাপ্তান বিরক্ত গলায় বললেন, না। দড়ি আল্‌গ্লা করে দাও।

জ্যাক দড়ি আল্গা করে দিতে থাকল। তখন কাপ্তান নিচে নেমে এসেছেন। জ্যাক কেন এখন এ- জায়গায়, এ-কাজ তো ছোট-টিণ্ডালের এবং ডেক-বোসানের। তিনি দড়ি আল্গা করার জন্য তাদেরই রেখেছেন। কিন্তু কাছে এসে কেমন মনে হল ভীষণ স্বার্থপরের মতো কাজ করে ফেলেছেন। এতগুলো জীবনকে তিনি ভয়াবহ এক অগ্নিকাণ্ডের সামনে পাঠিয়ে

দিচ্ছেন, নিজের সন্তানের বেলায় তিনি না বললেন। কিন্তু তিনি ততক্ষণে স্থির করে ফেলেছেন, এ-সময়ে কাউকে কিছু না বলাই ভাল। ইশারায় তিনি শেষবারের মতো নির্দেশ দিলে বোটগুলো সমুদ্রে দুলে উঠল।

তিনি নির্দেশ দিলেন, সাবধানে এগুবে। তেল ছড়িয়ে পড়ছে চারপাশে। আগুন বাঁচিয়ে বোট সামনে নিয়ে যাবে। একটা বোট থাকবে। আর একটা বোট চলে আসবে। দরকার হলে আরও লোকজন যাবে। তিনি নিজে যেতে পারলে ভাল করতেন। কিন্তু চিফ-মেট স্যামুয়েল বার বার এ-অভিযানে কর্তৃত্ব চাইছে। এ-সব ঘটনা পৃথিবীর সব কাগজগুলোতে ছাপা হয়ে যায়। কারণ এক দুর্ধর্ষ অভিযান এটা। চিফ-মেট জাহাজের খুব কাছ থেকে দেখবে সব। এবং যেন সিউল-ব্যাংক থাকল বেস-ক্যাম্পের মতো। দরকার মতো সব চেয়ে পাঠানো হবে। যদি কেউ ইতিমধ্যে সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়ে থাকে তাদের তুলে আনা, তাদের দেখাশোনা, সেবাশুশ্রূষা, সামনে অনেক কাজ, তিনি বনির কাঁধে হাত রেখে বললেন, যাদের উদ্ধার করা হবে তাদের তুমি দেখাশোনা করবে জ্যাক। খুব একটা বড় কাজ তোমাকে দেওয়া গেল।

তারপর তিনি পাইপে আগুন জ্বালালেন। কি নিথর সমুদ্র! আর নির্জনতা। সমুদ্র এতটুকু ফুঁসছে না। সামান্য যেটুকু ঢেউ আছে, অস্পষ্ট অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না। আর দূরে সেই অগ্নিকাণ্ড। একটা দিক জাহাজের এখনও অক্ষত। ওখানে যদি সব নাবিকেরা আশ্রয় নিয়ে থাকে। এবং উদ্ধারের আশায় বসে থাকে। যারা পুড়ে গেছে এবং অর্ধদগ্ধ তাদের জন্য সব রকমের ব্যবস্থা, কফিন এবং ফার্স্ট-এড সবকিছু তাঁর চিন্তা-ভাবনার ভেতর রাখতে হচ্ছে।

এরপর সিউল-ব্যাংকের সার্চলাইট জ্বেলে দেওয়া হল। যতক্ষণ বোটগুলো দেখা যাচ্ছে তাদের সামনে পেছনে সার্চ-লাইটের আলো ফেলা হতে থাকল। ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সর্বত্র এখন আলো ফেলে মহাসমুদ্রে মানুষ খোঁজাখুঁজি চলছে।

জ্যাক দাঁড়িয়ে ছিল ব্রীজে। আরও অনেকে ব্রীজে এসে জড়ো হচ্ছে। কোনো বাধানিষেধ কেউ মানছে না। দূরে জল কেটে হাঁসের মতো দুটো বোট ভেসে যাচ্ছে। কেউ কেউ দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছিল। ছোটবাবু নুয়ে কি সব করছে! বোধহয় সমুদ্রের জল হাতের কাছে বলে সর্বত্র দু'হাতে জল ছিটিয়ে দিচ্ছে। সব আগুনের ফুলকি, ঠিক ফুলকি বলা যায় না, কিছুটা পদ্মকলির মতো ছোট ছোট আগুনের শিখা, ঢেউ খেয়ে জ্বলছে নিভছে। অজস্র বয়ার আলোর মতো, খুব তীব্র গতিতে বোটগুলো ঢেউ ভেঙে খান খান করে এগিয়ে যাচ্ছে। এবং যারা ব্রীজে অথবা নিচে বোট-ডেকে অথবা আরও নিচে টুইন-ডেকে ছোটাছুটি করছে তারাও বসে নেই। কেবল দেখছে কোথাও কালো বিন্দুর মতো অথবা সাদা লাইফ-জ্যাকেট ভাসছে কিনা! দেখলেই তিন নম্বর বোটের ডাক পড়বে। যদিও বোটের সব লোকজন ঠিক করা থাকে, যেমন কে কোন বোটে জাহাজডুবির সময় উঠে যাবে ঠিক থাকে কিন্তু যখন জাহাজডুবি না হয়ে উদ্ধারকারী হয়ে যায় তারা, তখন সব কাপ্তানের মরজি। কে যাবে, কে যাবে না বলে দেবেন তিনি। সুতরাং যারা যাবার জন্য প্রস্তুত ছিল অথচ যেতে পারে নি, কারণ এ-সব ভয়াবহ সময়ে অনেকে কেমন আত্মত্যাগের জন্য অনুপ্রাণিত হয়ে পড়ে—সুতরাং যেতে না পারায় হতাশ মানুষের মতো দাঁড়িয়ে দেখছে, যেন বিন্দুর মতো কিছু সমুদ্রে ভেসে গেলেই বোট নিয়ে এগিয়ে যাওয়া। কিছু একটা না করা পর্যন্ত স্বস্তি নেই যেন।

এটাই হয়ে থাকে, নিশীতে মহাসমুদ্র এক অতিকায় দুয়ে রহস্য, এবং ভেতরে মহামায়া অর্থাৎ এই সব আগুনের ভেতর কঠিন কিছু আবিষ্কারের নেশায় পেয়ে যায়। তখন কিছুটা সবাই বেহুঁশ, মাথা ঠিক রাখা, মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করা খুবই কঠিন। কঠিন বলে স্যালি হিগিনসের এতটুকু অস্থিরতা নেই চলা-ফেরাতে। বরং জ্যাককে এখন সমুদ্রের সব প্রাচীন ইতিহাস শোনাবার জন্য, যেমন বলতে পারেন আফ্রিকা এবং এশিয়া একসময় একই মহাদেশ ছিল। অথবা তুষার যুগের আগের ঘটনা বলার সময় তখনকার গাছপালা কেমন ছিল বলবেন। প্রাচীন সব অতিকায় হাতির ফসিল আবিষ্কারের গল্প বলবেন এবং যেন তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন, সাইবেরিয়া অঞ্চল তখন তুষারাবৃত ছিল না। সব ঘাস তরুলতা এবং বন্য প্রাণীরা

চরে বেড়াচ্ছে, তারপর সহসা সেই তুষার ঝড়। তুষারপাত বছরের পর বছর। এবং সেই মদ্দা হাতির শুঁড় তুলে ছোটা, ছুটতে ছুটতে এক সময়ে খাদের ভিতর ক্রমে তুষারে ঢাকা পড়ে যাওয়া। হিম হয়ে যাওয়া। রক্ত মাংস সব একেবারে ফ্রিজ। এমন অজস্র হাতির পালের গল্প, উট বন্য বরাহের গল্প, খরগোশের গল্প তিনি একের পর এক অনায়াসে যেন বলে যেতে পারেন। কোথায় কোন জাহাজে আগুন লেগেছে উদ্ধারকারীর দল এগিয়ে যাচ্ছে, তিনি বেস-ক্যাম্পে প্রতীক্ষায় আছেন খবর আসবে—আরও সাহায্য চাই, দড়িদড়া চাই, গ্যাস-সিলিণ্ডার চাই, তার জন্য এতটুকু ভ্রুক্ষেপ নেই। এমনই মানুষ যখন স্যালি হিগিনস তখন চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে রেডিও-অফিসার, স্যার, শিগগির আসুন। দেখে যান কি কাণ্ড!

স্যালি হিগিনস কেবিন থেকে ছুটে বের হয়ে ব্রীজের রেলিঙে ঝুঁকে পড়লেন। এটা কি দেখতে পাচ্ছেন? এটা কেন হচ্ছে? চারপাশের সেই সব খণ্ড খণ্ড আগুন সহসা নিভে গেছে। কোথাও আগুন নেই। কেবল সেই অর্ধদগ্ধ জাহাজ তিনি দেখতে পাচ্ছেন। যত দূর সম্ভব সার্চ-লাইট ফেলে দেখলেন বোট দু'টো দেখা যাচ্ছে না। জাহাজটা তো কাছেই জ্বলছিল। এখন মনে হচ্ছে জাহাজটা তেমন কাছে নেই, বেশ দূরে সরে যাচ্ছে।

রেডিও-অফিসার বলল, স্যার কি হবে?

নিচে তখন চেঁচামেচি সোরগোল। আগুন-লাগা জাহাজটাকে কিছুতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বোট দেখা যাচ্ছে না, এমন সব চিৎকার ভেসে আসছিল। এনজিন-রুমে স্ট্যাণ্ড-বাই আর্চি, থার্ড-এঞ্জিনীয়ার। বয়লার- রুমে আছে মৈত্র, তিনজন ফায়ারম্যান। বাংকারে তেমনি ঝুপ ঝুপ কয়লা ফেলার শব্দ। আর এইসব হট্টগোলের ভেতর হিগিনস বুঝতে পারলেন না জাহাজের আগুন এভাবে ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে কেন। তিনি ঘড়ি দেখলেন, দু'টো বেজে গেছে। এক ঘণ্টার মতো বোট সমুদ্রে ভেসে গেছে। সার্চ-লাইটের আওতায় হয়তো বোট নেই, কাজেই খুব ভয়ের নয় বোট না দেখা। কিন্তু তাঁকে যা ভীষণ চিন্তিত করছে, জাহাজটা ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে। দূরে সরে যাচ্ছে, না আগুন ধীরে ধীরে নিভে যাচ্ছে কোনটা? কারণ এত দূর থেকে কিছুই সঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

তিনি সহজভাবে বললেন, হ্যালো এনজিন-রুম। মাউথ-পাইপের সামনে মুখ রেখে বলে গেলেন, এনজিন-রুমে আর্চি কান পেতে শুনছে—তিনি বলছেন তখনও, একটা আশ্চর্য ব্যাপার আর্চি, জাহাজের আগুন কমে আসছে, বোটগুলো দেখা যাচ্ছে না। মনে হচ্ছে এগোনো দরকার। তারপর আর্চির জবাবের জন্য অপেক্ষা না করে ঘড়ির কাঁটা ঘুরিয়ে দেবার মতো টেলিগ্রামের কাঁটা ঘুরিয়ে দিলেন। এনজিন- রুমে কাঁটা ঘুরে এস্টার্ন থেকে এ-হেডে চলে এল। তারপর কাঁটা 'ফুল' এই নামাঙ্কিত শব্দের ওপর আটকে তির্ তির্ করে কাঁপতে থাকল। সঙ্গে সঙ্গে আর্চি লিভার টেনে ধরল। এনজিন গর্জে উঠল। প্রপেলার-স্যাফট ধীরে ধীরে তারপর সামান্য দ্রুত তারপর আরও দ্রুত ক্রমে ক্র্যাংক-ওয়েভগুলো চরকিবাজির মতো ঘুরতে ঘুরতে একটা গোলাকার বৃত্ত হয়ে গেল। সিউল-ব্যাংক ফুল স্পীডে আবার সমুদ্রে এগিয়ে যাচ্ছে।

তখন ডেবিড কেমন হুঁশ ফিরে পাবার মতো বলল, কী ব্যাপার বল তো?

ছোটবাবু বলল, কী?

—কিছু বুঝতে পারছ না?

—না তো।

–দেড় ঘণ্টা বোট চালিয়ে কোথায় এলাম?

—কেন, কি হয়েছে?

—দেখছ না চারপাশে কিছু দেখা যাচ্ছে না?

—ছোটবাবু বলল, তাই তো!

—আমাদের জাহাজটা দেখতে পাচ্ছ?

অনেক দুরে ছোট্ট একটা ভেলার মতো দেখা যাচ্ছে সিউল-ব্যাংক। খুব ছোট। ছোটবাবু বলল, ঐ তো সিউল-ব্যাংক। তারপর আতঙ্কে ফেটে পড়ল সে, আমাদের দু'নম্বর বোট?

–দেখা যাচ্ছে না।

ডেবিড এবার ছেলেমানুষের মতো অন্ধকার সমুদ্রে চিৎকার করে উঠল, মি. স্যামুয়েল? তোমরা কোথায়?

কোনো সাড়া নেই। সমুদ্রে জোরে চিৎকার করলে অনেক দূরে সেই শব্দ ভেসে ভেসে যায়। কিন্তু মোটর-বোটের শব্দে সে কিছু শুনতে নাও পারে। ডেবিড এবার বোট থামিয়ে জলের কাছে ঝুঁকে থাকল। যদি দু'নম্বর বোটের শব্দ কানে ভেসে আসে।

মান্নান বলল, এই চঁইয়া হইছে কি কও?

ছোটবাবু বলল, কিছু হয় নি। ডেবিডের মুখ দেখে ওরাও একটা কিছু আন্দাজ করতে পারছে। কিন্তু ডেবিড এবং তার ইংরেজী কথাবার্তা বিন্দুবিসর্গ বুঝতে না পেরে মান্নান ক্ষেপে যাচ্ছে।

ডেবিড বলল, এত দূর এলাম অথচ দ্যাখো মনে হচ্ছে বোট একেবারে এগোচ্ছে না। বোটের প্রপেলার কতটা ঘুরছে দেখার জন্য সে ঝুঁকে পড়ল, এবং সমুদ্রে বেশ দ্রুত জল কেটে বোট যে এগিয়ে যাচ্ছে বোঝাই যায় এবং ওরা যে অনেকটা পথ চলে এসেছে পেছনে তাকালে সেটা আরও স্পষ্ট, এবং সিউল-ব্যাংক ক্রমে দূরে সরে যাচ্ছে, জাহাজের আগুনও ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে, আরও কিছু সময় চালিয়ে দেখা দরকার। এবং এক সময়ে মান্নান আর ধৈর্য ধরতে না পেরে বলল, ছোটবাবু তুমি কি মিঞা, কোনখানে নিয়া আইলা!

ছোটবাবুর বুকটা কেঁপে উঠল। সিউল-ব্যাংক ওদের দৃষ্টির বাইরে কখন চলে গেছে! যত ডিগ্রিতে বোট চালিয়ে এসেছে ঠিক তার বিপরীতমুখী গেলে সিউল-ব্যাংক জাহাজে পৌঁছানো যাবে। তবু ভয়ে কেমন সে গুটিয়ে গেল এবং তখনই দেখল সেই সমুদ্রে অতিকায় অগ্নিকাণ্ড যা তাদের নানা প্রলোভনে ফেলে এত দূরে নিয়ে এসেছে, নিমেষে সহসা দিগন্তের আকাশ আলোকোজ্জ্বল বর্ণমালায় ভরে দিয়ে সমুদ্রগর্ভে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর কিছু থাকল না। কেবল অন্ধকার চারপাশে আর সমুদ্রে সেই উজ্জ্বল ফসফরাস অথবা নানা বর্ণের ছোট ছোট অতি-ছোট সব মাছ। শুঁড় আছে এবং কুচো চিংড়ির মতো মাছের মুখে অজস্র লাল নীল আলো। যেন আকাশের মতো নানা নক্ষত্রমালায় সমুদ্র সেজে আছে। এ- হেন সময়ে ডেবিড এবং ছোটবাবু কি করবে বুঝতে পারল না। ঠায় বসে থাকল অন্ধকারে। কেবল মাঝে মাঝে ডেবিড চিৎকার করছে, মি. স্যামুয়েল আমরা এখন কি করবো? যেন সে তার চিৎকার সুদূর সেই অদৃশ্য জাহাজে পৌঁছে দিতে চাইছে। স্যালি হিগিনস আমরা কোথায় এলাম? অন্ধকার সমুদ্রে সেই চিৎকার ভেসে যাচ্ছে।

ছোটবাবু বলল, বোট ফেরাও।

কম্পাসের কাঁটা দেখে ডেবিড বোট ঘুরিয়ে দিল। এভাবে বোট গেলে ঘণ্টা দু-একের ভেতর ওরা সিউল-ব্যাংক জাহাজে পৌঁছে যাবে। এবং এখন জাহাজ, আগুন, সমুদ্রগর্ভে তার অন্তর্হিত হওয়া কেমন ভীতির সঞ্চার করছে। ওরা চুপচাপ, একটা কথাও বলতে পারছে না, আরও সব রহস্যময় ঘটনা যে ঘটবে না কে বলবে। এবং মনে হচ্ছিল, ভোঁস করে হয়তো একটা অতিকায় তিমি ভেসে উঠবে, অথবা একটা নয়, একপাল, অথবা এমন গভীর সমুদ্রে সামান্য একটা বোট, কত যে অসহায়, ছোটবাবু প্রথম টের পেয়ে খুব ভারী গলায় বলল, ডেবিড শেষ পর্যন্ত আমরা ফিরতে পারবো তো?

.

আর সেই মধ্যযামিনীতে জাহাজে যেন একটা তোলপাড় আরম্ভ হয়ে গেল। বয়লার-রুমে

দু'বার ছুটে এসেছে মেজ-মিস্ত্রি আর্চি। জাহাজ একবার এস্টার্ন একবার এ-হেড অর্থাৎ নেভিগেশানে কোথাও কিছু গণ্ডগোল, কখনও স্লো কখনও হাফ, কখনও ফুল, কি যে ছাই মাথামুণ্ডু সব ঘটনা। এখন খবর এসেছে যত জোরে পারো এ-সমুদ্র থেকে পালাও। ফায়ারম্যানদের চোখ-মুখ ধকধক করে জ্বলছে। স্টিম কিছুতেই উঠছে না। মৈত্র বার বার ছুটে যাচ্ছে। বয়লার গেজ দেখছে, ঠিক স্টিম না উঠলে সে নিজে জোর করে কেড়ে নিচ্ছে স্লাইস। একেবারে বয়লারের পেটে ঢুকিয়ে আগুন উল্টে-পাল্টে দিচ্ছে এবং লেলিহান সেই আগুন ফঁস করে বের হয়ে আসছে। মৈত্রের হাতের শিরা উপশিরা এবং অমানুষিক চোখ মুখ দেখলেই বোঝা যায় ঠিক ঠিক বয়লার স্টিম না দিলে একেবারে গলা টিপে ধরবে। রাশি রাশি কয়লা ফার্নেসে, তিন তিনটে বয়লারের ন'টা ফার্নেসে আগুন জ্বলছে। প্রায় সেই আগুন ভয়াবহ আর এক অগ্নিকাণ্ডের মতো। এবং তখনই মৈত্র দেখল যথাযথ স্টিম-গেজের কাঁটা লাল দাগটাতে এসে কাঁপছে।

স্যালি হিগিনস তখনও ব্রীজে পায়চারি করছেন। রেডিও-অফিসার জেগে আছে। এখনও ট্রান্সমিটারে কোনো খবর নেই। একেবারে ঠাণ্ডা। নব্ ঘোরালে দূরবর্তী কোনো বেতার থেকে গানবাজনা ভেসে আসছে। কোনোটা সুদূর দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল থেকে, কোনোটা আবার শৌখিন বেতারবিদ্ পৃথিবীর যে কোনো জায়গায় তার শখের খবর পৌঁছে দেবার চেষ্টা করছে। এতে করে রেডিও-অফিসার বুঝতে পারছে বেতারযন্ত্রটি ঠিক আছে—কোনো গণ্ডগোল নেই। যা কিছু গণ্ডগোল এই সমুদ্রের অথবা আবহাওয়া কোনো কারণে দূষিত হয়ে আছে। এমন সব আজগুবি চিন্তায় মাথাটা তার ক্রমে খারাপ হয়ে যাচ্ছে।

আর তখনই মনে হল দূরে অন্ধকার সমুদ্রে একটা আলো ভেসে আসছে। দূরবর্তী মাঠে একজন নিশীথের মানুষ যেভাবে হাতে লণ্ঠন নিয়ে হেঁটে যায়, তেমনিভাবে খুব ধীরে ধীরে আলোটা দুলছে সমুদ্রে। তিনি বুঝতে পারলেন একটা বোট আসছে। কিন্তু আর একটা বোট? তাকে আশেপাশে কোথাও দেখা গেল না। যেমন এসব সময়ে জাহাজ থামিয়ে দেওয়ার কথা থাকে, বোট এলে সব লোকজন তুলে নেবার কথা থাকে তেমনি তিনি তাদের তুলে নেবেন বলে জাহাজ থামিয়ে দেবার জন্য টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিলেন নিচে। জাহাজ আবার থেমে গেল। ঘড়িতে দেখলেন তিনটে বেজে গেছে।

দড়ির সিঁড়ি নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। প্রথমে এক এক করে সব জাহাজি, শেষে ফাইভার এবং চিফ- মেট উঠে এল। ওদের পোশাক জলে ভিজে গেছে। এবং ওরা কেউ একটা কথা বলতে পারছিল না। ওরা আস্তানায় ফিরে আসতে পেরেছে শেষ পর্যন্ত। এখন শুধু বিশ্রাম। ভীষণ একটা ভয়াবহ উত্তেজনা থেকে রেহাই পেলে যা হয়ে থাকে, গলা বুজে আসছে কথা বলতে। চিফ-মেট রিপোর্ট করছে সব। এক নম্বর বোট তো ওদের সঙ্গেই ফিরে আসার কথা, চিফ বলল, সে এক নম্বর বোটের খবর জানে না।

বোট-ডেকে আবার জটলা। সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। স্যালি হিগিনস এখন কি করবেন বুঝতে পারছেন না। তবু শান্ত গলায় বললেন, আপনারা যান। আমাদের এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। জাহাজ এখানেই থামিয়ে রাখা হোক। ওরা ঠিক ফিরে আসবে। ভয়ের কিছু নেই।

একে একে আবার বোট-ডেক খালি হয়ে গেল। দু'জন ওয়াচে রয়েছে সামনে পেছনে। ব্রীজে স্যালি হিগিনস নিজে থাকছেন। চিফ-মেটকে তিনি ছেড়ে দিলেন। আর যারা বোটে ছিল তাদের ছুটি। স্যালি হিগিনস দেখলেন একমাত্র একজন এখনও বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে আছে। সে কেবিনে ফিরে যাচ্ছে না। তিনি তার কাছে গিয়ে বললেন, বনি, এবার শুয়ে পড়। রাত জেগে শরীর খারাপ করবে না।

না আর একজনও আছেন। স্যালি হিগিনস আরও নিচে ঠিক টুইন-ডেকে দেখলেন এনজিন-সারেঙ দাঁড়িয়ে আছেন। রেলিঙে ভর করে দূরের সমুদ্রে কিছু কেবল অনুসন্ধান করছেন।

হিগিনস ওপরে ব্রীজে উঠে যাবেন ভাবলেন। চিফ-মেটের সঙ্গে আরও সব কথাবার্তা ছিল। কখন কিভাবে ছাড়াছাড়ি হয়, কখন ওরা কিভাবে বুঝতে পারল, বোট চালিয়ে কিছুতেই আগুনের কাছাকাছি পৌঁছাতে পারছে না। তারা এমন কিছু দেখেছে কিনা যাতে মনে হতে পারে অস্বাভাবিক কিছু। শয়তানের হাত যদি থেকে থাকে, অথবা এমন কিছু দেখেছে কিনা, যাতে মনে হওয়া স্বাভাবিক যথার্থই জাহাজডুবি। তিনি সিঁড়ি ধরে উঠে যাবার সময় এসব মনে করতে পারলেন। কিন্তু এখন সবাইকে অহেতুক ভয়ের ভেতরে রেখে কাজ নেই। বরং খুব স্বাভাবিকভাবে তিনি উঠে গেলেন ওপরে। যেন তিনি ওপরে উঠে ঘুমিয়ে পড়বেন। এক নম্বর বোট যেন কথা আছে যথাসময়ে ফিরে আসবে—চিফ-মেটকে জাগিয়ে রেখে দরকার নেই। অথবা এও হতে পারে খুব বেশী তিনি গুরুত্ব দিতে চাইছেন না, কারণ তিনি জানেন এখন একমাত্র তাঁর চিন্তা এক নম্বর বোটের মানুষগুলো সম্পর্কে। ওরা ফিরে না আসা পর্যন্ত তিনি আর কিছু ভাবতে পারবেন না। যদি ওরা আকাশে রকেট ছুঁড়ে সিগন্যালিং করে সেই আশায় তিনি ব্রীজে উঠে যাচ্ছেন।

আর তখনই মনে হল একটা লম্বা ছায়া ওঁর পেছনে চলে আসছে। নিশুতি রাতে জাহাজ সমুদ্রে থেমে আছে। চারপাশে শুধু কালো অন্ধকার। এবং এত বেশী নির্জনতা জাহাজে যে কেউ সিঁড়িতে পা রাখলে পর্যন্ত টের পাওয়া যায়। তিনি শুধু ছায়া দেখে চমকে উঠলেন। বোধ হয় জোরে হাই বলে চিৎকার করে উঠতেন, কিন্তু চোখ ফিরিয়ে দেখলেন, বনি ওঁর পেছনে পেছনে উঠে আসছে।

তিনি বিরক্ত গলায় বললেন, তোমাকে শুয়ে পড়তে বললাম। ওপরে উঠে আসছো কেন?

বনি বলল, বাবা!

স্যালি হিগিনস সিঁড়ির এক ধাপ ওপরে। এক ধাপ নিচে বনি। মুখোমুখি দু'জন এবং অজস্র নক্ষত্র তেমনি আকাশে জ্বলছে। দু'জনের মুখে উইংসের আলো দুলছে। ভেবেছিলেন আরও ভারী গলায় বনিকে কেবিনে ফিরে যেতে বলতে পারবেন। কিন্তু তার মুখ দেখে শেষে আর তা বলতে পারলেন না। তিনি আবার উঠে যেতে লাগলেন এবং ব্রীজের ভেতর ঢুকে যাবার আগে বললেন, বনি আমাকে কিছু বলবে!

—বাবা!

স্যালি হিগিনস বললেন, বোস।

চারপাশে কাঁচে মোড়া বলে এখানে বসলে জাহাজের সবটা দেখা যায়। এবং জাহাজের সবচেয়ে ওপরে বলে তিনি খুব দূরে যত দূরেই হোক সমুদ্রের কোথাও যেন আগুনের ফুলকি দেখলে বুঝতে পারবেন এক নম্বর বোট ফিরে আসছে।

বনি বসল না। বাবার সামনে দাঁড়িয়ে থাকল।

স্যালি হিগিনস একপাশে ঝুঁকে কি দেখলেন! আকাশের একটা নক্ষত্র দিগন্তের নিচে ঝুলে আছে। এত নিচে যে মনে হয় আলোর ফুলকির মতো। আর সমুদ্রে সামান্য ঢেউ আছে বলে নক্ষত্রটা একবার দেখা যাচ্ছে একবার দেখা যাচ্ছে না। তিনি বোটের আলো ভেবে এগিয়ে গিয়েছিলেন। যখন বুঝতে পারলেন ওটা আলো নয় নক্ষত্র, জলের ওপর নিচে ভেসে ভেসে খেলা করছে তখন কম্পাসের ওপর ভর করে ডাকলেন, বনি।

বনি কাছে এলে বললেন, কিছু করার নেই। এখন শুধু অপেক্ষা করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। আর তিনি আছেন, তিনি বলতে সেই ঈশ্বরের পুত্রের কথা বলতে চাইলেন স্যালি হিগিনস

বনি বাবাকে আর একটা কথাও বলতে পারল না। সে যে এসেছিল অনেক কথা বলবে বলে!–বাবা, যদি বোটে কেউ হারিয়ে যায় কি হবে, ওরা দ্বীপ-টিপ পাবে না! ওরা কোথাও একটা ডাঙা পেয়ে যাবে তো! বাবা, কাছাকাছি কি কি দ্বীপ আছে? যদি কোনো স্রোতের মুখে পড়ে যায় বাবা। আচ্ছা বাবা, সমুদ্রে বোট হারিয়ে গেলে তাদের কি কি কষ্ট হতে পারে। জল

ফুরিয়ে গেলে কি হবে? খাবার?

স্যালি হিগিনস সহসা দেখলেন, বনি আর ব্রীজে নেই। প্রথমে ভাবলেন বোধ হয় ওর কেবিনে ফিরে গেছে। কিন্তু কেবিনে ফিরে গেলে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ পেতেন। কোথায় গেল! তিনি ব্রীজের এদিক- ওদিক চার্ট-রুম এবং পাশে নিজের কেবিনে উঁকি দিতেই দেখলেন মেয়ে তাঁর যীশুর পায়ের নিচে হাঁটু মুড়ে বসে আছে। এবং দু'পায়ে বনির কপাল ঠেকে আছে। এমন ভঙ্গীতে তিনি বনিকে বসে থাকতে দেখে বুঝতে পারলেন, ছোটবাবু এখন বনির সব। ছোটবাবু এখন বনির সব। এই সব শব্দ তাঁর বুকের ভেতর থেকে বার বার উঠে আসতে থাকল। তিনি বুঝি আর বনির কেউ নন—তার চোখ জলে চিকচিক করছে।

এখন থেকে বনির জীবনে ছোটবাবু সব। এবং এসব বুঝতে পারলেই ভেতরের কষ্টটা বেড়ে যায় চুপচাপ বসে থাকেন ব্রীজে। চোখ ভীষণ উদাসীন হয়ে যায়। পৃথিবীতে এত বড় একটা কষ্ট আছে মানুষের তিনি যেন জাহাজে এটা ক্রমে বুঝতে পারছেন। তারপর কেন যে তিনি ছোটবাবুর ওপর ক্ষেপে যান, যেন শুধু এ জাহাজে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেবলমাত্র লুকেনার নয় অথবা এই যে নিশীথে জাহাজ সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে এবং একটা বোটের সন্ধান এখনও নেই, যেন না থাকাই ভাল, তিনি মনে মনে ছোটবাবুকে সমুদ্রে ফেলে যেতে পারলে বোধ হয় সবচেয়ে খুশী হতে পারতেন। নির্ভর করার মতো ছিল তাঁর সামান্য একটা মেয়ে, কোথাকার কে ছোটবাবু জাহাজে এসে তাঁর কাছ থেকে তাও কেড়ে নিচ্ছে।

এতদিন যা তিনি ভেবেছেন, মেয়েটার নানারকমের আবদার শুধু তিনি মেটাচ্ছেন, ছোটবাবুর হয়ে বনির কথাবার্তা সব একজন সমবয়সী মানুষের জন্য দুঃখবোধ আর কিছু না এবং এ বয়সে বনি যদি জাহাজে কোনো প্লে-মেট খুঁজে না পায় তবে নানা কারণে ওর নিজের জীবনই যেন বনি অতিষ্ঠ করে তুলত। প্রায় সেই জেদ থেকে আত্মরক্ষার নিমিত্ত সব সহ্য করে গেছেন—এখন সেই অপোগণ্ড ছোটবাবু তাঁর নাড়ি ধরে টান দিয়েছে। যেন এখুনি তিনি ফের টেলিগ্রাম পাঠাতে পারলে বাঁচতেন, মুভ এ-হেড নিখোঁজ বোটের জন্য আমাদের বসে থাকলে চলবে না। ক্যাপ্টেন লুকেনার সমুদ্রে আবার তাঁর হাত বাড়িয়েছেন।

কিন্তু তিনি জানেন তাঁর নাম স্যালি হিগিনস। নিজের এই নামটির প্রতি তিনি অতিশয় মোহগ্রস্ত এবং ভেতরে ভেতরে এক আশ্চর্য ধর্মবোধ যা বয়স বাড়ার সঙ্গে বাড়ছে। এবং কর্তব্যপরায়ণ মানুষ হিসেবেই তাঁকে এখন যেন ছোটবাবুকে জাহাজে তুলে নিতে হবে। যতটা সতর্ক ছিলেন এখন তার চেয়ে বেশি সতর্ক। সার্চ-লাইট জ্বালিয়ে রেখেছেন সামনে। ওয়াচম্যান বার বার চারপাশে আলো ফেলে দেখে যাচ্ছে এবং সেই আলো দূরবর্তী সমুদ্রে যদি দৃশ্যমান হয় বোট তবে ঠিক ঠিক দেখে ফেলবে, ঐ যে জাহাজের আলো। এবং এটা ঠিক রাতে যতটা সুবিধাজনক জাহাজে ফিরে আসা,.সকাল হয়ে গেলে সে সুবিধা থাকে না। রোদ উঠলে সমুদ্র ঝলসে যাবে। কারণ যত ইকুয়েডরের দিকে জাহাজ উঠে যাবে তত সমুদ্র তেতে উঠবে। তত সমুদ্র ইস্পাতের মতো রং ধরবে। সাদা জাহাজের রং আর সমুদ্রের রং প্রায় কখনও কখনও এক হয়ে গেলে ওরা কাছাকাছি চলে এলেও স্থির করতে পারবে না জাহাজটা কোথায়!

এ-ভাবে যত সময় যেতে থাকল ক্রমে তত তিনি অস্থির হয়ে উঠছেন। কি করবেন ঠিক বুঝতে পারছেন না। এ-ভাবে জাহাজ থামিয়ে অপেক্ষা করা ঠিক হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছেন না। চারপাশে শুধু গভীর অন্ধকার, আর কিছু নক্ষত্র মাথার ওপর এবং দূরে সমুদ্র তেমনি প্রবলভাবে ফুঁসছে। আর মনে হয় তখন সব অদৃশ্য শয়তানেরা সমুদ্রের ওপর হাত তুলে দিচ্ছে। তারা এগিয়ে আসছে। তারা যেন ওঁর গলা টিপে ধরবে এবার। অথচ তিনি চুপচাপ বসে পাইপ টানছেন। পাশে কোয়ার্টার-মাস্টার, হুইলের পাশে স্ট্যাণ্ড-বাই। নড়ছে না। সেই প্রাচীন মমির মতো তার মুখ।

সামান্য বোটের জন্য এ সমুদ্রে অপেক্ষা করা ঠিক হচ্ছে কিনা বুঝতে পারছেন না। সামান্য ক'জন জাহাজির জন্য জাহাজটা যদি আবার নতুন দুর্ঘটনায় পড়ে যায়। ক্যাপ্টেন লুকেনার

এবং তাঁর অশুভ প্রভাব তো সুযোগের অপেক্ষায় থাকে। এমন একটা সুযোগ হেলায় ছেড়ে দেবেন তিনি হিগিনস কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছেন না।

অথবা এই যে আগুন, আগুনের ফুলকি, ট্র্যান্সমিটারে ভৌতিক সব আর্তনাদ, এবং সহসা সব আবার হাওয়া, সবই সেই ক্যাপ্টেন লুকেনারের ছলনা নয় কে বলবে! সেই ধূর্ত মানুষটির অশুভ প্রভাবে জাহাজ কখন যে আবার অস্থির হয়ে উঠবে। ঠিক কিউ-টি-জি পাওয়া যাবে না, এবং টি-আর ধরা যাবে না। অথবা নিশিদিন সমুদ্রে ঘুরিয়ে মারার যে স্বভাব ওঁর রক্তে আছে—যদি আবার সবই এক এক করে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, তিনি কি করবেন! দুঃর্ভাবনায় তিনি ক্রমে অস্থির হয়ে উঠছেন। কখনও পায়চারি করছেন পাগলের মতো। আবার কখনও মাথার চুল ছিঁড়ছেন, এমনভাবে দু'হাতে তিনি চুল টানছেন মাথার। কারণ জাহাজ সিউল-ব্যাংক কখনও এত ধূর্ত হয়ে যায়, ওর কম্পাসে ম্যাগনেটিক কারণে এত বেশি গণ্ডগোল থাকে যে তিনি দেখেছেন বার বার কম্পাস পাল্টেও কিছু হয়নি, এবং এমন যে জাইরো-কম্পাস যার তুলনা নেই, তাও কেমন ঠিকঠাক তখন কাজ করে না। এবং এ-সব মনে হলে তাঁর বুঝতে অসুবিধা হয় না, সবই সেই ধূর্ত মানুষটির কাজ। তাঁর অশুভ প্রভাব ঠিক ঠিক কাজ করে যাচ্ছে।

আবার ভেবেছেন কখনও, হয়তো জাহাজের ভেতরে আছে সব রকমারি ইস্পাতের স্তর সাজানো, পুরানো আমলের কারিগরেরা এমন সব ইস্পাতের ব্যবহার রেখেছেন যার স্বভাব জানা ছিল একমাত্র ক্যাপ্টেন লুকেনারের। স্যালি হিগিনসও দীর্ঘদিনের সফরে জেনে ফেলেছেন, জটিল-প্লাস মাইনাসের একটা অতি সূক্ষ্ম ব্যবহার আছে। ওটা ধরতে না পারলেই সব গেল। আর সবটা যে শুধু অংকের ব্যাপার, কে বলবে। কিছু অনুভূতি। আবার মনে হয় বিশ্বাস রাখা দরকার জাহাজের ওপর, ভালোবাসার দরকার, সব মিলিয়ে জাহাজটা চলে। ভালবাসা না পেলে জাহাজটা চলে না।

জাহাজটা যত বিশ্বাসী হয়ে উঠছে, প্রিয় হয়ে উঠছে, তত সেই অশুভ প্রভাব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছে। তিনি বুঝতে পারছেন, এই শেষ সফরে তাঁর সর্বস্ব গ্রাস করতে চায় সে।

পায়চারি করতে করতে ক্যাপ্টেন লুকেনারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাঁর বেড়ে যায়। তিনি চিৎকার করে বলতে চাইলেন, মিঃ লুকেনার, আমি জাহাজ ঠিক বন্দরে পৌঁছে দেব। আপনি কিছুতেই আমাকে ঘাবড়ে দিতে পারবেন না।

তারপর ভাবলেন নিশীথে ভয় পেয়ে তিনি কি অদ্ভুত সব আজেবাজে কথা বলছেন! নিজের ওপর আর বিশ্বাস রাখতে পারছেন না! আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখতে পেলেন সেই দৃশ্য! এলিস অন্ধকারে রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে। পাশে একজন লম্বা মত মানুষ। যার মুখ দেখা যায় না।

সহসা তিনি চিৎকার করে উঠলেন, কোয়ার্টার-মাস্টার!

—ইয়েস স্যার।

—স্টার-বোর্ড সাইডে দ্যাখো। কিছু দেখতে পাচ্ছ?

—না তো স্যার!

আবার তিনি ডেক-চেয়ারে বসে পড়লেন। বোট সমুদ্রে দেখা যাচ্ছে না। না আকাশে কোনো রকেটের ফুলঝুরি। ওরা অন্তত আকাশে রকেট ছুঁড়ে তাঁদের অবস্থান বলে দিতে পারত। আসলে বোধ হয় ওরাও সেই অশুভ প্রভাবের পাল্লায় পড়ে গেছে। যেমন এলিস জাহাজে উঠে পড়ে গিয়েছিল। তিনি কিছুতেই তাকে রক্ষা করতে পারেন নি।

॥ উনচল্লিশ ॥

এবং এভাবে একজন মানুষ স্মৃতি-বিস্মৃতির জটিলতায় তলিয়ে যাচ্ছিলেন। যতই অবিশ্বাস করতে চান সবকিছু তত যেন তাঁকে পেয়ে বসে, তত তিনি রহস্যজনক কথাবার্তা শুনতে পান। —তুমি কতটুকু জানো! তুমি যা জানো তার কতটা তুমি বিশ্বাস কর। যা তুমি জান না, যা তুমি বুঝতে পার না তাকে তুমি অবিশ্বাস করবে কি করে! আবার মনে হয় কেউ হাসছে। ওঁর নির্বোধের মত চোখমুখ দেখলেই কেউ হাসছে। যখন ভেবে কুলকিনারা পান না, কেবল হাতড়ে বেড়ান তখন যদি ওঁর বোকামি দেখে কেউ হেসে ফেলে তিনি কি করতে পারেন! মাঝে মাঝে সেই হাসি একেবারে পাগল করে দেবার মতো—নো, নো, তোমাদের হাসি শুনতে পাচ্ছি না আমি!

মনে আছে তাঁর, তিনি তখন সিউল-ব্যাংকের পুরোপুরি কাপ্তান। তিনি কাপ্তান স্যালি হিগিনস। ভীষণ জাঁকজমক করে জাহাজ কার্ডিফ বন্দর থেকে ছাড়ছে। এমন একটা জাহাজের ভার স্যালি হিগিনসের ওপর। বহু হাতবদলের পর যখন জাহাজ খুব সস্তায় পাওয়া গেছে তখন আর ভাবনা কি! এবং স্যালি হিগিনস আর তাঁর স্ত্রী এলিস জাহাজে। যারা বিদায় জানাতে এসেছিল বন্দরে, ইয়েস মনে পড়ছে, রিচার্ড ফ্যালের বাবা ম্যাথিউ ফ্যাল নিজে এসেছিলেন জাহাজঘাটায়। জাহাজ সওদা নিয়ে জাভা সুমাত্রা যাচ্ছে। তিনি হ্যাণ্ড-শেক করার সময় বলেছিলেন—উইশ্ য়োর গুডলাক। তোমার সমুদ্রযাত্রা শুভ হোক।

আসলে স্যালি হিগিনস জানতেন একটা গণ্ডগোলে জাহাজ তাঁকে দেওয়া হয়েছে। জাহাজটা কেউ রাখতে পারেনি। বছর ঘুরতে না ঘুরতেই হাতবদল হয়ে যাচ্ছে! এমন একটা জাহাজ এবং একবার জাহাজটাকে তিনি ঠিক ঠিক পৌঁছে দিয়ে যখন প্রমাণ করেছেন, তিনি পারেন আর যার ফলে কোম্পানির কর্তাব্যক্তি খুশি হয়ে একেবারে সোজাসুজি তাঁকে জাহাজের ভার দিয়ে ফেললেন, তখন মনে হয়েছিল, নিজের এই সুনাম তিনি কিছুতেই ক্ষুণ্ণ হতে দেবেন না। জীবনে তা ক্ষুণ্ণ হতে দেননি। শেষ সফরেও তিনি সোজা থাকতে চাইছেন। তখনই মনে হল আবার সেই হাসি। ঠিক হাসি কিনা বোঝা যায় না, কখনও মনে হয় দীর্ঘশ্বাসের মতো। জাহাজের সাউণ্ডিং পাইপ নিচে ব্রিজে নেমে গেছে। জল সরে যাবার শব্দ, কিন্তু অন্ধকারে কেন যে মনে হয় ঠিক পেছনে ঘাড়ের ওপর কেউ নিঃশ্বাস ফেলছে। তিনি তখন চেঁচিয়ে বলতে চান, কে! কে! আর তখনই মনে পড়ে তিনি স্যালি হিগিনস, কাপ্তান, এস. এস. সিউল-ব্যাংক। তিনি ফের চেয়ারটাতে ফিরে আসেন। রাত দুপুরে এই অন্ধকার সমুদ্র ক্রমশ রহস্যময়ী হয়ে উঠছে। সার্চ-লাইট তেমনি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলা হচ্ছে। বোটের পাত্তা নেই। জলে হিস্ হিস্ শব্দ। এসব কারণে সব আজগুবি শব্দ, কখনও হাসির মতো কখনও দীর্ঘশ্বাসের মতো কানে এসে বাজছে।

তারপরই কেমন থমকে যান। বিচলিত বোধ করেন। হাত-পা কাঁপতে থাকে। সত্যাসত্য নির্ণয় করতে গেলে সব কেমন অবিশ্বাস্য ঠেকে। মনে হয় সব ভুল। আসলে সেই যে একটা ভীতি ছিল জাহাজ সম্পর্কে, কিছু একটা আছে জাহাজটার ভেতর, জাহাজটাকে কিছু ভর করে থাকে—কোনো অদৃশ্য আত্মা, এমন সব কত ঘটনা জাহাজ সম্পর্কে লুকেনার সম্পর্কে কানে এসেছে এবং লুকেনার তো মানুষ ছিলেন না। বেঁচে থাকতেই লোকটা ছিল সী-ডেভিল। দুরন্ত, দুর্বিনীত ধূর্ত প্রতিপক্ষের অজস্র যুদ্ধ জাহাজের মোকাবেলা করেছেন তিনি। এমন সব গল্প শুনে শুনে মনের কোথাও এক আশ্চর্য দুর্বলতা প্রশ্রয় পেয়েছে মনে হয়। এবং এমন মনে হলেই তিনি গা ঝাড়া দিয়ে উঠতে চান, কিন্তু.......।

জাহাজে এলিস উঠে এসেছিল। নতুন ক্যাপ্টেনের নতুন বৌ। বয়সের ফারাক যাই হোক না কেন। বরং সেদিনও বোধ হয় ছিল এমনি অন্ধকার রাত্রি। জাহাজ ইকুয়েডরের দিকে উঠে যাচ্ছিল। তিনি কেবিনে এলিসকে বুকে জড়িয়ে চুমো খাচ্ছিলেন। আর তখুনি মনে হল পোর্ট-হোলে কেউ দাঁড়িয়ে আছে, কেউ হাসছে। পেছন ফিরে দেখলেন—কিছু নেই। সমুদ্রের

সামান্য জলোচ্ছ্বাসে এমন শব্দ কখনও হাসির মতো অথবা বাতাসেরা যখন জলের ওপর দিয়ে ভেসে ভেসে যায় তখন তার হিস্ হিস্ শব্দ ক্রমান্বয় ভেসে গেলে সবই মনের ভুল ভেবে পোর্ট-হোলের কাঁচ বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

জাহাজ সিঙ্গাপুর থেকে ছেড়ে বেশ ক'দিন ভালই যাচ্ছিল। ঠিক জাভা অথবা সুমাত্রার কাছাকাছি জায়গায়, সমুদ্রে তখন ভীষণ সাদা জ্যোৎস্না, সারা আকাশময় কি আশ্চর্য সুগন্ধময় বাতাসের খেলা। চার্ট-রুমে তিনি বসে আছেন। ওসনোগ্রাফী সম্পর্কে সামান্য পড়াশোনা করছিলেন। রাত যে অনেক হয়ে গেছে একেবারে টের পাননি। এলিস কি না ভাবছে! এলিস বেশি রাত জেগে থাকতে পারে না। একটু রাত হলেই ঘুমিয়ে পড়ার স্বভাব। এলিস এত রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে পারে না। হয়তো অভিমানে এলিসের মুখ থমথম করছে। এমন কি যে একবার ওকে ডেকে মনে করিয়ে দেবে, কত রাত আর বসে থাকব, তুমি আসছ না কেন, এসবও ওকে জানায়নি। তিনি সেজন্য মনে মনে ভীষণ দুঃখিত। ভেবেছিলেন সোজা কেবিনে ঢুকে ওকে জড়িয়ে ধরে চুমো খেলে সব অভিমান নিমেষে ভেঙে যাবে। কিন্তু বাইরে বের হয়ে দেখেছিলেন, এলিস নিচে দাঁড়িয়ে আছে। বোট-ডেকে বোটের মাঝখানে এলিস। পাশে কেউ দাঁড়িয়ে আছে যেন। মাথায় তার জাহাজি টুপি, শরীরে জাহাজি পোশাক। মানুষটার মুখ তিনি দেখতে পাচ্ছেন না। এবং মনে হয়েছিল জাহাজের কোনো যুবক অফিসার ওর পাশে দাঁড়িয়ে গল্প-গুজব করছে। এত রাতে এভাবে গল্প-গুজব এলিসকে যেন মানায় না। একজন ক্যাপ্টেনের স্ত্রীর পক্ষে এটা ঠিক না। এলিসের এটা বোঝা উচিত।

সেদিন আরও রাত করে নিচে নামলেন। একেবারে থার্ড-অফিসারের সব কাজকর্ম দেখে সইসাবুদ শেষে নিচে যখন নেমে এসেছিলেন তখন রাত বারোটার ঘণ্টা পড়ছে।

কিন্তু অবাক এত রাত পর্যন্ত এলিস জেগে আছে! ওর শরীরে রাতের পোশাক। শরীরে দামী আতরের গন্ধ। ওর শরীরে পাতলা সিল্কের সোনালী গাউন। এত স্পষ্ট সব যে তিনি একমুহূর্ত অপেক্ষা করতে পারেন নি। এলিসকে বুকে জড়িয়ে বলেছিলেন, বোট-ডেকে কার সঙ্গে গল্প করছিলে!

এলিস ভীষণ বিস্মিত। সে চোখ বড় বড় করে বলেছিল, কার সঙ্গে গল্প করব!

—দু' নম্বর বোটের পাশে দাঁড়িয়েছিলে?

—তা ছিলাম তো। তুমি আসছ না।

—কেউ পাশে ছিল?

—কি বলছ যা তা!

—তোমার পাশে কেউ ছিল, তুমি আমাকে বলছ না!

—মাই গড়

স্যালি হিগিনস বুঝতে পারলেন এলিস কিছু গোপন করতে চাইছে। তিনি বললেন—ঠিক আছে। এলিস কেমন সরে দাঁড়াল। হিগিনসের চোখে মুখে ভীষণ নিষ্ঠুরতা।

হিগিনস বললেন—ঠিক আছে। এস। বলে তিনি প্রায় জোর করে বিছানায় টেনে ফেলে দিলেন। চোখে মুখে অতিশয় সংশয়। তিনি ছটফট করছিলেন। তাঁর সঙ্গে এলিসের বয়সের তফাত অনেক। এবং এসব সময়ে যা হয়ে থাকে কেমন অমানুষের মতো এলিসকে উল্টে-পাল্টে নিচ্ছিলেন, বয়স হয়ে গেছে বলে কোনো তরুণ যুবকের চেয়ে তিনি কম নন। কারণ তিনি বস্তুত তাঁর সব শরীরের নৃশংসতা এলিসের সুন্দর শরীরে ছড়িয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, তুমি এলিস নষ্ট হয়ে গেলে আমিও নষ্ট হয়ে যেতে পারি। বস্তুত এলিসকে সেদিন তিনি রেপ্ করেছিলেন।

এবং সেই থেকে ছিল জাহাজে লুকোচুরি খেলা। কখনও বোট-ডেকে কখনও আরও দূরে, তিনি আর রাতে কখনও দেখতে পেলেন না একা এলিস কোথাও দাঁড়িয়ে আছে। রাতে

তিনি যতবার এলিসকে নির্জনে কোথাও দেখেছেন, এলিস একা থাকছে না। ওর পাশাপাশি একজন জাহাজি মানুষ পুরো ইউনিফরম পরে দাঁড়িয়ে আছে।

তিনি তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে এত সচেতন যে তাঁর স্ত্রী সংগোপনে কিছু করছে এটা প্রমাণ করার জন্য কাউকে ডেকে কোনো সংশয়ের কথা বলতে পারেন নি। কেবল নিজে একা একা জ্বলে পুড়ে খাঁক হয়েছেন। এলিসকে বললে কখনও স্বীকার করত না। একদিন তো হাউহাউ করে কেঁদে ফেলেছিল এলিস। আমাকে তুমি দেশে পাঠিয়ে দাও প্লিজ। এবং তাই হয়তো করতেন। কিন্তু জাহাজি মানুষের জীবন কখনও সুখের হয় না, এটা তিনি জানেন। জেনেও যখন কিছু করতে পারছেন না, সব ঠিকঠাক, পরবর্তী বন্দরে এলিস নেমে যাচ্ছে, নেমে যাবার আগে জাহাজ কি যে ঝড়ের মুখে পড়ে গেল! সেই প্রচণ্ড টাইফুনের ভেতর জাহাজ যখন হাবুডুবু খাচ্ছে, যখন তিনি চার্ট-রুমে ব্যস্ত এবং বিস্তারিত খবর পাঠাচ্ছেন এরিয়া- স্টেশনকে মিনিটে মিনিটে, রেডিও-অফিসার নেমে এসে খবর দিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ কতটা উচ্চতা রেখে এগিয়ে আসছে আর সমুদ্রে ভয়ংকর সাদা ফেনা কেবল আর কিছু দেখা যাচ্ছে না, কেবল তুষারপাতের মতো আকাশে জলকণা উড়ে বেড়াচ্ছে, সাঁ সাঁ হাওয়ায় বোট-ডেক ধরে হাঁটা যাচ্ছে না, তখনই মনে হল নিচে এলিস দ্রুত নেমে যাচ্ছে। এবং এলিসকে অনুসরণ করার জন্য তিনিও এগিয়ে যাচ্ছেন—তারপর এলিস কেমন সন্তর্পণে সেই এলি-ওয়ে ধরে টলতে টলতে এগিয়ে যাচ্ছে—শেষে বোট-ডেকে ফের উঠে আসতে চাইলে আবার মনে হল সেই জাহাজি মানুষ যার মুখ কখনও তিনি দেখেননি, পেছন ফিরে যে কেবল দাঁড়িয়ে থাকে, উঁচু লম্বা প্রায় দেখতে জাহাজের থার্ড-অফিসারের মতো সে অনুসরণ করছে এলিসকে। কিন্তু তিনি নেমে কিছু দেখতে পেলেন না। একটা প্রচণ্ড ঢেউ জাহাজটাকে ভীষণ কাত করে দিল। আর মনে হল রেলিং ধরে কেউ পালাচ্ছে। তিনি কিছুতেই নিজেকে স্থির রাখতে পারলেন না। কেমন সব গোলমাল হয়ে গেল। যেন অদৃশ্য এক অশুভ প্রভাবে দরজার মুখে তিনি এলিসকে মাথায় মেরে ফেলে দিলেন। হাতে ছোট্ট একটা হাতুড়ি। আর তখন সেই অট্টহাসি সমুদ্রের ঢেউগুলো পার হয়ে নক্ষত্রের দিকে ছুটে যাচ্ছে। কেউ যেন জয়লাভ করে লাফাতে লাফাতে সমুদ্র পার হয়ে চলে গেল।

প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাসের ভেতর জাহাজটা থরথর করে কাঁপছিল। তিনি সেই ঝড়ের রাতে সহসা আর্তনাদ করে ওঠার মতো ছুটে গিয়েছিলেন বোটের পাশে। হয়তো পা ফসকে পড়েই যেতেন। অথবা তাঁকে জলোচ্ছ্বাসে ভাসিয়ে নিত। তিনি জানতেনও না তখন প্রচণ্ড রোষে আবার সেই অশুভ প্রভাব এগিয়ে আসছে, তিনি হাঁফাচ্ছিলেন, অন্ধকারে কে আপনি! এভাবে কোথায় দাঁড়িয়ে হাসছেন! এবং বোটের নিচে পড়ে আছে এলিস। কেউ ব্রীজ থেকে নেমে আসতে পারে, বয়লার-রুম থেকে কেউ উঠে আসতে পারে—কিছুই তাঁর মনে ছিল না। প্রচণ্ড জলোচ্ছ্বাস বোট-ডেক ভাসিয়ে নিয়ে গেল। যেহেতু স্যালি হিগিনস অভিজ্ঞ এবং তিনি জানেন তখন কি করণীয়, লাফ দিয়ে পাশের একটা রড ধরে ফেললেন দু'হাতে। ভেসে থাকলেন জলে। জল নেমে গেলে তিনি সোজা ছুটে গেলেন দরজার পাশে। দেখলেন এলিস নেই। এলিসকে সমুদ্রের ঢেউ ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। এলিসের কোনো চিহ্ন নেই। তাঁর পোশাক ভিজে গেছে। কেমন শীতে কাঁপছিলেন। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা চারপাশে মনে হচ্ছিল। শীতে যেন হাত-পা স্থবির হয়ে আসছে। নড়তে পারছিলেন না। কাঁপতে কাঁপতে কোনোরকমে ব্রীজে উঠে যেতে চাইছেন। আর কি আশ্চর্য, বার বার সিঁড়ি থেকে তিনি গড়িয়ে পড়ে যাচ্ছেন। পা স্লিপ করে যাচ্ছে। কে যেন তাঁকে ব্রীজে কিছুতেই উঠতে দিচ্ছে না। এতটুকু শক্তি নেই শরীরে। তিনি সিঁড়ির গোড়ায় যতক্ষণ পারলেন ঝুলে থাকলেন। তারপর কি হয়েছিল মনে নেই। আর তিনি মনে করতেও চান না। কিন্তু কি যে হয়, বোট হারিয়ে যাবার পর পুরোনো সব স্মৃতি তাঁকে আরও বেশি যেন কাবু করে ফেলছে। তিনি তেমনি বসে আছেন। থার্ড-মেট ওপরে উঠে এসেছে এবং যেহেতু জাহাজ স্ট্যাণ্ড-বাই, সবাই মাঝে মাঝে ওপরে উঠে দেখছে, বোট ফিরে আসছে কিনা। তখন থার্ড-মেট না বলে পারল না, স্যার আপনি এবারে যান। আমরা আছি।

স্যালি হিগিনস ঘড়ি দেখলেন চারটা বেজে গেছে। তিনি কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়তে পারেন। কিন্তু জানেন কিছুতেই দু'চোখ এক করতে পারবেন না। এতটা বিচলিত কেন বুঝতে পারছেন না। আসলে কি তিনি সেই অপোগণ্ডটার কথা ভেবে ভীষণ বিচলতি হয়ে পড়ছেন! তিনি কি এই অপোগণ্ডের জন্য ভেতরে ভেতরে নিজেও এক ভীষণ মায়ায় জড়িয়ে পড়েছেন!

তিনি তখন ভেবে পান না, ছোটবাবু কেন কখনও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে যায় তাঁর! আবার কখনও মনে হয়, ছোটবাবুর শান্তশিষ্ট মুখে চোখে এক অদ্ভুত সারল্য—ছেলেটাকে কোথাও ফেলে গেলে তিনি যেন বাকি জীবন শান্তি পাবেন না। বোটে অন্য যারা আছে তাদের কথা একবারও ভাবতে পারছেন না কেন? ভীষণ স্বার্তপর মনে হলে তিনি উঠে দাঁড়লেন। বলতে চাইলেন, তুমি কে হে? তোমার জন্য আমার এত ভাবনা! তারপরই বুঝি মনে হয়ে যায় মেয়েটা তাঁর নিচে বসে রয়েছে। সেও ঘুমোচ্ছে না। আসলে বনির কথা ভেবে বোধ হয় এমন মনে হচ্ছে তাঁর। তিনি প্রায় জোর করে উঠে পড়লেন। এবং কেবিনে ঢুকে দেখলেন বনি পোর্ট-হোলে মুখ রেখে ভোরের সমুদ্র দেখছে। তিনি বললেন, বনি এস আমরা দু'কাপ কফি খাই। তিনি মেয়েকে একটু অন্যমনস্ক করার জন্য বললেন, এখানেই মুখ ধুয়ে নাও। তারপর বেল টিপে ডাকলেন, কোয়ার্টার-মাস্টার। কোয়ার্টার মাস্টার এলে কফির কথা বলে দিলেন।

.

তখন নীল জলে শুধু একটা সাদা বোট আর তার পাঁচজন আরোহী। ওদের মুখে কোনো কথা নেই। সবাই অবাক, দেখছে সিউল-ব্যাংক জাহাজটা সামনে কোথাও নেই। চারপাশে কেবল শুধু জল আর জল। দিগন্তব্যাপী শুধু সমুদ্র আপন মহিমায় জেগে রয়েছে। দু'টো একটা মাছ, কখনও ছোট ছোট মাছের ঝাঁক বোটের পেছনে ভেসে ভেসে আসছে। আর কখনও অতিকায় সব হাঙ্গরের ঝাঁক পাইলট-ফিশদের তাড়া করছে। আবার কখনও দেখছে ছোট ছোট সব র‍্যামোরা মাছ বোটে এসে শামুকের মতো লেগে রয়েছে। ওরা কেউ, কোনো একটা র‍্যামোরা মাছ তুলে আনছে। জলে হাত দিলেই মাছগুলো ঝাঁকে ঝাঁকে এগিয়ে আসছে এবং চুম্বকের মতো হাতে সেঁটে যাচ্ছে। অদ্ভুত ওদের মুখ। এবং নানা বর্ণের ছবি মাছের গায়ে। হাতে সেটে গেলে টেনে তুলতে হচ্ছে। প্রায় জোঁকের মতো ওদের যেন রক্ত শুষে নেবার ক্ষমতা।

ডেবিড দূরবীন নিয়ে এলে দূরের সমুদ্র দেখতে পারত। কিন্তু ওরা ভুলে সঙ্গে দূরবীন আনেনি, ওরা এমন কি এল-বি সেট সঙ্গে আনলেও পাশাপাশি সব জাহাজে খবর পাঠাতে পারত। ওরা রকেট ছুঁড়ে আকাশের গায়ে সিগন্যালিং করতে পারত, কিন্তু সকাল হয়ে গেছে। সমুদ্রে সূর্য উঠে আসছে। আকাশে রকেটের আলো ফ্যাকাশে হয়ে যাবে। এখন ওদের কি করণীয় বুঝতে পারছে না। সামান্য হাওয়া উঠেছে। বড় বড় জলের আবর্তে বোট কেবল উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ভাসছে। ওদের মুখ দেখলেই বোঝা যায় ভারি অসহায় মুখ। প্রতিটি দণ্ড পল ভয়াবহ দীর্ঘ সফরের মতো, যেন ওরা আর তাদের আস্তানায় ফিরতে পারবে না। মান্নান সারাক্ষণ খিস্তি করছে। সবাইকে যা মুখে আসে বলছে। বোধহয় সেও আর কিছু ভেবে উঠতে পারছে না। ডেবিড নিজেও কিছু আর ভাবতে পারছে না। চুপচাপ, এবং এভাবে ক্রমে ওরা দেখতে পেল, সমুদ্রের বুকে লাল সূর্য, সমুদ্রের নীল রং ক্রমে ফ্যাকাশে হয়ে যাচ্ছে, রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ গরম। বোটের জল বিন্দুমাত্র ওরা ব্যবহার করেনি। আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর কিছু একটা স্থির করে ফেলতেই হবে। জাহাজ না পেলেও, ওরা কম্পাসের কাঁটা দেখে সোজা কেবল বোট চালিয়ে যাবে। ভরসা তাতেও নেই, কারণ মোটর-বোট বলে ওরা যা তেল এনেছে সঙ্গে সে বড় কম সময়ের জন্য। ভরসা, যারা যাত্রী, সবাই প্রায় জোয়ান। বোট ওরা দাঁড়ে টানতে পারবে কিছুক্ষণ—সেটাই বা কতদূর! এবং যতদিন শরীরে শক্তি থাকে, খাবার থাকে—খাবার বলতে শুকনো খাবার, আর তো ঝড়ের সময় এমন ছোট্ট বোটের কোনো পাত্তা পাওয়া যাবে না। ওরা বুঝতে পারছিল, মৃত্যুর মুখোমুখি ওরা ক্রমে এগিয়ে যাচ্ছে।

ছোটবাবু দাঁড়গুলো সব এক এক করে টেনে বের করছে। ডেবিডের ভীষণ হাসি পাচ্ছিল ছোটবাবুর কাণ্ড দেখে! অসীম অন্তহীন সমুদ্রে ছোটবাবু ভেবেছে দাঁড় টেনে কোথাও ঠিক পৌঁছে যেতে পারবে।

ছোটবাবু বলল, ডেবিড তুমি তো সমুদ্রের অনেক কিছু জানো। সামনে কোথাও দ্বীপটিপ আছে?

ডেবিড বলল, কাছাকাছি এমন কিছু নেই ছোটবাবু। এখন ভরসা একমাত্র কোনো জাহাজ যদি দেখতে পায়।

রোদে ওদের মুখ পুড়ে যাচ্ছে। ইস্পাতের রং ধরছে সমুদ্রে। ডেবিড বলল, এখানে থাকা বাদে কোনো উপায় নেই। সিউল-ব্যাংক খুঁজতে বের হলে যদি এদিকটায় ঘুরে যায়।

ছোটবাবু বলল, ডেবিড তোমার বাড়ির কথা মনে পড়ছে না!

ডেবিড বুঝতে পারল ছোটবাবু তাকে সাহসী করে তুলতে চাইছে। ছোটবাবু হয়তো নিজেও বাড়ির কথা ভাবছে। ওর মতো মনে মনে ভেঙে পড়ছে, কিন্তু বুঝতে দিচ্ছে না।

ছোটবাবু বলল, দ্যাখো আমরা দাঁড় টেনে ঠিক ডাঙা পেয়ে যাব। অথবা কোনো জাহাজ আমাদের দেখতে পেলে তুলে নেবে। আচ্ছা ওরাই বা কি করছে? সে বনিকে আসার সময় অযথা ঠেলে ফেলে দিয়েছিল। এখন কেন জানি মনে হচ্ছে কাজটা সে ভাল করেনি। আর হয়তো বনির সঙ্গে তার জীবনে দেখা হবে না। সে বলল, তোমার কি মনে হয় ডেবিড, ওরা আমাদের ফেলে চলে গেছে!

—বুঝতে পারছি না।

—তোমার কি মনে হয়, বলেই সে বুঝতে পারল, এখন এসব বলা ঠিক হবে না। বোট যদি শয়তানের প্রভাবে পড়ে যায় তবে কেউ রক্ষা পাবে না। বরং এখন যতটা পারা যায় সবাইকে স্বাভাবিক রাখা দরকার। সে কিছু লজেন্স বের করে নিল। সবাইকে একটা একটা করে দিল, প্রায় রেশনের সামিল, এখন কিছুতেই ওরা বেহিসাবী হতে পারে না। গলা শুকিয়ে উঠছে। আর সমুদ্র থেকে যেন এবার ক্রমে প্রচণ্ড উত্তাপ উঠতে আরম্ভ করবে। আসলে ওরা এমন একটা পরিস্থিতিতে পড়ে ঘাবড়ে গেছে। গলা শুকিয়ে চ্যাট চ্যাট করছিল।

—একটু পানি, দু'নম্বর জাহাজি সোলেমান এমন বলল।

ছোটবাবু বাকেট থেকে একটু জল ঢালতে গেলে ডেভিড চিৎকার করে উঠল।

—এটা তুমি কি করছ ছোটবাবু!

–সোলেমান জল খেতে চাইছে।

—এখন জল দেবে না।

বোটের দায়দায়িত্ব ডেবিডের। সুতরাং যা কিছু সে করবে ডেবিডের অনুমতি নিয়ে। সে একটা একটা করে লজেন্স বের করে দিয়েছিল, যেন তাও ঠিক হয়নি। ডেবিড না বললে সে কিছুই দিতে পারে না। কিন্তু সবার চোখ যেভাবে জ্বলছে, কখন ডেবিডকে ওরা জলে ফেলে দেবে কে জানে! এবং মনে হল সেই যেন নিরুদ্দেশ যাত্রা। ক্রমে সবাই ক্ষুধায় তেষ্টায় অমানুষ হয়ে উঠছে। মান্নান আর মান্নান নেই। সে একটা অমানুষ হয়ে যাচ্ছে। সে নিজেও একটা অমানুষ! সব খাবার এবং জল শেষ। বুকে অসহ্য কষ্ট। চোখ কোটরাগত। আর শুধু নানারকমের সব ভয়ঙ্কর ছবি সমুদ্রে। এবং এটা হয়, বোট অসীম সমুদ্রে হারিয়ে গেলেই এটা হয়। বিচিত্র সব হেলোসিনেসান—কখনও মনে হয় একটা বড় ক্রস সমুদ্রে ঝুলে আছে, কখনও মনে হয় অতিকায় সব উড়ুক্কু মাছ ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসছে অথবা মরুভূমির মতো দূরে উট দেখা যায়, মরূদ্যান দেখা যায় আর বিচিত্র সব সামুদ্রিক অপদেবতারা তখন চারপাশে হাত নেড়ে ভয় দেখাতে থাকে। এবং মনে হল, তখন বোটের সবাই কংকালসার মানুষ, ওরা সবাই মিলে ডেবিডের রক্ত চুষে খাচ্ছে। এসব ভেবে ছোটবাবুর মুখ কেমন সহসা ফ্যাকাশে

হয়ে গেল। ছোটবাবু বসেছিল গলুইয়ে, ডেবিড বোটের পাছাতে আর ডানদিকে মান্নান। সোলেমান মাঝখানে। আর বাঁদিকে জব্বার। ওরা সমুদ্রে সতর্ক হয়ে গেছে ভীষণ। বোটটা ভীষণ দুলছে। এবং বার বার ছোটবাবু সমুদ্রের গভীরে এই নীল জল পার হয়ে, আরও গভীরে, যে অন্ধকার আছে সেখানে কতটা আরও গভীর, এবং

ডুবে গেলে সেই জলরাশির ভেতর হাঙ্গরেরা কিভাবে ছুটে আসবে, ওর শরীর থেকে মাংস খুবলে খুবলে খাবে ভাবতে ভাবতে সে শিউরে উঠল। সে একটা কথা বলছে না। সে কেমন ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে উঠল। পাগলের মতো সে চারপাশে তাকাতে থাকল। সোলেমানের মতো সে নিজেও যেন তেষ্টায় কষ্ট পাচ্ছে। এবং এমনকি সে যে দু'টো একটা কথা বলবে সহজভাবে তা পর্যন্ত পারছে না। সে চুরি করে একটা লজেন্স বেশী খেয়ে ফেলল।

ক্রমে সূর্য মাথার ওপরে উঠে আসছে। ডেবিড ঘড়ি দেখে বলল, দশটা বাজে। কি করবে ছোটবাবু?

ছোটবাবু বলল, জাহাজটাতো এখানেই থাকার কথা!

জব্বার বলল, ছোটবাবু তুই বেশি মাতব্বরি করবি না। কিছু জানিস না কেবল মাতব্বরি চালাচ্ছিস। তুই কী বুঝিস সমুদ্রের। আমাদের এখানে ঘুরে আসা ঠিক হয়নি। যদি কিছু হয় তোমাকে খুন করব ছোটবাবু।

ডেবিড বুঝতে পারল ক্রমে সবাই উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। বচসা, মারামারিও শুরু হয়ে যেতে পারে। সবাই সবাইকে দোষারোপ করতে থাকবে। এখন যত বেশি মাথা ঠাণ্ডা রাখা যাবে তত তেষ্টা কম পাবে। গলা কম শুকোবে। ঘাম কম হবে। এসব নিয়ে ছোটখাটো একটা সে বক্তৃতা পর্যন্ত দিয়ে যখন বুঝতে পারল কোনো আশা নেই, মৃত্যু ক্রমে দু'হাত তুলে সমুদ্রে নাচানাচি শুরু করে দিয়েছে এবং দূরে সব শিস্ শোনা যাচ্ছে, হয়তো হাজার হাজার ডলফিন ভেসে আসছে, তাদের হাঁক-ডাক শোনা যাচ্ছে—তখন নিজেরাও ক্রমে সমুদ্রের জীব হয়ে যাচ্ছে ভেবে আবার চুপচাপ হয়ে গেল।

বোটটা তেমনি সমুদ্রের জলে দুলছে। লাফাচ্ছে। ওদের শরীরও দুলছে। ওরা আবার সামান্য কুটোগাছটি যদি ভেসে আসে এ আশায় কি যে অসহায় চোখে কেবল দেখে যাচ্ছে, কেবল সমুদ্র যেখানে শেষ হয়ে গেছে মনে হয়, দূরে অতিদূরে যেখানে দিগন্তরেখায় আকাশ নেমে গেছে সেখানে সবাই একসঙ্গে কিছু একটা দেখছে, দেখতে পাচ্ছে বিন্দুর মতো নীল সমুদ্রে সচল কি ভেসে আসছে।

ডেবিড চিৎকার করে উঠল, ওটা কি আসছে ছোটবাবু?

—বুঝতে পারছি না।

—মান্নান?

—জানি না স্যার।

—সোলেমান?

—কি যে আসছে!

—জব্বার? :

—কিছু একটা ছুটে আসছে।

আর তখনই দু'হাত তুলে ছোটবাবু সেই মহাসমুদ্রে সামান্য একটা বোটের ওপর দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠল—লেডি-অ্যালবাট্রস আসছে সেকেণ্ড। বোট ফেরাও। সে আমাদের নিতে এসেছে।

ওরা দেখল সেই অতিকায় পাখিটা ঢেউয়ের ওপর ভেসে এগিয়ে আসছে। অথবা কখনও অনেক ওপরে উঠে যেন কিছু দেখছে। নিচে শুধু জলরাশি, জলে ওর প্রতিবিম্ব ভেসে ভেসে চলে যাচ্ছে। এবং দূরে সে কেমন দেখতে পায়, আর এক দিগন্তে সেই জাহাজ, যেখানে তার

পুরুষপাখিটা রয়েছে কাঠের বাসে বন্দী এবং একজন মানুষের মুখ বুঝি তার অতীব চেনা, সে থাকতে না পেরে উড়ে উড়ে দেখছে কোথায় সে।

এসবই ছোটবাবু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কেবল ভাবছিল। তার ভাবতে ভাল লাগছিল। বোট দ্রুতগতিতে পাখিটার পেছনে ধেয়ে চলেছে, এবং পাখিটার কাছাকাছি চলে গেলে ওরা দেখতে পেল, আগে আগে সে উড়ে উড়ে যাচ্ছে, পেছনে তারা। মান্নান ছোটবাবুকে আনন্দে জড়িয়ে ধরেছে। ডেবিড নড়তে পারছে না। হালে সে বসে রয়েছে। এবং সামনে ওরা চারজন একেবারে মুহ্যমান, যেন অতিশয় স্থির এবং নির্বাক গভীর সমুদ্রে কুটোগাছটির মতো পাখিটা তাদের এখন একমাত্র অবলম্বন।

ছোটবাবু যেমন আজকাল পাখিটাকে আদর করে ডাকে, কখনও এলবি, আবার কখনও এলবা বলে, তেমনি সে ডাকল, এলবা ঠিক ঠিক নিয়ে যাচ্ছ তো! আমাদের জাহাজটা আর কতদূর? জাহাজে সবাই ভাল আছে তো? যেন মনে হয়েছিল ছোটবাবুর, কতকাল আগে অনেকদিন হয়ে গেছে ওরা জাহাজ ছেড়ে এসেছে। ঠিক আর তাকে জাহাজ ভাবা যায় না, বাড়ি-ঘরের মতো। প্রবাসী মানুষের মতো সে এখন ঘরে ফিরে যাচ্ছে। এবং গলা খুব খাটো করে বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, বনি কেমন আছে? চাচা কেমন আছে? সে বলতে পারল না। কারণ তখনই দূরে সেই সিউল-ব্যাংক, অস্পষ্ট ছায়ার মতো দিগন্তে ভেসে উঠেছে! ওরা আনন্দে সবাই সবকিছু ফেলে, এমনকি ডেবিড হাল ছেড়ে নৃত্য শুরু করে দিল। বোট যে ঘুরপাক খেয়ে ভরাডুবি হতে পারে সে খেয়াল পর্যন্ত নেই ডেবিডের। সে শুধু বলল, ডেবিড যেভাবে লাফাচ্ছো, বোট যে ডুববে!

ছোটবাবুর কথায় ওরা কেউ এতটুকু দমল না। তখন আর কি করা, হালে সে গিয়ে নিজেই বসল। প্রায় বোটটাকে সে জলের ওপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইল—বনি, আমি আসছি। আমরা সত্যি ফিরে আসছি। বনি, মাই লিটল্ প্রিন্সেস, দু'হাত তুলে কেবল এসব বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল তার।

তখন জাহাজে সবাই ওপরে উঠে এসেছে, সবাই বোট দেখে হাত নাড়ছে। এবং কেউ কেউ চুপচাপ কেবল দেখছে সে আসছে। ছোটবাবু হাল ধরে বসে আছে। লেডি-অ্যালবাট্রস বোটের সামনে আর নেই। বোট পৌঁছে দিয়ে সমুদ্রের নিরিবিলি আকাশে অথবা গভীর সমুদ্রে অদৃশ্য হয়ে যাবার চেষ্টা করছে। তখন রেডিও-অফিসার ঝুঁকে আছে বেতার-যন্ত্রটির ওপর। পিঁপ্ পিঁপ্ আর করছে না। রিন্ রিন্ করে কিছু ভেসে আসছে। গলা চেনা মনে হচ্ছে,যেন কতকাল পর আবার খোঁজখবর নিচ্ছে। তার মুখ চোখ অধীর। প্রথম খুব অস্পষ্ট, এবং মনে হচ্ছে হিসিং-সাউণ্ড, যেন খুব গভীর গোপন কথাবার্তা। রেডিও- অফিসার বুঝতে পারছে না। হেড-ফোন আরও জোরে চেপে ধরছে, ইয়েস, ইয়েস, হ্যাঁ হ্যাঁ সিউল- ব্যাংক। এস. এস. সিউল-ব্যাংক বলছি, ইয়েস ইয়েস, হ্যাঁ হ্যাঁ নেক্স্ট পোর্ট অফ কল সামোয়া, ইয়েস ড্যানসিং গার্ল, একুশ বারি স্ট্রীট, লণ্ডন। ইয়েস, ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস অফ হার কমাণ্ড। আর সঙ্গে সঙ্গে সে প্রায় উত্তেজনায় গালাগাল করতে যাচ্ছিল। রাসকেল, তোমরা এতক্ষণ কি করছিলে? তোমরা কি সব ঘুমোচ্ছিলে!

কিন্তু কে কাকে বলে! অপরপ্রান্ত থেকে ভয়ঙ্কর সব কথাবার্তা ভেসে আসছে।—তোমরা কি সব নেশাভাঙ করে আছ! সকাল থেকে চেষ্টা করছি, কিছুতেই ধরতে পারছি না। আর যা হয়ে থাকে দিকে দিকে ওরা খবর পাঠিয়েছে, সকাল আটটার পর থেকে এস. এস. সিউল-ব্যাংকের কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। আর সব খবর, যেমন জাহাজ কোন কোর্সে যাচ্ছে, তার ওয়েদার রিপোর্ট এবং সবকিছু জানিয়ে এরিয়া-স্টেশন থেকে পৃথিবীর সর্বত্র প্রায় ইথারে ভেসে গেছে, জাহাজ এস. এস. সিউল-ব্যাংক নিখোঁজ। এবং যা হয়েছিল, হেড-অফিসে মি. রিচার্ড ফ্যাল্ তখন মাত্র কথাবার্তা চালাবেন স্থির করেছেন, এবং এটা তৃতীয়বারের চেষ্টা—জাহাজ স্ক্র্যাপ করার সঠিক কথাবার্তা হবে, জাহাজ সাউথ-সীতে থাকতে থাকতেই কিছু একটা ব্যবস্থা করতে হবে। স্যালি হিগিনসের এটাই শেষ সফর, তারপর এই জাহাজের জন্য

কোনো আর মাস্টার-মেরিনার পাওয়া যাবে না। স্যালি হিগিনস থাকতে থাকতেই কিছু একটা করে ফেলতে না পারলে যতদিন যাবে তত সিউল-ব্যাংক ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে। এবং যা তিনি ভেবে শেষ পর্যন্ত স্থির করেছেন, স্যালি হিগিনসকে দিয়েই বিক্রি-বাট্টার দলিলে সই করাতে পারলে ব্যক্তিগত বিপদ থেকে তিনি ত্রাণ পাবেন। এমন একটা দুরভিসন্ধি যখন মাথায় খেলছে ঠিক তখনই খবর এসেছিল, এস. এস. সিউল-ব্যাংক মিসিং।

হেড-অফিসের সব মানুষ আনন্দে যে-যার টেবিল থেকে উঠে পড়েছিল, তবু শোক-জ্ঞাপনের মতো কিছুটা চেহারা রাখতে হয়, ভেতরের আনন্দ, অর্থাৎ সেই দুর্ভোগবহনকারী জাহাজটা আর কখনও নানারকমের দুঃসংবাদ বয়ে আনছে না, সে শেষ হয়ে গেছে, ফিস্ ফিস্ গলায় কেমন চারপাশের মানুষগুলো নড়েচড়ে বসেছিল, কেউ কেউ মি. ফ্যালের ঘরে ছুটে খবরটার সত্যাসত্য প্রমাণের ইচ্ছায় পাগল হয়ে যাচ্ছিল, তখন মি. ফ্যাল চুপচাপ বসে আছেন। তিনি কাগজটা উল্টে পাল্টে দেখছেন। সামনে বসে রয়েছেন এক ভদ্রলোক। নাম মি. হ্যামিলটন। তিনি এসেছেন, জাহাজ কেনাবেচার ব্যাপারে। জাহাজ এস. এস. সিউল-ব্যাংক যখন দক্ষিণ সমুদ্রে আছে তাকে সহজেই জাপানের উপকূলে ভিড়িয়ে দেওয়া যাবে। প্রাথমিক কথাবার্তা যখন এভাবে এগোচ্ছিল, তখন এমন একটা খবরে মি. ফ্যাল প্রায় মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলতে গিয়েও বুকটা কেমন ধড়াস করে উঠল—আসলে সিউল-ব্যাংক মিসিং। এটা তো মাঝে মাঝে দু-একবার হয়েছে। এমন রেকর্ড তো অফিসের খাতাপত্রে রয়েছে। আবার যথানিয়মে সমুদ্রের কোথাও তাকে দেখা যাবে। এমন যে কতবার হয়েছে! তিনি কেমন ভীষণ আবার হতাশায় ডুবে কথা শুরু করে দিতে চাইলেন।

হ্যামিলটন বললেন, তাহলে আর কথাবার্তা বলে লাভ নেই।

ফ্যাল্ বললেন, বসুন। চা খান।

হ্যামিলটন বললেন, খুব বড় রকমের লোকসানের মুখে পড়ে গেলেন।

ফ্যাল্ বললেন, হবে।

হ্যামিলটন একটু বিস্মিত। এতবড় দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পরও মানুষটা বিচলিত নয়। এতগুলো মানুষের জীবন সংশয়, সমুদ্রে জাহাজডুবি সুতরাং পৃথিবীর সর্বত্র বড় বড় হরফে যখন ছাপা হয়ে যাবে, এস. এস. সিউল-ব্যাংক নিখোঁজ তখনও একজন মানুষ কত সহজভাবে চা খেতে বলছেন।

হ্যামিলটন চা খাবার পর বললেন, উঠি।

ফ্যাল্ বললেন, কথাবার্তা কিন্তু শেষ হয়ে যায় নি।

হ্যামিলটন বুঝতে না পেরে টুপিটা মুখের কাছে এনে ফের নামিয়ে নিলেন। বললেন, কথাবার্তা আর কি থাকতে পারে?

—খোঁজখবর নেবেন

—আপনাদের আরও জাহাজ আছে?

মি.ফ্যাল উঠে দাঁড়ালেন। তিনি সামান্য ভারি চেহারার মানুষ—এবং তিনি হ্যান্ডশেক করার সময় বললেন, স্ক্র্যাপ করার মতো নেই।

—তবে?

—দু'একদিনের ভেতর জাহাজটার খবর আমরা পেয়ে যাব!

—কিন্তু এত বড় একটা খবর, আপনার বিশ্বাস হচ্ছে না। চোখ প্রায় কপালে তুলে হ্যামিলটন কথাটা বলতে গিয়ে থেমে গেলেন। সেই ভাল, যেন না হয়, করুণাময় ঈশ্বর ওদের রক্ষা করুন।

বিকেলে ফ্যাল্ হ্যামিলটনকে ফোনে জানালেন কাল আসবেন। এস.এস. সিউল-ব্যাংক বহাল তবিয়তে আছে। মাঝে একদিন শুধু ওর টি-আর পাওয়া যাচ্ছিল না। ওটা কিছু না।

ট্রানসমিটারে গন্ডগোল হলে এসব হয়। যেন কত সহজে তিনি এর ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন হ্যামিলটন সাহেবকে। নিজের দুর্ভাবনার কথা, জাহাজ নিয়ে যে তিনি তাঁর পুত্রের মৃত্যুর পর ভয়াবহ একটা দুর্ভাবনায় পড়ে গেছেন কি করে কি করা যায়, এবং যে জন্য তিনি সব সময় ভাবছেন, স্যালি হিগিনসের শেষ সফর যখন এটা, এবং আর যখন কাউকে পাওয়া যাবে না অর্থাৎ যিনিই উঠুন না কেন, জাহাজ তাঁকে সমুদ্রে নিশীথে এ-ভাবে এক দু'বার ঘুরিয়ে মারলেই পাগল হয়ে যাবেন। এবং জাহাজের নামে যখন এমন সব কিংবদন্তী তৈরি হয়ে যাচ্ছে অথবা বলা যেতে পারে—সেই জাহাজ এস.এস. সিউল-ব্যাংক আসছে আসছে, মাস্তুলে লম্ফ জ্বালিয়ে আসছে, যেন কতকাল থেকে এভাবে সে সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে, তাকে কিছুতেই নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া যাচ্ছে না—তখন স্যালি হিগিনসই একমাত্র কিছু একটা করতে পারেন। ভাবলেন, তিনি নিজে কোনো সই-সাবুদে যাবেন না। এস.এস. সিউল-ব্যাংক তাঁর পরিবারের কাউকে সহ্য করতে পারে না। বরং স্যালি হিগিনসের সঙ্গে যখন এত দহরম মহরম তিনিই তার শেষকৃত্য করে যাবেন, এটাই স্বাভাবিক। বিক্রি-বাট্টার কাগজপত্রে স্যালি হিগিনস কর্তৃপক্ষের হয়ে অনায়াসে সই-সাবুদের কাজটা সেরে ফেলতে পারেন। বোধ হয় এস.এস. সিউল-ব্যাংক নিজেও এটা মেনে নেবে। তার রোষে তখন আর তাঁকে অথবা তাঁর পরিবারের কাউকে পড়ে যেতে হবে না। তিনি মনে মনে ভীষণ খুশী এবং এমন কি তিনি গাড়ি থেকে নেমে বড় লনের ভেতর হেঁটে যেতে যেতে নাবালকের মতো শিস্ দিতে থাকলেন। কতদিন পর যেন সেই অশুভ প্রভাবের হাত থেকে নিষ্কৃতির একটা পথ খুঁজে বের করতে পেরেছেন।

তখন রেডিও-অফিসার আরও নুয়ে পড়ছে। সে বলছে, কি কি বললেন! সে যেন পারলে আরও জোরে চিৎকার করে উঠত।

—এমন হয়েছে।

—কি বাজে কথাবার্তা।

—না বাজে নয়। এটা হয়েছে।

—ঠাট্টা হচ্ছে!

অপর প্রান্ত থেকে তখন আর কোনো কথা ভেসে আসছে না। সে নিচে না নেমেই হল্লা শুরু করে দিল। বলল, স্যার শিগগির আসুন। কি বলছে এরিয়া-স্টেশন শুনুন।

সে তারপর ফের বলল, কবে হয়েছে?

—এই বছর দুই আগে।

—কাদের জাহাজ ছিল? —আমেরিকান অয়েল-ট্যাংকার।

—আমেরিকান অয়েল-ট্যাংকার!

কাপ্তান এলে হেড-ফোন খুলে দিয়ে বলল, শুনুন কি বলছে এরিয়া স্টেশন।

তিনি বললেন, ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস বলছি।

—গুড আফটারনুন স্যার।

—ইয়েস গুড আফটারনুন।

—স্যার, জাহাজের কোনো ক্ষতিটতি হয়নি তো?

—না।

—সবাই নিরাপদে ফিরে এসেছে?

—হ্যাঁ। লাস্ট বোট এই মাত্র এল।

—সবার শরীর ভাল তো?

স্যালি হিগিনস কেমন বিরক্ত গলায় বললেন, সবাই ভাল। তোমরা এতক্ষণ কোথায় ছিলে!

—আমরা তো স্যার ঠিকই খবর নিচ্ছি। কিন্তু কিছুতেই ধরতে পারছিলাম না।

স্যালি হিগিনস বললেন, দুপুর রাতে জাহাজডুবি হল কোনো খবর রাখো!

—ওটা স্যার কিছু না। মাঝে মাঝে জাহাজিরা এটা দেখে থাকে।

—তারে মানে!

—বছর দুই আগে এখানে একটা অয়েল-ট্যাংকার ডুবেছিল। কি করে আগুন লেগে যায়। একটা দিকতো বিস্ফোরণে উড়েই গেল। আর একটা দিক ডুবে গেল তারপর। কাউকে রক্ষা করা যায়নি। কেউ যেতেই পারেনি কাছে। চারপাশে আগুন কেবল আগুন। সারারাত সমুদ্রে সব আগুনের ফুলকি ভেসেছিল।

স্যালি হিগিনস শুনে কেমন হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি কি বলবেন বুঝতে পারছিলেন না, তখন আবার গলা ভেসে এল, মাঝে মাঝে এ সমুদ্রে এলেই কোনো কোনো জাহাজের নাবিকেরা এটা দেখে ফেলে। এমন আরও দু-একবার হয়েছে তাড়াতাড়ি এখান থেকে চলে যান।

স্যালি হিগিনস এমনই কিছু সন্দেহ করেছিলেন। তিনি এতটুকু বিচলিত হলেন না। কেবল রেডিও- অফিসারকে বললেন এসব ভৌতিক খবর গোপন রাখতে। জাহাজিদের ভেতর খবরটা ছড়িয়ে পড়া ঠিক না। শুধু বলে দিলেন জাহাজডুবি হয়েছে খবর সঠিক। অলৌকিক কিছু নয়। কারণ তিনি তাঁর প্রাচীন অভিজ্ঞতা থেকে এমন সব খবর আরও কিছু দিতে পারেন। তা ছাড়া তিনি তো সেই প্রথম থেকে এ জাহাজে এমন সব আরও ঘটনা দেখেছেন। চোখের ভুল বার বার ভাবতে চেয়েছেন। এবং সমুদ্রে শয়তানের পাল্লায় জাহাজ এভাবে পড়ে যেতে পারে তিনি বাদে আর কে বেশি বিশ্বাস করেন। তবু সবাইকে একটা জাহাজডুবির খবর দিয়ে নিরাপদে এখান থেকে চলে যাওয়া উচিত। তিনি খুব সহজভাবে নেমে এলেন। বোট থেকে এখন সবাই উঠে আসছে। এক এক করে সবাই দেখা করে যাচ্ছে তাঁর সঙ্গে। বনি একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। সারেঙ ছোটবাবুকে জড়িয়ে ধরেছে আর যারা ছিল সবাই এখন বোট-ডেকে হল্লা করছে। এবং বোট তুলে নেওয়া হচ্ছে। আবার এস.এস.সিউল-ব্যাংক সমুদ্রে ভেসে চলেছে। বোধ হয় টের পেয়ে গেছে ওর মৃত্যুর সমন এখন হেড-অফিসে টাইপ হচ্ছে। ক্রমশ সে কেমন ফের বেয়াড়া হয়ে যাচ্ছে চলায় ফেরায়। রাত বারোটায় কম্পাসের ডিভিয়েশান দেখে হিগিনস সেটা যেন আরও বেশি টের পেলেন। জাহাজ ঠিক চার্ট-মতো রান করছে না। আবার সে অস্থির হয়ে উঠছে।

॥ চল্লিশ ॥

রাতে মৈত্র ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখছিল।

ওর এটা আজকাল খুব বেশি হচ্ছে। ঘুমিয়ে পড়লেই সুন্দর সব স্বপ্ন দেখছে। এবং অধিকাংশ সময় স্বপ্নে ম্যান্ডেলা সমুদ্র-তীরে দাঁড়িয়ে থাকে। পায়ের কাছে ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাটা লাফায়। দূরে একটা পাইন গাছের ছায়ায় ছোট্ট সাদা রঙের বাড়ি, সামনে সব নানা বর্ণের গাছ-গাছালি।

স্বপ্ন দেখলেই সে আর যা দেখতে পায়, ম্যান্ডেলার মাথায় লাল রঙের টুপি, হাতে সাদা দস্তানা। ম্যান্ডেলার চুল সোনালী রঙের। ওর মুখ নরম আর কি তাজা। কেবল বুকে নিয়ে আদর করতে ইচ্ছে করে। কিন্তু ম্যান্ডেলাকে সে যেন কিছুতেই হাসিখুশি দেখতে পায় না। চোখ দু'টো ভারী ভারী, একটু আদর করলেই টস টস করে দু'গাল বেয়ে চোখের জল নেমে আসবে। তখনই ওর ইচ্ছে হল জাদুমন্ত্রে সে মেয়েটাকে কোনো দ্বীপে পৌঁছে দেবে। যেখানে জাহজডুবিতে একজন মানুষ সমূদ্রে আটকে পড়েছে। একটা নির্জন দ্বীপে সে আছে। ম্যান্ডেলাকে নিয়ে যেতে পারলে মানুষটার আর কোনো দুঃখ থাকবে না।

স্বপ্নটা ঘুরে ফিরে কখনও একই রকমভাবে বার বার সে দেখে ফেলে।

যেমন সে দেখে ফেলে সকাল হলেই ম্যান্ডেলা সমুদ্রের ধারে নেমে আসছে। ওর মা জানালায় বসে দেখতে পাচ্ছে, ম্যান্ডেলা বালিয়াড়িতে পায়ের ছাপ রেখে কেবল এগিয়ে যাচ্ছে। বাতাসে ওর চুল উড়ছে। চারপাশে ছুটে বেড়াচ্ছে ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাটা। সে পালকটা দিয়ে আসার পর মা তার ভাল হয়ে যাচ্ছে। আর ওর মা'র চোখে সেই দূরের সমুদ্র, যেন কতকাল পর তার ঘরের মানুষ ফেরার কথা, চোখ- মুখ উত্তেজনায় অধীর। ম্যান্ডেলার মা'কে সেই যে এক বাংলাদেশের নাবিক পালক দিয়ে গেল আর এল না। সাদা রঙের জাহাজ দেখলেই ম্যান্ডেলার মা'র মনে হত ওটা বসন্তনিবাসের জাহাজ। সে আবার এ-শহরে ফিরে আসছে। মা তার তখন সুন্দর নীল রঙের গাউন পরতে ভালবাসে। পায়ে সাদা রঙের জুতো। জাহাজিদের নীল রঙটা ভারি পছন্দ তার। ম্যান্ডেলার মা বোধহয় বুঝতে পারে সব। হাতে তার লাল রঙের দস্তানা।

শীত নেই তবু স্বপ্নে ম্যান্ডেলার মা দস্তানা পরে সমুদ্রের ধারে চলে আসে। ম্যান্ডেলার হাত ধরে দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু জাহজাটা নোঙর না ফেলে চলে যেত। নানারকম বার্চ গাছের নিচে ম্যান্ডেলার মা'কে সাদা পুতুলের মতো মনে হতো তখন।

এভাবে স্বপ্নে ম্যান্ডেলার দেশে শীত এসে যায় কখনও। বরফ পড়তে থাকে। পাইন গাছগুলো সাদা হয়ে যায়। একটা লাল রঙের বল আকাশে কেউ ছুঁড়ে দেয় তখন। বলটা গড়িয়ে নিচে পড়ে যায় না। আকাশের গায়ে লটকে থাকে সূর্যের মতো। তুষারপাতের সময় কখনও স্বপ্নে মৈত্র দেখতে পায় ম্যান্ডেলা আর তার মা জানালার কাঁচ বন্ধ করে বসে আছে। তুষারপাত দেখতে দেখতে বুঝি কখনও মনে হয় মাহিমের ঘোড়া পাহাড়ে যাচ্ছে সাদা মস্ খেতে। বরফের ছবি ফুলের মতো ভেসে থাকে জানালায়। হাত দিয়ে বার বার মুছে দিতে ভাল লাগে ম্যান্ডেলার।

কখনও স্বপ্নে বসন্তনিবাস দেখতে পায় সমুদ্রে বড় বড় তিমি মাছ ভেসে যাচ্ছে। সব সাদা তিমি মাছ। মাছের ওপর বরফ জমে, কখনও অতিকায় দ্বীপের মতো। সারি সারি পালতোলা নৌকার মতো ওরা ভেসে যায়। অথবা ওরা এক পাল ভেড়ার পাল যেন, জলের ওপর এমন অজস্র ছবি। ডলফিনগুলো লেজ নেড়ে নেড়ে একটা বাচ্চা মেয়ের কাছে চলে আসছে, আদর খেতে। স্বপ্নে বসন্তনিবাস ম্যান্ডেলাকে নিয়ে তখন সমুদ্রে নেমে মাছের সঙ্গে খেলা শুরু করে দেয়।

আর এভাবে এক আশ্চর্য সুষমা তৈরি হয়ে গেলেই ম্যান্ডেলার মা'র বোধহয় মনে হয়

আগামী বসন্তে আবার সেই বসন্তনিবাস চলে আসবে। পাইন-পাতার লম্বা বাঁশি থাকবে তার হাতে। সে আর ওয়াকা এবং শহরের সব ছেলেদের পেছনে পেছনে ব্যান্ড বাজিয়ে যাবে। ব্যান্ড-মাস্টার বসন্তনিবাস।

আবার কোনো কোনো রাতে মৈত্র স্বপ্নে বসন্তনিবাস হয়ে গেলে দেখতে পায়, ওর জাহাজটা গভীর সমুদ্রে নোঙর ফেলে আছে। একটা বোটে সে নেমে যাচ্ছে। যেন কোনো দূরবর্তী বন্দরে যাবার কথা। যাবার পথে দেখা করে যাচ্ছে ম্যান্ডেলা আর তার মা'র সঙ্গে। কি যেন ওদের দিয়ে যাবার কথা আছে।

কোনো কোনো রাতে ম্যান্ডেলা আর তার মা সারারাত যেন জেগে থাকে। দূরে একটা জাহাজ নোঙর ফেলে আছে, জাহাজ থেকে কেউ আসবে। ওরা সারা-রাত, দরজা খুলে দেবে বলে জেগে বসে আছে। যদি বসন্তনিবাস এসে ফিরে যায়। রিন-রিন্ করে তখন বসন্তনিবাসের মাথায় একটা আশ্চর্য বাজনা বাজতে থাকে। মানুষের সুখ-দুঃখের অতীত এক জাদুকরের বাজনা, সে তখন জেগে নিজের ভেতরই নিজে বিভোর হয়ে থাকে। তার আর কিছু ভাল লাগে না।

কখনও সে স্বপ্নে দেখতে পায় সমুদ্রে ঝড় উঠলেই ম্যান্ডেলার মা ভীষণ দুঃখী। ঝড় উঠলেই বুঝি ম্যান্ডেলার বাবার কথা খুব বেশি করে মনে পড়ে যায়। এবং যেবারে ওর বাবা ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাটা নিয়ে এসেছিল সেকি আনন্দ আর উৎসব বাড়িতে। সারাক্ষণ বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে, তখন তো ম্যান্ডেলা আরও ছোট, সে বাচ্চাটাকে সামলাতে পারত না, ফাঁক পেলেই দু' লাফে পালিয়ে যেত এবং এক রাতে যখন বাচ্চাটাকে খুঁজে পাওয়া গেল না, ম্যান্ডেলার কি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না! কিন্তু সকালে কি আশ্চর্য, দরজা খুললে ম্যান্ডেলা দেখতে পেয়েছিল বাচ্চাটা গুঁড়ি মেরে দারজার কাছে শুয়ে আছে। ম্যান্ডেলা বলেছিল, সেবারই যে বাবা জাহাজে গেল আর ফিরে এল না। স্বপ্নে বসন্তনিবাস সে-সব হুবহু দেখে গুম মেরে বসে থাকত। তার কিছু ভাল লাগত না।

স্বপ্নে মাঝে মাঝে ম্যান্ডেলার সঙ্গে কথাবার্তা হলে সে শুনতে পায়, ম্যান্ডেলা করুণ মুখে বলছে, তারপর আর বাবা ফিরে এল না। মা বিছানা নিলে। মনে হয়েছিল মা বাঁচবে না। যেমন বাবা সমুদ্রে চলে গেছে মা'ও তেমনি একদিন কোথাও চলে যাবে।

বসন্তনিবাসের তখন কতরকমের ইচ্ছে হয়। ইচ্ছে হয় পৃথিবীর কোথাও থেকে সে একটা জাদুকরের টুপি নিয়ে আসবে মেয়েটার জন্য, ক্যাঙ্গারুর বাচ্চাটার জন্য একটা ঘন্টা। ম্যান্ডেলা টুপি পরলেই যেখানে খুশি চলে যেতে পারবে, সঙ্গে ওর প্রিয় ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা হাইতিতি। ম্যান্ডেলা আর হাইতিতি বাতাসে ভেসে যাবে, এবং সঙ্গে সে। তারপর পৃথিবীর যেখানে যত দ্বীপ আছে, খুঁজে দেখবে কোথায় আটকা পড়েছে মানুষটা। যেন হাইতিতি গন্ধ শুঁকে টের পেয়ে যাবে এবং পেলেই ওরা কোনো নির্জন দ্বীপে পাহাড় গাত্রে দেখতে পাবে মানুষটা দাঁড়িয়ে তার মেয়ের ছবি আঁকছে। নির্জন দ্বীপে সে সময় পেলেই বালিয়াড়িতে অথবা পাহাড়ের গায়ে মেয়ের ছবি এঁকে যায়। তার শরীরে পাতার পোশাক। ঘাসের কুটিরে সে থাকে। কচ্ছপের ডিম খেয়ে মানুষটা বেঁচে আছে দ্বীপে।

আর যা ভাবে বসন্তনিবাস, যেন মানুষটাকে নিয়ে ফিরতে পারলেই, ম্যান্ডেলার মা'র অসুখ সেরে যাবে। ম্যান্ডেলাকে ফেলে কোথাও আর চলে যাবে না।

রাতে আবার সে স্বপ্ন দেখল! ম্যান্ডেলার জন্য সে নিয়ে গেছে জাদুকরের টুপি আর হাইতিতির জন্য একটা ঘন্টা। জানালায় দাঁড়িয়ে আছে ম্যান্ডেলা। চারপাশে সাদা জ্যোৎস্না। আর গীর্জায় ঘন্টা বাজছিল। সমুদ্র থেকে এলোমেলো বাতাসে সবুজ পাইনের বন যেন উড়ছে। বসন্তনিবাস বাতাসে ভাসতে ভাসতে পাইনের বন পার হয়ে গেল। এবং ঠিক জানালার পাশে ছোট্ট উইলোর ঝোপে নেমে ডাকল, ম্যান্ডেলা, হাইতিতি। জানালায় ম্যান্ডেলা, ওকে দেখে চিনতে পারছে না। সে যত বলছে, আমি বসন্তনিবাস, আমাকে চিনতে পারছ না? হাইতিতি পিট্পিট্ করে তাকাচ্ছে আর তখনই ম্যান্ডেলা দৌড়ে বের হয়ে বলছে, কোথায় তুমি,

তোমাকে তো দেখতে পাচ্ছি না। আর তখনই বসন্তনিবাসের মনে হয়, সে তার মাথার পালকটা খুলে না ফেললে ম্যান্ডেলা দেখতে পাবে না। যেই না খুলে ফেলা, বসন্তনিবাস জ্বলজ্বল করে উঠল। বলল, মা কোথায়?

ম্যান্ডেলা বলল, বসন্তনিবাস তুমি কী সুন্দর, বসন্তনিবাস তুমি পাতার পোশাক পরে আছ কেন?

—তোমার মা কোথায়?

—মা ছুটি কাটাতে মারুয়াতে গেছে।

—সেটা আবার কোন দ্বীপ?

—সাউথ আয়লান্ডে।

—আমরা ওখানে এখন যেতে পারব না?

—অনেক দূর।

—তুমি কার সঙ্গে থাকো?

—বুড়ি মা আছে। ড়াকব?

—না না ডাকতে হবে না। এটা তুমি রাখো। এটা মাথায় পরলেই তুমি বাতাসে ভেসে যেতে পারবে। কেউ দেখতে পাবে না। ঘন্টাটা হাইতিতির গলায় ঝুলিয়ে দেবে। সেও তোমার সঙ্গে যেখানে খুশি ভেসে যেতে পারবে। কেউ দেখবে না। কেবল ঘন্টা বাজবে। লোকে শুনতে পাবে বাতাসে ঘন্টা বাজছে। আর কিছু বুঝতে পারবে না। বাতাসে ঘন্টা বাজলেই পৃথিবীর লোকেরা বুঝতে পারবে ম্যান্ডেলা তার বাবাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সঙ্গে তার প্রিয় ক্যাঙ্গারুর বাচ্চা হাইতিতি।

—তুমি আমাদের সঙ্গে থাকবে না?

—আমিও থাকব।

—কি মজা হবে। বলেই সে লাফাতে লাফাতে বসন্তনিবাসের কাছে চলে গেল। টুপিটা মাথায় পরে ফেলতেই হঠাৎ একটা ঘুড়ির মতো বোঁ করে ওপরে উঠে গেল। ভেসে যাচ্ছে। ভয় পেয়ে চিৎকার করে উঠল, বসন্তনিবাস, আমি উড়ে যাচ্ছি। আমি পড়ে যাব। মরে যাব।

বসন্তনিবাস হাসল, তুমি যা ইচ্ছে করবে, বলবে। যা বলবে, টুপিটা তাই শুনবে।

—আমি নামব। কোথাও আমি যাব না।

—কোথায় নামবে বল।

—বাড়িতে।

একেবারে ছোট্ট পুতুলটির মতো নেমে এল ম্যান্ডেলা। বসন্তনিবাস ম্যান্ডেলাকে তারপর কোলে নিয়ে ঘুরে বেড়াল সারা শহর যেখানে যত খাবার সব তিনজনে মিলে গর্ গর্ করে খেয়ে ফেলতে থাকল। যত প্লাস্টিকের খেলনা সব কিনে সে উজাড় করে ফেলল। যত সুন্দর সুন্দর পোশাক সব সে ম্যান্ডেলার জন্য কিনে ফেলল। যেন ম্যান্ডেলাকে পৃথিবীর সবকিছু দিয়ে যেতে পারলে তার আর দুঃখ থাকবে না।

সে বলল, ম্যান্ডেলা আর ভয় পাবে না?

ম্যান্ডেলা বলল, না।

—ভয় পেলে আমাকে ডাকবে। আমি চলে আসব। কেমন!

মেয়েটা ঘাড় কাত করে তাকাল। বলল, আচ্ছা। তারপর কেমন কুয়াশার ভেতর ম্যান্ডেলা এবং হাইতিতি হারিয়ে যেতে থাকল। আর মনে হল, কেউ ডাকছে তাকে। সে চোখ মেলে কিছুতেই তাকাতে পারছে না। সে বুঝতে পারছে এক নম্বর পরীর গ্রীজার ওকে জাগিয়ে দিয়ে

যাচ্ছে। এমন সুন্দর স্বপ্নটা তার নষ্ট হয়ে গেল। সে জেগে চুপচাপ শুয়ে থাকল। স্বপ্নের উষ্ণতা তার শরীরে লেগে আছে এখনও। প্রপেলার সমুদ্রের অতলে ঘুরছে, তার শব্দ পাচ্ছে শুয়ে। বোধহয় সমুদ্রে সামান্য ঝড়-ঝঞ্ঝা উঠেছে। পোর্ট-হোল দিয়ে জল নেমে আসছে নিচে। সে উঠে পোর্ট-হোল বন্ধ করে দিল। এবং এই হয়, জাহাজ প্রায় তিনদিন আগে বন্দর পাবার কথা। বন্দর পাচ্ছে না। ভয়াবহ কিছু ঘটছে জাহাজে, তারা কেউ তা বুঝতে পারছে না।

আর এ-সবে এখন তার কিছু আসে যায় না। বরং সে এখন এভাবে কেন জানি পৃথিবীতে একজন সত্যিকারের বসন্তনিবাস হয়ে বাঁচতে চায়। তার আবার কখনও ইচ্ছে হয়, চুপচাপ এভাবে সারাজীবন সমুদ্রে ভেসে বেড়াবে—ডাঙায় নামবে মাঝে মাঝে, দু'হাতে সব সুন্দরী মেয়েদের সাপ্টে খেয়ে ফেলবে, আবার কখনও মনে হয়, ওর তো কিছুই নেই পৃথিবীতে, বরং সে ম্যান্ডেলার জন্য একটা পাতার বাঁশি কিনবে। ওয়াকা, সে আর ম্যান্ডেলা এবং সেই হাইতিতি মিলে একটা সুন্দর পৃথিবী গড়ে তুলবে। তারপর মনে হয়, কেউ তো তার জন্য অপেক্ষা করে নেই। শরীরে বিজবিজে ঘা দেখা দিচ্ছে ফের। যেন তার খারাপ ইচ্ছেগুলো যখন মাথানাড়া দিয়ে ওঠে তখনই বিজবিজে ঘা তার শরীরে একটা সবুজ ঘন ঘাসের বীজের মতো ছড়িয়ে থাকে এবং যখন যেমন খুশি সুড়সুড়ি দিচ্ছে, তখন শুধু মদ্যপান আর কখনও সমুদ্রের ধারে ধারে ঘুরে বেড়ানো। বাতাসে দু'হাত তুলে সমুদ্রকে বলা, কি আরাম জীবনধারণে। ওর এক হাতে সেই বড় মাপের জনি-ওয়াকার, সে সেটা যেন আকাশের অথবা সমুদ্রের মাথায় বাড়ি মেরে সহজেই ভেঙে ফেলতে পারে।

সে পোর্ট-হোলে দাঁড়িয়ে এমন সবই কেবল ভাবছে। ছোটবাবুর সঙ্গে কতদিন যেন দেখা হয় না। দুই গ্রহের এখন মানুষ তারা। আগে তবু খোঁজখবর নিত। আজকাল প্রায় সে এদিকটায় আসেই না। একবার ইচ্ছে হয় ছোটবাবুকে সে ডেকে বলে, খুব বড় হয়ে গেছিস না। আমি আর কেউ না? আমরা বাদে জাহাজে আর তোর কে ছিল। কেমন ওর পৃথিবীতে এভাবে সবার ওপর আশ্চর্য অভিমানে চোখ ফেটে জল আসে—আমি আর থাকব না জাহাজে। দেখবি, এবারে ঠিক নেমে যাব। আমাকে তোরা কেউ খুঁজে পাবি না।

তারপর ফের ভেবে ফেলে, কি সব আজেবাজে সে ভাবছে। ছোটর তো এখন অনেক কাজ, অনেক দায়িত্ব। জাহাজের মেরামত সারাদিন লেগে আছে। নিঃশ্বাস ফেলারই সময় নেই। দেখা করবে কখন আজ সকালে ওয়াচ থেকে ফিরে এসে শুয়ে পড়বে না। জেগে থাকবে। ছোটর সঙ্গে দেখা করবে। বলবে, ছোট তুই আমাকে চিনতে পারিস? আমি তোর মৈত্রদা। ভুলে যাসনি তো।

সকালে মৈত্র দেখা করতে গেলে ছোট বলল, আমি তোমাকে ভুলব কি করে! আমি রোজই ভাবি। একবার তোমার ফোকসালে যাব। কিন্তু কি যে হচ্ছে জাহাজে, তুমি দেখছ তো সারাক্ষণ এটা ভেঙে যাচ্ছে, ওটা ভেঙে পড়ছে। কখন কি হবে কেউ বলতে পারে না। তারপরই সে কেমন সতর্ক হয়ে যায়। এসব কথা বলা অনুচিত। একান্ত গোপন খবর, মাঝে মাঝে বনি তাকে কিছু কিছু বলে ফেলে। বনি! আশ্চর্য নাম। ওর কেবল বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, দাদা, জ্যাক তো ছেলে নয়। মেয়ে। তোমরা মনে মনে যা ভাবো ঠিক। বোধ হয় গোপন থাকছে না। কারণ এখন তো সে দেখলেই বনিকে বুঝতে পারে, বনি যতই ঢোলা পোশাক পরে থাকুক, ওকে পুরুষ মনে হয় না। ওর শরীরের গঠন একটু মনোযোগ দিলেই বোঝা যায় পুরুষের শরীর এমন হবে কেন। বুকের নিচু অংশে কেমন সহসা সমান্তরাল এবং সামান্য বেশ বেখাপ্পা লাগে দেখতে। এটাও হতে পারে, জাহাজে একজন মেয়ে থাকবে ভাবতেই ভীষণ বিস্ময়। বরং ওর শরীরে একটু অন্য মেজাজ আছে, মেয়ে মেয়ে ভাব আছে এই পর্যন্ত। তবু একবার সংগোপনে বলতে ইচ্ছে হচ্ছিল, আচ্ছা দাদা, জ্যাককে তোমরা কি ভাবো! তারপর আর যা মনে হয় সে তো বার বার পরীক্ষার সম্মুখীন হয়েও প্রথমদিকে বিশ্বাস করতে পারেনি জ্যাক মেয়ে। আজগুবি ভাবনা ভেবে সে বার বার জ্যাককে দূরে সরিয়ে রেখেছিল। এবং যা হয়ে থাকে, জাহাজে উঠে কেমন সমকামিতায় পেয়ে বসে। সব পুরুষের শরীরে তখন মেয়ে

মেয়ে গন্ধ—জ্যাক তো অসামান্য সুন্দরী, নীলাভ বড় চুল, ঢোলা কিছুটা বেল-বটসের মতো পোশাক, সহজেই মেয়ে ভাবতে ভাল লাগে। দুর্বলতা এভাবে উঁকি মারবে বেশি কি?

ছোট বলল, বিকেলে আমরা বন্দর পাচ্ছি দাদা।

—ক'দিন থেকেই তো শুনছি।

ছোটবাবু বলতে পারত, কম্পাস রিডিং-এ বেখাপ্পা ডিভিয়েশান। ভুতুড়ে জাহাজ, সমুদ্রে সবাইকে ঘুরিয়ে মারছে। কাপ্তান কিছুতেই সেটা স্বীকার করছে না। কেবল অফিসারদের ধমকের ওপর রাখছে। কেউ এদিক-ওদিক কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না। ছোটবাবু বলল, ঠিক আমরা বন্দর,পেয়ে যাব।

এবং বিকেলে ওরা ঠিকই বন্দর পেয়ে গেল। দ্বীপ দেখে কেউ নিচে ছিল না। সবাই ওপরে উঠে এসেছে। সামোয়ার গেটওয়ে দেখা যাচ্ছে। নিউ-প্লিমাউথ থেকে জাহাজ চোদ্দ দিনের মাথায় বন্দর পাবে কথা ছিল। কিন্তু হিসাব করে দেখা গেল সোজা তিন হপ্তা লেগে গেছে। পাগো-পাগো শহরের ইট কাঠ দালান, পাহাড়ের ছায়া এবং গাছের জঙ্গল ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

ওরা ক্রমে, দেখতে পেল, এখানে বন্দর বলতে তেমন কিছু নেই। জাহাজ নোঙর ফেলে দাঁড়িয়ে থাকে। সামনে ছোট ছোট পাহাড়। তারপর ওরা দেখতে পেল, জাহাজ ক্রমে আরও এগিয়ে যাচ্ছে। থামছে না। রাত নেমে আসে। বন্দরে জাহাজ কেন যে নোঙর ফেলছে না।

আসলে জাহাজটা ওখানে নোঙর ফেলার কথা না। দ্বীপের পাশে পাশে জাহাজ চলছে। এতদিন জাহাজ সোজা উঠে এসেছে প্রায় পঁচানব্বই ডিগ্রীতে। এখন জাহাজ সোজা বাইশ ডিগ্রীতে ঘুরে যাচ্ছে। ওরা গেটওয়ে পার হয়ে ওয়েস্টার্ন সামোয়ার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। পরদিন দুপুরের দিকে এরা ঠিক ঠিক বন্দর পেয়ে গেল। বন্দর বলতে কিছু অবশ্য দেখা যাচ্ছে না। সারি সারি পাহাড় এবং দীর্ঘ বালিয়াড়ি ডান দিকে। সমুদ্রে মাছ ধরার নৌকা। অসংখ্য নারকেল গাছ আর সেই আনারসের খেত। তাহিতির মতো প্রায় হুবহু দেখতে দ্বীপটা। বোধ হয় সাউথ প্যাসিফিকের সব দ্বীপগুলোর গাছপালা অথবা তার ছোট ছোট পাহাড় এবং উপত্যকায় সব বর্ণময় ফুল ফুটে থাকা—একরকমের। ওরা দাঁড়িয়ে ছবির মতো দ্বীপ এবং দ্বীপবাসীদের দেখার চেষ্টা করছিল। ডেভিড তেমনি বাইনোকুলার নিয়ে বসে গেছে। সে আঁতি-পাতি করে খুঁজছে একটা মেয়ে। ছোটবাবু চলে যাচ্ছিল পাশ কাটিয়ে। সে আজ বলল না, এনি ওম্যান সেকেন্ড। সে কেমন নির্বিকার। ডেভিড মনে মনে হাসছে। জ্যাককে ভীষণ ভয় ছোটবাবুর।

তা যা হোক জ্যাক দাঁড়িয়েছিল চার্ট-রুমের দরজায়। এখন যতটা সম্ভব ডেভিড লুকিয়ে থাকতে চায়। জাহাজ বাঁধাছাদা হলে সে যেমন একা নেমে যায় অথবা সঙ্গে ছোটবাবু, ছোটবাবু থাকলে বেশ জমবে ভাল। সামোয়ান মেয়েরা বেঁটে হলে কি হবে, ভারি মজবুত। রং তামাটে, তা হোক—ওরা যখন গ্লাসে কাভা ঢেলে দেয় কি যে সুন্দর, এবং আশ্চর্য নেশা, গাছের মূল থেকে তৈরি মদ, কিছু লবস্টার বাদাম তেলে ভাজা, ভারী মনোরম খেতে। সে কিছুতেই জ্যাকের পাল্লায় পড়ে যাবে না। যেন শিশু নাবালকটিই আছে বোঝে না কিছু, জানে না কিছু। আমি নেই এর ভেতর। আমি বাপু পারব না, অন্য কাউকে দ্যাখো। সে যাতে জ্যাক দেখতে না পায়, দেখে ফেললেই বাবাকে আবদার করবে, আমি ডেভিডের সঙ্গে যাব। ভারি বয়ে গেছে, এমন একটা বেয়াদপ ছোকরাকে নিয়ে ঘুরতে। সে প্রায় বোটের নিচে কিছুটা হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে গেল। যেন কিছুতেই ওকে কেউ দেখতে না পায়।

তখন ছোটবাবু ডাকছিল, এলবা। তুমি কোথায়। সে পকেটে খাবার নিয়ে এলবাকে খুঁজছে। আশ্চর্য, পাখিটা দ্বীপের কাছাকাছি এসে আবার কোথায় হারিয়ে গেল। সে সকালেও দেখেছে জাহাজের পেছনে এলবা উড়ে আসছে। এখন কোথাও নেই। সে তাড়াতাড়ি বোট-ডেকে উঠে সোজা বাইনোকুলারটা ডেভিডের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল। তারপর যতদূর চোখ

যায় দেখছে, চারপাশে সে খুঁজছে—কোথায় এলবা! নেই। কেবল অসংখ্য ছোট ছোট পাখি, কবুতরের মতো, কখনও ওর দূরবীনের কাঁচে পড়ে ভীষণ বড় হয়ে যাচ্ছে, আবার খালি চোখে ভীষণ ছোট হয়ে যাচ্ছে। প্রায় সাদা পায়রার মতো সমুদ্রে ঝাঁকে ঝাঁকে বসে থাকছে আবার উড়ে যাচ্ছে। অতিকায় সোনালী ডানার পাখিটা কাছে কোথাও নেই। থাকলেও গভীর সমুদ্রে কোথাও বসে রয়েছে। ভেসে বেড়াচ্ছে, ডুব দিয়ে হয়তো নীল জলে ছোট ছোট মাছ ধরে খাচ্ছে। ডাঙার কাছাকাছি পাখিটা কিছুতেই কেন যে থাকতে চায় না!

আবার মনে হয়, হয়তো পাখিটা শেষ পর্যন্ত জাহাজ ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু বার বার দেখেছে জাহাজ গভীর সমুদ্রে ঢুকে গেলেই এলবা পেছনে উড়তে থাকে। যেন কোথাও ওৎ পেতে বসে থাকে, কখন জাহাজ আবার সমুদ্রে ভেসে পড়বে। এই নিয়ে তিন তিন বার এলবা ডাঙা এলে নিখোঁজ হয়ে গেছে। ওর মনটা কেমন ভার হয়ে গেল। এবং একদিন সে সত্যি দেখবে পাখিটা আর জাহাজের পেছনে উড়ছে না। এ-সব মনে হলেই তার ভাল লাগে না। জ্যাক ওপরে দাঁড়িয়ে তখন ডাকল, হাই।

ছোটবাবু ওপরে তাকাতেই দেখল, ঠিক মাথার ওপরে জ্যাক। খুব হাসছে।

ছোটবাবু বলল, হাসছ কেন!

—আমরা বিচে যাচ্ছি।

—বিচে মানে?

—বারে, দেখতে পাচ্ছ না। কত সুন্দর বিচ্ সামনে।

—আমি যাচ্ছি মৈত্রদাকে নিয়ে।

—তুমি যাবে না আমাদের সঙ্গে?

—না। আমি মৈত্রদার সঙ্গে যাব। সে বলতে চাইল, তোমার খুশিমতো আমি কিছু করব না। সে একটু শক্ত হতে চাইল।

—বাবা নিয়ে যাবে।

ব্যাস মুখ চুন হয়ে গেল ছোটবাবুর। সে বলল, এই।

—কি!

—নিচে এস না।

—কি হয়েছে। বনি সোজা নিচে এসে বলল।

—আমি যেতে পারব না। একটু ম্যানেজ কর না।

—আচ্ছা বাবাকে বলব।

—আরে শোনো। তুমি বলবে না যেন আমার যেতে ভাল লাগছে না।

—বলব না।

—আরে শোনো, এত লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে যাচ্ছ কেন। আমাকে সবটা বলতে দাও।

—বল। সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বনি থেমে গেল। এবং সেই নীলাভ সমুদ্রে তখন ছোট ছোট ঢেউ। দুরন্ত বালিকার মতো চঞ্চল।

—বড়-টিণ্ডালের শরীরটা ভাল না। আর সে হয়তো বলেই ফেলেছিল, ডাক্তারের কাছে আবার যেতে হবে। কিন্তু খুব বুদ্ধিমানের মতো বলল, বুঝতে পারছ তো বড়-টিণ্ডালের মাথাটা গেছে। আমাদের তো জাহাজে কেউ নেই। আমরাই আমাদের সব। বড়-টিণ্ডালকে নিয়ে একটু শহরটা ঘুরব।

বনি উঠে যাচ্ছিল। কিছু না বলেই সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠে যাচ্ছে। ছোটবাবু সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে বেশ জোরে বলল, এই জ্যাক, তুমি কিছু বললে না!

—কি বলব!

—তিনি আবার রাগ করবেন না তো?

—সে আমি কি জানি!

—ধুস্। যত সব বাজে ব্যাপার। এই জ্যাক, তুমি নিচে এস বলছি।

জ্যাক আবার সুড়সুড় করে নেমে এল।–শোনো, তুমি সব পার। তুমি শোনো। এখানে এস, বসি বলেই বসতে যাবে যখন, দেখল, বোটের নিচে ডেবিড হামাগুড়ি দিচ্ছে। ডেবিড পালাতে চাইছে। ছোটবাবু অবাক, ডেবিড এ-ভাবে হামাগুড়ি দিচ্ছে কেন?—কি ব্যাপার! সে ডাকল, ডেবিড তুমি এখানে কি করছ!

ইশারায় কথা বলতে বারণ করে ডেবিড ও-পাশে লাফ দিয়ে নেমে গেল। বনি হেসে দিল। —ডেবিড ভেবেছে ওকে নিয়ে আমি শহর ঘুরতে যাব। তারপরই কেমন মুখ ভারী করে ফেলল জ্যাক। সে বলল, আসলে তোমরা কেউ আমাকে পছন্দ কর না ছোটবাবু। মাঝে মাঝে কি যে খারাপ কাজ করে ফেলি!

—আরে না না। তুমি যে কি না, তুমি আবার খারাপ কাজ কোথায় করতে গেলে!

—আমি খুব খারাপ মেয়ে। তুমি না বললেও এটা বুঝি। আমার রাতে কিছুতেই ঘুম আসতে চায় না। কেবল সারারাত কি যে আজেবাজে স্বপ্ন দেখি।

ছোটবাবু বলল, স্বপ্ন দেখলে খারাপ হয় না। সবাই স্বপ্ন দেখে। আমিও দেখি। যে স্বপ্ন দেখে না সে মানুষ না।

বনি বলল, জানো, শহরটার খুব সুন্দর নাম—আপিয়া।

ছোটবাবু বলল, হাওয়াই থেকে অস্ট্রেলিয়ায় যাবার মাঝা মাঝি সমুদ্রে এমন একটা সুন্দর শহর আছে কে বলবে!

বনি বলল, আমার কতরকমের ইচ্ছে হয় ছোটবাবু।

ছোটবাবু বলল, সেটা সবারই হয়। আমার হয় না!

—তোমার মনে আছে ছোটবাবু তাহিতিতে দু'জোড়া ফিন্ কিনেছিলাম। দু'টো মাছ মারার বর্শা।

—হ্যাঁ। সত্যি তো। ওগুলো কোথায়?

—আছে।

–দেশে গিয়ে সমুদ্রে বেশ মাছ ধরতে পারবে। কাজে লাগবে, নষ্ট হবে না।

বনি পারলে যেন এক্ষুনি দৌড়ে পালায়। এমন নিষ্ঠুর প্রকৃতির মানুষ সে জীবনেও দেখেনি। বনি আর বলতে পারল না, ও দু'টো তোমাকে নিয়ে সমুদ্রে সাঁতার কাটব বলে কিনেছিলাম। সমুদ্রের নিচে মাছ ধরব বলে কিনেছিলাম। তুমি আমি। আর কেউ না। বনি তো বুঝতে পারছে না, ছোটবাবু কিছুতেই আর আশকারা দিতে চাইছে না। কারণ, ছোটবাবু শুধু একবার বলেছিল সে জেগে থাকে। কখন দরজায় বনি এসে না জানি বলবে, দরজা খোলো। তারপর থেকে যেন গভীর রাতে শুনতে পায়, বনি দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকছে। আর তারপরই বনি জাহাজে যা করল! কোনো ভয়ডর নেই। এত মরিয়া হয়ে উঠলে ভাল লাগে! ছোটবাবুর তো ভয় করারই কথা। সে তো আর কাপ্তানের ছেলে নয় যে যা খুশি করতে পারবে। অথচ কোনো দোষ হবে না। এবং সেই এক ভয় থেকে সে যেন আবার যতটা পারছে, দূরে থাকতে চাইছে। যদিও সে জানে, বনিকে নিয়ে, যে কোনো জায়গায় চলে যাবার মতো রোমাঞ্চ সে আর কিছুতে পাবে না। এবং সে চোখ বুজলেই টের পায় বনি পরেছে সোনালী জ্যাকেট, লম্বা স্যু, পাজামা আর মোটা বেল্ট কাউ-বয়দের মতো, সমুদ্রের পাড়ে পাড়ে ওরা দু'জনে কেবল ছুটছে।

খুব হতাশ গলায় বনি বলল, আমি যে খারাপ বাবাও বোধ হয় টের পেয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে ছোটবাবুর মুখ একেবারে ব্যাজার হয়ে গেল। তবে কি কাপ্তান টের পেয়েছেন, সেও ভাল ছেলে নয়। সে বনির সব দেখে ফেলেছে। ছোটবাবু বলল, আমার কথা কিছু বলেছেন?

বনি বুঝতে পারল ভীষণ স্বার্থপর ছোটবাবু। সে নিজেকে ছাড়া কিছু আর ভাবে না। তার বলতে ইচ্ছে হল, হ্যাঁ বলেছেন। তুমি এমন দামী সার্টিনের গাউন ফালা ফালা করে দিয়েছ, আমি বুঝি চুপ করে থাকব! বাবা সব জানে। বাবা তোমাকে গিলোটিনে দেবে বলেছে। তারপরই ওর আবার কি যে হয়ে যায় ভেতরে—সে ছোটবাবুকে নিয়ে কখনও এমন নিষ্ঠুরতার কথা ভাবতে পারে না। ছোটবাবু কিছুই বুঝতে পারে না। দুঃখে চোখ তার ভারী হয়ে আসছে। সে বলল, ছোটবাবু তুমি কবে মানুষ হবে!

—কেন কাপ্তান যে আমাকে বলেন, তুমি খুব বড় হবে। সারেঙ যে বলে, তুই আমার মান রেখেছিস! মানুষ হয়ে গেছিস। কিন্তু বনি কোনো সাড়া দিচ্ছে না। বনি কেমন সামান্য ঝুঁকে বসে রয়েছে! ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না। ওর সুন্দর হাত, আর আঙ্গুলগুলো একেবারে কাছাকাছি মাখনের ছোট ছোট স্লাইস যেন। সজীব আর তাজা! গোলাপী আভা মুখে। ভেতরে ভেতরে ছোটবাবু এসব দেখলে মাঝে মাঝে একেবারেই স্থির থাকতে পারে না। বনি সামান্য আহত হলে ওর ভেতরটা কেমন কাঁপে। তখন নুয়ে বনির সব মুখটা না দেখতে পেলে সে কেমন অস্থির হয়ে পড়ে।

বনি তবু কোনো কথা বলল না। সে মুখ নিচু করে রেখেছে। এবং ওপরে চার্ট-রুমে কাপ্তান। চিফ- মেট দেখে গেল ওরা দু'জনে পাশাপাশি বসে আছে। এখন ছুটির সময়। জাহাজ বাঁধাছাদা হয়ে গেলে প্রায় সবারই ছুটি হয়ে যায়। এতদিন সমুদ্রে এক-নাগাড়ে থেকে থেকে ওরা এখন সবাই যে যার মতো নেমে যাবে বন্দরে। কেউ কোনো প্রশ্ন করবে না। কেবল ওরা দু'জন এখনও চুপচাপ বোট-ডেকে বসে আছে। কেউ কথা বলছে না।

ছোটবাবু বলল, বনি, কি হচ্ছে! কথা বলছ না কেন!

বনি মুখ তুলে তাকাল। চুলের ভেতরে বনির মুখ দেখা যাচ্ছে। চোখে তার আশ্চর্য মায়া। ছোটবাবু বলল, এই বনি, তিনি কি টের পেয়েছেন!

—জানি না।

—তবে তুমি আমাকে ভয় দেখাচ্ছো কেন?

—তোমাকে ভয় কোথায় দেখালাম!

—বারে, তুমি খারাপ হলে আমি খারাপ হয়ে যাব না। আমি তো কিছু করিনি। এবং ছোটবাবুর মুখ চোখ ভীষণ কাতর দেখাল।

বনি সামান্য হাসল। সে ছোটবাবুর দুঃখী মুখ একদম সহ্য করতে পারে না। সে যেন সাহস দিচ্ছে ছোটবাবুকে। শুধু বলল, বাবা টের পেয়েছে, আমি বড় হয়ে গেছি।

—বললেন বুঝি, তুমি বড় হয়ে গেছ!

–ডেবিডের সঙ্গে বেড়াতে বের হব বললাম। সঙ্গে তুমি থাকবে। তিনি রাজী হলেন না। বললেন, আমি যাব। আমার সঙ্গে তুমি চল। তারপর আমার মুখের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন। কি ভাবলেন। বললেন, ছোটবাবুকে বল সে আমাদের সঙ্গে যাবে।

ছোটবাবু বলল, তাহলে আমি যাব বনি। মৈত্রদার একটা ব্যবস্থা করে আসছি। বংকুকে বলে আসি, সে সঙ্গে থাকবে। বেশী দেরি হবে না। তুমি আমাকে ফেলে কিন্তু চলে যাবে না। সে পিছিলের দিকে ছুটে যেতে থাকল।

এবং তারপর যা হয়ে থাকে, সবার মতো স্যালি হিগিনস, বনি, ছোটবাবু জাহাজ থেকে নেমে গেল। জাহাজ বয়াতে বাঁধা। ওরা মোটর-বোটে নেমে গেল। তখন আপিয়া শহরে

বিকেলের রোদ। তখন নারকেল গাছে সমুদ্রের বাতাস, সামোয়ান নরনারীদের বিচিত্র পোশাক রোদে ঝিকমিক করছে। ওরা শহরে ঢুকে গেল। গাড়ি ওদের ঠিক করা ছিল। দু'পাশে সব পাহাড়ের ছায়া। সবুজ আভা গাছের জঙ্গল চারপাশে। সুন্দর সুন্দর সব পাহাড়ী ঘর-বাড়ি ছোট ছোট উপত্যকাতে। পেছনে বনি আর ছোটবাবু সামনে কাপ্তান স্যালি হিগিনস। ওরা বিচ্ ধরে কেউ হেঁটে গেল না। ওরা শহরের ভেতর ক্রমে ঢুকে যেতে লাগল।

আর সব গল্প। যেতে যেতে স্যালি হিগিনস এই দ্বীপের সব প্রাচীন গল্প-গাথা এক এক করে বলে যেতে থাকলেন। কবে প্রথম সাতসমুদ্র পার হয়ে মিশনারিরা চলে এসেছিল। কবে এসেছিলেন রবার্ট লয়াস স্টিভেনশান। মার্গারেট মিড এবং সমরসেট মম সুযোগ পেলেই এখানে এসে কিছুদিন কাটিয়ে যান। যখনই তাঁদের কিছু ভাল লাগে না, এমন একটা বন্য পৃথিবীতে তাঁদের চলে আসতে ইচ্ছে হয়। কি সব গাছপালা আর সবুজ পাহাড় দ্বীপে, কখনও চারপাশে থাকে শুধু রকমারি পাথর। সামোয়ান বন্য মেয়েদের গলায় থাকে ফুলের হার। এরা ফুলের অলংকার পরতে ভীষণ ভালবাসে। এদের দীর্ঘদিনের বন্যজীবন যাপনে রয়েছে অদ্ভুত এক শান্তিপ্রিয় স্বভাব। এখনও নগর-সভ্যতা এদের জীবন নষ্ট করে দিতে পারেনি। চারপাশে নীল সমুদ্র, দূরে পাগো-পাগো দ্বীপের ভালবাসা আর রয়েছে অসংখ্য প্রবাদ এই দ্বীপ সম্পর্কে। আর এই সব বনাঞ্চলে আছে সবুজ এক গন্ধ। একবার এই সব গভীর বনে ঢুকে গেলে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় না। ভেতরে রয়েছে অরণ্য মানুষের বসবাস। তাদের ভালবাসায় পড়ে গেলে মানুষের আর রক্ষে থাকে না।

তিনি কখনও একজন ভূতাত্ত্বিকের মতো কথা বলতে ভালবাসছেন। কখনও তিনি এদের জনসংখ্যা সম্পর্কে হুবহু বর্ণনা দিচ্ছেন। এই আটশ বর্গমাইলব্যাপী ভূখণ্ডে রয়েছে অজস্র ফসফেট। অস্ট্রেলিয়ার বড় বড় বন্দরগুলোতে ফসফেট নিয়ে যাওয়া হয়। আমাদের মতো এমনি অনেক জাহাজ শুধু সারা মাসকাল ফসফেট নিয়ে যায়। দু'লক্ষ লোকের বোধহয় এতেই চলে যায়। খুব কম এদের চাহিদা। আর যখন আছে চারপাশে এত বড় সমুদ্র তখন জীবনধারণের মতো সব কিছু তারা সহজেই পেয়ে যায়।

তিনি বলে যাচ্ছিলেন, এখানে ডিসেম্বর আর এপ্রিল পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের সময়। তোমাদের ভাগ্য ভাল, আকাশ এত পরিষ্কার। এখন তো শুধু ঝড় আর বৃষ্টিপাতের সময়। আমেরিকান সামোয়া আমরা পেছনে ফেলে এসেছি। ওটার চেয়ে আমার এ-দ্বীপটা বেশী ভাল লাগে। সব গাছপালা দেখে আমার তো এখানেই থেকে যেতে ইচ্ছে করছে। তোমাদের ইচ্ছে করছে না?

ছোট বলল, আমার খুব ইচ্ছে করছে।

—জ্যাক তোমার?

—আমার! সে কি বলবে ঠিক বুঝতে পারছে না। আমারও ইচ্ছে করে—কিন্তু বললেই যেন ধরে ফেলবেন, ছোটবাবুর জন্য তার ভীষণ টান। সে বলল, আমার ইচ্ছে করে না।

ওদের গাড়ি তখন সমুদ্রের ধারে ধারে যাচ্ছিল। জ্যাক বুঝতে পারছে না বাবা তাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। ছোটবাবুকে দেখলে মনে হয়, জীবনে ও যেন গাড়িতে চড়ার সুযোগ পায়নি। সে গাড়িতে উঠে বেড়াতে পারলেই খুশী।

তবে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, সে জানতে চায় না। পাশে সমুদ্র, সমুদ্রের ধারে ধারে গাড়ি বাঁক নিচ্ছে বার বার। আর ছোটবাবু বাচ্চা ছেলের মতো ভয় পাচ্ছে। বনি ওটা বুঝতে পেরে বলল, বাবা, ছাটবাবুকে এস আমরা এখানে নামিয়ে দি।

স্যালি হিগিনস বুঝতে পারছেন, বনি ছোটবাবুকে নিয়ে মজা করছে। ছোটবাবু হয়তো এক্ষুনি বলে উঠবে, না স্যার, আমাকে নামিয়ে দেবেন না। নামিয়ে দিলে আমি জাহাজে ফিরতে পারব না। আর বোধ হয় এ-জন্যেই ছোটবাবুকে তাঁর ভীষণ ভাল লাগে।

স্যালি হিগিনস বললেন, আমরা যাচ্ছি উপলুতে। এখন মাদা-পাসের ভেতর ঢুকে যাব। দু'পাশে তখন দেখতে পাবে আশ্চর্য সব প্রস্রবণ। স্রোতস্বিনী নদীর মতো পাহাড় থেকে

গড়িয়ে নামছে। আর দু'পাশে দেখবে কত সব বিচিত্র রকমের ফুল। যেন সারাটা পাহাড় ফুলের সমারোহে ডুবে আছে। আশ্চর্য ঘ্রাণ ফুলের। চারপাশটা ফুলের সৌরভে ম' ম' করছে।

ওরা ক্রমে এভাবে পাহাড়ের চড়াই-এ উঠে যাচ্ছিল। অনেক নিচে সমুদ্র। কিছুক্ষণ বাদে জ্যোৎস্না ওঠার কথা। এজেন্ট-অফিসের গাড়ি, বিশ্বস্ত ড্রাইভার—আর অতিকায় গাড়ির বনেটে মাঝে মাঝে দু'টো একটা ফুলের পাপড়ি উড়ে এসে পড়ছে অথবা প্রজাপতির মতো অসংখ্য ফুলের পাপড়ি বাতাসে ভেসে যাচ্ছে। ছোটাবাবু এসব দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে যাচ্ছিল। সে যে একজন সামান্য বাঙালী, সে যে ক্লাস টেনে ওঠার আগে রেলগাড়ি দেখেনি, এবং যে-বার দেশ ছেড়ে চলে আসে তখন গোয়ালন্দ- মেলে মুরগীর মাংসের গন্ধ এবং মাঝে মাঝে পদ্মানদীর অতিকায় ঢেউ দেখে সে যে ভয়ে জ্যাঠামশাইকে জড়িয়ে ধরেছিল এখন তাকে দেখে কিছুতেই আর তা বিশ্বাস করা যায় না। সে পরেছে হাল্কা চকলেট কালারের স্যুট। কালো বো। চকচকে জুতো, বুটিদার মোজা, সাদা ফুল-শার্ট। বনির বার বার ওকে ছুঁয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল। ছোটবাবুর শরীর থেকে আবার সেই চন্দনের গন্ধ উঠছে। নরম নীল রঙের দাড়িতে হাত রাখলে বনি বুঝি গাড়িতেই ঘুমিয়ে পড়বে।

বাবা পাইপ টানছেন। মাঝে মাঝে ছাই ছাইদানিতে ঝেড়ে ফেলছেন। দু'একজন সামোয়ান নারীপুরুষ রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। গাড়িটা এত বেশি জোরে ছুটছে যে সব ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে উঠছে। আর সেই ড্যাং ড্যাং বাজনার মতো। স্যালি হিগিনস তাঁর স্ত্রী, তাঁর জাহাজ, সমুদ্রের ঝড় সব এভাবে ভুলে যেতে চাইছেন।

—বুঝতে পারলে ছোটবাবু, উপলুতেই রবার্ট লয়াস স্টিভেনশান বাড়ি বানিয়েছিলেন। তাঁর দেশে ফিরে যেতে আর ইচ্ছে হয়নি। মাউণ্ট ভিয়াতে তাঁর সমাধি আছে।

ছোটবাবুর একবারও জানতে ইচ্ছে করছিল না কে এই স্টিভেনশান! সেতো সমরসেট মমের 'অফ হিউমান বণ্ডেজ' পড়েছে। এসব বই এখন জ্যাক ওকে সংগ্রহ করে দেয়। কখনও ডেবিড। তার চেয়ে চারপাশের দৃশ্যাবলী বেশী ভাল লাগছিল। পাশে জ্যাক। মাঝে মাঝে জ্যাক ওকে চুরি করে দেখছে। তখন কে স্টিভেনশন, কে মার্গারেট মিড, অথবা মাউণ্ট ভিয়াতে কার সমাধি আছে কিছু অসে যায় না। সে শরীর এলিয়ে দিয়েছে। ওর মাথার চুল উদাসীনভাবে বাতাসে ভাসছে। দ্বীপটা একজন লেখকের পক্ষে ভারী মনোরম জায়গা। তার মনে হল পৃথিবীতে শুধু লেখকদের সে হিংসে করতে পারে। সে তার এই সমুদ্রযাত্রায় যেসব বর্ণমালা দেখতে পেল কখনও তার হুবুহ বর্ণনা মানুষের কাছে যদি পৌঁছে দিতে পারত।

তখন স্যালি হিগিনস বললেন, ঐ যে দেখছ, সমুদ্রে আর একটা দ্বীপ ভেসে আছে, মনে হয় আলাদা দ্বীপ, আসলে ওটা আলাদা নয় একেবারে। ছোট্ট সরু, এই ফুট পাঁচেকের মতো একটা প্রবালের রাস্তা আছে। তারপরই ছোট্ট দ্বীপে আমরা বসে কফি খাব। ইচ্ছে করলে সমুদ্রের জলে তখন তোমরা প্রচুর স্যামন মাছ দেখতে পারো। দ্বীপের চারপাশে এখন দলে দলে স্যামন মাছ ডিম পাড়তে আসবে। সমুদ্রের অতলে রুপোলী মাছের ঝাঁক দেখার জন্য বহু লোক এখানে চলে আসে। কখনও শোনা যায় এক বাজনা। পাথরের ফাঁকে নিচে দেখা যায় শুধু নীল জল। মাছগুলো সমুদ্রে যখন লেজ নেড়ে চলে যায়, বুঝলে আমার মনে হয়, ওখানে সব স্ফটিক স্তম্ভ আছে কোথাও, যার চারপাশে ঘুরে বেড়ালে মনে হয় আশ্চর্য অর্কেস্ট্রা সমুদ্রের নিচে কেউ অবিরাম বাজাচ্ছে।

ছোটবাবু আর বনি দ্বীপে সেই জায়গাটা খুঁজে বেড়াল। স্যালি হিগিনস ওদের সঙ্গে হেঁটে পারছেন না। চারপাশে মনোহারিনী জ্যোৎস্না। আর শুধু পাথর। একটা গাছ নেই। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে নীল জল উজ্জ্বল আরশির মতো। একটা জায়গায় এসে ওরা থমকে দাঁড়াল। সমুদ্রের অতলে সুন্দর সব শব্দতরঙ্গ। ওরা কান পেতে শুনল, সত্যি সমুদ্রের অতলে কারা যেন কখনও উঁচু লয়ে, কখনও ধীরে ধীরে অর্কেস্ট্রা বাজিয়ে যাচ্ছে। আশ্চর্য এক মিউজিক!

ওরা তিনজন কতক্ষণ এভাবে সেই শব্দতরঙ্গের ধ্বনিতে অভিভূত ছিল, কতক্ষণ ওরা তিনজন সেই দ্বীপে চুপচাপ মাথায় হাত রেখে পাহাড়ে শুয়ে থেকেছিল মনে নেই—কেবল

মনে আছে, হঠাৎ ড্রাইভার চিৎকার করে ওদের তিনজনকেই সচকিত করে দিয়েছিল, স্যার আপনারা দেরী করবেন না। সমুদ্রে জোয়ার আসার সময় হয়ে গেছে। এবার চলে আসুন। জোয়ার এলে সমুদ্রের নিচে দ্বীপটা ডুবে যাবে।

তারপর স্যালি হিগিনস প্রায় পাগলের মতো বনি আর ছোটবাবুকে নিয়ে দৌড়েছিলেন। গাড়িতে উঠে বসেছিলেন। এবং জাহাজে ফিরে এসে শুনলেন বড়-টিণ্ডাল নিখোঁজ। বড় টিণ্ডালকে পাওয়া যাচ্ছে না। সবাই ফিরে এসেছে কেবল সে আসেনি। জাহাজে তখন ভীষণ গোলমাল শুরু হয়ে গেছে।

॥ একচল্লিশ ॥

ছোটবাবু তখন ডেকের ওপর দিয়ে জোরে ছুটছে। যাকে সামনে দেখছে তাকেই বলছে, বঙ্কু কোথায়। সারেঙ-সাব ছিলেন গ্যালির দরজায় দাঁড়িয়ে, ছোটবাবু সেখানে থেমে গেল, সামান্য দম নিল। বলল চাচা, বঙ্কু কোথায়?

—নিচে তো ছিল। বড়-টিণ্ডালকে পাওয়া যাচ্ছে না শুনেছিস?

বড়-টিণ্ডালকে পাওয়া যাচ্ছে না, পাওয়া যাবে। গভীর রাতে হয়তো সে ফিরে আসবে একা একা। একজন জাহাজি মানুষ রাতে ফিরে আসেনি, সকালে ফিরে আসবে। সকালে ফিরে না এলেই ভাবনার কথা, কিন্তু মৈত্রদা বঙ্কুর সঙ্গে ছিল, সহসা বঙ্কু দেখেছে, শহরে ভিড়ের ভেতর মৈত্র পালিয়ে গেছে। জাহাজে ফিরে ছোটবাবু এ-সব শুনেছিল।

তারপার আর যা শুনেছে, সেটা খুবই ভয়ের। বঙ্কু মৈত্রদাকে হারিয়ে খোঁজখুঁজি করছে, করতে করতে আপিয়া শহরের শেষ প্রান্তে দেখেছে ছোট ছোট বালির ঢিবি, সেখানে সব খরমুজের রস পান করছে মেয়েরা, সেখানে মৈত্র ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওর হাতে ছিল বড় মাপের একটা জনি-ওয়াকার। সে সেটা প্রায় বগলদাবা করে হাঁটছিল। ওর বিচিত্র পোশাক দেখে সবাই চোখ ট্যারা করে ফেলেছিল। এই যেমন শরীরে ছিল তার প্লাসটিকের খেলনা, সেফটিপিনে আটকানো সব নীল পাথরের মালা, ঝিনুকের পুতুল, হলুদ রঙের পাতার বাঁশি। এবং মাথায় লম্বা টুপি জোকারের মতো। সবাই, যেমন বুড়ো- বুড়িরা, অথবা যুবতীরা মৈত্রকে ঘুরে ফিরে দেখছিল। মৈত্র কথা বলছিল সবার সঙ্গে, সামোয়ান নারী-পুরুষেরা, অথবা কিছু বিদেশিনী যারা, খরমুজের রস চেটে খাচ্ছিল, তারা হাঁ করে দেখছিল।

কিছু ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ওর পায়ে পায়ে ঘুরছিল। সে সবাইকে গুড-আফটারনুন বলছিল। আর কথায় কথায় ম্যাণ্ডেলার গল্প, তার মায়ের গল্প বলছিল। ম্যাণ্ডেলার বাবার জাহাজডুবির গল্প বলছিল। একটা দু'টো করে লজেন্স চকোলেট দিচ্ছিল ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের। কাউকে কোলে নিয়ে আদর করতে করতে নীল রঙের পাথরের মালা পরিয়ে দিচ্ছিল।

বঙ্কু কোনো কথা বলছিল না। দূরে, আড়ালে দাঁড়িয়েছিল। কারণ জায়গাটা ছিল মেলার মতো। অথবা যা হয়ে থাকে বিকেলে সবাই বালিয়াড়িতে নেমে আসে, সমুদ্রের সাঁ সাঁ গর্জন শুনতে শুনতে—খরমুজের রস খেতে ভারি মনোরম, রস চেটে খাবার সময় মৈত্রের নাম জিজ্ঞাসা করলে বলেছিল—মি. বসন্তনিবাস। বসন্তনিবাস কথাটা ওদের কাছে স্পষ্ট না বলে সে আবার বলেছিল, মি. ব...স...ন্ত...নি...বা...স। আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?

সবাই প্রায় বাউ করার মতো বলেছিল, ইয়েস ই বসনটো নি....বা....স। নিবাস।

—ইয়েস মি নিবাস। বঙ্কু সব সময় আড়ালে আড়ালে ছিল। দেখে ফেললেই ফের ছুটে কোথাও মৈত্র পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল। গোপনে তাকে কেউ অনুসরণ করছে বুঝতে পারলেই আবার সে ছুটবে।

জাহাজে ফিরে ছোটবাবু এমন সব নানাজনের কাছে শুনেছে। সবাই ডেকে উঠে এসেছে। কেউ বোধহয় নিচে নেই। এবং কি করা যায়, কাপ্তানের কাছে ইতিমধ্যে রিপোর্টে হয়ে গেছে। তিনি ব্রীজে অফিসারদের সঙ্গে বোধ হয় পরামর্শ করছেন। আর ছোটবাবু ঘরে ঘরে খুঁজে বেড়াচ্ছে বঙ্কুকে। বঙ্কুর মুখ থেকে সব শুনতে না পারলে সে স্বস্তি পাচ্ছে না।

—বঙ্কু আছিস, বঙ্কু!

মনু বলল, এই তো এখানে ছিল। কোথায় গেল!

আবার সে ডাকল, বঙ্কু। বঙ্কু কোথায়?

ডেক-কশপ বলল, বঙ্কু বোধহয় মেস-রুমে গেছে।

কিন্তু ছোটবাবু ওপরে উঠে দেখল মেস-রুম খালি। করিডরে নানাজনের জটলা। কেউ চেঁচামেচি করছে, ভারী হট্টগোল, ওরা জাহাজে থাকবে না এমন বলছে। থাকলে বড়-টিণ্ডালের মতো ওরাও পাগল হয়ে যাবে। আসলে বড়-টিণ্ডালের কিছু হয়ে গেলে যেন ওরা আরও জোর পাবে। ওদের বিদ্রোহ করতে সুবিধা হবে। ছোটবাবুকে দেখে ফেললে সবাই চুপচাপ—একটা কথা বলছে না। কারণ ছোটবাবু তো আর ওদের সুখ-দুঃখ বুঝবে না। বেশ আরামে আছে, অফিসার মানুষ। ছোটবাবু ওদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালে সুবোধ বালক হয়ে যাচ্ছে সবাই।

এ-ভাবে ঘুরতে ঘুরতে ছোটবাবু টের পেল, সবাই ওকে ক্রমে অবিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে। কেউ ওদের উসকে দিচ্ছে, কে দিচ্ছে বুঝতে পারছে না। ডেবিড উত্তেজিত হয়ে আছে। এক বছর আরও জাহাজে থাকতে হবে, সে সবাইকে গোপনে বড়-টিণ্ডালকে কেন্দ্র করে উত্তেজিত করে রাখতে পারে। আসলে কেউ সঠিক বলতে পারছে না মৈত্রদার কি হয়েছে।

এবং এ-সময়ে মনে হল, মাস্তুলের নিচে কারা দাঁড়িয়ে সংগোপনে অন্ধকারে সলাপরামর্শ করছে। ছোটবাবু বলল, বঙ্কু তোকে খুঁজছি। মৈত্রদা কোথায়?

বঙ্কু বলল, জানি না।

—জানি না মানে!

—আমি কি করে জানব ছোটবাবু!

—বঙ্কু! এই প্রথম ছোটবাবু কেমন অহংকারী গলায় কথা বলল, আর যেন নতুন সে এক ছোটবাবু, সে আর আগের সেই ছোটবাবু নিরহঙ্কারী ছোটবাবু নয়। যেন কোনো এক জাদুবলে, ছোটবাবু, তার আত্মপ্রত্যয় খুঁজে পেয়েছে। সে বলল, ঠিক ঠিক বল, মৈত্রদা কোথায়! কোথায় ওকে শেষবারের মতো দেখেছিস! অহেতুক গুজব ছড়িয়ে সবার মাথা খারাপ করে দিস না।

বঙ্কু বলল, আমি তো তোর কথা মতো ওর সঙ্গেই ছিলাম। তারপর দেখি সে ভিড়ের ভেতর নেই। আমি কি করব!

—আর খুঁজে পাস নি?

—পেয়েছিলাম। ওর বগলে তখন একটা বড় মদের বোতল। সে সামান্য দম নিয়ে বলল, তারপর যা করে। একদল ছোট ছোট ছেলেপেলে। সে তাদের নিয়ে পাতার বাঁশি বাজাচ্ছিল। ঘুরছিল ফিরছিল। আড়ালে আড়ালে ওকে লক্ষ্য রাখছিলাম।

—তখন ক'টা বাজে?

—বিকেলে হবে। এই মানে সূর্য সমুদ্রে অস্ত যাচ্ছিল।

—কোথায় তখন তোরা?

সে বলল, বিচটা দেখছিস? বেশ লম্বা বিচ। অনেক দূরে কাল সকালে দেখা যাবে, দেখবি খুব দূরে একটা পাহাড়, সাঁকোর মতো সমুদ্রে ঢুকে গেছে। অতদূর যেতে হয় না। তার একটু এদিকে, সী-বিচে যারা বেড়াতে এসেছিল তাদের সঙ্গে পাগলামি করছিল মৈত্র। ওরা বেশ মজা পেয়ে ওকে সবাই বসন্তনিবাস বলে ডাকছিল।

সবাই গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। বঙ্কু বার বার কতবার যে একটা কথাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলেছে। চিফ-মেট ডেকে পাঠিয়েছিল বঙ্কুকে। সে তাকে বলে এসেছে। ডেক-সারেঙ তাকে চিফ-মেটের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। যতটা পেরেছে সে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে সবটা বুঝিয়ে বলতে চেয়েছে। ডেক- সারেঙ, আর পাঁচ-নম্বর, চিফ-মেটকে মাঝে মাঝে বিশদভাবে ব্যাপারটাকে আরো ভালো করে বুঝিয়ে দিয়েছে। চিফ-মেট সব লগ-বুকে নোট করে নিয়েছে। তারপর সেখান থেকে নেমে আসতেই মেজ- মিস্ত্রি আর্চি প্রায় অন্ধকার থেকে বের

হয়ে আসার মতো বলেছে, একে একে তোমরা সবাই যাবে। সেই অশুভ প্রভাব আবার জাহাজে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। বুড়ো হিগিনসকে আর মানতে চাইছে না। বঙ্কু ভীষণ ভয় পেয়ে গেছিল কথাটাতে। সে সবাইকে বলেছে, আর্চি বলেছে আমাদের কারো রক্ষা নেই। মৈত্রকে দিয়ে শুরু।

কি শুরু কোথা থেকে শুরু—কী যে সব হচ্ছে জাহাজে ছোটবাবু কিছুই বুঝতে পারছে না। সবারই চোখ প্রায় জ্বলছে। একটা আজগুবি জাহাজে ওরা উঠে এসে বিপদে পড়ে গেছে এমন ভাব যেন! এনজিন-সারেঙ ভয়ে ভয়ে আছে। সে খুব জোর গলায় এখন কথা বলতে পারছে না। যাদের সে জোর করে কলার টেনে জাহাজে তুলে এনেছিল তারা সবাই যেন ওৎ পেতে আছে। সময় এবং সুযোগ এলেই গলা টিপে ধরবে এনজিন-সারেঙের। গ্যালিতে এনজিন-সারেঙ চুপচাপ ভীতু মানুষের মতো লুকিয়েছিল। ছোটবাবু এতক্ষণে যেন আঁচ করতে পারছে সব। আর বুঝি এ-ভাবেই জাহাজে কখনও কখনও বিদ্রোহ দেখা দেয়। কোনো কিছু ভাববার তখন আর জাহাজিদের ক্ষমতা থাকে না।

ছোটবাবু প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে শুনছে সব। সে বলল, তারপর, তারপর কি?

বঙ্কু বলল, আমি তো জানি আমাকে দেখলেই দৌড়ে পালাবে।

—দৌড়ে পালাবে বুঝলি কি করে?

—মৈত্রকে বললাম আমার সঙ্গে বের হতে। বললাম ছোটবাবু তোমাকে একা বের হতে বারণ করেছে। মৈত্র তেড়ে মেরে বলল, ছোটবাবু কে। ছোটবাবু বলে কাউকে তো চিনি না। কি করি বল! তুই বলে গেছিস। অনিমেষও বলল, লক্ষ্য রাখা দরকার। কিন্তু কাকে লক্ষ্য রাখব! সোজাসুজি বলে দিল, আমার সঙ্গে কাউকে যেতে হবে না। আমার কিচ্ছু হয়নি।

তারপর বঙ্কু বলল, তুই ছোট জানিস, বেশি চেঁচামেচি করলে, হয়তো সারেঙ ঝামেলা করবে, একেবারেই নামতে দেবে না। আটকে রাখবে। ভাবলাম নেমে যাক, পেছনে পেছনে আমিও নেমে যাব। আর নেমে যেই না দেখল, আমি পেছনে আছি, কি খিস্তি! যা মুখে আসে। তারপর সেই শহরের একটা গোলমেলে জায়গায় এসে গেছি, দেখি মৈত্র নেই। অনেক দূরে একটা গলির ভেতর দিয়ে দৌড়াচ্ছে। আমি সঙ্গে থাকি কিছুতেই সে রাজি না।

—সঙ্গে থাকলে পাগলামি করবে কি করে! তারপর কেমন চিৎকার করে ছোটবাবু বলল, কোথায় গেল তারপর?

বঙ্কু বলল, সত্যি জানি না। আমার যে কি লোভ হল! ভাবলাম একটু খরমুজের রস খাই। ভাঁড়ে সামান্য খরমুজের রস, তামাটে রঙ, কি যে খেতে সুস্বাদু ছোটবাবু, আর তখন দেখি, একদল লোক চেঁচামেচি করছে, ঐ যে চলে যাচ্ছে, চলে যাচ্ছে! ফিরে দেখি অনেক দূরে একটা লোক পাহাড়ের সেই যে লম্বা সাঁকো আছে, তার নিচ দিয়ে সমুদ্রের দিকে ছুটে যাচ্ছে। ছোটবাবু আমি স্পষ্ট কিছু দেখিনি।

—সমুদ্রের দিকে!

—ওদিকে মাইলের পর মাইল সমুদ্রের ভেতরে সব অদ্ভুত বালির ঢিবি আছে। গাছপালা নেই। পাথর নানা রঙের। জোয়ার এলে সব ডুবে যায়।

ছোটবাবু আবার বলল, তখন কটা বাজে?

—আমি ঘড়ি দেখিনি। সূর্য ডুবে গেছে বলে সারা সমুদ্র তখন লাল ছিল ভীষণ।

—তুই বুঝলি কি করে মৈত্রদা গেছে?

—ওরা তো সবাই বলছিল আরে লোকটার দেখছি একদম মাথা খারাপ। কোথায় যাচ্ছে! এ- সময়ে ওদিকে কেউ যায় না। ওরা সবাই হা হা করে কিছুটা ছুটে গিয়ে ফিরে এসেছে। আমিও ভালো কিছু দেখিনি খরমুজের রস খেয়ে ততক্ষণে বেশ নেশা ধরে গেছে। কেবল দেখছি ক্রমে বিন্দুর মতো কালো একটা ফড়িং অনেক দূরে সমুদ্রের ওপর নাচছে। ওটা মৈত্র,

না একটা ফড়িং কি করে বুঝব! ছোটবাবু বুঝতে পারল, তারাও এমন একটা ঢিবিতে চলে গিয়েছিল। ঢিবিগুলোর একটা আলাদা আকর্ষণ আছে। সে আর এক মুহূর্তে দেরি করল না। যদিও জানে জোয়ার হয়তো এসে গেছে, না এলেও আর দেরি নেই। ওরা জোয়ারের আগে ফিরে এসেছে, এবং জোয়ার এলে জাহাজে টের পাওয়া যায়। যেন জাহাজটা লাফিয়ে অনেক উঁচুতে উঠে যায় এমন মনে হয়। যাই হোক সে লাফিয়ে পার হয়ে গেল ফল্কা। এলি-ওয়েতে ঢুকে দরজায় নক করল, ডেবিড দরজা খোলো। বোধহয় ভেতরে ডেবিড নেই। সে ওপরে উঠে দেখল স্যালি হিগিসন সবাইকে গালাগাল করছেন। জাহাজে তিনি ছিলেন না, এতক্ষণ সবাই এভাবে চুপচাপ বসে আছে! খোঁজাখুঁজির দায়দায়িত্ব কেউ নিচ্ছে না। যদিও এসব ঘটনায় স্থানীয় পুলিস সাহায্য করতে পারে, এবং লাইফ-সেভিং সমিতি। স্যালি হিগিনস এক এক করে সবাইকে ফোনে খবরটা দিয়েছেন—আর বড়-টিণ্ডালকে যে জাহাজে রাখা যাবে না, দেশে পাঠিয়ে দিতে হবে, দেশে পাঠিয়ে দেবার কথা মনে হলেই তাঁর মাথাটা ভীষণ গরম হয়ে যায়। এসব লোকগুলো জহাজটাকে ভালবাসে না। মিথ্যা পাগলামি করে দেশে ফিরে যেতে চায়। দেশে ফিরে যাবার একটা মোক্ষম ওষুধ। আর সঙ্গে সঙ্গে স্যালি হিগিনসের ভীষণ তিক্ত চোখ মুখ। সারেঙকে ডেকে পাঠালেন, বললেন, বড়- টিণ্ডালকে জাহাজ থেকে আর নামতে দেবে না। প্রায় লগ-বুকের ওপর একটা আদেশনামার মতো তিনি কথা বললেন।

তখন মৈত্র জ্যোৎস্না রাতে একটা ঢিবির ওপর বসেছিল। সে লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে এসেছে সব ঢিবি, বালির চরা। অনেক দূরে সেই পাহাড়ের ছাদ প্রায় সাঁকের মতো দু'হাত বাড়িয়ে যেন এগিয়ে আসছে ওকে ধরতে। কিছুতেই সে ধরা দেবে না। সে কেবল লাফ মেরে ঢিবি, বালির চরা পার হয়ে যাচ্ছিল ক্রমাগত। জ্যোৎস্না রাত বলে অস্পষ্ট সবকিছু চারপাশে।

ওর পায়ের কাছে সমুদ্র। আর দ্বীপে অজস্র পাথর, লাল লাল পাথর। সে একটা দু'টো করে হাতে পাথর নিচ্ছে, আর দূরে ঢিল ছুঁড়ে দিচ্ছে। একটা মাটির ভাঁড়। ভাঁড়ে সে মদ ঢালছে, খাচ্ছে। মাঝে মাঝে একাকী সে সেই খালি ভাঁড় নিয়ে পৃথিবীকে যেন বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে নাচছে। সে ক্রমে মাতাল হয়ে উঠছে। সে বসন্তনিবাস। সে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের সব পাতার বাঁশি বানিয়ে দিয়েছে। সে ইচ্ছে করলে বাতাসের ওপর ভেসে যেতে পারে—এই যে সামনে সমুদ্র, অনায়াসে সমুদ্র পার হয়ে যাবে, ওর মাথায় যখন পালক গোঁজা, যখন সে বসন্তনিবাস এবং যদি হাইতিতির ঘণ্টা বাতাসে বাজতে থাকে তখন সে কিছু ভাবে না। সে সাদা জ্যোৎস্নায় এমন একটা নির্জন দ্বীপে বসে অনায়াসে সারারাত মদ খেতে পারে, নাচতে পারে, অমিয় যেসব গান গাইত মদ খেলে, তেমন একটা গান, বাবু আমার কিছু ভাল লাগে না...সে নেচে নেচে গাইছিল।

আর তার মনে হচ্ছিল সমুদ্র চারপাশে তার ঘুরে ঘুরে নাচছে। সে এখন যেদিকে তাকাচ্ছে শুধু নীল জল। কেবল ওর ঢিবিটা উঁচুমতো এবং মনে হয় নিচে অর্কেস্ট্রা বাজছে। কান পাতলে আশ্চর্য সে মিউজিক শুনতে পাচ্ছে সমুদ্রের নিচে। এবং মনে হল সে অদ্ভুত একটা দেশের বাসিন্দা হয়ে গেছে। এক্ষুনি সে বাতাসে ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পাবে। আসছে আসছে। ম্যাণ্ডেলা হাইতিতি বাতাসে ভেসে আসছে। সে এবার মাটির ভাঁড় সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দিল। সে আর ভাঁড়ে মদ ঢালতে পারছে না, হাত কাঁপছে। ঢালতে গেলে পড়ে যাচ্ছে মদ। হাত তার ঠিক নেই। সে টলছে। তার চেয়ে মনে হল গলায় ঢেলে দেবে সোজা। সে হাঁ করে কিছুটা ঢেলে দিল মুখে। মুখ কুঁচকে গেল। বাঁ হাতের তালুতে মুখ মুছে শুয়ে থাকল চিৎ হয়ে। আকাশে অজস্র নক্ষত্র এবং জ্যোৎস্না সমুদ্রের জলে সাদা মসলিনের মতো ছড়িয়ে আছে। ওর আর যা মনে হচ্ছিল এক্ষনি শুনতে পারে বাতাসে ঘণ্টাধ্বনি। সে দেখতে পাবে একে একে সবাই নেমে আসছে। ম্যাণ্ডেলা, ম্যাণ্ডেলার মা, হাইতিতি, এলসা দ্য কেলি—সেই মেয়েটা যার শরীরে বিজবিজে ঘা। ওরা সবাই নেমে এলে কোথাও তার যাবার কথা

বোধহয় সেই মানুষটা জাহাজডুবির পর নির্জন দ্বীপে যে আটকা পড়েছিল—সেও আসছে। সে চিৎকার করে বলল, তুমি একা দ্বীপে কি করতে পার? সে বুঝতে পারল, মানুষটা

এখন বড় বড় গাছ কেটে তার গুঁড়ি কেটে ভেলার মতো বানাচ্ছে। অতিকায় সব কচ্ছপ তুলে নিচ্ছে ভেলাতে। সুস্বাদু জল নিচ্ছে ঝরনা থেকে। পাল বানিয়েছে বড় বড় ইউকন গাছের পাতা দিয়ে। মানুষটা ফিরে আসছে। ফিরে আসছে। সমুদ্রে ঝড়ঝঞ্ঝার ভেতর দিয়ে মানুষটা সমুদ্রের ওপর পাল তুলে চলে আসছে। বড় বড় কচ্ছপের বুক কেটে সে মাংস বের করছে। আগুন জ্বেলে পুড়িয়ে নিচ্ছে মাংস। সমুদ্রের জলে সামান্য চুবিয়ে খাচ্ছে। কি যে সুস্বাদু মনে হচ্ছে। শরীরে তার পাতার পোশাক। মাথায় পাতার টুপি। মুখে বড় বড় দাড়ি। চুল লম্বা। তার ভেলাটা সমুদ্রে বেশ হেলে-দুলে এগিয়ে আসছে। তারপর কেন যে তার মনে হল, লোকটা আর কেউ নয়। সে নিজে। ঝড়ের রাতে বাড়ি ফিরে দেখছে, শেফালী ঘরে নেই। শেফালী বিমলবাবুর স্ত্রী হয়ে গেছে ফের। আর মনে হল ম্যাণ্ডেলার মতো একটা ছোট মেয়ে জানালা খুলে এমন বন্য একটা মানুষকে দেখে ভয়ে চিৎকার করছে। সে কিছুতেই বলতে পারছে না, আমি বসন্তনিবাস। বিশ্বাস কর ম্যাণ্ডেলা আমি বসন্তনিবাস। তোমার মা'কে ডাকো। তার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে।

তখন একটা মাছি কোত্থেকে এসে মুখের ওপর বসল। সে ভাল করে হাত নাড়াতে পারছে না। সমুদ্র ফুঁসছে। পাহাড় সমান তরঙ্গমালা ক্রমে এগিয়ে আসছে। তীব্র শীস্ বাজছে আকাশে-বাতাসে। ব্রেকার ভেঙে যাচ্ছে, ফসফরাস পায়ের নিচে জ্বলে জ্বলে নিভে যাচ্ছে। যেন অজস্র জোনাকি পোকা ঘোরা ফেরা করছে জলে, আবার নিভে যাচ্ছে। সব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢেউ চলে আসছে আবার, আবার সেই জোনাকি পোকারা, পায়ের কাছে ক্রমে এত কাছে চলে আসছে কি করে! এবং মনে হচ্ছে ক্রমে দ্বীপটা ছোট হয়ে যাচ্ছে, ক্রমে মনে হচ্ছে, সে চারপাশে শুধু সমুদ্র দেখছে, সমুদ্রের জল গুলিয়ে উঠছে পেট গুলিয়ে ওঠার মতো। এবং আর সে উঠতে পারছে না। সে শুয়ে শুয়ে এ সব দেখছে। যেন এবার সে হাত দিলেই সমুদ্রের নাগাল পাবে। এবং ওর শেষ বিন্দু সেই মদ্যপানের অন্তিম মুহূর্তে মনে হয়, মাছিটা ভীষণ গণ্ডগোল বাঁধিয়ে দিয়েছে। সে বার বার ধরতে চাইছে মাছিটাকে। সে বার বার উঠে দাঁড়াতে চাইছে মাছিটাকে ধরার জন্য। জলের কল্লোল দমকে দমকে চারপাশে এত বেড়ে যাচ্ছে যে অনেক দূরে কে তাকে ডাকছে শুনতে পাচ্ছে না। সে কান পেতে শোনার চেষ্টা করছে, কে ডাকছে। মনে হচ্ছে অনেক দুরে সমুদ্রের তরঙ্গমালায় ভেসে চলে আসছে ডাকটা, মৈত্র..দা তু..মি কোথায়। সে শুনতে পাচ্ছে। ভারি অস্পষ্ট। তবু মনে হচ্ছে ছোট তাকে ডাকছে। তার তখন ভীষণ হাসি পাচ্ছিল। সে ফের উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। বলতে চাইল, আমি এখানে ছোটবাবু। সমুদ্র চারপাশে নেচে বেড়াচ্ছে। আমি একটা টিবির ওপর শুয়ে আছি। কিন্তু সে উঠতে পারছে না কেন! চোখে ভাল দেখতেও পাচ্ছে না। এখন যেদিকে হাত দিচ্ছে শুধু জল, জল উঠে আসছে, আবার নেমে যাচ্ছে, জল চারপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। সমস্ত শরীরে এখন জলকণা উঠে এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে তাকে। ঝাপসা মনে হচ্ছে চারপাশটা। আর তখনও দূরে কেউ ডাকছে—টিণ্ডাল।

কেউ ডাকছে—মৈত্র।

কেউ ডাকছে—মৈত্রদা তুমি কোথায়!

কেউ ডাকছে—বড়-টিণ্ডাল।

কেউ ডাকছে—বসন্তনিবাস।

সঙ্গে সঙ্গে সে উঠে দাঁড়াল টিবিটার মাথায় সে দাঁড়িয়ে গেল। সে এক হাতে বোতল বাতাসে উঁচিয়ে ধরল। কোনরকমে টলতে টলতে খালি বোতলটা বাড়িয়ে দিল আকাশের দিকে। জড়ানো গলায় বলল, মি বসন্তনিবাস। মনার্ক অফ অল আই সার্ভে। সে শেষবারের মতো জল এগিয়ে আসতে থাকলে সমুদ্রের মাথায় খালি বোতলটা ভাঙবে ভাবল। তার ভারি ইচ্ছে ছিল জীবনে, সমুদ্রের মাথায় বড় মাপের একটা বোতল ভাঙবে। কতদিন পর সে সুযোগটা পাচ্ছে ভেবে হা হা করে হেসে উঠল। দিগন্তব্যাপী কালো অন্ধকার এগিয়ে আসছে। সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টলছিল। তবু বাতাসে উঁচিয়ে রেখেছে বোতলটা। মারবে। কাছে এলেই

মারবে। মেরে মাথা ফাটিয়ে দেবে। মাগির ছেনালীপনা বের করবে।

তখনও সেই বিক্ষুব্ধ সমুদ্রের ভেতরে আর্ত ডাক, মৈত্রদা তুমি কোথায়! অস্পষ্ট সেই স্বর গুনগুনিয়ে বাজছে মৈত্রের মাথায়। সে আরও উৎফুল্ল হয়ে উঠছে। বেশ প্রতিশোধ নেওয়া যাবে, সে ছেলেমানুষের মতো আনন্দে ফের ছুটে পালাবে ভাবল। ছোটবাবু জ্যোৎস্না রাতে হয়তো তাকে দেখে ফেলেছে। পাহাড়ের ছাদ দু-হাত লম্বা করে যাকে ধরতে পারে নি, তুমি ছোটবাবু তার নাগাল পাবে! আর সেই বোতলটা তখনও ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো হাতে দুলছে। যেন সেই এবট অফ এবট ব্রথক, ঘণ্টা বাজাচ্ছে পাহাড়ের মাথায়, এদিকে না, এদিকে না। জল পায়ের পাতা ভিজিয়ে চলে গেল। এখন শুধু জল, আর জল। আর তরঙ্গমালা এবং ক্রমে সেই জলের চারপাশে শুধু ভয়াবহ ঘূর্ণি, অথবা নীল জলে, অতিকায় পাহাড়ের মতো শ্বাপদরা নিঃশ্বাস ফেলছে। এত বেশী জলকণা উড়ছে যে সে শ্বাস ফেলতে পারছে না।

তখনও দূরে, সমুদ্রের এইসব গর্জনের ভেতর একটা ক্ষীণ ডাক ভেসে আসছিল, মৈত্রদা কাল থেকে আমি তোমার সঙ্গে বের হব। তুমি কোথায়? কাল আ...মি... কোথাও যা-চ্ছি না।

শিশুর মতো সে পুলকে বলল, আমি এখানে। সে বোতলে চুমু খেতে খেতে বলল, আমি এখানে ছোটবাবু। আমি ভাল আছি।

জল আরও ওপরে উঠে আসছে। সে আর দাঁড়াতে পারছিল না। সে যে এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল, আসুক এলেই মারবে, কিন্তু এখন সে হাতের বোতল ঠিকবুকের কাছে এনে টলতে টলতে বসে পড়তেই তরঙ্গমালা চলে যেতে থাকল ওপর দিয়ে। নিচে সে ভেসে ভেসে প্রায় সেই জলের ভেতর কাটা ঘুড়ির মতো লাট খেতে খেতে হারিয়ে যাচ্ছিল। এবং শিশুর আর্তনাদ শুনতে পাচ্ছিল। সমুদ্রের অতলে শিশুরা কাঁদছে। সে আরও জোরে জলের নিচে বোতলটাকে একমাত্র সন্তানের আত্মরক্ষার্থে যেন চেপে ধরল। তারপর শুধু নীল জলের খেলা, অবিমিশ্র জল তার আপন প্রবাহে মত্ত। কোথাকার কে এক বসন্তনিবাস স্রোতের মুখে পড়ে কুটোগাছটির মতো ভেসে যাচ্ছে, তার বিন্দুমাত্র আক্ষেপ নেই।

পাহাড়ের উঁচু মতো জায়গায় তখন ওরা দাঁড়িয়েছিল। বিশ্বচরাচরে এ-ভাবে জ্যোৎস্না কখনও জোয়ারের জলে মিশে যায়, অথবা উঁচু সব তরঙ্গমালা ক্রমে নিস্তেজ হতে হতে শান্ত সমুদ্রের জলরাশি হয়ে যায়, না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। সমুদ্রের প্রবল গর্জন এ-ভাবে ক্রমে কমে আসতে থাকল। জল উঁচু হতে হতে সেই পাহাড়-ছাদের কাছাকাছি জায়গায় চলে এসেছে। এখন মনে হচ্ছে পাহাড়ের ছাদে ছাদে জেটির মতো, অনেকটা সমুদ্রের ভেতরে অনায়াসে হেঁটে যাওয়া যেতে পারে। ওরা শেষ প্রান্তে এসে বুঝল, কিছু করার নেই।

পুলিস কর্তৃপক্ষ জানাল, জল নেমে না গেলে কিছু করা যাবে না।

সমুদ্রে ভেসে গেলে খোঁজাখুঁজি করে যারা, তাদের দলটা ফিরে এসেছে। তারাও একই কথা বলল।

রাত ক্রমশ বাড়ছে। প্রবল জোয়ারের মুখে জ্যোৎস্না তেমনি ছায়া ফেলে যাচ্ছে। পাহাড়ের মাথায় সব অজস্র মানুষ দাঁড়িয়ে আছে। অথবা এখন এক খবর এই দ্বীপের ভেতর, একজন মানুষ সমুদ্রের ছলনায় আবার পড়ে গেছে। কোন খোঁজ-খবর নেই!

ডেক-সারেঙ এনজিন-সারেঙ সমেত প্রায় জাহাজ খালি করে সবাই চলে এসেছে! ওরা কেউ আর বিন্দুমাত্র উৎসাহ পাচ্ছে না জাহাজে ফিরে যেতে। ছোটবাবুর গলা ভেঙে গেছে ডাকতে ডাকতে। বনি ছোটবাবুকে বার বার বুঝিয়েছে—এ-ভাবে ডেকে লাভ নেই। কতদূরে কোথায় আছে বড়-টিণ্ডাল! তুমি অযথা ডাকছ।

ছোটবাবুর মন তবু মানছিল না। যেন তার বিশ্বাস তার আওয়াজ পেলেই মৈত্রদার সব অভিমান ভেঙে যাবে। আবার ফিরে আসবে।

সমুদ্র দেখে এখন মনেই হবে না, কখনও প্রবল তরঙ্গমালায় সে ক্ষেপে যায়। আশ্চর্য শান্ত হয়ে গেছে। বিকেলে যা ছিল বেড়াবার জায়গা, যেখানে মানুষেরা বসে খরমুজের রস পান

করেছে এখন তা সব সমুদ্রের অতলে। সকাল হতে না হতেই আবার বালিয়াড়ি জেগে উঠবে। সামোয়ান পুরুষ- রমণীদের তখন দেখা যাবে সমুদ্রের কিনারে ঝিনুক, শঙ্খ, স্টার-ফিশ কুড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এবং কত রকমের সব বড় বড় ঝিনুক—ঝিনুকের ভেতর কখনও কখনও ওরা মুক্তো খুঁজে পায়। সকাল হলে আর বোঝা যারে না, সমুদ্র এখানে গতকাল মাথাসমান উঁচু জলরাশি নিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

স্যালি হিগিনস একটা কথা বলছেন না। সবার সামনে, একেবারে সেই ছাদের কিনারে দাঁড়িয়ে আছেন। পাথরের সাঁকো নীল জলে ভেসে আছে মাত্র। বাতাস আসছে। ওঁর চুল পোশাক সব উড়িয়ে নিয়ে যেতে চাইছে। ওঁর হাতে রুপোলী স্টিক। তিনি স্টিকে ভর করে দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর শেষ সফরে এমন একটা দুর্ঘটনা বড়ই তাঁকে বিষণ্ণ করে দিচ্ছে। তিনি ভাবছেন, এমন তো হবার কথা না। সমুদ্রে এত দীর্ঘদিনের সফর, কখনও তিনি এমন বিচলিত বোধ করেন নি। এতো প্রায় আত্মহত্যার সামিল। তিনি কি এখন করবেন ভেবে উঠতে পারছেন না।

তবু সব স্থির সিদ্ধান্তের মতো, লাঠি উঁচিয়ে বললেন, আমাদের এখন জাহাজে ফিরতে হবে। সবাই স্যালি হিগিনস আর কি বলবেন ভেবে দাঁড়িয়ে থাকল। কেউ নড়ল না।

তিনি বললেন, বড়-টিণ্ডাল এটা ভাল কাজ করল না।

ওরা দাঁড়িয়ে আছে। বুঝতে পারছে ওরা, স্যালি হিগিনস একটা কথা শেষ করছেন আর মাথা নিচু করে রাখছেন। যেন সমুদ্রের কাছে তিনি পরাজয় স্বীকার করছেন এমনভাবে লাঠিতে ভর করে দাঁড়িয়ে আছেন।

তিনি ফের বললেন, ওকে পেলে আগাপাশতালা চাবকাতাম। তারপর যেমন জিভে দাঁত ঠেলে আবার ঠিক জায়গায় বসিয়ে দেন তেমনি বসিয়ে দিতে দিতে বললেন, স্কাউণ্ড্রেল।

তারপর তিনি আর একটা কথাও বললেন না। ঠিক লাঠি সামনে তরবারির মতো উঁচু করে হেঁটে যেতে থাকলেন। কে এল, কে এল না পেছনে ফিরে একবার দেখলেন না। সোজা সমুদ্রকে ওঁর লাঠির ঋজুতা দেখিয়ে ছাদের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে থাকলেন। জুতোয় ঠকঠক শব্দ শোনা যাচ্ছে। নীল রঙের জাহাজি পোশাক, পাতলা কদম ছাঁটের চুল এবং সাদা এক মহীয়ান যুবক এখন যেন পাহাড় বেয়ে শীর্ষে উঠে যেতে চাইছে।

প্রথম ডেবিডের হুঁশ হল। আরে চলে যাচ্ছে বুড়ো। সবাই তোমরা দাঁড়িয়ে থাকলে কেন!

সারেঙ তাঁর এনজিন-রুম কর্মীদের প্রায় চুন মুখে বলার মতো হেঁকে বললেন, ফিরে যান সবাই।

ডেক-সারেঙ তাঁর লোকদের বলল, নসিব মিঞা। পেটের দায়ে তোমরা ভাঙা জাহাজে মরতে এসেছ।

ছোটবাবু বলল, সবাই চাচা পেটের দায়ে এসেছে। এখন এ-সব বলার সময় না। প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল সে। কেউ তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে, টুটি ছিঁড়ে নিতে পারে এখন, বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারে নি। এবং যেন জাহাজিরা মারপিট শুরু করে দিতে পারে সহজেই সামান্য কথায় ডেক-সারেঙের অপমান হবে সে বুঝতে পারে নি। ডেক-সারেঙকে অপমান—তার লোকেরা সহ্য নাও করতে পারে। দূরে দাঁড়িয়ে তখন খাটো গলায় শিস্ দিচ্ছিল আর্চি।

এনজিন-কশপ হাত উঁচিয়ে বলল, লম্বা লম্বা বাত দেশে গিয়ে ঝাড়বে ছোটবাবু।

ছোটবাবু অবাক! সে বলল, কশপ আপনাকে কিছু বলি নি।

বনি বলল, ছোটবাবু চল।

ছোটবাবু এগিয়ে গেল। বলল, কশপ মাথা গরম করছেন কেন? এখন আমাদের মাথা গরম করার সময় না।

ডেবিড বলল, কি বলছে ছোটবাবু?

ছোটবাবু বলল, কিছু না।

এনজিন-সারেঙ বললেন, ছোট তুই ঝামেলায় থাকিস না।

—কিসের ঝামেলা চাচা!

এনজিন-কশপ তখনও বেশ সোরগোল করছে। সবাইকে তাতাচ্ছে। ছোটবাবু ডেক-সরেঙকে অসম্মান করেছে। কথাবার্তা ঠিক জানে না। বেয়াদপ। এবং কশপ যখন এ-ভাবে চিল্লাচিল্লি করছিল, তখন জ্যাক বলল, ছোটবাবু কি বলছে কশপ?

ছোটবাবু তেমনি নিস্পৃহ গলায় বলল, কিছু না।

এনজিন-সারেঙ বললেন, ছোটবাবু তুই চলে আয়। বলে হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেলেন।

—ওরা কিছু একটা করতে চাইছে, কি চাইছে আমিও ঠিক জানি না। শুধু বুঝতে পারি, ওদের মতলব ভাল না।

ছোটবাবু হাঁটতে হাঁটতে বলল, ওরা কি করতে চায়, আমি সব জানি।

সারেঙ সহসা দাঁড়িয়ে গেলেন। –কি করতে চায়?

—চায়, কিছু একটা করতে চায় চাচা। এখন তোমাকে বলা যাবে না।

—ওরা তোর কোন ক্ষতি করবে নাতো?

—তা করতে পারে। তুমি ভেব না।

এনজিন-সারেঙ আর একটা কথাও বলতে পারলেন না। আর্চি পেছনে তার দলবল নিয়ে আসছে। ছোটবাবু বুঝতে পারছে আর্চি বাজে গুজব ছড়াচ্ছে জাহাজে। সে জাহাজিদের তার পক্ষে টানছে। তারপর কি কি করতে পারে আর্চি তার সব যেন জানা। সে বলল, মৈত্রদা তুমি থাকলে কত আমার সাহস থাকতো বলতো। সে দু-হাত তুলে চিৎকার করে বলতে পারলে যেন বাঁচত, তুমি ভারী স্বার্থপর মৈত্রদা। কিন্তু কিছু বলতে পারল না। ওর চোখ জলে ভার হয়ে আসছিল। অমিয় নেই, মৈত্রদা নেই। ভারী নিঃসঙ্গ, সে ভীষণ একলা। এত বড় প্রতিপক্ষের সঙ্গে কি করে যুঝবে এখন!

॥ বিয়াল্লিশ ॥

ছোটবাবু সারারাত ঘুমোতে পারল না। আবার মাথার ভেতর সেই ঘণ্টাধ্বনি। ঘণ্টাধ্বনি হলে ভীষণ অস্বস্তি। জলতেষ্টা পায়, হাত পা এবং শরীরে কেমন অস্থিরতা, যেন এক অসহ্য দাহ নিয়ত মাথার ভেতরে কখনও ঘণ্টাধ্বনির মতো, কখনও রেলগাড়ির চাকার মতো ঘড় ঘড় করে আকাশ- বাতাস কাঁপিয়ে চলে যাচ্ছে।

ছোটবাবু চুপচাপ বোট-ডেকে দাঁড়িয়েছিল। পাশে ডেবিড। ডেবিডের যা স্বভাব, সে নানাভাবে ছোটবাবুকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। ছোটবাবু ডেবিডের একটা কথাও শুনতে পাচ্ছে না। এত জোরে মাথার ভেতর ঘণ্টাধ্বনি হলে কিছু শোনা যায় না। ছোটবাবু দু'হাতে রেলিং চেপে দাঁড়িয়ে আছে। দেখলে মনে হবে, ওর দু'হাতের পেশিতে এত বেশি শক্তি প্রায় মড়মড় করে লোহার রেলিং গুঁড়ো গুঁড়ো করে ফেলবে যেন। সে দূরের সমুদ্রে কেবল গর্জন শুনতে পাচ্ছে। জোয়ারের জল বোধ হয় ধীরে ধীরে নামছে। এবং এ-কারণে যা হয়ে থাকে, কখনও কখনও মৈত্রদার মুখ সমুদ্রের গভীরে নীল জলের ভেতরে দেখে ফেলে। যেন মানুষটা গভীর নীল জলে এখন একটা মাছ হয়ে সাঁতার কাটছে। এবং পাশে কোনো দ্বীপটিপ আছে কিনা খুঁজছে। তারপর যা হয়ে যায়, সে দেখতে পায় দূরে দাঁড়িয়ে দ্বীপের মাথায় মৈত্রদা ডাকছে। —এই ছোটবাবু আমাকে ফেলে তোরা চলে যাচ্ছিস, আমাকে নিবি না! সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় মৈত্রদা সাঁতার কেটে জাহাজে উঠে আসার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। কেউ তাকে নিতে চাইছে না। তারপর আশ্চর্য সে দেখতে পাচ্ছে মৈত্রদা ডুবে যাচ্ছিল। সমুদ্র আর তার অতিকায় সব ঢেউ মিলে মৈত্রদাকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। আর্চি যেন জাহাজে তখন বিউগল বাজাচ্ছে। ছোটবাবু তখন কেমন ভ্যাবাচাকা খেয়ে সামান্য অবলম্বন ডেবিড, ডেবিডকে বলে ফেলল, ডেবিড তোমার কী মনে হয়?

ডেবিড বুঝতে পারল না ছোটবাবু কী বলতে চাইছে।

ছোটবাবু বলল, তুমি কী বিশ্বাস কর জাহাজ কোনো অশুভ প্রভাবে আছে?

ডেবিড বলল, সে তো ছোটবাবু জাহাজটার আজন্ম একটা রোগ। এ-নিয়ে তুমি এখন ভাবছ কেন!

—আচ্ছা ডেবিড, তোমার কি সত্যি মনে হয় মৈত্রদা সমুদ্রে ভেসে গেছে। সমুদ্রে ডুবে গেছে। আসলে কেউ তো ঠিক ঠিক দেখেনি।

—কিছু তো বলা যাবে না। হয়তো দেখা যাবে সকালে বাঁশি বাজাতে বাজাতে জাহাজটায় বড়- টিণ্ডাল ফিরে আসছে! সে যা একখানা মানুষ!

ছোটবাবু বলল, ডেবিড তোমাকে তবে পেট ভরে মদ খাওয়াব।

—ঠিক!

—ঠিক ডেবিড।

তারপর আবার ছোটবাবু কেন যে দেখে ফেলে আর্চি ক্রমে তার দলবল ভারী করে এগিয়ে আসছে। প্রথমে আর্চি পরে পাঁচ-নম্বর এবং পরে এভাবে ডেক-সারেঙ, এনজিন-কশপ মার্চ করে যাচ্ছে বোট- ডেকে। ওরা প্রথমে বিউগল বাজাচ্ছিল। তারপর সবাই কেমন বন্দুকের নল উঁচু করে দাঁড়ায়। এবং ক্রমে সে দেখতে পায় সার সার ওরা তিনজন—কাপ্তান স্যালি হিগিনস, বনি এবং সে। অর্থাৎ একটা রহস্য জড়িয়ে আছে জাহাজে। এটা পাপ, কার্গো-শিপে মেয়েমানুষ রাখা পাপ। এবং একটা উন্মত্ততা তখন চারপাশে নেচে বেড়াচ্ছিল। প্রায় উলঙ্গ করে দেবার মতো বনিকে আর্চি সবার সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। এই আপনাদের জ্যাক। কাপ্তানের শয়তান ছেলে। ছেলে না মেয়ে? বলুন। জ্যাকের শরীর মাস্তুলে ঝুলিয়ে রেখে এমন বলছে যেন আর্চি।

আর ছোটবাবু দেখতে পায় তখন কি হুল্লোড় জাহাজে। সবাই এগিয়ে আসছে গন্ধ শুঁকে।

যেন সবাই গিরগিটি হয়ে যাচ্ছে। আসছে। মাথা উঁচিয়ে দেখছে সবাই। আবার ছুটে আসছে। মুহূর্তে প্রায় সেই হুল্লোড় বনিকে বগলদাবা করে তুলে নিচ্ছে যেন। এবং ছোট ছোট মাখনের স্লাইস মুখে পুরে জিভ দিয়ে চেটে চেটে খাচ্ছে। বনি চিৎকার করছে, ছোটবাবু বাঁচাও।

মাথায় এভাবে ঘণ্টাধ্বনি হলে সে যে কি করে! সে ডেবিডের সঙ্গে আর একটা কথা বলতে পারছে না। ওর চোখ জ্বলছে। আর্চির দলবল সহজেই ভারী হয়ে যেতে পারে—সে শুধু বলে দেবে মিড়-সীতে তোমাদের আমি জাদু দেখাব হে নাবিকগণ। তোমরা তো জানো জাহাজ পুরানো ভাঙা—এক বছরের নাম করে এনে তোমাদের ছলেবলে স্যালি হিগিনস দু'বছর রেখে দিচ্ছে। তারপর আরও কত বছর রাখবে কে জানে—দেশে ফেরার কথা ভেবে তোমরা পাগল হয়ে যাবে। কিন্তু আমি তোমাদিগকে দেখাতে পারি এক আশ্চর্য নারী সুধা-পারাবার। জিভ চেটে চেটে সে প্রায় ক্ষুধার্ত নেকড়ের মতো বনির পোশাক খুলে নেবে। সবার সামনে বনিকে উলঙ্গ করে ফেলবে।

জ্যাক তখন বাইরে এসে বলল, ছোটবাবু তুমি এখনও জেগে আছ?

ডেবিড বলল, কিছুতেই নিয়ে যেতে পারছি না।

ছোটবাবু জ্যাককে দেখে ক্ষেপে গেল। বলল, এত রাতে তোমার এখানে কি দরকার! তুমি কি করতে বের হয়েছ? ভেতরে যাও।

জ্যাক বলল, তোমরা কথাবার্তা বলছ, আমার ঘুম আসে?

ছোটবাবুর তারপর মনে হল সে আর বনিকে আগের মতো মর্যাদা দিচ্ছে না। বনিকে বরং ভারী অসহায় এবং দুঃখী মনে হচ্ছে। বনির জন্য এভাবে তার যেন কি আশ্চর্য মায়া। একই টুকুতেই সে খুব বেশী বিচলিত হয়ে পড়ছে! সে বলল, যাচ্ছি।

বনি বলল, যাচ্ছি না। এক্ষুনি যাবে।

ছোটবাবু আর দাঁড়িয়ে থাকার সাহস পেল না। দূরে শহর, শহরের আলো। বাতাস তেমনি বইছে এবং সবকিছু ঠিকঠাক কেবল একজন জাহাজি এখনও জাহাজে ফেরেনি। অথবা সমুদ্রের গভীরে সে শুয়ে আছে। সে কিছুতেই ডেবিডের মতো ভাবতে পারছিল না সকাল হলে সে মৈত্রদাকে দেখতে পাবে পাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাতার বাঁশি বাজাচ্ছে।

বনি বলল, ডেবিড তুমি ওকে নিয়ে যাও।

ডেবিড বলল, সেই কখন থেকে তো বলছি।

ছোটবাবু বুঝতে পারল, ওর জন্য সবাই বিব্রত হয়ে পড়েছে। সে ডেবিডকে বলল, চল।

বনি দরজার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। ছোটবাবু নিচে নেমে না গেলে সে এভাবে যেন দাঁড়িয়ে থাকবে। দরজা থেকে নড়বে না। ডেবিড আগে আগে নামছে। ছোটবাবু পেছনে পেছনে নেমে যাবার সময় সিঁড়ির মুখে দেখল বনি তখনও দাঁড়িয়ে আছে। সে বলল, দাঁড়িয়ে থাকলে কেন। ভেতরে যাও।

বনি এবার আর দাঁড়াতে পারল না। সে ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ না করলে যেন নিশ্চিন্ত হতে পারছে না ছোটবাবু। সে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

ছোটবাবু তখন নামছে। নিচে নেমে দরজা খুলে চুপচাপ বিছানায় বসে থাকল। পোর্ট-হোল খোলা। গরম পড়েছে ভীষণ। সে জোরে পাখা চালিয়ে দিল। মৈত্রদার দু'টো একটা কথা তার মনে হচ্ছে—তাহলে তুমি জাহাজের ছোটবাবু। মৈত্রদা জাহাজের কোল-বয়দের ছোটবাবু বলে ডাকত। ছোটবাবু নামটা মৈত্রদার দেওয়া। সে যে অতীশ দীপঙ্কর ভৌমিক যেন গলা চেঁচিয়ে বললেও কেউ আর বিশ্বাস করবে না। দেশভাগের আগে সে ছিল সোনা, জাহাজে উঠে সে হয়ে গেল ছোটবাবু। মৈত্রদা তাকে এ-জাহাজে ছোটবাবু বানিয়ে নিজে বেশ সরে পড়ল। আর যা হয়, এ-সব কথা মনে হলেই চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। বিশ্বাসই করতে পারে না, মৈত্রদার সঙ্গে তার আলাপ পুরো এক বছরও হয়নি অথচ মানুষটা ছিল তার সব যেন।

এবং রাগে দুঃখে সে বলল, কাল যদি তোমাকে না দেখি সকালে পাড়ে দাঁড়িয়ে পাতার বাঁশি বাজাচ্ছ তবে কাপ্তানের মতো আমিও তোমাকে আগাপাশতলা চাপকাব। তুমি ভেবেছ কি!

ডেবিড বেশ ভেবে খুশী তখন—বড়-টিণ্ডাল যা একখানা মানুষ এত সহজে ভেসে যাবে বিশ্বাস করা যায় না। হয়তো সত্যি সে সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখবে তার দলবল নিয়ে জেটিতে বেলুন উড়াচ্ছে বাঁশি বাজাচ্ছে তখন বিকেলে সে ছোটবাবুর পয়সায় আকণ্ঠ মদ খাবে! সকাল হলে সে আর ছোটবাবু সঙ্গে না হয় বড়-টিণ্ডালকে নেওয়া যাবে। তারপর মদ্যপান। লারে লারে গান গলায়। ওরা যে অন্য গ্রহে তাদের সবকিছু রেখে এসেছে তখন আর মনেই হবে না। ডেবিড আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ল। ছোটবাবু সহজে শুয়ে পড়তে পারল না। আলো নেভাতে ইচ্ছে হল না। পোর্ট-হোলে দাঁড়িয়ে থাকল।

ওপরে এভাবে বনিও দাঁড়িয়ে আছে। তারও ঘুম আসছিল না। ছোটবাবুর সঙ্গে এনজিন-কশপের কিছু একটা হয়েছে। এনজিন-কশপের কথা ছিল ছ'নম্বর হবার। কিন্তু সে হতে পারেনি। ওর রাগ স্বাভাবিকভাবে ছোটবাবুর ওপর থাকবে। ছোটবাবু এনজিন-কশপের সঙ্গে বাংলায় কথাবার্তা বলছিল। সে কিছুই বুঝতে পারেনি। ছোটবাবুকে সে বলেছিল, কি হয়েছে! ছোটবাবু বলেছিল, কিছু না। এই পর্যন্ত! তারপর সেও ছোটবাবুকে কেন জানি দ্বিতীয়বার... আর কিছু বলতে সাহস পায়নি। ছোটবাবুর মুখ ভীষণ থমথম করছিল। অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় যতই ছোটবাবু গোপন করুক সব সে বুঝতে পেরেছে। ছোটবাবুর মাথায় আবার সেই ঘণ্টাধ্বনি হচ্ছে। বাবা তাকে ঠিকই বলেছিলেন, বনি ছোটবাবুর মাথায় কিছু হচ্ছে না তো! সেই যে ক্রোজ-নেস্ট থেকে পড়ে ছোটবাবুর মাথায় পেরেক ঢুকে গেছিল এবং পর পর সব দৃশ্য মনে হলে সে স্থির থাকতে পারে না। সে কিছুতেই আজ বলতে পারেনি, যতই অস্বীকার কর তোমার কিছু হচ্ছে না, আমি কিন্তু বলছি মাথায় তোমার কিছু হচ্ছে। তুমি আমাকে সব গোপন করছ।

আর বনি আশ্চর্য হয়ে গেছে আগের মতো ছোটবাবু নেই। কেমন ক্রমে রাশভারী হয়ে যাচ্ছে। আগের মতো সহজেই জেদ বজায় রাখতে পারে না বনি। অন্য সময় হলে সে কি করত জানে না কিন্তু আজ যখন 'কিছু না' বলে এড়িয়ে গেল তখন অপমানে দিনের পর দিন কথা না বলে থাকতে পারত। অথচ সে মনে মনে ভারি খুশী। ছোটবাবুকে তার সমীহ করতে ভাল লাগছে। ছোটবাবু তাকে সব বললেই বোধহয় খাটো হয়ে যেত।

ছোটবাবু তখন নিচে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারছে বনি ঘুমোয়নি। মাথার ওপর বনির কেবিন। হাঁটাহাঁটি করলে টের পাওয়া যায়। জাহাজ নোঙর ফেলে রাখলে এত বেশি নির্জনতা যে বনি কাঠের পাটাতনে নেমে কার্পেটের ওপর কিভাবে কোনদিকে হেঁটে যাচ্ছে তা পর্যন্ত ধরা যায়। বনি এইমাত্র পোর্ট-হোলে দাঁড়িয়েছিল এখন হেঁটে সে তার বাংকে এসে বসেছে। আর কোন শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না। বোধহয় বনি এবার শুয়ে পড়ল।

ছোটবাবু এভাবে পোর্ট-হোলে দাঁড়িয়ে দূরের শহর দেখছে। আর নক্ষত্রমালার মত ঝিকমিক করছে শহরের আলো যেন হাজার জোনাকি-পোকা আকাশের গায়ে স্থির হয়ে আছে। আর দূরে তেমনি সমুদ্রগর্জন। সমুদ্র অবিরাম দ্বীপটার চারপাশে ফুঁসছে। জ্যোৎস্নায় দ্বীপের উঁচু পাহাড় অথবা টিলাতে ঘরবাড়িগুলো দেখা যাচ্ছে না। রাস্তার আলো ঘুরে ঘুরে ওঠে গেছে। আর কি বিস্ময় কখনও মিনারের মতো অথবা গম্বুজের মতো মনে হচ্ছে ছোট ছোট পাহাড়গুলোকে। আলোগুলো গম্বুজের গায়ে মীনা- করা মণি-মুক্তার মতো। এমন সব সুন্দর পৃথিবী ফেলে মানুষের চলে যেতে ইচ্ছে হয় কেন সে বুঝতে পারে না।

আবার মনে হল মাথার ওপর কাঠের পাঠাতনে কেউ হাঁটছে। বনি তবে ঘুমোতে পারছে না। বনি আবার পোর্ট-হোলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ওর ইচ্ছে হচ্ছে এক্ষুনি ওপরে উঠে দরজায় দাঁড়িয়ে বলে, বনি কী হচ্ছে! তোমার জন্য আমি ঘুমোতে পারব না! এভাবে দাপাদাপি করলে নিচে কারো ঘুম হয়।

আর তখনই মনে হল কোথায় যেন বনির ওপর সে অধিকার পেয়ে গেছে। বনি হয়তো

নিজেই অধিকারটুকু অজান্তে তাকে দিয়ে দিয়েছে। অথবা বোধহয় এমনই হবার কথা। সে তো বনির পায়ের শব্দ প্রথম থেকেই মাথার ওপর শুনতে পেত। সে তো কখনও এভাবে ভাবেনি বরং বনির পায়ের শব্দ মাথার ওপর না হলে ওর ঘুম আসত না। কাপ্তানের ছেলে সামান্য দাপাদাপি হুল্লোড় করবে না তো কে করবে! তার তখন মনেই হত না ওপরে কেউ হেঁটে বেড়াচ্ছে। তার ঘুম ঠিক চলে আসত। আর এখন সে শুনতে পাচ্ছে বনি খুট-খুট করে কিছু কাটছে। বনি তারপর খুব জোরে পোর্ট-হোলের কাঁচ ঠেলে দিচ্ছে এবং স্ক্রু এঁটে দিচ্ছে। তার শব্দ পর্যন্ত কান পাতলে শোনা যাচ্ছে। বনি কি সারারাত ঘুমোবে না।

সে এবার দরজা খুলে ওপরে উঠে ডাকল, বনি।

বনি দরজা খুলে বলল, কী?

—ঘুমোচ্ছ না কেন? কেবল খুটখাট শব্দ করছ!

বনির শরীরে রাতের পোশাক। বনি কী বলেই চোখ নামিয়ে নিয়েছে। আর যেন ছোটবাবু এক অধিকারের সাম্রাজ্য পেয়ে গেছে। এখানে সে খুশিমতো বিচরণ করবে। তার চোখেমুখে অতীব অহংকার। সে বলল, ঘুমোচ্ছ না কেন?

—ঘুম আসছে না ছোটবাবু।

ছোটবাবু বলল, তুমি না ঘুমালে আমার ঘুম আসবে না বনি। আমাকে তোমরা সবাই এত কষ্ট দাও কেন!

বনি বলল, যাচ্ছি। বনি আর কিছু বলল না। বনি অধীরতায় ডুবে যাচ্ছে। সে কিছুতেই সোজাসুজি ছোটবাবুর দিকে তাকাতে পারল না। ছোটবাবু আজ সারাদিন তাকে ধমকের ওপর রেখেছে। অভিমানে তার কান্না পাচ্ছিল। সে দরজা বন্ধ করে দেবার সময় বলল, ছোটবাবু আমি আর খুটখাট শব্দ করব না। আমি ঠিক এবার ঘুমিয়ে পড়ব।

ছোটবাবু নিচে এসে আর ওপরে কোন শব্দ শুনতে পেল না। ওপরের কেবিনটা নিথর। এতটা নিথর যেন ভয়ের। কেবল এখন কেন জানি মনে হচ্ছিল, বেশ তো ছিল বনি। যেন সে এবং বনি পৃথিবীতে শুধু জেগে ছিল। বনি ঘুমিয়ে পড়েছে কি চুপচাপ শুয়ে পড়েছে, পাশ ফিরছে না, শ্বাস জোরে ফেলছে না—পাছে তার ঘুমের ব্যাঘাত ঘটে, বুঝতে পারছে না। এতটা সে না করলেই পারত। ওপরে উঠে ওকে ভৎর্সনা না করলেও চলত। ভৎসনা শব্দটাই মনে আসছিল ঘুরে ফিরে।

এই জাহাজ, বনি, পাশে দ্বীপমালা এবং আরও ওপরে আছেন স্যালি হিগিনস, তিনি কি করছেন! আর্চি কি করছে! কারা যেন ওর এলি-ওয়ে ধরে ছুটে গেল। এবং ডানপাশের এলি-ওয়েতে কয়েকজন মানুষ এক সঙ্গে সন্তর্পণে হেঁটে গেলে যেমন একটা রহস্য থেকে যায় তেমনি রহস্য। অর্চি কি জেগে রয়েছে? অথবা জাহাজের কোনো অন্ধকারে সবাইকে নিয়ে সলাপরামর্শ করছে? ওর কিছুতেই ঘুম আসছিল না। একবার সে দরজা খুলে ডেক-ফল্কা সব ঘুরেও দেখে এল! কেউ জেগে নেই। গ্যাং- ওয়েতে কোয়ার্টার-মাস্টার ঝিমুচ্ছে। গভীর রাতে সে একা আবার ফিরে এল কেবিনে। দরজা বন্ধ করে ফের শুয়ে পড়ল।

খুব ভোরে জাহাজে সোরগোল উঠে গেল।

ছোটবাবু দরজা খুলেই শুনল, বড়-টিণ্ডালের লাশ পাওয়া গেছে।

ছোটবাবু যেন কথাটা আগ্রহের সঙ্গে শুনছে। তা হলে সকালে পাড়ে দাঁড়িয়ে মৈত্রদা পাতার বাঁশি বাজাচ্ছে না! সে কেমন বিহুলপ্রায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এক পা নড়তে পারল না। মনে হল ওর কিছু আর করণীয় নেই। কোথায় কে কিভাবে বসন্তনিবাসের মৃতদেহ আবিষ্কার করেছে তার জানার যেন কোন আগ্রহ নেই। কেবিনের দরজায় চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। ওর সামনে দিয়ে হেঁটে গেল বাটলার, মেস-রুম-বয়, থার্ড-অফিসার। ওরা সবাই ডেকে ছুটে যাচ্ছে। সে যাচ্ছে না। সে পোর্ট-হোলে গিয়ে পর্যন্ত দাঁড়াচ্ছে না। সে যেন এখন চুপচাপ

হাতমুখ ধুয়ে এক কাপ চা খাবে, কাজের পোশাক পরে তেলের টব, বাকেট নিয়ে যেমন রোজ উইনচে চলে যায় তেমনি যাবার কথা। বড়-টিণ্ডাল কে, সে তাকে যেন চেনে না! চোখমুখ দেখলে বিশ্বাসই হবে না সে বড়-টিণ্ডাল বলে কাউকে চিনত।

ডেবিড এসে দেখল ছোটবাবু চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। ডেবিডকে দেখে একটা কথা বলছে না।

এনজিন-সারেঙ ছুটে এসেছেন।

–কোথায়।

–ছোট তুই যাবি না?

বড়-টিণ্ডালের লাশ পাওয়া গেছে।

ছোটবাবু বলল, তোমরা যাও, আমি যাব না।

ডেবিড এবং রেডিও-অফিসার যাবে। স্যালি হিগিনস, বনি গ্যাঙ-ওয়েতে চলে গেছে। মোটরবোট সিঁড়ির কাছাকাছি অপেক্ষা করছে।

সারেঙ বললেন, তুই না হলে হবে কেন?

–আমার কি দরকার! আপনারা যান।

–কি বলছিস ছোট! ওর কাজ-কামে কি দরকার হবে আমরা কি করে জানব!

–আমি তো কিছু জানি না কি কি করতে হবে।

ডেবিড এবার যেন ধৈর্য হারিয়ে ফেলছে।–ছোটবাবু, সবাই তোমার জন্য অপেক্ষা করছে। স্যালি হিগিনস, আর্চি, চিফ-মেট সবাই। ছোটবাবু তবু কথা বলছে না। সে ভেতরে ঢুকে গেল। তারপর ছোটবাবু পোশাক পাল্টে বের হয়ে এল। সারারাত সে ঘুমোয় নি বলে চোখ লাল। সে বাইরে এসে দেখল নিচে বোটে সবাই উঠে গেছে। ওর জন্য বোট ছাড়ছে না। ওকে ধরে-বেঁধে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

সে বোটে উঠে গেল। সে সমুদ্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছে। ওকে কেউ দেখুক সে যেন চায় না। দূরে সেই বেলাভূমিতে শহর ভেঙে সব লোক নেমে এসেছে। সেই বিচিত্র মানুষটি জোয়ারের জলে ভেসে গেছিল আবার সমুদ্র তাকে ঠেলে দিয়ে গেছে কিনারায় এবং শহরের সর্বত্র তখন একই খবর। জাহাজের সেই বিচিত্র বসন্তনিবাস মারা গেছে। তখন সকালের রেডিওতে আবহবার্তা, তখন রেডিওতে এ-ছোট খবরটাও ছিল বেলাভূমিতে একজন বিদেশী মানুষের মৃতদেহ পাওয়া গেছে। জাহাজ সিউল-ব্যাংকের নাবিক। মানুষজন ছুটছে সেই বিদেশী মানুষের মৃতদেহ দেখতে।

ওরাও সবাই সেই পাহাড়-ছাদের নিচে চলে এসেছে। কে বলবে গতকাল রাতে জল ছিল এখানে ছাদের সমান। এখন বেলাভূমি শুকনো। যারা শঙ্খ, ঝিনুক সংগ্রহ করতে এসেছিল তারা দেখেছে একজন মানুষ উপুড় হয়ে পড়ে আছে। একটা বড় মাপের জনি-ওয়াকারের বোতল বগলে। সন্তানকে আদর করার মতো বুকের কাছে জড়িয়ে রেখেছে। এই সব মানুষেরা ছুটে ছুটে খবর দিয়েছে সব শহরবাসীদের, সেই লোকটা, বিকেলে যে লোকটা মেলায় ঘুরে বেড়িয়েছিল বেলুন উড়িয়েছিল বাতাসে, লজেন্স চকোলেট সব শিশুদের বিতরণ করেছিল—যে সারাক্ষণ পাতার বাঁশি বাজিয়ে বলেছিল, মি বসন্তনিবাস সেলর—মারা গেছে। সমুদ্রের জলে ডুবে মারা গেছে।

সবাই মিলে পথ করে দিলে ওরা ভেতরে ঢুকে গেল। ছোটবাবু বাচ্চা ছেলের মতো পাশে বসে পড়েছে। সে যে কাঁদছে কাউকে বুঝতে দিচ্ছে না।

স্যালি হিগিনস লাঠিতে ভর করে মাথার দিকে দাঁড়িয়ে আছেন। ঝুঁকে দেখছেন। দেখতে দেখতে বললেন, তুমি আমার ভারি বদনাম করলে হে ছোকরা। তিনি চিফ-মেটকে বললেন, চিফ জলদি বোট আনো। বোটে করে ওকে জাহাজে নিয়ে যেতে হবে। অনেক কাজ।

আপনারা এখান থেকে সরে যান মা-মাসিরা। এই যে ছেলে-ছোকরারা তোমরা যাও বাপু। সঙ্গে সঙ্গে পুলিসের লোকেরা ভিড়টা সরিয়ে দিচ্ছে। স্যালি হিগিনস বললেন, আমি আপনাদের বড়কর্তার সঙ্গে একটু কথা বলব। বলে পুলিসের কাছ থেকে ঠিকানা নিলেন। তারপর ডাকলেন, ছোটবাবু, তুমি আবার ঝুঁকে বসে আছ কেন? ওঠো ওঠো।

হঠাৎ স্যালি হিগিনস ভারি চটপটে এবং ব্যবহারে জাদুকরের মতো মুখ, একজন জাহাজি এভাবে বেলাভূমিতে শুয়ে আছে, তিনি যেন লাঠি উঁচিয়ে বলবেন, এক দুই তিন ওঠো, জাহাজে চলো। তারপরই বড়-টিণ্ডাল উঠে দাঁড়াবে। জাহাজের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করবে। এমনই মনে হচ্ছিল স্যালি হিগিনসকে দেখে।

–এই ছোটবাবু, এখনও তুমি ঝুঁকে আছ। ওঠো। ওকে তুলে নাও। দেখছ না জলে সব ভিজে যাচ্ছে আমাদের।

সকালের সমুদ্র তেমনি শান্ত এবং প্রবহমান। ছোট ছোট ব্রেকার এসে ওদের সবার জুতো মোজা ভিজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে। জলে ডাঙায় পড়ে থাকার মতো বড়-টিণ্ডাল শুয়ে আছে। ছোট ছোট ব্রেকার এলে জল ওর চারপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। ছোটবাবু এবার মৈত্রদাকে দু'হাতে পাঁজাকোলে তুলে বলল, কোথায় নিয়ে যেতে হবে স্যার?

—ওপরে নিয়ে যাও। জলে ভিজে তো ঢোল হয়ে যাচ্ছে।

মৈত্রদা ভীষণ ভারী। এমন জবরদস্ত মানুষটাকে সে সহজেই কাঁধে ফেলে নিতে পেরেছিল। প্রথম পাঁজাকোলে তারপর কাঁধে ফেলে নিলে জল বমি করেছে হড়-হড় করে। এবং প্রায় হাল্কা হয়ে গেলে ছোটবাবু দেখল সবাই ওকে অবাক চোখে দেখছে। এত বড় লাশটাকে কত সহজে কাঁধে ফেলে নিতে পারছে ছোটবাবু, প্রায় দৈত্যের সামিল। আর্চির গলা শুকিয়ে কাঠ। সে বলল, স্যার আমরা জাহাজে ফিরে যাচ্ছি।

স্যালি হিগিনস বললেন, নো।

আর্চি বোধ হয় অপমানে ফেটে পড়েছিল। সে দাঁড়িয়ে গেল—বোট আসতে দাও। স্যালি হিগিনস এমন বলে দেখলেন ছোটবাবু তখনও দাঁড়িয়ে আছে। কাঁধে মৈত্রের মৃতদেহ। তিনি কিছু বলছেন না তিনি অন্য অনেক কথা বলছেন—এই যে ডেভিড তুমি দাঁড়িয়ে আছ কেন! দ্যাখো বোট আসছে কিনা! —সারেঙ, এনজিন-সারেঙ!

এনজিন-সারেঙ ছুটে এলেন।—তুমি কি করছ?

এনজিন-সারেঙ বললেন, ওদের তো দাহ করার নিয়ম। ওরা তো স্যার লাশ কবর দেবে না।

–তা হলে কি কি করতে হবে ঠিকঠাক করে ফেল। আমরা দেরি করব না।

স্যালি হিগিনস দেখছেন, ছোটবাবু লাশ কাঁধে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সবার চেয়ে ছোটবাবু দীর্ঘকায় এক মানুষ, আত্মপ্রত্যয়ের অভাব সামান্য। সব ঠিক হয়ে যাবে। দাঁড়িয়ে থাকতে দাও। এই যে ডেক- সারেঙ, বলতেই ডেক-সারেঙ লাফিয়ে লাফিয়ে কাছে চলে গেল। বলল, আদাব স্যার।

স্যালি হিগিনস বললেন; আদাব। বড়-টিণ্ডাল কেন মরল বল তো?

–জানি না স্যার।

—তুমি ডেক-টিণ্ডাল?

–জানি না স্যার!

–তুমি তুমি

বনি বলল, কতক্ষণ লাশ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে। ওকে নামাও।

স্যালি হিগিনস ডাকলেন, দ্যাখো তো বোট আসছে কিনা জ্যাক!

আর্চি বলল, ঐ যে আসছে স্যার। আসছে। সে আর এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না, বোটের কাছে ছুটে গেল। স্যালি হিগিনস সামান্য হাসলেন। বললেন, ছোটবাবু এবার ওকে নামাও।

ছোটবাবু বলল, নামিয়ে কি হবে? বরং স্যার বোটে তুলে দি।

বোট কিছুটা দূরে। ডেভিড বলল, ছোটবাবু ওকে নিচে রাখ। আমরা লাশ ধরাধরি করে নিয়ে যাচ্ছি।

ছোটবাবু কিছু বলল না। এগিয়ে যেতে থাকল। বোটে সে একেবারে মৈত্রদাকে শুইয়ে দেবে। বোধহয় ছোটবাবুর ভীষণ ঘাম হচ্ছিল এবং এত ভারী ওজনের মানুষটাকে কাঁধে ফেলে রাখা যাচ্ছে না। এক হাতে দু'পা, কাঁধে শরীর এবং ডান হাতে আর একটা হাত, আহত কোন সৈনিকের মতো ছোটবাবু তার মৈত্রদাকে নিয়ে যাচ্ছে। বোধহয় সে মৈত্রদাকে কোনো মৃত মানুষের মতো ভাবতে পারছে না। জলে ডুবে মরা মানুষেরা কখনও বেঁচে ওঠে—হয়তো বোটে নিয়ে যেতে যেতে মৈত্রদা ফিক করে হাসবে, কিরে ছেলে না মেয়ে? এমন যখন হতে পারে তখন তাকে একজন আহত সৈনিকের মতো সে নিয়ে চলল। বেঁচে গেলে যেন বলতে না পারে, রাখ রাখ তোরা তো আমাকে মেরেই ফেলেছিলি। এবং এভাবে ছোটবাবু মৈত্রকে শুইয়ে দেবার সময় বোটের চারপাশে সবাই জড়ো হতে থাকলো। একটা মাত্র বোট। ঠিক থাকল বাকি সবাই হেঁটে যাবে জাহাজে। বোটে ছোটবাবু ডেভিড বঙ্কু এনজিন- সারেঙ। বনি উঠতে চেয়েছিল। ছোটবাবু বলল, নো। তুমি হেঁটে যাও।

আর এখন এই যে একজন সমুদ্র-মানুষের শেষ কাজ, শেষ কাজ বলতে ওরা মৈত্রকে দূর সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়ে আসতে পারে—একজন সমুদ্র-মানুষের সমাধি এভাবে হওয়া বাঞ্ছনীয়। কিন্তু বঙ্কু অনিমেষ ধার্মিক নাগরিকের মতো চোখ মুখ করে রেখেছে। বহুদিন পর মনে হয়েছে ওরা জাতিতে হিন্দু ওদের ধর্মে নানা বিধিনিষেধ আছে, তীরের কাছাকাছি কোথাও একটা দাহ করার জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। ওরা ছোটবাবুকে বলল, ছোটবাবু তুমি কিন্তু কিছুতেই রাজী হবে না।

বনি আবার বলল, ছোটবাবু আমাকে নাও। আমি যাব।

ছোটবাবু বলল, উঠে এস। বলেই ওরা বোট ছেড়ে দিল। ওদের অনেকটা পথ ঘুরে যেতে হবে, ছোটখাটো সব দ্বীপমালা ভেসে রয়েছে। জাহাজটা আছে সামনে, মনে হয় কাছাকাছি। কিন্তু এই সব দ্বীপমালা চারপাশে, অনেক ঘুরে ঘুরে যেতে হবে। মোটর-বোটে ওরা ভেসে যাবার সময় দেখল মৈত্রদা নিরীহ স্বভাবের মানুষ, ঘুমিয়ে আছে মতো। শরীর এখনও শক্ত হয়নি। দু'টো একটা প্লাস্টিকের খেলনা জামায়, ছোট পুঁতির মালা। পকেটে হাত দিয়ে পেল সামান্য ক'টা চকোলেট। এবং জামাটা ওপরে উঠে গেলে ছোটবাবু অবাক, পেটে পিঠে অদ্ভুত সব নীল চাকা চাকা দাগ। সামান্য দুর্গন্ধ। জামা ওঠে এলে সবাই কেমন চোখ মুখ কুঁচকে দেখল শরীরে মানুষটার কিছু বাকি ছিল না। এনজিন-সারেঙ বললেন, ছোট সর্বনাশ তুই ঘাটছিস! তোর রক্ষা থাকবে না।

ছোটবাবু জেদী বালকের মতো নরম হাতে জামা টেনে দেখল। বনি আছে নয়তো সে প্যান্ট খুলে দেখত, কোথায় কোথায় মানুষটা শরীরে এমন কঠিন অসুখ নিয়ে বেঁচেছিল। বনি আছে বলে সে ফের জামা টেনে বলল, বঙ্কু কাঠ পাবি কোথায়?

বঙ্কু বলল, ছোটবাবু তুমি কিন্তু আমাদের কথার বাইরে যাবে না। গেলে হাতাহাতি হবে।

অনিমেষ বলল, আমরা মৈত্রকে আগুনে পোড়াব। মাটির নিচে কিছুতেই চাপা দেব না। ধর্মাধর্মের ব্যাপারটা তুমি অবহেলা করবে না।

ডেভিড বলল, বড়-টিণ্ডালের এত বড় অসুখ ছোটবাবু তুমি জানতে না!

ছোট কি বলবে! সে বলল, না। সে সোজাসুজি মিথ্যা কথা বলল।

–তোমরা ছোটবাবু মরবে।

ছোটবাবু বলল, ডেবিড আমার কিছু করার ছিল না।

এবং ভীষণ চিন্তিত দেখাল ডেবিডকে। ডেবিড বলল, লোকটা ঘায়ের জ্বালায় পাগল হয়ে গেল। আর তোমরা চুপচাপ দেখে গেলে!

ছোটবাবু ভারী লজ্জায় পড়ে গেছে মতো মাথা নিচু করে রেখেছে।

তখন বনি বলল, ডেবিড, বড়-টিণ্ডালের শরীরে ওসব কি!

ছোটবাবু সহসা চিৎকার করে উঠল, বনি!

এবার ছোটবাবু ডেবিডের দিকে না তাকিয়েই বলল, ডেবিড এসব কথা আর কেউ যেন না জানে। মৈত্রদার ইচ্ছে নয় কেউ জানুক। আমরা ক'জনই না হয় জানলাম, মৈত্রদা একটা নোংরা অসুখে মরে গেল। আর তখনই ছোটবাবুর মুখটা ভারী বিষণ্ণ হয়ে যায়। যেন মনে হয় ওর উচিত ছিল ডেবিডকে সব খুলে বলা। মৈত্রদার ভয়ে সে এটা করেনি। মৈত্রদা তা হ'লে বেঁচে যেতো। সে বলল, ডেবিড আমি জানতাম। মৈত্রদার ভয়ে বলিনি। এখন মনে হচ্ছে আমি সত্যি মানুষটাকে মেরে ফেললাম। বুঝতে পারছি আমার আরও সাহসী হওয়া দরকার।

ডেবিড বলল, ছোটবাবু জাহাজে মানুষ এভাবেই বাঁচে। তোমার দুঃখ করার কিছু নেই। নসিবে আছে মরবে—তুমি কিছু করতে পার না।

বঙ্কু তখন আবার বলছে, ছোটবাবু আমরা কিন্তু মৈত্রকে পোড়াব।

ছোটবাবু বলল, পোড়াবি তো পোড়াবি। বার বার বলার কি আছে!

–তুমি যা মানুষ। ভালো মানুষের মতো রাজী হয়ে গেলে আমাদের কথা কেউ তখন শুনবে না।

ওরা ছ'জন মানুষ আর মাঝখানে লম্বা হয়ে পড়ে আছে বসন্তনিবাস। আকাশ ভীষণ মেঘলা। সমুদ্রের জল তেমন নীল নয় আর। কেমন ঘোলা দেখাচ্ছে। ওরা দু'টো-একটা দ্বীপের পাশ দিয়ে জাহাজের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হালে বসে আছে সামোয়ান মাঝি। মানুষটার কাছে আশ্চর্য লাগছে, কোথাকার মানুষ কোথায় এসে মরে গেল। লোকটার স্ত্রী, ছেলেমেয়েরা কোথায় থাকে জানার খুব তার ইচ্ছে। সেও দু'টো একটা কথা বলছে।

দু'এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল এ-সময়। ওদের বোট এখন জাহাজের নিচে ভিড়ে গেছে। সিঁড়ির কাছে বোট বেঁধে ছোটবাবু বঙ্কু ওপরে উঠে গেল। কিভাবে কি হবে ওরা এখনও জানে না। জাহাজে মাল বোঝাই হবার কথা সকাল থেকে। কিন্তু সকালে এমন একটা ঘটনা ঘটে গেলে সব বন্ধ হয়ে গেল। জাহাজে মাল বোঝাই হবে না। একজন মৃত জাহাজির সম্মানে সব কাজকর্ম বন্ধ। ছোটবাবু, ডেবিড, এনজিন-সারেঙ হেঁটে যাচ্ছিল। অন্য জাহাজিরা এখন রেলিঙে ঝুঁকে আছে। বড়-টিণ্ডালের লাশ দেখছে। খুবই হতাশা মুখে এবং আর্চি তেমনি জাহাজিদের পাশে পাশে হেঁটে যাচ্ছে। মুখে সে চুরুট রেখে জাহাজের মাস্তুলে নানাবিধ দুর্ঘটনার ছবি প্রত্যক্ষ করছে। সেও বেশ ঝুঁকে দেখছে।

তখন স্যালি হিগিনস ব্রীজ থেকে হাঁকলেন, কোয়ার্টার-মাস্টার!

কোয়ার্টার-মাস্টার এলে বললেন, ছোটবাবুকে ডাকো।

ছোটবাবু প্রায় দৌড়ে ওপরে উঠে গেলে হিগিনস বললেন, দাহ করা যাবে না। স্থানীয় মানুষেরা আপত্তি করবে।

ছোটবাবু বলল, কেন স্যার?

–ভারী বীভৎস ব্যাপার বলছে। ফোনে কথাবার্তা বললাম, কিছু করা গেল না। শহরের মেয়র রাজী হচ্ছে না। গণ্ডগোল বেঁধে যেতে পারে।

সে বলল, যদি দূরে এই ধরুন দশ-বারো মাইল দূরে কোনো দ্বীপে নিয়ে যাই! সেখানে

পুড়িয়ে আসি!

—দেখি তবে।

তিনি ফোন করে সব খবরাখবর নিলেন। বললেন, হবে। তাহলে তোমরা বোট নিয়ে ভেসে পড়।

দু'টো বোট ভাড়া করেছে চিফ-মেট। এখন কে কে যাবে? স্যালি হিগিনস বললেন, ছোটবাবুকে জিজ্ঞাসা কর, কে কে যাবে?

কাছে কোথাও ছোটবাবু ছিল না। সে তখন জাহাজের পাশে ছোট্ট বোটটাতে নেমে গেছে। তীরে সব মানুষদের জটলা। সূর্য ক্রমে সমুদ্র থেকে ওপরে উঠে আসছে। দলে দলে সব সাদা রঙের পাখি জাহাজটার মাথায় উড়ছিল। ছোটবাবু বড়-টিণ্ডালের জামা প্যান্ট খুলে ফেলছে। বনি উঁকি দিলেই হাঁকছে, এই তোমার এখানে কি! যাও ভেতরে যাও। বনি মুখ ব্যাজার করে কেবিনে ঢুকে বসে থাকছে। বার বার ভাবছে—আর যাবে না। সারাক্ষণ ধমকের ওপর রাখলে কার মেজাজ ঠিক থাকে!

এনজিন-সারেঙ অবাক, জ্যাক ছোটবাবুকে কবে থেকে এত মান্য করতে শিখল। তিনি একেবারে হাঁ। সব দেখে-শুনে এখন ইচ্ছে হচ্ছে তাকেও ছোটবাবু কিছু বলুক। কিছু এই যেমন সামান্য চন্দন কাঠ কোথায় পাওয়া যাবে। সামান্য ঘি স্টোর রুমে পাওয়া যাচ্ছে—কাঠের জন্য বঙ্কু আর ডেবিড চলে গেছে। ছোটবাবু তাকেও পাঠালে পারত। জব্বার মনু বাদশা মিঞা চুপচাপ বড়-টিণ্ডালের পাশে বসে রয়েছে। এবং যা হয়ে থাকে সবাই নিজের নিজের সুখ দুঃখ অর্থাৎ এই মৃত্যু মানুষের কোন দূরবর্তী আকাঙ্ক্ষার মতো, মৃত্যু তাদের যেন অনেক বড় করে দিয়েছে। কিছুতেই ওরা আর ছোট কাজ করতে পারবে না। একজন জাহাজি নানাকারণে পৃথিবীর অন্যসব মানুষের চেয়ে আলাদা।

বোট ছাড়ার সময় হয়ে যাচ্ছে। যারা যারা যাবে হাত তুলে ছোটবাবু ইশারায় ডাকছে। যেমন যাচ্ছে ছোট-টিণ্ডাল, এনজিন-সারেঙ, বড়-টিণ্ডালের ওয়াচের তিনজন ফায়ারম্যান, দু'জন কোলবয় স্যালি হিগিনস নিজে, ডেবিড, বঙ্কু, অনিমেষ। বনি লাফিয়ে নামছে। বেহায়ার মতো জাহাজের ওপরে দাঁড়িয়ে হাঁকছে, ছোটবাবু আমি যাব। ছোটবাবুর তাকাবার পর্যন্ত সময় নেই। হাত তুলে সে ইশারায় না করছে। স্যালি-হিগিনস নেমে আসার সময় দেখতে পেলেন বনি কেবিনের দিকে ব্যাজার মুখে ফিরে যাচ্ছে। তিনি বললেন, বনি যাবে? গেলে চল।

বনি বলল, না বাবা আমি যাব না।

বনি বোধ হয় মানুষের এই নিষ্ঠুর পরিণতি দেখতে সাহস পাচ্ছে না।

আর একটা বোট নিয়ে ফিরছে বঙ্কু এবং ডেবিড। ওরা কাঠ মেটে হাঁড়ি এবং নতুন সাদা থান এনেছে। এবং বাঁশ লম্বা মতো দু'টো। কিছু শুকনো ডাল আর সব চন্দন কাঠ। পাটকাঠি পাওয়া যাচ্ছে না। তার চেয়ে নরম ঘাসের কাণ্ড এনেছে যা পাটকাঠির মতো জ্বলবে। তারপর দু'টো বোট সমুদ্রে ক্রমে একটা দ্বীপ খুঁজে বেড়াতে বেড়াতে বেশ পাঁচ-ছ মাইলের মাথায় একটা আশ্চর্য সবুজ রঙের পাথরের দ্বীপ পেয়ে গেল। দূর থেকে দ্বীপ বলে চেনা যায় না। সমুদ্র যেন সহসা ঢেউ তুলে স্থির হয়ে গেছে। ঢেউটা আর নড়ছে না। উঁচু নিচু সব ঢেউ আর তার উপত্যকা। ওরা কাছে গেলে বুঝতে পারল বেশ ছোট দ্বীপটা। ফার্লং-এর মতো দ্বীপটা প্রস্থে দৈর্ঘ্যে সমান। ওরা চারজন, ডেবিড, বঙ্কু সামনে, অনিমেষ, ছোটবাবু পেছনে, উঠে যেতে থাকল।

মাচানের ওপর শুয়ে আছে বড়-টিণ্ডাল। পেছনে আসছে সবাই। মাথায় করে তুলে আনছে কাঠ বাঁশ। এবং স্যালি হিগিনসের হাতে চন্দনের কাঠ। সারেঙের হাতে ঘি-এর টিন। সব নিয়ে উঁচু একটা জায়গা দেখে ওরা উঠে যাচ্ছে। চারপাশে শুধু সমুদ্র আর তার তরঙ্গমালা। সবুজ পাহাড়ের মাথায় সেই এক অগ্নিকাণ্ডের আয়োজন। ডেবিড এবং স্যালি হিগিনস দূরে দাঁড়িয়ে ক্রমে কৌতুহলী হয়ে উঠেছেন। মানুষের শরীর আগুনে পুড়ে যায়—

জীবনেও ওঁরা দেখেন নি। কেমন ভয়ে কৌতুহলে ওঁরা সামান্য দূরে দাঁড়িয়ে দেখছেন।

ছোটবাবু সমুদ্র থেকে হাঁড়িতে জল তুলে আনছে। জলে স্নান করানো হচ্ছে বড়-টিণ্ডালকে। বড় একটা পাথরের ওপর বসন্তনিবাস শুয়ে আছে। ঘড়া ঘড়া জল ঢালা হচ্ছে। একে একে সবাই জল এনে ওর শরীরে ঢেলে দিল। তারপর সাদা নতুন কাপড় এবং কাঠ সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। সূর্য ঠিক তখন সমুদ্রে অস্ত যাবার মুখে। ছোটবাবু মৈত্রদার মুখে আগুন দেবার সময় বলল, বন্ধু, তোরা হরিবোল দিলি না; সবই যখন হল এটা বাদ যাবে কেন?

এবং এই এক শব্দ পাহাড়ের মাথায় আর এই দিগন্তে। এখন সমুদ্র জয় করে অথবা আকাশ- বাতাস জয় করে ছুটে যাবে। ওরা তার চিতা প্রদক্ষিণ করল। ছোটবাবুর সেই ঠাকুরদার দৃশ্যের কথা মনে পড়ছে। এবং পুড়ে ছাই হয়ে যাওয়ার কথা ভাবছিল। কি যে ভয় ছিল তখন! এখন সে সাহসী মানুষের মতো অথবা বলা যায় অভিভাবকের মতো কাঠের নিচে আগুন দিয়ে পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকল। আগুন ক্রমে প্রবল হয়ে উঠছে। কাঠের ফাঁকে ফাঁকে আগুন ক্রমে আকাশ ছুঁয়ে দিতে চাইছে।

আর আগুনের ভেতর ছোটবাবু সহসা কেন যে বনির মুখ দেখে ফেলল। জাহাজে বনি একা। স্যালি হিগিনস পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে মানুষের সৎকার দেখছেন। কেমন হুঁশ ছিল না তার। ছোটবাবু পাশে দাঁড়িয়ে ডাকল, স্যার।

—কিছু আমাকে বলবে?

—অনেক রাত হবে। আপনি বরং স্যার ফিরে যান একটা বোটে। সে ডাকল, চাচা! সারেঙ পাহাড়ের মাথায় উঠে গেলে বলল, আপনারা ফিরে যান। আমরা একেবারে শেষ হয়ে গেলে ফিরব। একটা বোট এখানে থাক।

হিগিনস জাহাজে ওঠার মুখে দেখলেন, বনি বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে আছে! আবার সেই সাদা জ্যোৎস্না সমুদ্রে। বোট-ডেকে বনিকে আবছা দেখা যাচ্ছে। বনির কাছে গিয়ে বললেন, ওদের ফিরতে রাত হবে বনি।

—ওরা কতদূর গেছে?

তিনি এবার দূরে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় দেখলেন নক্ষত্রের মতো সমুদ্রের বুকে আগুনটা জ্বলছে।—এই যে দেখছ, দেখতে পাচ্ছ না, মাঝে মাঝে একটা উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো আগুন আকাশে কখনও বেশ দপ্ দপ্ করে জ্বলছে আবার নিভে যাচ্ছে দেখতে পাচ্ছ?

—হ্যাঁ বাবা।

—ওখানে ওরা একটা দ্বীপে বড়-টিণ্ডালকে আগুনে পুড়িয়ে দিচ্ছে। তিনি এবার বললেন, ভয় করলে ব্রীজে এসে বসতে পার।

এবং তখনই হঠাৎ ওপরে কোয়ার্টার মাস্টারের গলা। স্যার ফোন। সে বলতে বলতে নেমে আসছে। ওপরে উঠে তিনি বললেন, ইয়েস ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস, বলুন। তারপর চুপচাপ। আবার বললেন, ইয়েস ইয়েস। কিন্তু এটা কেন হচ্ছে। বনি দেখল বাবার মুখ দুমড়ে মুচড়ে যাচ্ছে।

ফোনে তিনি চিৎকার করে উঠলেন, হোয়াট।

—স্যার রিচার্ড ফ্যালের এমনি নির্দেশ আছে।

—নো নো। আমি পারব না। বলতে বলতে উত্তেজনায় তিনি থরথর করে কাঁপছেন। তারপর কেমন স্তিমিত গলায় বললেন, আসবেন। নিশ্চয়ই আসবেন। তারপর বসে পড়লেন। কেমন রক্ত- শূন্য হয়ে গেছেন সহসা। সাদা ফ্যাকাশে মুখ। বনির দিকে তাকিয়ে আছেন। আর চোখ নামাচ্ছেন না। বনি বাবাকে জড়িয়ে হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, বাবা কি হয়েছে! বাবা! বাবা!

স্যালি হিগিনস ভীষণ নিথর। ঠাণ্ডা। যেন জীবনে আর একটা কথা বলবেন না।

॥ তেতাল্লিশ ॥

তখন সমুদ্রের পাড়ে পাড়ে সব সামোয়ান নর-নারীদের ভীড়। ওরা জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে দূরবর্তী পাহাড়ের মাথায় আগুন জ্বলতে দেখছে। অতি-উৎসাহী মানুষেরা বোট-ভাড়া করে পাহাড়টার কাছাকাছি চলে যাচ্ছে। কি করে যে একজন মানুষকে পুড়িয়ে দেওয়া হয়। এবং পাহাড়ের চারপাশে ওদের দেখে ছোটবাবু অবাক--বোটের সব মানুষেরা এসে হাত নাড়ছে নিচে। ওপরে ওরা উঠে আসতে চায়। দেখতে চায়।

ছোটবাবু না বললে যেন কেউ উঠতে পারছে না। সে বলল, আসুন। এবং ওদের কেউ কেউ মানুষের সেই আধ-পোড়া শরীর দেখে কেমন ঘাবড়ে গেল। ডেবিড খুব বেশি সময় কাছে থাকতে পারে নি। ও-পাশের ছোট একটা পাহাড়ের মাথায় সে শুয়ে আছে। ওর শরীর গোলাচ্ছে। ছোটবাবু ওকে ওদিকে রেখে এসেছে। কারণ মানুষের মাংসের সেই উৎকট পোড়া গন্ধে ছোটবাবুও ঠিক ছিল না। বঙ্কু, অনিমেষ খুব সাহসী মানুষের মতো কাজ করে যাচ্ছে। ছোটবাবু মাঝে মাঝে আগুন কমে গেলে উসকে দিচ্ছে, কাঠ ফেলে দিচ্ছে। কাঠের নিচে আধ পোড়া শরীর ঢেকে দিয়ে সে সবসময় যতটা পারছে না দেখে থাকছে।

যারা এসেছিল বোট-ভাড়া করে, তারা কেউ বেশি বয়সের কেউ কম বয়সের। বেশ নিজেদের ভাষায় কথাবার্তা চালিয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ের মাথায় বলে একসঙ্গে বেশি লোক উঠতে পারছে না। পাঁচ সাতজনের একটা দল উঠে আসছে, আবার ওরা নেমে গেলে আর একদল উঠে আসছে।

অনিমেষ বলল, বেটা বেশ মরে গিয়ে এখানে অমর হয়ে থাকল।

আসলে বোধহয় এই দ্বীপবাসীদের কাছে এটা একটা খবর—যেন দিন কাল মাস কেটে যাবে, বছরের পর বছর কেটে যাবে, তবু খবরটা ওরা বয়ে বেড়াবে আজীবন। বাংলাদেশের নাবিক বসন্তনিবাস এখানে সমুদ্রে ডুবে মরেছিল। ঐ যে দেখছ পাহাড়টা, সমুদ্র থেকে খাড়া উঠে গেছে, ঠিক আকাশের নিচে, তার মাথায় সারারাত আগুনটা জ্বলেছিল। একজন-মানুষের শরীর প্রায় সারারাত পাহাড়ের মাথা জ্বলেছিল—বড় দুঃসাহসিক ঘটনা।

সুতরাং প্রথমে মনে হয়েছিল একজন মানুষের শরীর আগুনে পোড়ালে দ্বীপবাসীরা সহজে মেনে নাও নিতে পারে। পরে মনে হয়েছে, যেন এই দ্বীপবাসীদের জীবনে এটা একটা নতুন রোমাঞ্চ। কারণ সমুদ্রের পাড়ে পাড়ে হাজার হাজার এখন মানুষ। জ্যোৎস্নায় দিগন্তে নক্ষত্রের মতো আগুনের সামান্য ফুলকি দেখছে। আগুনের সেই ফুলকি নিভে না গেলে ওরা বুঝি কেউ ঘরে ফিরবে না। একজন ঘরছাড়া মানুষের মৃত্যুতে ওরা বেদনা বোধ করছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শোক প্রকাশ করছে। দেখে মনে হচ্ছে মেয়রকে ধরে হয়তো এ-বছরের বাজেটে পাহাড়ের মাথায় সামান্য একটা স্মৃতিসৌধের জন্য খরচ রাখবে, যেন আগামী বছরের জুন-জুলাইর ভেতর তার নির্মাণকার্য শেষ হয়ে যায়। এত সব মানুষ যখন বালিয়াড়িতে, সমুদ্রের ধারে ধারে এবং পাহাড়ী উপত্যকাতে দাঁড়িয়েছিল তখন একটা স্মৃতিসৌধ সামান্য ঘটনা। সেই সাদা জ্যোৎস্নায় ছায়া ছায়া সব মানুষের মিছিল। আর আগুন নিভে নিভে শেষ হয়ে আসছে।

চারপাশে সমুদ্র তেমনি ফুঁসছে। সমুদ্র পাহাড়টার চারপাশে মাথা কুটে মরছে। ওরা ডেবিডকে ডেকে নিয়ে এল। এখন সমুদ্র থেকে জল আনতে হবে। চিতা নিভিয়ে দিতে হবে। ছোটবাবু জল এনে চিতার ওপর ঢেলে দিল। বলল--দাদা, তোমাকে এখানে রেখে গেলাম, সুখে থেকো।

অনিমেষ বলল, থাক শালা সুখে থাক।

বঙ্কু বলল, তুমি তো থাকলে বড়-টিগুাল। তোমার বৌকে আমরা ফিরে গিয়ে মুখ দেখাব কি করে!

ডেবিড জল ঢেলে দিল।

জব্বার এবং অন্য সবাই জল ঢেলে তারপর নেমে এল নিচে। সমুদ্রে ওরা ডুবে স্নান করল। তারপর ভেজা জামা-কাপড়ে বসে থাকল বোটে সবাই। কেউ একটা কথা বলছে না। আকাশে নক্ষত্রমালা তেমনি জেগে আছে। পাহাড়টা ক্রমে জ্যোৎস্নায় অস্পষ্ট হয়ে গেল। ক্রমে ওরা তীরের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এবং জাহাজে আলো, মাস্তুলে তেমনি লম্ফ জ্বলছে। ওরা বোট ভিড়িয়ে ওপরে উঠে যেতে থাকল।

তখন গ্যাঙ-ওয়েতে কোয়ার্টার-মাস্টার বললে, আল্লা মুবারক।

ছোটবাবু বলল, আল্লা মোবারক।

কোয়ার্টার-মাস্টার হাত টেনে বলল, কাপ্তানের শরীর ভাল না।

–কি হয়েছে! ডেবিড শুনছ?

–কী!

–কাপ্তানের শরীর ভাল না।

কোয়ার্টার-মাস্টার বলল, ফিট, ফিটের ব্যামো।

ছোটবাবু এবং ডেবিড এক মুহূর্ত আর দেরি করল না। জব্বার আর বঙ্কুকে বলল, তোরা যা। ভিজে জামা প্যান্ট পরে বেশিক্ষণ থাকিস না এবং ছোটবাবু নিজের কেবিনে এসে তাড়াতাড়ি পোশাক পাল্টে নিল। পাশের কেবিনগুলো বন্ধ। সবাই ঘুমিয়ে আছে হয়তো। রাত গভীর, কোন সাড়া শব্দ নেই। সে ওপরে ওঠে বনির কেবিনে টোকা মারল। সাড়া শব্দ এখানেও কিছু নেই। বনির কাছে জানতে পারত কি হয়েছে। ও-পাশের পোর্ট-হোলে উঁকি মেরে দেখল, বনি কেবিনে নেই। সে এবার সিঁড়ি ধরে আরও ওপরে উঠতে থাকল। চার্ট-রুমের পাশে কাপ্তানের খাসকামরা। দরজা খোলা। ভেতরে আলো জ্বালা। সে উঁকি দিয়ে দেখল, পায়ের কাছে আর্চি বসে আছে। মাঝে চিফ-মেট। কাপ্তানের বাংক দেখা যাচ্ছে। কাপ্তানের শরীর চাদরে ঢাকা সে বুঝতে পারল। চিফ-মেট ছোটবাবুকে উঁকি দিতে দেখে বলল, কাম-ইন

—ছোটবাবু।

–কাম-ইন, কাম-ইন। যেন প্রাণ পেয়েছেন হাতে। এবং মুখে সরল বালকের মতো হাসি।

ছোটবাবু ভেতরে ঢুকলে বললেন, বোস। মুখ এত গোমড়া কেন। আরে, আমার কিছু হয়নি। বড়-টিণ্ডাল! ওটা একটা আহাম্মক। ওর জন্য কষ্ট পেয়ে লাভ নেই।

ছোটবাবু কখনও কাপ্তানের খাস-কামরায় আসে নি। একটা সবুজ রঙের আলো জ্বলছে। তিনি শুয়ে আছেন। বুক পর্যন্ত সাদা চাদরে ঢাকা। নকল দাঁতের দু'পাটি খোলা। খুব বুড়ো এবং শীর্ণকায় মনে হচ্ছে স্যালি হিগিনসকে। এবং কেন জানি মনে হল মানুষটা প্রাচীন মানুষের মতো ভীষ্মের শরশয্যায় যেন শুয়ে আছেন। সে পাশে বসে বলল, কেমন আছেন?

—খুব ভাল। জ্যাক তুমি শুতে যাও। কতক্ষণ এ-ভাবে বসে থাকবে।

এবং ছোটবাবু দেখল, জ্যাক মাথার কাছে বসে আছে। তার দিকে তাকাচ্ছে না। অথবা সে যে কেবিনে এসেছে একেবারে যেন বুঝতে পারে নি, জ্যাক কি যে চুপচাপ এবং সেও কেন জানি আর একটা কথা বলতে পারল না। এমন একটা সুন্দর কেবিন, ঠিক মাথার কাছে যীশুর মূর্তি। নিচে ছোট্ট গোল টেবিল। ফুলদানিতে কিছু ফুল। হুকে জাহাজি টুপি ঝুলছে। লকার অতিকায়। দু'টো পোর্ট-হোল দু'দিকের দেয়ালে। তিনি বুকে দু-হাত প্রার্থনার মতো রেখেছেন। ছোটবাবুর কেমন ভাল লাগছে না। ডেবিড এখনও আসছে না কেন!

তখন স্যালি হিগিনস বললেন, বেশ সময় লেগে গেল তোমাদের।

ছোটবাবু বলল, হ্যাঁ সার। ডেবিড এখনও আসছে না কেন! সে দরজার দিকে বার বার

তাকাচ্ছে।

হিগিনস বললেন, বড়-টিণ্ডালের বাড়িতে কে আছে?

—ওর স্ত্রী।

—আর কেউ নেই?

—আর কে আছে জানি না।

—কালই খবরটা পাঠিয়ে দিতে হবে। চিফ-মেট বলল, আপনি চিন্তা করবেন না। আমরা তো আছি।

ডেবিড ঝড়ের মতো ঢুকে প্রথমে পালস্ দেখল কাপ্তানের। তারপর চোখ টেনে দেখল। দেখি জিভ। বের করুন। ছোটবাবু উঠে দাঁড়িয়েছে। ওরা দু'জন প্রায় এখন যেন সমবয়সী মানুষ। ওরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে স্যালি হিগিনসকে দেখছে। জ্যাক বসে রয়েছে মাথার কাছে। একটা কথা বলছে না। জ্যাকের পোশাক আরও ঢিলে-ঢালা। আর্চি আড়চোখে জ্যাককে দেখছে। এবং এ-কেবিনে সে যেন জ্যাককে দেখার জন্যই বসে রয়েছে। এই যে মেয়ে জ্যাক, এবং এই যে সুগন্ধ মেয়ের চারপাশে—কেমন এক কূট আকর্ষণ। সে সারারাত জেগে যেন বসে থাকতে পারবে। জ্যাক বসে থাকলে রাত জেগে বসে থাকতে এতটুকু কষ্ট হবে না তার।

ডেবিড বলল, আপনি ঘুমোন স্যার।

স্যালি হিগিনস বললেন, আমার ঘুম আসছে না ডেবিড।

—না ঘুমোলে তো চলবে না। এই জ্যাক, তুমি আর বসে থাকবে না। যাও। শুয়ে পড়ে গে। স্যার, সে চিফ-মেটের দিকে তাকাল।

চিফ-মেট বলল, যাচ্ছি।

ডেবিড এবার আর্চির দিকে তাকিয়ে বলল, কি ব্যাপার তোমার ঘুম পায় না? এস। সে প্রায় সবাইকে নিয়ে বাইরে বার হয়ে এল। একজন কোয়ার্টার-মাস্টার শুধু জেগে বসে থাকল বাইরে। আলো নিভিয়ে দেওয়া হল। ওকে এ-ভাবে জাগিয়ে রাখা ঠিক হয় নি। পাল্সের বিটে সামান্য গণ্ডগোল এখনও আছে। ওরা বোট-ডেকে নেমে গেল। জ্যাক বলল, ফোনে কথা বলার সময় অজ্ঞান হয়ে যান। ডাক্তার বলে গেছেন, দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় এমন হয়েছে।

জ্যাক আবার বলল, বাবা ফোনে কথা বলতে বলতে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েন।

—কার সঙ্গে কথা বলছিলেন? ডেবিড রেলিঙে দাঁড়িয়ে এমন বলল।

—বুঝতে পারলাম না। কেবল শেষে বলতে শোনলাম, আসবেন। তারপরই বসে পড়লেন। আর আমার দিকে ভূত দেখার মতো তাকিয়ে থাকলেন।

বোধহয় মধ্যযামিনীতে ওরা এভাবে বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে বিচিত্র চিন্তাভাবনার ভেতর কিছুই বুঝে উঠতে পারছিল না। জাহাজ সম্পর্কে নতুন কিছু কি খবর এসেছে। চিফ-মেট পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। বয়সে প্রবীণ মানুষটি রাতের পোশাক পরে আছেন। মাথার ওপর সেই নিরবধিকালের আকাশ আর তার নক্ষত্রমালা। ওপরে কাপ্তান, জাহাজের সবচেয়ে দামী মানুষটা বুকের কাছে করজোড়ে হাত রেখে শুয়ে আছেন। বার বার জিজ্ঞাসা করেও ওরা ফোনে কি কথা হয়েছে জানতে পারে নি। এমন কি নতুন দুঃসংবাদ রয়েছে এই প্রাচীন জাহাজকে কেন্দ্র করে যার জন্য এমন প্রবীণ অভিজ্ঞ মানুষটা পর্যন্ত বিচলিত বোধ করছেন। ওরা কেউ আর কথা বলতে পারল না। নিঃশব্দে যে যার কেবিনের দিকে হাঁটতে থাকল!

সকালে যে যার মতো ঘুম থেকে উঠেছিল, যে যার মতো চা খেয়ে ডেকে উঠে এসেছিল। পাহাড়ের মাথায় সেই আগুনের শিখা আর নেই। সূর্য লাল বলের মতো পাহাড়ের মাথায় জেগে উঠেছে। এই সমুদ্র, দ্বীপের নারকোল গাছ, অথবা আভা গাছের জঙ্গল দেখতে দেখতে কে বলবে, গত রাতে ওরা ও-পাশের একটা পাহাড়ে একজন মানুষকে চিরদিনের মতো রেখে

এসেছে। সকালের সব কাজ-কর্মের ভেতর বড়-টিণ্ডালের দু'টো একটা কথা এবং অথবা শোক-সন্তাপ, এবং এরই ভেতর ওরা কাজ করে যাচ্ছিল। ফল্কা থেকে ত্রিপল খুলে ফেলা হচ্ছে। কাঠ ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে। ডেরিক টেনে তোলা হচ্ছে। মাল বোঝাই হবে বলে সবাই এক দণ্ড দাঁড়াতে পারছে না। বড় বড় সব টাগ-বোট এগিয়ে আসছে ক্রমশ। বড় বড় পিপে ভর্তি ফসফেট। এবং সামোয়ান মানুষেরা টাগ-বোট জাহাজের কাছে নিয়ে এসে হাঁকছে—হাড়িয়া।

আর এ-ভাবে যখন জাহাজে হাড়িয়া হাফিজ শব্দ, কাঠ ফেলার শব্দ, ঘর্ ঘর্ করে বড় বড় পিপে উঠে যাচ্ছে ডেরিকে, নিচে অনেক নিচে খাদের মতো জাহাজের তলায় নেমে যাচ্ছে পিপেগুলো—তখনই দেখা গেল একটা সাদা রংয়ের বোট জাহাজের দিকে ভেসে আসছে। দু'জন মানুষ একজন বেঁটে মতো, একজন লম্বা মতো, সাদা পোশাকে দাঁড়িয়ে আছে বোটে। ওদের একজনের হিপ পকেটে ছোট্ট মতো একটা হাতুড়ি। জাহাজটা দেখেই, বেঁটে মতো মানুষটা হাওয়ার ওপর হাতুড়িটা দোলাচ্ছে।

আর সেই হাতুড়িটা দোলাতে দোলাতে লোকটা লাফ মেরে সিঁড়িতে উঠে এল। তারপর সিঁড়ি কাঁপিয়ে সে আরও ওপরে উঠে আসছে। পেছনে সেই লম্বা মতো মানুষ। ওরা দু'জন প্রায় লাফিয়ে লাফিয়ে জাহাজের সেই শেষ তলায় উঠে যাচ্ছে। গোলগাল মানুষটা, যেন প্রস্থে দৈর্ঘ্যে সমান—যার শরীর বেঢপ, যার মুখে স্মিত হাসি এবং হাসলে কান পর্যন্ত নড়তে থাকে, সে কেমন মাঝে মাঝে দুষ্টু ছেলের মতো বালকেডে হাতুড়ি ঠুকে দেয়ালে কান পেতে কি শুনছে। শুনতে শুনতে তখন সেই মানুষের চোখে মুখে কি অপার বিস্ময়। যেন সেই শব্দ লোহার অভ্যন্তরে ঢুকে নানারকমের খেলা প্রায় লুকোচুরি খেলার মতো অথবা হৃৎপিণ্ডের শব্দ শোনার মতো কান পেতে শুনছে শরীরে তার শিরা-উপশিরা কতটা ঠিক আছে।

এনজিন-সারেঙ বয়লার-রুম থেকে উঠে আসার সময় দেখলেন, অদ্ভুত দেখতে একটা লোক ফানেলের গুঁড়িতে উবু হয়ে আছে। সে ফানেলের পাশে উবু হয়ে কি দেখছে! তারপরই মনে হল উবু হয়ে দেখছে না, কান পেতে কি শুনছে! হাতুড়িতে দু'বার ঠুকেই কান পেতে বড় সন্তর্পণে শুনছে কিছু। চোখে মুখে দুষ্টু বালকের মতো হাসি। খুশীতে তার প্রাণ ভরে যাচ্ছে। হাতুড়িটা আনন্দে বাতাসে ছুঁড়ে আবার লুফে নিচ্ছে।

আর তখন লম্বা মতো মানুষটি হাতের ইশারায় ডাকল তাকে। বড় বেশি তোমার বাপু নেশা! জাহাজে উঠেই কাজকাম আরম্ভ করে দিয়েছ! এস দেখি জাহাজের বুড়ো কর্তা কি বলে! কাল ফোনে যা তেড়ে উঠেছিলেন, এখন হাতে হাতুড়ি দেখলে ঘাড় ধরে নামিয়ে দেবেন। দিতে পারেন।

—ভিতরে আসতে পারি?

চিফ-মেট বলল, কাকে চাই?

—ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস। বলে সে একটা লম্বা কাগজ চিফ-মেটের নাকের ডগায় তুলে ধরল।

লোকটার সাহস আছে! বলা কওয়া নেই একেবারে ব্রীজে উঠে এসেছে। কিন্তু কাগজটা পড়ে সে বুঝতে পারল—হেড অফিসের খোদ কর্তার লোক সুতরাং যা হয়ে থাকে, আদর আপ্যায়নের শেষ থাকে না। আপনারা বসুন। দেখছি। ক্যাপ্টেন কাল থেকে সামান্য অসুস্থ। দেখি–বলে সে সীল করা খাম হাতে নিয়ে ঢুকে গেল কাপ্তানের ঘরে। তিনি বেশ উঠে বসেছেন—এবং ফলের রস খাচ্ছেন। জ্যাক সব হাতের কাছে এগিয়ে দিচ্ছে।

চিফ-মেট বলল, স্যার দু'জন লোক এসেছে। আপনার সঙ্গে দেখা করতে চায়।

স্যালি হিগিনস গ্লাস রেখে দিলেন—তা হলে ওরা এসে গেছে! ফলের রস তখন মাত্র সামান্য খেয়েছেন।

জ্যাক বলল, তুমি খেয়ে নাও না বাবা! ওরা তো বসছে। ওরা তো চলে যাচ্ছে না।

চিফ-মেট বলল, স্যার ওদের ভেতরে নিয়ে আসব?

—না। ওদের চার্ট-রুমে বসতে বল, আমি যাচ্ছি।

—কিন্তু স্যার, আপনার এ-শরীরে যাওয়া কি ঠিক হবে!

—কিচ্ছু হবে না। ওদের বসতে বল।

জ্যাক বলল, বাবা

—কী!

—তুমি যাবে না। ওদের এখানে আসতে বলি।

স্যালি হিগিনস ডাকলেন, চিফ-মেট! সেই হাই করে ডাক। একেবারে আগের মতো স্বাভাবিক। এতটুকু বিচলিত বোধ করছেন না।

—আজ্ঞে কিছু বলছেন স্যার?

—আমার শরীর ভাল না, এ-সব আবার বল নি তো!

চিফ-মেটের চোখ মুখ শুকিয়ে গেল। সে তো আগেই বলে দিয়েছে। চিফ-মেট বলল, স্যার!

—তোমাদের কবে যে কাণ্ডজ্ঞান হবে! যাও। তিনি এবার বেশ সহজভাবে নেমে এলেন বাংক থেকে। যেন সেই যৌবনে ফিরে যাচ্ছেন। প্রথমে তিনি তাঁর দু'পাটি দাঁত মুখে পুরে দিলেন। একেবারে যুবকের মতো মুখ হয়ে গেল। তিনি তাঁর ইউনিফরম পরে নেবেন। কাপ্তান-বয় হাজির থাকল। বড় বড় পিপে সব ওপরে উঠে যাচ্ছে, নিচে নেমে যাচ্ছে। ছোটবাবু মাথায় টুপি পরে তেলের টব আর বালতি নিয়ে এক একটা উইনচের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকছে, মাল ওঠা-নামা, অর্থাৎ গিয়ার, লিভার এবং সবকিছু ঠিক মতো চলছে কিনা দেখে আবার অন্য উইনচে ছুটে যাচ্ছে। দড়িদড়া বেয়ে উঠে যাচ্ছে সব মানুষ। কুলিরা সব হাঁকডাক করছে। ওরা হাত তুলে বলছে, হাড়িয়া, মাল নেমে যাচ্ছে। ওরা বলছে, হাফিজ, খালি পিপে উঠে ভেসে যাচ্ছে বাতাসে।

জ্যাক পরেছিল সাদা রঙের ট্রাউজার। হাঁটু পর্যন্ত গোটানো। মাথায় সেও টুপি পরেছে। এবং চারপাশে ফসফেটের গুঁড়ো, কুয়াশার মতো উড়ছে বলে সে একটা নিরিবিলি জায়গায়, অর্থাৎ ট্যাঙ্ক- টপে শরীর এলিয়ে দিয়ে সামনের রেলিঙে পা রেখে দূরের সমুদ্রে গভীর এক নীল নির্জনতা দেখতে পাচ্ছে। সে বুঝতে পারছে না বাবাকে লোকটা কি বলেছিল! যারা দেখা করতে আসছে তারা কি সেই লোক! বাবাকে সে দেখেছে, যখন ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েন তখন সব কিছু তাঁর বেশি ঠিকঠাক চাই। কারো তিনি তখন সামান্য ত্রুটি সহ্য করতে পারেন না। মার্জনা করা তো দূরের কথা। সে বুঝতে পারছিল, বাবা ভেতরে ঠিকঠাক নেই। সে দমে গেল খুব।

তখন স্যালি হিগিনস পুরোপুরি ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস। চকচকে সাদা জুতো, সাদা মোজা, সাদা প্যান্ট, সাদা হাফ-শার্ট, সোনালী স্ট্রাইপ কাঁধে চার চারটা। মাথায় এংকারের সোনালী ছবি আঁকা কাপ্তানের টুপি। ফিটফাট এবং খুবই রাশভারি মানুষ দেখাচ্ছিল তাঁকে। ভেতরে ঢুকলে ওরা দু'জন উঠে দাঁড়াল। পাশে চিফ-মেট আজ্ঞাবহনকারী মানুষের মতো দাঁড়িয়ে আছে।

লম্বা মতো মানুষটি ঝুঁকে সামান্য হাত বাড়াল, নাম বলল।

বেঁটে মতো মানুষটি ঝুঁকে নাগাল পাচ্ছিল না কাপ্তানের হাত। পেট ভীষণ মোটা। টেবিলের ও পাশে পেটের চর্বি থকথক করছে। জামার ওপরে পেট ভেসে রয়েছে। মোটা বেল্ট। বেল্ট খুলে ফেললেই প্যাণ্ট হড় হড় করে পড়ে যাবে। স্যালি হিগিনস আরও বেশি ঝুঁকে হাত বাড়ালেন। বললেন, ইউ দেন মিস্টার ইয়াদু ওসাকা।

—ইয়েস ইয়েস ওসাকা। ইয়াদু ওসাকা।

—বসুন।

ওরা বসে পড়ল। তিনি বললেন, কফি।

চিফ-মেট মুখ বাড়াল দরজায়। কাপ্তান-বয় সোজা দাঁড়িয়ে আছে। সে হুকুমের প্রতীক্ষায় আছে।

–কফি।

স্যালি হিগিনস মাথা থেকে টুপি খুলে পাশের হুকে ঝুলিয়ে দিলেন। খুব সতর্ক চোখ মুখ। তিনি জানতেন, এরা কি বলবে। তিনি বললেন, কবে এসেছেন এখানে।

—সকালের ফ্লাইটে।

—মি. ফ্যাল কেমন আছেন?

—ভাল।

—তাঁর স্ত্রী।

—ভালো আছেন।

—তাহলে সবাই ভাল আছে। দেখি আপনাদের কাগজপত্র। মি. হ্যামিলটন আপনাকে আগে কোথাও দেখেছি?

—না স্যার।

—মুখটা খুব চেনা চেনা।

মি. হ্যামিলটন ভীষণ লম্বা আর রোগা। দালাল লোকেরা দেখতে যেমন হয়ে থাকে—এবং পৃথিবীতে সব দালাল লোকদের মুখই বুঝি এমন হয়। মি. হ্যামিলটন বুঝি তাই খুব চেনা চেনা লাগছিল। ফাইল থেকে সীল করা খাম বের করে আলোতে দেখে ছিঁড়ে ফেললেন। এবং চিফ-মেটকে বললেন, তুমি আসতে পার। কাছাকাছি থাকবে। ডাকলে সাড়া দেবে।

তিনি খামের ভেতর থেকে লাল রঙের প্যাডে দেখলেন সেই সমনের নোটিস। চোয়াল শক্ত হয়ে উঠছে তাঁর।

—তারপর ইয়াদু ওসাকা, জাহাজটা একবার দেখবেন বলছেন?

—ইয়েস স্যার। পুরানো জাহাজ। একটু বাজিয়ে নিতে হবে। বলেই সে তার হিপ পকেট থেকে ছোট্ট একটা হাতুড়ি বের করে প্রায় কানের ভেতর গুঁজে ফেলল। যেমন স্বর্ণকারদের হাতুড়ি পাতলা চকচকে এবং দামী ইস্পাতের তৈরি হয়ে থাকে অথচ ভারি মনোরম, কানের ভেতর পেনসিল গুঁজে রাখার মতো এমন একটা ভারি হাতুড়ি লোকটা অনায়াসে কানে গুঁজে রেখে দিল। সারাজীবন সে এ-কাজটাই করেছে। পুরানো জাহাজ কেনা-বেচার কাজ। জাহাজের ইস্পাত ঠুকে ঠুকে দেখে নেবে কতটা কি মাল আছে জাহাজে। কানে এখন লোকটা পেনসিল গুঁজে রাখার বদলে হাতুড়ি গুঁজে রাখে। কানের পাশে কড়া পড়ে গেছে। কানটা ভারী হয়ে গেছে।

স্যালি হিগিনস দেখলেন, কফি এসে গেছে। তিনি কফি ঢালতে ঢালতে বললেন, জাহাজটা দেখে আপনাদের কিছু মনে হচ্ছে না!

—জাহাজটা তো স্যার অনেকদিন থেকেই দেখার ইচ্ছে ছিল। এত শুনেছি। এখন দেখে তো আর দশটা জাহাজের মতোই লাগছে। ইয়াদু ওসাকা ঢোক গিলল বলতে বলতে।

—তাই তো হওয়া উচিত।

মি. হ্যামিলটন বলল, মাঝখানে শুনলাম আপনাদের জাহাজের কোনো খবর নেই।

—মাঝে মাঝে থাকে না। খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন স্যালি হিগিনস। এত দিনের একটা বিশ্বাস এরা ভেঙে দিতে এসেছে?

—যাক ভালোয় ভালোয় শেষ পর্যন্ত পৌঁছে গেলেন।

—ভারী বিশ্বাসী জাহাজ।

ইয়াদু ওসাকার শুধু মুখটা দেখা যাচ্ছে। গলা পর্যন্ত টেবিলে ঢাকা। শুধু মুখটা দেখতে পাচ্ছেন স্যালি হিগিনস। হাঁড়ির মতো মুখ। চুল কালো। সজারুর কাঁটার মতো চুল খাড়া। সব সময় স্মিত হাসি। হাসলে দু'টো কান নড়তে থাকে। লোকটা কেন যে হাসছে। কান নড়তে থাকলে ভীষণ অস্বস্তি। এবং মনে হচ্ছিল ইয়াদু ওসাকা একটা পিপে থেকে গলা বের করে কথা বলছে। কান মলে কান নাড়া বন্ধ করে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে।

ওসাকা খুব গলে গেছে মতো বলল, ভারী ইচ্ছে ছিল, ঠিক ইচ্ছে না বরং স্বপ্ন বলতে পারেন, সিউল-ব্যাংক জাহাজ আমার হাত দিয়ে পাস্ হবে।

স্যালি হিগিনসের সত্যি ইচ্ছে হল কান ধরে বের করে দেবেন। কিন্তু তিনি দাঁত ঠেলে দিলেন ওপরে—বয়েস হয়েছে আমারও ইয়াদু ওসাকা। সত্যি মিথ্যা যা খুশি শুনে এটাকে স্ক্র্যাপ করার জন্য পাগল হয়ে গেছেন। তারপর কেমন জেদী বালকের মতো ভাবলেন, আসলে জাহাজকে ভয় তারও কম নয়। এতদিন তিনি তাকে বাগে রেখেছিলেন, জাহাজ এখন শেষ সফরে তাঁর হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। তিনি বললেন, জাহাজ তো আপাতত জিলঙ যাচ্ছে।

—তা যাক। হ্যামিলটন বললেন। আপনাদের চুক্তি শেষ না হলে এটাকে ভাগাড়ে নিয়ে যাচ্ছি না। মি. ফ্যাল সব আমাদের বলেছেন।

স্যালি হিগিনস বললেন, যদি এর ভেতর কিছু হয়ে যায়!

—চুক্তিপত্র সে-ভাবেই করা আছে? একটু থেমে হ্যামিলটন চোখ বড় বড় করে বলল, কিছু হবে বলে কি আপনার মনে হচ্ছে?

—না না এমনি বললাম। সব কথাবার্তা খোলামেলা থাকা ভাল।

—আপনি তো শুনেছি জাহাজটাকে সব অশুভ প্রভাব থেকে রক্ষা করে আসছেন।

—এ-সব গল্পকথা। জাহাজ ঠিকই আছে। গুজব বলতে পারেন।

—আমরা তো জাহাজটা সম্পর্কে এত শুনেছি স্যার, উঠেই মনে হয়েছিল, আমাদেরও কিছু একটা হয়ে যাবে।

স্যালি হিগিনস হা হা হেসে করে উঠলেন।

ইয়াদু ওসাকা মুখ ভার করে ফেলল। এই প্রথম হিগিনসকে দেখলেন, ইয়াদু ওসাকার মুখে কোন কথা নেই। বিমর্ষ। সেই বলল, আমরা তো শুনেছি ক্যাপ্টেন লুকেনার নিজের তদারকে জাহাজটা বানিয়েছিলেন।

—তা হয়তো হবে।

ওসাকা বলল, স্যার সব খবরাখবর নেবার জন্য হামবুর্গ কিছুদিন থেকে গেলাম। রেজিস্টার খাতা, সাল তারিখ, সব জাহাজের নাম ঘেঁটে দেখলাম কোথাও এর কোন রেকর্ডই নেই।

—আছে কোথাও। সব দেখা তো আপনার পক্ষে সম্ভব নয়!

—তা ঠিক বলেছেন স্যার। তবে হামবুর্গ শহরের বাইরে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা। সে কেবল বলল, সিউল-ব্যাংক, জাহাজের নাম নয়। অন্য নাম ছিল জাহাজটার। ক্যাপ্টেন লুকেনারকে সে চিনত। কাউণ্ট পরিবারের ছেলে তিনি। বাবার নাম—কি যেন যাক গে ভুলে গেছি। তিনি শেষ পর্যন্ত আর ক্যাপ্টেন লুকেনার ছিলেন না। তাঁকে সী-ডেভিল বলা হত। সমুদ্রে একটা জাহাজ আর একটা মানুষ—অনেক কীর্তিকাহিনী আছে। সে একটা রোমহর্ষক ঘটনা স্যার। বলে ফ্যাক করে হাসতে গিয়ে কেমন চেপে গেল সব কথা।

স্যালি হিগিনস ছাড়বেন কেন! ক্যাপ্টেন লুকেনার সম্পর্কে লোকটা কিছু খবর রাখে তবে! তিনি বললেন, জাহাজের কি নাম ছিল আপনি জানেন? ক্যাপ্টেন লুকেনার যে জাহাজটা চালাতেন তার নাম আপনার মনে আছে?

ওসাকা উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। বসে থেকে সে স্যালি হিগিনসকে যেন ভালভাবে দেখতে পাচ্ছে না। ক্যাপ্টেন লুকেনার কিংবদন্তীর মানুষ, আর এ-যেন আরও বড়। তাঁকে ভাল করে দেখতে না পেলে যেন ঠিক জমছে না। ওসাকা দাঁড়িয়ে বেশ স্বাভাবিক বোধ করছিল। স্যালি হিগিনস তাকে কি বলেছেন ভুলে গেছে। উল্টে সে বলল, জার্মান ইমপিরিয়াল সার্ভিসে তিনি লেফটেনান্ট কম্যাণ্ডার ছিলেন।

—ওর জাহাজটার নাম জানেন? স্যালি হিগিনস বিরক্ত মুখে কথাটা বললেন।

—হ্যাঁ স্যার। সেলার। কেউ বলে, সিজলার। কেউ বলেছে সিজালার! সঠিক কি হবে জানি না! হ্যাঁ স্যার বাপের নাম মনে পড়েছে—বাপের নাম গ্র্যাফ ফেলিকস্ ফন্ লুকেনার

স্যালি হিগিনস এবার কাগজপত্র দেখছেন। ওর দিকে তাকাচ্ছেন না। সে কি পরীক্ষা দিচ্ছে। সে কেমন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বলল, ওটা বাপের নাম না ছেলের নাম মনে নেই স্যার।

স্যালি হিগিনস কাগজপত্র একটা পেপার-ওয়েটে চাপা দিলেন। তারপর কেমন হাই তুলে বললেন, লুকেনার সম্পর্কে এত আপনার কৌতূহল কেন?

ওসাকা বলল, স্যার জাহাজটা সম্পর্কে কত কি শুনেছি, সত্যি যদি অশুভ প্রভাব থাকে—যদিও এ-সবে আমার বিশ্বাস নেই তবু কি হয় জানেন স্যার, মন তো মানুষের দুর্বল, দুর্বল মহুর্তে সবই সত্যি মনে হয়। সেজন্য কিছু কিছু খোঁজখবর নেওয়ার ইচ্ছে হয়েছিল। সবই পেয়েছিলাম—ওদের পারিবারিক মর্যাদা—ওর ঠাকুরদার বাপের খবর। সে একটা ইতিহাস। ওর ঠাকুরদার বাপ শুনেছি স্যার ঘোড়ার ঘাস কাটত।

হ্যামিলটন জানে ওসাকা খুব মজার লোক। স্যালি হিগিনস হেসে ফেলেছিলেন, কিন্তু লোকটা যদি জোরে হাসলে ঘাবড়ে যায়, তিনি সামান্য হাসলেন, হ্যামিলটন জোরে হাসল।

ওসাকা বলল, বিশ্বাস করুন, ঘোড়ার ঘাস কাটতে কাটাতে লোকটা অশ্বারোহী সৈন্য হয়ে গেল। নিজে সৈন্যদল গড়ে তুলল। তখন তো স্যার রাজারা সব ভাড়াটে সৈন্যদল রাখতেন। তখন ওর ঠাকুরদার বাপের বয়স বেশি হয় নি। তের বছরে ঘর ছেড়েছিল, ঘোড়ার ঘাস কাটার কাজ নিয়েছিল, তখন তো স্যার প্রুসিয়ান ওআর চলছে। প্রুসিয়ান আর্মিতে সে তার সৈন্যদল নিয়ে ভিড়ে গেল। এবং ফ্রেডারিক দ্য গ্রেটের আণ্ডারে একজন তখন সে জাঁদরেল জেনারেল। এক নিঃশ্বাসে এতটা বলে সে ভোঁস করে শ্বাস নিল।

হিগিনস বললেন, আপনি দেখছি অনেক খবর রাখেন!

—রাখব না স্যার! ওর ঠাকুরদার বাপের তো শেষ পর্যন্ত গিলোটিন হয়েছিল! বলে চোখ গোল করে ফেলল ওসাকা।

—গিলোটিন! যেন কত স্বাভাবিক কথা। স্যালি হিগিনস বললেন, শেষ পর্যন্ত ক্যাপ্টেন লুকেনারের কি হয়েছিল বলতে পারেন?

—সে তো ঘুরে ঘুরে জেনেছি অনেক। কিন্তু একটার সঙ্গে আর একটার কোন মিল নেই স্যার।

স্যালি হিগিনস বললেন, মিল পাওয়া খুব কঠিন।

ওসাকা বলল, স্যার এক গ্লাস জল খাব।

স্যালি হিগিনস জল আনতে বলে কাগজের ওপর সামান্য ঝুঁকে পড়লেন। দু'বার তিনবার করে কাটা ক'টা লাইন বার বার পড়লেন। –এখানে তো দেখছি আপনাদের বিক্রি-বাট্টা দর দাম সব কথাবার্তা শেষ। জাহাজ বেচে দিয়েছে তবে!

—হ্যাঁ স্যার।

—তবে আর দেখবেনটা কি!

হ্যামিলটন আমতা আমতা করতে থাকল।

ওসাকা বলল, এতদূর থেকে উড়ে এলাম স্যার, একবার ঘুরে সবটা দেখে যাব না! দেখে না গেলে ঘুম হবে! আপনার হত স্যার বলুন! তাছাড়া অনেক সইসাবুদ আছে। দেখিয়ে দেব, বলে সে প্রায় ঝুঁকে টেবিলের ওপর লাফ দিয়ে উঠে আসতে চাইল।

—তাছাড়া কোথায় কি কি আছে!

—ঠিক আছে আপনি বসুন।

ওসাকা ভালো ছেলের মতো বসে পা নাড়াতে থাকল।

হিগিনস বললেন, গিলোটিন হয়েছিল? ওসাকা খুব বিনীত ছাত্রের মতো আবার দাঁড়িয়ে গেল। সে মুখস্থ বলে যাবার মতো বলল, স্যার ফ্রেডারিক দ্য গ্রেট মহা পাজি লোক ছিল। ওর ঠাকুরদার বাপ যুদ্ধ জয়ের পর পাওনা-গণ্ডা মিটিয়ে নিতে গেলে বললে, পাওনা-গণ্ডা কি, দেশের জন্য যুদ্ধ করেছ, কিচ্ছু হবে না। রাগে দুঃখে সব তকমা রাজার পায়ে রেখে সোজা প্যারিসে। তখন স্যার ফরাসী বিপ্লব চলছে। বিপ্লবে যোগ দিয়ে ফেলল। বেশ রাজার বিরুদ্ধে লড়ছে। ভালই লড়ছিল। কাল হল সেই এক পাওনা-গণ্ডা নিয়ে। সে প্যারিসে ফিরে তার দাবির কথা বলল। তার সৈন্যদলের মাইনে বাকি পড়েছে কতদিন—না দিলে চলছে না। ওরা বলল, তোমার বাপু গিলোটিন। একজন লোককে টাকা পয়সা না দিয়ে গিলোটিন করা কত সহজ বলুন। বলে আবার ফ্যাক করে হেসে দিল।

স্যালি হিগিনস শুধু বললেন, খুব সহজ। তারপর দ্বিতীয় আর কোনো কথা না। শুধু বললেন, কোথায় কোথায় সই করতে হবে বলে দিন। সব কাগজপত্র পড়ার আর তাঁর ধৈর্য নেই। এখনই হয়তো তিনি হাই করে ফের চিৎকার চেঁচামেচি শুরু করে দেবেন।

ওসাকা ঢক ঢক করে সব জলটা খেয়ে ফেলল তখন। বলল, স্যার এখানে। বলে সে ঘুরে স্যালি হিগিনসের প্রায় ঘাড়ের কাছে চলে এল। হাতের চেটোতে মুখ মুছে একটা একটা করে পাতা উল্টে যেতে থাকল, আর স্যালি হিগিনস সই করে যাচ্ছেন। হাত কাঁপছিল সই করতে, বোধ হয় ভীষণ দুর্বল শরীর। একবারে মাংকি-আয়ল্যাণ্ডে উঠে গোটা জাহাজটা দেখার ইচ্ছে হয়েছিল তাঁর। তারপর ভেবেছেন কি হবে দেখে! একটা জীবন এ-ভাবে বাজি রেখেছিলেন একটা জাহাজের পেছনে, এখন তাও শেষ হয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন, ওসাকা, পুরানো জাহাজ সম্পর্কে খোঁজখবর করার তোমার বোধ হয় একটা নেশা আছে?

—তা আছে স্যার। পৃথিবীর সব প্রাচীন জাহাজ কবে কোথায় কিভাবে বিক্রি হয়েছে বলে দিতে পারি।

—তা যখন পার সিউল-ব্যাংক কত পুরোনো নিশ্চয়ই বলতে পারবে।

–পারি না।

—কেন?

—খোঁজখবর কেউ শেষ পর্যন্ত সঠিক দিতে পারে নি।

—তার মানে?

—মানে স্যার এও হয় ওও হয়।

স্যালি হিগিনস বললেন, তুমি বেশ মানুষ হে ওসাকা।

ওসাকা বলল, এখানে একটা সই বাদ যাচ্ছে স্যার। এত সব কথার ভেতরও ওসাকার হিসেব ঠিক আছে। ভুলে কিছু বাদ যাচ্ছে না।

স্যালি হিগিনস বললেন, তাহলে সিজলারকে কিনে নিয়ে যাচ্ছ ভাবছ?

—আমার তো মনে হয় তাই। তবে কি জানেন স্যার! এখন আর পাতা ওলটাচ্ছে না সে।

পনের বিশ পাতার একটা ডীড। প্রতিটি পাতায় প্রতিটি অক্ষরের প্রতি ওসাকার নজর ঠিক আছে। চোখে মুখে যতটা বোকা বোকা, কাজে কর্মে, তার বিপরীত। বরং ওসাকা ভীষণ ধূর্ত স্বভাবের। সে বলল, সিজলারের সী-ডেভিলের কি হয়েছিল কেউ ঠিক বলতে পারেনি। কেউ বলেছে জাহাজটা ডুবে গেছে বাল্টিক সমুদ্রে। কেউ বলেছে, প্রথম মহাযুদ্ধে তিনি প্রাণ হারিয়েছেন। ইংরেজদের হাতে জাহাজটা চলে যায়। আবার কেউ বলে থাকেন স্যার, জাহাজটা ডুবেও যায় নি, কেউ ধরেও নিয়ে যায় নি। তিনি নিজে জলদস্যু হবার জন্য মিথ্যা প্রচার করে সরে পড়েছেন। এখনও নাকি লুকেনারকে দেখা যায় কোনো নির্জন দ্বীপে। তিনি পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে থাকেন। কেউ বলে থাকে তিনি কোনো কোনো বন্দরে পর্যন্ত মাঝে মাঝে ছদ্মবেশে চলে আসেন। তাঁকে একা একা হাঁটতে দেখা যায়। সমুদ্রের পাড়ে পাড়ে তিনি হেঁটে যাচ্ছেন। মনে হয় তিনি আমাদের ভেতরই আছেন স্যার। এরা কখনও মরে যায় না। আমাদের ভেতরেই বেঁচে থাকে।

স্যালি হিগিনস এবার উঠে পড়লেন। তিনি যে নিজে গিলোটিনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন কথাবার্তায় এতটুকু বোঝা যাচ্ছে না। সামান্য একটা ডীড সই করার মতো সব কাজ সেরে বললেন, তাহলে চলুন জাহাজটা আপনাদের দেখিয়ে দি। কোথায় কি আছে, রিপোর্টের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পাবেন। কিছু আবার এদিক ওদিক বিক্রি হয়ে গেলে আপনাদের সত্যি ক্ষতির কারণ ঘটবে।

—তা স্যার ঠিক।

স্যালি হিগিনস উঠে টুপি টেনে নিলেন। তারপর কিছু যেন ভাবছেন এমনভাবে চুপচাপ দাঁড়িয়ে মাথায় টুপি পরে নিলেন। পাছে ভেঙে পড়েন জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন গত রাতের মতো—ঠিক না। বনি কাছে কোথাও নেই। থাকলে হয়তো সত্যি ভেঙে পড়তেন। অন্যমনস্ক থাকার জন্য বললেন, ফানেল আমরা পাল্টে ছি বছর পনের আগে। ওসাকা ফানেলে দু'বার হাতুড়িতে ঘা মেরে দেখল। স্যালি হিগিনসের কথার সত্যাসত্য যাচাই করে সে খুশী হল। সিঁড়ি ধরে ক্রমে বয়লার-রুমে—এই তিনটে বয়লার। বাঁ দিকে স্টার-বোর্ডে ঢুকে গেল ওরা। পাশে দু'টো জেনারেটর, রেসিপ্রোকেটিং এনজিনের কলকব্জা, কনডেনসার, পাম্প, পাইপের নাম এবং প্রপেলার স্যাফট, সব কাগজের সঙ্গে মিলিয়ে নিল ওসাকা। তারপর প্রপেলার স্যাফটের মাথায় চড়ে বসেছে ওসাকা। সে হাতুড়িতে ঘা মারছে, আর চোখে মুখে এক অতীব বিস্ময়। যেন ভেতরে শুধু স্টিল পোরা নেই, অন্য কিছু ধাতু, সোনাদানা নেইতো! স্যালি হিগিনসের এমনই মনে হতে থাকল। একটা কসাইর মতো চোখ মুখ ওসাকার। লোভে লালসায় চোখ মুখ অধীর। ওসাকা বলল, স্যার শুনতে পাচ্ছেন?

স্যালি হিগিনস বললেন, কী?

—আসুন। কান পেতে শুনুন। বলে সে হাতুড়ি দিয়ে ঠুং ঠুং করে ক'বার ঘা মারল।

স্যালি হিগিনস কান পেতে তেমন কিছু শুনতে পেলেন না।

—শুনতে পাচ্ছেন না আওয়াজটা অনেক দূরে পর্যন্ত স্যাফটের গা বেয়ে চলে যাচ্ছে। যেন এখানে আঘাত করলে সারা জাহাজটা কাঁপছে। সারা জাহাজটা ঝনঝন করে বাজছে। মিরাকল্, সামথিং মিরাকল্ স্যার সে বলতে পারত। কিন্তু খুবই বোকামীর কাজ হয়ে যাবে, পরে যদি জাহাজডুবির খবর দিয়ে বিক্রি-বাট্টার ডীড অচল করে দেয়। সে যে খুশীর চোটে কি সব করতে যাচ্ছিল! সে ঝুলে স্যাফট থেকে নেমে পড়বে ভাবল। নামার সময় মনে হচ্ছে, এত নিচে সে লাফিয়ে নামতে পারবে না। ধপাস করে পড়ে যেতে পারে। সে হেঁটে হেঁটে কিছুটা দুরে গেলে স্যাফট জয়েণ্টে নামার ধাপ পাবে। ততটা হেঁটে গেলে নেমে যেতে পারবে। কিন্তু সে হাতুড়ি দুলিয়ে ডাকল, মি. হ্যামিলটন আসুন। ওর কাঁধে এক হাত রেখে প্রায় শরীর বেয়ে নিচে এল ওসাকা। বলল, কেনাবেচাতে সামান্য লাভ লোকসান থাকে স্যার। এ নিয়ে আর ভেবে লাভ নেই। চলুন ওপরে ওঠা যাক।

স্যালি হিগিনস দেখলেন টানেলের দরজায় চিফ-মেট, ডেভিড, ছোটবাবু সবাই অপেক্ষা করছে।

এ-শরীর নিয়ে কি যে এত নামার দরকার নিচে, ওরা ভেবে পেল না! আর এ-দু'টো লোক সেই থেকে এত কি কথা বলছে! এত কি দেখছে! লোকটার হাতে সেই হাতুড়ি। কানে গুঁজে রাখছে ফের। ওরা স্যালি হিগিনসকে খুঁজতে এসেছে এখানে। শরীর ভাল না। কি যে করছেন!

স্যালি হিগিনস ওপরে উঠে বললেন, মি. ফ্যালকে আমার অভিবাদন থাকল। বলবেন, আমরা ভাল আছি।

ওসাকা বোটে উঠে হওয়ায় হাতুড়িটা দুলিয়ে বলল, বলব আপনারা ভাল আছেন। তারপর ওসাকা দেখল, সিউল-ব্যাংক জলে ভেসে আছে। যত দূরে বোট চলে যেতে থাকল তত জাহাজটা ক্রমে ছোট হবার পরিবর্তে চোখের ওপর বড় হয়ে যেতে থাকল। ভয়ে ওসাকার শরীরে কেমন জ্বর এসে গেল। মাথা ঘুরছে।

॥ চুয়াল্লিশ ॥

—স্যার!

স্যালি হিগিনস পাশে চোখ ফেরালেন।

—ওপরে চলুন স্যার।

—ওপরে? আচ্ছা।

—স্যার!

—যাচ্ছি।

বনি একটা কথা বলছে না। চোখে মুখে তার ভারী দুর্ভাবনা। সে একটু দূরে দাঁড়িয়ে আছে। ছোটবাবু বনিকে নানাভাবে বোঝাচ্ছিল। সামান্য সাহসী হতে বলছে। বনি যেন ছোটবাবুর একটা কথাও বুঝতে পারছে না।

ডেবিড এবং চিফ-মেট বুঝতে পারছে না কি করবে। আবার বলল, স্যার আপনি সেই কখন থেকে এখানে দাঁড়িয়ে আছেন। ওরা তো চলে গেছে। আর দেখা যাচ্ছে না। ওপরে চলুন এবার। শরীর আপনার ভাল নেই।

স্যালি হিগিনস বললেন, চল।

ওরা পোর্ট-সাইড ধরে এবার হেঁটে যেতে থাকল। সোজা ছোটবাবুর কেবিনের ও-পাশে হেঁটে গেল।

তিনি ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভাঙতে থাকলেন। খুব সতেজ এবং কিছু হয় নি মতো উঠে যাচ্ছিলেন। কেউ আর একটা কথা বলতে সাহস পাচ্ছে না। লোক দু'টো কে, ওরা কেন এসেছিল—বেঁটে মতো লোকটা ভারী অদ্ভুত—অকারণ যেখানে সেখানে হাতুড়ি ঠুকছিল!

ডেবিড, চিফ-মেটের কানের কাছে মুখ এনে বলল, কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে স্যার।

—কি ঘটবে মনে হয়? চিফ-মেট সিঁড়ি ধরে ওঠার সময় এমন বলল।

ডেবিড ফিস্ ফিস্ গলায় কথা বলছিল।

—কিছু একটা ঘটবে। ঠিক ঘটবে। ওর মুখ দেখে আপনি বুঝতে পারছেন না স্যার!

—কি ঘটবে? কি ঘটতে পারে!

ওরা ততক্ষণে দু'জনই বোট-ডেকে উঠে এসেছে।

চিফ-মেট সামান্য কি ভেবে বলল, কিন্তু এটা ঠিক না। এমন শরীরে জাহাজের অতলে নেমে যাওয়া ঠিক না। এতটা ওঠা-নামা করা তাঁর উচিত হয় নি। কিছু একটা সত্যি ঘটে গেলেও ঘটে যেতে পারে।

স্যালি হিগিনস সিঁড়ি ধরে আরও ওপরে উঠে যাচ্ছেন তখন। মনে হচ্ছে না গতকাল তিনি অসুস্থ ছিলেন, সংজ্ঞা হারিয়েছিলেন। বেশ স্বাভাবিক গলায় না তাকিয়ে ডাকলেন—চিফ-মেট।

চিফ-মেট, ডেবিডকে বোট-ডেকে ফেলে ওপরে প্রায় দু-লাফে উঠে গেল।

বনি আর ছোটবাবু আরও পেছনে আসছে। বনি দেখল বাবা চিফ-মেটকে নিয়ে চার্ট-রুমে ঢুকে যাচ্ছেন।

ডেবিড জ্যাককে পেছনে আসতে দেখে বলল, তুমি জানো জ্যাক, এরা কারা?

—না ডেবিড। এরা কারা জানি না।

জাহাজে তেমনি ফসফেটের গুঁড়ো উড়ছে। টাগ-বোট সব আসছে যাচ্ছে। টাগ-বোট থেকে তেমনি বড় বড় ফসফেটের পিপে সব হাড়িয়া হাফিজ হচ্ছে। তেমনি কোলাহল

জাহাজে। উইনচের প্রচণ্ড শব্দ। তেল কালি বার্নিশের গন্ধ। আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ। ঠিক বাংলাদেশের গ্রীষ্মের রোদ আর বাতাসের মতো আবহাওয়া। দড়িদড়া, রঙের টব, জাহাজ সমুদ্র এবং দ্বীপমালার ভেতর তেমনি আছে তার ছোটবাবু। তবু সব কেমন তার বর্ণহীন। সে কিছুতেই কেন জানি ভাল করে সাড়া দিতে পারছে না। এই তো পাশে তার ছোটবাবু হাঁটছে—তবু কি যে এক ভয়!

ছোটবাবুর কাজ পড়ে আছে উইনচে। সে এক্ষুনি হয়তো নেমে যাবে। ডেবিডও থাকবে না। সে তখন এই বোট-ডেকে আরও একা হয়ে যাবে। বাবার কাছ থেকে সবটা না জানতে পারলে বনি নিশ্চিন্ত হতে পারছে না। চিফ-মেট এখনও কেবিন থেকে বের হচ্ছে না। বাবা আর চিফ-মেট এত কী যে পরামর্শ করছে! বের হলে সে ঠিক দেখতে পাবে। এবং যখন বের হয়ে এল চিফ-মেট এক দণ্ড বনি আর নিচে দাঁড়াল না। লাফিয়ে ওপরে উঠে গেল। ভেতরে ঢুকে ডাকল, বাবা!

স্যালি হিগিনস মাত্র টেবিলে মাথা রেখেছেন। বনি জাহাজে আছে তার যেন মনেই ছিল না। মাথার ভেতরে সোরগোল উঠে উঠে জট পাকিয়ে যাচ্ছে—ঘূর্ণির মতো অথবা রথের চাকার মতো বন্ বন্ কেবল ঘুরছে। তিনি তখন আর চারপাশে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। বনি এই যে তাঁকে এসে ডাকল কতদূর থেকে যেন সেই ডাক, বাবা তুমি এমন হয়ে যাচ্ছ কেন! যেন চিনতে সময় লেগে যাচ্ছে তাঁর—বনি তাঁর আত্মজা, রক্তে মাংসে বনি তাঁর। আত্মার চেয়ে প্রবল অস্তিত্বে বেঁচে আছে—কিছুই মনে করতে পারছিলেন না এতক্ষণ। বনিকে চিনতে কত যে সময় লেগে যাচ্ছে তাঁর।

বাবা কেবল তাকে দেখছেন। একটা কথা বলছেন না। সে ভয় পেয়ে ফের ডেকে উঠল, বাবা তোমার কি হয়েছে?

তিনি খুবই নিস্তেজ গলায় বললেন, কিছু হয় নি তো!

—লোক দু'টোর সঙ্গে তুমি এনজিন-রুমে নেমে গেলে কেন?

—ওরা জাহাজটা দেখতে এসেছিল।

—চিফ-মেটকে পাঠালে পারতে। ডেবিড ছিল, তুমি নেমে গেলে কেন?

—তাতে কি হয়েছে! সেই সরল বালকের মতো, অথবা বনির এমন যে সুন্দর লাবণ্যময় শরীর, যেন প্রায় তাঁর মতো, অথবা বোধহয় কৈশোরে তিনি এমনই ছিলেন দেখতে—এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন প্রবল বেঁচে থাকার ইচ্ছে সারা শরীরে—তিনি সাহসী বালকের মতো উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, তোমার সঙ্গে আমি আজ খাব বনি। তারপর ঠিক আগের মতো দরজার বাইরে গলা বাড়িয়ে হাঁকলেন কোয়া...র্টা...র মা-স্টা...র।

কোয়ার্টার-মাস্টার এলে বললেন, কাপ্তান-বয়।

কাপ্তান-বয় এলে বললেন, জ্যাকের কেবিনে আমি খাব। ডাইনিং-হলে জানিয়ে দেবে। তারপর রনির বড় বড় চুল এলোমেলো করে দিয়ে বললেন, তাহলে আমরা একসঙ্গে খাচ্ছি।

বাবাকে সহসা এত খুশী দেখে সে কেমন অবাক হয়ে গেল। ঠিক সেই চিরদিনের এক স্নেহময় পিতার মুখ, সে কি আর বলবে, সে যে ভেবেছিল অনেক কিছু বলবে, বাবা, তুমি এত ভাবো কেন? তোমার তো বাবা বেঁচে থাকার মতো সব আছে। একটা ভাঙা জাহাজ নিয়ে তোমার এত কি দায়! তুমি কেন বলতে পার না, জাহাজ আর চলবে না। তোমার এমন কি দাসখত দেয়া আছে ভাঙা জাহাজ চালিয়ে নিতেই হবে! কিন্তু বাবার হাসিখুশী মুখে কখনও এত বেশি ছেলেমানুষী থাকে যে সে আর রাগ করতে পারে না।

সে আর কিছু বলতে পারল না। নিচে নেমে গেল। বাবা নিমেষে তার সব দুর্ভাবনা ঝড়ো বাতাসের মতো উড়িয়ে নিয়ে গেলেন। সে সহজেই নিচে নেমে বাথরুমে ঢুকে গেল। এবং বাথরুমের সাদা টবে সব দামী সুগন্ধ ছড়িয়ে জলের ভেতরে একটা সোনালী মাছ হয়ে ভেসে

থাকল চুপচাপ। ছোটবাবুর কথা ভেবে বার বার জলের ভেতরে ডুবে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে।

খাবার টেবিলে বনি বলল, বাবা ওরা জাহাজটার কি দেখতে এসেছিল?

—ওরা জাহাজটার সব ইস্পাত দেখতে এসেছিল।

—ইস্পাত!

—জাহাজটা ওরা কিনতে চায়!

—এই পুরেনো ভাঙা অচল জাহাজ ওরা কিনে কি করবে।

—এখনও এর যা আছে বনি...যেন জাহাজটা ভাঙা পুরোনো বললেই তিনি ক্ষেপে যান ভেতরে ভেতরে! তিনি কফি খাচ্ছিলেন, আর চুরি করে বনির মুখ দেখছিলেন। বনি জাহাজটাকে পুরোনো ভাঙা বলছে, বনির এমন কথাবার্তা তাঁর একেবারে পছন্দ না। বনির কাছে তিনি কিছুতেই মুখ ভার করতে পারেন না। এই যে তিনি বনির সঙ্গে খেলেন, বনিকে নানাভাবে উৎসাহ দিচ্ছেন—যেন বনি কিছুতেই তাঁর দুর্ভাবনার কথা টের না পেয়ে যায়, পেয়ে গেলে তিনি জানেন মেয়েটা সারাক্ষণ জাহাজে মুখ গোমড়া করে রাখবে। তিনি সারাক্ষণ ভাবতে চেষ্টা করছেন, গতকাল এমন কিছু তাঁর হয় নি। এবং দুর্ভাবনা এত বেশি প্রবল যে বার বার মুখের ওপর একটা ঘন কালো ছায়ায় ঢেকে গেলে তিনি প্রায় জোরে হেসে দেবার চেষ্টা করছেন, আর তখন কিনা বনি বলছে, ভাঙা পুরোনো জাহাজ—যেন তিনি এখন জোরে চিৎকার করে উঠতে পারতেন, বনি পৃথিবীতে সবাই জাহাজটাকে নিয়ে উপহাস করেছে, আমি সহ্য করে গেছি। কিন্তু তুমি কর না। তুমি জাহাজটাকে ভাঙা অচল বললে আমি আমার সব সাহস হারিয়ে ফেলব।

বনি দেখল, বাবা মুখ মুছে ধীরে ধীরে বের হয়ে যাচ্ছেন। জাহাজটা অচল বললে বাবা ভীষণ ক্ষেপে যান। সে কেন যে এমন বলতে গেল! দরজার বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখল, ওপরে তিনি চুপচাপ ব্রীজে দাঁড়িয়ে আছেন। কাঁচের ভেতর অস্পষ্ট ছায়া দেখা যাচ্ছে। বনির মনটা আবার ভার হয়ে গেল।

তখন স্যালি হিগিনস যেন এই সামনে যা কিছু আছে কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। কেবল দেখতে পাচ্ছেন একটা জাহাজ। সেই কবে থেকে তিনি তার যাত্রী, জাহাজটা তাঁকে নিয়ে নিরবধিকাল সমুদ্রে ভেসে চলেছে। আর তখনই তাঁর সদর্পে বলতে ইচ্ছে হয়, আসলে বনি, জাহাজটা লুকেনারের হাড় দিয়ে তৈরি। সমুদ্রে সে কখনো ডুবে যেতে পারে না। তারপর তাঁর কি যে হয়ে যায়, দু-হাত ওপরে তুলে আকাশ ছুঁয়ে দেবার মতো ইচ্ছে। বলার ইচ্ছে চিৎকার করে—সি...জা...রা। জাহাজের আসল নাম সি...জা...রা। প্রায় আর্কেমেডিসের সূত্র আবিষ্কারের মতো তিনি যেন কতদিন পর, প্রায় দীর্ঘকাল বলা চলে এবং এই শেষ সফরে জেনে ফেলেছেন—অতি প্রাচীন জাহাজ এই সিউল-ব্যাংক। তার বয়স-কাল নির্ণয় করা অর্থহীন। এবং এখন আর যা তাঁর মনে হয়, জাহাজের ভেতরেই আছে সেই এক ঐশী শক্তি। বনি তুমি সব অবহেলা করতে পার, কিন্তু তাঁকে তুমি পার না। দোহাই বনি, এসব বলে তুমি তার কোপে পড়ে যেও না।

আর সঙ্গে সঙ্গে সেই কঠিন দুর্ভাবনা। জাহাজের গিলোটিন হয়ে গেল। কিংবদন্তীর মতো যে ছিল তাঁর কাছে অজয় অমর, কলমের এক খোঁচায় সে শেষ হয়ে গেল। এখন তাঁর ইচ্ছে করছে যদি পারতেন জাহাজ নিয়ে সমুদ্রে পালিয়ে বেড়াতেন। গিলোটিনের হাত থেকে বাঁচবার তাঁর কাছে আর কোনো পথ নেই। তারপর বুঝতে পারেন সব অর্থহীন—মি. ফ্যালের ব্যক্তিগত চিঠি এবং কিছু তার বাক্যাংশ মাথা কুরে কুরে খাচ্ছে। দুর্বলতা ভেবে যত চেয়েছেন সবকিছু ভুলে থাকবেন, তত সেই বাক্যাংশ কঠিন সংশয়ের ভেতর নিক্ষেপ করছে। তিনি কিছুতেই এই অতিশয় অভিনয়ের ভেতর আর নিজেকে গোপন রাখতে পারছেন না। মূর্ছা যাবার ভয়ে কেবিনে ঢুকে টেবিলে মাথা রেখে ফের বসে পড়লেন। বিকেলে সবাই দেখল, ব্রীজের ডেক-চেয়ারে স্যালি হিগিনস মাথা এলিয়ে দিয়েছেন। বাইবেল ওল্টাচ্ছেন। পাতার

পর পাতায় কি যেন কেবল খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তিনি পড়লেন, হ্যাভ কনফিডেন্স ইন দ্য লর্ড, ইন অল দাই ওয়েজ থিংক অন হিম, অ্যাণ্ড হি উইল ডাইরেকট দাই স্টেপস। ঈশ্বর আর কোথায় কি বাইবেলের পাতায় নির্দেশ রেখেছেন বসে বসে দেখছেন। পাগলের মতো পাতার পর পাতা উল্টে যাচ্ছেন। এবং এখন দেখে মনে হয় একজন আত্মমগ্ন মানুষ তিনি। ভীষণ ঝুঁকে পড়েছেন বাইবেলের ওপর। এত যে জাহাজের চারপাশে ব্যস্ততা, ঘড় ঘড় শব্দ এবং অতিকায় শব্দের ভেতর সব কর্মপ্রণালী ঈশ্বরের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তিনি যেন তা একেবারে শুনতে পাচ্ছেন না। বাইবেলের পাতায় শব্দের ভেতর বার বার তিনি ভিকটিম শব্দটি আবিষ্কার করে অতিশয় মর্মান্তিক চোখ মুখ করে রেখেছেন। এবং এ-ভাবে বার বার শেষবার, শেষবারে তিনি নিজে তার শিকার। মি. ফ্যালের ধুর্ততা চোখের ওপর চশমার কাঁচে জ্বল জ্বল করছে।

—আপনি আমাদের আজীবন সহযোগী। মি. হিগিনস, আপনার ওপর আমরা নানা কারণে নির্ভরশীল। বোর্ড আপনাকে পরিচালকবর্গের অন্যতম করে নিয়েছেন। এতে আমরা সম্মানিত বোধ করছি। আপনার অধিকারের ভেতরেই আছে সে। অধিকার শব্দটির দ্বারা কিছু অর্জন করা বোঝায়। অর্জন করেছেন তিনি, জাহাজের বিশ্বাস অর্জন করেছেন। আর বিশ্বাস শব্দটির সঙ্গে গিলোটিন শব্দটি বার বার চোখের ওপর আগুনের রিং হয়ে যেতে থাকল। তিনি চোখ মুছে ফের চশমা পরে নিলেন। চোখের ওপর তিনি কি যে সব ভেসে উঠতে দেখলেন! এবং মনের এ দুর্বলতা তিনি কিছুতেই পরিহার করতে পারছেন না কেন? আর তখনই বাইবেলের ভেতর সেই সব শব্দ, যেন কোনো দেবদূত পাথরের গায়ে বড় বড় শাবলে রোপণ করে যাচ্ছেন—নাথিং ক্যান বি কমপেয়ার্ড টু এ ফেথ ফুল ফ্রেণ্ড, অ্যাণ্ড নো ওয়েট অফ গোল্ড অ্যাণ্ড সিলভার ইজ এবল টু কাউন্টারভেল দ্য গুডনেস অফ হিজ ফাইডেলিটি। তিনি ভীষণ ঘামছেন। খালি গা তাঁর। সাদা রংয়ের হাফ-প্যান্ট। মুখ চোখ ক্রমশ আবার লাল হয়ে যাচ্ছে—সেই সব শব্দ পাহাড়ের গায়ে এত বেশী বড় হয়ে যাচ্ছে। এত বেশী কাঁপছে এবং ক্রমে এগিয়ে আসছে যে তিনি আর বসে থাকতে পারছেন না। যেন বার বার সেই সব শব্দ বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করছে তাঁকে। সহসা আবার পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা লেখা সব মুছে গেল! যেন সেখানে ডেভিল তার শাবলে বড় বড় অক্ষরে ফের রোপণ করে যাচ্ছে নতুন সব শব্দ—বাই দ্য এনভি অফ দ্য ডেভিল, ডেথ কেম ইনটু দ্য ওয়ালর্ড। ডেথ, একাকী গোপনে দু-বার উচ্চারণ করার সময় তিনি কেঁদে ফেললেন। দোহাই আপনার, তিনি যেন বাতাসে তাঁকে ছুঁতে চাইলেন। বনিকে ছাড়া আমি আর কিছু ভাবতে পারি না। দোহাই আপনি তাকে রক্ষা করুন।

তারপর আর যা মনে হয়, তিনি পাগল হয়ে যাচ্ছেন না তো! নিজেকে অকারণ কেন বারবার বিশ্বাসভঙ্গের দায়ে অভিযুক্ত করছেন! সাধারণ একটা জাহাজকে কেন বার বার ভাবছেন তার প্রতিটি রি রক্ত-মাংসের। কেন ভাবছেন এক্ষুনি জাহাজের হাড়-পাঁজরে বিদ্যুৎ খেলে যাবে! আর তিনি এ- সব কি দেখছেন চোখের ওপর।

—সত্যি সারা ডেকে বিদ্যুৎপ্রবাহ, সেই কোনো মরুভূমির মরীচিকার মতো তিনি দেখতে পাচ্ছেন বনি আতঙ্কে চিৎকার করছে, লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে। তিনি ব্রীজে যেন ঝুঁকে পড়েছেন। চিৎকার করে ডাকছেন, বনি ওদিকে না। এদিকে চলে এস। হায়! বনি কিছুতেই এদিকে চলে আসতে পারছে না। অক্টোপাসের মতো বিদ্যুৎপ্রবাহের বেড়াজালে আটকা পড়েছে। মেয়েটা সোনালী লতায় ক্রমশ ঢেকে যাচ্ছিল। আর সঙ্গে সঙ্গে তিনি ফের বোধহয় না পেরে হাতের বাইবেল ছুঁড়ে দিতেন; ছুঁড়ে দিলেই সব বিদ্যুৎপ্রবাহ ঈশ্বরের অমোঘ বাণীতে ছাই হয়ে যাবে, তখনই মনে হল অনেক দূরে সমুদ্রে অথবা বাতাসের গায়ে কেউ রোপণ করে যাচ্ছে আশ্চর্য সব অভয় বাণী—কল্ আপন্ মি ইন দ্য ডে অফ ট্রাবল, আই উইল ডেলিভার দী, অ্যাণ্ড দাউ শ্যালট গ্লোরিফাই মি।

তারপর সব আবার ঠিকঠাক। জাহাজটা যেন একেবারে আর দশটা জাহাজের মতো। এতক্ষণ তিনি কেবল জাহাজটা দেখতে পাচ্ছিলেন, আর কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না। বনি

ডেকে লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়াচ্ছে, আর কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না। তিনি নিজে ব্রীজে দাঁড়িয়ে আছেন—আর কিছু দেখতে পাচ্ছিলেন না। এখন তিনি আবার সব দেখতে পাচ্ছেন। চারপাশে টাগ-বোটে মাল খালাস করে চলে যাচ্ছে। একজন খালাসি রং করে ফিরছে। ফলগুঞা খুলে পাশে রেখে গোপনে সিগারেট খাচ্ছে। বড় বড় কাঠে নাবিকেরা ফল্কা ঢেকে দিচ্ছে। ডেরিকের দড়িদড়া তুলে নিয়ে যাচ্ছে ডেক-কশপ। ছোটবাবু উইনচের নিচ থেকে মাথা বের করে রেখেছে। এবারে সে হামাগুড়ি দিয়ে উঠে আসবে। বনি বোট- ডেকে দাঁড়িয়ে ডেবিডের সঙ্গে গল্প করছে।

আবার এ-ভাবে পৃথিবীতে আর একটা দিন শেষ হয়ে যাচ্ছে। সূর্য অস্ত যাচ্ছে পাহাড়ের মাথায়। সমুদ্রে সব পাখিদের ছায়া। ওরা দ্বীপে ফিরে আসছে। লেডি-অ্যালবাট্রস কোথাও হয়তো আছে, অথবা সমুদ্রের গভীরে নীল জলে এখন মাছ ধরে খাচ্ছে। সে বোধহয় তার পুরুষ-পাখিটার কথা একেবারে ভুলে গেছে। পৃথিবীতে বেঁচে থাকার সময় কত স্মৃতি, কত ছবি। এবং এইসব ছবির শব্দমালা আর শোনা যায় না, পৃথিবীর অন্ধকারে অথবা সৌরজগতের সেই প্রবহমান ধারায় মিশে গেলে কত ক্ষুদ্র, কত সামান্য এ-সব মনে হয়। স্যালি হিগিনস এ-সব ভেবে বোধহয় মনের দুর্বলতা পরিহার করতে চাইছেন। শক্ত হতে না পারলে তিনি ডুবে যাবেন। পাগল হয়ে যাবেন।

কোয়ার্টার-মাস্টার জাহাজের সব আলো জ্বেলে দিচ্ছে তখন। ফোর-মাস্টের আলো জ্বেলে, দু- পাশের সব আলো জ্বালতে জ্বালতে সে ছুটছে। মেন-মাস্টে তাকে আলো জ্বালতে হবে। জাহাজের যেখানে যা কিছু অন্ধকার সে দু-হাতে এখন সরিয়ে দিচ্ছে। সব আলো জ্বেলে, সব পতাকা ঘরে নিয়ে যাবে সে। তারপর হয়তো মাদুর বিছিয়ে খোলা ডেকে উদার আকাশের নিচে সারাদিন কেটে গেলে পৃথিবীর সেই মহিমময়ের কাছে সামান্য নতজানু হওয়া। বাই দ্য এনভি অফ দ্য ডেভিল, ডেথ কেম ইনটু দ্য ওয়ালর্ড। মানুষের নতজানু না হয়ে উপায় নেই। পাপ এবং বিশ্বাসভঙ্গের জন্য মানুষের নতজানু না হয়ে উপায় নেই। এবং এ-সব মনে হলেই তিনি কেমন ভেতরে দুর্বল হয়ে পড়েন। তাঁর সব সাহস নিমেষে উবে যায়। তিনি তখন কি যে করবেন ঠিক করতে পারেন না। কখনও তিনি পাতার পর পাতা না দেখে বাইবেলের সব স্তবক আবৃত্তি কার যান। অথবা কখনও তিনি কোনো স্পিরিচুয়াল সঙ গলা ছেড়ে গাইতে চান—পারেন না। হাত তুলে দু-হাতে করুণা ভিক্ষার মত গলা ছেড়ে তাঁর ভীষণ ভাল লাগে ভাবতে তিনি গাইছেন—আই অ্যাম অন্ মাই ওয়ে। অথবা কখনও আই অ্যাম অন মাই ওয়ে টু ক্যানানা-ল্যাণ্ড। তারপরই মনে হয় নাভির ভেতর থেকে গলার স্বরে ভেসে আসবে সেই ঈশ্বরের জন্য প্রতীক্ষা—গ্লোরি হ্যালেলুজা, আই অ্যাম অন্ মাই ওয়ে। আমি আপনার কাছেই যাচ্ছি। কোনো উপত্যকার পথে, অথবা কোনো দ্বীপমালার ভেতর দিয়ে যেতে যেতে, অথবা সব সবুজ গাছের ছায়ায়, দূরবর্তী নক্ষত্রের মতো ঘুরে ঘুরে দু-হাতে করুণা ভিক্ষার মতো তিনি যেন গেয়ে যাচ্ছেন, গ্লোরি হ্যালেলুজা, আই অ্যাম অন্ মাই ওয়ে।

—স্যার!

স্যালি হিগিনস মুখ তুলে তাকালেন।

—ডাক্তার নিচে দাঁড়িয়ে আছে।

–ডাক্তার আবার কেন! আমি তো ভালো আছি। বেশ ভালো। এখানে তাকে নিয়ে এস।

—ভিতরে গেলে ভাল হত না স্যার!

—তোমরা ভারী জ্বালাতন কর চিফ। আমাকে নিয়ে হঠাৎ তোমাদের কেন যে এত দুর্ভাবনা বুঝি না। বলে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। সমুদ্র থেকে জোর হাওয়া উঠে আসছে। তিনি ইচ্ছে করলে তাঁর পোশাক পুরোপুরি পরে নিতে পারেন। আর স্বভাবে তিনি প্রায় এ-রকমের। ধড়াচূড়া পরে তিনি একেবারে এখন ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস। ভেতরে ডাক্তার এলে হাত বাড়িয়ে হ্যাণ্ড-শেক করলেন। বললেন, তোমার কি মনে হয় ডাক্তার, এ-বয়সে তুমি আর

আমার কিছু ভাল করতে পার?

—না স্যার।

—তবে এসেছ কেন!

ডাক্তার এর ওর মুখের দিকে তাকাতে থাকল। তখন বনি বলল, তুমি শুয়ে পড়তো বাবা। আর একটা কথা বলতে পারলেন না। একেবারে ভীতু বালকের মতো শুয়ে পড়লেন। বনি যতক্ষণ পায়ের কাছে আছে আর বোধহয় তিনি একটা কথাও বলতে পারবেন না। সামান্য দুষ্টুমি করার ইচ্ছে ছিল ডাক্তারের সঙ্গে। বনির জন্য তাও হল না। চুরি করে মাঝে মাঝে মেয়ের মুখ দেখছেন। বনি ডাক্তারের মুখ দেখছে। ডেবিড ডাক্তারকে নানাভাবে সাহায্য করছে। কতটা রক্তচাপ শরীরের দেখছে এবং কানে নল লাগিয়ে বুক দেখছে। বনি প্রায় নিঃশ্বাস বন্ধ করে পাশে দাঁড়িয়ে আছে। ডাক্তার কি বলবে শোনার জন্য চোখের পলক পড়ছে না।

ডাক্তার সব ব্যাগের ভেতরে ভরে নেবার আগে, জিভ দেখল, চোখ দেখল, পেট টিপে দেখল। দু'টো-একটা প্রশ্ন। বনি অথবা চিফ-মেট কখনও ডেবিড জবাব দিচ্ছে। এবং সকালে জাহাজের এনজিন- রুমে নেমে গেছিলেন এ-সবও যখন বলা বাদ গেল না আর যখন ডাক্তার বলল, ভাল আছেন, কোনো ভয় নেই, তখন স্যালি হিগিনস হা হা করে হেসে দিলেন।

—তবে! বলেই স্যালি হিগিনস একেবারে সোজা উঠে বসেছিলেন।

—তবে আপনি এ-বয়সে যত বিশ্রাম নেবেন তত ভাল।

স্যালি হিগিনস সহসা গলা ছেড়ে গান গেয়ে উঠেছিলেন বুঝি—হাত তুলে বলার ইচ্ছে—আই অ্যাম অন্ মাই ওয়ে, আই অ্যাম এ ফলিং অ্যাণ্ড এ রাইজিং, বাট আই অ্যাম অন্ মাই ওয়ে।

স্যালি হিগিনস সহসা বললেন, ডাক্তার তুমি গান জানো?

ডাক্তার মানুষটি সামান্য না হেসে পারল না। কাপ্তান সত্যি মজার মানুষ। অথচ সে দেখছে, অফিসাররা কেমন ভীতু মুখ করে সবাই দাঁড়িয়ে আছে পাশে। যমদূতের মতো ভয় স্যালি হিগিনসকে। সে এবারে বলল, জানি স্যার।

—তোমরা?

চিফ-মেট অবাক। স্যালি হিগিনস রাশভারী কর্তব্যপরায়ণ এবং স্থির ধীর কাপ্তান। কিংবদন্তীর মতো তাঁর জীবন। এবং যেহেতু দীর্ঘদিন একটা অচল জাহাজ চালিয়ে তিনি প্রমাণ করেছেন, তিনি আর দশজন কাপ্তানের মতো একেবারে শুধু কলকব্জার ওপর নির্ভরশীল নন, এবং জাহাজ চালাতে গেলে একটা স্থির বিশ্বাস থাকা বাঞ্ছনীয়, মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করা যত মঙ্গলজনক এবং তিনি যখন এ-ভাবে একজন সফল কাপ্তান তখন গলা ছেড়ে গান গাওয়া খুব একটা অমর্যাদার ব্যাপার নয়—কিন্তু কি বলবে সে! কাপ্তান ওর দিকে এখনও তাকিয়ে আছেন। সে বলল, গলা মেলাতে পারব।

—তা হলেই চলবে। তুমি ডেবিড?

ডেবিড মাথা ঝাঁকাল।

—ছোটবাবু কোথায়? ছোটবাবুকে ডাকো। আমরা সবাই এখন গলা ছেড়ে গাইব, গ্লোরি হ্যালেলুজা, আই অ্যাম অন্ মাই ওয়ে। আই হ্যাভ হ্যাড টাইম বাট্ আই অ্যাম অন্ মাই ওয়ে। হ্যাড এ মাইটি হার্ড টাইম, গ্লোরি হ্যালেলুজা, আই অ্যাম অন্ মাই ওয়ে। ডাক্তার এবং সবাই মিলে পায়ে তাল দিয়ে গাইছে। যেন জাহাজে এখন পিয়ানো থাকলে, বনি পিয়ানো বাজাতে পারত। অথচ ছোটবাবু বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। সে কোনোদিন কোনো গানের সঙ্গে ঠিকমতো গলা মেলাতে পারে না। আর এ তো বিদেশী গান, এবং গলা চিরে যাচ্ছে—এ-ভাবে অসুস্থ কাপ্তানের কি যে মরজি, হয়তো ভেতরে একটা গণ্ডগোল ঘটে গেছে সবার, সবাই এখন

এইসব স্পিরিচুয়ালের ভেতর সামান্য অবলম্বন খুঁজছে। মানুষ এ-ভাবে দীর্ঘদিন সমুদ্রে ভেসে বেড়ালে মাথা ঠিক রাখতে পারে না।

স্যালি হিগিনস খুশীর চোটে ডাক্তারকে পরদিন লাঞ্চে নেমন্তন্ন করে ফেললেন, তুমি বেশ গাও হে ছোকরা। তোমার গলা ভারী দরাজ। আমিও এক সময় খুব গলা ছেড়ে গাইতে পারতাম। এখন পারি না।

বনির ভয় লাগছিল, বাবা হয়তো এবার বলবেন, আর একটা। সে তাড়াতাড়ি বাবাকে বলল, বাবা, তুমি আমার রেকর্ডগুলো শুনবে?

স্যালি হিগিনসের যেন সহসা বাঁধ ভেঙে গেছে। তিনি বনির কথা একেবারে শুনতে পেলেন না। বুড়োমানুষটা বাঁধানো দাঁতের জন্য ভাল গাইতেও পারেন না—অথচ ডাক্তারের গলায় এবং সকলের গলায় গানটা আশ্চর্য এক স্বর, কখনও উঁচু লয়ে, কখনও নিচু লয়ে, কখনও ফিস্ ফিস্ গলায় আবার কখনও লম্বা যেন সরল রেখার মতো। ক্রমে জাহাজের বাঁশি বেজে উঠেছে। তিনি ফের বললেন, ধরো, হাত তুলে এই ছোট্ট কেবিনের ভেতর, ঠিক ছোট কেবিনে কুলোচ্ছে না বলে তিনি প্রায় হাত তুলে গাইতে গাইতে ব্রীজে উঠে যাচ্ছেন—হোললার, হে ওম্যান হে গার্ল ডোনচ্ ইউ হিয়ার মি, কলিং ইউ, মাই ওম্যান সো সুইট সো সুইট!

বনি ডাকল, বাবা। তুমি এত জোরে গাইবে না!

স্যালি হিগিনস হাত সরিয়ে দিয়ে একেবারে স্থির হয়ে গেছেন

সবাই এ-ভাবে স্থির। আর মনে হচ্ছিল বাবা সারাদিন এ-ভাবে কি যে সব করে যাচ্ছেন! কোনো মাথামুণ্ডু নেই। সে ডাকল, বাবা! বাবা! বাবাকে ধরে ফেল্ল।—তুমি থামো বাবা। তারপর কেমন চিৎকার করে বলল, আপনারা থামুন। বাবা বাবা!

স্যালি হিগিনস তারপর ধপাস করে বসে পড়লেন। খুব জোরে জোরে শ্বাস নিচ্ছেন। তারপর ঢোক গিলে বললেন, বুঝলে এখন আর সত্যি পারি না। আমার খুব প্রিয় গান এটা। পারি না আর পারি না।

বনি এবার বাবার পাশে বসে বলল, বাবা আবার যদি তুমি গাও, আমি কিন্তু ভীষণ কাণ্ড করব!

স্যালি হিগিনসের মনে হল, মেয়েটা তাহলে এখনও তাঁর বেঁচে আছে। তিনি বললেন, আর গাইব না। আমার আর কি গাইবার আছে!

আর তখন আর্চি জাহাজের অন্ধকারে পায়চারি করছিল। কতদিন সে ডাঙায় নামতে পারে নি। ডাঙায় নামতে পারলে তার ভেতরের অসুখটা নিরাময় হত। সাময়িক নিরাময় তাকে হয়তো ক্রমে এ-ভাবে এক কঠিন নিয়তির দিকে এত সহজে ঠেলে দিত না। সে ডাঙায় নামতে পারলে কোনও সুন্দরী রমণী, অথবা কি যে হচ্ছে ডাঙ্গাথেকে সে প্রায় আছে নির্বাসনের মতো এবং যে কোনো বন্দরে নেমে গেলেই যুবতীরা যেন তার কাছ থেকে আত্মরক্ষার্থে পালাতে চায়। কোথাও সে দেখেছে, শিশুরা তাকে নিয়ে তামাশা করতে ভালবাসছে। ভয়ে সে আর জাহাজ থেকে নামতে পারছে না। আয়নায় যত নিজের মুখ দেখছে তত ক্রমে সে ভয় পেয়ে যাচ্ছে নিজেকে। এবং অন্ধকারে সে এখন বেশি থাকতে ভালবাসছে। ডাইনিং হলে সে যাচ্ছে না। মেস-রুম-বয় তার খাবার কেবিনে দিয়ে আসছে। এ-ভাবে সে ঠিক বড়-মিস্ত্রির মতো ক্রমে অন্ধকারের জীব হয়ে যাচ্ছিল। আর তখন জাহাজে বালিকা যুবতী হচ্ছে। জাহাজে বালিকা....বালিকা, প্রায় রেকর্ডের বাজনার মতো বালিকা যুবতী হচ্ছে।

এবং এ-ভাবে আর্চি দেখছে, বরং সে এখন আলো দেখলে ভয় পেয়ে যায়। কেউ তার মুখ দেখুক তা সে চায় না। যতটা পারে সে মুখ লুকিয়ে রাখে। জ্যাককে দেখলে সে আর আগের মতো দৌড়ে যেতে পারে না। কারণ জ্যাক এমন কদর্য মুখ দেখলে ভীষণ ভয় পেয়ে যায়।

ক্যাপ্টেনের ঘরে গতরাতে সে কিছুক্ষণ বসেছিল, উঠতে ইচ্ছে করছিল না, জ্যাক ওর দিকে একবারও ভয়ে তাকাচ্ছিল না। সে লোভের ভেতরে পড়ে যাচ্ছিল, রক্তপ্রবাহ সারা মুখে এবং সে ভেতরে ভেতরে নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছিল। সে কেবিনে ফিরে দু-হাতে কদর্য ডোরা কাটা কাটা দাগ মুছে দিতে চেয়েছে, যতবার মুছে দিতে চেয়েছে, ততবার দেখেছে দাগ-গুলো আরও প্রকট, আর গভীর—কি যে কালো আর কুৎসিত হয়ে যাচ্ছে এবং আশেপাশে সাপের মতো নীলাভ সাদা রং স্বাভাবিক চামড়ায়—সে যেন উইচ, আফ্রিকার ঘন অরণ্যের ভেতর কোনো অরণ্য সর্দারের যুবতী কন্যার চামড়া তুলে নিচ্ছে। সে একটা উইচ, সে একটা উইচ।

আসলে এ-জাহাজে যত রাত বাড়ছিল তত সে ঘুমোতে পারছিল না। মাঝে মাঝে সে ক্ষেপে যায়—শরীরে আশ্চর্য লোভ লালসা, কোনো বালিকা যুবতী হবার মুখে শুয়ে আছে, তার চুলে সমুদ্রের গন্ধ, শরীরে কি যে নরম আস্বাদন, মাংস খুবলে নিতে ইচ্ছে করছে বার বার, জংঘায় তার রয়েছে চমৎকারিত্ব—যেন হাতের পেশী সেই চমৎকারিত্ব সব লুণ্ঠন করে নেবে। সে এ-ভাবে ক্রমে যখন অমানুষ হয়ে যায় আর পারে না, চুপি চুপি একটা শ্বাপদের মতো উঠে যায়। গভীর রাতে সে দেখেছে কখনও কেউ না কেউ বালিকার মাথার ওপরে সতর্ক পাহারায় থাকে—কখনও লুকেনারের প্রেতাত্মা, কখনও লেডি-অ্যালবাট্রস, কখনও সমুদ্রের অগ্নিকাণ্ড, কখনও বজ্রপাতের মতো কিছু আধিভৌতিক শব্দ আকাশের অভ্যন্তরে বাজতে থাকে। বার বার সে ভয়ে লেজ গুটিয়ে পালিয়ে আসছে। এবং যা হয়ে থাকে, আবার দু'রাত পার হয় না, কেবল জ্যাকের কেবিনের চারপাশে খাঁচায় পোরা বাঘের মতো এ-পাশ ও-পাশ শুঁকে শুঁকে যাওয়া, জ্যাক যেখানে বসেছিল, যেখানে দাঁড়িয়ে গল্প করেছিল সেখানে শুঁকে শুঁকে সে কুকুরের মতো ঘ্রাণ নিতে নিতে অমানুষ হয়ে যায়। তখন ঘুম আসে না, মদ খেতে ভাল লাগে না, ভাঙা আয়না আরও ভেঙে দুমড়ে সে একটা অতিকায় মনস্টার যেন। আর অন্ধকার তার বড় প্রিয়। সে সলাপরামর্শ করে থাকে—যেমন কখনও ডেক-সারেঙ কখনও এনজিন- কশপ অন্য সবাই যারা জাহাজের আধিভৌতিক ঘটনায় ম্রিয়মাণ তাদের সহজেই সে উসকে দিতে পারে। এখন একমাত্র সম্বল এইসব নিরীহ গোবেচারা জাহাজিরা। সবাই তার হাতে এসে গেলে, জাহাজে বিজয় লাভ করতে সময় লাগবে না। তখন সে যুবতী হবার মুখে বালিকার সবকিছু চমৎকারিত্ব লুণ্ঠন করে নেবে।

অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তার মনে হল সব মিছিলের মতো কারা অন্ধকারে এগিয়ে আসছে। যেন বাতাসে ভর করে প্রথমেই এসে দাঁড়াচ্ছে ছোটবাবু। সে সজোরে ছোটবাবুর পেটে ঘুষি বসিয়ে দিল এবং দেখা গেল ডেক-সারেঙ দাঁড়িয়ে আছে মেন-মাস্টের নিচে। সে ছোটবাবুর গলায় দড়ি পরিয়ে দিচ্ছে। এবং উইনচে চালিয়ে সোজা মাস্তুলে লটকে দেওয়া হচ্ছে। আ—হাততালি। তার ক্রুরতা ক্রমে এভাবে কবে যে সফল হবে!

আর্চি অন্ধকারে দাঁড়িয়ে শুধু পায়চারি করছে। এদিকটায় কেউ আসে না। কারণ এখানে বড়-মিস্ত্রি থাকতে একবার ভূত দেখেছিল। অথবা কেউ কেউ জাহাজে রাতের গভীরে কোনো যুবতীর ছায়া দেখেছে। আর কি যেন আছে এদিকটায়, নানা কারণেই সব সময় এ জায়গাটায় কেউ আলো জ্বালিয়ে দেয় না—অথবা মনে হয় যতবার আলো জ্বালানো হয়েছিল, ক্যাপ্টেন কোথাও অন্ধকার রাখতে যত বারণ করেছেন তত সে মাঝে মাঝে এদিকটার লাইন অকেজো করে রাখে। এবং যেহেতু তার হাতে মেরামতের দায়-দায়িত্ব কে আর ভাবে—কোথায় আলো কিভাবে জ্বলবে। এবং এই অন্ধকারে সে দেখতে পেল, বাতাসে ভর করে এসে দাঁড়িয়েছিল স্যালি হিগিনস। আর্চি হা হা করে হেসে উঠল। বলল, স্যার আপনাকে আমরা কিছু করব না। সামনের দ্বীপটাতে আপনাকে আমরা রেখে চলে যাব। আলেকজাণ্ডার সেলকার্ক। হা-হা-হা!

জ্যাক তুমি কি দেখছ! তোমার কিছু অনিষ্ট করব না। তোমার শুধু চমৎকারিত্ব লুণ্ঠন করে নেব। তোমার অস্থিমজ্জায় আমি প্রবেশ করে যাব জ্যাক। তোমার একটা সুন্দর নাম রাখব। পুরুষের নাম তোমার খাতা থেকে কেটে দেব। আর কিছু করব না। সত্যি বলছি, আর কিছু করব না।

তখন স্যালি হিগিনস সিঁড়ি ধরে নামছিলেন। তিনি চার্ট-রুমের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। কিছু কাজকাম বাকি। গতকাল থেকে অদ্ভুত একটা দুর্ভাবনায় সময় কেটেছে। কোনও কাজ করতে পারেন নি। কেবল মনে হয়েছে যে-কোনো মুহূর্তে দুর্ঘটনা ঘটে যাবে। ভবিতব্য ভেবে মাথা পেতে নেওয়া ছাড়া উপায় থাকবে না।

এখন সময় যত চলে যাচ্ছে তত তিনি হাল্কা বোধ করছেন। বার বার দু'বারের মতো তিনবারের মাথায় কিছু ঠিক ঘটবে, এবং ভয়ংকর সেই ঘটনার মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছিলেন —প্রথমবার থিও ফ্যাল নিজে, দ্বিতীয়বার রিচার্ড ফ্যালের একমাত্র জাতক উইলিয়াম ফ্যাল। তখন রিচার্ড ফ্যাল গাড়ি ঘুরিয়ে নিচ্ছিলেন। হুডখোলা গাড়ি। বারান্দার পাশ থেকে সেই প্রাসাদের মতো বাড়ির রাস্তায় চলন্ত গাড়িতে ধপাস করে কিছু এসে পড়েছিল। সবকিছু ঠিকঠাক। কেবল কাগজপত্রে সইসাবুদ—তারপর সিউল-ব্যাংককে আর দশটা পুরোনো ভাঙা জাহাজের মতো নাকে দড়ি দিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে—তারপরই ঠিক ছিল উৎসব প্রাসাদে, এতবড় একটা আজীবন উদ্বেগ শেষ হয়ে গেল বলে যখন উৎসবের আয়োজন ঠিকঠাক তখন হুডখোলা গাড়িতে একমাত্র জাতকের মৃতদেহ। দোতলার রেলিং টপকে কেউ তার বালকপুত্রকে নিচে ঠেলে ফেলে দিয়েছে। রিচার্ড ফ্যাল দেখলেন ঘাড়টা বেঁকে গেছে, মনে হয় ঘাড় মটকে ছুঁড়ে দিয়েছে নিচে। এবং রিচার্ড ফ্যাল পাগলের মতো নেমে গেছিলেন। উন্মাদের মতো চিৎকার করেছিলেন সিঁড়ি ধরে ওপরে ছুটে যাওয়ার সময়—সব শেষ। তারপর তাঁর গলার স্বর ভয়ংকরভাবে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছিল।—দ্য সী-ডেভিল। যেন খবর পাঠাবেন, মাঝ সমুদ্রে নিয়ে সিউল- ব্যাংকে পুড়িয়ে দাও। পেট্রোল ঢেলে জ্বালিয়ে দাও। সে আমাদের সব কেড়ে নিচ্ছে। তিনি তারপর কিছুতেই তৃতীয়বার জাহাজ স্ক্র্যাপ করার আদেশপত্রে একটা কথা লিখতে সাহস পান নি।

আসলে দৈব-দুর্ঘটনার সঙ্গে যদি অকারণ কিছু হয়ে যায় তবে তার কি দোষ! অযথা সিউল-ব্যাংককে দোষারোপ করার অর্থ হয় না।

সামান্য জড় পদার্থ এই জাহাজ। শুধু কলকব্জায় চলে। কোনো অনুভূতি থাকতে পারে না। অথচ বার বার একে দোষারোপ করে অতিকায় ভীতির ভেতর পড়ে যাচ্ছে সবাই। কাল রাতে সেই পুনরাবৃত্তিব কথা ভেবে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন, অথচ মুখে বলা যায় না, ভারী হাস্যকর ব্যাপার—এবং কেউ গুলগল্প ভেবে একজন বনেদী কাপ্তানের এতদিনের ঐতিহ্যে কলঙ্ক লেপে দেবে বলে স্থির করেছিলেন, সব তিনি ঠাণ্ডা মাথায় করে যাবেন। যতই ভাবুন সবকিছু ঠাণ্ডা মাথায় করে যাবেন, শেষ পর্যন্ত আর তিনি খুব ঠাণ্ডা মাথায় ছিলেন না। তিনি সারাক্ষণ বনিকে ভুলে থাকার জন্য একটা না একটা অস্বাভাবিক কিছু করে গেছেন। এসব মনে হলেই বুঝতে পারেন দীর্ঘ দিনের অতীব এক বিশ্বাস ভেতরে বাসা বেঁধে আছে। তার হাত থেকে তিনি কিছুতেই নিষ্কৃতি পাচ্ছেন না। এবং মাঝে মাঝে এই যে বনিকে ডেকে পাঠাচ্ছেন, ডেকে বলছেন, আচ্ছা বনি তোমার শরীর ভাল তো। এবং এ-সব প্রশ্নে তিনি দেখেছেন, বনি বড় বড় চোখে ওঁর দিকে তাকিয়ে থাকে। কিছু বলে না। বড় বেশি অবাক হয়ে যায়। তিনি তখন নিজের দুর্বলতা ধরতে পেরে কেমন শুকনো গলায় বলেন, জাহাজ তো খুব একটা ভালো জায়গা নয়। সাবধান থাকলে ক্ষতি কি?

তখনই আবার মনে হয় সেই ভয়াবহ বজ্রপাতে কেউ মারা যাচ্ছে। পৃথিবীতে কত লোক বজ্রপাতে মারা গেছে অথচ সেই নির্দিষ্ট খবরে তিনি স্থির থাকতে পারবেন না কেন! এটা তিনি কাকতালীয় ভাবতে পারছেন না কেন। এবং সেটা কাকতালীয় ব্যাপার ভাবলেই তাঁর বেশি ভাল লাগার কথা। রিচার্ড ফ্যালের শ্রীমান তো ভীষণ চঞ্চল ছিল স্বভাবে। পরিচারকদের সব সময় দুর্ভাবনায় অস্থির করে রাখত। সে যে সহজ পথ ভেবে রেলিং টপকে পালাতে চায়নি এবং নিচে পড়ে যায় নি কে বলবে! তিনি মাথা থেকে অহেতুক দুর্ভাবনা সরিয়ে দেবার জন্য হাজার রকম ব্যাখ্যা করতে থাকলেন সবকিছুর। নতুন করে আবার সব ভাবছেন। না ভাবলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন

তবু রক্ষে দুর্ঘটনা ঘটে যাবার আগেই কাগজপত্র সব ঠিকঠাক করে দিয়েছেন। এটা একটা তাঁর বড় রকমের জয়লাভ। তিনি সিঁড়ি ধরে এক ধাপ নামলেন, আর হিজিবিজি সব চিন্তা তাঁর মাথায়। সহজে তরতর করে নিচে নেমে যেতে পারছেন না। অনেক উঁচু থেকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন রাজমহিষীর মতো সিউল-ব্যাংক ভেসে আছে সমুদ্রের জলে। আর দু'টো বড় মাস্তুলে তেমনি লম্ফ জ্বলছে। হাওয়ায় তার দড়ি-দড়া তেমনি বাতাসে দোল খাচ্ছে। কোনো কিছুতে যেন তার আসে যায় না। শুধু মনে হল বনিকে বলে দিতে হবে, বনি তুমি কিন্তু রেলিং ঘেঁষে কখনও দাঁড়াবে না। নিচে ঠেলে ফেলে দিলে তো কিছু করার থাকবে না। তখন যত দোষ হবে সিউল-ব্যাংকের। মনে হবে সত্যি কিছু একটা অশুভ প্রভাব এ-জাহাজে আছে।

স্যালি হিগিনস চার্ট-রুমে ঢুকে বললেন, তোমার ঘড়িতে কটা বাজে চিফ-মেট?

চিফ-মেট ভারি অবাক। মাস্টার তাকে জিজ্ঞেস করছেন কটা বাজে! সময় মেলাচ্ছেন ঘড়িতে। সময় তো তাঁর ভুল হবার কথা না। সময় ঠিকঠাক থাকার কথা। চিফ-মেট বলল, ন'টা বাজে স্যার।

—আমার ঘড়িতেও ঠিক ন'টা। ভীষণ কারেক্ট সময়। দ্যাখো দ্যাখো সেকেণ্ড এবং মিনিটের কাঁটা ঠিক দু'জনের একজায়গায় দেখে স্যালি হিগিনস খুবই পুলকিত হয়ে পড়লেন। তাঁর হাতের ঘড়ি কোনো অশুভ প্রভাবে পড়ে যেতে পারে। কিন্তু চিফ-মেটের ঘড়ি এবং যেখানে যত রকমের সময় নির্ধারণের ব্যাপার আছে সর্বত্র দেখে দেখে বুঝতে পারলেন কোনো ভুল-ত্রুটির ভয় নেই—সময় ঠিক –বারো ঘণ্টা পার হয়ে ছত্রিশ মিনিট। এবং এভাবে তিনি বসে বসে কেবল দণ্ড পল দেখে যাচ্ছেন। মিনিটের কাঁটা একবার ঘুরে গেলেই সেই শৈশবের মতো প্রায় লাফিয়ে উঠছেন—এক দুই তিন গুণে যাচ্ছেন। যত সময় পার হয়ে যাবে তত তার রোষ কমে আসবে। রোষের মুখে একরকম, সময় পার হয়ে গেলে অন্যরকম।

সারারাত তিনি ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো এভাবে চিন্তাভাবনায় দুলেছেন। পায়চারি করেছেন। ঘুমোতে পারেন নি। মাঝে মাঝে পোর্ট-হোলে দাঁড়িয়ে দেখেছেন, সর্বত্র শুধু নক্ষত্রেরা ভেসে যাচ্ছে আকাশে। কখনও তিনি সিঁড়ি ধরে নেমে এসেছেন নিচে। বনি দরজা খুলে যদি কোথাও চলে যায়? কোনো অশুভ শক্তি তাকে যদি আকর্ষণ করে, মাথায় তো তখন কিছু থাকে না। বোকার মত দরজা খুলে হেঁটে যেতে পারে। বার বার এভাবে নিচে ওপরে, কখনও মাথায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা, কখনও ঠিক বনির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে ভেবেছেন, কেবিনের ভেতর বনি নেই, ফাঁকা ঘর তিনি পাহারা দিচ্ছেন, তখনই বুকটা কেঁপে ওঠে, মুহূর্তপ্রায় তাঁর আর অপেক্ষা করার সময় থাকে না—বনি বনি, তুমি কি করছ! বনি!

বনি দরজা খুলে মুখ বাড়িয়ে বলছে, কি হল বাবা? এত রাতে? তুমি এখনও ঘুমোও নি! চল ওপরে!

—আরে না। তুমি ঘুমোও। আমি ঠিক উঠে যেতে পারব। আচ্ছা শোনো, দরজা খুলবে না। কেমন? জাহাজ তো ভাল জায়গা না! কেউ ডাকলে দরজা খুলবে না। দরজাটা ভাল করে লক করে দাও। কি দিয়েছ?

—হ্যাঁ দিয়েছি। তবু ঠেলে দেখলেন একবার। রাতটা কিছুতেই শেষ হচ্ছে না। সেই এলিসের মৃত্যুর . দিনের মতো। প্রত্যেকটা মিনিট ঘণ্টার চেয়েও বেশি লম্বা হয়ে যাচ্ছে। আর তাঁর ঘুম আসছে না। ঘুম এলেও তিনি ঘুমোতে যাচ্ছেন না। ক্রমে রাত এভাবে বাড়ছে। তিনি আর কেবিনের ভেতরও থাকতে পারছেন না। যেন কেউ বনিকে অসতর্ক মুহূর্তে বের করে নিয়ে যাবে। তিন চার্ট-রুমের রেলিঙে চলে এলেন। এখানে দাঁড়ালে বনির দরজা দেখা যায়। উইংসের আলো এসে পড়েছে দরজায়। সামান্য শব্দ হলে তিনি ঠিক টের পাবেন। এবং সমুদ্র থেকেযত প্রবল হাওয়া আসুক, দরজা খোলার শব্দ ঠিক শুনতে পাবেন। বনি কোথাও দরজা খুলে চলে যেতে চাইলে তিনি ঠিক টের পাবেন।

নিশীথে নক্ষত্রেরা তখনও তেমনি আকাশে এবং দিগন্তে পারাপারহীন অসীমতায় কিরণ

দিচ্ছে। সামনে শহরের সব আলো ঘর বাতি। কোথাও বাড়িঘরের ছায়া। জাহাজে কোথাও কোনো এতটুকু শব্দ নেই। একেবারে শব্দহীন অন্তহীন যাত্রার মতো তিনি দাঁড়িয়ে আছেন ওপরে। গোপনে পাহারা দিচ্ছেন। কোনোরকমে রাতটা পার করে দিতে পারলেই দুর্ভাবনার অনেকটা লাঘব। তখন সহসা যেন দূরে কিছু দেখতে পাচ্ছেন! ঠিক মেন-মাস্টের গোড়ায় কেউ দাঁড়িয়ে আছে। তার ছায়া বড় হয়ে যাচ্ছে ক্রমে এবং ক্রমে ছায়াটা লম্বা হয়ে যাচ্ছে। লম্বা হতে হতে প্রায় বনির কেবিনের কাছাকাছি চলে আসছে। তিনি কাঠ হয়ে গেছেন দেখতে দেখতে। ভারি সন্তর্পণে সে এগিয়ে আসছে। জাহাজের অস্পষ্ট আলোতে তিনি বুঝতে পারছেন না, এভাবে টলতে টলতে গভীর রাতে বোটডেকে কে উঠে আসছে। তিনি কিছুতেই আর স্থির থাকতে পারলেন না। রেলিঙে ঝুঁকে চিৎকার করে উঠলেন, কে? কে ওখানটায়! ঠিক বনির দরজার কাছে এসে গেছিল। এখন পালাচ্ছে। মুখটা ভীষণ নিচু করে রেখেছে। ওপর থেকে দেখা যাচ্ছে না। তিনি বললেন, কে? কে আপনি? সঙ্গে সঙ্গে চোখের ওপর থেকে ছায়াটা টুপ করে ডুবে গেল। বনির দরজার সামনে ঠিক নিচে নামার সিঁড়ি। সিঁড়িতে ছায়াটা অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন সেই মধ্য যামিনীতে হাহাকার শব্দে স্যালি হিগিনসের কণ্ঠস্বর গমগম করে বেজে উঠল, কে? কে আপনি! আপনি কি জাহাজের সেই অশুভ প্রভাব। আপনি কি ক্রমে আবার প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে উঠছেন!

॥ পয়তাল্লিশ ॥

ছোটবাবু ফিস্ ফিস্ গলায় ডাকল, বনি।

বনি বলল, বাবা আমাকে জাহাজ থেকে আর নামতে দেবে না ছোটবাবু।

ছোটবাবু বলল, কেন নামতে দেবে না! ডেবিড যাচ্ছে।

—বাবা কিছুতেই রাজী হচ্ছে না।

ছোটবাবু সুন্দর পোশাক পরে ওপরে উঠে এসেছে। সারাদিন ভীষণ খাটুনি গেছে। সে তাড়াতাড়ি কাজ সেরে স্নান করেছে ভাল করে। এ ক'দিন মন ভাল ছিল না। মৈত্রদার মৃত্যুর পর সে কেমন নিঃসঙ্গ বোধ করছিল। বিকেলে তার কোনদিন জাহাজ থেকে নামতে ইচ্ছে হয়নি। সকাল থেকে আজ ডেবিড বারবার ওর কাছে এসেছে। তাকে নিয়ে কিনারায় নেমে যাবে। শহরে ঘুরবে। কোনো পাবে বসে সামান্য ড্রিংকস। এভাবে একটু উৎফুল্ল হওয়া। তখনই মনে হয়েছে গেলে মন্দ হয় না। সে, বনি আর ডেবিড। বনির সঙ্গে কতদিন যেন একা একা শহরের রাস্তায় অথবা সমুদ্রের ধারে সে হেঁটে যায়নি। সে বলেছিল বনিকে, আমরা বিকেলে কিনারায় যাব।

বনি বলেছিল, আমিও যাব।

কিন্তু এখন বনি কেমন নিস্পৃহ, তার কোনো ইচ্ছে নেই যাবার। সে চুপচাপ জাহাজের ডেক চেয়ারে বসে আছে। কিছু বই একটা টিপয়ের ওপর। খুশিমতো যে কোনো বই তুলে দু'টো-একটা পাতা ওল্টে দেখছে আবার রেখে দিচ্ছে। আসলে তার কিছু ভাল লাগছে না। বাবা দিন দিন কেমন যেন হয়ে যাচ্ছেন। সে বলল, জানো ছোটবাবু বাবা রাতে একেবারে ঘুমোয় না।

ছোটবাবু পা ছড়িয়ে পাশে বসে পড়ল। বলল, কেন কি হয়েছে?

—বাবা মাঝে মাঝে আমার দরজায় নেমে আসেন।

—কেন নেমে আসেন? কি করে টের পাও তিনিই নেমে আসছেন!

—আমি বুঝতে পারি ছোটবাবু। বাবা সিঁড়ি ধরে নেমে এলেই বুঝতে পারি। মাঝে মাঝে বাবা নেমে এসেও নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন না। ডাকেন। আমি জেগে থাকলে সাড়া দেই। বাবা কেন যে এমন হয়ে যাচ্ছেন!

ছোটবাবু বলল, বুড়োর শেষ সফর। আর সমুদ্রে আসতে পারবেন না। সমুদ্রের জন্য বুড়োর শোক উথলে উঠছে।

—তা এভাবে আমার কেবিনের দরজায় সেজন্য দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন?

—ভাল লাগে না ঘুম আসে না। নিজের বলতে পৃথিবীতে এখন শুধু তুমি। সারাক্ষণ তোমাকে কাছে কাছে রাখতে চান।

—আরে না। তা ঠিক না। পরশু রাতে কি হল তুমি তো জান না!

—কী হয়েছে!

—আমার ঘুম আসছিল না। কেন যে ছোটবাবু ঘুম আসে না! যখন আর পারছিলাম না, ভাবলাম গোপনে তোমার কেবিনে গিয়ে চুপচাপ বসে থাকব। জাহাজে সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। কে টের পাবে বল! দরজা খুলে দেখি বাবা ওপরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন। একা। ব্রীজের সব আলো নিভিয়ে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন। কার সঙ্গে কথা বলছেন যেন। বাবাকে আমি এভাবে কখনও দেখিনি! সন্তর্পণে দরজা খুলেছিলাম। সামান্য গলা বাড়াতেই দেখেছি বাবা দাঁড়িয়ে আছেন। মনে হল বাবা টের পান নি, দরজা বন্ধ করে দেব ভেবে আবার যেই না সরে গেছি তখনই বাবা ডাকলেন, ভাল করে দরজা লক করে দাও। এত রাতে আবার উঠেছ কেন?

ছোটবাবু বলল, ঠিক একটা কেলেঙ্কারী করবে বনি। তুমি কেন এত রাতে দরজা খুলতে গেলে! মাথায় তোমার কি চাপে!

বনি ভীষণ দমে গেল। ছোটবাবু পর্যন্ত তিরস্কার করছে। কেউ তাকে বুঝতে পারছে না। সে আর একটা কথাও বলল না। বইয়ের পাতা উল্টাতে থাকল।

ছোটবাবু তখন আরও ক্ষেপে যায়। না, না, বনি এটা তুমি ঠিক করনি। তুমি বুঝতে পারছ না কেন তোমার এভাবে বের হওয়া ঠিক না।

—আমি কি করব ছোটবাবু। পারি না, দু'বার তোমার দরজায় পর্যন্ত অন্ধকারে নেমে গেছিলাম। তুমি বকবে বলে দরজায় গিয়েও ডাকতে পারি নি। আবার ফিরে এসেছি। তুমি ভারি নিষ্ঠুর ছোটবাবু।

ছোটবাবুর মাথায় এখন কিছু শব্দ বার বার ঘুরপাক খাচ্ছে—স্যালি হিগিনস ঠিক অনুমান করেছেন, বনি পালিয়ে কোথায় যেতে চায়। বনি পালিয়ে ছোটবাবুর কেবিনে যেতে চায়। সে কেমন এবার শাসনের গলায় বলল, পোর্ট মেলবোর্নে তোমাকে ঠিক নামিয়ে দিতে বলব।

বনি বলল, কেউ আমাকে নামাতে পারবে না ছোটবাবু।

–কেউ দেখে ফেললে কি হবে বলতো! বুড়ো মানুষটাকে আমরা মুখ দেখাব কি করে বল তো। আর ভাবছ সবাই চুপচাপ থাকবে! আর্চি তখন পেয়ে বসেব না তোমাকে! বনি, দোহাই ছেলেমানুষী কর না।

বনি তাকাল না পর্যন্ত। খুবই গম্ভীর মুখ। বয়সী যুবতীর মতো মুখ গম্ভীর করে রেখেছে। বই-এর পাতা উল্টে যাচ্ছে। মুখ তুলে ছোটবাবুকে একবারও দেখছে না। ছোটবাবু পাশে বসে আছে, থাকুক। ছোটবাবুর তো কেবল এখন তিরস্কার করার স্বভাব। ছোটবাবু, তুমি এত স্বার্থপর কেন—যেন ছোটবাবুর এই স্বার্থপরতাকে কিছুতেই সে সহ্য করতে পারছে না। পারলে সে এখন উঠে চলে যেত। কিন্তু ছোটবাবু যা একখানা মানুষ! অপমানজ্ঞান এত, হয়তো তারপর দিনের পর দিন কথা বলবে না। যেন বনি বলে সে কাউকে কখনও চেনে না। তার বলার ইচ্ছে হল, ছোটবাবু তুমি নিজেকে ছাড়া আর কারও কথা ভাব না। কিন্তু কিছু বলতে পারল না। তোমার তো ছোটবাবু খুশী হওয়ার কথা। আমি তোমার জন্য এত করতে পারি, তুমি আমার জন্য এটুকু সহ্য করতে পারবে না!

ছোটবাবু কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। বনি কথা না বললে তার মাথায় এখন আরও বেশি রক্ত উঠে যায়। সে বলল, নামিয়ে না দিলে তোমার ঠিক শাস্তি হবে না।

—বললাম তো কেউ পারবে না ছোটবাবু। মরে যাব, তবু কেউ তোমরা পারবে না।

ছোটবাবু সহসা খুবই দমে গেল। চোখ তুলে বনির মুখ দেখল। ভীষণ থমথম করছে। সারা মুখে রক্তচাপ। বোধহয় মেয়েটার অপমানে চোখ জ্বালা করছে। ছোটবাবু বলল, বনি, আমি তোমার ভালোর জন্য বলছি। তোমাকে নিয়ে বনি আমার ভারী ভয়।

সহসা বনি এবার জ্বলে উঠল। ওর দিকে বড় বড় চোখে তাকিয়ে বলল, কেন তুমি জাহাজে উঠে এলে ছোটবাবু! তোমার সঙ্গে আমার দেখা না হলে কি ক্ষতি ছিল! তুমি কেন আমার সব এভাবে চুরি করে নিয়েছ! কেন কেন? এখন তুমি তামাশা দেখছ। কিছু হলে তোমার কলঙ্ক হবে বলছ। তুমি এত ছোট, তুমি এত স্বার্থপর ছোটবাবু। তুমি ভাল না, তুমি খারাপ। বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়ল!

ছোটবাবু বলল, এই বনি, ছিঃ কি হচ্ছে! বনি প্লিজ এমন করে না। শোনো! বনি প্লিজ, ডেবিড উঠে আসছে।

বনি তাড়াতাড়ি বই দিয়ে মুখ ঢেকে দিল।

ডেবিড কাছে এসেই হৈ-চৈ বাধিয়ে দিয়েছে।—কি ব্যাপার তোমরা এখানে! সেজেগুজে

বসে আছি, পাত্তা নেই তোমাদের, এই জ্যাক চল। তুমি যাবে বলেছ। তা চল! দুষ্টুমি করবে না। আরে তুমি চলে যাচ্ছো কেন! যাবে না!

ছোটবাবু দেখল, বনি মুখ আড়াল করে কেবিনের দিকে হেঁটে যাচ্ছে। সে তাকিয়ে থাকল, তারপর কেবিনের ওপাশে চলে গেলে বলল, জ্যাক যাবে না। ওর শরীর ভাল নেই বলছে।

—কি হল আবার?

—কি জানি কে জানে! ছোটবাবু বলতে বলতে ভারী অন্যমনস্ক হয়ে গেল। সে কিছু দেখছে না মতো হেঁটে যাচ্ছে ডেক ধরে। ডেবিড পেছনে পেছনে যাচ্ছে। ছোটবাবু বোটে উঠেও একটা কথা বলল না ডেবিডের সঙ্গে। ডেবিড দড়ি খুলে দিল। ছোটবাবু তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। ও পরেছে কালো প্যান্ট হাওয়াইন শার্ট—পায়ে সাদা মোজা আর কালো জুতো। ওর দিন দিন চুল ঠিক জ্যাকের মতো বড় হয়ে যাচ্ছে। এবং কি যে সুমহান চোখমুখ হয়ে যাচ্ছে ক্রমে! দাড়ি সেই নীলাভ রঙের পাতলা, ক্রমে ঘন হচ্ছে। চোয়াল ভীষণ ভারী। এবং নাকের কিছুটা অংশ এখন দেখা যাচ্ছে—শরীরে সবুজ ঘাসের মতো কখনও রঙ, কখনও মনে হয় ঘাড়ে মসৃণতা অত্যধিক। হাতের পেশী শক্ত, ডেবিড়ের কেমন ভয় ভয় করতে থাকল। বলল, ছোটবাবু তুমি এমন গুম মেরে আছ কেন!

ছোটবাবু বলল, কই না তো!

—তোমার কিছু হয়েছে ছোটবাবু?

—কি হবে?

—কি হয়েছে জানি না। কিছু হয়েছে এটুকু বলতে পারি।

—আরে না। কিচ্ছু হয়নি। ছোটবাবু বোটে উঠে ডেবিডের পেছনে চলে এল। দাঁড় টানবে বলে বসে পড়ল। ওর মুখে অজস্র রেখা তৈরি হচ্ছে—নানারকমের সংশয়।—আর্চি সারারাত আবার জাহাজে জেগে থাকছে!

সে নুয়ে দাঁড় টানছে। ক্রমশ আর্চি চারপাশে নেচে বেড়াচ্ছিল। স্যালি হিগিনস, আর্চি, পুরনো জাহাজ, এই যুবতী মেয়ে আর সব নানারকম সংশয় ক্রমে ছোটবাবুকে অস্থির করে ফেলছে। সে একটা কথা বলতে পারছে না। মনে হচ্ছে জাহাজ সমুদ্রে ভেসে গেলেই ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে। এসব ভাবনার ভেতর জ্যাকের মুখ বড় বেশি হারিয়ে যাচ্ছিল। তখন ইচ্ছে হচ্ছিল, একবার গোপনে পেছনে তাকায়। যদি জ্যাক জাহাজে দাঁড়িয়ে থাকে, তাকে সে বোট থেকে দেখবে।

এবং তখনই কি যে হয়ে যায়, সে দেখতে পায় পোর্ট-হোলে সেই মুখ। সে ফিরে তাকাতেই ধীরে ধীরে হাত নাড়ছে—আমি আছি ছোটবাবু ভয় নেই। আমি পোর্টহোলে দাঁড়িয়ে তোমাকে দেখছি। তুমি যত দূরেই যাও আমি আছি সঙ্গে! ছোটবাবু মনে মনে বলল, আমিও আছি বনি। সে দাঁড়িয়ে হাত নাড়তে থাকল। বনি হাত নাড়ছে। সহসা এক আশ্চর্য সুখানুভূতিতে ছোটবাবুর মনটা ভরে গেল। চোখ ঝাপসা হয়ে গেল বনির কথা ভেবে।

ছোটবাবু বলল, ডেবিড আমি কিন্তু বেশি খাব না। আমাকে তাড়াতাড়ি জাহাজে ফিরতে হবে। বনিকে জাহাজে একা ফেলে সে একদণ্ড কোথাও আর থাকতে পারছে না।

আর যা মনে হল ছোটবাবুর, বনি জাহাজে না থাকলে সেও ঠিকঠাক যেন জাহাজে বেঁচে থাকবে না। ডেবিডকে নিয়ে সে বেশি সময় কিনারায় থাকল না। বালিয়াড়িতে সে এবং ডেবিড কিছুক্ষণ ঘুরে বেড়াল। সন্ধ্যা হয়ে গেলে ওরা দু'জন পাশাপাশি বসল। আভা ঘাসের মদ খেল দু'জনে। কিছু খাবার। ডেবিড ওর সঙ্গে ফিরে এল না। সে একা ফিরে এল জাহাজে।

এবং এভাবে আর কখনও ছোটবাবুকে নেমে যেতে দেখা গেল না। সারাদিন কাজের পর সে বোট- ডেকে জ্যাকের সঙ্গে বসে থাকত। গল্প করত। ডেবিড বার বার এসে ফিরে গেছে।

ওকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেনি। সূর্যাস্তের সময় ছোটবাবু রেলিঙে দাঁড়িয়ে থাকলে ডেবিড বুঝতে পারত, যেভাবে ছোটবাবু জাহাজে উঠে এসেছিল এখন আর সেভাবে ছোটবাবু বেঁচে নেই। কেমন ধীরস্থির এবং চরিত্রের দৃঢ়তা ছোটবাবু জাহাজে বড় হতে হতে পেয়ে গেছে। ছোটবাবু কথা বললে মনে হয়, অনেক দূর থেকে কথা বলছে। ছোটবাবুকে আর আগের ছোটবাবু কিছুতেই ভাবা যাচ্ছে না।

মাসাধিককাল জাহাজ এ-বন্দরে থেকে গেল। ফসফেট ডেরিকে বোঝাই হচ্ছে। ক্রেনে যত সহজে একটা জাহাজ বোঝাই হতে পারে ডেরিকে তত সহজে হয় না। সময় লেগে যায়। এখন জাহাজ বোজাই হয়ে গেলে ফের যাত্রা। জাহাজ আপাতত যাবে জিলঙে। পোট-মেলবোর্ন পার হয়ে মাইল চল্লিশ

দূরে ছোট্ট বন্দর। সব মাল সেখানে খালাস করা হবে। স্যালি হিগিনসের কাজকর্ম এবং অফিসারদের সব দেখাশোনা শেষ। বন্দর ছাড়ার আগে সেই এক নিশান উড়িয়ে দেওয়া। সবাইকে বলে দেওয়া চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর জাহাজ আবার ছাড়ছে। বয়লার-রুমে সব বয়লারের স্মোক-বক্স একেবারে পরিষ্কার করে নেয়া হয়েছে। ক্রস-বাংকারে কয়লা লেভেলিং হচ্ছে। কোনো কারণে উঁচু নিচু পড়ে থাকা কয়লায় গ্যাস হতে পারে। আগুন লেগে যেতে পারে জাহাজে। কোথাও কোনো কারণে গাফিলতি থেকে না যায়। প্রায় বিশদিনের মতো জাহাজ ফের সমুদ্রে ভেসে চলবে। মে মাসের মাজামাঝি সফর। দক্ষিণ-পূর্ব আয়ন বায়ুর গতিবেগ ক্রমশ এখন বাড়ছে। সমুদ্রের আবহাওয়া খুবই খারাপ থাকার কথা। ঝড় বৃষ্টিতে জাহাজটা ভেসে চলবে সমুদ্রে। ফল্কার ওপরে কাঠ, কাঠে ত্রিপল এবং চারপাশে কিল্ এঁটে সবকিছু ধোয়ামোছা শেষ। কোথাও কিছু পড়ে নেই ডেকে। ঝড়ের দরিয়ায় পড়ে গেলেও কিছু ভাসিয়ে নিতে পারবে না। কোথায় কি রঙ চটে গেছে, খুঁজে খুঁজে দেখছে ডেক-টিণ্ডাল। রং-এর টব কোমরে ঝুলিয়ে জাহাজিরা ছোটাছুটি করছে। নিচে ওপরে ভেতরে বাইরে এভাবে রঙ করে নেয়া হচ্ছে—সব ডেরিক নামিয়ে দেয়া হচ্ছে। এবং মজবুত সব গিঁটের সাহায্যে বাঁধাছাঁদা শেষ। উইন্‌চগুলোতে ত্রিপলের ঢাকনা পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। জাহাজের লাব্বাস-লাইন আবার জলে পড়ে আছে। জাহাজ চলতে আরম্ভ করলেই দড়ি-রিঙে ছোট্ট একটা ডালিমের মতো গুলি ঘুরতে থাকবে অনবরত। জাহাজের গতি মাপার জন্য এটা ঠিকঠাক করে নেয়া দরকার!

জলের ট্যাংকগুলোতে কত জল আছে, জাহাজের ড্রাফট ঠিক থাকল কিনা, ভাঙা জাহাজ বলে খুশিমতো দু-এক ফুট ড্রাফট এদিক-ওদিক হওয়ার উপায় নেই। কম হলে ক্ষতি নেই। বেশি হলে বোধহয় জল এবং কয়লার ওপর দিয়ে যাবে। জল কম হলে রেশনিং করে দেয়া যেতে পারে। কাজেই সব চার্ট, সব স্টক, জাহাজের কোথায় কি কতটা আছে সব এক এক করে বুঝে নিচ্ছেন স্যালি হিগিনস। তিনি সবাইকে নিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখছেন, যেমন প্রত্যেকবার জাহাজ ছাড়ার আগে দেখে নেন। বন্দরে তিনি দু'বার বোট-মাস্টার করিয়েছেন —যদিও বন্দরে বোট-মাস্টার করা কোনো জরুরী ব্যাপার থাকে না। জাহাজের লাইফ-বয়াগুলো সব ঠিকঠাক আছে কিনা দেখে নিচ্ছেন। শেষ সফরে তিনি ভীষণ সতর্ক। লাইফ-বয়া, লাইফ-জ্যাকেট, দু'টো বড় বড় কাঠের পাটাতন, সবই যেখানে যেভাবে থাকে ঠিকঠাক আছে দেখতে পেলেন। লাইফ-বোটের শুকনো খাবার, জল, তেল, লণ্ঠন, সী-অ্যাংকার সব ঠিকঠাক আছে। বোটের ওপরে ত্রিপলে ঢাকা। পুরানো বলে কোথাও ফুটাফাটা। দু'টো মোটর বোটেই দেখলেন লাইফ- বোটে ট্র্যানমিটার সেট নেই। ও দু'টো চার্ট-রুমে থাকে। বোট-মাস্টারের সময় রেডিও-অফিসার হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে এসেছিল, আবার তুলে রেখেছে বোঁধহয় চার্ট-রুমে। ঝড়জলে ও দু'টো আবার সময়-কালে যদি নষ্ট হয়ে যায়। রেডিও-অফিসার তবে বুঝতে পারছে, স্যালি হিগিনসের কাছে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। দরকার মতো হাতের কাছে আসল ত্রাণকর্তা। ট্র্যান্‌সমিটার সেটটি বিকল—তখন মাথা চাপড়ানো ছাড়া অন্য উপায় আর থাকবে না। চার্ট-রুমে রেখে ভালই করেছে।

এভাবে জাহাজে পর পর সব কাজ হয়ে গেলে, গ্যাঙ-ওয়ে থেকে সিঁড়ি টেনে তোলা হতে থাকল। এটাই সবার শেষের কাজ। জাহাজের সঙ্গে ডাঙ্গার শেষ যোগসূত্র এভাবে উঠে এলেই মনে হবে চারপাশে সর্বত্র যেন কেউ সেই বিউগিল বাজিয়ে দিচ্ছে ফের। সমুদ্রে, অসীম অনন্ত সমুদ্রে জাহাজ সিউল- ব্যাংক তার বিশ্বাস অবিশ্বাস আর কিংবদন্তী নিয়ে ভেসে চলেছে। মনের ভেতরে তখন যার যত দুর্বলতা সব এক এক করে দেখা দিতে থাকে। মৃত্যু এবং বেঁচে থাকা দুইই পরম আত্মীয়ের মতো মনে হয়। শেষ চিঠি তারা পৌঁছে দেয় এজেন্টের হাতে। আমরা যাচ্ছি জিলঙ। বেঁচে থাকলে সেখানে আমরা তোমাদের চিঠি পাব।

ঠিক একই দৃশ্য আবার, জাহাজ যত সমুদ্রে এগিয়ে যায় ডাঙা যত দূরে সরে যায়, জাহাজিদের মন তত খারাপ হতে থাকে। স্বভাব যে কি মানুষের—ডাঙা যতক্ষণ দেখা যাবে কেউ নড়বে না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে সেই দ্বীপ এবং দ্বীপের বর্ণমালা দেখতে দেখতে ঠিক স্বদেশের মতো কষ্ট বুকে। যে-কোনো ডাঙাই তখন তাদের দেশ মনে হয়। ঐ দ্বীপটাতেই যেন বেঁচে রয়েছে তার স্ত্রী পুত্র অথবা মা এবং মনে হয় কোনো সবুজ শস্যক্ষেত্র পার হলেই সে তার ছোট্ট কুটির দেখতে পাবে। যুবতী স্ত্রী দরজায়। চোখ তুলে বলছে, তাহলে এলে! সফরে বের হলে ঘরে ফেরার নিশ্চিন্ত সম্ভাবনা বুঝি মানুষের থাকে না।

ওরা সেই দ্বীপটার পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে। মৈত্রকে এ দ্বীপটায় রাখা হয়েছে। এখনও কাঠ-কয়লা কিছু পোড়া কাঠের অংশ ভাঙা হাঁড়ি দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের এই দ্বীপে যেন বেশ তাকে মানিয়ে গেছে। অশান্ত তরঙ্গমালার ভেতর আশ্চর্য দ্বীপটা। নির্জনতা প্রবল। হা হা করে বাতাস সারাক্ষণ বয়ে যাচ্ছে আর দ্বীপে মৈত্রের সব অস্তিত্ব ছড়িয়ে আছে। দ্বীপটা এখন মৈত্রদার। বোধ হয় কোন সফরে যদি আবার সে ফিরে আসে দেখতে পাবে বসন্তনিবাসের নামে কেউ এখানে একটা স্মৃতিসৌধ গড়ে দিয়ে গেছে। ছোটবাব; দ্বীপটার কোথায় কিভাবে মৈত্রদাকে পুড়িয়ে দিয়েছিল এক এক করে বনিকে বলে যাচ্ছে—এবং সেই যে জাহাজে ওঠার সময় তার সব ভরসা ছিল মৈত্রদা, সেই মানুষ তার নাম দিয়েছিল জাহাজে ছোটবাবু এসব বলতে বলতে শেফালীবৌদির গল্প এবং কখনও যে মৈত্রদা স্বপ্ন দেখত একটা বড় পাইন গাছে কেউ ঝুলিয়ে রেখেছে বড় একটা তিমি মাছের কংকাল, নিচে মৈত্রদা দাঁড়িয়ে আছে—এসব কথা সে বলতে বলতে দেখল বনি হাঁ করে তাকে দেখছে। ছোটবাবু বলল, বনি, তুমি কি দেখছ! দ্বীপে মনে হচ্ছে না মৈত্রদা আমাদের হাত তুলে টা টা করছে!

বনি বলল, শুনছ?

—কী!

—তুমি শুনতে পাচ্ছ না!

—না।

—বাবা আবার সেই গানটা বাজাচ্ছেন।

ছোটবাবু ওপরে তাকাল। ব্রীজে ডেবিড পায়চারি করছে। পাশে হুইলের সামনে তিন-নম্বর কোয়ার্টার- মাস্টার। মাথায় টুপি। মুখ প্রায় টুপিতে ঢাকা। সে দাঁড়িয়ে আছে। সামনে আদিগন্ত সমুদ্রের জলরাশি খেলাচ্ছলে যেন অসীমে ভেসে যাচ্ছে অথচ সেই সঙ্গীত ঠিক সঙ্গীত বলা যাবে না, আশ্চর্য এক মেলোডি বোধ হয়। যখন কোনো জাহাজি সমুদ্রে থেকে যায় স্যালি হিগিনসের দুঃখবোধ বাড়ে। কিংবা স্যালি হিগিনস এখন কোথায়? সে বলল, তিনি তো কোথাও নেই বনি?

বনি বলল, বাবা ঠিক ঘরে বসে বাজাচ্ছেন। এবং বনি ঠিক বুঝতে পারছে না বাবা আবার এত দুঃখের ভেতর ডুবে যাচ্ছেন কেন। বাবা যখন সবকিছুর ওপর বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেন, এমন কি তাঁর ঈশ্বরের ওপর তখন তিনি এ গানের ভেতর, এমন একটা সুরের ভেতর ডুবে যান। বাবা, মা চলে যাবার পর, এভাবে গান বাজিয়ে বাঁচার মতো আশ্রয় খুঁজেছিলেন। আবার কি বাবা এমন একটা আশঙ্কার ভেতর পড়ে গেছেন, যেন কোনো তাঁর অতীব আপন কিছু শেষ

অবলম্বন হারিয়ে ফেলছেন। শেষ অবলম্বন বলতে বনি জানে সে নিজে এবং বাবাকে এভাবে ভায়োলিন বাজাতে শুনে কেমন শঙ্কা বোধ করল।

ওরা দু'জনই ভীষণ ঝুঁকে ছিল সমুদ্রে। ছোটবাবু দ্বীপটা দেখছে দূরে সরে যাচ্ছে। দ্বীপটা দেখতে দেখতে লেডি-অ্যালবাট্রসের কথা মনে পড়ছে। এখনও দিগন্তে ওকে দেখা যাচ্ছে না। যত জাহাজ সমুদ্রে ঢুকে যাচ্ছে তত ভাবছিল পাখিটা দিগন্তে কোথাও উড়ে উড়ে আসছে দেখতে পাবে। কাছে এলে সে ঠিক চিনে ফেলবে। অথচ পাখিটা নেই, দ্বীপটা দূরে সরে যাচ্ছে; বনি এখন বোটে হেলান দিয়ে বসে আছে। ওর চোখ কেমন স্থির। সে খুব নিবিষ্ট হয়ে যাচ্ছে যেন। একটা পা সে তুলে দিয়েছে রেলিঙে। প্যান্ট গোটানো হাঁটুর কাছাকাছি। পায়ে পাতলা চাঁদমালার জুতো। খালি পা, মোজা পরেনি বলে ভারী মনোরম। ছোটবাবু বোধ হয় চুরি করে বনির খালি পা এবং আরও কিছু, এভাবে কি সব ভাবছিল—লেডি-অ্যালবাট্রসের কথা মনে আসছে। প্রিয় পাখিটার কথা পর্যন্ত সে বনির খালি পা এবং সৌন্দর্য দেখতে দেখতে ভুলে যাচ্ছে—আর এ সময়ে বনির কি দরকার ছিল এমন একটা উদ্ভট পোশাকে নেমে আসার। মাথায় তালপাতার টুপির ভেতর জাফরিকাটা হলুদ রং, বাঁ-হাত ঘাড়ের কাছে, আর ডান-হাত বুকের কাছে। লাল রঙের জ্যাকেট পরেছে। মোটা বেল্ট আর পোশাকের আঁটসাট শক্ত আবরণের ভেতর শরীরের ভাঁজ যেন ফুটে বের হচ্ছে! এত সাহস বনির কি করে হচ্ছে! সে জানে খুব কাছে তার কেবিন, সে বুকের ওপর ইচ্ছে করলে ন্যাপকিন ফেলে সব একেবারে গোপন করে ফেলতে পারে—কিন্তু এখানে যদি এখন ডেবিড চলে আসে! যে কেউ এলেই সামনাসামনি দাঁড়ালে টের পাবে, যেন জ্যাক মেয়ে। অথচ সে জানে এমন করে ওকে কেউ দেখে ফেললেও বিশ্বাস করবে না সে মেয়ে। কারণ সে জানে, এটা একটা আজগুবি কথা কার্গো-শিপে মেয়ে! কারণ এ তো আর যাত্রী বহন করে না, অথবা কোনো কার্গো-শিপে দশ-বারোজন যাত্রীর ব্যবস্থা কখনও কখনও থেকে যায়। কিন্তু সিউল-ব্যাংক যাত্রী নেবে দূরে থাক দামী কার্গো পর্যন্ত সে পায় না। আর সেখানে মেয়ে-যাত্রী, মেয়ে! ভাবাই যায় না যতই তুমি মেয়ে মেয়ের মতো থাকো। কেউ ভাববে না তুমি মেয়ে! তুমি মেয়ে সেজে সবাইকে লোভে ফেলে দিচ্ছ এমন ভেব না! আর তখনই মনে হল, কেবল আর্চি, আর্চি জানে, আর্চি জানে জ্যাক বনি। আর্চি জ্যাককে কেবিনে টেনে নিতে চেয়েছিল। সে কেমন ভেতরে ভেতরে গণ্ডগোলের ভেতর পড়ে যাচ্ছে। সে বনিকে কি বলবে বুঝতে পারল না। তখনও ভায়োলিন বাজাচ্ছেন স্যালি হিগিনস। সে বলল, জ্যাক দিন দিন তোমার খুব সাহস বাড়ছে।

—সাহস?

—হ্যাঁ। তুমি কি পরেছ!

—কেন পুরুষের পোশাক।

—ভাল দেখাচ্ছে না। সব বোঝা যাচ্ছে। এত আঁট, বিশ্রি দেখাচ্ছে।

—যা!

—হ্যাঁ সত্যি বলছি।

—তুমি জানো বলে বুঝতে পারছ।

—আচ্ছা বনি, ছোটবাবু পাশে বসল, আর্চি তবে টের পেল কি করে?

জ্যাক সব বলল। 'ইউ নটি গার্ল' থেকে সে যে একদিন কেবিনে ব্যালেরিনার মতো পোশাক পরে নাচছিল এবং এমন কি সে যে একদিন ডেকে মাতাল ছোটবাবুকে গভীর রাতে কেবিনে দিয়ে আসার নামে বারবার গোপনে চুমো খেয়েছিল সব বলে গেল। সে আর মাথা উঁচু করে যেন কথা বলতে পারছে না। সে বলল, আমি আর্চির কাছে নিজের দোষে ধরা পড়ে গেছি ছোটবাবু!

—আর্চি সবাইকে যদি বলে দেয়?

—দিতে পারে।

—দিলে কি হবে বুঝতে পারছ?

—জানি ছোটবাবু। বাবাও বোধ হয় অনুমান করতে পারছেন সব

—তুমি অহেতুক বুড়ো মানুষটাকে ভাবনার ভেতরে ফেলে দিয়েছে।

—কি করব ছোটবাবু। আমার কপাল।

—ছোটবাবু বলল, আর্চি এখনও কিছু বলছে না।

—বলছে না কি করে জানো?

—ঠিক খবর চলে আসবে। বন্ধু অনিমেষ জব্বার এখনও আছে জাহাজে।

—আর্চি ধূর্ত ছোটবাবু। সে একা মজা লুটতে চায়। সে কাউকে সহজে বলবে না।

তারপর ওরা কেউ আর কথা বলতে পারল না। চুপচাপ পাশাপাশি বসে থাকল। সূর্য অস্ত গেছে। সমুদ্রে অন্ধকার। এবং অনেক রাতে চাঁদ উঠবে আকাশে। ফ্যাকাশে সমুদ্রে তখন জাহাজের শুধু কলকব্জার শব্দ। আর হয়তো সারারাত স্যালি হিগিনস ভায়োলিন বাজাবেন। ছোটবাবু বলল, কি তিনি বাজাচ্ছেন বনি?

বনি বলল,

নোবডি নোজ দি ট্রাবল আই সি
নোবডি নোজ বাট জেসাস।
নোবডি নোজ দি ট্রাবল আই সি
গ্লোরি হ্যালেলুজা।

ছোটবাবু বলল, সত্যি আমরা জানি না কি ঘটবে। এনজিন-কশপ মাঝে মাঝে আজকাল আর্চির কেবিনে খুব আসছে।

এবং রাতে কেউ ঘুমোতে পারল না। ছোটবাবু বারবার বোট-ডেকে উঠে এসেছে। যতবার সে বোট- ডেকে উঠে এসেছে সেই গান—সেই গান—নোবডি নোজ দি ট্রাবল আই সি! স্যালি হিগিনস বারবার একই গান বাজিয়ে যাচ্ছেন। এবং সে বুঝতে পারছে না—কিভাবে জাহাজে তিনি আছেন, সামটাইমস আই অ্যাম আপ, সামটাইমস আই অ্যাম ডাউন ও ইয়েস লর্ড, আরও কি যেন আছে—তিনি গোপনে ভাঙা জাহাজ নিয়ে ফ্যাকাশে সমুদ্রে ভেসে চলেছেন। চারপাশে সমুদ্রের হাহাকারের ভেতর তিনি ক্রমে ঢুকে যাচ্ছেন। ভেতরে তাঁর অতীব যাতনা। কি এখন করণীয় ছোটবাবু বুঝতে পারছে না। নিরিবিলি আকাশ আর সমুদ্রে তিনি ফ্যাকাশে এক অন্তহীন করুণা ঈশ্বরের ধরতে পেরে কেমন বিচলিত। এবং সে তখন বুঝতে পারছিল এলবা জাহাজের পাশাপাশি কোথাও আছে। ওর পাখার শব্দ এইমাত্র কোথাও যেন দ্রুত ভেসে আসছে। সে বোট-ডেক ধরে নিচে নেমে গেল। আলোগুলো জাহাজের বিরামহীন জ্বলে যাচ্ছে। ফ্যাকাশে সমুদ্রের ভেতর চাঁদের নিভৃত আলো বড় বেশি ভীতিময়। ছায়া ছায়া এক বিশ্বচরাচবে ওরা ভেসে বেড়াচ্ছে। এলবা মাস্তুলের ওপর বসে আছে সে দেখতে পেল। পাখিটাও বুঝি বুঝতে পারছে সব। ঠোঁট গুঁজে যতবার সে ঘুমোবে ভেবেছিল ততবার সে কি এক আতঙ্কে জেগে যাচ্ছে। আর বাতাসে পাখা মেলে সমস্ত হতাশা সরিয়ে দিতে চাইছে বুঝি। সে দাঁড়িয়ে থাকল মেন-মাস্টের নিচে। পাখিটাকে ফিফিস্ করে ডাকল, এলবা তুমি তো সমুদ্রে আবহমানকাল এভাবে বেঁচে আছো। তুমি কি বুঝতে পারছ, আমরা এ ভাঙা জাহাজে কোথায় যাচ্ছি!

তখনও স্যালি হিগিনস বাজাচ্ছেন—ওভার মাই হেড আই হিয়ার ট্রাবল ইন দ্য এয়ার, দেয়ার ইজ এ হেভেন সাম হোয়েয়ার—আপ এবাভ মাই হেড, অ্যাণ্ড আই নো, ইয়েস আই নো দেয়ার ইজ এ হেভেন সাম হোয়েয়ার…।

তারপর গম গম করে বাজছে—ভায়োলিনে তিনি দ্রুত ছড় টেনে যাচ্ছেন বুঝি

জেরি;

টিমবার, টিমবার!

লর্ড দিস টিমবার গটা রোল।

টিমবার টিমবার...।

বনি শুয়ে শুয়ে সব শুনতে পাচ্ছিল। ওপরে উঠে যেতে ইচ্ছে হচ্ছে। বাবাকে নিরস্ত করা দরকার। কিন্তু দরজা খুলতে সে সাহস পাচ্ছে না। দরজার কাছে সে এখন দাঁড়িয়ে আছে। সে বুঝতে পারছে বাবার সব গান তাঁর ঈশ্বরের কাছে লিপি পাঠানোর মতো। এখন তিনিই তাঁর সব। তাঁর উদ্দেশ্য এবং বিধেয়। অর্থাৎ তিনি নিমিত্ত মাত্র। বাবা তাঁর জীবনের সব সুখ-দুঃখ করুণাময় ঈশ্বরের পায়ে সমর্পণ করছেন। বনি বুঝতে পারছে বাবার আর কোনো অবলম্বন নেই। বাবা এখন বিধ্বস্ত মানুষের প্রতিচ্ছবি। সে এখন কি করবে ঠিক বুঝতে পারছে না। ওর কেবল বাবার জন্য কান্না পাচ্ছিল।

॥ ছেচল্লিশ ॥

ডেবিড তখন নেমে যাচ্ছিল সিঁড়ি ধরে। ওর ওয়াচ শেষ। সে ঘুমোবার আগে আকাশের সব নক্ষত্রমালা দেখবে। সকাল হবার আগে যে সব নক্ষত্র ওর চারপাশে দিগন্তে অথবা মাথার ওপর থাকে তাদের দেখে জাহাজের সাইট নেবে। এ-সব কাজের পর ওর আর কিছু করণীয় থাকে না। তার শুয়ে পড়ার কথা। সারারাত কাপ্তান ঘুমোন নি। কেবল ভায়োলিন বাজিয়েছেন। বুড়ো মাঝে মাঝে বেশ ধার্মিক মানুষ হয়ে যান। এবং এত ভাল ব্যবহার যে মনেই হয় না তখন তিনি তাদের ওপরআলা। তিনি যেন তাদের সবাইকে নিয়ে এক সংসারের মানুষ। তাদের জন্য বুড়ো মানুষটার ভাবনার অন্ত নেই। লগ- বুক জমা নেবার সময় বুড়ো মানুষটা একটা কথা বলেন নি। কোনোরকমে আপদ বিদায় করতে পারলে যেন বাঁচেন। উপাসনার মতো মনে হয়েছিল তাঁর চোখ মুখ। সারারাত তিনি ভায়োলিন বাজাবেন, এটা সে ওয়াচ বুঝে নেবার সময় টের পেয়েছিল। থার্ড-মেট বলেছে বুড়ো ভায়োলিনে স্পিরিচুয়ালস বাজাচ্ছে। শেষ সফরে বুড়ো মানুষটা বুঝি আর নিজের ওপর আস্থা রাখতে পারছেন না।

তবু যা হয়ে থাকে, ব্রীজে পায়চারি করার সময় সমুদ্রে সে অনেকক্ষণ ঝুঁকে ছিল। পাশে চার্ট-রুম, তার পাশে কাপ্তানের কেবিন। কেবিনের দরজা বন্ধ। শুধু পোর্ট-হোল খোলা। খুব স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল সব এবং এ-সব বাজনার ভেতর এক আশ্চর্য কাতর অভিমান অথবা বলা যায় জাহাজিদের দুঃখ থেকে থাকে। বাড়ির জন্য ওর মনটা ভার হয়ে উঠেছিল। কতকাল সে যেন এবিকে না দেখে আছে। মনে হয় অনেক অনেক বছর আগে, সে জাহাজে উঠে এসেছে, তার ছেলেমেয়েরা অনেক অনেক আগে হাত নেড়ে বিদায় জানিয়েছে, এখন ফিরে গেলে সে তাদের বুঝি আর ঠিক ঠিক চিনতে পারবে না। তারা সবাই বড় হয়ে গেছে।

এ-সব কারণে সে সোজা নিচে নেমে যেতে পারে নি। বোট-ডেকে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে থেকেছে। সমুদ্রে ঠাণ্ডা বাতাস। আর যা থাকে শুধু নক্ষত্র আকাশে দপদপ করে জ্বলছে। যেন কোনও অতিকায়, অলৌকিক সত্ত্বা সেই সব নক্ষত্রের আলো সকাল হয়ে যাচ্ছে বলে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিচ্ছে। ক্রমে এ- ভাবে আকাশ নক্ষত্রশূন্য করে দিয়ে তিনি সমুদ্রে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছেন। এবং ক্রমে এ-ভাবে চাঁদ ডুবে গেল। ক্রমে এনজিনের শব্দ ফানেলের ধোঁয়া আর দিনের আলো ফুটে উঠবে বলে দিগন্তের আকাশে সামান্য লাল আভা। দু'টো একটা পারপয়েজ মাছ জাহাজের খুব কাছাকাছি এসে আবার ডুবে গেছে। এবং মনে হল তখন বোটের ও-পাশে চুপচাপ কেউ দাঁড়িয়ে আছে। একা। সে ডাকল, ছোটবাবু।

ছোটবাবু কোনো সাড়া দিল না।

সে উঠে বোটের ও-পাশে চলে গেল। বলল, তুমি এত সকালে!

ছোটবাবু বলল, ডেবিড তুমি কিছু বুঝতে পারছ?

ডেবিড একেবারে হাঁ। সে বলল, কি!

ছোটবাবু বলল, কিছু বুঝতে পারছ না?

ডেবিড বলল, না তো।

—তুমি টের পাচ্ছ না আর্চির ঘরে খুব লোকজন আসছে?

–কখন?

—রাতে। এনজিন-কশপ ডেক-সারেঙ তার দলবল।

ডেবিড বলল, ওরা কেন আসে রাতে!

ডেবিডকে কিছু বলা নিরর্থক। আসলে ছোটবাবু বুঝতে পারছে ডেবিড, জাহাজে সংগোপনে একটা বড়রকমের ষড়যন্ত্র গড়ে উঠছে টের পাচ্ছে না। সে সব খুলে বলতেও পারছে না। সে বলল, এলবা আবার ফিরে এসেছে।

—কোথায়?

—মেন-মাস্টে বসে রয়েছে।

ডেবিড দেখল সেই অতিকায় পাখিটা মাস্তুলের ওপর ঘুমোচ্ছে। সে বলল, ওকে জাগিয়ে দাও।

—থাক না। ঘুমোচ্ছে ঘুমোক। সমুদ্রে যেটুকু সামান্য অন্ধকার ছিল, এখন আর তাও নেই। চারপাশের সমুদ্র বেশ শান্ত নিরীহ। এবং তখন ছোটবাবুর মনে হল, ঠিক নর্থ-ইস্ট-নর্থে একটা কালো অতিকায় পাহাড় সমুদ্রের বুক চিরে ক্রমান্বয়ে আকাশের গায়ে বড় হয়ে যাচ্ছে। পরিচ্ছন্ন আকাশের নিচে একটা কালো পাহাড় সমুদ্রের অতলে ডুবে আছে, আর দিগন্তের লাল আভার নানাবর্ণের কিরণ সেই গম্বুজ অথবা মিনারের মতো জেগে-ওঠা পাহাড়টাকে ঝলসে দিচ্ছিল।

পাহাড়টা দেখতে দেখতে তার খেয়াল নেই কখন সূর্য সমুদ্রে জেগে গেছে। কখন এনজিন-কশপ তার দলবল নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কাজের কথা নিচে, ওরা নিচে না নেমে সবাই জড়ো হচ্ছে বোট- ডেকে। ওরা খুব ভালো মানুষের মতো বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে আছে। আর্চি খুব দ্রুত সিঁড়ি ভাঙছে। স্যালি হিগিনসের দরজায় দাঁড়িয়ে হাঁকছে—ডেনজার এহেড স্যার।

ডেবিড ছোটবাবুকে বলল, কি ব্যাপার! আর্চি চিৎকার করছে কেন!

ছোটবাবু এবার পেছনে তাকাল। দেখল একদল জাহাজি আর্চির পেছনে পেছনে যাচ্ছে। সে তাদের ভেতর এনজিন-সারেঙকে দেখতে পেল না। এবং অন্য অনেকের ভেতর সে পাঁচ নম্বর সাব, ডেক- সারেঙকে দেখতে পেল। ডেক-সারেঙ আর্চির সঙ্গে গোপনে কি সব পরামর্শ করছে তখনও। ছোটবাবু বুঝতে পারছে, শেষ কামড় আর্চি এবার বুঝি বসাতে চায়।

ছোটবাবু আর দেরি করল না। সোজা নেমে পিছিলের দিকে ছুটতে থাকল। গ্যালিতে ঢুকে ভাণ্ডারীকে বলল, চাচা সারেঙ-সাব কোথায়?

ভাণ্ডারী রুটি বেলছিল। সে ব্যালনা দিয়ে সামান্য পিঠ চুলকে বলল, নিচে।

নিচে খোঁজ করেন। ছোটবাবু নিচে নেমে অবাক। ওর ঘরে কেউ নেই। সারেঙ-সাব একা বাংকে বসে আছেন। সে ডাকল, চাচা!

সারেঙ-সাব মুখ তুলে বললেন, বোস। কি ব্যাপার!

—ওরা জাহাজে মাস্তার দিয়েছে কেন?

—লতিফ রাতে পরী দেখেছে। জাহাজে রাতে পরী ঘুরে বেড়ায়।

—মিথ্যে কথা। তুমি কখনও দেখেছ?

—আমি কি করে দেখব!

—কে কে দেখেছে? ছোটবাবুর সংশয়ে প্রায় দম আটকে আসছিল। সারেঙ-সাব কত সহজে কথাটা বললেন! সারেঙ-সাব জানেন না এতে কি সব সাংঘাতিক সত্যাসত্য লুকিয়ে আছে। ওর দু-হাতে চুল ছিড়তে ইচ্ছে হচ্ছে মাথার। বনি, বনি প্রায় সে তোতলাতে থাকল। সারেঙ-সাব ছোটবাবুকে এত বিচলিত কখনও দেখেননি। তিনি বললেন, কি হয়েছে! তুই এমন করছিস কেন! বিড়বিড় করে কি সব বলছিস! বোস না।

সে বলল, আর কে দেখেছে?

—আরও সব কে কে দেখেছে!

—কখন?

—যখন সবাই ঘুমিয়ে থাকে, ডেকের ওপর লোকজন থাকে না তখন। পরীর মতো কেউ জাহাজে ঘুরে বেড়ায়। ইয়াসিন দেখেছে। এনজিন-কশপ বলছে, সেও দেখেছে। ভুতুড়ে

জাহাজ। ওরা কেউ থাকবে না জাহাজে। নেমে যাবে বলছে। পোর্ট এলেই নেমে যাবে।

ছোটবাবু বলল, আপনি এ-সব বিশ্বাস করেন চাচা! এবং তার এখন বলতে ইচ্ছে হচ্ছে, বনি খুব ছেলেমানুষ চাচা, সে তো পাগলের মতো কখনও কখনও মেয়ের পোশাকে রাতে আমার কেবিনে নেমে আসে। সতর্ক থেকেও সে দু'এক রাতে লোকজনের সামনে পড়েছে তাই বলে পরী হতে যাবে কেন! সত্যি বলছি এটা ভুতুড়ে জাহাজ নয় চাচা। অথচ সে একটা কথাও বলতে পারল না। সে প্রায় এবার গোপনে চাচার পায়ের কাছে হাঁটু গেড়ে বসল। বলল, সব বাজে কথা। সব মিথ্যে কথা।

—মিথ্যে নাও হতে পারে। আল্লার দুনিয়ায় জিন পরী থাকবে না সে কি করে হয়! তার জন্য ভয়ের কি আছে। বাড়িয়ালা তো মাঝে মাঝে পরী দেখতে পায়। কৈ তিনি তো ভয়ে জাহাজ থেকে নেমে যাচ্ছেন না।

—না না সব মিথ্যে কথা। সে প্রায় দু'হাত তুলে চিৎকার করতে থাকল। সব মিথ্যে কথা চাচা। জাহাজটার নামে অযথা দোষ চাপিয়ে সবাই নেমে যেতে চায়।

সারেঙ-সাব মুখে সামান্য সাদা পাতা ফেলে বললেন, তুই তো দেখেছিস। তুইও তো একবার রাতে কি দেখে পালিয়ে এসেছিলি।

—সব মনের ভুল চাচা। তারপর বলতে ইচ্ছে হল, সব আর্চির ষড়যন্ত্র। সে জ্যাককে ধরিয়ে দিতে চায়। কাপ্তানকে ছোট করতে চায়। কিন্তু সে কেবল ছটফট করতে থাকল। কিছুতেই সারেঙ-সাবকে বোঝাতে পারছে না—যদিও দেখে থাকে, সে বনি। জ্যাক রাতে মেয়ের পোশাকে জাহাজে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসে। তারপর যা হয়, সব রাগ বনির ওপর। এবারে মর। আমি কিচ্ছু জানি না। সবার সামনে তোমাকে আর্চি উলঙ্গ করে ছাড়বে। তারপর মনে হল সে এ-সব কি ভাবছে! সে বলল, আমি যাচ্ছি। আপনি বসুন। ওরা মনে হয় সবাই মিলে কাপ্তানকে অপমান করতে চায়!

সে আর দেরি করল না। পিছিলে উঠেই সে দেখতে পাচ্ছে, বোট-ডেকে সিঁড়ির মুখে আর্চি হাত নেড়ে জাহাজিদের কি সব বক্তৃতা করছে। জাহাজে মৈত্রদা নেই। তার রাগ তখন মৈত্রদার ওপর। তুমি ভীষণ স্বার্থ পর দাদা। এমন একটা সময়ে আমি কি করি! বনি কোথায়! সে কেবিনের ভেতরে বোধহয়। ওর এখন বাইরে বের হওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু সে কি দেখছে! বনি দরজা খুলে ছুটে ওপরে উঠে যাচ্ছে কেন! প্রায় লাফ দিয়ে সিঁড়ি ভেঙে বোট-ডেকে উঠে গেল। ডাকল, জ্যাক তুমি এখানে কেন! কিন্তু কার কথা কে শোনে। জ্যাক আর্চিকে বলছে, কেন চেঁচাচ্ছেন। বাবা ঘুমোচ্ছে। কি হয়েছে আপনাদের। জ্যাকের চোখ জ্বলছে। সারারাত জেগে কাপ্তান বোধহয় তবে সত্যি এখন ঘুমোচ্ছেন। কিন্তু কে কার কথা শুনছে! চেঁচামেচি জটলা, কেউ বলছে, পুড়িয়ে দাও সব। কেউ বলছে, আমরা দরকার হলে কাপ্তানকে জলে ফেলে দিতে পারি। চিফ-মেট, সেকেণ্ড মেট ডেভিড, রেডিও-অফিসার এবং অন্যসব অফিসার জাহাজের ব্রীজে উঠে এসেছে। ওরা বুঝতেই পারছে না এইসব জাহাজিরা এখন কি চায়। ওদের চোখ মুখ এমন 'রক্তাক্ত কেন। চোখ জ্বলছে সবার। আর্চির কথাবার্তা ওরা একেবারে বশংবদের মতো শুনছে। যত শুনছে তত আর্চি জুস পেয়ে যাচ্ছে। আর তখনই ক্ষিপ্ত বাঘের মতো, কাপ্তান দরজা খুলে বের হয়ে এসেছেন। বলছেন চিৎকার করে—হাই! এই উল্লুকের বাচ্চা, চেঁচাচ্ছ কেন? কি হয়েছে।

সঙ্গে সঙ্গে আর্চির গলা খাটো হয়ে গেল। আমতা আমতা করতে থাকল। আর্চি কি বলতে গেছে ফের এক ধমক। এবং সঙ্গে সঙ্গে আর্চি ঢোক গিলে যেন সব হজম করে নিল। যেন সে কত পবিত্র ইচ্ছাতে জাহাজের এত ওপরে উঠে এসেছে। জাহাজের ভাল চায়, তার তো দায় নেই, তবু কাপ্তানের কথা ভেবে সে এতটা দায়িত্ব নিয়ে এখানে এসেছে। সে না এলে এরা সব জংলী নেটিভ ইণ্ডিয়ান অবিনয় আসামীরা এতক্ষণে জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিত। এমন সব বললে, কাপ্তান নিস্পৃহ গলায় বললেন, কি হয়েছে! তোমাদের জন্য একটু ঘুমোতে পারলাম না।—এই আর্চি এই চিফমেট কি বলছে ওরা!

চিফ-মেট বলল, বুঝতে পারছি না স্যার।

—তবে আছ কি করতে? যত সব হতভাগার দল!

এবং কাপ্তানকে দেখে সবাই কিছুক্ষণ একেবারে চুপ মেরে গিয়েছিল। কোন কথা বলছে না। বাড়িআলা বলতে! ভেতরে ভয় ষোল আনা। এনজিন-কশপ তবু একপা এগিয়ে গিয়েছিল কিছু বলবে। আর তখনই চিফ-মেট তড়তড় করে নিচে নেমে একেবারে সারেঙের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল, কি, কি বলছে ওরা?

এনজিন-সারেঙ হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এসেছেন। এতটা হবে তিনি বুঝতে পারেননি। ওদের দৌড় আর্চি অথবা চিফ-মেট পর্যন্ত। কিন্তু তিনি ভাবতে পারেন নি একেবারে খোদ বাড়িআলার কেবিনে গিয়ে হামলা করবে। তিনি এক ধমক লাগালেন। বললেন, এনজিন-কশপ আমি কী মরে গেছি। তিনি আর্চির দিকে তাকাতেই বুঝলেন আর্চি ওর কথা একদম পছন্দ করছে না। আর্চিকে তিনি বলতে পারতেন, জী সাব, জাহাজে এনজিন-কশপ কে! আমি থাকতে সে আসে কেন! সে ঘোড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাচ্ছে কেন! কিন্তু তিনি বুঝতে পারছেন আর্চির মতলব ভাল না। কি বলবেন এনজিন-কশপকে মুহূর্তে গুলিয়ে ফেললেন।

আর্চি তখন বলল, স্যার এরা কি বলছে শুনুন।

কাপ্তান এখনও স্লিপিং গাউন পরে আছেন। প্রায় আলখেল্লার মতো দেখতে! সাদা চুল। চোখে তাড়াতাড়ি চশমা দিতে ভুলে গেছেন। নিচে যারা যারা দাঁড়িয়ে আছে সবাইকে তিনি ঠিক চিনতে পারছেন না। চিফ-মেট দাঁড়িয়ে আছে—কি সব বলছে। তিনি তার একবর্ণ শুনতে পাচ্ছেন না। জ্যাক একপাশে দাঁড়িয়ে সব দেখছে। ডেবিড বিড়বিড় করে বকছিল, ছোটবাবু পরী, হোয়াট পরী!

এত দুঃখেও ডেবিডের কথায় ছোটবাবুর হাসি পাচ্ছিল। আর সে দেখছে তখন সেই অখণ্ড মেঘের পাহাড় এসে সুউচ্চ পর্বতমালার মতো সমুদ্রে বড় হয়ে যাচ্ছে। নর্থ-ইস্ট-নর্থে আর আকাশ দেখা যাচ্ছে না। এত বড় সুউচ্চ পর্বতমালা মনে হয় ক্রমে সমুদ্র আকাশ এবং ছোট্ট অসহায় জাহাজটাকে সহজেই ঢেকে দেবে। রেডিও-অফিসার কেন যে এখনও দাঁড়িয়ে আছে! অথবা এ জাহাজের নেভিগেটার ডেবিড, চিফ-মেট সবাই এখানে দাঁড়িয়ে এমন একটা বিদ্রোহের ভেতর চুপ মেরে গেছে কেন? সমুদ্রে এত বড় বড় সব পাহাড়শ্রেণী—কোথাও তার মাথা বরফে ঢাকা আবার কোথাও নীলবর্ণের সব পাইনের মতো গভীর অন্ধকার যেন একটা তাড়কা-রাক্ষসীর মতো আকাশের ওপর দিয়ে ভেসে আসছে। কেউ লক্ষ্যই করছে না ওটা কি। মেঘের এমন বর্ণমালা সে যেন ডাঙায় কোনদিন দেখেনি। প্রচণ্ড গরমে সমুদ্র মরুভূমির মতো তেতে উঠছে। আর চিফ-মেট তখন বলছে, পরী, হোয়াট পরী! পাঁচ-নম্বরকে বলতে যাবে, হোয়াট পরী তখন সাবাস নেবার জন্য এগিয়ে যাচ্ছে ডেক-সারেঙ। সে চেঁচিয়ে বলছে—ওম্যান–ঘোস্ট স্যার। ওম্যান-ঘোস্ট সিন। এভরি নাইট ওম্যান-ঘোস্ট ওয়াক। উই স স্যার। উই স।

ছোটবাবু সোজা দাঁড়িয়ে আছে। সে লক্ষ্য রাখছে জ্যাক তখন কোথায়। আর্চি জ্যাককে কিভাবে দেখছে। কাপ্তান ঝুঁকে আছেন নিচে। চিফ-মেট ওপরে উঠে গিয়ে না বললে তিনি বোধ হয় কিছু বুঝতে পারছেন না। তিনি কেবল মাঝে মাঝে আর্চির দিকে আড়চোখে তাকাচ্ছেন। আর তিনি লক্ষ্য রাখছেন চিফ কতক্ষণে ওপরে উঠে আসবে। আর্চির কথা তিনি একদম শুনতে চাইছেন না। তিনি চিৎকার করে উঠলেন—হাই।

সঙ্গে সঙ্গে চিফ-মেট লাফিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেল। বলল, ওম্যান ঘোস্ট।

সঙ্গে সঙ্গে স্যালি হিগিনসের মুখ কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেল। এবং খুব সহজেই তিনি সেই ফ্যাকাশে মুখ লুকিয়ে ফেলার জন্য হা হা করে হেসে উঠলেন। দু'পাটি বাঁধান দাঁত নেই বলে হাসির শব্দ তেমন তীব্র হল না। তিনি তাড়াতাড়ি ঢুকে গেলেন কেবিনে এবং দাঁত আর চশমা পরে ফের ফিরে এসে বললেন, কি হয়েছে তাতে! আমিও তো দেখি। দুর্বল মুহূর্তে

মানুষ এসব দেখে থাকে।

আর্চি বলল, স্যার আপনার দেখা ওদের দেখা তফাত আছে না!

কাপ্তান বললেন, আর্চি, তোমরা এখন যেতে পার।

আর্চি চিৎকার করে বলল, আপনারা যান। কিন্তু একজনও নড়ছে না দেখে বলল, কেউ যাচ্ছে না স্যার।

স্যালি হিগিনস ওপর থেকে ফের ঝুঁকে পড়লেন—হাই। ওদের যেতে বল।

স্যালি হিগিনস দু'জন সারেঙকে উদ্দেশ করে কথাটা বললেন।

ডেক-সারেঙ মাথা নিচু করে রাখল। যেন স্যালি হিগিনসের এক বর্ণ ইংরেজী সে বুঝতে পারছে না। এই যে ছোটবাবু সামনে কি চুপচাপ ভাল মানুষ। সারেঙ ফের বলল, আপনারা এখন কি করবেন ভেবে দেখুন। বাড়িআলা আপনাদের যেতে বলছেন।

ওরা একসঙ্গে হাত তুলে বলল, আমাদের কি হবে জেনে নিন।

স্যালি হিগিনস কেমন ভেতরে ভেতরে এই সব মানুষের জেদ দেখে মুষড়ে পড়েন। জ্যাককে হঠাৎ ধমকে উঠলেন, তোমার এখানে কি? যাও কেবিনে যাও।

আর্চি খুব খাটো গলায় সামান্য শিস দিচ্ছে। জ্যাক ফাঁপড়ে পড়ে গেল। জ্যাক নেমে গেলে সে খুব ভাল মানুষের মতো বলল, আপনারা কী! সামান্য পরী দেখে জাহাজ ছেড়ে পালাতে চাইছেন! ছি ছি!

ওরা বলল, হ্যাঁ সাব জাহাজ ভাল না। অনেক সয়েছি। মৈত্র মশায় পাগল হয়ে গেল। সমুদ্রে অগ্নিকান্ড, বিষাক্ত পাখিদের আক্রমণ, রাতে জাহাজে পরী ঘুরে বেড়ায়। আমাদের কপালে আর কি আছে জানি না। হুজুর এবারে আমরা ক্ষেমা চাই।

আর্চি চোখ ট্যারা করে বলল, জাহাজে মেয়েভূত কি করে থাকবে! আর একটা মেয়ে থাকলেও না হয় কথা ছিল। জাহাজে মেয়ে থাকবে কি করে? হুঁ। কার্গো-শিপ, কি বলেন স্যার। সে স্যালি হিগিনসের মুখের ওপর কথাটা বলে ভারি অন্যায় করে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলল, অ্যাবসার্ড। জাহাজে মেয়ে ভাবা যায় না। সে হা হা করে হেসে উঠল। জাহাজে মেয়ে ভাবা যায় না।

স্যালি হিগিনস কেমন সব সাহস হারিয়ে ফেলছেন। তিনি ফ্যাসফেসে গলায় আর্চিকে সমর্থন জানালেন। সত্যি কার্গো-শিপে মেয়ে ভাবা যায় না।

—তা হলে স্যার! এটা একটা কথা! ওরা বলবে আর আমরা বিশ্বাস করব। এরা জংলী অসভ্য অজ্ঞ, এদের ভুল ভেঙে দেয়া দরকার না স্যার।

স্যালি হিগিনস ভেতরে ভেতরে ছটফট করছেন। গুরুতর সব কথাবার্তা। আর্চি তার স্বপক্ষে কথা বলছে। আর্চির ওপর সংশয় এবং আর্চিকে তিনি উল্লুকের বাচ্চা বলে অসম্মান করেছেন! তিনি নিজের কাছে কৈফিয়ত দেবার মতো বললেন, আমার মাথার ঠিক নেই আর্চি। ওদের বুঝিয়ে তুমি বিদায় কর। যেন এটুকু বলে তিনি এবার ভেতরে ঢুকে যাবেন। এবং ফের ঘুমোবেন।

আর্চির বলার ইচ্ছে হল, বাঞ্চোত এবার তুমি বেশ ঘায়েল হয়েছ। তোমাকে নিয়ে আমি দ্যাখো না কি খেলাটা খেলছি, উল্লুকের বাচ্চা শয়তান তুমি। সব গোপন রেখেছ। তোমার বজ্জাতি বের করে দিচ্ছি। সে তারপর পরম পুরুষের মতো চোখ-মুখ করে রাখল কিছুক্ষণ। কিভাবে এখন এগোবে, সামান্য চোখ বুজে যেন ঠিক করে নিচ্ছে। সে তারপর খুব বিজ্ঞজনের মতো জাহাজিদের বলল, আপনারা এবার সবাই দেশে ফিরতে চাইছেন। আপনাদের এতদিন একনাগাড়ে সমুদ্র সফর আর ভাল লাগছে না। আপনারা মেয়েমানুষ দেখতে ভালবাসেন। সবসময়—যেমন যে কোনো কাজের সময় মাথায় একটা মেয়েমানুষের ছবি থাকে...তাকে নিয়ে আপনারা স্বপ্ন দেখতে ভালবাসেন। কতরকমভাবে মেয়েমানুষ

চিবিয়ে খেতে আপনাদের ইচ্ছে হয়। ভেতরে রহস্যময় জ্বালা। সমুদ্রের একঘেয়েমীতে মেয়েমানুষের প্রতি সবারই লোভ ভীষণ। জাহাজে যদি পেয়ে যাই—আহা সুস্বাদু খাবারের মতো, কাজেই মাঝে মাঝে চোখের ওপর ওদের ছায়া দেখবেন না তো একটা বুড়ো শয়তানের মুখ দেখবেন আপনারা! সে মাঝে মাঝে খারাপ কথায় এলে আর্চি আমাদের দিয়ে আরম্ভ করছে। সে বলছে এই যে আমরা কবে থেকে ভাবছি দেশে এবার হয়তো ফিরব অথচ জাহাজটা কিছুতেই মুখ ফেরাচ্ছে না, আমরা ভেতরে ভেতরে মরিয়া হয়ে উঠছি। জাহাজে আগুন লাগিয়ে দিতে ইচ্ছে হচ্ছে এটা খুব দোষের না। খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা নাবিক আমাদের একটা ইজ্জত আছে। আমরা খুশিমতো কিছু করতে পারি না। সে একটু থামল। একনাগাড়ে বলতে বলতে সে একবার দেখে নিল কে কোথায় আছে। জ্যাক কোথায়! জ্যাক নেই। কেবিনে নেমে গেছে। ওর দরজা খোলা। এবং সে বুঝতে পারছে জ্যাক নিচে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সব শুনছে। ওপাশে দৈত্যটা দাঁড়িয়ে আছে। মাথা নিচু করে রেখেছে। বয়লার স্যুট পরেছে বলে ওর শরীর আরো বেশি মজবুত দেখাচ্ছে। আর্চি ছোটবাবুর মুখ দেখতে পাচ্ছে না। সে আরও ক্ষেপে গেল।—এই শয়তানের বাচ্চা তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে কেন! কাজ নেই! এটা তোমার বাবার জাহাজ, কাজ না করে ঘুরে বেড়াবে!

ছোটবাবু চোখ তুলে তাকাল। শয়তানের বাচ্চা সে ছাড়া আর কে হবে। আর্চি দুলে দুলে কথা বলছে। আর্চি যেন বাঘের মুখোশ পরে আছে। আর্চি ওপরে দাঁড়িয়ে রিঙের খেলা দেখাচ্ছে এখন। ছোটবাবু একটা কথা বলতে পারছে না। আর্চিকে এভাবে দেখলে ঠিক একটা জানোয়ার না ভেবে পারা যাচ্ছে না। কি অসীম ধূর্ত এবং একজন সাধারণ নাবিকের মতো স্যালি হিগিনস চিফ-মেটের পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। আর্চির মুখের ওপর কারো কথা বলার সাহস নেই। আর্চি তেমনি খাঁচায় পোরা বাঘের মতো দুলে দুলে একবার সামনে একবার পেছনে হেঁটে যাচ্ছে। ছোটবাবু এখানে আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। মাথায় সেই ঘন্টা আবার বাজছে। সেই ঘন্টার শব্দ, যেন মাথার ভেতরে অজস্র বুদবুদ উঠছে শব্দের তরঙ্গে। আর তেমনি মাথার ওপর সেই মহাকায় রাশি রাশি মেঘ ছড়িয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। গাছের শেকড়ের মতো ফালা ফালা বিদ্যুতের ছটা আকাশের গায়ে ফুটে উঠে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। কড় কড় শব্দ—প্রায় বজ্রপাতের সামিল। সবাই সহসা সেই বজ্রপাতের শব্দে লক্ষ্য করল সমুদ্রে ভয়ংকর ঘন অন্ধকার। প্রায় যেন আকাশ আর সুমদ্র গভীর অন্ধকারে ক্রমে এক হয়ে যাচ্ছে। জাহাজের সব আলো আবার ডেকে জ্বালিয়ে দিতে হবে। দিনের এই মধ্যপ্রহরে এটা যে কি হয়ে যাচ্ছে—কেউ একদম পাত্তা দিচ্ছে না। আর্চি কি বলে শেষ করবে বক্তৃতাটা তার জন্য সবাই অপেক্ষা করছে। ছোটবাবু শেষ পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে পারল না। কারণ আর্চি প্রবল প্রতাপান্বিত মানুষ হয়ে যাচ্ছে ফের। যেমন জাহাজে উঠে আর্চিকে দেখলে ভয়ে সংশয়ে বুক গলা শুকিয়ে যেত এখনও তেমনি। ছোটবাবু সন্তর্পণে নেমে গেল উইনচে। উইনচে নেমে একটা বড় হাতুড়িতে দমাদম ঘা মারতে থাকল। সব ভেঙে চুরে সব মিথ্যা সব মিথ্যা বানানো স্যালি হিগিনস, আপনি কেন এত বড় একটা ট্রাপে পড়ে যাচ্ছেন, আর্টি কেন আপনার দুর্বলতার সুযোগ নিচ্ছে—আপনি স্যালি হিগিনস বুঝতে পারছেন না আর্চি কি চায়! বনি তুমি, তুমি এর জন্য দায়ী। তোমাকে আমাদের জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া ছাড়া আর বুঝি কোনো উপায় থাকবে না। আর তার কি যে হয়ে যায়—না না বনিকে কেন জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলা হবে! স্যালি হিগিনস আপনি আর্চির ট্র্যাপে পড়বেন না। আর্চি শেষে কি বলবে আমি জানি। আমি আমি বার বার এই আমির ভেতর হাঁটু মুড়ে কেমন একদল আমি তার মাথার ভেতর কেবল বুদবুদ তুলে ছত্রখান হয়ে যাচ্ছে।

তখনই আর্চি চিৎকার করে বলছে, ঐ দ্যাখুন স্যার—ঐ যে বসে আছে। দেখতে পাচ্ছেন ঐ দেখুন আবার সে ফিরে এসেছে। শয়তানটা সবকিছুর মূলে। ঐ শয়তান পাখিটা। আপনারা বিশ্বাস করুন যতদিন নচ্ছার পাখিটা ছিল না, জাহাজের সব ঠিক-ঠাক ছিল। পাখিটা উড়ে আসার পর থেকেই জাহাজটা শয়তানের পাল্লায় পড়ে গেছে। পাখিটা আসলে পাখি না স্যার। পাখিটা আমার ধারণা ক্যাপ্টেন লুকেনারের প্রেতাত্মা।

একটু থেমে আর্চি ফের বলল, – বুঝলেন স্যার—ডেনজার এহেড। ওর মতলব ভাল না। ওর জন্য আমাদের সামনে যত বিপদ। জাহাজিরা কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে থাকে—হওয়া স্বাভাবিক। এখন আমাদের এই সংস্কারকে না মেনে উপায় নেই। আমাদের কি করা উচিত বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই। ওটাকে সরিয়ে দিতে না পারলে জাহাজের বিপদ কাটবে না। আমি বলছি স্যার আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি ওটা সরিয়ে দিতে পারলে আপনার জাহাজে কেউ আর পরী দেখবে না। কেউ আত্মহত্যা করবে না, বিষাক্ত পাখিদের আক্রমণ ঘটবে না, সমুদ্রে অগ্নিকান্ড দেখা যাবে না—সবাই ভাবছে পাখিটা এভাবে জাহাজের পেছন নিয়েছে কেন! আপনারা বলুন—কে আছেন বলতে পারেন, সে প্রায় কথা বলতে বলতে মুখে ফেনা তুলে ফেলছে এবং এভাবে যেন গলা চিরে যাবে।

—আপনারা বলুন কে কবে দেখেছেন এভাবে একটা অ্যালবাট্রস দিন নেই রাত নেই মাসের পর মাস জাহাজের পেছনে উড়ে বেড়ায়। একে যদি আপনারা ভয়ে কিছু করতে সাহস না পান আমি আমি এতগুলো মানুষের জন্য নিজের জীবন বিপন্ন করতে রাজী আছি।

এবং সঙ্গে সঙ্গে সব জাহাজিরা আর্চির শেষ কথা এবং কোনরকমে প্রায় সব কথার কিছু কিছু অর্থ ধরতে পেরে বুঝতে পেরেছে আর্চি তাদের শুভাশুভের জন্য আত্মত্যাগের বাসনা জানিয়েছে। সবাই প্রায় জয়ধ্বনি দেবার মতো থ্রি চিয়ার্স ফর আর্চি এবং সেই শব্দমালার ভেতর যেন একটা কঠিন নিয়তি থেকে পরিত্রাণের চেষ্টা করছে বারবার। তারা এখন সবাই আর্চির জন্য সহজেই প্রাণ বিপন্ন করতে পারে।

আর্চি একটু দম নিয়ে বলল, তাহলে আপনারা যেতে পারেন। সবাই সঙ্গে সঙ্গে জটলা থেকে বের হয়ে আসছিল এবং ঠিক বোট-ডেক থেকে নেমে যাবে তখনই ফের চিৎকার, আমি শুধু হাতে লড়ব কি করে! এতো আর একটা সাধারণ পাখি নয়। দেখুন কেমন জুলজুল করে তাকাচ্ছে। দি ডেভিল। দি সী ডেভিল। লেট হার ডাই। সে হাত তুলে মেন-মাস্টের ওপর নিশ্চিন্তে বসে থাকা পাখিটার দিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করার সময় খুব সতর্ক গলায় বলল, স্যার।

স্যালি হিগিনস আর্চির অশুভ মুখের দিকে তাকালেন।

আর্চি স্যালি হিগিনসের কাছে গিয়ে খুব নিচু গলায় বলল, —স্যার, জ্যাককে সাবধানে রাখবেন। খুব বেঁচে গেছে জ্যাক। ওরা জ্যাককে সন্দেহ করছিল। আপনি গোপনে একটা পাপ কাজ জাহাজে চালিয়ে যাচ্ছেন। সব ঘুরিয়ে দিলাম। বন্দুকটা দেবেন। ওটাকে না মেরে ফেললে হারামজাদারা স্বস্তি পাবে না। অল ইন্ডিয়ান ডগস লাইক টু কিল দ্য বার্ড। পাখিটাকে মেরে ফেললে যদি আপদ দূর হয় ক্ষতি কি স্যার। জাহাজ থেকে সংশয় যত সরিয়ে দিতে পারেন ততই মঙ্গল।

স্যালি হিগিনস, চিফ-মেট পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে। স্যালি হিগিনস আর একটা কথা বলতে পারছেন না। তাঁর সত্তাসুদ্ধ টান দিয়েছে আর্চি। চিফ-মেট নিচে নেমে গেল। এমন হবে সে যেন জানত। বারবার সে বলেছে বনিকে রাখা ঠিক হবে না, সে বড় হয়ে যাচ্ছে। এবং আর্চির চোখে মুখে অতীব লোভ। আর্চি সেয়ানা অথচ খুব সৎ মানুষের মতো এখন ক্যাপ্টেনের সব যেন উপকার করে যাচ্ছে! আর্চিকে সাহস নেই আর তিনি ঘাঁটাতে পারেন। যেন ঘাঁটালেই আর্চি চিৎকার করে উঠবে, ইফ ইউ লোয়ার দ্য বোট, ইউ উইল গেট দিস হারপুন ইন ইউর বেলি। সুতরাং স্যালি হিগিনসকে আর্চি যা যা বলবে সব সুড়সুড় করে মেনে নিতে হবে। ঘাঁটালেই জ্যাকের ছদ্মবেশ খুলে দেবে আর্চি।

এখন স্যালি হিগিনস আর আর্চি। আর্চি দু'পায়ের ওপর ভর করে বেশ শক্ত চোখে মুখে দেখছে স্যালি হিগিনসকে। স্যালি হিগিনস দূরবর্তী আকাশে যেন কিছু দেখতে পাচ্ছেন। অজস্র বিদ্যুতের ছটা এবং স্তব্ধ সমুদ্র। প্রলয়ঙ্কর ঝড় ওঠার আগে সবকিছু মন্থর স্থির। বাতাস একটুকু বইছে না। জাহাজিরা সবাই কাজে লেগে গেছে ফের। অ্যালবাট্রস পাখিটা ঝড়ের পূর্বাভাস বোধহয় নাকে শুঁকে টের পাচ্ছে। মাঝে মাঝে সে পাখা ছড়িয়ে উড়ে যাবে ভাবছিল

আবার কি ভেবে ঠোঁট গুজে দিচ্ছে। আর্চি বন্দুক না নিয়ে নামবে না। ঘোর অন্ধকারে জাহাজ সমুদ্র মানুষজন সব ডুবে যাচ্ছে। গুমগুম শব্দ উঠছে সমুদ্রে। আর্চি সেই মৃদু গলায়, যেন কাক-পক্ষী টের না পায় একেবারে অনুগত মানুষের মতো বলল, স্যার ওরা বলছে জাহাজটা দোষ পেয়েছে। সেই এক কথা সবার মুখে। অশুভ প্রভাবে জাহাজ পড়ে গেছে। কে বা কারা যে ছড়িয়ে দিচ্ছে সব গুজব!

তিনি নিজে এক রকমভাবে এ-সব বিশ্বাস করতে ভালবাসেন, কিন্তু আর্চি এ-সব নিজের কাজে লাগাচ্ছে। অন্যসময় হলে পাছায় লাথি মেরে এখান থেকে নামিয়ে দিতেন—ইউ লোফার, হিপোক্র্যাট, দ্য আগলিয়েস্ট ক্রীচার...এখন তিনি যেন শুধু কোয়ার্টার-মাস্টারকে খবর পাঠাতে পারেন—জাহাজে হিবিং-লাইন বেঁধে দিতে বল, বোট-ডেকে টুইন-ডেকে যেখানে জাহাজিরা হেঁটে যায় হিবিং-লাইন বেঁধে দিতে বল। টানেল-পথ খুলে দিতে বল। ক্রমে যা বুঝতে পারছি ঝড় মহাপ্রলয়ের মতো নেমে আসছে সমুদ্রে। তিনি ডাকলেন, সেকেন্ড!

—ইয়েস স্যার।

—কাম ইন

আর্চি, স্যালি হিগিনসোর সঙ্গে কেবিনের ভেতর ঢুকে গেল।

তিনি একটা কথা বললেন না। লকারের দরজা খুলে ধরলেন। আর্চি একেবারে হামলে পড়ল বন্দুকটার ওপর। তারপর বের করে বাঁটে দু'টো থাপ্পড় মেরে ওর নল ট্রিগার সব দেখেশুনে যখন মনে হচ্ছে না নকল কিছু ধরিয়ে দিচ্ছেন না তখন সে ভাবল বেশ সহজেই এখন নেমে যাওয়া যায়। আর কথা বলার তেমন কিছু দরকারও নেই। আর তখনই কেন জানি মনে হল হাজার হোক জাহাজের সর্বময় কর্তা, দু'দন্ড দাঁড়িয়ে অভয় দিলে বুড়োটা সাহস পাবে। সে বলল, স্যার।

স্যালি হিগিনস কিছু খুঁজছেন মনে হচ্ছে।

সে আবার বলল, স্যার।

স্যালি হিগিনস বললেন, ক্যারি অন ম্যান।

সে বলল, স্যার, আমি বলেছি জ্যাককে খুব ছোটবেলা থেকে দেখছি। জ্যাক জ্যাক। কোনো সংশয় থাকা ঠিক না।

স্যালি হিগিনস বললেন, ওরা বিশ্বাস করে!

—হ্যাঁ স্যার। ওরা ভয় পেয়েছে বড়-টিন্ডালের আত্মহত্যায়। পাগল হয়ে গেছিল তো! স্যালি হিগিনস আবার কিছু খুঁজছেন। তিনি চাইছেন ধূর্ত লোকটা এটা নিয়ে এক্ষুনি বের হয়ে যাক। পোর্ট-মেলবোর্ণ পর্যন্ত ওর হাতে থাকা ছাড়া উপায় নেই। গোপন পাপ কাজ, গোপনে জাহাজে মেয়ে তুলে আনা! নিজের ওপর তিনি সব বিশ্বাস এ-ভাবে হারিয়ে ফেলছেন কেন? কেন বারবার মনে হচ্ছে এই গোপনীয়তা তাঁকে এক কঠিন শাস্তির ভেতর ফেলে দিয়েছে। জাহাজ স্ক্র্যাপ করার কথা ওঠার সময় দু' দু'বার যেভাবে সব সাংঘাতিক ঘটনা ঘটেছে ওর বেলায় কি সে ঘটনা আরও বীভৎস আকার নেবে! এই যে বন্দুকটা হাতে নিয়ে আর্চি লাফিয়ে লাফিয়ে নেমে গেল, নিচে নেমে সে কি এক্ষুনি প্রথম পাখিটা পরে ছোটবাবু এবং পরে সে নিজে, চিফ-মেট সবাইকে হত্যা করে জাহাজে সে আর...আর....পাইরেট ক্যাপ্টেন লুকেনারের মতো পাইরেট...জলদস্যু... সে আর...। তিনি চিৎকার করে উঠলেন—বনি বনি।

বনি তখন প্রায় মূর্ছা যাবার মতো, সে দরজায় দাঁড়িয়ে দেখেছিল আর্চি খুব আয়াসে নেমে আসছে সিঁড়ি ধরে। হাতে বন্দুক। যেন সে শিকারে যাচ্ছে। চোখে মুখে ভারী উদাসীনতা। তাকে দেখেও যেন চিনতে পারছে না। এবং তখনই ছোটবাবুর অসহায় মুখ, ছোটবাবু

কোথায়, সে ছোটবাবুর কাছে ছুটে যাবে ভাবছিল। দাঁড়িয়ে থাকলে সে মুর্ছা যাবে আর ঠিক সেই মুহূর্তে মনে হল বাবা তাকে ডাকছেন। সে ভেতরে গেলে দেখল, বাবা উদ্‌ভ্রান্তের মতো লকার থেকে টেনে নামাচ্ছেন।—সব পোশাক, বই ডায়েরি যা কিছু তাঁর প্রিয় সব ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছেন নিচে। আর বলছেন, কোথায় রাখলাম বনি।

বনির মাথার ঠিক নেই। কতদূরে গেছে সে শয়তানটা! বাবার এ-সব ছুঁড়ে ফেলার চেয়ে বাবা কেন বন্দুকটা দিতে গেল জানা বেশি দরকার।—কেন কেন বাবা তুমি ওটা হাতছাড়া করলে, পারলে বনি আঁচড়ে খামচে বাবার পোশাক ছিঁড়ে ফেলবে। স্যালি হিগিনস মেয়ের আচরণে এতটুকু ক্ষুব্ধ হতে পারলেন না। কি খুঁজছিলেন ভুলে গেলেন। বনির মাথায় মুখ রেখে বললেন, নিয়ে গেল। আমাকে ভয় দেখিয়ে নিয়ে গেল। আর বনি তখন বলছিল, না না না, এটা বাবা আমি নিয়ে আসব। আমি নিয়ে আসব বাবা। যা হবার হবে বলে সে প্রায় বাবাকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিল, তারপর নিচে নেমে গেল।

আর্চির সামনে দু'হাত তুলে বনি বলল, আর্চি।

স্যালি হিগিনস পেছনে পেছনে ছুটে গেলেন। ধরে আনতে হবে। তিনি নিচে নেমে অত দ্রুত ছুটতে পারবেন কেন! বনি আর্চির সঙ্গে বোধহয় ধ্বস্তাধ্বস্তি শুরু করে দিয়েছে এতক্ষণে। কিন্তু নিচে নেমে অবাক। আর্চির বন্দুকটা জ্যাকের হাতে।

আর্চি বলল, ছেলেমানুষ। চাইল দিয়ে দিলাম স্যার। থাক ওর কেবিনে। জেদি ছেলে তো। বুঝিয়ে ঠিক আমি নেব। আপনাকে ভাবতে হবে না। সামান্য বন্ধুত্ব স্যার। সব ঠিক হয়ে যাবে।

স্যালি হিগিনস বললেন, জ্যাক তুমি ভারি অন্যায় করেছ।

জ্যাক একটা কথা বলল না। সে দৌড়ে বন্দুকটা লকারে রেখে আবার বের হলে দেখল বাবা ওপরে উঠে যাচ্ছেন। ওর সঙ্গে একটা কথা বলছেন না। আর্চি দাঁড়িয়ে আছে। আর্চি শিস দিচ্ছে। আর্চির কাছে যেতে সে আর সাহস পেল না। সে কোথায় যাবে এখন বুঝতে পারছিল না। বাবার কি হারিয়েছে, বাবার কাজে সাহায্য করলে সব রাগ বাবার পড়ে যাবে।

তখনই আর্চি ডাকল, জ্যাক।

জ্যাক থমকে দাঁড়ল।

—জ্যাক, বন্দুকটা খুব যত্ন করে রাখবে। কখন আবার দরকার হবে। দরকার মতো চেয়ে নেব। কাউকে দেবে না কিন্তু। তোমার কাছে রাখবে।

জ্যাক বলল, আচ্ছা।

আর্চি পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, আলবাট্রস পাখিটাকে তুমি খুব ভালবাসো?

জ্যাক বলল, হ্যাঁ।

—কিন্তু পাখিটাকে তো সরিয়ে দিতেই হবে। জাহাজিরা তা না হলে ক্ষেপে যাবে। জাহাজে মারদাঙ্গা আরম্ভ হলে কেউ তো রক্ষা পাবে না জ্যাক।

জ্যাক হাঁটতে থাকল।

আর্চি বলল, জ্যাক আকাশটা কী ভীষণ কালো হয়ে উঠেছে। এবং সঙ্গে সঙ্গে কড়কড় করে বজ্রপাতের শব্দ। ওরা দু'জনই সিঁড়ির নিচে দাঁড়িয়ে গেল। আর্চি এত কাছে এই প্রথম জ্যাকের—চুলের গন্ধ পর্যন্ত নাকে আসছে। নেশার মতো, পোশাক খুলে ফেললে মেয়েরা সব বড় নরম আর মসৃণ। ত্বকে আশ্চর্য প্রলোভন। হাতে এবং পায়ে অথবা জংঘায় সর্বত্র মেয়েটা ফুটে উঠছে। ফুটে উঠছে, পাপড়ি মেলে দিচ্ছে, পাপড়ি ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। বন্দুকটা সে যে-কোনো সময় নিয়ে নিতে পারবে। যেন অবুঝ মেয়ের মতো বন্দুকটা আগলে রাখছে জ্যাক। যাক আসল কাজটা তার হয়ে গেল। জ্যাকের কেবিনে ঢোকার একটা

ছাড়পত্র রেখে দিল সে। যে-কোনো সময় সে সুযোগ পেলেই এখন জ্যাকের কেবিনে ঢুকে যেতে পারবে। এবং দুরন্ত ঘোড়ার মতো ফাঁকা মাঠ পেলেই ছুটবে। এখন শুধু সময় এবং সুযোগের প্রতীক্ষা। ভাল ভাল কথা, জ্যাকের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং যেন কত গভীর তার এই মমতাবোধ, জ্যাক আর জাহাজে একা নয়, সে পাশে থাকছে—এত সহজে এমন একটা সুযোগ চলে আসবে বুঝতে পারেনি। এখন স্বভাবে বেশ সে সজ্জন তার কোনো স্পৃহা নেই একেবারে সে জ্যাকের বশংবদ যেন জ্যাক বললে মাস্তুলের ডগায় উঠে সমুদ্রে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। সে বলল, জ্যাক তুমি আমাকে ভয় পাও কেন বলত?

জ্যাক বলল, কোথায়?

—আমার কেবিনে তুমি আস না। নিজের কেবিন ছেড়ে কোথাও যাও না। সবার কেবিনে যাবে সবার সঙ্গে মেলামেশা দরকার। জাহাজে রাতে বের হতে নেই। যেন এখন আর্চি কথা বলছে না, ছোটবাবু কথা বলছে। গলার স্বরে কি কপট অভিনয়।

জ্যাক বলল, যাব।

—কখন জ্যাক?

—যাব। সময় হলেই যাব।

—এস। কোনো ভয় নেই। আরে আমি ত মানুষ। তুমি একজন সাধারণ মানুষকে ভয় পাবে কেন। মুখে দাগফাগ হয়েছে সব সেরে যাবে।

জ্যাক আর কোনও কথা বলল না। আর্চির সঙ্গে সে এবার ওপরে উঠে যেতে থাকল সিঁড়ি বেয়ে।

আর্চি দেখল তখন আকাশের ফালা ফালা সব সাদা কালো মেঘেরা দজ্জাল মেয়েমানুষের মতো ছটোছুটি করছে। আর যা হয়ে থাকে সমুদ্রে সেই গুমগুম আওয়াজ ক্রমে এগিয়ে আসছে। লেডি অ্যালবাট্রস ওর ভারী হাতের কাছে এখন। সে যে কোনো সময় তাকে বন্দুকে নামিয়ে আনতে পারে। এখন নামিয়ে না এনে ভালই করেছে। যেন নামিয়ে আনলেই স্যালি হিগিনস বলতেন বন্দুকটা আমার কেবিনে রেখে দেবে আর্চি। স্যালি হিগিনসের চেয়ে এই চপলমতি বালিকা অনেকটা তার স্বপক্ষে কাজ দেবে। সে যা চায়, দরজা খুলে বলবে জ্যাক শিগগির বন্দুকটা দাও। না দিলে লোয়ার দ্য বোট আই উইল গেট দিস হারপুন ইন ইউর বেলি।

তখনই জাহাজে সামাল সামাল রব উঠছে। চোং মুখে সারেং হেঁকে যাচ্ছে—দরিয়া ক্ষেপে গেছে মিঞারা। বুঝি কেয়ামতের দিন এসে গেছে। ডেক-ঠিন্ডাল তখন সব লম্বা হিবিং-লাইন ছুঁড়ে দিচ্ছে ডেকে। অন্ধকারে আর কিছু দেখা যাচ্ছে না।

যে যার মতো এখন ডেক ছেড়ে চলে যাচ্ছে। পোর্ট-হোল বন্ধ করে দেয়া হচ্ছে। ঝড় ওঠার সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র ক্ষেপে গেল। অতিকায় সব ঢেউ ক্রমে জাহাজটাকে দোলনার মতো দোলাতে শুরু করে দিল। কখনও মনে হচ্ছে জাহাজটা দুলে দুলে সমুদ্রে মরণ নাচন নাচছে। কখনও ঢেউ ছড়িয়ে যাচ্ছে ডেকে। ডেক ভাসিয়ে দিয়ে সোঁ সোঁ শব্দে জলরাশি নিমেষে কোথায় উধাও হয়ে যাচ্ছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি নামছে। এলোমেলো বাতাস উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে সব। দিনের বেলাতে আলো জ্বেলে ঘরে ঘরে যেখানে যা কিছু আলগা সব লকারে পুরে দেওয়া হচ্ছে। গ্যালির দরজা বন্ধ করে দিয়েছে ভান্ডারী। প্রপেলার মাঝে মাঝে জলের নিচ থেকে ওপরে উঠে যাচ্ছে। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালার ভেতর ডেকচি হাঁড়ি কড়াই হাতাখুন্তি সব ছিটকে কোথায় কোনটা চলে যাচ্ছে, এক হাতে সামলাতে পারছে না ভান্ডারী। চারপাশে কিছু দেখা যাচ্ছে না। আকাশটা ভীষণ ছোট হয়ে গেছে। যেন কালো বোরখায় ঢেকে দিয়েছে কেউ সমুদ্র। তার নিচে জাহাজটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলার চেষ্টা করছে। আর চরাত চরাত অজস্র কাঁচের জার ভেঙে যাবার মতো আকাশে বজ্রপাতের শব্দ। যে কোনো মুহূর্তে এখন জাহাজে আগুন লেগে যেতে পারে। স্যালি হিগিনস হাতের কাছে ঠিক তখনই পেয়ে গেলেন—তিনি পাতার পর পাতা উল্টে এক জায়গায় বড় বড় অক্ষরে দেখতে পেলেন—দাউ শ্যালট ফিয়ার

দ্য লর্ড দাই গড অ্যান্ড শ্যা সার্ভ হিম ওনলি।

তারপর এক জায়গায় আরও বড় বড় অক্ষরে দেখতে পেলেন, যেন আকাশের বুকে বিদ্যুতের ছটায় কেউ লিখে দিয়ে যাচ্ছে—বি কনভারটেড টু মি, অ্যান্ড ইউ শ্যাল বি সেভড। মুহূর্তে শরীরের সব জড়তা, ভয় কেটে গেল। তিনি ঝড়ের ভেতর সিঁড়ি ভেঙে জাহাজের ওপরে উঠে যেতে থাকলেন। তাঁর এখন সবাইকে অভয় দেয়া দরকার। বিশেষ করে সিউল-ব্যাংককে। সিউল-ব্যাংক ঝড়ের সমুদ্রে এখন যে কোনো মুহূর্তে পথ হারিয়ে ফেলতে পারে।

লেডি-অ্যালবাট্রসের ভারী আনন্দ। ঝড়ের ভেতর পাখা ছেড়ে দিলে খুশিমতো সে আকাশের নক্ষত্রমালার কাছে যেন পৌঁছে যেতে পারবে। সে এবার পাখা মেলে দিল বাতাসে।

স্যালি হিগিনস মাংকি-আয়ল্যান্ডে দাঁড়িয়ে তখন দেখছেন, প্রবল বেগে তরঙ্গমালা কালো অক্ষত প্রাচীরের মতো এগিয়ে আসছে। সাদা ফেনা। সমুদ্রে যেন বরফের পাহাড় জমে উঠছে আর ঝাপসা চারপাশ—কাঁচের ওপর বৃষ্টিপাতে তিনি সব ঝাপসা দেখতে পাচ্ছেন। জাহাজটা কাত হয়ে জলের নিচে ঢুকে যাচ্ছে মতো। আবার ভেসে ওঠে স্টারবোর্ড সাইডে হেলে যাচ্ছে। কখনও সেই অক্ষত কালো অন্ধকারের প্রাচীর ডেকের ওপর দিয়ে চলে যাচ্ছে। সব ফল্কা সব উইনচ মায় ডেরিকের মাথা পেরিয়ে সমুদ্র লক্ষ লক্ষ ক্ষেপা মোষের মতো ছুটে যাচ্ছে। তিনি দু'পা ফাঁক করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার চেষ্টা করছেন। পারছেন না। প্রচন্ড ঝড়ের মুখে জাহাজটা পড়ে গেল। জাহাজে কে বনি, কে আর্চি, কে সেই লুকেনার সব তিনি ভুলে গেলেন। এখন জাহাজটাকে বন্দরে পৌঁছে দেওয়া ছাড়া পৃথিবীতে আর তাঁর কোনো যেন দায়িত্ব নেই। তিনি ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস। এস.এস.সিউল-ব্যাংক আন্ডার হিজ কম্যান্ড।

॥ সাতচল্লিশ ॥

ভারী কঠিন সময়। কি যে দুর্যোগ আরম্ভ হয়ে গেল। মাস্তুলের দড়ি-দড়া বাতাসে উড়িয়ে নিচ্ছে। বৃষ্টিপাতে অন্ধকার আরও গভীর। পোর্ট-হোল খুলে কিছু দেখা যাচ্ছে না। কেবল বিদ্যুতের তরবারি আকাশ ফালা ফালা করে দিলে মনে হচ্ছে, নীল রঙের অতিকায় সব মনস্টার এগিয়ে আসছে। আবার কখনো মনে হচ্ছে জলস্তম্ভ সামনে।

বাতাসের গতি ঠিক থাকছে না। জাহাজিদের এখন টালমাটাল অবস্থা। ডেকে কেউ উঠছে না। দিনে দিনে ভান্ডারী সবাইকে খাইয়ে দিয়েছে। সমুদ্রের অবস্থা ক্রমে খারাপের দিকে যাচ্ছে। হিবিং-লাইন দু'বার ছিঁড়ে গেছে। অন্ধকারে হেঁইয়ো হেঁইয়ো শব্দ জাহাজিদের। কারণ ঝড়ের ভেতর হিবিং-লাইন ফের বেঁধে দিতে হচ্ছে। অন্ধকারে আর ডেকে দাঁড়িয়ে থাকা নিরাপদ নয়। যে কোনো সময় সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। দু'জন ডেক-জহাজি আর ডেক-টিন্ডাল প্রায় প্রাণ হাতে করে ডেকে উঠে এসেছে। ডেকের ওপর ভুতুড়ে কিছু আলো, আর চারপাশে সমুদ্রে এখন যেন লক্ষ লক্ষ শিশুর আর্তনাদ। কি যে বাতাসের বেগ! ডেরিক তুলে ফেলছে। হাসিল সব ছিঁড়ে ফেলছে। যেন ওয়ারপিন, ড্রাম, উইনচ, মাস্তুল সব মুহূর্তে উড়ে যাবে বাতাসে। বাতাসের ঝাপটা মুখে এসে লাগলে নিশ্বাস নেয়া যাচ্ছে না। আর জাহাজিরা আশ্চর্য এই কঠিন সময়ে কে যেন বোট-ডেকে হিবিং-লাইন ধরে ঝুলে আছে। ঠিক ওরা নিচ থেকে বুঝতে পারছে না। হিবিং-লাইন ধরে কে ক্রমান্বয়ে টলে টলে অন্ধকারে এগিয়ে যাচ্ছে। লোকটার কি দুঃসাহস। কে এমন প্রাণ হাতে করে ওপরে উঠে এসেছে। লোকটাকে দেখার জন্য ডেক-টিন্ডাল ঝড়ের সমুদ্রে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে উঠে যেতে থাকল। এবং ভয়ে সে প্রায় চিৎকার করে উঠত। জাহাজের মরা আলোর ভেতর আর্চির মুখ স্থির। ডোরাকাটা এক অতিকায় জীব। তাকে দেখেই খেঁকিয়ে তেড়ে আসছে মেজ মিস্ত্রি। শরীরে রেনকোট। মাথায় টুপি। মুখটা অতিকায় আলোর ভেতরে বিভীষিকার মতো ডেক-টিন্ডাল এক লাফে ভূত দেখার মতো হিবিং-লাইনে ঝুলে ঝুলে চলে আসার সময়ই নীল তরঙ্গ মালা অথবা বলা যায় উড়ন্ত জলস্তম্ভ মাথার ওপরে ভেসে গেলে সে হিবিং-লাইন বরাবর ঝুলে পড়ল। জাহাজ সমুদ্রের নিচে অতলে ডুবে যাচ্ছে বুঝি। কিন্তু প্রাচীনতা শরীরে একেবারে কোনো তিমি মাছের মতো। দু'দন্ড ডুবে থেকে ভেসে উঠলে সে চো দৌড়। আর্চি একটা জাহাজে অতিকায় জীব হয়ে গেছে। অতিকায় জীব হয়ে যত রাতে ঘোরাফেরা করছে, তত যেন সমুদ্র ক্ষেপে যাচ্ছে। ডেক-টিন্ডাল নিচে নেমে কারো সঙ্গে একটা কথা বলতে পারল না। ভয়ে ভেজা জামা-পান্ট খুলে নেংটা হয়ে শুয়ে থাকল কম্বলের নিচে। আবার ওকে ডেকে উঠে যেতে বললে সে ঠিক সমুদ্রে লাফিয়ে আত্মহত্যা করবে। মানুষের মুখে কখনও সে এমন বিভীষিকা দেখেনি। সে ত্রাসে পড়ে গেছে—সে যেখানে যেমনভাবে থাকছে, চোখ মুখের ওপর স্থির হয়ে আছে। ডেক-টিন্ডাল ভয়ে তাড়াতাড়ি কম্বলে মুখ ঢেকে ফেলল।

বনির দরজায় তখন ঠক ঠক শব্দ। সমুদ্রে তেমনি রোলিং হচ্ছে। বনি বাংকে শুয়েছিল। পুরুষের পোশাক সে আর খুলছে না শরীর থেকে। বন্দুকটা যখন তখন আর্চি চেয়ে নিচ্ছে। হিবিং-লাইনে ঝুলে ঝুলে অথবা ঝড়ো হাওয়ার ভেতর হামাগুড়ি দিয়ে লেডি-অ্যালবাট্রসকে খুঁজছে। জাহাজের মাথায় পেলেই গুলি করবে। আর পাখিটা তখন দূরে, ঝড়ো বাতাসে অথবা জলস্তম্ভের মাথায় বসে থেকে ভেসে যাচ্ছে দুরে আবার উড়ে আসছে। কখনও জাহাজের অনেক ওপরে ভেসে থাকছে। নাগাল পাচ্ছে না আর্চি। ছোটবাবুকে দেখা যাচ্ছে না। তবু সে জানে ছোটবাবু চুরি করে পাখিটাকে খাওয়াচ্ছে। পাখিটাকে উড়িয়ে দিচ্ছে মাস্তুল থেকে। এক ভয়ংকর লুকোচুরি খেলা চলছে জাহাজে। দরজায় জোরে কড়া নাড়ছে আর্চি। রাতে আর্চি যখন তখন মাঝে মাঝে ছুটে চলে আসে। জ্যাক জ্যাক ভেতরে আছো? ঝড়ের সমুদ্রে জ্যাক ভেতরে থাকতে পারে, ওপরে উঠে যেতে পারে, নিচে নেমে যেতে পারে। জ্যাক দরজা খুলে বলল, হ্যাঁ ভেতরে আছি।

—আবার সী-ডেভিলটা আসছে।

জ্যাক বলল, তাই বুঝি।

—বন্দুকটা কোথায় রেখেছ?

জ্যাক বলল, ঐতো, নিয়ে যাও।

—জ্যাক তুমি রাগ করছ না তো?

—আরে না। জ্যাক যেন ঠিক ছোটবাবুর সঙ্গে কথা বলছে।

—বুঝতে পারছ, আসলে ওটাকে আমি মারব না। তবু দেখাতে হয় মাঝে মাঝে ওদের দেখাতে হয় আমি বসে নেই। রাত নেই দিন নেই খুঁজছি। সমুদ্রে সী-ডেভিলটাকে খুঁজছি। ঝড়ের মধ্যেও খুঁজছি।

জ্যাক দরজা থেকে নড়ল না। এত রাতে আর্চি বন্দুকটা নিতে এসেছে। আর্চির চোখ মুখ সে ঠিক দেখতে পাচ্ছে না। অন্ধকারে আর্চি রেনকোট গায়ে দাঁড়িয়ে আছে দরজার বাইরে। যেন ভেতরে ঢুকতে দিলেই আর্চি রেনকোট খুলে বাংকে বসে পড়বে। তারপর কত ডিপ্রেসান, সী-হাইট কত যাচ্ছে—বাতাসের ফোর্স কত—সোয়েল কোনদিক থেকে আসছে —এবং এভাবে কখন সে আরও ক'বার সমুদ্রে অতিকায় ঝড়ে পড়ে গেছে তার গল্প বলে হাত ছড়িয়ে দেবে। বিশ্রাম করার মতো এমন সুন্দর জায়গা আর বুঝি তার কোথাও নেই।

জ্যাক বন্দুকটা বের করে বলল, ধরো।

এত তাড়াতাড়ি! আর্চি বলল, দাঁড়াও। সে দু'পা ফাঁক করে দরজার মুখে দাঁড়িয়ে ফের বলল, দাঁড়াও। বলে সে বন্দুকটা নেবার অছিলাতে হাত বাড়িয়ে দিল। বলল, নো। নো গার্ল। নাগাল পাচ্ছি না। তারপর সে ঝুঁকে যেন জাহাজের পিচিং-এ টাল সামলাতে পারেনি, কেবিনে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মতো ভেতরে ঢুকে বলল, বাইরে ভীষণ ঝড়। ডেকে যাওয়া যাবে না। একটু বসলে আশা করি তুমি রাগ করবে না।

ভেতরে ঢুকলে বনি আর্চির মুখ স্পষ্ট দেখতে পেল। আর্চি উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপছে। ধূর্ত চোখ লালসায় জ্বলছে। বারবার আর্চি অতি সাধারণ মানুষের মতো বলছে, জ্যাক দরজাটা বন্ধ করে দাও। কিন্তু জ্যাক দরজা বন্ধ করছে না। আর্চি এবার নিজেই দরজা লক করে বলল, ভেতরে জল ঢুকছে, ভাল হল না? জ্যাক তবু কিছু বলছে না। আর্চি তখন বলল, জ্যাক কি ঠাণ্ডা! ঠাণ্ডায় মরে যাব। ঝড় আর থামবে না!

জ্যাক একপাশে দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটা এখন ইচ্ছে করলে যেন কুকুর দিয়ে ছোটবাবুকে খাইয়ে দিতে পারে। বারবার তাকে আর্চি এমন ভয় দেখিয়েছে। কেবল সেই রক্ষা করতে পারে সব। আর্চির মুখে এভাবে অস্বাভাবিক ক্রুরতা। আর্চি বাংকে বসে পড়েছে। মুখের ডোরাকাটা দাগ আরও বেশি হিংস্র। আর্চি পোর্ট-হোলের কাঁচ বন্ধ করে বলছে, জ্যাক কেউ টের পাবে না। জ্যাক প্লিজ।

জ্যাক নড়ছে না। সমুদ্রে তেমনি তরঙ্গমালা। জাহাজ সমুদ্রে ওঠানামা করছে। জ্যাক দেয়ালে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। শক্ত চোখ মুখ। এ দু'দিন আর্চি যতবার এসেছিল বাইরে দাঁড়িয়ে ভাল মানুষের মতো বন্দুকটা নিয়ে গেছে। জ্যাক দরজা খুলে অপেক্ষা করেছে। কিছু সময় পার হলে ফিরে এসেছে আর্চি। বন্দুকটা জ্যাকের কেবিনে রেখে ফের নিচে নেমে গেছে। প্রাণে কি যে ভয়! আর্চি ডেকে বন্দুক হাতে ঘুরে বেরিয়েছে। জ্যাক বাইরে তখন ঝড়ের ভেতর দাঁড়িয়ে সব সময় লক্ষ্য রেখেছে কোথায় আর্চি। আর্চি যদি এলি-ওয়েতে ঢুকে যায়! ভয়ে ওর বুক গলা শুকিয়ে উঠেছে। এবং এভাবে আর্চিকে সে চোখের ওপর রেখেছে। আসলে সে চেয়েছে বন্দুকটা নিয়ে যেন কখনও আর্টি এলি-ওয়েতে ঢুকে না যায়। একবার সে ভেবেছিল বন্দুকটা সমুদ্রে ফেলে দেবে, তখনই আর্চির ভেতরের বীভৎস মানুষটা যেন তার সামনে দাঁড়িয়ে যায়। চিৎকার করে সে বলতে থাকে যেন লোয়ার দ্য বোট, আই উইল গেট দিস হারপুন ইন ইউর বেলি। জ্যাক ভয়ে আর বন্দুকটা সমুদ্রে ফেলে দিতে পারেনি।

আর এভাবে যা হয়ে থাকে এক ধূর্ত ব্যবসায়ীর মতো আর্চি চোরাকারবারী জাহাজের এবং অতিশয় হীন চক্রান্তে শেষবারের মতো সে কেবিনের ভেতরে ঢুকে বসে থাকবে জ্যাক কিছুতেই অনুমান করতে পারেনি। জ্যাকের এই কেবিনটাই ছিল সবচেয়ে বড় নিরাপদ আশ্রয়। আর্চি কত সহজে এখানে ঢুকে গেল। সে কাউকে ডাকতে পারছে না। ডাকলেই চিৎকার চেঁচামেচি জাহাজে, এই যে এখানে সুন্দরী বালিকা যুবতী হচ্ছে। স্যালি হিগিনস গোপনে জাহাজে সুন্দরী বালিকা দেশে যুবতী করে নিয়ে যাচ্ছেন। এর চেয়ে বড় পাপ কি আছে! ফলে ঝড়ে জাহাজডুবি পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। আমাদের পাপের শেষ নেই। এতেও কাজ না হলে বলবে, আসুন আপনারা, আপনাদের আমি জ্যান্ত পরী দেখিয়ে দিচ্ছি। একেবারে জ্যান্ত। রক্তমাংসের। জ্যাক বুঝতে পারছে সে জাহাজে ভারী অসহায়। ভয়ে সে প্রায় কেঁদে ফেলবে এবার।

আর্চির যেন তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই। বেশ রয়ে সয়ে সে সব দেখে যাচ্ছে। জ্যাক কি লম্বা! জ্যাকের পোশাক ছিঁড়ে ফেললে আশ্চর্য সব সুগন্ধ সারা কেবিনে ম ম করবে। জ্যাকের শরীরে সামান্য হাত যেন কতকাল পর যুবতী নারী-সুধা-পারাবার হয়ে যুবতী নারী তার সামনে। পোশাকের ভেতরে সেই সব চমৎকারিত্ব, সে একেবারে দু'হাতে লুণ্ঠন করে নেবার জন্য মাঝে মাঝে গোপনে চোখ তুলে দেখছে। একটা চুরুট সে অনায়াসে খেতে পারে। জ্যাককে সামান্য সময় দেবার জন্য, অথবা এটা এমন কিছু দুর্ঘটনা নয়, সে ইচ্ছে করলেই আর্চিকে খুব সহজে সুধা-পারাবারে নিমজ্জিত করে এই প্রবল ঝড় এবং সব আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকতে পারে। সে চুরুট জ্বালিয়ে পায়ের ওপর পা রাখল। একটা হাত বিছিয়ে দিল বাংকের রেলিঙে। প্রায় শরীর এলিয়ে নিশ্চিন্তে চুরুট টানছে। ধোঁয়ার রিঙ মুখে এবং বগলের কাছে ঘুরেফিরে নেমে যাচ্ছে। জ্যাক একটা কথা বলতে পারছে না। মুখ নামিয়ে রেখেছে। জালে পড়া ভীরু কবুতরের মতো কাতর চোখ। তখনই সে ডাকল, জ্যাক। জ্যাক তাকাচ্ছে না। আর্চি উঠে দাঁড়াল।—জ্যাক, সে আবার ডাকল। জিভে লালা জমছে। দু'ঠোঁটে আঠা আঠা লাগছে—সে ফের বসে পড়ল। ডাকল,জ্যাক। জ্যাক কাছে আসছে না। তাড়াহুড়ো করে সব সে মাটি করে দিতে পারে না। ওর চোখ জ্বলছে। শরীরের তাপমাত্রা বেড়ে গেছে এবং শরীরে জ্বর আসার মতো। সে ফের উঠে দাঁড়াল। জ্যাক এতটুকু নড়ছে না। একবারে স্থির। জ্যাক যেন সামনে ভূত দেখছে।

আর এভাবে ভীষণ অস্থির যেন সেই পাখিটা। সে সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে। বড় বড় সব সমুদ্রের নীল জলস্তম্ভের ওপর পাখা ছড়িয়ে দিচ্ছে জলে। আকাশের সেইসব ঝড়ো হাওয়া অথবা বিদ্যুতের ঝলকে সে যেন বিন্দুমাত্র ভয় পাচ্ছে না। বরং এমন একটা ভয়ংকর সমুদ্রে সে কতকাল পর চুপচাপ বসে থাকতে পারছে, ভেসে থাকতে পারছে, তাকে পাখা ছড়িয়ে দিতে হচ্ছে না। সব তরঙ্গমালার মাথায় সে আছে কখনও পাহাড়র মতো ঢেউয়ের শীর্ষে, কখনও পাতালের মতো নীল জলের তলায়। আর জাহাজটা দূরে কাছে কখনও। কখনও ডুবে যাচ্ছে, কখনও কাত হয়ে যাচ্ছে ভীষণ। রাশিরাশি মেঘ ভেসে যাচ্ছে মাথার ওপরে। তার ওপরে রয়েছে সেই চিরদিনের নক্ষত্রমালা। যেন পাখিটা মেঘ ফুঁড়ে উঠে গেলেই দেখতে পাবে পৃথিবীর মতো সব গ্রহ নক্ষত্র আপন মহিমায় স্ব স্ব কক্ষপথে বিচরণ করছে। এক অমোঘ শক্তি সবকিছুর অন্তরালে নিয়ত কাজ করে যাচ্ছে। কেউ তার মহিমা ইচ্ছে করলেই পাল্টে দিতে পারে না।

ঘোর দুর্যোগের ভেতর অন্ধকার সমুদ্রে মাঝে মাঝে পাখিটার কক কক আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। কোন লোহার তার-টার বোধহয় মাস্তুল থেকে আল্গা হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে লোহার তারে তারে বাড়ি খাচ্ছে। গং গং করে কঠিন ধাতব শব্দটা ঝড়ের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছিল। আবার কোথাও কাঠের ঘসা লেগে শব্দ উঠছে। ঝড়ের মুখে স্টিয়ারিং এনজিনের সব পেনিয়ান একটার ওপর আর একটা উঠে আসতে চাইছে। যেন মার মার কাট কাট। হাল বারবার জাহাজের ঘুরে যাচ্ছে। প্রবল ঝড়ের জন্য কম্পাসের কাঁটা ভীষণ কাঁপছে। কম্পাসের কাঁটা লাফিয়ে লাফিয়ে ঘর পার হয়ে যাচ্ছে। হালের ওপর প্রবল চাপ পড়ছে তখন। প্রপেলার

বাতাসে ভেসে উঠলে হালে পানি পাচ্ছে না জাহাজ। যেন দম আটকে জাহাজটা সত্যি সমুদ্রে মরে যাবে।

তখন স্যালি হিগিনস আর কেবিনে ফিরে যেতে পারেন না। তিনি পায়চারি করছেন ব্রীজে। মাঝে মাঝে ঝুঁকে আকাশ দেখছেন। সী-হাইট ক্রমশ বাড়ছে। বাতাসের গতিবেগ প্রবল হয়ে উঠছে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় রেডিও-অফিসার বেতার সংকেতে সমুদ্রের খবর পাঠিয়ে যাচ্ছে। স্যালি হিগিনস তখন ভিজিবিলিটি কত, লক-বুকে উপুড় হয়ে দেখছেন। দেখে চক্ষু স্থির হয়ে যাচ্ছে। জাহাজ তবু চলছে।

তিনটে বয়লারের সামনে তিনজন ফায়ারম্যান। এনজিন-সারেঙ উইণ্ড-সেলের নিচে দাঁড়িয়ে আছেন। স্টিম এক ঘর নামতে দিচ্ছেন না। টলতে টলতে সব ফায়ারম্যানরা এগিয়ে আসছে। রমারম কয়লা হাঁকড়ে যাচ্ছে। তবু স্টিম কিছুতেই ঠিক রাখা যাচ্ছে না। বার বার স্লাইস মেরে আগুনের কলজে উপড়ে আনার মতো সব ঘেঁটে নতুন কয়লা, এয়ার-বালব ছেড়ে একটু হাঁফ ছাড়তে না ছাড়তেই সেই ঐশী শক্তির ওপর নির্ভরশীল মানুষেরা চিৎকার করতে থাকে—আল্লা হু আকবর। অর্থাৎ আপনি এখন একমাত্র আমাদের ভরসা। সমুদ্রের নোনা জল তখন হুড়মুড় করে নিচে নেমে আসে। জাহাজটা আবার একটা বড় রকমের ঢেউ সামলে উঠেছে। ফায়ারম্যানরা পা ঠিক রাখতে পারছে না। পিছলে পড়ে যাচ্ছে।

আর সেই গুম গুম শব্দ—যেন পাতালপুরী থেকে লক্ষ লক্ষ মনস্টার ধেয়ে আসছে। ভেসে আসছে অথবা উড়ে আসছে। কানে তালা লেগে যাচ্ছে। শিস্ দিচ্ছে সমুদ্রের চোরা বাতাস। এনজিন-রুমে ফাইভার দেখছে তখন প্রপেলার স্যাফটা ঘুরতে ঘুরতে আর দম পাচ্ছে না। প্রপেলার স্যাফট ঘুরতে ঘুরতে সহসা থেমে যাচ্ছে, ঝুপ করে জলের ভেতর প্রপেলার পড়ে গেলেই প্রাণ পেয়ে যাচ্ছে ফের। সেণ্টার-বয়লার যে ক্রমে নিচে বসে যাচ্ছে কেউ এতটুকু বুঝতে পারছে না।

ছোটবাবু ডেবিডের ঘরে বসে ছিল। ডেবিডের ওয়াচ এবার আরম্ভ হবে। ডেভিড ছোটবাবুকে বার বার উঠতে বলছে—কেবিনে গিয়ে শুয়ে পড়তে বলছে। কিছুতেই উঠছে না ছোটবাবু। চুপচাপ বসে আছে। ডেবিড বুঝতে পারছিল, ছোটবাবুর চোখ-মুখের অবস্থা ভাল না। ছোটবাবু বোধহয় এবার কোনো কঠিন অসুখে পড়ে যাবে। ছোটবাবুর জন্য ওর ভীষণ ভাবনা হচ্ছিল।

সারাদিন প্রবল ঝড়বৃষ্টিতে ছোটবাবু কাজ করেছে উইনচে। যখন কেউ ডেকে উঠতে সাহস পাচ্ছে না যখন ডেকে ওঠা নিষেধ তখনও তাকে দিয়ে কাজ করিয়েছে আর্চি। সে কোমরের সঙ্গে লম্বা দড়ি দিয়ে নিজেকে উইনচের সঙ্গে আটকে নিয়েছিল। আর সমুদ্র থেকে তরঙ্গমালা নাচতে নাচতে চলে গেলে সে ডুবে থাকত, শ্বাস ফেলতে পারত না। মনে হত এই বুঝি তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। জল যতক্ষণ সরে না যাচ্ছে, জলের নিচে দু'হাতে শক্ত করে ধরে রাখতো সে উইনচের লিভার। জল নেমে গেলে সে ভীষণ হাঁপিয়ে পড়ত। আর এভাবে যখন ছোটবাবুকে নিয়ে জাহাজে নিষ্ঠুরতার খেলা চলছিল—তখন কাপ্তান অথবা জ্যাক একটা কথা বলতে পারে নি। আর্চির কোনো ওয়াচ নেই। ওর ওয়াচের ভার এখন পাঁচ-নম্বরের ওপর। সে বেশ যেন এই খেলায় মেতে গিয়ে ভারী মজা পাচ্ছিল। বন্ধু অনিমেষ গণি জব্বার মাঝে মাঝে উঠে এসেছে ওপরে—সব দেখে ফোকসালে নেমে গেছে। এনজিন সারেঙকে বলেছে, কিছু একটা করুন। ছোট তো মরে যাবে। সারেঙ চুপচাপ বসে থেকেছে। একটা কথা বলেনি। পবিত্র কোরান থেকে বারবার সেইসব আয়াত সুরা দীর্ঘস্বরে যেন কতকাল থেকে আছে মানুষের দীপ্যমান আল্লাহ তাঁর কথাই একমাত্র এখন উল্লেখ করা যেতে পারে—তিনি পর পর সব সুরা পাঠ করে যাচ্ছেন, কারো কাছে তাঁর কোনো নালিশ নেই।

আর আর্চি বার বার ঘুরে গেছে ওপরে। সে ঝড়ের ভেতর ঘুরে ঘুরে বোট-ডেক থেকে দেখছে ছোটবাবু ঠিকঠাক ডেকে এখনও আছে না সাবাড় হয়ে গেছে। ডেবিড আর্চিকে বলল, না, এ সময়ে তুমি ছোটবাবুকে ডেকে কাজ করতে পাঠিয়ে ঠিক করনি। বার বার সে অনুরোধ

করেছে—আর্চি, এখন সময় নয়। আর্চি বলেছে, ভাঙা জাহাজ। কখন আর সময় পাওয়া যাবে। সমুদ্রে 'সব ঠিকঠাক করে না নিলে বন্দরে উইনচ চালানো যাবে না।

ডেবিড এক্তিয়ারের বাইরে কথা বলছে, আর্চি তার কথা আদৌ গ্রাহ্য করছে না। এবং ডেবিড বুঝতে পারছে আর্চির মতলব ভাল না। তবু ছোটবাবুর জন্য ডেবিডের ভীষণ মায়া। খাবার সময়ে সে বলেছে, ছোটবাবু তুমি সাবধানে কাজ করবে। ছুটির পর ছোটবাবুর চোখে ভীষণ আতঙ্ক! সে দেখেছে ছোটবাবু চুপচাপ শুয়ে থেকেছে ওর কেবিনে। শরীর চাঙ্গা করার জন্য সামান্য ড্রিংকস দিলে সে খেয়েছে। তবু ওর চোখ-মুখের চেহারা পাল্টায় নি। চোখের নিচে অনিশ্চিত অন্ধকার। যেন আবার সকাল হবে, ঝড় থাকলে সেই ডেকে আবার তার কাজ, যে-কোন সময় সমুদ্র তাকে ভাসিয়ে নিতে পারে। যে-কোনো সময় সমুদ্রের তরঙ্গমালা তাকে জলের নিচে নিয়ে গিয়ে হত্যা করতে পারে। ফলে ডেবিড বার বার ওকে ঘুমোতে যেতে বলছে। এমন অমানুষিক পরিশ্রমের পর ভাল ঘুম না হলে শরীর ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়বে। পরদিন এই নিষ্ঠুরতার সঙ্গে তবে ঠিক ঠিক যুঝতে পারবে না।

ছোটবাবু কেবিনে ঢুকে দরজা লক করে দিল। সে শুল না। ডেবিড ওয়াচে চলে যাচ্ছে। সে বসে থেকে ডেবিডের পায়ের শব্দ পাচ্ছে। মাথার ওপর জ্যাকের কেবিন। পায়চারি করছে বোধহয় জ্যাক। খুব ধীরে ধীরে কেউ হেঁটে গেলে কাঠের পাটাতনে যেমন শব্দ হয় তেমন চতুর পদক্ষেপ, যেন প্রতিটি পদক্ষেপ ভীষণ সতর্ক। বনি তো এভাবে কখনও হাঁটে না! বনি তো এভাবে পায়চারি করে না। এখন আবার সব চুপচাপ। কেউ হাঁটছে না। ছোটবাবু দু'হাতের ভেতরে মুখ ঢেকে বসে পড়ল। বনি বার বার তাকে সতর্ক করে দিয়ে গেছে—ছোটবাবু তুমি আমার জন্য ভেব না। তুমি সাবধানে থেকো। আমাদের পোর্ট-মেলবোর্ন পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া আর উপায় নেই।

তারপর বনি বুকে মুখ লুকিয়ে বলেছে, আমাকে নেমে যেতে হবে ছোটবাবু। আমি নেমে যাব। বাবাকে তোমাকে এতবড় বিপদে কিছুতেই পড়তে দেব না। বনি তারপর কিছুক্ষণ কেঁদেছে। চলে যাবে বলে কেঁদেছে। ছোটবাবুকে বলেছে, তুমি ঠিকই বলেছ ছোটবাবু, আমাকে নামিয়ে না দিলে জাহাজটা অশুভ প্রভাব থেকে মুক্তি পাবে না।

ছোটবাবু বলেছিল, বনি তুমি ওকে বন্দুকটা দিয়ে দাও। ওটা তোমার কাছে না রাখাই ভাল।

বনি কি বলবে, সে তো বুঝিয়ে বলতে পারে না, ছোটবাবু সমুদ্রে এখন সাইক্লোন এখন যে-কেউ জাহাজে গোপনে কিছু একটা করে ফেলতে পারে। তুমি কখন কিভাবে থাকবে, আর আর্চি তোমাকে ভয় পায় ছোটবাবু, আর্চি তোমাকে কিছু একটা করে ফেললে আমার কি হবে ছোটবাবু। যতক্ষণ আর্চি বোট-ডেকে থাকে, বন্দুকটা ওর হাতে থাকে। আসলে আমি পাহারায় থাকি তখন। ঝড়ে জলে আমি ভিজে যাই, তবু হিবিং-লাইনে ঝুঁকে অলক্ষ্যে ছোটবাবু এগিয়ে যাই দেখি আর্চি কতদূর যেতে পারে। তুমি ছোটবাবু আমার জান্য ভেব না। তুমি এখন আর কিছু করতেও পারবে না। বাবা বুঝতে পারছ কেমন হয়ে গেছে। বাবা এখন মাঝে মাঝে রাতে চিৎকার করে ওঠেন—কে? আর্চি তখন সেই অন্ধকারে দাঁড়িয়ে জবাব দেয় ছোটবাবু, আমি আর্চি স্যার। সী-ডেভিলটাকে খুঁজছি। আসলে সে আমার কেবিনের চারপাশে ঘুরে বেড়ায়। এলবাকে খোঁজার নামে আমার শরীরের গন্ধ শুঁকে বেড়ায়। সব বুঝতে পারি ছোটবাবু। বাবাও বুঝতে পারেন। কিন্তু বাবা আর কিছু করতে পারছেন না। আমাকে নামিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তিনি কিছু করতে পারবেন না। তুমি ছোটবাবু কি আর করবে! মুখ বুজে সব সহ্য করে যাওয়া ছাড়া তোমার উপায় নেই।

সে ছোটবাবুকে শুধু বলেছে, আমি আর নিচে আসছি না। তুমি ছোটবাবু আমার জন্য ভাববে না। বল ভাববে না। সে ছোটবাবুর কাছ থেকে কথা আদায় করে নিয়ে গেছে। ছোটবাবু আর কিছু করতে পারছে না। রাতে সে ভাল ঘুমোতে পারছে না। ঘুম ভেঙে যাচ্ছে বার বার। সে জেগে গেলেই শুনেছে বাইরে সেই সাইক্লোনের হাহাকার শব্দ। সমুদ্রের অস্থির

গর্জনে কান পাতা যাচ্ছে না। সব পোর্ট-হোল, এলি-ওয়ের দরজা বন্ধ। ভেতরে একবিন্দু জল ঢুকতে পারছে না। দরজা অথবা পোর্ট-হোল খুললেই জলের ঝাপটায় কেবিন এলি-ওয়ে সব ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর তখনই মনে হচ্ছে ফের মাথার ওপর কে বার বার হেঁটে যাচ্ছে। পাটাতনে খুব সতর্ক নিস্তেজ পায়ের শব্দ। আসলে এটা ওপরে হচ্ছে না মাথার ভেতরে সেই ঘণ্টাধ্বনি যা সে মাঝে মাঝে আতঙ্কের ভেতর ডুবে গেলে শুনতে পায় এমন সব শব্দ কি মগজের ভেতরে নড়ানড়ি করছে! সে মাথা চেপে বসে থাকল দু'হাতে। সে দু'হাতে কান চেপে ওপরের কোন শব্দ শুনতে চাইছে না। তবু সে শুনতে পাচ্ছে যেন ঘোড়ার পায়ের শব্দ। ঠক ঠক মাথার ভেতরে বাজছে। চোখে মুখে অবসাদ আর ক্লান্তি। সে যত চেষ্টা করছে শুয়ে পড়বে—কোনো ঘণ্টাধ্বনি তাকে কাতর করতে পারবে না—তবু কি যে হচ্ছে মাথার ভেতরে সেই সব শব্দমালা। পাটাতনে কিছু পড়ে গেল যেন। হাত ফসকে পড়ে গেছে মতো। জ্যাক এত রাতে এভাবে কেবিনে ছুটোছুটি করছে কেন? ধাক্কা লেগে কিছু পড়ে গেল যেন। মনে হচ্ছে এক ভয়ংকর ধ্বস্তাধ্বস্তি চলছে ওপরে। কোনো দানবের পাল্লায় কেউ পড়ে গেছে মনে হয়। এবং কাঁচের গ্লাস ভাঙার শব্দ। এবং সে নিজে ক্রমে নিজের ভেতরে অস্থির হয়ে উঠছে।

তখন অবিশ্রান্ত মার মার কাট কাট এনজিন-রুমে। স্টিম-গেজের কাঁটা দু'শো বিশে কিছুতেই লাল দাগ বরাবর তুলে দেয়া যাচ্ছে না। বয়লারের আগুন দাউ দাউ জ্বলছে। র‍্যাগ মেরে সব আগুন ঘেঁটে ক্রমান্বয় কয়লা হাঁকড়াচ্ছে, একদণ্ড বিশ্রাম পাচ্ছে না কেউ। এনজিন-সারেঙ গেজের কাঁটা শুধু দেখছেন। কাঁটাটা ক্রমশ ওপরে উঠে যাচ্ছে ক্রমশ ক্রমশ ওপরে উঠে যাচ্ছে, আর ঠিক জায়গায় যেতে না যেতেই দপ করে নেমে যাচ্ছে। এনজিন-সারেঙ চিৎকার করতে করতে ছুটছে, জাহাজ চলছে না, জাহাজ ঝড়ে পড়ে গোঙাচ্ছে। মিঞারা সাহস সঞ্চয় কর। দরিয়া দামাল হয়ে উঠছে। তোমরা কেন পারছ না।

জ্যাক দু'হাতে আত্মরক্ষার্থে প্রাণপণ লড়ছে। ওর প্যান্ট জামা ছিন্নভিন্ন। ওর পা তুলে ফেলছে—ঠিক লাল দাগের কাছে কাঁটাটা উঠে যাচ্ছে আর সে দু'হাতে এনজিন-দানবের সঙ্গে লড়ছে। মুখে মুখোশ। বনি পা শক্ত করে রাখছে। পা সে কিছুতেই শিথিল করছে না। আর্চি লুটিয়ে পড়েছে শরীরে। সব আসুরিক ক্ষমতা তার ক্রমে পাগলের মতো মাথায় এসে জড়ো হচ্ছে। সে বনির স্তনের ওপর সজোরে খাবলে ধরতে যাচ্ছে। মুখে ঠোটে লালা। বাংকের ওপর লুটিয়ে পড়েছে বনি। দু'হাতে আর্চির মুখ ঠেলে তুলে রেখেছে ওপরে। যেন হাত ফসকে গেলেই মুখটা তার ঠোঁট কামড়ে ধরবে। পা তুলে ফেলছে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে জ্যাকের। সে তবু পা প্রাণপণ জড়ো করে রাখছে। আর্চি এক হাতে ডান পাটা কব্জা করে আনছে। আঁচড়ে খামচে জ্যাক তাকে রক্তাক্ত করে দিচ্ছে, যে কোনো মুহূর্তে আর্চি চিৎকার করে উঠতে পারে—লোয়ার দ্য বোট আই উইল গেট দিস হারপুন ইন ইউর বেলি, যে কোনো মুহূর্তে মুহূর্তে......মুহূর্তে আর তখনই মনে হল ঝড়ের দরিয়ায় কে দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকছে, জ্যাক দরজা খোল। ভীষণ ঠাণ্ডা গলা। ভীষণ স্থির। কতদিন পর কেউ ফিরে এসে যেভাবে ডাকে যে ভাবে বলে আমি এসেছি জ্যাক, দরজা খোল।

সমুদ্রের হাহাকার বাতাসে এখন আর কোনো তঞ্চকতা নেই। জলোচ্ছ্বাস এসে ডেক ধুয়ে দিয়ে যাচ্ছে। জাহাজ কাত হয়ে একেবারে খাড়া হয়ে যাচ্ছে কখনও। ছোটবাবু বালকেডে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। ওপরে সব কেবিনের দরজা পোর্ট-হোল বন্ধ। ব্রীজে কাউকে দেখা যাচ্ছে না। দরজা বন্ধ বলে কেউ দেখছে না নিচে ছোটবাবু জ্যাকের দরজা ধাক্কাচ্ছে।

সহসা দরজা খুলে ছিটকে বের হয়ে গেল আর্চি। জ্যাক বিছানায় পড়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। বালিশ, চাদর, লাইফ জ্যাকেট, জলের কুঁজো এবং ফুলদানি বই যা কিছু এই যেমন জামা প্যান্ট সব ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। ছোটবাবু একটা কথা বলল না। সে যেন পাথর হয়ে যাচ্ছে। আর ক্রমাগত সেই ঘণ্টাধ্বনি—সে দেখতে পাচ্ছে, কেউ যেন উঠে যাচ্ছে দ্বীপে। পাহাড়ের মাথা থেকে সেই ঘণ্টাধ্বনি মুছে দিতে যাচ্ছে—জলের ভেতরে সেই ঘণ্টাধ্বনি

অজস্র বুদবুদের মতো, অথবা মনে হচ্ছে মোষ বলির সময় সেই যে ঢাকীরা ঘুরে ঘুরে কেবল বাজায়, ধূপধুনো এবং মন্ত্রোচ্চারণ, মোষের ডাক, আর রক্তপ্রবাহ সব একসঙ্গে যেন তার মাথার ভেতরে বাজছে। জ্যাক মুখ তুলে ছোটবাবুকে দেখতেই আতঙ্কে ছোটবাবুর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল—নো নো। ছোটবাবু তুমি এভাবে তাকিয়ে আছ কেন? ছোটবাবু তুমি তুমি কথা বলছ না কেন! ছোটবাবু তুমি তুমি ছোটবাবু... ছোট.... বাবু।

ছোটবাবু বনির দু'হাত ছাড়িয়ে নেমে গেল। এটা তার কাছে কোনো ঘটনা নয়। ছোটবাবু সিঁড়ি ধরে নেমে যাচ্ছে। যেন এটা একটা সহজ ঘটনা, সে একেবারে সহজভাবে নিয়েছে সব —এবং আলোর ডুম দুলছে। ছোটবাবুর ছায়া একবার বড় হয়ে যাচ্ছে আবার ছোট হয়ে যাচ্ছে। ছোটবাবুর কাছে এটা একটা কিছু নয়—ছোটবাবু হেঁটে যাচ্ছে। মাথার ভেতর মোষ বলির বাজনা বাজছে। মন্ত্রোচ্চারণের মতো মনে হচ্ছে এই সমুদ্রের হাহাকার বাতাস। সে হেঁটে যাচ্ছে। নিশীথে জাহাজ তখন উন্মাদের মতো মাথা কুটে মরছে, পেরে উঠছে না। কিছুতেই, পেরে উঠছে না সমুদ্রের সঙ্গে যুঝতে তখন ছোটবাবু নেমে যাচ্ছে। টলতে টলতে নেমে যাচ্ছে। সে নেমে সোজা আর্চির কেবিনের দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকছে, স্যার আমি ম্যান। দরজা খুলুন।

—ম্যান। তোমার এত সাহস। আমার দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকছ। সে দরজা খুলে ভেবেছিল বন্দুকের বাঁটে একটা মাথায় বাড়ি মারবে—তুমি যত নষ্টের গোড়া তুমি আমার এমন সুযোগ নষ্ট করে দিলে হে। ইণ্ডিয়ান ডগ। কুত্তার বাচ্চা। কিন্তু দরজা খুলেই আর্চির মুখ আতঙ্কে শুকিয়ে গেল। ম্যানের চোখে শূন্যতা। যেন সাক্ষাৎ শয়তানের মতো দাঁড়িয়ে আছে। ম্যানের চোখে পলক পড়ছে না।

হায় তখন কেউ জানে না, একটা বিদ্যুতের শেকড় যেন ক্রমাগত মাংকি-আয়ল্যাণ্ডের ছাদ থেকে নেমে আসছে। বিদ্যুতের শেকড় কি বাতাসের ঝাপটায় এমন একটা অতিকায় দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে জাহাজিরা কেউ টের পাচ্ছে না। চিরে যাচ্ছে। আঁকাবাঁকা দাগের মতো মস্ত ফাটল দেখা দিচ্ছে। ঠিক সোজা বোট-ডেকে উইংসের নিচে দাঁড়ালে ফাটল গভীর থেকে ক্রমশ গভীরতর হয়ে যাচ্ছে। আর একভাবে দাঁড়িয়ে আছে বনি। দরজা বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। ছোটবাবুর পেছনে পেছনে সে যেতে সাহস পায়নি। সে চিৎকার করে বলতে পারত, বাবা ছোটবাবু পাগল হয়ে যাচ্ছে। সেই যে তুমি বলেছিলে বাবা মাথায় ওর কোনো গণ্ডগোল দেখা দিতে পারে বাবা ওর বুঝি সত্যি সেই গণ্ডগোল দেখা দিয়েছে—কোথায় অন্ধকারে নেমে গেল! বনি এভাবে কিছুতেই আর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না। সে অস্থির হয়ে উঠছে। ছোটবাবু কিছু একটা করে ফেলতে পারে। ছোটবাবুকে আর্চি কিছু একটা করে ফেলতে পারে। সে দ্রুত নেমে আসছিল সিঁড়ি ধরে। তার পা ফেলা ঠিক থাকছে না। সে বুঝতে পারছে ঠিক এ-ভাবে এখন হেঁটে কোথাও যাওয়া যায় না। সে কোনরকমে সিঁড়ি ধরে নিচে নামতেই বুঝতে পারল আহাম্মকের মতো পোশাক না পাল্টে সে নেমে এসেছে। তাকে ওপরে উঠতে হবে। ঝুলে ঝুলে প্রায় কোনোরকমে হামাগুড়ি দিয়ে ওপরে ফের উঠে গেল। এবং মনে হল জাহাজের নিচে কোলাহল শোনা যাচ্ছে! বোধহয় এনজিন-রুমে। ছোটবাবু কোথায়! সে জামা গলিয়ে নিচে নেমে এসে দেখল, না সব ঠিক, কোথাও কোনো কোলাহল নেই। একেবারে আর দশটা দিনের মতো এলি-ওয়ে নির্জন। ছোটবাবুর দরজা বন্ধ। সে বার বার ডেকেও সাড়া পেল না।

আর ঠিক জাহাজের এটা একটা অন্তিম সময় কেউ টের পেল না! জাহাজ ওঠানামার ভেতর কখন সেই ইণ্টারমিডিয়েট স্টপ ভালভ মুরগীর গলা ছেঁড়ার মতো কোন এক দানব দু'হাতে টেনে ছিঁড়ে ফেলছে। টের পাচ্ছে না কেউ কী করে জেনারেটর ঘুরতে ঘুরতে আর ঘুরতে পারল না। কখন এই অতিকায় যুদ্ধবাজ ঘোড়া ক্রমে অবসন্ন হতে হতে হাঁটু মুড়ে যাচ্ছে কেউ বুঝি বুঝতে পারছে না। সহসা সব অন্ধকার হয়ে গেল। জেনারেটর ফেল করেছে, সহসা মনে হল ভূখণ্ড চিরে অগ্ন্যুৎপাত হচ্ছে। আর ভীষণ বীভৎস তীক্ষ্ণ শিস্ শোনা যাচ্ছে। সহসা

মনে হচ্ছে লোকজন ছোটাছুটি করছে। এলি-ওয়ে ধরে কেউ ছুটে গেল। সারা এনজিন-রুমে ভয়ংকর উত্তাপ, যেন ঝলসে যাচ্ছে শরীর, গরম স্টিমে সারা এনজিন-রুম ছেয়ে গেল। বনি আর শ্বাস নিতে পারছে না। আর চারপাশে শুধু গভীর অন্ধকার। বনি কোনো রকমে চেনা পথটা আবিষ্কারের চেষ্টায় হামাগুড়ি দিতে গেলে ওর ঘাড়ে এসে অন্ধকারে কেউ ছিটকে পড়ল। বনি এখন বুঝতে পারছে বোট-ডেকে উঠে যাবার জন্য প্রাণরক্ষার্থে সবাই যে যেদিকে পারছে এলোপাথাড়ি ছুটছে। এনজিন-রুমে ভয়ংকর রকমের দুর্ঘটনা। এ-সময়ে টর্চ জ্বালিয়ে কেউ টলতে টলতে ছুটে আসছে। অন্ধকারে কিছু বোঝা যাচ্ছে না। এবং টর্চের আলোতে বনি বুঝতে পারল পাগলা- ঘণ্টি বাজিয়ে দিলে যেভাবে মানুষ ছুটে যায় সবাই তেমনি ছুটছে। বনি কাউকে কিছু বললে, কেউ দাঁড়াচ্ছে। বনি কাউকে কিছু বললে, কেউ দাঁড়াচ্ছে না। ডেকের দিকে পালাচ্ছে। আর তখনই কোথা থেকে ছোটবাবুর গলার স্বর সে সহসা শুনতে পেল। সতেজ, যেন সে ঘুম থেকে উঠে এসেছে। গলার স্বর এমনই মনে হয়েছিল। ছোটবাবুর হাতে টর্চ। সে বনিকে টানতে টানতে এবার ওপরে তুলে নিয়ে যাচ্ছে। সব এলি-ওয়ে, সব কেবিন, সব এনজিন-রুম আর সব ফাঁকফোকড় স্টিমে অন্ধকার হয়ে গেছে। মুহূর্ত মাত্র দেরি করে ফেললে সবাই শ্বাস বন্ধ হয়ে মরে যাবে।

আর যা হয় ছোটবাবুর এ-সময়ে। শুধু ছোটবাবুর কেন সবাই যে যার প্রাণ রক্ষার্থে নিজের নিজের যা কিছু আছে, এই যেমন ছোটবাবুর বনি আছে তাকে বগলদাবা করে ওপরে উঠে যাচ্ছে। অন্ধকারে কত বড় দুর্ঘটনা ঘটেছে কেউ অনুমানই করতে পারছে না। নিচে ঠিক জালির নিচে ক'জন লোক মনে হয় আটকা পড়েছে। ফানেলের কিছুটা অংশ উড়ে গেছে। দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে। সে ডাকল, হাই

আবার সে ফের ডাকল, হাই। এবং সঙ্গে সঙ্গে বনির বুক ফেটে যাচ্ছে, বাবা! বাবা! অন্ধকারে ওপরে বাবা দু'হাত তুলে যেন সেই কঠিন প্রেতাত্মার মতো ঝুলে আছেন। যারা এনজিন-রুম থেকে আসতে পেরেছে, যারা নিঃশ্বাস নিতে পারছে না বলে বোট-ডেকে টুইন-ডেকে ছোটাছুটি করছে এবং চিফ-মেট পর্যন্ত সত্যি ওপরে উঠে দেখল মাস্টার প্রায় কোনোরকমে ঝুলে আছেন। বড় রকমের আর একটা ঢেউ এলেই ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, তখন টর্চের আলো বরাবর ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে ওরা দু'জন অর্থাৎ ছোটবাবু আর চিফ-মেট প্রায় বগলদাবা করে তুলে এনে নিচে জ্যাকের কেবিনে ঠেলে দিতেই হুড়মুড় করে ঝুলে থাকা মাংকি-আয়ল্যাণ্ড চার্টরুম সহ মনে হল নিমেষে উধাও হয়ে গেল সমুদ্রে। যারা ডেকে ছিল হিবিং-লাইন ধরে জলের নিচে কিছু কাল সাঁতার কেটে ওঠার মতো এবং এই জলরাশি কিছুটা স্টিম সঙ্গে নিয়ে যাওয়ায় মনে হল, জাহাজের ভেতরটা হাল্কা। কোথায় কি হয়েছে কেউ বলতে পারছে না। কোথায় আর্চি, কোথায় অন্য সব এনজিনিয়াররা এবং এমন একটা অন্তিম সময়ে শুধু থার্ড- মেট বলল, স্যার এস. ও. এস.। স্যার আমরা সব হারিয়েছি। স্যার আমাদের সব ভাসিয়ে নিয়ে গেছে! ডেবিডের পাত্তা নেই। রেডিও-অফিসারের পাত্তা নেই। ব্রীজ, মাংকি-আয়ল্যাণ্ড, চার্ট-রুম সব ভাসিয়ে নিয়ে গেলে যা হয় সবাই অন্ধকার নিশীথে জাহাজে মৃত্যুর মতো শীতল গভীর ঠাণ্ডা স্পর্শে মুহ্যমান কি করণীয়, কি এখন এনজিনের অবস্থা এবং জাহাজডুবী কি হয়ে যাচ্ছে, আসলে জাহাজটা ভেসে আছে তাও কেউ যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। জাহাজ ক্রমশ কাত হয়ে যাচ্ছে। জাহাজের অবস্থা একটা ভাসমান কাঠের গুঁড়ির মতো কেউ অনুমানই করতে পারছে না। যেন এক্ষুনি আবার আলো জ্বলে উঠবে। আবার সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে। যেন এক পরাভূত মানুষের দল জয়লাভের নিমিত্ত স্বপ্ন দেখছে। সমুদ্রের দমকা বাতাস প্রবল পরাক্রম যুদ্ধবাজ—বিরাম নেই বিশ্রাম নেই। অন্ধকারে জাহাজ যে কাত হয়ে গেল কাতই হয়ে থাকল। অন্ধকারে জাহাজ যে ঘুরতে থাকল সমুদ্রে, কেবল ঘুরতেই থাকল। তবু কেউ কিছু বুঝতে পারছে না। কোনো মন্ত্রঃপূত মানুষের মতো স্যালি হিগিনস বাইরে এসে দাঁড়ালেন তখন। শরীরের সব পোশাক জলে ভেজা। তখন একমাত্র সম্বল এল. বি. সেট, তার চেয়েও দরকার একবার দেখা আর্চি কোথায়। আর্চি, আর্চি। থার্ড এনজিনিয়ার এবং ফাইভার সামনে দাঁড়িয়েছিল। হাউমাউ করছে সব জাহাজিরা। কেউ

কাপড় নষ্ট করে দিয়েছে। এবং কপাল থাবড়াচ্ছে যখন অর্থাৎ ওরা বুঝতে পারছে না, কোয়ার্টার-মাস্টার মহসীনের কি খবর। ওর ডিউটি ছিল ব্রীজে। অনেকের খবর নেই। এনজিন- রুম থেকে সবাই উঠতে পেরেছে কিনা, স্টিম নির্গত হলে যে অতিশয় শব্দ তা ক্রমে কমে আসছে। স্কাইলাইটের ভেতর থেকে একেবারে ধূম উদ্‌গিরণের মতো তখন সব স্টিম বের হয়ে আকাশ-বাতাস ঢেকে দিচ্ছে। ইচ্ছে করলেই কিছু করা যাবে না। তখন সবাই বুঝতে পারছে সমুদ্র শয়তান তার শেষ আক্রোশ জাহাজের ওপর মিটিয়ে নিয়েছে। মাংকি-আয়ল্যাণ্ডে ট্রান্সমিটার-রুম। মাংকি-আয়ল্যাণ্ড উড়িয়ে নিয়েছে। হুইল-রুমের সব লণ্ড ভণ্ড। দুমড়ে মুচড়ে একটা বীভৎস অবস্থা করে রেখেছে। আর ঠিক পাকা ফলটি তুলে নেবার মতো মাঝখান থেকে চার্ট-রুম উড়িয়ে নিয়েছে বলে ভারি মজার দৃশ্য। জাহাজের মাথা নেড়া। সবাই যেন হাসাহাসি করতে পারত। তখনই স্যালি হিগিনসের গলা, শিগগির দেখুন আর্চি কোথায়? দেখুন ডেবিড কোথায়। এল. বি. ট্রান্সমিটার সেট দ্যাখো কোথায় রেখেছে রেডিও-অফিসার। একটা টর্চ। আপনারা কেউ আমাকে একটা টর্চ দিতে পারেন! নিজের টর্চ নিজের বলতে যা কিছু চার্ট- রুমে। চার্ট-রুম উড়ে গিয়ে ভিখিরীর মতো তিনি। এটা ডেবিডের টর্চ। ছোটবাবু টর্চ দিয়ে বলল, এই নিন স্যার।

স্যালি হিগিনস বললেন, ছোটবাবু! তুমি ছোটবাবু বেঁচে আছ!

ছোটবাবু বলল, বনি আপনার পাশে। অন্ধকারে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না বলে তিনি বনির কাছে মুখ নামিয়ে বললেন, বনি তাহলে তুমিও বেঁচে আছ! তারপরই যেন দ্বিগুন উৎসাহে বললেন, এনজিন- রুমের কি খবর। দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই।

থার্ড এনজিনিয়ারের মুখ স্টিমে সামান্য ঝলসে গেছে। সে উবু হয়ে বসে আছে। স্যালি হিগিনস ডাকতেই সে উঠে দাঁড়াল। বলল, শুধু দেখলাম স্যার বালব ফেটে বেরিয়ে গেছে। আর কিছু দেখার সময় ছিল না স্যার। ভয়াবহ শব্দে আমাদের মাথা ঠিক ছিল না। সারা এনজিন-রুম মুহূর্তে অন্ধকার হয়ে গেল স্যার। এলার্ম বাজিয়ে উঠে এসেছি স্যার।

আর তখন যে যার লাইফ-জ্যাকেট পরে নেবার কথা। কিন্তু অন্ধকারে এখন নিচে নামা পাতালে নামার সামিল। স্যালি হিগিনস বুঝতে পারছেন যা কিছু করণীয় খুব ঠাণ্ডা মাথায় করে ফেলতে হবে। হাল ঠিক নেই জাহাজের তিনি এটা বুঝতে পেরেই বললেন, হারি আপ ম্যান। সবার দিকে হাত তুলে দিলেন। চিফ-মেট বলল, স্যার এল. বি. সেট পাওয়া যাচ্ছে না। ডেবিডকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

তখন স্যালি হিগিনস বললেন, চিফ তুমি ওদের নিয়ে আফটার-পিকে চলে যাও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব স্টিয়ারিঙের পিনিয়ান ব্লক করে দিতে হবে। হাল ঠিক নাইনটি ডিগ্রিতে রাখবে! মনে রাখবে- কি বললাম? অন্ধকারে মুখ বাড়িয়ে প্রশ্ন করলেন স্যালি হিগিনস।

—আচ্ছা স্যার। সে টর্চ নিয়ে কিছু লোকজন সঙ্গে নিয়ে প্রায় ঝুলে পড়ল নিচে।

আর তখন তিনি জোরে হাঁকলেন, ডেবিড কোথায় আছ? ডেবিড, আর্চি কোথায় আছ! তিনি জানেন আর্চিকে খোঁজা বৃথা, তোমরা কে কোথায়! এবং এ-সময়ে মনে হল কারো গোঙানি শোনা যাচ্ছে, মেন-মাস্টের নিচে জড়াজড়ি করে দু’জন পড়ে আছে। বোট-ডেক থেকে টর্চ মেরে বুজতে পারলেন, ওরা ডেবিড আর রেডিও-অফিসার। ওরা দু’জন ভয় পেয়ে কখন একসঙ্গে লাফিয়ে নেমে আসছিল নিচে। কাপ্তানকে খবর দেবে বলে, তারপর কি হয়েছিল ওরা বলতে পারল না। স্যালি হিগিনসের গলা শুনে ওরা বিশ্বাস করেছে ওরা বেঁচে আছে। ওরা ভয়ে ভয়ে উঠে আসছে। ওদের টর্চ মেরে পথ দেখাচ্ছেন স্যালি হিগিনস। ওরা উঠে আসার সময় মনে হল, জালির নিচে কেউ আটকা পড়েছে। ছোটবাবু এদিকে নেই। সে গেছে নিচে সেই আফটার-পিকে—এনজিন-সারেঙ, এবং বঙ্কু অনিমেষ সবার খবর নিতে গিয়ে দেখেছে কেউ আর নিচে নেই—সবাই উন্মুখ। সঠিক কি হয়েছে কেউ জানে না। এনজিন-রুমে কি হয়েছে, এনজিন-রুমে কেউ নামতে পারছে না কেন? জাহাজটা এভাবে মাতালের মতো ঘুরছে কেন? এমন সব প্রশ্ন করছে। স্টিম কোথা থেকে এত বের হয়ে

আসছে। কোল-বয় দু'জনের খবর পাওয়া গেছে। ওরা উঠে এসেছে। এনজিন-সারেঙ কেবল আটকা পড়েছেন। সবাইকে তুলে দিয়ে নিচে আটকা পড়ে গেছেন। এবং তখনই ছোটবাবুর মনে হল, সেও শুনেছিল এমন। অথচ মাথা তার ঠিক ছিল না। কোনদিকে কি ভাবে সে এগুবে ঠিক বুঝতে পারছে না। যেন সেই অশুভ প্রভাব জাহাজ ছেড়ে যাবার আগে শেষবারের মতো শোধ তুলে নিয়ে গেছে। সে আর দেরি করতে পারল না। প্রায় ঝুলে ঝুলে হিবিং-লাইনে ঝুলে ঝুলে কখনও দড়িদড়া ধরে লাফিয়ে মুহূর্তে বোট-ডেকে উঠে জালির কাছে টর্চ মারতেই দেখল এনজিন-সারেঙ উপুড় হয়ে পড়ে আছেন নিচে! এ-সময় নামা ঠিক না, কারণ জাহাজের কড়িবরগা যা কিছু আছে সব প্রায় লণ্ডভণ্ড—কোনটা কিভাবে ছিটকে এসে পড়বে কেউ বলতে পারবে না। তবু যা হয়ে থাকে ছোটবাবুর কোনো কোনো সময় হুঁস থাকে না। স্বার্থপরের মতো মাথা ঠিক রেখে কাজ করতে পারে না। আর সে তো এখন আর অপোগণ্ড নেই। জাহাজে সে এখন সবচেয়ে বোধহয় শক্ত মানুষ। সে দু'হাতে ফাঁক করে ফেলল লোহার জালি। বনি ওপরে ঝুঁকে আছে। হাতে টর্চ। লোকজনের ভিড় চারপাশে। অন্ধকারে কারো মুখ চেনা যাচ্ছে না। এনজিন-সারেঙের গোটা শরীরটা কাঁধে ফেলে যখন সে সত্যি উঠে এল, এবং অন্ধকার সমুদ্রে সেই তরঙ্গমালা যখন শান্ত হয়ে আসছে, বাতাসের ঝাপটা আর তেমন প্রবল নেই বরং মনে হচ্ছে সব আকস্মিকতা শেষে সমুদ্র আবার শান্ত এবং শীতলপাটির মতো নির্ভরশীল আশ্রয়—তখন আর যেন ছোটবাবুর বিন্দুমাত্র ভয় থাকল না। সে ডেকের ওপর অন্ধকারে সারেঙকে শুইয়ে দিল। ডাকল, চাচা।

এনজিন-সারেঙ তেমনি পড়ে আছেন। স্যালি হিগিনস, বয়-বাবুর্চিরা, এবং ডেক-জাহাজিরা জড়ো হচ্ছে চারপাশে। এখন দাঁড়িয়ে থাকার সময় নয়। কেউ কেউ মাথা চাপড়ে কাঁদতে বসে গেছে। এক ধমক তখন স্যালি হিগিনসের। পালস্ দেখে বললেন, নুনজল খাওয়াও। জলের ঝাপটা দাও চোখে। সব ঠিক হয়ে যাবে। আর তখন সেই মাস্তুলে এলবা পাখা ঝাপটে সবাইকে কিছুটা যেন আশ্বস্ত করে দিল। স্যালি হিগিনস নিজের এই অবস্থার কথা আর ভাবতে পারছেন না। অর্থাৎ জাহাজিরা পৃথিবীর সব সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল, তখন যেন মাস্তুলে উঠে কেউ বলছে এবানডান দ্য শিপ। তখনই তিনি লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়ে গেলেন ডেক, বললেন সেই চরম পরিণতির উদ্দেশ্যে, নো। তিনি ডেকে দাঁড়িয়ে যখন এমন বারবার চিৎকার করে বললেন, নো, নো। শী ইজ ফেথফুল! সমুদ্রে শয়তান যতই চেষ্টা করুক, সিউল ব্যাংক আমাদের ঠিক কোনো ডাঙায় ভিড়িয়ে দেবে। এতগুলো মানুষের আশা- আকাঙ্ক্ষা এবং নির্ভর বলতে যা কিছু এখন তিনি। চিফ-মেট বুঝতে পারছে সকাল না হলে কিছু স্থির করা যাবে না। তিনিও গলা ছেড়ে বললেন, জাহাজ আমাদের ঠিক পৌঁছে দেবে। নাবিকগণ আপনারা এখন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করুন। ঈশ্বর ব্যতিরেকে সম্বল বলতে আমাদের আর কিছু নেই। তারপর তিনি চিৎকার করে হেঁকে গেলেন, আর্চি আর্চি তুমি কোথায়? তখন মনে হল অতিশয় দূরবর্তী সমুদ্রে কেউ বাতাসে প্রবল শিস্ দিয়ে যাচ্ছে। আর্চির শিসের মতো প্রায় সঠিক আওয়াজ। চিফ-মেট বলল, আর্চি, বোধহয় স্যার সমুদ্রে ভেসে গেল। এবং কি মনে হতেই স্যালি হিগিনস গুম মেরে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক টর্চের আলো দূরবর্তী সমুদ্রের মাথায় ভেসে উঠল। না, কিছু নেই সেখানে সাদা ফেনা সমুদ্রের অথবা জলের বুদবুদ অজস্র। টর্চের আলো ফেলে সর্বত্র এভাবে দেখার সময় স্যালি হিগিনস বললেন, একবার এনজিন-রুমে নামা দরকার! ওখানে যদি আর্চি আটকা পড়ে থাকে। মনে মনে বললেন, ছলনা ছাড়া আমার আর কিছু করণীয় নেই ঈশ্বর।

ওরা সকাল পর্যন্ত চেষ্টা করেও এনজিন-রুমে নামতে পারল না। ধূম উদ্‌গিরণের মতো গরম স্টিম তখনও ভক ভক করে বের হচ্ছে। হালের পিনিয়ান ব্লক করে দেয়া হয়েছে। বড় বড় সব রড ভেতরে ঢুকিয়ে ব্লক করা হয়েছে পিনিয়ান। পিনিয়ান নড়তে পারছে বলে মনে হয় না। শক্ত সোজা লম্বা জলের ভেতরে হাল দাঁড়িয়ে আছে। জাহাজটা এখন কাত হয়ে যাচ্ছে না। সোজা এবং সরল কাঠের মতো ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। ওরা এনজিন-রুমে যখন শেষ পর্যন্ত নেমে গেল, অবাক সিলিণ্ডারের নিচে তিনটে পিস্টন-রড একেবারে হাঁটু ভাঙা দ-এর মতো

উবু হয়ে আছে। সেণ্টার বয়লার ছিটকে বেরিয়ে এসেছে কিছুটা। পোর্ট-সাইড বয়লার স্টাফোর্ড-সাইড বয়লার ঝুলে পড়েছে নিচে। তামার মোটা পাইপ ঠিক সিলিণ্ডারের মুখে ছিঁড়ে গেছে। ইণ্টারমিডিয়েট ভালভের কোনো হদিস নেই। মরা সাপের মুখের মতো হাঁ-করা পাইপ থেকে এখনও অল্প স্টিম বের হচ্ছে। জাহাজের এনজিন একেবারে অকেজো করে দিয়েছে। সমুদ্রের কোনো তুফান এভাবে এনজিন বিনষ্ট করতে পারে না। সেই অশুভ প্রভাব যাবার আগে শেষবারের মতো জাহাজের সব শক্তি হরণ করে চলে গেছে। চিফ-মেট কোথাও আর্চির বিন্দুমাত্র চিহ্ন পেল না। ওরা এখন নিয়তির হাতে পড়ে গেছে। আর একমাত্র সিউল-ব্যাংক পারে কোথাও তাদের এখন পৌঁছে দিতে। ঈশ্বরের প্রায় কাছাকাছি এই বিশ্বস্ত জাহাজ। এত কিছু ঘটে যাবার পরও স্যালি হিগিনস যেন নিশ্চিন্ত। তিনি যেন জানেন ভারী বিশ্বস্ত জাহাজ। এতদিন তার সঙ্গে ঘর করে এ-বয়সে জাহাজের এমন দুঃসময়ে আর তাকে অবিশ্বাস করেন কি করে! আবার তাঁর ছলনা তিনি বললেন, তোমরা আর্চির কেবিন খোঁজ করেছ?

ফাইভার ঝুঁকে ছিল এনজিন-রুমের দরজায়। সে নিচে নামতে সাহস পায়নি। কোথায় কি আগা হয়ে আছে কখন কি মাথার ওপর পড়ে যাবে—সে পেছনে পেছনে দরজা পর্যন্ত গিয়েছিল। আর নিচে নামেনি। তারপর যখন ওরা উঠে আসছে খুব একটা কাজের মানুষের মতো সে চেঁচিয়ে উঠল, কেবিনের দরজা বন্ধ। কেউ সাড়া দিচ্ছে না স্যার, বেঁচে থাকলে ঠিক সাড়া দিতেন তিনি।

স্যালি হিগিনস ডেকে উঠে দেখলেন বাতাস একেবারে পড়ে গেছে। তিনি আর্চির কেবিনে গেলেন না। সারা জাহাজ তাকে ঘুরে দেখতে হচ্ছে। অর্থাৎ তিনি ঘুরে ঘুরে বুঝতে পারছেন জাহাজটার খোলের কোনো ক্ষতি হয়নি। জল ঢুকে যাচ্ছে না জাহাজে। যতদিন খাবার থাকবে জাহাজে সবাইকে তিনি বাঁচিয়ে রাখতে পারবেন। জল, খাবার, কয়লা এখনও মাসের মতো হয়ে যাবে। এবং মাসের ভেতর সিউল- ব্যাংক ঠিক কোনো ডাঙায় তাঁদের পৌঁছে দেবে—অথবা কোনো জাহাজ পাশাপাশি দেখা গেলে, অথবা যদি নিখোঁজ জাহাজের সন্ধানে উপকূল থেকে উড়োজাহাজ চলে আসে কিংবা গভীর সমুদ্রে কোনো মাছ-ধরা জাহাজের সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায়—কিছু একটা ঠিক হয়ে যাবে।

ফাইভার ছুটে এসে বলল, খোলা যাচ্ছে না। কোনো চাবি লাগছে না। ডুপ্লিকেট চাবি পাওয়া যাচ্ছে না। স্যালি হিগিনস জানেন দরজা ভেঙে ঢুকতে হবে। এই ছলনার আশ্রয় না নিয়েও তাঁর উপায় নেই। তবু এসব করার আগে তন্ন তন্ন করে তিনি সব খুঁজে শেষে দরজা ভেঙে যখন বোঝা গেল শেষ পর্যন্ত মহসীন আর আর্চি সমুদ্রে ভেসে গেছে তখন সামান্য সময় মৌন থাকা দরকার। বোট-ডেকে সবাই ফের গোল হয়ে দাঁড়াল। মাথা হেঁট করে সমুদ্রের ভেতর সবাই দাঁড়িয়ে আছে। সবাই সমুদ্রে অসীম জলরাশির ভেতর অথবা আকাশে কোনো দৈববাণী হবে এমন প্রত্যাশা করছে যেন। তখনই ছোটবাবুর মনে হয়েছিল, একমাত্র লেডি অ্যালবাট্রস বুঝি তাদের খবর ডাঙায় পৌঁছে দিতে পারে।

সে ছুটে বোট-ডেক থেকে নেমে গেল। মেন-মাস্টের গোড়ায় দাঁড়িয়ে ডাকল, এলবা আমাদের কি হবে? এলবা ওকে তখন ঘাড় বাঁকিয়ে দেখল। বাতাসে উড়ে গেল না। যেন বাতাসে উড়ে গেলেই সে ভাবতে পারত এলবা ডাঙায় খবর পৌঁছে দিতে যাচ্ছে। সে ফের বলল, আমাদের জন্য তুমি কিছু করছ না! এলবা এবার ঘাড় বাঁকিয়ে দেখল না পর্যন্ত। সে যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। শত চেষ্টায়ও সে পাখিটাকে আজ বাতাসে উড়িয়ে দিতে পারছে না। সামান্য খড়কুটোর মতো অবলম্বন এই জাহাজ এখন সব হারিয়ে শুধু পাখিটার আশায় যেন আছে। সেও চুপচাপ। যেন ছোটবাবু বুঝতে পারছে পাখিটা আর তাকে বিশ্বাস করছে না। এবং কেন বিশ্বাস করছে না সে কি করেছে এমন! সে বলল, আমি কি করেছি? সেই ঘণ্টাধ্বনি যেন ফের—একটা আশ্চর্য ঘোরের ভেতর পড়ে যাচ্ছে সে এবং মনে করতে পারছে সব। সে বলল, না আমি কোনো পাপ কাজ করিনি। আমার কোনো অনুশোচনা নেই। আমি আমার মনুষ্যত্ব হারাইনি। বরং মনুষ্যত্ব আমি এই প্রথম অর্জন করেছি এলবা। আমি এখন সম্পূর্ণ মানুষ। তবু

এলাবা মুখ তুলে তাকাচ্ছে না। ভেতরটা কেমন শঙ্কায় অস্থির হয়ে উঠছে। সে ফের বলল, আমার কিছু আসে যায় না। যদি এটা পাপ কাজ হয়ে থাকে তবে আমার আসে যায় না। বনির জন্য আমি সব করতে পারি। যে-কোনো পাপ কাজ। আমার ভয় করে না।

বরফ-ঘর থেকে সব শুয়োর ভেড়া-গরু তুলে আনা হচ্ছে তখন। অনিমেষের কাঁধে একটা বড় মাদি গরুর ঠ্যাং। সে ছোটবাবুকে দেখে বলল, কিরে বিড়বিড় করে কি বকছিস?

ওদের দুর্জনের কথায় পাখিটা ফের ঘাড় বাঁকিয়ে নিচে তাকাচ্ছে।

বঙ্কু পাশ কাটিয়ে যাবার সময় বলল, কারো মাথা ঠিক থাকবে না। কে কার মাংস কামড়ে খায় এখন দ্যাখো।

ছোটবাবুর কিছুমাত্র ভ্রুক্ষেপ নেই। সে শুধু পাখিটাকে দূরবর্তী কোনো ভূখণ্ডে পৌঁছে যেতে বলছে। কিন্তু সমুদ্রে এলবা কিছুতেই উড়ে গেল না। ফের ঠোঁট গুঁজে দিল পাখার ভেতরে। কত কাল পর কত দীর্ঘকাল পর সে যেন নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। তখন কিছু ডলফিন ভেসে আসছিল, কিছু পারপয়েজ মাছ ঘুরে বেড়াচ্ছিল। এমন একটা অদ্ভুত জীবকে সমুদ্রে আবিষ্কার করে পায়লট মাছের ঝাঁক ধেয়ে আসছে। দুটো একটা অতি ক্ষুদ্রকায় র‍্যামোরা মাছ ইতিমধ্যেই জাহাজের খোলে শামুকের মতো বসে গেছে। আর অন্তহীন জলরাশি লীলাচ্ছলে জাহাজটার চারপাশে খেলা করে বেড়াচ্ছিল।

তখন ফের ছোটবাবু এলবাকে ডাকছে। সামান্য খড়কুটোর মতো পাখিটাই একমাত্র জাহাজের ত্রাণকর্তা। ওর বিশ্বাস পাখিটাই বুঝি একমাত্র এতগুলো অসহায় মানুষের বার্তা ডাঙায় পৌঁছে দিতে পারে। আর আশ্চর্য পাখিটা এত ডাকেও সাড়া দিচ্ছে না। চোখ বুজে আছে। সে বলছে, এলবা কি ভেবেছ! আমরা কি এমন পাপ করেছি যে সমুদ্রে হারিয়ে যাব। আর তখনই যা হয় ঘোরের ভেতর থেকে স্বপ্নাবলীর মতো কঠিন দৃশ্য আবার চোখের ওপর ভেসে যেতে থাকল। ওর গলা বুক শুকিয়ে উঠছে। সে দু'হাত তুলে বলতে চাইল, না না, এলবা আমি করিনি। সত্যি বলছি আমি করিনি। ঘোরের ভেতর কি করেছি আমার মনে নেই। এলবা তবু ঘুমোচ্ছে! কোনো সাড়া দিচ্ছে না। যারা উপাসনার মতো দাঁড়িয়েছিল তারা দেখল ছোটবাবু পাগলের মতো পাখিটার সঙ্গে কি সব কথা বলছে।

এখন এমন সব ঘটনা ঘটবে—কেউ এসবে পাত্তা দিচ্ছে না। ছোটবাবু কেন জাহাজে সবাই উন্মাদ হয়ে যেতে পারে। ছোটবাবু ফের ডাকছে, এলবা আমার কোনো দোষ নেই। এতে আমার কিছু পাপ হয়নি। তুমি বুঝতে পারছ না কেন আমি না করলে বনির কি হত।

দূর থেকে ওরা তখনও দেখছে মাস্তুলের নিচে দাঁড়িয়ে আছে ছোটবাবু। সে তখনও বলে যাচ্ছে—দ্যাখোনা আমার অনুশোচনা নেই। কেউ আবার আসছে না তো? সে চারপাশে দেখল। সে যে ফিসফিস করে কথা বলছে অথবা পাখিটার সঙ্গে এক আশ্চর্য তার টেলিপ্যাথি আছে ওরা কেউ বুঝি তা জানে না। সে বলল, বয়ে গেল! খবর পৌঁছে দেবে না ভারী বয়ে গেল। আমার কোনো দুঃখ নেই। বরং সে বনির জন্য এমন একটা কাজ করতে পেরে ভীষণ খুশী। সে বনির পবিত্রতা রক্ষার জন্য সব করতে পারে। তার আর কোন দুঃখ নেই। সমুদ্রে নির্বাসিত হলেও দুঃখ নেই। কি এক আনন্দে সে ছুটে গেল বনির কাছে। বনির কাছে গেলে শঙ্কা দূর হয়ে যাবে। সে ঘাবড়ে যাবে না। সারা সকাল সে বনিকে জাহাজ-ডেকে দেখতে পায়নি। সে বনিকে কেবল খুঁজছে। ওপরে উঠে দেখল দরজা লক করা ভেতর থেকে। সে ডাকল, বনি বনি।

বনি বলল, শুয়ে আছি। ভারি নিষ্প্রাণ গলা বনির।

—অসময়ে শুয়ে আছ! দরজা খুলে বনি মুখ বাড়াল তখন। বনিকে চেনা যাচ্ছে না, ভারী অসহায় মুখ। মুখে সব আঁচড়। দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনায় যখন মাথা সবার খারাপ হয়ে যাবার জোগাড় ছোটবাবু তখন কেমন চঞ্চল বালকের মতো কি বলতে গেল বনিকে। বনি চাদর গায়ে ফের শুয়ে পড়ছে। বলছে, আমার শরীর ভাল নেই ছোটবাবু। তুমি এখন যাও

ছোটবাবু আর একটা কথাও বলতে পারল না। বনি ওর দিকে তাকাচ্ছে না। কঠিন সংশয়ে বনির মুখ থমথম করছে। কথা বললেই যেন সারা মুখে তার ঘৃণা ফুটে উঠবে। বনি টের পেয়েছে বুঝি ছোটবাবু একজন জঘন্য হত্যাকারী যুবক। বনির সব বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। মানুষ খুন করলে বুঝি মুখের ছবি বদলে যায়। বনি তার দিকে তাকাচ্ছে না। কথা বললেই বনির চোখে মুখে বুঝি অতিশয় ঘৃণা ফুটে উঠবে। সে বনির সামনে আর দাঁড়াতে সাহস পাচ্ছে না। মাথা হেঁট করে নিচে নেমে গেল সিঁড়ি ভেঙে। মনে হল জাহাজে অথবা এই পৃথিবীতে জীবনযাপনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন সব সে হারিয়েছে।

ভেতরে ঢুকে সে এবার কেবিনের দরজা বন্ধ করে দিল। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে মুখে কোনো বীভৎস রেখা ঠিক আর্চির মতো ফুটে উঠে কিনা দেখার সময় সে কেঁদে ফেলল। সে বলল, ঈশ্বর আমি খুন করেছি। আমার পাপের শেষ নেই। পাপের শেষ নেই, পাপ তাকে আজীবন অনুসরণ করবে এবার থেকে। সে অসহায় নিরলম্ব মানুষের মতো এবার দেয়ালে মাথা কুটতে থাকল। সে হাউ মাউ করে কাঁদছে। তার এতদিনের পারিবারিক পরিমণ্ডল নষ্ট হয়ে গেল। সে একজন খুনি।

স্যালি হিগিনসের কাছেও খবরটা পৌঁছে গেল। কেবিনের ভেতরে দরজা বন্ধ করে ছোটবাবু বালকের মতো উপুড় হয়ে কাঁদছে। দরজার সামনে ভিড়। সবাই দরজা খোলার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। কিন্তু খুলতে পারছে না। কেবল ছোটবাবু হাউ হাউ করে কাঁদছে—আর কি সব বলে যাচ্ছে! জাহাজের অনিশ্চিত এই যাত্রায় বুঝি প্রথমেই ছোটবাবু ধরাশায়ী হল। স্যালি হিগিনস দরজার সামনে দাঁড়িয়ে বুকে ক্রস টানলেন। জাহাজে এবার শুধু আত্মহত্যা। সমুদ্রে মরীচিকা দেখে শুধু জলে লাফিয়ে পড়া। মৃত্যু-ভয় মানুষকে এভাবে দীন-হীন এবং বড় করুণভাবে যখন নিয়তির হাতে তুলে দিচ্ছে, স্যালি হিগিনস তখন ছোটবাবুকে দড়িদড়ায় বেঁধে ফেলে রাখার নির্দেশ দিলেন। এছাড়া এখন আর কোনো উপায় নেই। সংক্রামক ব্যাধির মতো রোগটা আবার সবার ভেতর যে কোনো সময় ছড়িয়ে পড়তে পারে।

॥ আটচল্লিশ ॥

স্যালি হিগিনস নিচে আর অপেক্ষা করতে পারলেন না। ছোটবাবুকে সবাই মিলে ডাকাডাকি করছে। ছোটবাবু দরজা খুলছে না। দরজা ভাঙার আগে সবাই এই যেমন ডেবিড, এনজিন সারেঙ বঙ্কু জব্বার বার বার বলেছে, ছোট দরজা খোল। তোর কি হয়েছে! এভাবে তুই শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়লি! ছোটবাবু কোনো জবাব দিচ্ছে না। স্যালি হিগিনস এক মুহূর্ত এখন সময় নষ্ট করতে পারেন না। এনজিন-সারেঙকে শেষ পর্যন্ত দরজায় পাহারা রেখে ওপরে উঠে গেছেন। সব অফিসারদের ডেকে পাঠিয়েছেন। সবাই এলে তিনি সাদা কাগজে পেনসিলে প্রথম বড় বড় তিনটে দাগ কেটে ফেললেন। যেহেতু সব চার্ট, ওসেনোগ্রাফি সংক্রান্ত বই, লগ-বুক সেকসটান, চার্ট-রুমে থাকত অর্থাৎ জাহাজ চালাবার পক্ষে যা কিছু প্রয়োজনীয় সব এখন সমুদ্রগর্ভে—তিনি কিছুমাত্র বিচলিত বোধ না করে খুব সহজভাবে দাগ কেটে জাহাজের অবস্থান মোটামুটি নির্ণয়ের চেষ্টা করার সময় বললেন, আপনারা বুঝতে পারছেন আমরা লয়ালটি দ্বীপের কাছাকাছি কোথাও আছি। জাহাজটা সম্ভবত স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। এবং সম্ভবত দক্ষিণ নিরক্ষীয় স্রোতে জাহাজ ড্রিফটিং হচ্ছে। সামোয়া থেকে পোর্ট-মেলবোর্ণের দূরত্ব ধরুন প্রায় দু'হাজার তিনশ বিশ মাইলের মতো। জাহাজ প্রায় দশ দিন রান করেছে। সুতরাং অস্ট্রেলিয়ার উপকূল থেকে প্রায় বারোশো মাইলের দূরত্বে রয়েছি ধরে নিতে পারি। ঝড়ে যদি সাউথ-ইস্ট-ইস্টে কিছু এগিয়ে যাই দূরত্ব ধরে নিতে পারি সামান্য বেড়ে গেছে। আপনারা কি বলেন?

চিফ-মেট বলল—স্যার, কিছুই তো বুঝতে পারছি না।

—কিছু না বুঝলে এ সময় চিফ-মেট আমাদের চলবে না। যখন আমরা বুঝতে পারছি জাহাজ থেকে নেমে পড়া বোকামি হবে—তুমি ডেবিড কি বুঝছ! সহসা কথা শেষ না করে তিনি ডেবিডকে প্রশ্ন করলেন।

ডেবিড বলল—মাথা স্যার ঠিক নেই। মাথায় কিছু আসছে না।

স্যালি হিগনস বললেন—মানুষকে এ সময়ে সবচেয়ে বেশি শক্ত থাকতে হয়। আচ্ছা ছোটবাবুটা কি! ওকে আমি ভেবেছিলাম এ সময়ে আমাদের বেশি কাজে আসবে। থার্ড, তুমি সব দেখছ ত?

থার্ড-মেট ঝুঁকে বলল—হ্যাঁ। শেষে বলতে চাইলেন হারামজাদা তুমি তবে জানতে সব।

স্যালি হিগিনস দরজার বাইরে একবার ঝুঁকে কি দেখলেন, অর্থাৎ জাহাজে কাজকর্ম ঠিক হচ্ছে কিনা। কারণ এ-সময়ে কাজকামে জড়িয়ে না রাখলে সবার অবস্থা ছোটবাবুর মতো হয়ে যাবে।

তখন ডেক-কশপ বড় বড় সব রঙের টব খালি করে দিচ্ছিল আর মাঝে মাঝে ইনসে আল্লা বলছিল। কাজ করতে করতে সে সোজা ডেকে উঠে নামাজের ভঙ্গীতে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। স্যালি হিগিনস ওপর থেকে চিৎকার করে উঠলেন, হাই। কি হচ্ছে? কাজ কাজ। ঈশ্বরকে ডাকার অনেক সময় পাবে। স্টুয়ার্ডকে ডাকো ডেবিড

স্টুয়ার্ড এলে তিনি গম্ভীর গলায় বললেন—সব বের করে দিচ্ছ তো?

স্টুয়ার্ড সালাম জানিয়ে বলল—হ্যাঁ স্যার। হ্যাম মটন বিফ টার্কি যা কিছু স্টক আছে সব তুলে দিয়েছি ওপরে।

হিগিনস বললেন—ক্যাবেজ কতটা আছে?

—স্যার স্টক বুকটা নিয়ে আসছি।

—ননসেন্স! ভয়। আরে এখন তোমাকে আমি স্টক মেলাতে বলছি না। যা কিছু খাবার আছে এক ফোঁটা নষ্ট হলে জাহাজ থেকে ফেলে দেব বললাম।

—ক্যাবেজ কি হবে স্যার?

—তুলে দাও ওপরে, কেটে সব শুকোতে দাও। তখন তিন-নম্বর মিস্ত্রি ছুটে এল। বলল – চারটা জায়গা করেছি। হয়ে যাবে মনে হয়।

—কোথায় কোথায় করেছ?

—দু'টো ফোর-মাস্টের দু'পাশে আর দু'টো মেন-মাস্টের দু'পাশে।

—বাড়াতে পারছ না?

—আর সব তো কাঠের স্যার। ড্রামে আগুন জ্বললে কাঠের ডেক পুড়ে যেতে পারে।

—বোর্ট-ডেকে বয়-কেবিনের পাশে একটা জায়গা করতে পার।

একটা মস্ত ভুল করে ফেলেছে মতো বলল—তা স্যার ঠিক বলেছেন। ভাণ্ডারীদের বল যা বিফ আর মটন আছে যতটা পারে যেন বয়েল করে ফেলে। বরফ-ঘরে তোমার কিছু রাখা আর ঠিক হবে না। পচে যাবে সব। তারপর স্টুয়ার্ডের দিকে তাকিয়ে বললেন—এক টুকরো খাবার নষ্ট হলে তুমি মারা পড়বে স্টুয়ার্ড। এখন তুমি যেতে পার। তারপর তিনি চিফ-মেটকে বললেন—তবে এটা আমরা বুঝতে পারছি স্রোতের মুখে জাহাজ ঘুরে না গেলে কোনো দ্বীপ-টিপ ঠিক পেয়ে যাব। আর মনে হচ্ছে ঠিক কোনো জাহাজের সঙ্গে দেখা হয়ে যাবে! শুধু ভয়, আমরা স্রোতের মুখে পড়ে না যাই। স্রোতটা যদি সাউথ-ইস্ট-ইস্টে তুলে নিয়ে যায় ভাগ্য আমাদের সুপ্রসন্ন বলতে হবে। চারপাশে অজস্র দ্বীপ-টিপ পেয়ে যাব। পাঁচ-সাতশ মাইলের ভেতরই পেয়ে যেতে পারি। চিফ-মেট কাপ্তানের কথার বিরুদ্ধে একটা কথা বলতে পারছে না। বললে যেন শোনাতো, আপনার কি মাথা খারাপ স্যার। সমুদ্রে পাঁচ-সাতশ মাইল চাট্টিখানি কথা। শুনে তো মনে হয় পাশেই একটা দ্বীপ রয়েছে। আমরা দ্বীপে যেন একেবারে নেমে যাচ্ছি। কিন্তু বুড়োর মুখের ওপর কথা বলার সাহস তার নেই। সন্তান-সন্ততিদের মুখ স্ত্রীর মুখ ভেসে উঠলে ভেতরে ভেতরে পাগল হয়ে যাচ্ছে, অথচ কথাবার্তায় কিছু হয়নি মতো থাকতে হচ্ছে। সে বলল—তা স্যার পেয়ে যাব মনে হচ্ছে।

—সুতরাং খুব ঘাবড়ে যাবে না। আরে জাহাজ তো সিউল-ব্যাংক। তোমাদের বলছি—ভীষণ বিশ্বস্ত জাহাজ। এতগুলো জীবন নিয়ে ছেলেখেলা করবে মনে হয় না।

তারপর তিনি ফের বললেন—যদি ধরো নিরক্ষস্রোতের ঘূর্ণিতে পড়ে যাই তবে আমরা ঠিক কারমাদা দ্বীপের পাশ দিয়ে যাব। ওটা একটা অবশ্য আশার কথা। আর একটা কথা মনে রেখ, স্রোত কখনও ঠিক থাকে না। আমরা এমন সব চোরাস্রোতে পড়ে যেতে পারি যে দেখবে হয়তো জাহাজ যেখানে যাবার ঠিক সেখানেই চলে যাচ্ছে।

ডেবিডের দাঁত শক্ত হয়ে যাচ্ছে। পাগল! পাগলের পাল্লায় পড়া গেছে। সব আজগুবি কথাবার্তা স্রোতে আর জাহাজ কতটা ঠেলে নেবে। জাহাজ তো প্রায় স্থির দাঁড়িয়ে আছে, মনে হচ্ছে যেমন কাঠের গুড়ি ভেসে থাকে তেমনি ভেসে আছে। একটু নড়ছে বলে তো মনে হচ্ছে না। চিফ-মেট আপনিই বা কেন সব কথায় সায় দিয়ে যাচ্ছেন। বলতে পারছেন না বোট দিয়ে দিন আমরা নেমে যাই। অন্তত আর কিছু না হোক বোটে আমরা অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে পারব।

স্যালি হিগিনস ফের উপুড় হয়ে পড়লেন তিনটে দাগের ওপর। মানচিত্র তৈরি করে ফেলেছেন। মে-জুন মাসে কোথায় কোন সমুদ্রে কি স্রোত কি আবহাওয়া কোথায় উচ্চচাপ কোথায় নিম্নচাপ এবং বাতাসের প্রভাবে জাহাজ কতটা কোনদিকে ভেসে যেতে পারে মোটামুটি তার একটা হিসেব দিয়ে বললেন, যদি জাহাজ আমাদের স্রোতের মুখে পড়ে সোজা দক্ষিণে চলতে থাকে তবে নিউজিল্যাণ্ডের উপকূল পেয়ে যেতে পারি। ওটা ধরুন প্রায় আঠারশ মাইলের মতো হবে।

বেজন্মার বাচ্চা হিসাব শেখাচ্ছে। ডেবিড চিৎকার করে উঠতে চাইল। তারপরই মনে হল

একজন যথার্থ নাবিকের পক্ষে এত সহজে ভেঙে পড়া ঠিক না! দুর্বল মানুষের মতো সে ব্যবহার করতে পারে না। ছোটবাবু এখনই তুমি এত ভেঙে পড়লে! আর মা বাবা বুঝি আমাদের নেই, দেশে আমাদের কেউ নেই! কেবল তুমি নিজের কথা ভেবে দরজা বন্ধ করে বসে আছ!

স্যালি হিগিনস বললেন, যদি কোনো কারণে জাহাজের গতি সাউথ অথবা সাউথ-সাউথ-ইস্টে ঘুরে যায় তবে ভাববার কথা এবং যেন মুখে এসে গেছিল, জাহাজ তবে নির্ঘাত সাউথ-ইস্ট থেকে ক্রমে ইস্ট-সাউথ-ইস্টে উঠতে উঠতে একেবারে সোজা পূবমুখে ছুটতে থাকবে। তখন আমরা পাঁচ হাজার মাইলের আগে কোন ভূখণ্ড পাব না। দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে জাহাজ যেতে যেতে আমরা মরে শুকিয়ে কাঠ হয়ে যাব। তিনি একেবারে অন্য কথায় চলে এলেন, চিফ দেখবে কেউ যেন বসে থাকতে না পায়। বসে থাকলেই শয়তানের বাসা হয়ে যাবে।

চিফ বলল, সে দেখছি স্যার।

এবং সবাই নেমে গেল নিচে। বোট-ডেক ধরে হাঁটার সময়, ডেবিড, চিফ মেটকে বলল, কি বুঝছেন স্যার।

—বুড়ো নিজেই একটা শয়তানের বাসা। ওর ভরসায় থাকলে সবাই মারা পড়ব। আমাদের গোপনে বসার দরকার। এবং চারপাশে সমুদ্রে নীলাভ জল আর অন্তহীন দিগন্ত দেখে সবাই কেমন হাহাকার করে উঠল। ডেকে উঠে এলেই বুকের রক্ত হিম হয়ে আসছে। সমুদ্র কি ভয়ঙ্কর কি যে শূন্যতা নিয়ে গ্রাস করার মতো উদ্যত হয়ে আছে। এই মহাশূন্যের ভেতর ওরা না জানি কত দিন ভেসে বেড়াবে। একটা কথা আর কেউ বলতে পারছে না। সূর্য মাথার ওপর উঠে আসছে। আপন মহিমায় তেমনি কিরণ দিচ্ছে। কি শান্ত জলরাশি! সব মাছের ঝাঁক বড় চক্রাকারে ভেসে আসছে। যেন জাহাজটাতে মাংসের গন্ধ পেয়ে গেছে সমুদ্রের অতিকায় সব প্রাণীরা। সব ধেয়ে আসছে। কে বলবে মধ্যরাতে জাহাজটা ঝড়ে তার সব সামর্থ্য হারিয়েছে। মধ্যরাতে সমুদ্র শেষবারের মতো তাদের পঙ্গু করে দিয়ে গেছে। সমুদ্রের শান্ত জলরাশি দেখলে এখন বিশ্বাস করা যায় না তার কোনো দুঃখ অথবা ক্রোধ আছে। বরং দুরন্ত বালিকার মতো ভারী মিষ্টি হাসি হাসছে। ছোট ছোট ঢেউ-এর ভেতর এমন সব সমুদ্রের দুরন্তপানা এবং উজ্জ্বল রোদ নীলাভ জলে বর্ষার ফড়িঙের মতো উড়ে বেড়াচ্ছে।

তখন কাপ্তান-বয় বলল, আপনি জানেন না সাব!

—না তো!

—ওপরে থাকেন শুনতে পাননি!

বনি বলল, সত্যি ভাবতে পারিনি। ছোটবাবু এমন করবে আমি কি করে ভাবব। সে তাড়াতাড়ি প্রায় সবটা কফি একবারে গিলে ফেলার মতো খেয়ে ফেলল। পায়ে স্লিপার গলিয়ে সে ছুটে নেমে গেল। কেবিনে গোপনে লুকিয়ে আয়নায় মুখ দেখে বুঝেছিল কিছু নখের আঁচড় ওর মুখে স্পষ্ট। বাইরে বের হতে সংকোচ ছিল তার। এখন সে সব ভুলে নিচে নেমে গেল। এনজিন-সারেঙ দাঁড়িয়ে আছেন। সে তখনও কত কথা বলে যাচ্ছিল। একটা কথা বুঝতে পারছে না বনি। বনি ফিফিস্ গলায় ডাকল, সারেঙ! সারেঙ-সাব কাছে গেলে বলল, ও কি বলছে?

—তা তো জানি না সাব। কি বলছে জানি না তো! মাইজলা মালোম ডেবিড বলল, ছেলে হাউ হাউ করে কাঁদছে। কোথায় কাঁদছে! আমি তো এসে দেখছি ভেতরটাতে কেউ রা করছে না। কখন কাঁদল! কত ডেকেছি, বলছে কেবল, আপনি যান চাচা আমার কিছু হয়নি। কিছু হয়নি তো দরজা বন্ধ করে আছিস কেন! দরজা খোল। দেখি ভয়ে চোখমুখের কি অবস্থা! আরে বাপু নসিব তো পালটাতে পারবি না। বার বার বলেছিলাম সাব, ছেলে ভেবে দেখ যাবি কিনা! ভাঙা জাহাজ, পুরোনো, কত দুর্ঘটনা ঘটতে পারে—কথা শুনল না। জেদ। জেদ ধরে

চলে এল জাহাজে। আর আমার কি দুর্মতি হল সাব, যদি না নিয়ে আসতাম ঘরের ছেলে ঘরে থাকত আমাকে কলঙ্কের ভাগী হতে হত না।

এসব কথা ছোটবাবু শুনছিল ভেতর থেকে। ওর চোখে জল চলে আসছে। চাচা কার সঙ্গে এতসব কথা বলছে। বরং জ্বালা এই যেমন সে ভেবেছিল তার পরিবারের আশ্চর্য এক পরিমণ্ডলের ভেতর সে মানুষ। তার বাবা মা, পাগল জ্যাঠামশাই, ঈশম অথবা ফতিমা এবং দুর্গাপূজার সময় অমলা কমলা অথবা সেই যে বনের ভেতর কখনও হারিয়ে যাওয়া, পাগল জ্যাঠামশাইকে খুঁজতে গিয়ে কখনও সোনালী বালির নদীর চরে, কখনও হাতীতে চড়ে সে আর জ্যাঠামশাই, পৃথিবী আর আকাশ তখন কত বড় হয়ে যেত তার কাছে। কিংবা সেই অর্জুন গাছে সে যে লিখে রেখেছিল জ্যাঠামশাই আমরা হিন্দুস্থানে চলিয়া গিয়াছি। তার নিরুদ্দিষ্ট জ্যাঠামশাইর জন্য সে অর্জুন গাছে একটা বার্তা রেখে এসেছিল —সব অধিকার থেকে সহসা মনে হয়েছিল সে বঞ্চিত। একজন হত্যাকারী মানুষের জন্য যেন ওরা আর তার নয়। ছোটবাবু ভারী অসহায় বোধ করেছিল। সে কেঁদেছিল। আর যা হয় ভেতরে সেই দাহ—বনি যেন তাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। বলছে—ছোটবাবু তুমি খুনী আসামী। তোমার আর কোনো পরিচয় নেই।

সারেঙ-সাব তখনও অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে। দেখুন সাব আপনি যদি পারেন। আপনাকে তো ভয় পায়। আমাকে তো আর ভয় পায় না। আমাকে মানবেই বা কেন। কত বললাম ছেলে ঘাবড়ে যাবি না। আল্লা মুবারক। ওর ওপরে তো কিছু নাইরে। তাই বলে ভয়ে মাথা খারাপ করে ফেললি! লোকে হাসাহাসি করবে না! লোকে হাসাহাসি করলে আমার সম্মান থাকে কোথায়! তুই তো কিছু বুঝলি না ছেলে, সবাই মুখে রক্ত তুলে খাটছে তুই এখন বসে থাকতে পারছিস ছেলে!

ছোটবাবু আর পারছে না। সে বসেছিল দু'হাতে মুখ ঢেকে। এত কথা কার সঙ্গে বলছে চাচা! সে হঠাৎ টেনে দরজা খুলে বলল, কি হয়েছে আপনার কেবল সেই থেকে ঘ্যান ঘ্যান করছেন! সারেঙ- সাব বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করলেন না। সরল হাসি মুখে ফুটে উঠল। বললেন, ছোটসাব পর্যন্ত এসে গেছে। তুই চল ছেলে, ডেকে চল। সবার সঙ্গে থাকলে মন ভাল থাকবে। আমার সোনা, লক্ষ্মী মানিক চল। সঙ্গে সঙ্গে ছোটবাবুর ফের বুক বেয়ে কান্না উথলে উঠল। সে সোনা ছিল, জাহাজে ছোটবাবু হয়ে গেল। এখন সে ম্যান হয়ে গেছে। সারেঙ-সাব পাশে দাঁড়িয়ে তখন বলছেন, ছেলে তোর কি হয়েছে? এভাবে ছেলে-মানুষের মতো কাঁদছিস কেন? আমরা সবাই দেখবি বাড়ি ফিরে যেতে পারব। ছেলে আল্লার কাছে আমার এত গুণাহ জমা নেই, সমুদ্রে তোকে আমার হারাতে হবে।

ছোটবাবু বলল আপনি যান চাচা আমি যাচ্ছি। ছোটবাবু বনির দিকে তাকাল না। ছোটবাবু ফের বলল, আপনি ভাববেন না চাচা। আমার কিছু হয়েছে ভাববেন না। বাড়ির কথা মনে পড়ে গেছিল। কেন যে মাথাটা গোলমাল হয়ে গেল বুঝলাম না। সারেঙ-সাব পিছিলে চলে গেলে ছোটবাবু খুব শক্ত হতে চাইল ভেতরে। সে বনির দিকে তাকাল না পর্যন্ত। বনি পাশে বালকেডে হেলান দিয়ে আছে। সে ছোটবাবুর দিকে মাঝে মাঝে চোখ তুলে তাকাচ্ছে। ছোটবাবুর পিঠ ঘাড় লম্বা চুল দেখতে পাচ্ছে। আর কিছু না। একবারও তাকে মুখ ঘুরিয়ে দেখছে না ছোটবাবু। সে ভাবল, ডাকবে, ছোটবাবু তোমার কি হয়েছে! কিন্তু ছোট আবার বেশি সাহসী, ছোটবাবু যেন এক্ষুনি দরজা লক করে ডেকে বের হয়ে যাবে। যারা ড্রামে কয়লার বড় বড় উনুন তৈরি করছে, যারা কাঠের ঠেকা তৈরি করছে এবং যারা এখন প্রায় আস্ত গরু অথবা ষাঁড়ের শুয়োরের হতে পারে ভেতরে লোহার শিক ঢুকিয়ে প্রাচীন বন্য মানুষের মতো ডেকে আগুন জ্বেলে ভেড়া গরু হাঁস মুরগী রোস্ট করার ব্যবস্থা করছে, অর্থাৎ এখন সব মাংস পুড়িয়ে গুদামজাত করে রাখা, কতদিন এ-জাহাজ নিখোঁজ হয়ে থাকবে কেউ জানে না।—ছোটবাবুও জানে না, ছোটবাবু যাচ্ছে সে-সবে হাত লাগাতে। সকালে সে একটা সিন ক্রিয়েট করেছিল ভাবতেই সে আর যেন সঙ্কোচে পায়ে জোর পেল না।

ছোটবাবু চলে যাচ্ছিল ভেতরে। বনি ছোটবাবুর হাতে হাত বাড়িয়ে দিল। ছোটবাবু তাকাচ্ছে না। ছোটবাবু এক পা ভেতরে রেখেছে, আর এক পা বাইরে। বনি ওর ডান হাত ছুঁয়ে রেখেছে। কিছুতেই হাতটা আর টেনে নিতে পারল না। সে কেমন শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। বনি হাত ছেড়ে না দিলে ক্ষমতা নেই সে এখন কেবিনের ভেতর ঢুকে যায়। এত সে দুর্বল হয়ে যায় কি করে! কোথায় সেই আশ্চর্য রহস্যময়তা। ডেকে ভীষণ মাংসপোড়া গন্ধ উঠছে। ডেকে আগুনের ভেতর সব শিকে গেঁথে মাংস পোড়ানো হচ্ছে। গরু শুয়োর ভেড়া হাঁস মুরগী। পাঁচটা লোহার পিপের ভেতর আগুন জ্বলছে আর লোহার শিকে গোঁজা প্রায় আস্ত ঠ্যাং শিক-কাবাবের মতো রোস্ট হচ্ছে সব। আর তখন ছোট-বাবুর হাত সামান্য ছুয়ে আছে বনি। কি আশ্চর্য অধিকার। কিছু বলছে না। কোনো কথা বলছে না। কোনো আবদার অথবা অভিমান নেই। তুমি যেখানে আছ ছোটবাবু আমিও সেখানে আছি। যা কিছু পাপ সব আমার তোমার। তুমি একা কেঁদে পাপ থেকে রেহাই চাইবে সে হবে না ছোটবাবু। আমরা দু'জনে মিলে সব পাপের অধিকার বহন করব। সামান্য হাত ছুঁয়ে রেখে রনি এতবড় কথা বলে ফেললে ছোটবাবু এই প্রথম বনিকে টেনে ভেতরে নিয়ে প্রথম বুকে জড়িয়ে নিল। বলল, বনি মাই লিটল্ বনি। মাই ডার্লিং। আলিঙ্গনে অলিঙ্গনে একেবারে পাগল করে দিল। চুমো খেতে খেতে কোথায় কিভাবে যে জীবনের সব আকাঙ্খা ফুটে ওঠে ছোটবাবু জানে না।

সহসা বনি চিৎকার করে উঠল, ছোটবাবু প্লিজ দরজাটা বন্ধ করে দাও।

ছোটবাবু অবাক। দরজা খোলা ছিল। সে তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে যেই না ফিরে এল একেবারে আলাদা মানুষ। কেমন এক বিস্ময় অথবা বলা যেতে পারে সংকোচ—সে এটা কি করতে যাচ্ছিল! বনি তো তার কেউ নয়। সে আর্চির মতো কি সব করতে যাচ্ছিল! অমানুষ হয়ে গেলে তার আর অহঙ্কার বলতে কিছু থাকে না। সে বনির পাশে চুপচাপ বসে পড়ে বলল, বনি সত্যি আমার মাথার ঠিক নেই। তুমি রাগ কর না। তারপর সে বের হয়ে গেল। বনির সমস্ত চোখে উদগত অশ্রু। ছোটবাবু তুমি আমাকে কতভাবে অপমান করবে। তুমি আমাকে ছোটবাবু কি ভাবো...। আমার কি কোনো দাম নেই। আমি এতই খারাপ...?

ছোটবাবু বাইরে এসে অবাক। ওকে আসতে দেখে জব্বার লাফিয়ে প্রায় চলে আসছে। সারেঙ- সাব আসছে। বঙ্কু এবং কেউ কেউ যাদের কাজ এখন আগুনে মাংস ঝলসে ফেলা এবং যারা হাতে ধারালো ছুরি রেখেছে, যখন তখন খুশিমাফিক ঝলসানো মাংস সামান্য কেটে মুখে ফেলে দিচ্ছে, সব ফেলে তারা চলে আসছে। বেশ একটা নতুন পরিবেশ জাহাজে। এবং সিউল ব্যাংক স্থির। সব রেশন জাহাজের সীজ করে ফেলেছে কাপ্তান। ক্রুদের জন্যে সামান্য রসদ বের করে দেওয়া হয়েছে। এই যে সব মাংস ঝলসে রাখা হচ্ছে, কারণ এভাবে মাংস ঝলসে না রাখলে বিকেল থেকেই জাহাজে দুর্গন্ধে টেকা যাবে না। দু- চারদিন সবাইকে কেবল মাংস খেয়ে থাকতে হবে পুরোপুরি। ভাণ্ডারীরা বড় বড় ডেকচিতে যতটা পারছে মাংস খণ্ড খণ্ড করে সেদ্ধ করছে। আর যা হয় ঐ প্রলোভনে পড়ে সমুদ্রের সব বড় বড় হাঙ্গর কি যে অতিকায় তারা জাহাজের চারপাশে জড়ো হয়েছে, সমুদ্রের অতলে নেমে যাচ্ছে, আবার মুখ ভাসিয়ে রেখেছে। ভারি মনোরম গন্ধ। কেউ কেউ জলে বড় বড় কাঠের বাড়ি মারছে হাঙ্গরের মাথায়। চারপাশের সমুদ্রে বীভৎস দৃশ্য। সব ঝাক বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। নীল রঙের পিঠ সাদা রংয়ের পেট। খুশীতে মাঝে মাঝে উল্টে গেলে অতিকায় সব মাছের চর্বির থলে দেখা যাচ্ছে পর্যন্ত। এবং ধারাল দাঁতের ঝিলিক দেখলে প্রাণে আর বিন্দুমাত্র সাহস থাকে না। জাহাজটাকে মনে হচ্ছে সেই হাজার বছর আগের পালতোলা জাহাজের মতো। কেবল সারা আকাশময় এখন ধুম উদগীরণ হচ্ছে প্রবলভাবে। আগুন জ্বলছে লেলিহান জিহ্বায়। তার ভেতরে সব মাংস ঝলসে তুলে নেওয়া হচ্ছে। এভাবে মাংস প্রথমে গুদামজাত করে রাখা, দরকার মতো রোদে শুকিয়ে রাখা, তেলে চর্বিতে ভেজে রাখা, অন্য সব খাবার যা আশু নষ্ট হয়ে যাবার কথা যেমন বাঁধাকপি, ফুলকপি, কাল থেকে ডেকে বাঁধাকপি ফুলকপি কেটে কেটে ত্রিপলে ছড়িয়ে দেওয়া হবে, সব শুকিয়ে যা কিছু খাবার আছে এখন কেবল গুদামজাত করে রাখা। স্যালি হিগিনসের বোধহয় মনে হয়েছে জাহাজে বেঁচে থাকতে হলে এটাই প্রাথমিক প্রচেষ্টা।

তিনি ঘুরে ঘুরে দেখছেন। কেউ আবার সহজেই ঝলসানো মাংস সরিয়ে ফেলতে পারে এজন্য স্টুয়ার্ড যা যা দিচ্ছে আবার তা সঠিক ফেরত আসছে কিনা দেখে নিচ্ছে। কেউ কেউ যে চুরি করে এক দু'খণ্ড মাংস আলগা করে মুখে ফেলে দিচ্ছে—এরই মধ্যে দুটো একটা ঝলসানো ঠ্যাং অথবা মাংসপিণ্ড দেখে সে ঠিক ধরে ফেলেছে। এবং রিপোর্ট করলে স্যালি হিগিনস বলেছেন, কিছু খেতে দাও। একেবারে খেতে না দিলে চলবে কেন।

ছোটবাবুর কাছে প্রায় অশ্বমেধ যজ্ঞের মতো ঘটনা। ফরোয়ার্ড ডেকে আছে চিফ-মেট, দু'জন ডেক- জাহাজি, তিনজন ফায়ারম্যান একজন কোল-বয়। চিফ-মেটের অধীনে দু'টো উনুন, ফোরমাস্টের দু'পাশে। তিন-নম্বর মিস্ত্রি কয়লা বাকেটে তুলে যোগান ঠিক রাখছে। বাংকারে আছে ছোট-টিণ্ডাল। দু'জন কোল- বয়। এবং উইণ্ড-সেলের নিচে একজন উইনচ চালিয়ে কয়লা বাংকার থেকে তুলে আনছে। যেখানে যত কয়লা লাগবে তার তদারকের ভার তিন-নম্বর মিস্ত্রির। ছোটবাবুর মনে হয়েছিল—যখন জাহাজ সমুদ্রে স্থির ভাসমান, সূর্যের মতো গনগনে আগুনে আকাশ দীপ্তিময় তখন শুধু খাওয়া আর বসে থাকা জাহাজে। দূরবীনে চোখ রাখা। আশ্চর্য সে-সবের কিছু নেই। কেউ দেখছে না কেন, কোথাও জাহাজ কিংবা দ্বীপটিপ যদি দূরে দেখা যায়। আর সে উল্টে দেখছে জাহাজের যা কিছু খাবার সব নিচ থেকে তুলে ডাইনিং হলে পাশের খালি কেবিনটায় সাজিয়ে রাখা হচ্ছে। কার্পেন্টার জলের পরিমাণ কত দেখছে। কেউ একদণ্ড দাঁড়াতে পারছে না। অমানুষের মতো সবার চোখমুখে। জব্বার মেন মাস্টের নিচে আছে। এখানে দেখাশোনা করছে ডেভিড। সে ঠিক ঠিক লোহার রডটা ঘুরিয়ে দিচ্ছে মাঝে মাঝে ঠ্যাং অথবা হৃৎপিণ্ড কলজে এবং যা কিছু সব ঝুলছে আগুনের ওপর টিপে টিপে দেখছে। চর্বিপোড়া গন্ধে টেকা যাচ্ছে না। ধোঁয়ায় চোখ জ্বলছে সবার। গরমে সবাই ঘামছে। চোখ লাল। কোমরে ফেটি বেঁধে নিয়েছে কেউ। মাথায় ফেটি। সবাই শ্মশানযাত্রীর মতো। যেন উল্টে-পাল্টে দিচ্ছে হাত-পা শরীর। ছোটবাবুর মাথা গুলিয়ে উঠল।

—হেই ওখানে কেন? এস। হাত লাগাও।

ছোটবাবু কোনো রকমে বলল, যাচ্ছি।

এবং সে নেমেই জোরে একটা লোহার রড ঘুরিয়ে দিল। বোধ হয় চর্বির ভাগ বেশী, একটা বড় সাইজের ভেড়া প্রায় হাত-পা তার এখন লাল, ঘন সাদা আবার ফিনকি দিয়ে বের হচ্ছে যাবতীয় জমে থাকা বরফের রক্ত কণিকা, সব শুকিয়ে কাঠ কাঠ মাংস দিন মাস গেলে চিবিয়ে জীবনধারণ করতে হবে—সে কেমন সাহসী হয়ে গেল। একটা প্রেরণার মতো কাজ করছে বুড়ো মানুষটা। একবার খবরও নিচ্ছে না তার জাতক এ-জাহাজেই আছে, কোথায় কি করে বেড়াচ্ছে একবার দেখছে না। সে বলল, ডেভিড তুমি বরং ঠাণ্ডায় গিয়ে বস। ডেভিড নড়ছে না। রোদে ডেক তেতে আছে এবং সঙ্গে এই আগুনের উত্তাপ প্রায় ফার্নেসে ঢুকে যাবার মতো। ডেভিড ছুরি দিয়ে সামান্য মাংস কেটে দিল, দেখ তো জিভে দিয়ে ঠিক মতো রোস্ট হয়েছে কিনা?

ছোটবাবুর বেশ খিদে পেয়েছে। ডাইনিং হলে আজও হয় তো নিয়মমাফিক খাওয়া হবে। বয়বাবুর্চিরা বড় বেশী এদিকে আসছে না, তবু সে একটু খেয়ে বলল, ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি দ্যাখো।

ডেভিড মাঝে মাঝে ছিঁড়ে খেয়েছে। খেতে ক'টা হবে অফিসারদের কেউ জানে না। এবং জাহাজে কখন খাবার সময় পার হয়ে গেছে—কারো বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই। খাওয়া দাওয়ার কথা কারো মাথায় থাকছে না।

থার্ড-মেটকে নিয়ে তিনি ঘুরছেন জাহাজে। ডেভিডের ওখানে ছোটবাবুকে দেখে বললেন, ছোটবাবু তোমার জীবনটা খুব দামী না হে। আর এতগুলো জীবনের কোনো দাম নেই। ছোটবাবু সঙ্কোচে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকল। সে কি করে বলবে, স্যার আমাকে তেমন ছোট ভাববেন না। কিন্তু সে তো বলতে পারে না। সে তো বলতে পারে না, স্যার আর্চিকে আমি নিঃশ্বাস বন্ধ করে মেরেছি। বিশ্বাস করুন স্যার আর্চিকে সামান্য ইঁদুরের মতো মনে

হয়েছিল। মুখ বালিশে চেপে ধরার সময় মনে হয়েছিল সামান্য একটা জীব। ওকে সমুদ্রে ছুড়ে দেবার সময় মনে হয়েছিল বনি আর কোন অশুভ প্রভাবে পড়ে যাবে না। এত বড় একটা পাপ কাজের জন্য বিশ্বাস করুন আমার এতটুকু অনুশোচনা হয় নি। তখন হিগিনস বললেন, দাঁড়িয়ে থাকবে না। নিচে যাও। চার-নম্বরের কাছ থেকে কাজ বুঝে নাও গে।

সে যখন এনজিন-রুমে নেমে এল, অবাক, এত বড় এনজিনটা কিভাবে হাঁটু মুড়ে পড়ে আছে! সব এলোপাথাড়ি। কনডেনসার, সার্কুলেটিং পাম্প সব গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেছে। বয়লারের গেজ, ফিল্টার বকস্ কোথায় সব ছিটকে বের হয়ে গেছে। এভাপরেটারটা শুধু অক্ষত আছে। সিঁড়ি সব ঝুলে আছে। খুব সন্তর্পণে নিচে নেমে আসতে হয়েছে। তেলের ড্রাম গড়িয়ে ওপরে তোলা হচ্ছে। সে ডাকল! এই এনজিন-কশপ চার নম্বর কোথায়?

আর্চি চলে যাওয়ায় এনজিন-কশপ খুব দমে গেছে। সে বলল, বয়লার-রুমে। টব কেটে সব লম্ফ বানাচ্ছে।

ছোটবাবুকে দেখে চার-নম্বর বলল, তুমি টবগুলো গোল করে কেটে ফেল। দু'টো টব ক্রোজনেস্টে বসিয়ে দিতে হবে। লম্ফের মতো জ্বলবে। যেন দূর থেকে রাতে কোনো জাহাজ সমুদ্রে আমাদের দেখতে পায়। লম্ফ দু'টো মাস্তুলে সারা রাত জ্বলবে। বাংকারে দু'টো লম্ফ আছে আর সারেঙের ঘরে একটা, কশপের কাছে গোটা তিনেক আছে। বুড়োর সব তাতেই তাড়াহুড়ো। বিকেলের ভেতর সব ওপরে তুলে নিয়ে যেতে হবে। এবং ছোটবাবু সামান্য ঘুরে গেলে বলল, ওদিকে যাবে না। সব আম্মা হয়ে গেছে। মাথায় পড়তে কতক্ষণ?

—কিভাবে সব লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে!

—তাই। চার-নম্বর মাথায় সামান্য ফাইলটা ঘসে নিল অর্থাৎ সামান্য তেল লাগিয়ে নেবার মতো সব ভুলে সে ফের ফাইল করছে। কেমন বিড় বিড় করে বলল, জাহাজে সত্যি কিছু একটা অশুভ প্রভাব ছিল ছোটবাবু, যাবার সময় সব নিয়ে চলে গেল জাহাজের। বলেই সে ক্রস টানল। মুখ থম থম করছে চার-নম্বরের। সে বোধ হয় কেঁদে ফেলবে। অথবা নিশ্চিত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ালে মানুষের যে অবস্থা হয় একজন ছন্নছাড়া মানুষের মতো মুখ চোখ— চার-নম্বর ঠিক তেমন হয়ে গেছে! হুঁসের মাথায় সে কাজ করছে না। সে মাঝে মাঝে বলছে, আমরা সবাই মরে যাব ছোটবাবু। আমরা কেউ বাঁচব না। মিরাল কিছু না ঘটে গেলে আমরা কেউ বাঁচতে পারি না।

ছোটবাবু কিছু বলল না। যত ভাবনা বনিকে নিয়ে। সে বুঝতেই পারে না বার বার তার চোখের সামনে কোনো হতাশা ফুটে উঠলে কেন দেখতে পায় বনি কাতর চোখে তাকিয়ে আছে। একটা নিমজ্জমান জাহাজে সে আছে। দেশের কত রকমের ছোট-বড় ছবি, যেমন অনায়াসে সে যে স্বপ্ন দেখেছিল মাথায় এংকারের টুপি সাদা নেভির পোশাক পরে সে ফিরে গেছে বাড়িতে, বাবা-মা রাতে দরজা খুলে লণ্ঠনের আলোতে একজন অপরিচিত সাহেব-সুবো মানুষ দেখে অবাক কে আপনি কাকে চান, তখন সে যেমন ভেবেছিল মা আমাকে তুমি চিনতে পারছ না, আমি সোনা। আমি তোমার মেজ ছেলে সোনা। তোমার নিখোঁজ সন্তান। আমি এত বদলে গেছি! মুখ দেখেও আমাকে চিনতে পারছ না? ছোট ছোট ভাই-বোনের মুখ, ওরা শীতের ভিতর কুঁকড়ে বসে আছে, সে তার দামী কম্বল দিয়ে ভেবেছিল, সংসারের সব শীত নিবারণ করবে, কিছুই আর বুঝি হয়ে উঠছে না—অথচ এখন কোনো তার দুঃখও নেই— কেবল বনির কথা ভাবলে হাহাকার করে ওঠে যেন বুকটা। সে বলল, বুড়ো মানুষটা যখন আছে তখন কোনও ভয় নেই।

চার-নম্বর রোগা মতো মানুষ। ভীষণ কর্তব্যপরায়ণ। সে দেখেছে জাহাজে মানুষটা নিঃশব্দে কাজ করে গেছে। বন্দর এলে সে কাজের পর শুধু মাতাল হয়ে পড়ে থাকত। আর আশ্চর্য সে দেখে ভাবত সকালে চার-নম্বর অসুস্থ থাকবে, ডিউটিতে আসবে না, কিন্তু সেই মানুষ সকালে সরল সোজা আর কি তাজা শিস্ দিতে দিতে নেমে আসত নিচে যেন সে রাতে মাতাল না হলে গভীর ঘুমে ডুবে যেতে পারত না। গভীর ঘুম না হলে সে অসুস্থ হয়ে পড়ত।

সেই মানুষটা পর্যন্ত ঘাবড়ে গেছে।

ছোটবাবু এত দিনে এই প্রথম বলল, কে আছে দেশে?

—দেশে আছে ছোটবাবু, সবার যা থাকে আমার তাই আছে। ছোট দু'টো বাচ্চা ফুটফুটে মেয়ে। বড়টা হাঁটতে পারে, ছোটটা মায়ের কোলে থেকে আমায় আদর জানিয়েছে। ভেবেছিলাম দেশে গিয়ে দেখব ছোটটাও হাঁটতে শিখে গেছে। ওদের দু'জনকে নিয়ে চিড়িয়াখানায় যাব ভেবেছিলাম। বড় মেয়েটার খুব শখ হাতী বাঘ দেখার। কিছু বোধ হয় আর হয়ে উঠবে না। তাছাড়া যেন বলতে চাইল দু-চার দিনের ভেতরই সর্বত্র খবর ছড়িয়ে যাবে—সিউল-ব্যাংক জাহাজের কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। একেবারে মাঝ-দরিয়ায় চুপ মেরে গেছে। তারপর যা হয়, পত্রিকায় ফলাও খবর জাহাজিদের ছবি ছেপে খবর, শেষে সব খবর কেমন মানুষের অগোচরে চলে যায়। আমাদের কথা ছোটবাবু কেউ আর মনে রাখবে না। ঘণ্টায় ঘণ্টায় যে জাহাজটা খবর পাঠিয়েছে ঝড়ের, সেই এখন অকুলে ভাসছে।

ছোটবাবু বলল, আমরা একটা এস-ও-এস পর্যন্ত পাঠাতে পারলাম না।

চার-নম্বর সতর্ক গলায় বলল, বুড়ো মানুষটার কোনো আপশোষ আছে সেজন্য। কেমন মজা পেয়ে গেছে। অন্য কাপ্তান হলে মার্কনি সাবের গলা টিপে ধরত। কোনো এস-ও-এস না পাঠিয়ে কেন স্টেশন লিভ করলে। কৈফিয়ত তলব করত। তারপর একটু থেমে বলল, কিচ্ছু করল না। বুঝলে,সব শয়তানটা জানত।

—জানত মানে?

—জানত না! না জানলে এত স্বাভাবিক কেউ থাকে? যেন মজা পেয়ে গেছে! জাহাজটা এখন আর কেউ স্ক্র্যাপ করতে পারছে না, জাহাজ নিয়ে সারা জীবন সমুদ্রে ভেসে বেড়াতে পারবে।

ছোটবাবু বলল, ওর ছেলে জাহাজে আছে।

—আরে ওকি মানুষ আছে? ও তো সারা জীবন জাহাজ চালিয়ে চালিয়ে একটা অদ্ভুত জীব হয়ে গেছে। সিউল-ব্যাংক ছাড়া মাথায় তার আর কেউ নেই।

ছোটবাবু এ-নিয়ে কথা বলল না। আসলে মাথায় সবার এখন রক্ত উঠে যাচ্ছে। এবং এটা স্বাভাবিক। যত দিন যাবে ওটা বাড়বে। কাপ্তান তখন আর সত্যি মানুষ থাকবেন না। তিনি একটা আস্ত শয়তান হয়ে যাবেন সবার চোখে। আর যা মনে হল, যত দিন যাবে তত এই সব মানুষেরা ক্রমে অমানুষ হয়ে উঠবে। দুর্ঘটনা ঘটে যাবার মুখে কেউ বুঝতেই পারেনি কি ভয়াবহ এই ভাসমান জাহাজে বেঁচে থাকা। দিন যাবে আর ক্রমে টের পাবে খাবার যত ফুরিয়ে আসবে তত টের পাবে, জল যত কমে আসবে টের পাবে। এখনও যে জাহাজে সবাই মুখ বুজে কাজ করে যাচ্ছে সে কেবল তীরের আশায়। কোনো মিরাকলের আশায়।

ঠিক সন্ধ্যার সময় দু'টো মাস্তুলের ক্রোজ-নেস্টে লম্ফ জ্বালিয়ে দেওয়া হল। বেশ বড় টবের মুখে হাসিল পরিয়ে দেওয়া হয়েছে। হাসিল সলতের মতো কাজ করছে। আগুন ধরিয়ে দেওয়া হলে যেন মশালের মতো আকাশে লম্ফ দু'টো জ্বলতে থাকল। টর্চ সহজে কেউ ব্যবহার করবে না। সব টর্চ এখন কাপ্তানের জিম্মায়। চীফ-মেট সব বোট থেকে টেনে নামিয়েছে। সিগন্যালিং লাইট, থ্রি শর্ট থ্রি লঙ, আলোর সিগন্যালিংয়ে দূরবর্তী উপকূলে অথবা জেলে-জাহাজে কিংবা কোনো কার্গো-শিপ যদি যায় তবে বুঝতে পারবে এস-ও-এস আসছে জাহাজ থেকে। যারা সারা দিনমান মাংস ঝলসে গুদামজাত করেছে তারা এখনও কাজ করছে। সব রোস্ট করতে বেশ সময় লেগে যাচ্ছে। আধপোড়া হলেও যেন ক্ষতি নেই। দরকার মতো কাল আবার ঠিকমত ঝলসে নেয়া যাবে। এবং রাতে সেই গোল অগ্নিকুণ্ডের ভেতর মানুষের মুখ লাল আভায় ডুবে থাকল। স্যালি হিগিনস বুঝতে পারছেন জাহাজটা এখন এক দল ক্ষুধার্ত বন্য মানুষের হাতে পড়ে গেছে। অন্ধকার কেবিন থেকে তিনি সব দেখছেন। পোর্ট-হোল খোলা রেখে চারপাশে যা কিছু আছে প্রত্যেকটা পোর্ট-হোলে গিয়ে দাঁড়ালেই

দেখতে পাচ্ছেন। দলে দলে এই সব বন্য মানুষেরা ভাগ হয়ে এখন আগুনের ওপর উপুড় হয়ে পড়েছে। মনে হল সেই আগুনের ভেতর জামা খুলে ছিঁড়ে ফেলে দিচ্ছে কেউ। স্যালি হিগিনস এত ওপর থেকে ঠিক বুঝতে পারছেন না। কে সে? সবাই আগুনের চারপাশে হল্লা করছে। আর লোকটাকে চ্যাংদোলা করে ধরে আনছে। ওর প্যান্ট খুলে আগুনে পুড়িয়ে হাততালি দিচ্ছে। এই বন্য ইচ্ছে কোনো রকমে বেড়ে গেলে ওরা লোকটাকে আগুনে ফেলে দিয়েও তামাশা দেখতে পারে। তিনি আর বিন্দুমাত্র দেরি করলেন না। তিনি বোট-ডেকে বয়-কেবিনের সামনে এসে দাঁড়াতেই বিরাট এক পুরুষের মতো মুখ এবং চার-পাঁচ দিন দাড়ি না কামানোর জন্য সাদা দাড়ি ক্রমে বেড়ে যাচ্ছিল এবং তিনি সেই বোট-ডেকে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে উঠলেন—হাই। সঙ্গে সঙ্গে লোকটিকে ছেড়ে দেওয়া হল। লোকটি একেবারে উলঙ্গ। সে পিছনের দিকে ছুটছে। বন্য লোকগুলো আর হাতে তালি বাজাতে পারল না। আগুনের আভায় তিনি প্রায় যেন জ্বলে উঠলেন। তাড়াতাড়ি ডেবিড লোহার রডে একটা নরম পাছার মাংস গেঁথে আবার দু'টো কাঠের ফাঁকে ঝুলিয়ে দিল। স্যালি হিগিনসের সেই কঠিন চেহারার সামনে আর একটুও বেয়াদপি করার ক্ষমতা তার নেই। সে বিনীত ভদ্র ভাল মানুষ হয়ে গেল। এবং বুঝতে পারছে এক্ষুনি ডেকে পাঠাবে তাকে। কারণ তিনি ফিরে যাচ্ছেন অন্ধকারে। বোট-ডেকের অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছেন। সে ভয়ে আর একবার ফিরে তাকাতে পর্যন্ত পারল না। চোখ মুখে কয়লার ধোঁয়া এবং কালিতে ছোপ ছোপ দাগ, এবং মুখে হাতে পায়ে মনে হয় সে কত দিন যেন স্নান না করে আছে। সমুদ্রে ভয়ংকর ঝড় ছিল বলে এতদিন কেউ দাড়ি কামাবার সুযোগ পায় নি। ফলে সবার খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ডেবিডের থুতনির সামান্য লাল দাড়ির পাশে আগোছালো সেই খোঁচা খোঁচা দাড়ি কেমন তাকে আরও বেশী জংলী করে তুলেছে। বয়স মনে হয় বেড়ে গেছে। ছোট-টিণ্ডালকে নিয়ে এতটা মশকরা না করলেই যেন ভাল ছিল। ওর চারটা বিবি। চার-নম্বর বিবি লিটল গার্ল। বুড়ো বয়সে লিটল গার্ল নিয়ে কি সুখ এবং অদ্ভুত রকমের ঠাট্টা-তামাশা করার স্পৃহা কেন যে জেগে উঠল! সে বলেছিল, লিটিল গার্ল বুড়ো বয়সে সামলাও কি করে?

বাদশা মিঞা হেসেছিল দাঁত বার করে। যেন খুব মজার কথা। সে দাঁত সোনায় বাঁধিয়েছে বিবির জন্য, দাঁত বের করে হেসেছিল।

ডেবিড আগুন উসকে দিয়ে বলেছিল, তুমি কি মিঞা বিবিকে দাঁতে কামড়ে সুখ দাও। টিণ্ডাল আবার হেসেছিল। সাহেব তার বিবিকে নিয়ে বেশ তামাশা করছে যা হোক। সেও মজা পেয়ে গেছিল। বলেছিল, তা পাই।

—তাহলে বাদশা তোমার ওটা নেই

—আছে।

—না নেই।

—আছে সাব।

—তবে দ্যাখাও।

—তোবা তোবা। বাদশা দৌড়ে পালাতে চেয়েছিল।

আর সঙ্গে সঙ্গে সে বলেছিল দু'জন ফায়ারম্যানকে, সে বলেছিল দু'জন গ্রীজারকে, উস্‌কো পাকড়ো। আধা হিন্দী আধা বাংলায় সে যে দু'টো একটা কথা বলতে পারে ওদের মতো সে বলেছিল, পাকড়ো। বোলতা হ্যায় না। এবং সঙ্গে সঙ্গে ওরা চারজন ওকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে এলে কি যে বন্য রসিকতায় সে উন্মাদ হয়ে গেছিল। টেনে জামা প্যান্ট একেবারে খুলে সব আগুনে ছুড়ে ফেলে তাকে উলঙ্গ করে বলেছিল, তোমার কিছু নেই মিঞা। ঝুট বাত বলতা হ্যায়। তুমি নিমকহারাম। অর্থাৎ বোধ হয় অমানুষ অথবা তোমার কিছু নেই শালা, তুমি নপুংসক, কেন লিটল গার্ল ঘরে এনেছ? দেব আগুনে ফেলে। দাঁতে কামড়ে মজা পাও তুমি। আগুনে ফেলে তোমার মজা বের করে দেব। এবং স্যালি হিগিনস পেছনে বোট-ডেকে না

দাঁড়ালে তাকে সত্যি আগুনে ফেলে দিত কিনা জানে না।

তখন বনি ছুটে এসে বলল—তুমি এখন যাও ডেবিড। আমি এখানে আছি।

ডেবিড বলল, কোথায় যাব।

—তোমার ছুটি। এবারে তুমি বরং স্নান-টান করে পরিষ্কার হয়ে নাও। বাবা তোমাকে ছেড়ে দিতে বললেন।

ডেবিড কি করবে বুঝতে পারল না। এমন একটা অমানুষিক খাটুনি জ্যাকের মতো নাবালক পারবে কেন। আগুনের সামনে পাঁচ-দশ মিনিট দাঁড়িয়ে থাকলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে। সে বলল–তুমি পারবে না জ্যাক।

—খুব পারব।

–একা কিছুতেই পারবে না।

—এরা তো আছে।

ডেবিড চলে যাচ্ছিল, তখন দেখল ছোটবাবু নেমে আসছে। মাথায় ফেটি বেঁধে নিয়েছে। সারা রাত ছোটবাবুর মাংস ঝলসে রাখার ডিউটি পড়েছে। আসলে ছোটবাবু করবে। জ্যাক মাঝে মাঝে এটা ওটা এগিয়ে দেবে। এবং ডেবিড চোখ তুলে ওপরে তাকাতেই দেখল অতিকায় দু'টো যেন মশাল জ্বলছে আকাশে। এতক্ষণ সে কিছু খেয়াল করেনি। মশালের প্রতিবিম্ব সমুদ্রে ভাসছে। এবং এক জায়গায় স্থির হয়ে আছে প্রতিবিম্ব। সে বুঝতে পারল জাহাজ সকালে যেখানে ছিল এখনও ঠিক সেখানেই আছে। এতটুকু ভেসে যাচ্ছে না কোথাও। এবং আগুনের আভায় মশালের আলোতে সে লক্ষ্য করল চারপাশে সব সামুদ্রিক মাছ। বড় হাঙ্গর। অক্টোপাস উঠে এলেও বিস্ময়ের কিছু থাকবে না। এবং জাহাজটা যে এক সময় সব ধুর্ত মনস্টারদের আড্ডা হয়ে যাবে না কে জানে! সে ঘরে ঢুকেই গলায় আকণ্ঠ মদ ঢেলে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকল। বুক গলা পুড়ে যাচ্ছে। আহা তবু কি আশ্চর্য আরাম। সে দেয়ালে মুখ লেপ্টে দিল।—এবি তুমি এখন কি করছ! সে ছেলেদের নাম ধরে ডাকতে থাকল, তোমরা সবাই কি করছ, কিছু করতে পারছো না। তারপর নেশার ঘোরে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকল, এবি আমাদের কি হবে। আমরা সবাই মরে যাব।

স্যালি হিগিনস অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন। যারা সারাদিন আগুনের সামনে ছিল তাদের এখন ছুটি। অন্য দল কাজ করছে। এখনও যেন দুর্ঘটনার গুরুত্ব তেমনভাবে কেউ বুঝতে পারেনি। এটা হয়। দুর্ঘটনা ঘটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে না আসলে কতটা তারা বিপন্ন। বুঝতে সময় লেগে যায়। দিন যত যাবে তত সবাই মরিয়া হয়ে উঠবে। আফটার-পিকে এখন একজন জাহাজি চুপচাপ বসে আছে। ওর কাছে রয়েল সিগন্যালিং টর্চ। সে যদি কোনো জাহাজ দেখতে পায়। সে অন্ধকারে এখন ভীষণ সজাগ। দু'ঘণ্টা পর পর ডিউটি পাল্টে যাবে। এবং সকাল হলে তিনি পাহারায় রাখবেন জ্যাককে। জ্যাক, ডেবিড, চিফ-মেট, থার্ড-মেট পালা করে সতর্ক নজর রাখবে চারপাশে। ওরা দূরবীনে যদি কোনো জেলে জাহাজ অথবা কোনো মালবাহী জাহাজ দেখতে পায় দূরে। সবই দুরাশা। তবু যেন বিশ্বাস করতে ভাল লাগে সকাল হলেই দেখতে পাবেন কোনো উদ্ধারকারী জাহাজ সমুদ্রের জল কেটে দ্রুত চলে আসছে। তখন তিনি অনায়াসে সবাইকে নিরাপদে ডাঙায় পৌঁছে দিতে পারবেন।

এবং তিনি এও জানেন আশা কুহকিনী ছাড়া তাঁদের বেঁচে থাকার আর কিছু অবলম্বন থাকবে না। মশাল দু'টো মাস্তুলে দপ দপ করে জ্বলছে। সামান্য হাওয়া পেলে আলোর শিখা লম্বা হয়ে যাচ্ছে এবং কেন জানি মনে হচ্ছে জাহাজ স্থির অনড়। মাস্তুলে অগ্নিশিখা কাঁপছে। জাহাজটা সেই আলোতে ভারী স্তব্ধ হয়ে আছে। সেই যেন সারা মাস কাল সে পিঠে ক্রস বহন করে চলেছে। যেতে যেতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। আর উঠতে পারছে না। সমুদ্রের অতল থেকে ভেসে উঠছে সব সামুদ্রিক মাছ। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। জলে মাছের শব্দ। ওরা বোধহয় জলে একটা আজব জীব ভাসতে দেখে অবাক হয়ে গেছে। কেমন ঠাণ্ডা মরা

ভুতুড়ে জাহাজ ভুতুড়ে আলো জ্বালিয়ে বেশ স্থির। তবে কি জাহাজ কোনো স্রোতের মুখে পড়ে যায় নি! জল দেখে কিছুই স্থির করা যাচ্ছে না। আকাশের নক্ষত্র দেখে তিনি বুঝতে পারছেন না কিছু। প্রতিদিনের মতো একই নক্ষত্রমালা আকাশে দপদপ করে জ্বলছে। এবং মনে হচ্ছে আকাশের নিচে জাহাজের চারপাশে রয়েছে সেই পাখিটা। ধোঁয়া এবং আগুনের জন্য সে মাস্তুলে এসে বসতে পারছে না। সমুদ্রে ভেসে রয়েছে কোথাও। পাখিটা মাঝে মাঝে কক-কক করে ডাকছে। তার শব্দ ভেসে আসছে। আশ্চর্য পাখিটা সেই যে জাহাজের পেছন নিয়েছে, সেই যে কেবল উড়ছে তো উড়ছেই সমুদ্রে থেকে যাচ্ছে না, জীবনে তিনি কখনও এমন দেখেননি। অ্যালবাট্রস পাখিদের দীর্ঘদিন জাহাজের পেছনে উড়তে দেখেছেন। ডাঙা এলেই তাদের আর দেখা যেত না। আবার হয় তো আর এক জোড়া পাখি। কিন্তু লেডি অ্যালবাট্রস একা নিঃসঙ্গ যেন জাহাজটাতেই আছে তার প্রিয়জন। ছোটবাবুর পোষ মানা পাখিটা খাবারের লোভে বুঝি জাহাজ ছেড়ে যাচ্ছে না। এবং কেন জানি এইসব বিপন্ন মানুষের সঙ্গে স্যালি হিগিনসের মনে হচ্ছে পাখিটাও ভারি বিপন্ন। তারা ডাঙায় ফিরে যেতে না পারলে পাখিটাও ফিরে যেতে পারবে না।

সকালে চিফ-মেট দুঃখে হাসবে কি কাঁদবে ভেবে পেল না। এখন থেকে জাহাজে সবার দৈনিক রেশন কি পরিমাণে হবে ভাগ-বাঁটোয়ারার সময় প্রত্যেকের নাম এবং নিবাস লিখে রাখার মতো কাপ্তান পাখিটার নাম এবং নিবাস লিখে রাখলেন। সবার খাদ্যের গড়-তালিকা যেমন হওয়া দরকার ঠিক তেমনি পাখিটারও একটা খাদ্যতালিকা প্রস্তুত হয়ে গেল। চিফ-মেট অতি দুঃখে তালিকাটি দেখার সময় না হেসে পারল না।

স্যালি হিগিনস আড়চোখে চিফ-মেটের মুখ দেখে সামান্য বিরক্ত হলেন। মুখের ওপর তিনি তাকে কিছু বলতে পারলেন না। দূরবীন নিয়ে বোট-ডেকে নেমে গেলেন। তাঁকে সত্যি ভারি দুঃখী এবং অসহায় মনে হচ্ছিল।

চিফ-মেট সহসা তখন লাফিয়ে নেমে গেল পেছনে। বলল, স্যার দেখেছেন?

স্যালি হিগিনস মুখ তুলে দেখলেন চিফ-মেটকে। ভীষণ ঝুঁকে আছে। চিফ-মেট ঘামছে।

—কী হয়েছে?

—যীশুর মূর্তি দেয়ালে নেই।

—তুলে রেখেছি। চিফ বললেন, না ওটা ঝড়ের সময় পড়ে ভেঙে গেছে। ওটা শেষ।

॥ উনপঞ্চাশ ॥

জাহাজ তখন সমুদ্রে ক্রমাগত ভেসে বেড়াচ্ছিল। জ্যোৎস্নার ভেতর জাহাজটাকে আর জাহাজ মনে হচ্ছে না। সত্যি যেন কিংবদন্তীর জাহাজ হয়ে গেছে। অশরীরী আত্মার মতো সে মহাশূন্যে যেন পাড়ি জমিয়েছে।

—স্যার ওরা আপনার সঙ্গে কথা বলতে চায়।

স্যালি হিগিনস কেবিনের ভেতর চুপচাপ বসেছিলেন। টেবিলের লম্ফটা বাতাসে কখন নিভে গেছে, কখন চিফ-মেট ঘরে ঢুকেছে তিনি টের পাননি। তিনি মুখ না তুলে বললেন, কারা দেখা করতে চায়?

—সব জাহাজিরা।

—ওরা দেখা করতে চায়! বল আমি এখন দেখা করতে পারব না। কোয়ার্টার-মাস্টারকে বল লম্ফটা যেন জ্বেলে দিয়ে যায়।

চিফ-মেট বলল, অবস্থা স্যার ভাল না!

—অবস্থা ভাল কে বলেছে!

—ওরা বলছে জাহাজে থাকবে না।

—থাকবে না কোথায় যাবে?

—ওরা বোটে নেমে যেতে চাইছে।

—কতদূর যানে?

—যতদূর সম্ভব।

—যতদূর কি দশ-বিশ মাইল কি পঞ্চাশ-একশ- পাঁচশ মাইল! সহসা উত্তেজিত গলায় বললেন—চিফ-মেট লম্ফটা তোমাকে জ্বেলে দিতে বলেছি না!

চিফ-মেট গলা বের করে ডাকল, কোয়ার্টার মাস্টার। তারপর কেবিনের ভেতর ফের সেই অসহায় অন্ধকার। চোখের ওপর অন্ধকারটা সয়ে গেছিল। বাইরে মুখ বের করতেই সমুদ্রের জ্যোৎস্না ভয়ংকরভাবে চোখের ওপর ঝলমল করে উঠেছিল। এখন কেবিনের ভেতর সে কিছু দেখতে পাচ্ছে না। কেবল ঘুলঘুলির মতো পোর্ট-হোল দিয়ে সামান্য জ্যোৎস্না নেমে আসছে। আর মনে হচ্ছিল মানুষটা একটা ইজি-চেয়ারে চোখ বুজে পড়ে আছেন। ঠিক লম্ফ না জ্বাললে সে বুঝতে পারবে না। বাইরে সেই ক্রোজ-নেস্টে মশাল জ্বলছে। জাহাজের সামনে পেছনে দু'টো অতিকায় লম্ফ ক্রোজ-নেস্টে ঠিক আগের মতো এবং কোথাও থেকে এতটুকু কোনো গণ্ডগোল ভেসে আসছে না। জাহাজটা সহসা ভারী নিশ্চুপ। সবাই যেন জাহাজ ছেড়ে চলে গেছে।

কোয়ার্টার-মাস্টার লম্ফ জ্বালিয়ে চলে গেল নিচে। স্যালি হিগিনস এবার চিফ-মেটের দিকে তাকালেন। বললেন—বোটে তোমরা কতদূর যেতে চাও?

চিফ-মেটের ফ্যাকাশে মুখ আরও ফ্যাকাশে হয়ে গেল। সে বলল, আমি তো স্যার জানি বেশি দূর বোটে যাওয়া যাবে না!

—যাওয়া যাবে না ঠিক না। যাওয়া যাবে। মোটর-বোট যখন বেশ কিছুদূর যেতে পারবে। তেল ফুরিয়ে গেলে পালে হাওয়া লাগবে। সবই তুমি জান। কিন্তু চিফ-মেট সেটা কতদূর! কতদিনে ডাঙা পাবে যখন কিছুই জানো না অহেতুক জাহাজ থেকে নেমে যাবে কেন?

চিফ-মেট বলল—স্যার আপনি কিছু টের পাচ্ছেন না।

কে বলছে টের পাচ্ছি না! সব টের পাই। স্টোররুম থেকে দু'টো কনডেনসড মিল্ক কে চুরি করেছে তাও বলতে পারি। করড্ বিফের প্যাকেট কে নেকড়ায় জড়িয়ে রেখেছে এবং রাতে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে অন্ধকারে বসে খাচ্ছে তা আমি জানি না তো তুমি জানো চিফ-মেট

চিফ-মেট বলল – কিন্তু স্যার সবাই নিচে জড়ো হয়েছে!

—নিচে মানে বোট-ডেকে?

—ইয়েস স্যার।

—কেন? কেন জড়ো হয়েছে? কোনো সাড়াশব্দ পাচ্ছি না তো।

—ওরা স্যার বলছে জাহাজে থাকবে না। নেমে যাবে। চুপচাপ নিচে বসে আছে।

—নেবে যাবে বললেই নেমে যাওয়া যায়! স্যালি হিগিনস এবার উঠে দাঁড়ালেন।—ইউ হেল, গেট-আউট, আই সে গেট-আউট। তোমরা থাকতে আমার কাছে আসে কেন! তোমরা কি করতে আছো জাহাজে!

চিফ-মেট, ডেবিড এবং ক্রমে রেডিও-অফিসার পর্যন্ত এসে গেল শেষ পর্যন্ত।

—আপনি একবার বলুন। ওদের সঙ্গে কথা বলুন। আপনি বুঝিয়ে বললে ওরা শুনবে। স্যালি হিগিনস পোর্ট-হোলে দাঁড়িয়ে বললেন—তোমরা কিছু শুনবে না ডেবিড। তোমরা সব আগেই ঠিক করে নিয়েছ।

ধরা পড়ে গিয়ে আর মুখ থাকে না। তখন প্রায় ক্ষেপে যাবার মতো ডেবিড অনর্গল বলে যেতে থাকল—না স্যার, বুঝতে পারছেন এভাবে দিনের পর দিন আমরা ভাসতে ভাসতে

কোথায় যাচ্ছি! কেবল জল কেবল আকাশ, কেবল জল কেবল আকাশ! কেবল দিগন্ত একই দূরত্ব। যেদিকে তাকাই স্যার সমুদ্র ঠিক একভাবে আমাদের ঘিরে রেখেছে। আমরা স্যার পাগল হয়ে যায়নি এ স্যার আপনার বাবার ভাগ্য। তারপর সে একসকিউজ মি বলে জিভে কামড় দিল এবং রসিকতা পুরো মাত্রায় বিন্দুমাত্র ভয়ডর নেই, সে যে এখন থেকেই জিভ ঝালিয়ে নিচ্ছে বোঝাই যাচ্ছিল। কারণ প্রথমেই তো আর বেজন্মার বাচ্চা বলে আরম্ভ করা যায় না। বাবার ভাগ্য দিয়ে আরম্ভ বেজন্মার বাচ্চা বলে শেষ

স্যালি হিগিনস আর একটা কথা বললেন না ডেবিডের সঙ্গে।

ডেবিড কেমন মরিয়া হয়ে উঠছে—স্যার আপনি আমাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলছেন। আমরা আপনাকে অসম্মান করতে চাই না। আমরা এতগুলো লোক একদিকে আপনি একা একদিকে। মানুষের জীবন মরণ বলে কথা। আপনার ভাবা উচিত।

বাইরে সেই একইভাবে জাহাজে মশালের আলো জ্বলছে। বোট-ডেকে শান্তশিষ্ট বালকের মতো সব মানুষের মুখ। ওরা বসে আছে বোট-ডেকে। প্রায় হরি-সংকীর্তনের বাতাসা নেবে বলে যেন বসে আছে। একটা কথা কেউ বলছে না। ওপরে সব বাবুরা গেছে। বাবুরা ঠিক হেস্তনেস্ত করে আসবে। মশালের আলোতে আবছা ওদের মুখ দেখা যাচ্ছিল—প্রায় সব ফ্যাকাশে মুখ। ভয়ে চোখ ক্রমে কোটরাগত। দপ দপ করে জ্বলছে চোখ। ওরা স্যালি হিগিনসের কাছে এসেছে। ওরা জানে যেহেতু তিনি জাহাজের সর্বময় কর্তা তিনি ইচ্ছে করলে সব বিদ্রোহ সহজেই দমন করতে পারেন। সবাইকে তিনি জাহাজ থেকে যে কেন নামিয়ে দিচ্ছেন না! কি যে স্বার্থ এতগুলো লোকের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার, এখন যত দ্রুত সম্ভব জাহাজ থেকে নেমে পড়া বাঞ্ছনীয়। অথচ তিনি বেশ যেন সমুদ্রে এক চতুর খেলায় মেতে উঠেছেন—তাঁর বিন্দুমাত্র ভাবনা নেই।

তখন ডেবিড রেলিঙে ঝুঁকে চিৎকার করে বলল—তিনি আপনাদের মোকাবিলা করতে চাইছেন না।

ছোটবাবু ফানেলের গুঁড়িতে ছিল। সে বলল—তুমি শিগগির যাও জ্যাক। রাজী করাও। বুড়ো নিজেও মরবে, আমাদেরও মারবে।

জ্যাক বলল, বাবা ভীষণ একগুঁয়ে। আমার কথায় রাজী হবেন না। তুমি আমার সঙ্গে এস। ছোটবাবু এবং জ্যাক প্রায় লাফিয়ে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। ডেবিড ওদের দেখে বলল—তিনি কি ভেবেছেন জ্যাক, তিনি কি ভেবেছেন আমরা এভাবে জাহাজে মরে যাই। বড় অসহায় চোখ ডেবিডের। ডেবিড ভেতরে ভেতরে উন্মাদ হয়ে যাচ্ছে। শুধু ডেবিড কেন, সবাই। ছোটবাবু বলল, ডেবিড মাথা খারাপ করবে না। দেখছি।

সে ঢুকে বলল—স্যার ওদের সঙ্গে আপনি কথা বলুন!

স্যালি হিগিনস কেমন মরিয়া। তিনি বললেন—তোমরা সব ঠিকঠাক করে এসেছ। তোমাদের সঙ্গে আমি কি কথা বলব!

—না স্যার, সব ঠিকঠাক করে আসিনি। আপনি কথা বলুন। কথা না বললে ওরা জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেবে। আপনি একা কিছু করতে পারবেন না। আমরা সবাই এবার বোট হারিয়া করে দেব। বোট সমুদ্রে নামিয়ে জাহাজে আগুন ধরিয়ে দেব। জাহাজটা অলৌকিক না আপনি অলৌকিক কিছু, আমাদের এখন তাই দেখা দরকার। অলৌকিক হলে জাহাজ এবং আপনি নিশ্চিত বেঁচে যাবেন। আমরা আপনাদের কিছু করতে পারব না। আগুনে আমরা আপনাদের পুড়িয়ে মারতে পারব না। আমরা হেরে যাব। আপনি কথা বলুন স্যার। ওরা ভারী সরল সহজ মানুষ। এঁদের সংস্কার রয়েছে কিছু। এবং জাহাজে ওঠার পর থেকে এমন সব ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছে, এমন সব কাণ্ড কারখানা একের পর এক যে ওরা উন্মাদের মতো কিছু করে ফেললে আপনি আমাদের বিশ্বাসঘাতক ভাববেন না। আসলে এটা কোনো বিশ্বাসঘাতকতা নয়। ওরা আপনার ওপর সব বিশ্বাস হারিয়ে ফেলতে বাধ্য হচ্ছে। ওদের

কোনো দোষ নেই স্যার। ওদের দিনের পর দিন জাহাজে আটকে রেখেছেন, বোট দিচ্ছেন না, একবার, দোহাই আপনার ঈশ্বরের, একবার কথা বলুন। ছোটবাবুর কথায় স্যালি হিগিনস বোধহয় সামান্য ভয় পেয়ে গেলেন। জোরজার করে বোট নামিয়ে চলে যাবার আগে জাহাজে আগুন ধরিয়ে দিলে কিছু করার থাকবে না। তাঁর চোখ-মুখ ভয়ঙ্কর কঠিন এবং খাবার ক্রমে ফুরিয়ে আসছে বলে ওরা দুর্ভাবনায় আর মানুষ নেই। এখন এরা সবকিছু করতে পারে। তিনি চোখ তুলে অপলক ছোটবাবুকে দেখলেন। ছোটবাবুকে তিনি অবিশ্বাস করছেন। করুন। সে এখন এছাড়া আর কিছু বলতে পারে না। যেন স্যালি হিগিনস ছোটবাবুর আসল চেহারা এতদিনে দেখেতে পেয়েছেন। ছোটবাবু পর্যন্ত হাত মিলিয়েছে।

স্যালি হিগিনস বাইরে দাঁড়ালেন। চিফ-মেট লম্ফটা হাতে নিয়ে আসছে। চার্ট-রুম, মাংকি-আয়ল্যাণ্ড এবং হুইল-রুম সব উড়ে গেছে বলে রেলিং ভারী নড়বড়ে। যে কোনো সময় স্যালি হিগিনস সামান্য অসতর্ক হলে উল্টে নিচে পড়ে যাবেন। তা ছাড়া তাঁকে যেন পথ দেখানো দরকার—চিফ-মেট আগে আগে লম্ফের আলোতে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল। সমুদ্রে সাদা জ্যোৎস্না। এত. জ্যোৎস্নায় আলো লাগে না। তবু নিচে যারা বসে আছে তারা বোধ হয় দেখে আশ্বস্ত হতে পারবে লম্ফের আলোতে সত্যি তিনি মাথার ওপরে দাঁড়িয়ে ওদের সঙ্গে কথা বলছেন। কি বলবেন, ওরা এক বিন্দু বুঝতে পারবে না। ছোটবাবু ওদের বুঝিয়ে দেবে—পাশে ছোটবাবু দাঁড়িয়ে আছে। ওরা ছোটবাবুকে দেখে নিচ থেকে সবাই হাত নাড়ল।

আর ছোটবাবু দেখল, নিচ থেকে দু'টো মশাল জ্বালিয়ে এনেছে ডেক-কশপ। দু'দিকে দুটো মশাল বসিয়ে দিয়েছে সে। জ্যোৎস্নায় অস্পষ্ট মুখগুলি এবার স্পষ্ট হয়ে উঠছে। ডেক-কশপ বুঝি ভেবেছে এভাবে মশাল জ্বেলে দিলে কাপ্তান সবার মুখ স্পষ্ট দেখতে পাবেন। এতগুলো নিষ্ঠুর অতিশয় ক্রুর মুখ দেখলে তিনি নিজের বিশ্বাসে আর অটল থাকতে পারবেন না। এবং মশালের শিখা পরিব্যাপ্ত হয়ে যাচ্ছে আকাশে বাতাসে। সমুদ্রে এমন যখন বিশালতা আর জাহাজের কিছু নাবিক মৃত্যুর বিভীষিকায় যখন উন্মাদ তখন স্যালি হিগিনস খুব ধীরে ধীরে বললেন—বন্ধুগণ, আমরা এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন। জাহাজ অচল। খাবার শেষ হয়ে আসছে। যা খাবার আছে বড় জোর দু' হপ্তা। প্রায় তিন হপ্তা আমরা জাহাজে ভেসে বেড়াচ্ছি। এতদিন আপনারা ধৈর্য ধরেছিলেন বলে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

ছোটবাবু তাদের এবার সবটা বাংলায় বুঝিয়ে দিল।

—আমরা বিশ্বাস করি, বিশ্বাস ছাড়া আমাদের এখন আর কি আছে! আমরা বিশ্বাস করি সিউল- ব্যাংক আমাদের ঠিক ডাঙায় পৌঁছে দেবে।

ছোটবাবু বুঝতে পারছে স্যালি হিগিনস বিশ্বাস কথাটার ওপর জোর দিচ্ছেন। বারবার। বিশ্বাস কথাটার ওপর সেও বলার সময় বিশেষ জোর দেবার চেষ্টা করল। কিন্তু আশ্চর্য যতটা জোরের সঙ্গে কাপ্তান বিশ্বাস কথাটা উচ্চারণ করেছেন, সে যেন তেমনভাবে পারছে না। এমন নিরুদ্দিষ্ট যাত্রা প্রায় যেন এক অলৌকিক জলযানে এরা নিরুদ্দেশে পাড়ি জমিয়েছে। অথবা তার মনে হচ্ছে আসলে যেন কেউ বেঁচে নেই জাহাজে। এক অন্যলোকে ওরা এসে গেছে। ঝড়ের রাতে ওরা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে সমুদ্রের অতলে। ওরা সবাই সেই সব মানুষের প্রেতাত্মা! এবং মানুষের আকাঙ্ক্ষা মরে গেলেও শেষ হয়ে যায় না—সে আবার ফিরে আসে পৃথিবীতে। অথবা এমন দুর্ঘটনায় যখন মৃত্যু অনিবার্য তখন তো সবাই নিজের নিজের ইচ্ছের কথা স্যালি হিগিনসকে জানাবেই! ওরা দেশে ফিরে যেতে চায়—এমন শব্দগন্ধহীন সমুদ্রে তারা ঘুরে বেড়াতে চায় না। সেও যেমন ভাবত আর্চির ওপর প্রতিশোধ নেবে, মরে গিয়ে সে সেই প্রতিশোধের কথা ভেবে থাকে আর ভাবে ঘটনা সত্যি সে আর্চিকে খুন করেছে। আসলে সে কিছুই করেনি। সবই এক অন্যলোকের ঘটনা। সে মিথ্যে বিশ্বাস কথাটার ওপর জোর দিতে চাইছে। আর এভাবে ওর সত্যি কেন যে মনে হল কেউ বেঁচে নেই। এরা সবাই মানুষের ছায়া। মরে গিয়ে ছায়ার মতো জাহাজে সবাই ভেসে রয়েছে। ঠিক যেমন জলের বুদবুদ ভেসে থাকে সমুদ্রে তারপর সময়ে মিশে যায় সমুদ্রে তেমনি তারা এখন দুর্ঘটনা ঘটে যাবার পর

বুদবুদের মতো পৃথিবীর বাতাসে ভেসে রয়েছে। সময় হলেই তারা বাতাসে মিশে যাবে। কোনো আর চিহ্ন থাকবে না।

সে কেমন সব গুলিয়ে ফেলেছে। একটা কথাও সঠিক প্রকাশ করতে পারছে না। স্যালি হিগিনস পর পর কি বলে যাচ্ছেন সে বুঝতে পারছে না। এতগুলো মানুষের মুখমণ্ডলে কেমন কঠিন চোখ এবং মশালের আলোতে ওরা যেন সত্যি আর পৃথিবীর কেউ নয়। মাস্তুলে আগুনের প্রজ্বলিত শিখা যেন আকাশ এবং সমুদ্রে ভাসমান। স্থির। নক্ষত্রমন্ডলে তাদের বুঝি এখন প্রতিবিম্ব ভাসছে। সে বলল– আজ আসুন বরং স্যার আমরা কিছু সত্যি কথা বলি। আর্চি কোথায়। সে তো নেই—সে গেল কোথায়!

স্যালি হিগিনস বললেন—ছোটবাবু এটা ফাজলামির জায়গা না। তুমি কিছু বলছ না। একটা কথা বলছ না আজে-বাজে বকছ। বেশি আজে বাজে বকলে জাহাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেব। এবং ছোটবাবু কেমন সম্বিত ফিরে আসার মুখে বলল–স্যার আপনার কি মনে হয় না আমরা এক অলৌকিক জলযানে ভেসে যাচ্ছি। মনে হয় না আমরা সত্যিকারের কেউ বেঁচে নেই। মনে হয় না আমাদের যাত্রা অন্য কোনো গ্রহলোকে, আমরা আর পৃথিবীর মানুষ না। মরে গিয়ে পৃথিবীর মানুষ ভেবে সান্ত্বনা পাচ্ছি। সহসা জ্যাক ছুটে এসে বলল তখন, ছোটবাবু প্লিজ! কি তুমি আজে-বাজে বকছ। তুমি কি সবার মাথা খারাপ করে দেবে?

ছোটবাবু কেমন ফ্যাকাশে মুখে বলল—আমি সবার মাথা খারাপ করে দিচ্ছি!

জ্যাক বলল—দিচ্ছ না! তুমি ভাগ্যিস বাবাকে বলেছ। এখন যদি তোমার ভাষায় বলতে, কি হত বলত!

তখন পাঁচ-নম্বর এসে দাঁড়াল। সে স্যালি হিগিনসকে মাথা নুইয়ে বাউ করল। একসকিউজ মি! এমন বলল। লম্ফের আলোতে ডেবিড়, পাঁচ-নম্বরের মুখটা তুলে দেখাল সবাইকে। ডেবিড ওকে ঠেলে পাঠিয়েছে ছোটবাবুর কথাগুলো বাংলায় এখুনি সবাইকে বুঝিয়ে বলতে হবে! এমন মওকা আর পাওয়া যাবে না!

পাঁচ-নম্বর তখন বলছে, ছোটবাবু কি বলছে শুনুন।

ছোটবাবু বলল—ছোটবাবু কি বলছে—ছোটবাবুই বলবে ফাইভার......। — আপনারা শুনুন আমি কি বলছি। পাঁচ নম্বর বলল, ছোটবাবু বলছে.....।—ছোটবাবু বলল—আমার কথা আপনারা আমার কাছ থেকে শুনবেন না ফাইভারের কাছ থেকে শুনবেন?

সবাই হাত তুলে দিল। কেউ বোধ হয় বিরক্ত হয়ে ছুটে আসছে। কে আসছে ওটা! এনজিনকশপ সে এসেই একটা মশাল নিচ থেকে চিৎকার করে ওপরে ছুঁড়ে মাড়ল! ছোটবাবু সেই মশাল ত্বরিতে খপ করে ধরে ফেলল। তারপর ফের ছুঁড়ে দিয়ে বলল—এনজিন-কশপ জায়গারটা জায়গায় রেখে দাও। মাথা গরম করবে না।

ছোটবাবু চিৎকার করে এবার বলল—কাপ্তান সিউল-ব্যাংকের ওপর বিশ্বাস হারাতে আপনাদের বারণ করছেন। বিশ্বাস হারালে আমাদের আর কিছু থাকে না বলছেন। জাহাজ অচল, জাহাজে খাবার ফুরিয়ে এসেছে, আমরা চানের জল পাচ্ছি না, আমাদের এখন নোংরা জামাকাপড়ে থাকতে হচ্ছে। তিনি জল পর্যন্ত রেশন করে দিয়েছেন, সবাই কোনো না কোনো দিন আমরা ডাঙায় ফিরে যাব বলে।

পাঁচ নম্বর বলল—ছোটবাবু তুমি কিন্তু নিজের কথা বললে না।

পাঁচ নম্বর ভারী লম্বা মানুষ। ছোটবাবুকে অরাও লম্বা মনে হচ্ছে। ছোটবাবু কালো প্যান্ট হলদে শার্ট পরে আছে। সামান্য শীত লাগছে। ওর চুল এখনও মনোরম। সে তো কখনও দাড়ি কামায় না। ডেবিড এবং অন্য সবাই দাড়ি কামানো-টামানোর পাট প্রায় তুলে দিয়েছিল। সকালে কাপ্তান পাইকারি হারে সবাইকে দাড়ি কামিয়ে ঘরে হাজিরা দিতে বলেছিলেন। সবাই দাড়ি কামিয়ে মুখ দেখিয়ে গেছে। স্যালি হিগিনস ঠাট্টা করে বলেছিলেন, তোমাদের সবাইকে জামাই জামাই লাগছে হে! বোকার মতো হেসে সবাই বের হয়ে এসেছিল –কি যে বলেন

স্যার! আর সেই লোকটার মুখ এখন কি নিষ্ঠুর। প্রায় নিয়তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন মাথার ওপর। মনেই হয় না মানুষটা জীবনে কারও সঙ্গে কোনো রসিকতা করেছেন

পাঁচ-নম্বর ফের বলল—তুমি কি বলেছিলে একবার বল।

এনজিন-কশপ ভিড়ের ভেতর থেকে উঠে দাঁড়াল। সে চিৎকার করে বলল—আমরা শুনতে চাই।

এবং পাশাপাশি আর যারা ছিল ছোটবাবু অবাক সবাই বলছে—আমরা শুনতে চাই।

সে এমন কাউকে দেখল না যে বলতে পারে, না শুনতে চাই না! সে সারেঙ-সাবকে খুঁজছে! সব মুখগুলো সে একে একে চিনতে পারছে। যতই বন্য হয়ে যাক যতই তারা অমানুষ হয়ে যাব সে সবাইকে চিনতে পারছে। কেউ উবু হয়ে বসে আছে। কেউ পা ছড়িয়ে দিয়েছে। কেউ সব হারিয়ে গেলে মানুষের যে মুখ যে উদাসীনতা অর্থাৎ মৃত্যু চারপাশে হাত তুলে নৃত্য করে বেড়ালে তখন যেমন লাগে মানুষকে হুবহু সেই সব ছবি! ঠান্ডা বাতাস সমুদ্র থেকে উঠে আসছে। বাতাসে জলের ভেজা গন্ধ। জলে কোনো অতিকায় মাছের ভেসে বেড়ানোর শব্দ। অথবা দূরে রাশি রাশি পাইলট ফিশের ঝাঁক। নিচে জাহাজের অতলে সব জোনাকির মতো জেলি-ফিশেরা সাঁতার কাটছে। এবং র‍্যামোরা মাছের প্রবল আক্রমণে জাহাজের খোল এখন হিজিবিজি আঁসের মাছ যেন একটা। এত বড় খোলের কোথাও আর বিন্দুমাত্র জায়গা নেই যেখানে ফাঁক রয়েছে। র‍্যামোরা মাছ ছোট গুগলির মতো নিজের আশ্রয় ইতিমধ্যে গড়ে তুলেছে এবং ক্রমে সময় পার হয়ে গেলে ছোটবাবুর মনে হল খোলের ইস্পাতে সব শ্যাওলা জমে বড় বড় দাড়ি এবং অতিকায় জলযানটা একসময় জলচর প্রাণী হয়ে যেতে পারে সে কোনো সময়। চারপাশে সাদা জ্যোৎস্নায় মরা সমুদ্রে এমনই মনে হল তার। এবং সঙ্গে সঙ্গে সে হাত তুলে বলল—আমার কখনও এটা কেন যে মনে হয় আমরা যেন এক অলৌকিক জলযানে ভেসে যাচ্ছি। যেন নিয়তির মতো এই যান। আমরা নিজেরা জানি না কোথায় তাকে নিয়ে যাব অথচ কি আশ্চর্য দেখুন ঠিক কোথাও যাবার জন্য আমরা প্রত্যেকে বের হয়ে পড়েছি—সেই কবে থেকে যেন সেই, আচ্ছা, আপনারা কেউ বলতে পারেন সেই কবে থেকে আমরা যানে চড়ে বের হয়ে পড়েছি—কেউ মনে করতে পারছেন না, এই সেদিন লক্ষ কোটি বছর আগে........।

—ও হো ছোটবাবু তুমি অন্য কথায় চলে যাবে না। ঠিক ঠিক বলে যাও। লম্ফটা এবার পাঁচ নম্বর ছোটবাবুর মুখের সামনে তুলে ধরল।

স্যালি হিগিনস ঠিক ছোটবাবুর পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। লম্বা রেলিং। তার পাশে চিফ-মেট, ডেভিড এবং রেডিও অফিসার। দোমড়ানো ফানেলের গুঁড়িতে বনি তেমনি তাকিয়ে আছে ওপরে। নিচে নেমে ছোটবাবু এবং বাবা তারপর এই জাহাজিরা কিভাবে পরস্পর মোকাবেলা করবে সে বুঝতে পারছে না। সে ভীষণ উদ্বিগ্ন চোখ মুখে প্রত্যাশায় আছে, ছোটবাবু ঠিক সব সামলে দিতে পারবে। কিন্তু কেমন জল ঘোলা করে ফেলেছে ফাইভার। ওরা পরস্পর বচসা করছে মতো! ছোটবাবুকে অপদস্থ করার জন্য বার বার চাপ দিচ্ছে।

আর ছোটবাবু তখন আবার জাহাজিদের উদ্দেশ্য করে কি সব বলে যাচ্ছে। আশা করছে ছোটবাবু ওদের বলে দিয়েই সে ফের এই সব ইংরেজ অফিসারদের বুঝিয়ে বলবে।

ছোটবাবু যা যা বলেছিল সব হুবহু বললে—পাঁচ নম্বর হৈ চৈ বাঁধিয়ে দিল—তবে! ডেভিড বুঝতে পারছ?

ডেভিড বলল—না। কিছু বুঝতে পারছি না।

পাঁচ-নম্বরই ইংরেজীতে বলল—স্যার। সে স্যালি হিগিনসকে উদ্দেশ্য করে বলছে।

—দ্য বাস্টার্ড। স্যালি হিগিনস ক্ষেপে গেলেন। এই ফাইভারের এত রোয়াব। সময় বুঝে বদলা নিচ্ছে। আর ছোটবাবুর কথা শুনে স্যালি হিগিনস একেবারে থরথর করে কাঁপছেন উত্তেজনায়।

—কি কি বলছ! এটা অলৌকিক জলযান! আমরা কেউ বেঁচে নেই। আমাদের যাত্রা অন্য কোন গ্রহলোকে। আমরা আর পৃথিবীর মানুষ না। ননসেন্স। স্যালি হিগিনস আর চুপচাপ থাকতে পারলেন না। মিথ্যে কথা। ছোটবাবু আপনাদের মিথ্যে কথা বলেছে। এটা অলৌকিক জলযান নয় আমি বলছি। আমরা বেঁচে আছি আমি বলছি। আমরা অন্য কোন গ্রহলোকে পাড়ি জমাচ্ছি না। আপনাদের ভয় পাইয়ে দেবার জন্য এসব ছোটবাবুর ষড়যন্ত্র। এরা সবাই আপনাদের ভয় পাইয়ে দিতে চায়। এটা ভুতুড়ে জাহাজ এটার মাথা ঠিক নেই—ঠিক না। এটা আর দশটা জাহাজের মতো জাহাজ, আর দশটা জাহাজের মতো এর কলকব্জা। দশটা জাহাজের মতো এটা পুরানো। পুরানো গন্ধ এর শরীরে আছে। এর ইস্পাত আর দশটা জাহাজের চেয়ে সামান্য আলাদা। কম্পাসে সামান্য গন্ডগোল দেখা দিত মাঝে মাঝে। আসলে জাহাজটা সম্পর্কে এত বেশি প্রচার ছিল, এত পুরোনো সব খবর জাহাজিদের ঘরে ঘরে পৌঁছে গেছিল যে জাহাজে উঠলেই সবাই ভয়ে একটা অস্বস্তিকর পরিবেশে পড়ে যেত। শুধু গুজব গুজব এ জাহাজটাকে এমন একটা অবস্থায় ফেলে দিয়েছে। ছোটবাবু তুমি কী! তুমিও ছোটবাবু শেষ পর্যন্ত..... তোমার ওপর খুব বেশি নির্ভর করেছিলাম হে। হাতের শেষ তাসটাও কেড়ে নিলে!

ছোটবাবু ততোধিক চিৎকার করে বলল—ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস আপনি আমাকে ভুল বুঝবেন না। এবং তারপর কাপ্তানের সব কথার বাংলা করে দিলে এনজিন-কশপ, ডেক-সারেঙ সবাই উন্মত্তের মতো লাফাতে থাকল—মানি না। এটা কাপ্তান বাড়িয়ে বলছে। যদি আর দশটা জাহাজের মতো হয় তবে আমাদের এভাবে আটকে রেখে কি লাভ। তিনি কি জাহাজে রেখে সবাইকে মেরে ফেলতে চান। শয়তানির একটা সীমা থাকা উচিত।

ছোটবাবু বলল—স্যার ওরা বলছে আর দশটা জাহাজের মতোই যদি হয় তবে সবাইকে জাহাজে আটকে রেখেছেন কেন? বোট দিচ্ছেন না কেন?

স্যালি হিগিনস এবার ধীরে ধীরে বললেন—বন্ধুগণ, বোটের চেয়ে জাহাজে বেশি আপনারা নিরাপদ।

ছোটবাবু বলল—বোটের চেয়ে জাহাজে আপনারা বেশি নিরাপদ।

ডেবিড বলল—মিথ্যা কথা।

স্যালি হিগিনস ভীষণ ধমকে উঠলেন—ডেবিড!

ডেবিড বলল—আমরা তবে স্যার এভাবে বসে বসে নিয়তির হাতে মার খাব?

—কোনো উপায় নেই। প্লিজ ডিপেনড অন দ্য ফেট।

নিচ থেকে সোরগোল উঠছে। বাংলায় বলুন। বুঝতে পারছি না কি বলছেন।

ছোটবাবু বলল——ডেবিড বিশ্বাস করছে না জাহাজ বোটের চেয়ে বেশি নিরাপদ জায়গা।

সমস্বরে সবাই চিৎকার করছে, আমরাও বিশ্বাস করছি না। আমরা সমুদ্রে নেমে যেতে চাই। আমরা সমুদ্রের সঙ্গে লড়াই করতে চাই। সমুদ্রের হাতে বসে বসে আর মার খাব না। সমুদ্রের হাতে পুতুল বনে যেতে চাই না।

স্যালি হিগিনস ছোটবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন, কখন ছোটবাবু ওদের কথা সব খুলে বলবে।

ছোটবাবু বলল–স্যার ওরা তো ঠিকই বলছে। ওরা বলছে বসে বসে নিয়তির হাতে মার খাবে না। ওরা বোট নিয়ে ভেসে পড়তে চায়। ওরা লড়তে চায়।

স্যালি হিগিনস দাঁড়িয়ে থাকলেন। তিনি স্লিপিং গাউন পরে আছেন। সোনালী রঙের স্লিপিং গাউন। জ্যোৎস্নায় তার গেরুয়া রং ধরেছে। দাড়ি না কামানোর জন্য বেশ বড় দাড়ি। মাথার চুল সাদা বলে খুবই প্রাজ্ঞ পুরুষ মনে হচ্ছে। তিনি এবার সত্যি সত্যি জাহাজ সমুদ্র এবং এই সব নক্ষত্রমালা সম্পর্কে এমন খবর দেবেন যে সবাই তাজ্জব বনে যাবে। যেন এক্ষুনি বলবেন

সমুদ্রকে তোমরা কতটুকু চেন! সিউল-ব্যাংককে তোমরা কতটুকু জান! তোমরা যখন আমার চেয়ে বেশি জান না তখন আমার ওপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় কি! কিন্তু তিনি আর কিছুই বললেন না। শুধু বললেন—আপনাদের কি মনে হচ্ছে না জাহাজ কোথাও যাচ্ছে! আপনারা কি বুঝতে পারছেন না জাহাজ এক জায়গায় নেই। বোটের কম্পাস থেকে আমি বুঝতে পারছি জাহাজ তার কোর্স পাল্টে ফেলেছে। চোখের ওপর অবশ্য মনে হয় জাহাজ স্থির—এত বড় সমুদ্রে এ ছাড়া কিছু বোঝারও উপায় নেই। তবু বলছি জাহাজ আমাদের ওয়েস্ট-নর্থ-ওয়েস্টে উঠে যাচ্ছে। জাহাজ তার কোর্স পাল্টে ফেলেছে যখন আমাদের ভয় নেই। আমরা এবার সামনে অসংখ্য দ্বীপ পেয়ে যাব। পাঁচ সাতশ মাইলের ভেতর এখানে আছে অসংখ্য দ্বীপ। বলা যায় না ফিজিতেও গিয়ে আমরা উপস্থিত হতে পারি। ভাগ্য যদি তেমন সুপ্রসন্ন থাকে ভিতিলেবুতে যেতে পারি। আরও ওপরে ফানফুতি—যদি জাহাজ চোরাস্রোতে কোরাল সীতে ঢুকে যায়, চারপাশে থাকবে নিও-ক্যালেডোনা, নিউ হেবরাইটস রতুম, সান্তাক্রুজ, সালামন দ্বীপপুঞ্জ, এমন কি আর একটু ওপরে উঠে গেলে এলিস। সেখানে খাবার থাকবার এবং ঘরে ফিরে যাবার সব রকমের ব্যবস্থা।

বঙ্কু বলল তখন—অ ছোটবাবু, সাহেব এত কি বলছে রে!

জব্বার বলল—অ ছোটবাবু, নাকে নস্যি গুঁজে দাও। নইলে থামবে না।

বাধা পেয়ে স্যালি হিগিনস থেমে ছোটবাবুর দিকে তাকালেন। ছোটবাবু বলল—স্যার আপনি বলে যান। ওদের কথায় কান দেবেন না।

মনে হল সব বুঝতে পারছেন তিনি। এই জাহাজিরা তাকে এখন অপমান করতে চায়। তিনি জানেন তাঁর কাছে যেহেতু একমাত্র আগ্নেয়আস্ত্র আছে এবং তিনি যেহেতু যে কোন জাহাজিকে টেনে এনে বুলেটের সামনে দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন—তিনি বোধ হয় সেজন্য আদৌ বিচলিত হচ্ছেন না। তাঁর গলা মাঝে মাঝে চড়ে গেলেও অধিকাংশ সময় মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করে যাচ্ছেন।

—আর ছোটবাবু তুমিও শালা শেষ পর্যন্ত দালাল হয়ে গেলে। বঙ্কু লাফিয়ে রেলিঙের নিচে এগিয়ে এল।—কি বলছে সাহেব। ছোটবাবু ফের সবটা বুঝিয়ে বললে—এবার আর কেউ যেন তেমন চিৎকার চেঁচামেচি করে উঠল না।

ওদের মুখ দেখে স্যালি হিগিনস কিছুটা স্বস্তি বোধ করছেন। তিনি ফের ওদের ভুল ধারণা মন থেকে মুছে ফেলার জন্য বললেন—এসব দ্বীপ আমরা পাঁচ-সাতশ মাইলের ভেতর পেয়ে যাব আশা করছি।

ডেবিড তখন আর ধৈর্য ধরতে পারল না। সে চিৎকার করতে করতে নেমে যাচ্ছে।

—সব ভাঁওতা। আপনারা এর বিন্দু-বিসর্গ বিশ্বাস করবেন না। দোহাই ঈশ্বরের, আপনারা ফাঁদে পা দেবেন না। তিনি মুখে যাই বলুন মনে মনে জাহাজের অলৌকিকত্বে বিশ্বাসী। তাঁর বিশ্বাস জাহাজ ঠিক আমাদের পৌঁছে দেবে। সব ওঁর মনগড়া কথা। জাহাজের তো আর পাখা গজায়নি!

ছোটবাবু এখন কাকে কি বলবে বুঝতে পারছে না।

ডেবিড তখনও তারস্বরে চিৎকার করছে।—এখনও আপনাদের সময় আছে। এই ছোটবাবু তুমি ওদের বোঝাও। বুড়োর কথায় ওরা তো সব বুঝে ফেলেছে। দ্যাখো সবাই মাথা নুয়ে চলে যাচ্ছে মতো। এই এনজিন-কশপ কোথায় যাচ্ছ! জাহাজের খাবার ফুরিয়ে গেলে কি করবে! জল ফুরিয়ে গেলে! চিফ-মেট আপনি একটা কথাও বলবেন না! জাহাজ এক ইঞ্চি নড়ছে না এটাও বলবেন না! এবং এ-সময় যা হয় চোখের ওপর শুধু শহর নদী গাছপালা এবং গমের খেত। আর সেই প্রিয়জনেরা মুখের ওপর মিছিলের মতো সরে সরে যায়! তখনই সে মরিয়া হয়ে বলল—আমি থাকব না, এ জাহাজে থাকব না। সমুদ্র অনেক নিরাপদ জায়গা। জাহাজের অশুভ প্রভাবে থাকলে আমরা কেউ বাঁচব না। বলতে বলতে সে একেবারে বোটের

নিচে হামাগুড়ি দিয়ে সত্যি সমুদ্রে লাফিয়ে পড়তে যাচ্ছে। এবং তখন যে যার মতো ছুটছে ডেভিডকে ধরার জন্য। ছোটবাবু তখন বিরক্ত মুখে যেন না বলে পারল না, স্যার কেন এদের আটকে রেখেছেন! এদের বোট দিয়ে দিন। যারা নেমে যেতে চায় নেমে যাক।

স্যালি হিগিনস প্রায় কৈফিয়তের সুরে বললেন—ছোটবাবু জাহাজ ভেসে থাকলে আমাদের চলে যাবার নিয়ম নেই। জাহাজ ডুবে যেতে থাকলে উই ক্যান এবানডান দ্য শিপ। কিন্তু সে তো আমাদের জলে ভাসিয়ে সমুদ্রের অতলে ডুবে যাচ্ছে না। এর জন্য তার প্রতি তোমাদের এতটুকু কৃতজ্ঞতা নেই!

ছোটবাবু কেমন বোবা বনে গেল। কী আন্তরিক কথাবার্তা তাঁর! থার্ড-মেট বলল—স্যার দেশলাই আছে? লম্ফটা নিভে গেছে আবার। ডেভিডের পা কেটে গেছে ছুটতে গিয়ে। বেনজিন লাগাতে হবে।

স্যালি হিগিনস পকেট থেকে দেশলাই বের করে লম্ফটা জ্বালালেন। অল্প অল্প হাওয়া বইছে। থার্ড মেট হাতে হাওয়া বাঁচিয়ে কোনোরকমে নিচে নেমে গেল। বেনজিন তুলো এনে এখন টুইনডেকে জোরজার করে ওষুধ লাগাচ্ছে। ওকে ঘিরে রেখেছে ক'জন জাহাজি। লাফিয়ে সমুদ্রে পড়ে গেলে কেলেঙ্কারি। মাস্তুলে লেডি-অ্যালবাট্রস বসতে পারছে না। তার নিচে এখনও আগুন জ্বলছে। কাছাকাছি কোথাও সে সমুদ্রে ভেসে রয়েছে। ছোটবাবু জ্যোৎস্নায় নিরুপায় হয়ে এখন কেবল পাখিটাকে যেন খুঁজছে। ফানেলের গুঁড়িতে বনি তেমনি শূন্যচোখে তাকিয়ে আছে ওপরে। সে বুঝতে পারছে না, কারা ঠিক। সে বাবার পক্ষে না বিপক্ষে তাও বুঝতে পারছে না বোধহয়।

ডেভিড তখন খোঁড়াতে খোঁড়াতে আবার উঠে আসছে। সে সবার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে। একটা মশাল সে নিজের মুখের ওপর ধরে রেখেছে। এবং মশালের আলোতে ওর চোখ-মুখ জ্বলছিল। সে তারপর নিশীথে সবার মুখের ওপর দিয়ে সেই মশালের আলো ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এবং নাটকের পাত্র-পাত্রীর মতো সে ঘুরে দাঁড়াল। কোনো যুদ্ধবাজ মানুষের মতো সে জ্বলে উঠছে। যে জানে জীবনে সে আর জাহাজে কাজ পাবে না, যদি কোনো কারণে সবাই রক্ষা পেয়ে যায় সে জানে তার সব রেকর্ড, বিশ্বস্ততার সব ইতিহাস মুছে যাবে।—এমন কি শৃঙ্খলাভঙ্গের দায়ে কারাগারে বন্দীজীবন যাপনও করতে হতে পারে। তবু সে এবির মুখ এবং সন্তানের কথা ভেবে কেমন মশাল তুলে নিচ্ছে ওপরে। বলছে, আপনারা ওই লুকেনারের ডামিটাকে শুধু একটা প্রশ্ন করুন। মাত্র একটা প্রশ্ন। তিনি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলবেন—সামোয়া বন্দরে তিনি কেন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ছোটবাবু তুমি এদের বুঝিয়ে বল। বলে সে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সব জাহাজিদের পাশে ওদের সামিল হয়ে দাঁড়াল। ছোটবাবু বলল—ডেভিড আজ না হয় থাক। বুঝতেই পারছ আমরা কেউ ঠিক নেই। দু-একদিনে এমন কিছু হবে না আমাদের! আমাকে তোমরা সময় দাও বুঝিয়ে-সুঝিয়ে যদি মত বদলাতে পারি। সে কিছুতেই বলল না চাবিকাঠি তার হাতে। সে বনিকে দিয়ে কাজটা উদ্ধার করতে পারে বলল না।

ডেভিডের কথায় আবার যেন সবাই সাহস ফিরে পেয়েছে। ওরা আবার আগের মতো গোল হয়ে দাঁড়াল। স্যালি হিগিনস এক পা নড়ছেন না। ঠিক আগের মতো স্থির। গীর্জার কোনো ফাদার সিঁড়িতে যে-ভাবে মানুষের শুভ কামনায় দাঁড়িয়ে থাকেন তেমনি তিনি দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ গ্রহণ করবেন যেন এবার। তিনি সত্যি সত্যি বলতে আরম্ভ করলেন—ডেভিড, আপনি যা ভেবেছেন সত্যি তাই। আপনি সবটা জোর গলায় প্রচার করতে পারেন—আমার কোনো দুঃখ নেই আর। আমি সব মেনে নেব। এবং এই আপনি সম্বোধনে ডেভিড কেমন যেন অস্বস্তির ভেতর পড়ে গেল। একজন কাপ্তানের এ-ভাবে পরাজয় তাকে বোধহয় ক্ষতবিক্ষত করছিল। সে সহসা নতজানু হয়ে গেল, স্যার আমাকে ক্ষমা করুন। বলে সে দূরে সমুদ্রের ভেতর তার মশালটা নিক্ষেপ করে অন্ধকারে নিচে নেমে গেল। সবাই হাঁ। বোট-ডেকে কতগুলো ছায়া মাত্র। তাদের জোর একদম হারিয়ে গেছে। ওপরে মাথা নিচু করে

রেখেছেন স্যালি হিগিনস। পাশে ছোটবাবু থার্ড-মেট, চিফ-মেট এবং এইমাত্র তিন-নম্বর মিস্ত্রি ওপরে উঠে কেমন একটা স্তব্ধতার ভেতর পড়ে গিয়ে আর সিঁড়ি ভাঙতে পারল না। সবাই যেন ফ্রিজ হয়ে গেছে মুহূর্তে।

এনজিন-কশপ সেই স্তব্ধতাভঙ্গকারী। সে বলল, ছোটবাবু তিনি কেন ব্যামোতে পড়েছিলেন আমি বলতে পারি।

ছোটবাবু একটা কথা বলল না।

এনজিন-কশপ এবার চারপাশের জাহাজিদের কাছে গলা উঁচিয়ে বলতে থাকল—তার গলার রগ ফুলে যাচ্ছে, সে হাতে একটা মশাল জ্বালিয়ে নিয়েছে। না নিলে সে যেন জোর পাচ্ছে না। সবার সামনে মশাল তুলে বলছে—ইনসে আল্লা অথবা যেন বলছে আল্লার কসম—আপনারা মিঞাভাইরা আমার জানেরা থোড়া মেহেরবানী করে শুনে লেন—জাহাজ দু'-দু'বার পিঁজরাপোলে যাবার কথা!

ফাইভার দেখছে ঠিকমতো লোকটা বলতে পারল না গুছিয়ে। সে মশালটা এবার হাত থেকে কেড়ে নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল। বলল, তুমি থামো মিঞা। বলেই সে তাকাল ওপরে। তারপর বলল, থিও ফ্যাল স্যার দৈব দুর্ঘটনায় মারা গেছেন। ঠিক?

স্যালি হিগিনস বললেন—ঠিক।

—জাহাজ স্ক্র্যাপ করার দলিলপত্রে সই করার নিমিত্ত গাড়িতে রওনা হয়েছিলেন?

—হয়েছিলেন।

—বজ্রপাতে তিনি রাস্তায় মারা গেলেন!

স্যালি হিগিনস মাথা নুয়ে ক্রস্ টানলেন বুকে

—তারপর রিচার্ড ফ্যালের পালা।

—হ্যাঁ তিনিও জাহাজটা বিক্রি করে দিতে চেয়েছিলেন।

পাঁচ-নম্বর যেন এবার মশালের আলোতে সবাইকে একসঙ্গে দেখতে চায়। সে বলল, শেষ পর্যন্ত পারেন নি। একমাত্র নাবালক পুত্র একমাত্র উত্তরাধিকার তাঁর মরে গেল। দুর্ঘটনায় মারা গেল। রিচার্ড ফ্যাল গাড়ি করে যাচ্ছেন। হস্তান্তরের জন্য কাগজপত্র সব রেডি। যাবার পথে তাঁর বিঘ্ন ঘটল। গাড়িতে পুত্রের মৃতদেহ আবিষ্কার করলেন—ঠিক?

ছোটবাবু এমন একটা ভয়াবহ ঘটনা যেন এই প্রথম শুনছে। আর জ্যোৎস্নায় সমুদ্র জাহাজ আকাশের সব নক্ষত্রমালা এবং চারপাশের সব মানুষ কেমন অজানা অচেনা হয়ে যাচ্ছে। ভীতিকর সব কথাবার্তা। জাহাজটা যেন ফুঁসছে নিরন্তর নিজের ভেতর। জাহাজটাকে আর কিছুতেই দশটা জাহাজের মতো মনে হচ্ছে না। স্যালি হিগিনসকে জ্যোৎস্নায় সেই মৃত, লুকেনারের অবয়ব মনে হচ্ছে। একমাত্র সে বনিকে চিনতে পারছে, ফানেলের গুঁড়িতে দাঁড়িয়ে আছে তেমনিভাবে। সে খুব অসহায় গলায় চিৎকার করে ডাকল, জ্যাক ওপরে এস, ওখানে দাঁড়িয়ে কি করছ তুমি!

পাঁচ-নম্বর সেই সব কথাবার্তা একবার ইংরেজীতে একবার বাংলায় প্রায় ধর্মগ্রন্থ পাঠের মতো বলে যাচ্ছিল। সে এবার খুব সতর্ক গলায় বলল, ফোনে কথা বলতে বলতে পড়ে গেলেন। পাঁচ- নম্বর প্রায় একজন উকিলের মতো জেরা করে যাচ্ছে। আর বিস্ময়ের ব্যাপার ছোটবাবু দেখছে, কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে প্রায় আসামীর মতো তিনি স্বীকারোক্তি করে যাচ্ছেন! বোধহয় পাঁচ-নম্বর এক্ষুনি ঘুরে যাবে, বলবে, হিয়ার ইজ দ্য পয়েন্ট।

স্যালি হিগিনস বললেন, ফাইভার শরীরটা আমার ভাল ছিল না।

–নো নো। ঠিক কথা বলছেন না। ঠিক কথা বলুন। আসল রহস্য খুলে বলুন। এমন দিগন্তব্যাপী সাদা জ্যোৎস্না যখন, আমরা যখন সবাই সমুদ্রের বিভীষিকায় পড়ে গেছি এবং যে কেনো মুহূর্তে জাহাজ সমুদ্রের অতলে ডুবে যেতে পারে, আমরা আশা করব মহামান্য

ক্যাপ্টেন আমাদের কাছে কোনো রহস্য আর গোপন রাখবেন না।

স্যালি হিগিনস আর পারলেন না, দু'হাতে মাথার চুল ছেঁড়ার মতো চিৎকারে ফেটে পড়লেন, ফাইভার প্লিজ, প্লিজ আমাকে আর টরচার করবে না।

আর যায় কোথায়! এমন পরাজয়ের মুখে পাঁচ-নম্বর ভীষণ ক্ষিপ্ত গলায় বলে উঠল, আপনি এত সব জেনে কেন কাগজপত্রে সই করলেন জবাব দিন! কেন আপনি এতগুলো মানুষের জীবন নিয়ে ছিমিমিনি খেলছেন জবাব দিন! আপনি যখন জানতেন জাহাজে ক্যাপ্টেন লুকেনারের অশুভ প্রভাব আছে তখন কেন একবার ভাবলেন না, আপনার সই করার বিনিময়ে সব জাহাজির জীবন বিপন্ন হতে পারে। শুধু নিজের কথা আর শ্রীমান জ্যাকের কথা ভাবলেন। আমাদের কথা আপনার একবারও মনে হল না। আপনি স্বার্থপর, আপনি আপনি.........।

ছোটবাবু বলল, ফাইভার আপনি কী সব বলছেন!

পাঁচ-নম্বর এবার আরও জোর গলায় যতটা সম্ভব, যেন তার চিৎকার সমুদ্রের দিগন্তে অস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় যতদূর সম্ভব পৌঁছে দিতে চায়। তারপর প্রায় নাটকীয় গলায় বলে উঠল, বন্ধুগণ, আমরা এখন বুঝতে পারছি, মহামান্য ক্যাপ্টেনের প্রলোভন আমাদের নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কোম্পানির কর্তাব্যাক্তিরা তাঁকে পরিচালকবর্গের একজন করে নিয়েছেন বিনিময়ে। কতদূর নীচ হীন এই মানুষ, জাহাজের এতদিনের সংস্কার তুচ্ছ করে নিজের জীবন অথবা বলতে পারেন জ্যাকের জীবনের কথা একবার ভাবলেন না—সবচেয়ে অবাক লাগে এই বুড়ো বয়সে তোর কি এমন প্রয়োজন ছিল বলেই কোথায় যেন কথাবার্তায় গাফিলতি থেকে যাচ্ছে—ঠিক ঠিক সবাই যেন এখনও মশাল তুলে ছুটে আসছে না, মশালের আগুনে কাপ্তানকে পুড়িয়ে মারছে না—কিভাবে আর এইসব ঘটনা জোর গলায় বলা যেতে পারে—সে মরিয়া হয়ে ফের বলল, এখন কি দেখতে পাচ্ছি? চারিদিকে শুধু সমুদ্র। শুধু জল। আমরা বুঝতে পারছি না কোথায় আছি। তারপর সে কি ভেবে বলল, দেখুন দেখুন—জাহাজটাকে দেখুন। এর মাস্তুল, আফটার-পিক, ফরোয়ার্ড-পিক, ফানেল, উইন্ডসেল, হ্যাচ-উইনচ সব কেমন যেন কতদিন পর হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। রেস্ট....রেস্ট। নিরুদ্বিগ্ন জীবন। ভাবনা নেই আর। কেউ তাকে আর নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নিয়ে যাবে না। সে মুক্ত। শী ইজ ফ্রি নাও।

ছোটবাবু দেখছে সব মানুষগুলোর চোখ মশালের আলোতে প্রায় স্থির। গোল গোল চোখে স্যালি হিগিনসকে দেখছে। কারো পলক পড়ছে না। সে ভয় পেয়ে ডাকল, স্যার আপনি কিছু বলুন। দোহাই। দেখছেন না এরা কি হয়ে যাচ্ছে। স্যার, এ-ভাবে মাথা নুয়ে দাঁড়িয়ে থাকার এখন সময় নয়। আমরা সবাই এখন বুঝতেই পারছেন পাঁচ-নম্বরের হাতে পড়ে গেছি। আমরা কিছু করে ফেললে.....।

পাঁচ-নম্বর এবার সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে আসছে। আর চিৎকার করছে। যেহেতু সে পরেছিল কালো প্যান্ট এবং খয়েরী রংয়ের গেঞ্জি, জ্যোৎস্নায় সব কালো দেখাচ্ছে, ওর পোশাকে কেউ যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে এমনভাবে হাউ-মাউ করছিল—অর্থাৎ ভয়ে-ভীতিতে যেন সে ভেঙে পড়ছে।—সে চিৎকার করে কি বলছে, সব বোঝা যাচ্ছে না। কিছুটা বোঝা যাচ্ছে। সেই কিছুটাই প্রায় সবার হৃৎকম্প এনে দিয়েছে। সে বলছে, আমরা মরে কাঠ হয়ে যাব। সেই অশুভ প্রভাব—ক্যাপ্টেন লুকেনার আমাদের পাশেই আছে। এ-জাহাজে বহাল তবিয়তে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জাহাজের কলকব্জা সব উপড়ে ফেলেছে। একেবারে নিজের মতো চিরকালের একটা আশ্রয় বানিয়ে ফেলেছে। এতদিন লুকেনার সেই ফিকিরেই ছিল।

ছোটবাবু বলল, স্যার দোহাই আপনার ঈশ্বরের। সব, সবাই পাঁচ নম্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। কিছু না বললে, আপনাকে স্যার ওরা পুড়িয়ে মেরে ফেলবে। আপনি বলুন, একটাও সত্যি কথা নয়! সব মিথ্যা কথা বলছে ফাইভার! সব বানিয়ে বলছে!

পাঁচ নম্বর তখনও তেমনি চিৎকার করছে, একজন বিজ্ঞাপনদাতার মতো মুখ পাঁচ-নম্বরের। গুজব ছড়াবার পক্ষে যা যা দরকার সব সে এবার বিজ্ঞাপনে হাজির করছে। সে এবার প্রায় লাফাতে থাকল, যেন সারা শরীরের আগুন ওর মাথায় উঠে পড়েছে। সে বলল, এবার থিও ফ্যাল নয়। রিচার্ড ফ্যালের পুত্র নয়—এবারে বন্ধুগণ আমাদের পালা। আপনারা তৈরী হোন। মহামান্য ক্যাপ্টেন এবার আমাদের লুকেনারের হাতে তুলে দিলেন। অজানা সমুদ্রে শুধু ঢুকে গেছি। সমুদ্রে শুধু ভৌতিক অগ্নিকান্ড দেখতে পাব না। এবার লুকেনার ভয়াবহ নৃসংশতার ভেতরে নিয়ে যাবে। সোজা কথায় জাহাজটাতে আমরা সবাই লুকেনারের মতো মরে ভূত হয়ে যাব। লুকেনারের প্রোতাত্মা ভর করা জাহাজটাও এতদিন সেই ফিকিরে ছিল। এতদিন পর সে আমাদের বাগে পেয়েছে। আর তখনই দূরে কক্ কক্ করে ডাকছিল পাখিটা। সে কেমন এবার ফিসফিস গলায় বলতে থাকল, শুনতে পাচ্ছেন? ডাকছে! কেউ ডাকছে, মনে হচ্ছে কেউ হাসছে, কেউ হাসছে! দ্য সী-ডেভিল হাসছে। আমরা কেউ বাঁচব না। আতঙ্কে পাঁচ- নম্বর বলতে বলতে হাঁটু মুড়ে বসে পড়ল।

সমুদ্রের ভয়ংকর স্তব্ধতা তখন কি যে কঠিন শীতল হাহাকারে ভুগছে! কেউ একটা আর কথা বলতে পারছে না।

ছোটবাবু তখন প্রায় পাগলের মতো দু'হাতে নাড়তে থাকল স্যালি হিগিনসকে—জ্যাক নিচে তুমি কি করছ! ওপরে এস! দেখ তিনি কী হয়ে যাচ্ছেন। সে নিরুপায় হয়ে বলল, চিফ-মেট আপনি কিছু বলছেন না—স্যার স্যার! একবার আপনি প্রতিবাদ করুন। তা না হলে সবাই ভয় পেয়ে যাবে। ঘাবড়ে যাবে। আমরা আর আপনার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারব না।

স্যালি হিগিনস শুধু বললেন, ছোটবাবু ওতো ঠিকই বলেছে। ফাইভার তো বানিয়ে কিছু বলে নি!

—স্যার আপনি কী বলছেন! এ-সব আজগুবী কথা স্যার আপনি বিশ্বাস করেন! এতদিনের বিশ্বস্ত জাহাজ! ফাইভার অযথা দুর্নাম দিচ্ছে, আর আপনি সবার সামনে স্বীকার করছেন! আমাদের শেষ বিশ্বাসটুকু এ-ভাবে নষ্ট করে দিচ্ছেন!

স্যালি হিগিনস বিশ্বস্ত কথাটা বার বার উচ্চারণ করতে লাগলেন। সিউল-ব্যাংক ভারী তাঁর অনুগত ছিল। এখনও আছে। জাহাজটার জন্য তাঁর সর্বস্ব বাজি রেখে ভেবেছিলেন, তিনি স্যালি হিগিনস পাঁচ-নম্বর কত সহজে সব কেড়ে নিচ্ছে। তিনি জাহাজটাকে অযথা গুজবের হাতে ছেড়ে দিতে পারেন না। মনের দুর্বলতা প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে ভেবে সোজা হতে চাইলেন। তিনি সোজা হয়ে দেখলেন চারপাশে কি নিদারুণ জ্যোৎস্না, কি নীল আকাশ আর অনেক দূরে যেন সেই মহাপ্রাণ–কক্-কক্ করে ডাকছে। তিনি সাহস সঞ্চয় করছেন—কল আপন্ মি ইন দ্য ডে অফ ট্রাবল, আই উইল ডেলিভার দী অ্যাণ্ড দাউ শ্যান্ট গ্লোরিফাই মি। তিনি এবার দ্রুত নেমে গেলেন। আর বলতে থাকলেন, জাহাজটার প্রতি আপনারা কে বিশ্বস্ত বলুন। হু ইজ ফেথফুল টু দ্য শিপ। সবাই আপনারা মাস্তারে দাঁড়ান।

এবং ওপরে কেউ আর থাকল না। সবাই যে যার মতো বোট-ডেকে মাস্তার দিলে তিনি বললেন—ইউ? ইউ? তাঁর আলখাল্লার মতো লম্বা স্লিপিং গাউন পাটাতনে লোটাচ্ছে। তাঁর কপাল ভীষণ ঘামছে। মনে শংকা তাঁর। প্রত্যেকের মুখের সামনে মশাল তুলে বললেন—ইউ? নান্। কেউ তাঁর স্বপক্ষে নেই। তিনি কেমন ভেঙে পড়ছেন! তখন ছোটবাবুর মুখ মশালের আলোতে প্রায় উদ্ভাসিত—তিনি বললেন, তুমি ছোটবাবু?

ছোটবাবু বলল, মি ফেথফুল টু দ্য শিপ স্যার।

—আর, আর কে! তিনি যেন ফের সাহস ফিরে পাচ্ছেন।—জ্যাক তুমি?

জ্যাক হাত তুলে দিল। যেন বলতে চাইল ইয়েস মি ফেথফুল টু দ্য শিপ, টু ইউ অ্যাণ্ড… অ্যাণ্ড কথাটাতে সে বোধহয় ছোটবাবুকে বোঝাতে চাইল। সব মিলে যেন ছোটবাবু বাবার পাশে দাঁড়াবার মতো যথার্থ মানুষ। এবং এভাবে সে আর বিন্দুমাত্র ভয় পাচ্ছে না জাহাজে

থাকতে। বাবা ছোটবাবু সে। তার আর কিছু লাগে না।

তিনি তখন মশালের আলোতে বলে বলে যাচ্ছেন, আর, আর কে? এনি মোর? এক হাতে গাউন সামলাচ্ছেন অন্য হাতে মশাল তুলে বলছেন—ইউ? নো ফেথ্! নো...দে...ইউ...ইউ?

—মি সাব ফেথফুল! এনজিন-সারেঙ হাত তুলে দিলেন।

আর কেউ না, তিনি এবার ফিরে যেতে থাকলেন। আর কেউ জাহাজটার প্রতি বিশ্বস্ত নয়। তারা সহজেই তাঁকে পুড়িয়ে মারতে পারে। ভয়ে মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেলে তিনি সিঁড়িতে দ্রুত উঠে গেলেন। যেন ওরা ছুটে আসছে পেছনে। ওঁকে ধরবার জন্য হা-হা করে ছুটে আসছে। ওপরে উঠে পেছনে তাকালেন। তিনি কিছুই দেখতে পাচ্ছেন না। কেউ নেই। তিনি একা। একা দাঁড়িয়ে আছেন। জাহাজে একটা কাক-পক্ষী নেই। অন্তহীন সমুদ্র আর আকাশ। জাহাজটা সাঁতার কাটছে সমুদ্রে। তিনি এবার ভীষণ অহঙ্কারী গলায় বলে উঠলেন—আপনাদের ছুটি। কাল সকালে আপনারা সেল করবেন। ঈশ্বর আপনাদের সহায় হোন!

॥ পঞ্চাশ ॥

জাহাজ তেমনি সমুদ্রে ভাসমান। মাস্তুলে তেমনি জ্বলছে মশাল। ভারী নিভৃতে যেন জাহাজটা অজানা সমুদ্রে পালিয়ে আছে। পৃথিবীর সব সংযোগ হারিয়ে চুপচাপ নিশিদিন বেশ আছে সে—মনের সুখে সমুদ্রে ভেসে বেড়াচ্ছে। ক্রমে জ্যোৎস্না আরও মনোহারিণী। নক্ষত্রে অধীর কুহেলিকা। এবং আকাশ সমুদ্র কোনো মরুভূমির মতো দায়দায়িত্বহীন। এতগুলো মহাপ্রাণ এই মহাসমুদ্রে এবং মহাকাশের ভেতর অবরুদ্ধ—তাদের কিছু আসে যায় না।

ছোটবাবু বোটের নিচে শুয়ে ছিল। ওপরে যে বিস্তৃত আকাশ এবং নক্ষত্রমালা সেখানে ওর মতো কেউ যদি শুয়ে থাকে তবে দেখতে পাবে মাথার ওপরে আকাশের মতো স্থির সমুদ্র। জলরাশি নীল নীহারিকার সামিল। জাহাজ কাগজের নৌকোর মতো ভেসে ভেসে যাচ্ছে। কি যে হয়, মনে হয় দু'হাতে আকাশ ফাঁক করে কেউ যেন এক্ষুনি উঁকি দেবে—কি ছোটবাবু তুমি শুয়ে আছ? এবং যতবার চেষ্টা করছে, সেই আকাশ ছিঁড়ে যার মুখ দেখতে পাবে সে বনি। যেন বনি ক্রমে দূরবর্তী কোনো নীহারিকা- পুঞ্জের মতো অস্পষ্ট। অবিরাম সে আকাশ ছিঁড়ে ছিঁড়ে নেমে আসতে চাইছে তার কাছে। সে কিছুতেই আর বাঁধা দিতে পারছে না।

জাহাজে সবাই যে যার ফোকসালে অথবা কেবিনে, কেউ কেউ বাংকে, কেউ ফল্কায় মাদুর পেতে শুয়ে আছে; অতীব এক কঠিন নিশুতি রাত। কলকল ছলছল শব্দ শুধু জলের। ছোট ছোট সব ঢেউ জাহাজটাকে নিয়ে বুঝি এখন খেলা করছে। সামান্য বাতাস উঠে আসছে সমুদ্র থেকে। আর সেই মশালের আলো প্রায় কখনও স্থির কখনও তির্-তির্ করে কাঁপছে। নিচে দু'একজন মানুষ ফল্কায় ঘুমোচ্ছে কি জেগে আছে সে বুঝতে পারছে না। আগামীকাল সেল করতে হবে। কাপ্তান সবাইকে ছুটি দিয়ে দিয়েছেন। যেহেতু কাল সবাইকে অজানা এক সমুদ্রে নেমে যেতে হবে, বোটে যেহেতু ঘুমোবার কোনো তেমন বন্দোবস্ত থাকবে না, যতটা পারা যায় এক্ষুনি ঘুমিয়ে নেয়া দরকার—এবং এসব ভেবে তিনি কড়া হুকুম জারি করেছেন—যার যার সামান সকালে ঠিক করে নেবেন, শুধু যতটুকু পারা যায় শেষবারের মতো ঘুমিয়ে নিন। যেন বলতে চেয়েছিলেন, নির্ভর করার মতো এই শেষ আশ্রয়। তাও আপনারা ছেড়ে চলে যাচ্ছেন!

ছোটবাবু এখন বোটের নিচে শুয়ে আছে। কড়া হুকুম সত্ত্বেও অন্ধকারে পালিয়ে এসেছিল বঙ্কু, জব্বার মনু এবং এভাবে প্রায় অনেকে খুব নিচু গলায় ওরা অন্ধকারে বসে বলেছিল, ছোটবাবু তুই এমন আহাম্মক! তুই কি রে! তোর কি ভয়ডর বলে কিছু নেই। সবাই জাহাজ ছেড়ে দিচ্ছে—আর তুই কাপ্তানের শয়তানিতে ভুলে গেলি! তুই কি বলতে চাস—খুব বিশ্বাসী তুই। তুই কি বলতে চাস বড়-মালোম মেজ-মালোম তোর চেয়ে কম বোঝে! এভাবে যারা তার প্রিয় সবাই প্রায় অন্ধকারে লুকিয়ে ওর কেবিনে দেখা করতে এসেছিল। ওরা ওকে বলতে এসেছিল- —একজন মাথা খারাপ কাপ্তানের সঙ্গে থেকে যাওয়া ঠিক না। কিন্তু সবাইকে সে বুঝিয়েছিল সে যা করেছে ঠিকই করেছে। কেবল ডেবিডকে সে পারেনি। ডেবিড নিজেও ঘুমোচ্ছিল না। ক্ষণে ক্ষণে অন্ধকারে এসে ডাকছে, ছোটবাবু তুমি আমার কথা রাখো। তোমার মা-বাবার কথা ভাবো। ভাইবোনদের মুখ মনে পড়ছে না! ওরা তোমার আশায় রয়েছে—একদিন না একদিন তুমি দেশে ফিরবে।

ছোটবাবু হেসেছিল। সে বলতে পারত ডেবিডকে, সঠিক আমি কিছু জানি না। তবু আমি এটুকু বুঝি তিনি সবচেয়ে বেশি প্রাজ্ঞ। একজন প্রাজ্ঞ মানুষের সঙ্গে থেকে যাওয়া অনেক বেশি বুদ্ধিমানের কাজ।

সে শুধু বলেছিল, ডেবিড তুমি ঘুমোতে যাও। খুব সকালে আবার তোমাদের উঠতে হবে। ডেবিড বারবার ছুটে এসেছিল, ছোটবাবু তোমাকে ফেলে যাই কি করে বলত। তারপর দু' হাত ধরে বলেছিল, ছোটবাবু তোমাকে ফেলে গেলে আমি শান্তি পাব না। আমার খুব কষ্ট হবে ছোটবাবু। অন্ধকারে ওরা দু'জনে চুপচাপ বসে থেকেছিল। ডেবিড কিছুতেই ঘুমোতে যাচ্ছে

না। সে বাধ্য হয়ে বলেছিল, আমার কাজ আছে ওপরে। আমি যাচ্ছি। এখন ওপরে যা কিছু কাজ দরকার হলে রাতে আমাকেই করতে হবে। এবং এভাবে কাপ্তানের নাম করে সে ওপরে উঠে এসেছে। ডেবিড ওপরে আসতে সাহস পাচ্ছে না। কাপ্তানের কাছে সে ফের মুখ দেখাবে কি করে—এবং এমন সব প্রতিকূল চিন্তাভাবনা ডেবিডের ভেতর আছে সে জানত। প্রায় আত্মগোপনের মতো আছে সে। ডেবিড নিজেও ঘুমোচ্ছিল না। ওকেও ঘুমোতে দিচ্ছিল না। সে এখানে চুপচাপ শুয়ে ঘুমোবে ভেবেছিল। কিন্তু ঘুম আসছে না। চোখের ওপর আকাশ আর নক্ষত্র কেবল দুলছে। আকাশ দুলে উঠলেই বুঝতে পারে সমুদ্র সামান্য মাতাল হয়েছে। সুতরাং আকাশ এবং নক্ষত্রমালা তার চোখের ওপর দুলছে। পাশে বনির কেবিন। অন্ধকার কেবিনে বনি শুয়ে আছে। যেন কান পাতলে সে বনির নিঃশ্বাসের শব্দ পাবে। সে কিছুতেই ঘুমোতে পারছে না। জাহাজে কেউ ঘুমোতে পারছে না—সকালে নেমে যাবে সবাই। সব লম্ফ স্যালি হিগিনস জমা নিয়েছেন। কেউ যে লম্ফ জ্বালিয়ে কি কি নেবে সঙ্গে রাত জেগে খুঁজবে তারও উপায় নেই। সামান্য যে তেল অবশিষ্ট তা তিনি সীল করে দিয়েছেন। সন্ধ্যার পর থেকে যে যার খুশিমতো মশাল জ্বালিয়েছে—প্রায় উপদ্রবের সামিল উচ্ছৃঙ্খল আচার-আচরণ এবং ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে সবাই আর একটা কথা বলেনি। ডেক খালি করে নিচে নেমে গেছে। আর মনে হচ্ছে অন্ধকারে সবাই হাতড়াচ্ছে কোথায় কে কি রেখেছে। কেউ ঘুমোতে পারছে না। ছোটবাবু এখানে পালিয়ে এসেছে একটু ঘুমোবে বলে তারও ঘুম আসছিল না। তারপর ভোর রাতের দিকে কখন সে ঘুমিয়ে পড়েছিল টের পায় নি।

সকালে জাহাজিদের দেখে মনে হল না ওরা কোনো বিভীষিকার ভেতর আছে। যেন খুব কাছে বন্দর। জাহাজ বন্দরে লাগবে—বন্দরে ওরা নেমে যাবে। অথবা মনে হয় জাহাজ হোমে ফিরে যাচ্ছে। বোটে ভেসে গেলেই সেই মাঠ এবং শস্যক্ষেত্র দেখতে পাবে তারা। সবাই যে যার পেটি এবং বাসো সকাল থেকে গোছাচ্ছে। নামার আগে সবার রেশন একসঙ্গে করে নেয়া হয়েছে। জাহাজে দু'টো র‍্যাফট আছে। চিফ-মেট র‍্যাফট দু'টোর জন্য স্যালি হিগিনসকে অনুরোধ জানিয়েছে এবং কথা আছে তিনটে বোট যাবে। স্যালি হিগিনস নিজের জন্য একটা রেখেছেন। যদিও তিনি এক-নম্বর বোট রাখতে পারতেন ওটা তাঁর বোট এবং যেহেতু বোট মোটরে চলে, রেখে দিলে স্বার্থপরের মতো দেখাবে। তিনি তাঁর বোট দিয়ে চার-নম্বর বোট পরিবর্তে চেয়ে নিলেন। একটা বোট কাপ্তানের জন্য রাখা দরকার। যাক সব ক'টা বোটই যে তিনি শেষ পর্যন্ত দিয়ে দেননি—এবং চিফ-মেট যেন একটু নিশ্চিন্ত—সে দৌড়ে দৌড়ে কোথায় কি লাগবে দেখছে। র‍্যাফট দু'টো মোটর-বোটের পেছনে বেঁধে নেওয়া হবে। তবে কাঠের পাটাতন বলে জল কেটে ঠিক ভেসে যেতে পারবে না, সেন্টার-বোর্ড লাগিয়ে নেওয়া হচ্ছে। কারপেন্টার সকাল থেকে কাঠ কেটে সেণ্টার-বোর্ড লাগিয়ে দিচ্ছে। দু'পাশে ঠিক জল কেটে তবে র‍্যাফট দু'টো বোটের সঙ্গে সমান তালে চলতে পারবে। র‍্যাফট দু'টোকে টানতে বোটের অসুবিধা হবে না। বোধহয় ছোটবাবুর করাতে কাঠ কাটার শব্দে ঘুম ভেঙে গেছিল। বেশ বেলা হয়ে গেছে। ঘুম থেকে উঠে ওর কেন যেন মনে হচ্ছিল—সব স্বাভাবিক হয়ে গেছে। ডেকে সবাই ঠিক আগের মতো ছুটোছুটি করছে, তেমনি তেল বার্নিশের গন্ধ। তেমনি মনে হচ্ছিল ডেক-জাহাজিরা রঙের টব হাতে নিয়ে রং করতে যাচ্ছে জাহাজে। ওয়াচে যাচ্ছে মৈত্রদা, সে উইনচের নিচে কাজ করছে। বন্দর আসছে ডাঙা দেখা যাচ্ছে এমন যেন কেউ হাত তুলে বলছে। জাহাজটা ভাঙা অচল, এক অজানা সমুদ্রে তারা ভেসে বেড়াচ্ছে ছোটবাবুর যেন ঘুম থেকে উঠে একেবারেই বিশ্বাস হচ্ছিল না। বুঝি বনি এই মাত্র ডাকবে, ছোটবাবু কিনারায় যাবে? ডেবিড তুমি আমি। জাহাজের মানুষগুলো কি যে স্বাভাবিক হয়ে গেছে মুহূর্তের জন্যে।

কেবল চিফ-মেট জানে, ডেবিড এবং থার্ড-মেট বুঝতে পারে কি ভীষণ দুঃসাহসিক এই অভিযান। এখন একে অভিযান ভাবাই ঠিক হবে। এবং কে কি নিতে পারবে তার লিস্ট স্যালি হিগিনস নিচে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এবং তিনি জাহাজের সর্বত্র এই যেমন বোট খালি করে দেখে নিতে বলছেন অর্থাৎ বোট নামিয়ে দেখা দরকার কোথাও কোনো ফুটোফাটা আছে

কিনা। শুকনো খাবার সব ঠিকঠাক আছে কিনা। র‍্যাফট দু'টোতে ওরা বোঝাই করছে এখন ওদের বাকি রেশন। কাপ্তান স্টোর-রুমে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে যার যা রেশন সমান ভাগে দিয়ে দিচ্ছেন। এগুলো দড়ি দিয়ে এখন নিচে নামিয়ে দেওয়া হচ্ছে। র‍্যাফটের চারপাশে কাঠ লাগিয়ে নেওয়া হয়েছে। একটা চৌকোনা বড় ভাসমান বাসোর মতো দেখতে এবং যেহেতু সেন্টার-বোর্ড লাগিয়ে নেওয়া হয়েছে সেজন্য জলের ওপর কাৎ হয়ে যাচ্ছে না। বরং দুলে দুলে দু'টো র‍্যাফট যেন জলের ওপর মাতালের মতো টলছে।

সকালে শেষ চর্বি ভাজা রুটির গন্ধ পাওয়া গেল। দুপুরে শেষ চাল ডাল সেদ্ধ খিচুড়ির গন্ধ পাওয়া গেল। সবাই ডেকের ওপর বসে গেছে। যেহেতু চাল ডাল শুকনো এবং পচে যায় না, জাহাজে শুধু চাল ডাল অবশিষ্ট। রেশন বলতে এখন এই চাল ডাল কিছু টিন ফুড। টিন-ফুড অফিসারদের রেশন। জ্যাম জেলি কিছু আছে। পচা খাবার শেষ পর্যন্ত পচতে পারেনি। স্যালি হিগিনসের হুকুমে সবাই এতদিন জাহাজে শুধু মাংস খেয়ে জীবনধারণ করেছে। তারপর ফলমুল। এবং এই চাল ডাল যেহেতু শেষদিনের সম্বল তিনি খুব কিপটের মতো টিপে টিপে খরচ করেছেন। আজ সেই মানুষ খুব অমায়িক। পেট-ভরে খাবার। অর্থাৎ যাবার আগে কতদিন পর পেট ভরে খাবার যেন। চাল- ডাল সেদ্ধ পাতলা প্রায় স্যুপের সামিল করে দেওয়া হয়েছে সাহেবদের—যেন সবাই সমুদ্রে ছুটির দিন কাটাতে এসেছে—কথাবার্তায় ছোটবাবুর এমনই মনে হচ্ছে। বনির জন্য ছোটবাবু আরও এক বাটি স্যুপ চেয়ে নিয়েছে। কেন জানি অন্যদিনের চেয়ে পাতলা খিচুড়িটা খেতে আজ বেশি মনোরম। সামান্য এলাচ দানা ফেলে দেওয়া হয়েছে। ছোটবাবু একটা পোড়া শুকনো লংকা পেয়ে গেল। আরে, একটুকরো আলু। মেপে দেওয়া হচ্ছে না। যার যত লাগে খাও। ভাবা যায় না। ষাট-পঁয়ষট্টি জন জাহাজি ডেকের ওপর পাত পেতে খাচ্ছে। বঙ্কু একটা বড় রকমের ঢেকুর তুলছে। ওর যেমন স্বভাব খেয়ে-দেয়ে হাত চাটা, আজ আবার অনেক দিন পর সে হাত চাটছে। পিছিলে হাত ধোওয়া যাচ্ছে না। জল পরিমাপ মতো আছে। এনজিন-সারেঙ সবাইকে এক মগ করে জল দিচ্ছে—হাত ধোওয়া এবং খাওয়া, একবিন্দু বেশি চাইলে পাওয়া যাবে না।

স্যালি হিগিনস, চিফ-মেট স্যামুয়েল, সেকেন্ড-মেট ডেবিড এবং থার্ড-মেট, তাছাড়া এনজিনিয়ার তিনজন এবং ছোটবাবু সবার সঙ্গে আজ এক লপ্তে বসে খেয়েছে। সবকিছু স্যালি হিগিনসের নির্দেশমতো হচ্ছে। কে বলবে গতকাল এই মানুষ ভীষণ অহংকারী ছিলেন, ভয়ে ওপরে উঠে কেউ কথা বলতে পর্যন্ত সাহস পায় নি। আজ এই মুহূর্তে মানুষটা একেবারে অন্যরকম। চিফ-মেটকে এক দন্ড ফুরসৎ দিচ্ছেন না। সারাক্ষণ একজন পরিবারের অভিভাবকের মতো তিনি। কে কি নিতে ভুল করেছে, বোটে কি আছে, আর কি লাগবে? সামান কি কি যাবে, কি কি যাবে না? যতটা পারা যায় খাবার আর জল। কিন্তু ইচ্ছে করলেই খাবার আর জল প্রচুর দেওয়া যাচ্ছে না। তবু বড় বড় চারটে ড্রাম ভর্তি করে জল নিচে নামানো হচ্ছে! বলতে গেলে দুটো র‍্যাফটের একটাতে খাবার, অন্যটাতে জল। প্রথম বোট আগে দু'নম্বর বোট পেছনে, তার পেছনে তিন-নম্বর বোট এবং একেবারে শেষে র‍্যাফট দু'টো। হাসিলে বাঁধা থাকবে একের পর এক। ঝড়ে-ঝঞ্ঝায় অথবা যখন খাবার, জল সব ফুরিয়ে আসবে- কেবল উত্তপ্ত জলরাশি আর সমুদ্রের মরীচিকা বাদে কিছু দেখা যাবে না, তখন যেন চিফ-মেট স্যামুয়েল অন্তত চিৎকার করে সবাইকে বলতে পারেন—দ্য লর্ড ইজ আওয়ার স্ট্রেংথ অ্যান্ড আওয়ার প্রেইজ। কারণ এতগুলো মানুষকে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব এখন থেকে তার। তাদের ভরসা-নির্ভর বলতে সে। ঈশ্বরের নামে সব ভেঙে-পড়া জাহাজিদের প্রাণে সাহস সঞ্চার করতে না পারলে পরস্পর মাংস খুবলে খাবে। তিনি স্যামুয়েলকে শেষ পর্যন্ত নিভৃতে ঘরে ডেকে নিলেন। সবাই দাঁড়িয়ে বোট-ডেকে। তিনটে বোট নিচে নামিয়ে দেয়া হয়েছে। সূর্য সমুদ্রে হেলে পড়েছে। সঙ্গে কেউ বিশেষ কিছু নিতে পারছে না। সামান ছোটবাবুর জিম্মায় রেখে ঠিকানা রেখে গেছে সবাই। ছোটবাবু দেশে ফিরে গেলে সব সামান যেন নিয়ে যায়। ডেবিড একটা কথা বলছে না। ছোটবাবুর দিকে তাকাচ্ছে না ডেবিড। সে রেলিঙে একাকী চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ওকে খুব দুঃখী এবং বিষণ্ন

দেখাচ্ছে।

স্যামুয়েল আগে নেমে আসছে। পেছনে স্যালি হিগিনস। ছোটখাটো একটা বক্তৃতা করবেন বোধহয়। এতক্ষণ ওরা ভেতরে কি যে করছিল! সময় হাতে কম। স্যামুয়েল বার বার শেষবার অনুরোধ করেছিল, স্যার সবার হয়ে আমার অনুরোধ, একবার যদি ভেবে দেখতেন জাহাজে এভাবে থেকে যাওয়া আপনাদের উচিত হচ্ছে কিনা। স্যামুয়েলের কথায় তিনি বিন্দুমাত্র দুঃখ অথবা রাগ প্রকাশ করেননি। স্বার্থপরের মত ওরা নেমে যাচ্ছে। এখন তাঁকেও অনুরোধ করছে ছোটবাবু, জ্যাক, এনজিন-সারেঙকে নিয়ে নেমে যেতে। তিনি স্যামুয়েলকে ভীষণ অমায়িক গলায় এতক্ষণ বুঝিয়েছেন। স্যামুয়েল মনে কোন দুঃখ রাখবে না এমন বলছেন। আমি তো ওকে ছেড়ে যেতে পারি না। এত দিনের বিশ্বস্ত জাহাজ এমন বলতে পারতেন অথচ সে-রকম কিছু তিনি বলেননি। স্যামুয়েল বুঝেছিল নিরর্থক। সে শেষ পর্যন্ত নেমে এসেছে। পেছনে স্যালি হিগিনস নেমে এলে ফাইলে সবাই মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকল। তিনি সবার সঙ্গে হ্যান্ড-শেক করলেন। কথা বললেন দু'টো-একটা। তোমরা তাহলে সবাই অন্ ইওর ওন হয়ে।

স্যালি হিগিনসের গায়ে পুরো কাপ্তানের পোশাক। সাদা হাফ-শার্ট, সাদা হাফ-প্যান্ট, সাদা মোজা, সাদা জুতো, নীল রঙের এংকারের টুপি। সোনালী স্ট্রাইপ কাঁধে ঝকঝক করছে তেমনি। মুখে সাদা দাড়ি। তিনি ধীরে ধীরে হেঁটে যাচ্ছিলেন। বলছিলেন, এখন আপনাদের আমি শুধু একটা কথাই বলতে পারি—ঈশ্বর মঙ্গলময়। তাঁর করুণার শেষ নেই। সব হারালেও তাঁর ওপর আপনারা বিশ্বাস হারাবেন না। এইটুকু বলে হাত তুলে দিলেন। যেন সেই বলা—হাই। বিদায়। বিদায় বন্ধুগণ।

তারপরের দৃশ্য দেখা যায় না। নেমে যাবার আগে ডেবিড ছোটবাবুর সঙ্গে হ্যান্ডশেক করতে এসে একেবারে ভেঙে পড়ল। সে ছোটবাবুকে জড়িয়ে কাঁদছে। ছোটবাবু তুমি কোথাকার ছোটবাবু জানি না, তুমি যদি বেঁচে থাক যদি আমি বেঁচে থাকি দেখা হবে। ঠিক দেখা হবে ছোটবাবু। দেশের অনেক কিছু ভুলে ছিলাম হে ছোটবাবু! তুমি আমার পাশে ছিলে এতদিন। এখন আমার তাও থাকল না। এবং বন্ধু আর যারা যেখানে ছিল সবাই এনজিন-সারেঙ ও ছোটবাবুর সঙ্গে আলিঙ্গন করে গেল। ওরা নেমে গেল বোটে। স্যালি হিগিনসও দড়ি ধরে নেমে গেলেন। কেন যে বুড়ো মানুষটা এমনভাবে নেমে যাচ্ছেন! তিনি তিনটি বোটেই লাফিয়ে লাফিয়ে এ-মাথা ও-মাথায় হাঁটাহাঁটি করছেন। বোট দুলছে। সমুদ্রের জলে বোট ভীষণ দুলে উঠছে। কোথায় কি রাখা হয়েছে, ঠিকমতো রাখা হয়েছে কিনা, আচ্ছা স্যামুয়েল—সব গীয়ার তুমি এদিকটায় রেখেছ কেন? ভাগ ভাগ করে দাও, তা হলে তোমাদের বসতে সুবিধা হবে।

দু'নম্বর বোটে গিয়ে বললেন, ডেবিড়, কি মন খারাপ কেন? আরে আমরা দেখবে তোমাদের আগে পৌঁছে যাব। দ্যাখো না কে আগে যায়। তুমি ভাবছ আমাদের সমুদ্রে ফেলে যাচ্ছ। একদম এসব ভাববে না। ডেবিড নতজানু হয়ে গেল স্যালি হিগিনসের সামনে। মাথা নিচু করে বসে থাকলে স্যালি হিগিনস বললেন, তোমাদের বিশ্বস্ততার শেষ নেই ডেবিড। শেষ নেই। আবার আমাদের ব্যারি স্ট্রীটে দেখা হবে। তখন যদি তুমি মুখগোমড়া করে রাখ ত একদম তাড়িয়ে দেব।

ডেবিডের দু'চোখ বেয়ে শুধু জল ঝরছে। মহান ঐতিহ্যবাহী এই মানুষ। মানুষের সব বিশ্বস্ততার প্রতীক তিনি। তাঁকে সে গতকাল কি যে অপমান করেছিল! সে বলল, স্যার আমার মাথা ঠিক ছিল না।

তিনি বললেন, কারো থাকে না। তোমরা এভাবে বসেছ কেন? পাশাপাশি বস। দ্যাখো কত জায়গা। হিগিনস নিজ হাতে সব গুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, আরে লণ্ঠনটা এত নিচে রেখেছ কেন? ওটা কাছে রাখো! হাতের কাছে দরকারের সময় খুঁজে পাবে না। দু'টো বাকেট। একটার ভেতরে আর একটা ভরে রাখো।

তারপর তিন-নম্বর বোটে উঠে গেলেন। সবাই উঠে দাঁড়ালে বললেন, বোস। আচ্ছা থার্ডমেট, তোমার অয়েল-ব্যাগ ঠিক আছে তো? খুব সাবধান। কেরোসিনের ফাইল?

—স্যার সব ঠিক আছে।

–ঠেলেঠুলে নিচে ঢুকিয়ে নাও। ওপরে কিছু রাখবে না। শেষে তিনি দড়ির সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলেন। ওরা চারজন—জ্যাক, ছোটবাবু, এনজিন-সারেঙ, স্যালি হিগিনস এবার সমুদ্রে আকাশের নিচে হাত তুলে দিলেন—দড়ি ফেলে দেওয়া হল নিচে। ওরা দড়ি লুফে তুলে নিল। মোটর-বোট দু'টোই গর্জে উঠল। জলের ভেতর সাদা ফেনা তুলে ধীরে ধীরে যেন একটা কনভয় গভীর সমুদ্রে ক্রমে হারিয়ে যাচ্ছে। ওরা চারজন চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। ওরা ক্রমে ছোট হয়ে যেতে থাকল। এবং বিন্দুবৎ হয়ে আসার মুখে ছোটবাবু দেখছে দূরে আবার একটা বিন্দু ক্রমশ এগিয়ে আসছে। ক্রমশ বড় হয়ে যাচ্ছে। সকাল হলেই এলবা কোথায় চলে যায়। সারাদিন পর সন্ধ্যা হলে এলবা ফিরে আসে। ছোটবাবু বুঝতে পারছে বিন্দুবৎ যে ভেসে আসছে বাতাসে সে এলবা, আর কেউ নয়। এলবা ক্রমশ আকাশের ওপর সেই অতিকায় পাখি হয়ে যাচ্ছে। ওরা চলে যাওয়ায় যে নিঃসঙ্গতা জাহাজে চেপে বসেছিল, এলবা যেন কক্-কক্ করে ডেকে মুহূর্তে সব দূরে সরিয়ে দিল। এলবার খাবার সে রেখে দিয়েছে। এলবাকে দেখেই নিচ থেকে খাবার ছোটবাবু নিয়ে এসে ডাকল, এল...বা। খেতে এস। এলবা দু-পাখা ছড়িয়ে এই প্রথম বোট-ডেকে একেবারে পায়ের কাছে উপুড় হয়ে পড়ল। আর গর্ গর্ করে সব খাবার গিলে ফেলতে থাকল।

এত কাছে থেকে ছোটবাবু এলবাকে যেন আর কখনো দেখে নি। কোনো ভয়ডর নেই এলবার। বনি আর সে দাঁড়িয়ে আছে। নিচে বড় একটা মাটির পাত্রে পাখিটার খাবার। পাখিটা আজ পেট ভরে খাবার পেয়েছে। কিছু পাতে পড়েছিলো কারো কারো। ছোটবাবু তাও তুলে রেখেছিল এলবার জন্য। এলবা খেতে খেতে দু'বার ঘাড় বাঁকিয়ে দেখেছে ওদের। পাখা ছড়িয়ে বসলে প্রায় বারো চোদ্দ ফিট লম্বা পাখা, এখন গুটিয়ে রেখেছে। গুটিয়ে রাখলে বোঝা যায় না বাতাসে ডানা মেলে দিলে কখনও এমন অতিকায় দেখাতে পারে। হাঁসের মতো ওর হলুদ রঙের পা পেটের দিকটা কি সাদা আর হাঁসের মতো নরম এবং যেন হাত দিলেই পাখিটা একটা ডিম পারবে। সোনালী রঙ সারা পিঠে ঠোঁট প্রায় কবুতরের মতো—আর কী গভীর নীল চোখ! ছোটবাবু আর বনির প্রতিবিম্ব চোখের মণিতে প্রায় এখন নাচানাচি করছে।

বনি বলল, কী পেট ভরেছে?

এলবা ঘাড় বাঁকিয়ে বনিকে দেখল। যেন বলছে, খুব। খুব খেলাম।

ছোটবাবু বলল, ওদের সঙ্গে গেলে না কেন?

এলবা খেতে গিয়ে যা আশে পাশে ছড়িয়ে পড়েছিল এখন ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে। ছোটবাবুর দিকে তাকাল না। ছোটবাবুর সঙ্গে কোন কথা বলল না।

বনি এবার ছোটবাবুকে জড়িয়ে ধরল আনন্দে, এলবা আমাকে বেশি ভালবাসে। এলবা তোমাকে ভালবাসে না।

ছোটবাবু বলল, বনি। প্লিজ। নিচে বুড়ো দাঁড়িয়ে আছে।

বনি তাড়াতাড়ি সরে দাঁড়াল। ওর মনেই থাকে না কেউ পাশে থাকতে পারে। এনজিন-সারেঙ আসছেন। স্যালি-হিগিনস উঠে আসছেন। পাখিটার খাওয়া শেষ। সে উড়ে যাচ্ছে। ছোটবাবু ডেক সাফ করে রাখছে। আর তখন সূর্য অস্ত যাবে। বোট অথবা কোনো কিছু আর সমুদ্রে ভেসে নেই। সেই একঘেয়ে আকাশ আর নক্ষত্র। সমুদ্রে জ্যোৎস্না। ঝাঁক ঝাঁক সব সামুদ্রিক মাছ। অতিকায় হাঙ্গর ছুটে যাচ্ছে, আর পেছনে সব পাইলট মাছ অথবা সেই সব র‍্যামোরা মাছের আস্তানা এখন জাহাজের পুরো খোলটা। জাহাজের খোলে বোধহয় ধীরে ধীরে শ্যাওলা গজাতে শুরু করেছে। কারণ জাহাজ থেমে থাকলে শ্যাওলায় ঢেকে যাবে খোলটা। ছোটবাবু বনির দিকে ভয়ে তাকাতে পারছে না।

আর তখন স্যালি হিগিনস বললেন, ছোটবাবু এদিকে এস। বনি এদিকে এস। বলে তিনি ওদের নিয়ে গোল হয়ে বসলেন। চুপচাপ। সমুদ্রে নিঃসঙ্গ চাঁদ, তার ছায়া জলে ভেসে যাচ্ছে।

ছোটবাবু বলল, স্যার ক্রোজ-নেস্টে আলো দিয়ে আসছি। ক্রোজ-নেস্টে মশালে আগুন দিয়ে আসছি সে বলতে পারত। কিন্তু আগুন দিয়ে আসছি কথাটার ভেতর কেমন অমঙ্গলজনক কথাবার্তা থাকে। বরং আলো দিয়ে আসছি কথাটা ভারী পবিত্রতায় ভরা। সেই সন্ধ্যার সময় শীতের মাঠে দাঁড়িয়ে শঙ্খের শব্দের মতো অথবা দূরে খুব দূরে কোনো মন্দিরে ঘন্টাধ্বনি হলে যা হয়ে থাকে—সেই এক সুদূর পবিত্রতা মনে মনে ছোটবাবু অনুভব করছিল। সে মাস্তুলে আলো জ্বেলে ফিরে এল। মাথার ওপরে চাঁদ আর সমুদ্রের ঘন নীল কুয়াশা ক্রমে অস্পষ্ট হয়ে আসছে। কেমন সেই অস্পষ্ট কুয়াশায় ওরা ঢেকে যাচ্ছিল। ছোটবাবু ফিরে না আসা পর্যন্ত স্যালি হিগিনস আরম্ভ করতে পারছিলেন না। সে এসে পাশে দাঁড়াতেই বললেন, বোস।

ডেক-চেয়ারে বসেছিলেন তিনি। প্রাচীনকালের কোনো মানুষের মতো, প্রফেট যেন তিনি। অর্থাৎ এমন মুখ গম্ভীর যেন এক্ষুনি তিনি বলবেন, ছোটবাবু কাল আমরা ডাঙা পাচ্ছি। কাল আমরা বন্দর পাব। সেখানে আমাদের জন্য থাকবে প্রচুর সুস্বাদু খাবার, থাকবে ঠান্ডা পানীয় এবং সুপেয় জলের হ্রদ। তুমি বনি সেই ঠান্ডা জলে সাঁতার কেটে দারুণ আরাম পাবে। এবং গভীর পাইনের বন। ইচ্ছে করলে সবুজ পাইনের বনে তুমি বনিকে নিয়ে সামান্য ঘুরেও আসতে পার।

স্যালি হিগিনস বললেন, এনজিন-সারেঙ তোমার কি মনে হয়।

—কী স্যার!

—থেকে ভাল করলাম তো।

—খারাপ কিছু তো বুঝতে পারছি না।

—কবে ডাঙা পাব কেউ যখন জানে না....!

বনির মুখ দুশ্চিন্তায় কেমন কালো হয়ে গেল। বলল, বাবা আমরা আর ডাঙা পাব না?

—ঠিক পাব। কোনো ভয় নেই। ছোটবাবু এখন আর বসে থাকা আমাদের কাজ নয়। ছোটবাবু তোমাকে একটু বেশি সতর্ক থাকতে হবে। আমাদের ওয়াচ ভাগ করে নাও। কে কি করবে ঠিক করে নাও।

ছোটবাবুকে সহসা কেমন সমস্যার ভেতর ফেলে দিয়েছেন কাপ্তান। সে বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করল না। সে খুব দৃঢ় গলায় বলল, স্যার সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত বারোটা আপনার ওয়াচ। রাত বারোটা থেকে সকাল ছ'টা, চাচা আপনার ওয়াচ। আর সকাল ছ'টা থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত আমার।

সে আর দাঁড়াল না। পকেটে টর্চ নিয়ে নেমে গেল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে সোজা মাস্তুলের ডগায় ক্রোজ-নেস্টে উঠে দেখল কিভাবে এখানে সামান্য বসার জায়গা করে নেয়া যায়। দিনমানে মাস্তুলে মশাল জ্বলে না। সকাল হলেই উঠে আগুন নিভিয়ে দিতে হয়। সে পাশে আর একটু জায়গা পেলে বসার জায়গা করতে পারত। মাস্তুলের ডগায় বসে দূরবীনে চারপাশটা লক্ষ্য রাখতে তবে অসুবিধা হয় না। সে বুঝতে পারল হাত-পা মুড়ে সারাদিন এখানে বসে থাকা যাবে না। তার চেয়ে ফলপ্পা বেঁধে নিলে সুবিধা হবে। প্রায় আকাশের নিচে দোল খাবার মতো একটা তক্তা ঝুলিয়ে নিলে সময়ে অসময়ে বনি এখানে উঠে পাহারা দিতে পারবে।

ছোটবাবু মাস্তুলের গোড়ায় নেমে দেখল বনি মুখ গোমড়া করে দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটার স্বভাব ভারি অদ্ভুত। কি এমন হল, সে বুঝতে না পেরে চিৎকার করে উঠল, কি হয়েছে বনি। মুখ ভার করার কি হল?

বনি কেমন অভিমানের গলায় বলল, আমি বুঝি কেউ না জাহাজে!

—তা তো বলি নি।

—আমাকে কি করতে হবে? সবাই তোমরা কাজের, আমি বুঝি কোনো কাজের না!

সে বুঝতে পেরে হেসে দিল। বলল, বনি তোমার অনেক কাজ। তোমাকে আমাদের খাওয়ানোর দায়িত্ব। কি ভাবে কি করবে সব দেখে নাও। আমাকে যখন তখন ডাকবে না। বলে সে স্টোররুমের চাবি কাপ্তানের কাছ থেকে চেয়ে নিতে বলল।

এবং ছোটবাবু আর দাঁড়াল না। রাতের ভেতর সে মাস্তুলের ডগায় ফলঞ্চা বাঁধার জন্য কাঠ সংগ্রহ করতে এনজিন-রুমে নেমে যাবে ভাবল। এনজিন-কশপের স্টোর রুম থেকে দড়ি-দড়া বের করতে হবে। একটা লম্বা তক্তা বের করতে হবে। সে এলি-ওয়েের অন্ধকারে ঢুকতেই কেমন গা ছমছম করতে থাকল। সব খালি কেবিন। এবং অন্ধকারে টর্চ ফেলে সে এগুচ্ছে। সে যতটা পারছে অন্ধকারে নামার চেষ্টা করছে। কোথাও থেকে কোনো বিদঘুটে শব্দ ভেসে এলে টর্চ জ্বালছে। আর আশ্চর্য মনে হচ্ছে সর্বত্র নড়বড়ে জাহাজ—ক্যাঁ কোঁ এমন শব্দ যেন ঝিঁঝিঁ পোকার মতো ডাক। কখনও দরজা ঠাস করে কে বন্ধ করছে। আর্চির সেই ফেটে বের হয়ে আসা চোখ যেন তার পেছনে পেছনে আসছে। এ-সব মনের দুর্বলতা, এমন কি নিঃশ্বাসের শব্দ আর মনে হচ্ছে দৌড়ে কে পালাচ্ছে—সে মুহূর্তে টর্চ জ্বাললেই দেখতে পেল পাঁচ-নম্বরের দরজা খোলা। দু-চারটে ইঁদুর দৌড়ে পালাচ্ছে, দু'টো একটা আরশোলা দেয়াল বেয়ে নেমে আসছে—যেন এক পরিত্যক্ত বাসভূমি—সে সহজে নিচে নেমে যেতে পারল না। দরজা লক্ করে পরিত্যক্ত কেবিন এবং এলিওয়ের অন্ধকারে ঘুরে বেড়াবে ভাবল। অন্ধকারে ঘুরে সাহস সঞ্চয় করবে। কোনো অশুভ প্রভাবকে সে আমল দেবে না। দিলে মনের দুর্বলতা প্রশ্রয় পেয়ে যাবে।

তখন কাপ্তান এনজিন সারেঙকে বললেন, তোমাকে একটা কথা বলা হয়নি। এখন ভাবছি বলা উচিত। জাহাজে এখন আমরা চারজন। একটা গোপন খবর আছে জাহাজে, খবরটা তুমি জান না। আমার কেন জানি মনে হচ্ছে তোমার জানা উচিত। তুমি জানলে এ-জাহাজে সে মুক্ত হয়ে যাবে। তার আর কোনো বাধা থাকবে না।

এনজিন-সারেঙ সামনে সোজা দাঁড়িয়ে আছেন। কাপ্তানের মুখোমুখি বসতে তাঁর ভারি সংকোচ। যেন তিনি সামনে হাঁটু মুড়ে বসে কথা বললে এত বড় মানুষটাকে অপমান করা হবে। তিনি দাঁড়িয়ে থেকে দু একটা কথা ভাঙা ইংরেজীতে বলছিলেন। স্যালি হিগিনিস খুব ধীরে ধীরে কথা বলছেন। সারেঙের বুঝতে যেন এতটুকু অসুবিধা না হয়। তবু মুখ দেখে বুঝতে পেরেছেন তিনি সব কথা তাঁর বুঝতে পারেন নি। তিনি এবার আরও সহজ করে বললেন, জ্যাক ছেলে নয়। মেয়ে। ওকে আমি জাহাজে ছেলে সাজিয়ে রেখেছি। জ্যাক মাঝে মাঝে ছেলের পোশাকে হাঁপিয়ে উঠলে গোপনে বোধহয় মেয়ের পোশাক পরে গভীর রাতে ডেকে ঘুরে বেড়াতো। কেউ কেউ পরী দেখতে পেত। বলে তিনি থামলেন।

সারেঙ-সাব বললেন, ওম্যান স্যার।

—ইয়েস ওম্যান। শী ইজ ওম্যান নাউ।

সারেঙ-সাব বললেন, জী, ছোটবাবু তো সাব ম্যান হয়ে গেছে। যেন বলতে চাইলেন বনি ওম্যান হলে ছোটবাবু ম্যান। ছোটবাবু টের পেলে যদি কেলেঙ্কারী করে ফেলে কিছু—তবে অসম্মান তাঁর। ছোটবাবু কোনো খারাপ কাজ করে ফেললে তাঁর আর মুখ দেখাবার জায়গা থাকবে না।

স্যালি হিগিনস বললেন, ছেলে খুব সেয়ানা। সে আগেই টের পেয়ে গেছে। তার জন্য তোমাকে ভাবতে হবে না।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ার মতো সারেঙ-সাব হাল্কা হয়ে গেলেন। জেনেও যখন কিছু করে নি, কাপ্তানের যখন বিশ্বাস আছে ছোটবাবুর ওপর তখন তিনি আর কিছু বলতে পারলেন না।

স্যালি হিগিনস বললেন, আমি ভাবছি বনি এবার থেকে জাহাজে আর যে ক'দিন আছে মেয়ের পোশাক পরবে। তুমি কি বল?

—জী সাব, পরবে বৈকি। সারেঙ-সাবের নামাজের সময় হয়ে যাচ্ছে। তিনি বললেন, আমি যাই সাব।

—দাঁড়াও। তিনি জোরে ডাকলেন, বনি। বনি এদিকে এস। এই প্রথম বাবা তাকে জাহাজে বনি বলে জোরে ডাকছেন। বনির ভেতরটা তোলপাড় করে উঠল। সে বলল, যাই বাবা।

কাছে গেলে তিনি বললেন, তোমার কথা সারেঙকে জানিয়ে দিলাম। তুমি গাউন পরে এস। আমরা তোমাকে দেখি।

বনির হাত-পা ভীষণ কাঁপছিল। সে যেন কেবিন পর্যন্ত হেঁটে যেতে পারবে না। এতদিন ছেলের মতো জাহাজে তার বেশ দিন কেটে গেছে। সে মেয়ের মতো এবার থাকবে। মেয়েরা কিভাবে হেঁটে যায়—অথবা লজ্জা-সংকোচ এবং সুষমা বলতে যা-কিছু সব সে ঠিক ঠিক আয়ত্তে রাখতে পেরেছে কিনা, এসব চিন্তায় সে কেমন সব গুলিয়ে ফেলছে।

স্যালি হিগিনস বললেন, কী দাঁড়িয়ে থাকলে কেন? যাও। পকেট থেকে টর্চ বের করে দিলেন। বললেন, লম্ফ জ্বালিয়ে নাও। তুমি জাহাজে কত বড় হয়ে গেছ আমরা দেখব না?

বনি টর্চ নিয়ে প্রায় ছুটে পালিয়ে গেল। সে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। আলো ফেলে সে লকারের চাবি খুঁজছে। আর ভীষণ ঘামছিল। এই প্রথম সে টের পাচ্ছে সবার সামনে তার প্রিয় পোশাক পরে দাঁড়াতে ভারী সংকোচ। সে তবু লকার খুলে সবচেয়ে দামী গাউন বের করল। পোর্ট-হোল থেকে গলে পড়ছে সাদা জ্যোৎস্না। আলো জ্বালতেই জ্যোৎস্না সরে গেল। আলোতে নিজেকে ভারী মহার্ঘ ভেবে আয়নায় নিজেকে দেখতে থাকল। খুব বেশি উগ্র দেখাচ্ছে সবকিছু। তাড়াতাড়ি পোশাক পাল্টে ফেলল, এবং সাধারণ একটা নীল রঙের গাউন পরে দাঁড়িয়ে থাকল। দরজা পর্যন্ত সে কোনরকমে হেঁটে এসেছে। আর তার পা সরছে না। দু'জন বুড়ো মানুষ তাকে দেখবেন বলে ডেকে অপেক্ষা করছেন। সে অতদূরে হেঁটে কিছুতেই যেন আর যেতে পারবে না। তার আগেই হাঁটু মুড়ে বসে পড়বে অথবা পড়ে যাবে।

স্যালি হিগিনস তখন ডাকছেন—বনি, এত দেরি কেন? তাড়াতাড়ি এস।

কোনো জবাব নেই। সমুদ্রে ছোট ছোট ঢেউ। উঠছে। ভেঙে যাচ্ছে। ভোঁস করে ভেসে উঠছে কোনো সামুদ্রিক প্রাণী। তাদের নিশ্বাস ফেলার শব্দ শোনা যাচ্ছে। তিনি ফের ডাকলেন, বনি এস সারেঙের নামাজের সময় পার হয়ে যাচ্ছে।

সারেঙ-সাব বললেন, সরম লাগছে সাব। সারাটা সফর জাহাজে দুষ্টুমী করেছে, এখন মেয়ে হয়ে গেলে দুষ্টুমী করতে পারবে না। খুব বিপাকে পড়ে গেছে।

স্যালি হিগিনস বললেন, কি ব্যাপার? কোনো সাড়াশব্দ নেই? এস তো সারেঙ। দেখি ও কি করছে? তারপর দারজার সামনে এসে থামতেই কেমন অবাক। বনি দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। ওর মুখ দেখা যাচ্ছে না। হিগিনস বললেন, লাইট। যেন জোরে হেঁকে উঠতেন—মোর লাইট, সারেঙ লম্ফটা নিয়ে এলে প্রায় ওরা দুই ফেরেস্তার সামিল যেন, লম্ফের আলোতে যুবতীর মুখ দেখছেন। মুখে কপালে যুবতীর বিন্দু-বিন্দু ঘাম। লজ্জায় চোখ বুজে আছে। সারেঙ-সাব তখন ডাকলেন, ছোট্‌সাব আপনি কি খুবসুরত!

স্যালি হিগিনস নুয়ে মুখের কাছে প্রায় মুখ নিয়ে ডাকলেন, বনি, আমার বনি, বনি তাকাও।

বনি কিছুতেই বাবার দিকে তাকাতে পারছে না। যেন বনির এতবড় গোপন ঐশ্বর্যের খবর পৃথিবীতে এবার প্রচার হয়ে গেল। বনি সেদিনও ভারী ছোট্ট, জাহাজে থেকে থেকে সে কখন যুবতী হয়ে গেছে। যুবতী হয়ে গেলেই সুন্দর সব দৃশ্যমালা—কোনো মনোরম উপত্যকায় ফুল ফোটার মতো। স্যালি হিগিনস এত ঝুঁকে মেয়েকে দেখছিলেন যেন মনে হয় উপত্যকায় ফুল সত্যি যথাযথ এবার ফুটেছে, না এখনও ফুল ফুটতে সময় লেগে যাবে।

সারেঙ-সাব বললেন, কি মনে হয় সাব?

হিগিনস বললেন, ভাল। খুব ভালো।

আর এই সমুদ্রে দুই বুড়োর হাতে লম্ফ সামনে রূপবতী কন্যা। হাজার হাজার মাইল ব্যাপ্ত আকাশের নিচে, সমুদ্রে অথবা কঠিন বিভীষিকার ভেতর যুবতী ইহকাল পরকালের মতো। আর এক অপোগন্ড তখন ডেকে কাঠ চিরে যাচ্ছে। মাস্তুলে ফলগুঞ্চা বাঁধতে না পারলে সারা দিনমান পাহারায় থাকা যাবে না। যেন প্রায় শপথের সামিল। স্যালি হিগিনস তখন জোরে হাঁকলেন, ছোট বা......!

ছোটবাবু বহুদূর থেকে যেন জবাব দিচ্ছে—যাই স্যার।

—স্কাউড্রেল, এখানে দেখে যাও। তুমি অপোগণ্ড কত সেয়ানা দেখি।

ছোটবাবু কাছে এসে ঘাবড়ে গেল। বনি মেয়ের পোশাক পরে আছে। মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে আছে। দরজায় দু'বুড়োর হাতে লম্ফ। ঠিক মুখের ওপর ওরা লম্ফ ঝুলিয়ে রেখেছে। দূর নীহারিকার কোনো গ্রহনক্ষত্রের দরজায় দাঁড়িয়ে যেন তারা বনিকে সন্তর্পণে দেখছে।

তখনই স্যালি হিগিনস বললেন, কী চিনতে পারো?

ছোটবাবু বলতে পারল না, হাঁ চিনি। সে সমুদ্র দেখতে থাকল।

হিগিনস কেমন ক্ষেপে গেছেন মতো। বললেন, চিনতে পারছো না?

ছোটবাবু সমুদ্র দেখতে দেখতেই যেন খুব অন্যমনস্ক গলায় বলল, হ্যাঁ চিনি স্যার।

—হিগিনস পরিবারের শেষ নোঙর।

ছোটবাবু বলল, জানি স্যার।

তারপর সহসা স্যালি হিগিনস ফু দিয়ে দু'টো লম্ফই নিভিয়ে দিলেন। আবার সেই মরা জ্যোৎস্না সমুদ্রে, ডেকে জ্যোৎস্না, মাস্তুলের ছায়া ডেকে লম্বা হয়ে পড়েছে, কিছুটা সমুদ্রে ভেসে গেছে। আর ওরা চারজন কেমন এক রহস্যময় সমুদ্রে দাঁড়িয়ে চুপচাপ অনেক দূরে এক দল নিরীহ ডলফিনের আর্তনাদ শুনতে পেল। বোধহয় ভেড়ার পালে বাঘ পড়ার মতো অতিশয় হিংস্র হাঙরেরা পেছনে লেগেছে। কাছাকাছি এলে ঠিক দেখা যেত সমুদ্রের জল আর নীল থাকছে না। ধীরে ধীরে রক্তাক্ত হয়ে যাচ্ছে সবকিছু।

তারপর স্যালি হিগিনস ওপরে উঠে গেলেন। তাঁর ডিউটির সময় পার হয়ে যাচ্ছে। শুধু এখন চুপচাপ জ্যোৎস্নায় দাঁড়িয়ে থাকা। বারোটার পর আসবে সারেঙ। ঠিক ব্রীজে উঠে যাবার জায়গায় সে থাকবে। অন্তত বুড়ো মানুষের পক্ষে এর চেয়ে উঁচুতে দাঁড়াবার আর জাহাজে জায়গা নেই। দূরে কোথাও যদি কোনো আলোর বিন্দু দেখা দেয়। কতবার যে সমুদ্রে সব নক্ষত্রেরা কুহেলিকা তৈরি করেছে—ঠিক ঠিক আলোর বিন্দুর মতো যেন এগিয়ে আসছে, আসছে—স্যালি হিগিনস ঝুঁকে থেকেছেন—তারপর চমকে গেছেন—এতো দিগন্তে ঝুলে থাকা একটি সামান্য নক্ষত্র! দূরবর্তী মাস্তুলের কোনও আলো নয়। অথচ চোখের ওপর স্বপ্নের মতো আশা কুহকিনী, চোখ মুছে বার বার অবিশ্বাস করেছেন নিজেকে। কিছুতেই আর এ-সব গ্রহ-নক্ষত্রের ছলনায় পড়ে যাবেন না। তিনি পায়চারি করছেন আর দেখছেন—যদি কোথাও কিছু, না—কিছু না, কেবল ধূসর ঠান্ডা মরুভূমির মতো চারপাশে মৃত্যুর আতঙ্ক।

তখন দেখলেন বনি টুইন-ডেকে নেমে যাচ্ছে। হাতে লম্ফ। সে বোধ হয় কিছু আনতে যাচ্ছে নিচে। ফল্কায় মাদুর বিছিয়ে নামাজ পড়ছেন এনজিন-সারেঙ। ছোটবাবু মাস্তুলের ওপর উঠে ঠুকে ঠুকে সেই থেকে কি সব করছে। বনি আবার ওপরে উঠে আসছে। হাতে লম্ফ নিয়ে সে বোধ হয় কিছু খুঁজে বেড়াচ্ছে। ছোটবাবু বনিকে যা-হোক একটা কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। বনি ওদের জন্য রাতের খাবার তৈরী করছে বোধ হয়। খাবারের নামে তাঁর জিভে জল এসে গেল।

আর যখন ওরা ডেকের ওপর গোল হয়ে খেতে বসল—তখন হিগিনস অবাক, বনি বেশ

চারটে কেক বানিয়েছে। চিনি নেই, ডিম নেই, সামান্য জেলি আর ময়দা গুলে বেশ রাতের মতো চারটে কেক। এবং মনে হল, ছোটবাবুর পাতে বনি সব চেয়ে বড়টা দিয়েছে। হিগিনস মুখ গোমড়া করে খাচ্ছিলেন আর ছোটবাবুর পাতের দিকে বার বার তাকাচ্ছিলেন। সারেঙ একটু দূরে বসে খাচ্ছেন। তাঁর কাছে একটা লম্ফ দরকার। ছোটবাবু কেমন ধমকের গলায় বলল, বনি, চাচা অন্ধকারে বসে খাচ্ছেন।

সারেঙ-সাব বললেন, তোর ব্যস্ত হতে হবে না। তুই খা। আমি ঠিক দেখতে পাচ্ছি।

হিগিনস কফি খাচ্ছিলেন। কফি বলা যাবে না, গরম জলে সামান্য কফির গন্ধ। খুব যেন কষ্ট হচ্ছে খেতে। পানসে। বনি একটু চিনি হবে না! এই একটু হলেই হয়ে যেত।

ভাঁড়ার খালি হয়ে গেছে প্রায়। খুব সতর্ক না থাকলে বিশ-পঁচিশ দিনও যাবে না। সে ছোটবাবুর দিকে তাকালে, কি বলবে ছোটবাবু বুঝতে পারল না। বুড়ো মানুষটা কেমন শিশুর মতো আবদার করছে। সে শক্ত হতে পারলে ভাল করত। কিন্তু বুড়ো মানুষটা এভাবে তাকিয়ে আছেন যেন কতদিন তিনি সুস্বাদু কফি খান নি। ছোটবাবু বলল, দাও। বুড়ো মানুষেরা সময়ে সময়ে কি যে হয়ে যান।

বনি একটা জেলির কৌটা থেকে আধ-চামচ বের করে দিল। হিগিনস চামচটা দিয়ে খুব জোড়ে নাড়তে থাকলেন। তারপর পা দুলিয়ে দুলিয়ে খেতে থাকলেন। কি যে সুন্দর লাগছে এখন বনিকে। ছোটবাবুকে সামান্য খোশামোদ করলে তিনি যদি সামান্য বেশী সুযোগ-সুবিধা পান—তাঁর কথাবার্তা শুনে এখন এমনই মনে হচ্ছিল।

স্যালি হিগিনস কফি খেতে খেতে বললেন, বুঝলে ছোটবাবু তোমাকে একটা কথা বলে রাখি, বেশি রাত জাগবে না। সকালে উঠে আবার করবে। মাস্তুলে বসে সারারাত খুট খুট করলে দিনের বেলা ভীষণ ঘুম পাবে

বনি তখন তার অ্যাপ্রনে হাত মুছে নিল। সে কাজের জন্য খাটো স্কার্ট পরে নিয়েছে। পা হাঁটু পর্যন্ত খালি। আর মোমের মতো এত মসৃণ পা যে ছোটবাবু খেতে খেতে অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল ভীষণ। সে তাড়াতাড়ি উঠে কাজে চলে গেল। যত রাত হোক শেষ করে ফেলতে হবে। নেমে যাবার সময় বলল, এলবা আফটার-পিকে আছে। তুমি ওর খাবারটা নিচে রেখে এস।

এখন দেখলে কে বলবে, জাহাজটা ভাঙা, জাহাজ অনন্ত সমুদ্রে কাঠের গুড়ির মতো ভাসছে। যেন এরা যাযাবর মানুষ, কিছুদিন এখানে আছে আবার সময় হলেই অন্য কোথাও চলে যাবে। কেউ এতটুকু যেন বিচলিত নয়। খুব স্বাভাবিক। বনি তার কাজে এতটুকু খুঁত রাখে নি। যা স্বভাব মানুষটার—যখন তখন যার তার সামনে অপমান করতে পারলে যেন বাঁচে।

এভাবে জাহাজে ক্রমে আর একটা রাত কেটে গেল। সকালে সবাই দেখল ছোটবাবু ক্রোজনেস্টে বসে থাকার মতো ছোট্ট একটা ঘর বানিয়ে চলেছে। ওপরে ত্রিপল দিয়ে কোনো আদিবাসী মানুষের মতো ঘর বানিয়ে ছোটবাবু বসে আছে। চারপাশটা ফাঁকা। মাথার ওপরে ছাদের মতো ত্রিপলের ছাউনি। সে ছাউনির নিচে বসে আছে। চোখে দূরবীন। সে এক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হচ্ছে না। বার বার মনে হচ্ছে ঠিক কিছু দেখে ফেলবে। মাস্তুলের নিচে দাঁড়িয়ে খবর নিচ্ছেন স্যালি হিগিনস—কিছু দেখতে পাচ্ছ ছোটবাবু? কোনো মাছ অন্তত! এই তিমি মাছটাছ!

ছোটবাবু বলেছিল, না স্যার। কেবল চারপাশে সমুদ্র আমাদের যেন গিলতে আসছে। আমরা বাদে এ-সমুদ্রে আর কোনো প্রাণী আছে দেখে বিশ্বাস হচ্ছে না। চারপাশে এত পারপয়েজের ঝাঁক থাকে—তাও নেই। র‍্যামোরা মাছ আর একটাও ভেসে আসছে না।

স্যালি হিগিনস বললেন, দ্যাখো তো কোথাও নীল হাঙ্গর দেখতে পাচ্ছ কিনা। ওরা কাছাকাছি ঘুরে বেড়ালে কোনো মাছ থাকবে না। ভয়ংকার হিংস্র এরা।

সে বলল, না স্যার। জলের নিচে কিছু দেখা যাচ্ছে না। মাছের কোনো ফুটকরি পর্যন্ত নেই।

ক্রমশ সূর্যের উত্তাপ বাড়ছে। প্রখর উত্তাপে ঘামছে ছোটবাবু। বনি একটা তোয়ালে রেখে গেছে। সে বার বার ঘাম মুছছিল। তোয়ালে ভিজে গেছে। খালি গা। আর সে পরেছে সাদা হাফ-প্যান্ট। শরীরে কিছু রাখা যাচ্ছে না গরমে। সকালে চিনি ছাড়া চা মিলেছে শুধু। তারপর কি করে সময় যে কেটে যাচ্ছে। স্যালি হিগিনস ফের বললেন, চারপাশে কোথাও কিছু দেখতে পাচ্ছ না।

—না স্যার।

—অন্তত এক ঝাঁক ডলফিন?

—না স্যার।

—সমুদ্র তো এমন হয় না। তিনি বললেন, জলের গভীরে কাছাকাছি যদি.......

সে বলল, গভীরে শুধু নীল কাঁচের মতো জল ঝকঝক করছে। একেবারে পরিষ্কার, সাত-আট ফেদম্ নিচে কি আছে দেখা যাচ্ছে।

—এত স্বচ্ছ!

—হ্যাঁ স্যার।

—তবু কিছু চোখে পড়ছে না। স্ট্রেঞ্জ!

এতদিন জাহাজটার চারপাশে কত সব বিচিত্র মাছের ভিড় ছিল। সিউল-ব্যাংক অদ্ভুত প্রকৃতির এক আগন্তুক তাদের কাছে! ওরা নাক ভাসিয়ে পিঠ ভাসিয়ে দেখে গেছে। এবং ছোটবাবু প্রায় সব রকমের মাছ দেখলে চিনতে পারে। কোনটা কি মাছ। সমুদ্রের প্রাণীতত্ত্ব সম্পর্কে ডেবিড কিছু খোঁজ- খবর রাখত। স্যালি হিগিনসও সব মাছের এবং প্রাণীদের নাম বলে দিতে পারেন। ওর এখন মনে হচ্ছিল, আসলে এ-সমুদ্রে বুঝি কোনো অতিকায় মনস্টার এসে গেছে—ভয়ে একটা মাছ আর নেই। রাতারাতি সব ভেগেছে। এবং যেন সব দিগন্ত জুড়ে সে ভেসে উঠবে—তারপর এই ছোট্ট জাহাজটাকে টেনে নেবে জলের নিচে। আর থাকবে অতিকায় লেজ, মুখ ড্রাগনের মতো। সে ডুবে ডুবে বোধ হয় আসছে।

স্যালি হিগিনস মাথায় টুপি পরে রোদে দাঁড়িয়ে আছেন। খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছে তাঁকে। অন্য সময়ে তিনি নীল হাঙ্গরের কথায় এলে অন্য সব হাঙ্গরের কথা সঙ্গে না বলে পারতেন না। তাদের স্বভাব কি রকমের—কতটা ধূর্ত, কোন মাছ সমুদ্রে সবচেয়ে বোকা এ-সব বলে তিনি বেশ সময় কাটিয়ে দিতে পারতেন। হিংস্র অক্টোপাসেরা জ্যোৎস্না রাতে প্রবালের পাহাড়ে উঠে বসে থাকে। চাঁদের আলো ওদের বড়ই প্রিয়। এবং প্রবালের নিচে যে সব জলজ ঘাস, সেখানে সে যে ধূসর রঙের লালা ছড়িয়ে রাখে শিকার ধরার আশায়, যাবতীয় তথ্য দিয়ে বোধ হয় বুঝিয়ে দিতেন। এখন তিনি মাস্তুলের নিচে চুপচাপ। রোদে কেন যে এভাবে দাঁড়িয়ে আছেন! ছোটবাবু বলল, কিছু দেখলে ঠিক ডাকব; রোদে দাঁড়িয়ে থাকবেন না।

স্যালি হিগিনস সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে আসছেন কেন? ছোটবাবু ঝুঁকে বলল, সাবধানে উঠবেন, ওপরের সিঁড়ি ভাল নয়। হিগিনস প্রায় ঝুলে ঝুলে ওপরে উঠে এলেন। তিনি ছোটবাবুকে সরিয়ে দূরবীনে কি দেখতে থাকলেন। এমন নির্বোধ উদাসীন সমুদ্র কখনও দেখেন নি। সত্যি কিছু নেই কোথাও। কোনো মাছ, অথবা স্কুইড দেখলেও তিনি যেন আশ্বস্ত হতে পারতেন। এতটা ঘাবড়ে যেতেন না। তাঁর মুখ চোখ কালো হয়ে যাচ্ছে ক্রমশ। তিনি নেমে যাবার সময় বললেন, কিছু দেখলেই ডাকবে। এতটুকু দেরি করবে না। যেন হিগিনস বুঝিয়ে গেলেন—তিনি আবার জাহাজে স্যালি হিগিনস হয়ে গেছেন।

হিগিনস ক্রোজ-নেস্ট থেকে নেমে ডেকে পা ফেলতে না ফেলতেই ছোটবাবু চিৎকার

করে উঠল, স্যার সামথিং ভিজিবল্। দূরে কিছু দেখা যাচ্ছে। নর্থ-ওয়েস্ট-নর্থে সে ভেসে উঠেছে। সে দিগন্তের ওপর প্রায় আকাশ ছুঁয়ে দিচ্ছে মতো। ক্রসের মতো—অথচ মনে হয় প্রতিহিংসাপরায়ণ। জাহাজ এক আশ্চর্য স্রোতের মুখে পড়ে গেছে। দেখুন সে গতি পেয়ে গেছে। কোথায় যাচ্ছি আমরা স্যার কিছু জানি না। সমুদ্রের ও-পাশে ক্রসটা মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে।

॥ একান্ন ॥

সিউল-ব্যাংক এগিয়ে যাচ্ছে কি অতিকায় ক্রসটা কাছে ছুটে আসছে বোঝা যাচ্ছে না। সমুদ্র পার হয়ে দিগন্তের নিচ থেকে ক্রমে ওটা আকাশের বুকে বড় হয়ে যাচ্ছিল। যেন কেউ ওটা ঠেলে আকাশের গায়ে তুলে দিচ্ছে। সব বর্ণচ্ছটা ক্রসটার গা থেকে ঠিকরে বের হচ্ছে—কারণ মনে হচ্ছিল এক আলোময় জগত, যেন অনেক সূর্যের দীপ্যমান আলো নিয়ে সে আকাশে জ্বলে উঠেছে। স্যালি হিগিনস দেখতে দেখতে প্রায় বিহ্বল। তিনি বিড়বিড় করে বকছিলেন—মাই টাইম হ্যাজ কাম্। মাই টাইম হ্যাজ কাম্। শী উইল সুন সারাউন্ড মি। অ্যান্ড দিস ইজ মাই ফেট।

ছোটবাবু নিচে দাঁড়িয়ে আছে। সে দেখছিল—বহুদূরে প্রায় দিগন্তে কিছু দেখা যাচ্ছে। বিন্দুর মতো অস্পষ্ট। কখনও অজস্র ঢেউ-এর ভেতর ওটা হারিয়ে যাচ্ছে। সে নিজের চোখকে ভীষণ অবিশ্বাস করছে এখন। ক্রোজ-নেস্ট থেকে সে যা দেখেছিল—ডেকে নেমে সে তার প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কখনও বিন্দুবৎ কালো কিছু দিগন্তে উঁকি মেরে সমুদ্রগর্ভে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। যা সে এত কাছে দেখেছিল, যা সে ভেবেছিল প্রায় আকাশের মতো অতিকায় কি করে যে সে সহসা অবার বিন্দুবৎ হয়ে গেল। সে বলল, এনি মিরাকল্?

তিনি বললেন, মিরাকল! অল ননসেন্স।

ছোটবাবু বলল, শুধু বিন্দুবৎ কিছু দেখা যাচ্ছে। একটা পাহাড়ের মতো ক্রসটা দেখেছিলাম। এখন কিছু নেই। একেবারে ফাঁকা।

হিগিনস আর একটা কথাও বলছেন না। তিনি দ্রুত নেমে আসছেন। সারেঙ-সাব পাশে দাঁড়িয়ে কি করবে ভেবে পাচ্ছেন না। বনি চিফ-কুকের গ্যালি থেকে মুখ বার করে রেখেছে। সে চাপাটি উল্টে পাল্টে দিচ্ছে। একটু এদিক ওদিক হলে পুড়ে যাবে। সে বের হয়ে আসতে পারছে না। চিৎকার করে কথা বলছে—বাবা ওটা কি! কি দেখলে?

হিগিনস ডেকে লাফ দিয়ে প্রায় নেমে পড়লেন। খুব স্বাভাবিক গলায় বললেন—কিছু না। প্রবালের দ্বীপ-টিপ হবে।

—আমরা ওখানে নামতে পারব বাবা?

ছোটবাবু লাফ দিয়ে তখন ফের দেখার জন্য মাস্তুলের মাথায় উঠতে গেলে খপ করে হিগিনস হাত ধরে ফেললেন। বললেন, ইয়ং ম্যান, প্লিজ লি টু মি। ডোন্ট গো।

ছোটবাবু বলল, কিন্তু স্যার.......

হিগিনস বললেন, প্লিজ ইউ ফলো মি।

সারেঙ-সাব বললেন, আমি একবার উঠে দেখব সাব?

হিগিনস বললেন, কিছু আর দেখার নেই।

বনি দু'হাতে তখন চাপাটি উল্টে-পাল্টে দিচ্ছে। সে কিছুতেই বের হয়ে, কেন ছোটবাবু ক্রোজনেস্ট থেকে চিৎকার করে উঠেছিল—বাবা উঠে গেলেন কেন আবার তিনি নেমেই বা এলেন কেন এবং একটা কথা কেউ বলছে না, বাবা ছোটবাবুকে ধরে নিয়ে যাচ্ছেন, এসব জিজ্ঞাসা করলে হত। সে একটা পাতলা ফ্রক গায়ে দিয়ে নিয়েছে। দিন যত এগিয়ে যাচ্ছে বাতাসে তত উত্তাপ। শরীরে দু'তিন জায়গায় ইতিমধ্যে গরমে ফোসকা পড়েছে। সারেঙ সাব সব হাতের কাছে এগিয়ে দিচ্ছেন। আগুন ধরিয়ে দিচ্ছেন। এবং সব কাজে সহায়তা না করলে সে কিছু করতে পারত না। অথচ সে যে ছুটে গিয়ে বলবে—ছোটবাবুকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ বাবা? ও কি করেছে? আমাকে কিছু বলছ না কেন—সে না পেরে সব উনুন থেকে নামিয়ে দু'লাফে বাইরে বের হয়ে এল। বলল, বাবা ছোটবাবুকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?

হিগিনস দেখলেন সত্যি তিনি ছোটবাবুকে প্রায় টেনে নিয়ে যাচ্ছেন বোট-ডেকে। যেন

কিছুতেই আর তাকে ক্রোজ-নেস্টে উঠতে দেবেন না। তিনি যে তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছেন একেবারে খেয়াল করেন নি। কেমন বিভ্রমের ভেতর সব ঘটে যাচ্ছে। তিনি বনিকে আশ্বস্ত করার জন্য না বলে পারলেন না, বোট-ডেকে আমাদের সামান্য কাজ আছে বনি।

বনি বলল, কি যে দেখলে তোমরা!

—কিছু না তো।

—ছোটবাবু যে চিৎকার করে উঠছিল—কি সব এগিয়ে আসছে?

—কোথায় কি এগিয়ে আসছে! দ্যাখো না। কিছু দেখতে পাচ্ছ? বনি চারপাশে খালি চোখে সত্যি কিছু দেখতে পেল না। বলল, ছোটবাবু তোমার ঠাট্টা করার সময়-অসময় নেই।

ছোটবাবু বোকার মতো তাকিয়ে আছে। সে বলল, স্যার তবে আমি চোখে ভুল দেখেছি।

তিনি শান্ত গলায় বললেন, উই উইল নো লংগার ওয়ানডার ইন দ্য ডারকনেস। তাড়াতাড়ি আমাদের হাতের বাকি কাজ সব সেরে ফেলা ভাল। স্যালি হিগিনস ফের তাঁর পুরানো মরজি পুরোনো স্বভাব পুরোনো ব্যক্তিত্ব ফিরে পাচ্ছেন। ছোটবাবুকে কিছু বলার সময় দিচ্ছেন না। তিনি কি সব অজস্র কথা বলে যাচ্ছেন বিড়বিড় করে। মাথামুণ্ডু সে কিছু বুঝতে পারছে না। তিনি তাকে নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছেন। এবং জাহাজের ফরোয়ার্ড-পিকে উঠে যাবার মুখে প্রায় লাথি মেরে দরজা খুলে ফেললেন। এবং বললেন, ইয়াংম্যান, প্লিজ গো ইন-সাইড। বলে অন্ধকারে তাকে ঢুকিয়ে বললেন, দ্যাখো কি কি কাঠ আছে। তিন বাই চার এবং যত লম্বা সব কাঠ আছে বের করে ফেল। ছোটবাবু জানে এটা কার্পেন্টারের ঘর। পাশে ডেক-কশপের স্টোর রুম। সে যত লম্বা কাঠ ভারী কাঠ আছে ছোট বড় সব ডেকে টেনে টেনে বের করে আনছে। আর মাঝে মাঝে বলছে, স্যার এত সব ভারী কাঠ দিয়ে কি হবে? তিনি ফিতে গজ দিয়ে মাপছেন। এবং পছন্দমতো সব কাঠ টেনে একপাশে রেখে দিচ্ছেন। তারপর হাঁটু গেড়ে বললেন, কাঠগুলো সব আমার কাঁধে তুলে দাও ছোটবাবু।

ছোটবাবু বিব্রত বোধ করছে।

—রাখুন। আপনাকে নিতে হবে না। কোথায় রেখে আসতে হবে বলুন, রেখে আসছি। ছোটবাবু বিরক্ত গলায় এ-সব বলতে গেলে বুঝতে পারল, স্যালি হিগিনস তার দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন। সেই চোখ, যেমন সে জাহাজে উঠে প্রথম দেখেছিল—যা দেখলে ওর বুকের রক্ত হিম হয়ে যেত। সে বলল, এক্সকিউজ মি স্যার। আপনার কষ্ট হবে ভেবে বলেছি। ছোটবাবু বুড়ো মানুষটার কাঁধে সব ক'টা কাঠ তুলে দিলে তিনি সোজা উঠতে পারলেন না। প্রায় টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিলেন। ছোটবাবু এবার ধরে ফেলল। বলল, স্যার আপনি পারবেন না।

তিনি তবু কাঁধে সব ক'টা কাঠ নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন। এত ভারী যে তিনি নুয়ে পড়ছিলেন। তবু যেন হার মানবেন না।—বিড়বিড় করে বকছেন। কখনও ঈশ্বরকে অজস্র গালাগাল করছেন—কখনও বোধহয় নতজানু—যেমন তিনি এবার জোরে জোরে বলছেন, লর্ড ব্রিংগ মি আউট অফ অল দিস ট্রাবল, বিকজ্ উই আর ট্রু টু ইউর প্রমিসেজ। অ্যান্ড বিকজ ইউ আর লাভিং অ্যান্ড কাইনড টু মি..... বলতে বলতে চলে যাচ্ছেন। ছোটবাবু পেছনে পেছনে যাচ্ছে—যদি উপুড় হয়ে পড়ে যান—তার আগেই ধরে ফেলতে হবে—এবং আবার তিনি বলছেন—কাট্ অফ অল আওয়ার এনিমিজ অ্যান্ড ডেস্ট্রয় দোজ হু আর ট্রাইং টু হার্ম আস, ফর উই আর ইয়োর সার্ভেন্টস। যেন জপ করছেন, উই আর ইয়োর সার্ভেন্টস।

ছোটবাবু বলল, আমাকে কিছু দিন। পড়ে গেলে হাত-পা ভাঙবে। তিনি একটা কাঠও ওকে দিলেন না। বসলেন। কাঠগুলো এবার সিঁড়ির কাছে রেখে একটা একটা করে বোট ডেকে তুলে নিয়ে গেলেন। সব ক'টা কাঠ তুলে ফের নেমে এলে ছোটবাবু বলল, কোথায় যাচ্ছেন আবার!

—আমার সঙ্গে এস। মুখে যে ছোটবাবুর সামান্য বিরক্তি ফুটে উঠেছিল স্যালি হিগিনসের

গলার স্বরে তা মিইয়ে গেল। সে তাঁর পেছনে মন্ত্রঃপূত মানুষের মতো হেঁটে যেতে থাকল। আর একটা প্রশ্ন করতে পারল না।

ছোটবাবুকে নিয়ে তিনি ফের ডেক-কশপের ঘরে ঢুকে তন্ন তন্ন করে খুঁজছেন সব। পেরেক ছোট- বড় মাপের যা পাচ্ছেন ছোটবাবুর হাতে দিয়ে বলছেন, রাখো। কিছু লোহার পাতলা প্লেট এবং স্ক্রু। ত্রিপল টেনে বের করছেন। আর যেন এখন ঘরভর্তি আরশোলা পা বেয়ে মাথা বেয়ে উঠে যাচ্ছে। আবার উড়ে যাচ্ছে কখনো। কত অল্প সময়ে ওদের উপদ্রব বেড়ে যাচ্ছে। এবং রং তেল বার্নিশের গন্ধ। তিনি পাতলা কাঠ যা পাচ্ছেন টেনে বের করছেন। লোহার শিক টেনে বের করছেন। ছোটবাবু একটা কথা বলছে না। ভয় পেয়ে গেছে হয়তো, তিনি এবার টর্চের আলো অন্ধকারে ছোটবাবুর মুখে ফেললেন। সহসা আলো পড়ায় সে মুখের ওপর হাত তুলে দিলে স্যালি হিগিনস কেমন অমানুষের মতো হেসে উঠলেন। বললেন, ছোটবাবু তুমি ভীষণ কাওয়ার্ড। মুখ এমন করে রেখেছ কেন? আরে কিছু হয় নি। এই ছোটবাবু, তুমি ক্রোজ-নেস্টে উঠে গেলে কিছু আর দেখতে পাবে না। কিন্তু আমি জানি আমরা কোথায় এসে গেছি। তোমাকে বলতে পারি কিন্তু তুমি যা একখানা মানুষ! ছোটবাবু শক্ত গলায় বলল, স্যার আমরা কোথায় এসেছি? কোন সমুদ্রে?

—সমুদ্রটার সঠিক কিছু আমি জানি না। তবে এটা বলতে পারি কোরাল-সীর কাছাকাছি জায়গা। এতদিনে অন্তত কোথায় আমরা আছি জানা গেল। একবার এখানে সিউল ব্যাংক কোর্স ভুল করে ফেলেছিল।

—কি বলছেন স্যার!

—ভয় পাচ্ছ কেন? এই দ্যাখো হাত থেকে দু'টো তোমার স্ক্রু পড়ে গেল। তবে তাঁর একান্ত করুণায় ছ' সাত দিনের ভেতর আমরা আবার কোর্স পেয়ে গেলাম। একেবারে সহজ স্বাভাবিক কথা।

—তখন কিউ-টি-জি চাইলেন না কেন?

—চাইতে পারিনি। ভারী অসম্মানের ব্যাপার। এই তুমি কিন্তু আবার বনিকে বলবে না।

—না স্যার।

—বনিকে বললে সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেব। তিনি টর্চের আলো কাঠের র‍্যাকগুলোতে ফেলে যাচ্ছেন। ছোট ছোট প্যাকেট, সব প্যাকেটে ঠিক পছন্দমতো তিনি ওয়াশার পাচ্ছেন না। দু'টো বড় হাতুড়ি বেছে নিলেন। একটা র্যাদা। করাতের ব্লেড হাতে নিয়ে বাঁকিয়ে দেখলেন কতটা ধকল সইতে পারবে। কাজ করছেন আর অজস্র কথা বলে যাচ্ছেন।—বুঝলে হে, জায়গাটা ভাল না। ক্রোজ-নেস্টে আর উঠবে না। কে কখন ঠেলে ফেলে দেবে ক্রোজ-নেস্ট থেকে!

ছোটবাবু বলল, তা হলে দূরে কিছু দেখতে পেলেন?

—দেখার আর কিছু নেই। সব ঠিক হয়ে গেছে।

—তা হলে স্যার আমরা দু' একদিনের ভেতর ডাঙা পেয়ে যাব!

—পেতে পার। ছোটবাবুকে সব খুলে বলতে বড় কষ্ট হচ্ছিল। এমন দু'টো তাজা প্রাণ বিনষ্ট হবে! ভাবতেই চিৎকার করে বললেন, হ্যালেলুজা। ছোটবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, ডিয়ার ফ্রেণ্ড আই অ্যাম প্রেইং দ্যাট অল ওয়েল উইদ ইউ অ্যাণ্ড দ্যাট য়োর বডি ইজ অ্যাজ হেলদি অ্যাজ আই নো য়োর সোল ইজ...

ছোটবাবু বলল, স্যার আমাকে ভয় পাইয়ে দেবেন না।

তিনি শুধু বললেন, এস।

এবং ওরা দু'জন আরও ভেতরে ঢুকে যেতে থাকল। তারপর তিনি কশপের ঘরে হন্যে হয়ে কি খুঁজতে থাকলেন। এবং পেয়ে গেলে বললেন, টর্চ জ্বালো।

বাইরের আলো ভেতরে এতটুকু ঢুকতে পারছে না। ওরা অন্ধকারে যেন ভীষণ একটা গোপন জায়গায় চলে যাচ্ছে। ছোটবাবু বুঝতে পারছে না হিগিনস তাকে নিয়ে জাহাজের কোথায় নেমে যাচ্ছেন। এতদিন সে জাহাজে আছে কখনও এদিকটায় আসে নি। হিগিনস কি ওকে নিয়ে একেবারে জাহাজের তলায় নেমে যাচ্ছেন! অন্ধকারে ওরা একটা সিঁড়ি পেয়ে গেল। এবং টর্চ জ্বালিয়ে ক্রমে নিচে নেমে যখন ওপরে আলো ফেলল, তখন মাথার ওপরে ছাদ। পাশেই এক নম্বর হ্যাচ। ফসফেটের গন্ধ উঠে আসছে। ছোটবাবু বুঝতে পারছে না তিনি তাকে এত নিচে কেন নিয়ে এসেছেন। ওকে ফেলে তিনি ওপরে উঠে গেলে সে যেন ঠিক পথ চিনে ওপরে উঠতেও পারবে না। হিগিনস আর পার্থিব জগতের কেউ, বিশ্বাস হচ্ছে না। চোখ জ্বলছে। বোধ হয় তিনি লুকেনারের প্রেতাত্মা কোথায় লুকিয়ে আছে অথবা মনে হয় তিনি তাকে বুঝি এখুনি দরজা খুলে দেখাবেন—হিয়ার ইজ দ্য ডেভিল। তার শুকনো অস্থিচর্মসার কংকাল, দ্যাখো এখনও কি যে বহাল তবিয়তে আছে। ছোটবাবু চিৎকার করে উঠল, স্যার আপনি আমাকে কোথায় নিয়ে এলেন, আপনার কি ইচ্ছে?

হিগিনস চক-খড়ি দিয়ে তখন ইস্পাতের দেয়ালে একটা চার্ট এঁকে বললেন, এই হচ্ছে কোরাল সী। অস্ট্রেলিয়ার পূর্ব উপকুল থেকে প্রায় উত্তরে এর আটশ নটিক্যাল মাইলের ওপর বিস্তৃতি। আমরা আছি তারও ওপরে। অর্থাৎ জাভা সুমাত্রা নিউ-গিনি এখন আমাদের পাশাপাশি অঞ্চল। এখানে আছে অজস্র প্রবাল দ্বীপ। পাঁচ-সাতশ মাইলের ভেতর জনহীন দ্বীপ তোমরা পেয়ে যেতে পার।

প্রায় ভূগোল মাস্টারের মতো ছোট একটা স্টিক দিয়ে তিনি কাছাকাছি দ্বীপের দূরত্ব কি হবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ঠিক কম্পাসের কাঁটার বরাবর চালাতে পারলে আর পালে বাতাস লাগলে আট- দশ দিনের ভেতর পেয়ে যাবে। যদি কোনো কারণে দ্যাখো পাচ্ছ না, তবে বুঝতে হবে—

—তুমি ঠিক ঠিক বোট চালাতে পার নি। বলেই তিনি থামলেন, দু'টো আরও দ্বীপের নাম লিখলেন—বেশ বড় বড় অক্ষরে যেন বুঝতে ছোটবাবুর অসুবিধা না হয়। এই হচ্ছে সান্তাক্রুজ দ্বীপপুঞ্জ তারপর ফানাফুতি তারপর ওপরে তাকালেন। বোধ হয় গলা ছেড়ে কেউ ডাকছে। ছোটবাবু কান পেতে বুঝতে পারল, ডেকে বনি গলা ফাটিয়ে ডাকছে। বাবা, ছোটবাবু তোমরা কোথায় গেলে? প্রায় ওর গলা কান্নায় বুজে আসছে। সারেঙ-সাবও চেঁচাচ্ছেন—ছোট তোরা কোথায় গেলি? হিগিনস তাড়াতাড়ি দু'হাতে সব মুছে বললেন, ছোটবাবু শিগগির ওপরে চল। উঠতে উঠতে বললেন, তোমাকে একটু শক্ত হতে হবে ছোটবাবু।

ছোটবাবু কেমন জেদি বালকের মতো নিচে দাঁড়িয়ে থাকল।

হিগিনস টর্চের ফোকাসে দেখলেন ছোটবাবু তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। উঠে আসছে না। তিনি খুব সতর্ক গলায় বললেন, অন্ধকারে ভয় পাবে ছোটবাবু। শিগগির উঠে এস।

ছোটবাবু বলল, স্যার আপনি আমাকে দিয়ে কি করাতে চাইছেন? আপনি চলে যান।

হিগিনস ফের নিচে নেমে বললেন, পরে বলব। সব তোমাকে বলব ছোটবাবু। তুমি প্লিজ মুখ গোমড়া করে রাখবে না। বনি টের পেলে আমার কিছু আর করার থাকবে না। আমাদের ওরা খুঁজছে।

গলার স্বর এত অসহায়! এত তিনি অসহায় ছোটবাবু যেন এই জাহাজে প্রথম টের পেল। সে আর বিন্দুমাত্র দেরি করল না। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে কশপের ঘরে এসে প্রথম সাড়া দিল, আমরা এখানে বনি। চাচা, আমরা এখানে কাঠ খুঁজছি।

বনি কশপের ঘরে ঢুকে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাবার ওপরে—কোথায় ছিলে! টেবিলে খাবার কখন সাজিয়ে রেখেছি—তোমাদের কারো পাত্তা নেই।

ছোটবাবুর সকাল থেকে এত বেশি উৎকণ্ঠা ছিল, এত বেশি উত্তেজনা ছিল যে মনেই হয়নি সে মাত্র এক কাপ চা খেয়ে আছে। ক্ষুধায় পেট জ্বলছে, যেন দাবানল এবং সে আর

একটা কথা না বলে বের হয়ে এল। কি মুক্ত আকাশ আর সমুদ্র! জাহাজের ভেতর এমন ভয়াবহ সব জায়গা আছে সে কখনও জানত না।

খেতে বসে হিগিনস বললেন, বুঝলে ছোটবাবু গুডমেন ইট টু লিভ ব্যাড মেন লিভ টু ইট। দু'টো চাপাটি দু'টো আলুসেদ্ধ দুপুরের লাঞ্চ। ছোটবাবু জলখাবারের মতো প্রায় গিলে খেয়ে ফেলল। খিদে একেবারে যাচ্ছে না। সে ঢকঢক করে জল খাচ্ছিল—তখন স্যালি হিগিনস তাঁর দু'টো আলুসেদ্ধ এবং একটা চাপাটি ওর পাতে তুলে দিলেন। বললেন, খাও ছোটবাবু। ছোটবাবু বলল, আপনি এ- সব কি আরম্ভ করেছেন স্যার!

সারেঙ-সাব ভেতরে একসঙ্গে খেতে লজ্জা পাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর খাবার ডেকে নিয়ে গেছেন। বনি একেবারে এরই মধ্যে যতটা পারা যায় সেজেগুজে এসেছে। সে পাশে বসে খাচ্ছিল। ছোটবাবুর যা শরীর ওরও ইচ্ছে করছে—ছোটবাবুর জন্য কিছু তুলে দেয়—কিন্তু সে জানে ছোটবাবু হয়তো খাবার ফেলে উঠে চলে যাবে। বাবা দিয়েছে বলে ঘাড় গুঁজে খেয়ে উঠেছে। এবং বনি দেখল ছোটবাবুর মুখ কেমন ভারী শুকনো। ছোটবাবু কেন যে বাবা জাহাজে থাকতে এত দুশ্চিন্তা করছে। বাবা ক্রমশ রোগা হয়ে যাচ্ছেন এবং বাবাকে দেখলেই বোঝা যায় আর তিনি আগের মতো নেই। চোখে মুখে যদিও হাসিটুকু তেমনি আছে তবু কোথায় যেন তিনি জোর হারিয়ে ফেলেছেন।

ছোটবাবু বোট-ডেকে উঠে আবার সেই বিন্দুবৎ প্রবাল দ্বীপটিপ যদি চোখে দেখতে পায় —সে এগিয়ে যেতে থাকল, রেলিঙে ঝুঁকে দাঁড়াল—কি কঠিন আর বিভীষিকার সমুদ্র ক্রমে চোখে ইতস্তত পাক খাচ্ছে—কেমন সামনে দুলে উঠছে সবকিছু—সেই প্রবাল দ্বীপ অথবা ক্রস কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সকাল থেকে সব অসংলগ্ন কথাবার্তা বলছেন কাপ্তান। কেন যে তিনি এ-সব বলছেন—আর থেকে থেকে চিৎকার করে উঠছেন—হ্যালেলুজা অর্থাৎ জয় জগদীশ হরে। কখন বুড়ো মানুষটা চুপি- চুপি সারেঙকে ডেকে নিয়ে গেছেন। আড়ালে কিসব শলাপরামর্শ করেছেন। এবং সারেঙ-সাব যখন বোটডেক থেকে নেমে এলেন মুখ ফ্যাকাশে, যেন ওঁর ফাঁসির হুকুম হয়েছে। চোখ স্থির। অতিশয় চুপচাপ তিনি হেঁটে যাচ্ছিলেন। ছোটবাবু ডাকল, চাচা!

তখন হিগিনস ডাকলেন, ছোটবাবু এদিকে এস।

ছোটবাবু দেখল, তিনি সব কাঠ বিছিয়ে দিচ্ছেন। করাত চালাচ্ছেন। ছোটবাবুকে একটি যাঁদা দিয়ে বললেন, চালাও। সারেঙ-সাব বোটে উঠে গেছেন—সব গিয়ার নিচে নামিয়ে রাখছেন। এবং কাঠের লাইনিং সেরে নেওয়া হচ্ছে। আর হিগিনস কাজের ফাঁকে ফাঁকে কথা বলে যাচ্ছেন। একজন বুড়ো মানুষ যেভাবে তার সন্তানসন্ততিকে তীর্থে যাবার আগে বলে থাকে—তেমনি কথা বলে যাচ্ছেন। যেন মানুষটা প্রবাসে যাবার আগে বলে যাচ্ছেন, বুঝলে হে—পাপের প্রতি মানুষের ভারী প্রলোভন। তিনি হাতুড়ির কাঠ ঢিলে হয়ে যাওয়ায় ডেকে বার বার ঠুকছিলেন। ছোটবাবুর যাঁদায় খসখস শব্দ হচ্ছে। হিগিনস এবার সোজা হয়ে বললেন, ছোটবাবু তুমি কি কি ধর্মগ্রন্থ পড়েছ?

—রামায়ণ মহাভারত পড়েছি স্যার।

তোমাকে আমি বাইবেল দেব। তুমি পড়বে। প্রত্যেক মানুষের সব ধর্মগ্রন্থগুলো পড়ে ফেলা উচিত।

সে বলল, পড়ব স্যার।

স্যালি হিগিনস খাকি রঙের হাফ-প্যান্ট পরেছেন। গায়ে স্যাণ্ডো গেঞ্জি। এবং ভীষণ লম্বা বলে, আর চোখে গোল চশমা বলে গালে সাদা দাড়ি বলে কখনও কখনও তাঁকে ধার্মিক মানুষ মনে হচ্ছিল। তিনি যখন রাতে স্লিপিং গাউন পরে থাকেন অর্থাৎ সমুদ্রে ঠাণ্ডা বাতাস বইলে তিনি যখন বেশ লম্বা পোশাক পরেন তাঁকে সান্তাক্লজ না ভেবে পারা যায় না। তিনি এখন একটা কাঠ সোজা দাঁড় করিয়ে কতটা উঁচু দেখছেন। দেখতে দেখতে তিনি কিছু পাপ এবং

লোভের গল্প বললেন। তার পরিণতির গল্প বললেন। তারপর সামান্য সময় কান থেকে পেনসিল বের করে প্রায় একজন ছুতোর মিস্ত্রির মতো কি সব রেখা টেনে গেলেন, তাকালেন ছোটবাবুর দিকে—এ-সব গল্প শুনে ছোটবাবুর মুখে চোখে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে বোঝার চেষ্টা করতে করতে এক সময় বলে ফেললেন, ডিয়ার ফ্রেণ্ড ডোন্ট লেট দিস ব্যাড একজামপল ইনফ্লুয়েন্স ইউ। ফলো ওনলি হোয়াট ইজ গুড। রিমেম্বার দ্যাট দোজ ডু হোয়াট ইজ রাইট প্রুভ দ্যাট দে আর গডস চিলড্রেন; অ্যাণ্ড দোজ হু কনটিনিউ ইন ইভিল প্রুভ দ্যাট. দে আর ফার ফ্রম গড।

ছোটবাবু বুঝতে পারছিল, চরম পরিণতির দিকে তারা এগিয়ে যাচ্ছে। সে বলল, স্যার আমি ছবিতে বাইবেলের কিছু গল্প দেখেছিলাম। একটা ব্যাপার ভারী আশ্চর্য মনে হল—মাঝে মাঝে এটা আমি স্বপ্নেও দেখি—সেই মরুভূমির ভেতর সব মানুষেরা হেঁটে যাচ্ছে। তাদের পিঠে অতিকায় ক্রস। ছবিতে এটা দেখে কখনও ভুলতে পারিনি ভাল বুঝতেও পারিনি।

তিনি চিৎকার করে উঠলেন ফের—হ্যালেলুজা! তারপর কাঠে পেরেক ঠুকতে ঠুকতে বললেন, সাফারিঙস। সাফারিঙস অফ ম্যানকাইণ্ড। মানুষ তার সবকিছুর জন্য দায়ী সে নিজে। যা কিছু সে বিনিয়োগ করবে লাভালাভ তার ওপর বর্তাবে। সে নিজেই তার ক্রস বহন করে নিয়ে যায়। সে নিজেই রচনা করে তার বধ্যভূমি। শৈশব থেকে যৌবনে এবং যৌবনকাল পার হলে প্রৌঢ় বয়সে সে দেখতে পায় এতদিনের যা কিছু প্রয়াস সব এক সুন্দর নীল উপত্যাকাতে তার নিজের বধ্যভূমি তৈরিতে কেটে গেছে। জনগণেরা এবার হাততালি দিলে গলায় দড়িটা পরে ফেলবে। তারপর সব শেষ—শুধু থাকে নীলবর্ণের এক আলোর ভূখণ্ড। বুঝতে পারছ আমাদের তা হলে কিছুই নেই। এত সুখ এত দুঃখ সবই তাঁর। তিনিই সব। সো প্রেইজ দ্যা লর্ড। হাউ গুড ইট ইজ টু সিং হিজ প্রেইজেস! হাউ ডিলাইটফুল, অ্যাণ্ড হাউ রাইট।

বনি তখন ওপরে উঠে এসেছে।

বাবাকে ভীষণ উৎফুল্ল দেখাচ্ছে। বাবা কাঠগুলো পালিশ করছেন। সারেঙ ছোট ছোট সব কাঠের লাইনিং মেরে দিচ্ছে বোটে। সব ড্রাই ফুডের প্যাকেট নামিয়ে রেখেছে। পরিচ্ছন্ন নীল আকাশ। গরম নেই তেমন। পরিচ্ছন্ন আকাশের নিচে এখন একটু সময় পেয়ে গেছে বনি। সে চুল আঁচড়াচ্ছে। ওর সুন্দর নীলাভ চুলে ক্রিম ঘষে দিচ্ছে। সামনে সে রেখেছে ছোট্ট আয়না। সে ক্ষণে ক্ষণে পোশাক পাল্টাচ্ছে। বাবাকে, ছোটবাবুকে দূর থেকে দু'টো-একটা কথা বলে আবার চুলে ক্রিম ঘষছে। কেবিনের অন্ধকারে ভালো কিছু দেখা যায় না। বাবা ছোটবাবু সারেঙ সারাদিন কেবল বোট-ডেকে খুট খুট করে কাঠ কাটছে, পেরেক পুঁতে দিচ্ছে কাঠে এবং আশ্চর্য বনি সন্ধ্যায় দেখল বাবা বেশ বড় দু'টো ক্রস বানিয়ে ফেলেছেন। ক্রস দেখে সে কেমন ভয় পেয়ে গেল। বলল, বাবা এ-দিয়ে কি হবে?

তিনি ভয়ে মেয়ের দিকে তাকাতে পারলেন না। তিনি গজ ফিতে সব তুলে রাখছেন। সারেঙের পক্ষে একা কাজ শেষ করা কঠিন। এবার তিনি ছোটবাবুকে নিয়ে বোটের কাছে এসে দাঁড়ালেন। বনিকে তিনি কিছু বললেন না। অথবা কি বললে বনি আপাতত শান্ত থাকবে কি বললে বনি বুঝতে পারবে না দ্য টাইম হ্যাজ কাম্—ভেবে ভেবে তিনি যখন দেখলেন বনি কিছুতেই যাচ্ছে না তখন বাধ্য হয়ে বললেন, জায়গাটা ভাল না বনি। খারাপ জায়গা। শয়তানের প্রভাবে পড়ে যেতে পারি। ক্রস দু'টো জাহাজের মাথায় দাঁড় করিয়ে দিলাম। এবার দেখি কার কত সাহস?

ছোটবাবু তখন লোহার সরু জালের ওপর ত্রিপল ফেলে দিচ্ছে। বোটের ওপর হুড খোলা গাড়ির মতো এই ত্রিপল কাজ করবে। ঝড়বৃষ্টিতে হুড টেনে দিলে প্রায় নৌকার ছই, সমুদ্রে বোট ভেসে গেলে ঝড়বৃষ্টিতে সামান্য আশ্রয়। জাহাজ তবে সত্যি অশুভ প্রভাবে পড়ে যেতে পারে—বাবা ক্রস দু'টো বানিয়ে ভাল করেছেন। ক্রস থাকলে জাহাজে অশুভ প্রভাব ভিড়তে সাহস পাবে না। সে খুব নিশ্চিন্তে ঘরে ঘরে আলো জ্বালাবার জন্য নিচে নেমে গেল। সে ঘরে ঘরে লম্ফ জ্বেলে দিয়ে গেল।

॥ বাহান্ন ॥

হিগিনস বোট থেকে চিৎকার করে বললেন, নো নো। সব কেবিনে লম্ফ জ্বালতে হবে না। এখানে একটা লম্ফ দিয়ে যাও। গ্যালিতে রাখো একটা আর একটা বোট-ডেকে ঝুলিয়ে রাখো।

বনি নেমে যাবার সময় হঠাৎ দেখল তখন পায়ের কাছে দু'তিনটে ফ্লাইং ফিশ পড়ে আছে। ওদের বোধ হয় কোনো অতিকায় মাছটাছ তাড়া করেছিল, উড়ে এসে ডেকে পড়েছে। বনি মাছগুলো কুড়িয়ে নেবার আগে এমন চেঁচামেচি লাগিয়ে দিয়েছিল যে ছোটবাবু ভয় পেয়ে লাফ মেরে ছুটছে সেদিকে। গিয়ে সে অবাক। তিনটে মাছ। রুপোলী লম্বা, এবং বড় পাখনাঅলা মাছ। প্রায় পারশে মাছের মতো এবং খেতে বসে ছোটবাবু দেখছে এ-বেলাতেও হিগিনস তাঁর অধিকাংশ খাবার তার পাতে তুলে দিচ্ছেন। মাছভাজা সে একটা আস্ত পেয়েছে। বনির কি যে স্বভাব হয়েছে! ওকে খাওয়াতে পারলে বাঁচে। আর কেউ খাবে সে যেন মনে রাখতে পারে না। ছোটবাবু বুঝতে পারছে না বুড়ো বনির ওপর রাগ করে সব খাবার ওকে দিয়ে দিচ্ছেন কিনা। সে ভেবেছিল বনিকে জোর ধমক দেবে—কিন্তু তখন হিগিনস বললেন, ছোটবাবু তুমি খুব ভাগ্যবান হে!

ছোটবাবু বললে, না স্যার এটা বুঝতে পারি বনির উচিত হচ্ছে না।

হিগিনস বললেন, ভারী মজা কি বল!

ছোটবাবু বলল, বনি সবাইকে সমান দিতে হয়।

বনি, মাত্র মুখে সামান্য মাছভাজা পুরেছে, লম্ফের আলোতে ওর মুখ রহস্যময়ী নারীর মতো, চোখে অপার বিস্ময় ছোটবাবু সম্পর্কে এবং হিগিনস ঝুঁকে আছেন সামান্য—তখন ছোটবাবু কি যে বাজে বকছে। সে বলল, আমি কি বাবাকে কম দিয়েছি?

হিগিনস বললেন, তোমাকে খুব হিংসে হচ্ছে ছোটবাবু।

বনি বলল, বাবা তোমাকে বলছি, এ-সব আমার সহ্য হয় না। তুমি ওকে দিতে যাও কেন? তুমি খেতে না পার ফেলে দেবে।

ছোটবাবু বলল, বনি কি বকছ আজেবাজে! এতে কারো পেট ভরে! তুমি খাচ্ছ না তিনি খাচ্ছেন না, আমাকে তোমরা সব দিচ্ছ! কি পেয়েছ তোমরা! প্রায় সব ছুঁড়ে ফুঁড়ে সে উঠে যেতে চাইলে হিগিনস বললেন, কোথায় যাচ্ছ! তুমি না খেলে আমরা খাব ভেবেছ? বুঝলে ছোটবাবু মাঝে মাঝে তুমি ভারী স্বার্থপর হয়ে যাও। তোমার সব ভাল লাগে এটা কিন্তু ভাল লাগে না।

বনির মুখ অপমানে থমথম করছে। যেন সে কথা বললেই ঝরঝর করে কেঁদে ফেলবে। সে মুখ নামিয়ে রেখেছে। খাচ্ছে না! যেন কিছু বলতে পারলে এতটা সে অপমানিত হত না অথবা সে যদি বলতে পারত বাবা, তুমি ওকে আর কতটুকু চিনেছ আমি ওকে হাড়ে হাড়ে চিনি। ও নিজেকে ছাড়া পৃথিবীতে আর কাউকে চেনে না। আমি এমন সুন্দর পোশাক পরে দাঁড়িয়ে থাকি রেলিঙে—কতবার ভেবেছি ও আসবে, আমার পাশে ঠিক দাঁড়াবে, কথা বলবে—কত কিছু আমি আশা করি ওর কাছে—সে আসে না বাবা। একবার বলে না বনি তোমাকে মেয়ের পোশাকে এমন সুন্দর দেখায় জানতাম না।

কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। ছোটবাবু এখনও হাত নামিয়ে রেখেছে। হিগিনস বললেন, খাও। বনির ওপর রাগ কর না। কি ব্যাপার! তোমরা কেউ খাচ্ছ না। আচ্ছা জ্বালা হল দেখছি—ছোটবাবু তোমাকে আমি খেতে বলছি। তুমি না খেলে মেয়েটা আমার খেতে পারবে ভাবছ!

ছোটবাবু ধীরে ধীরে মুখ নামিয়ে কাঁটা-চামচ টেনে নিলে।

হিগিনস ফের বললেন, তুমি ভীষণ ভাগ্যবান হে ছোটবাবু। তোমাকে আমার হিংসে হচ্ছে। সারাজীবন যা চেয়েছি, কত সহজে তুমি ছোটবাবু তা পেয়ে গেছো। এত সহজে তাকে নষ্ট

করে দিও না।

স্যালি হিগিনস ফের খেতে খেতে বললেন, আমি পাইনি। কত সহজভাবে তিনি এখন কথা বলছেন! ডাইনিং হলে তেমনি সব বড় বড় তৈলচিত্র। এখন আর ফুলদানিতে কোনো ফুল নেই। অন্ধকারে অস্পষ্ট আলোর ভেতর সেইসব কাপ্তানের ছবি কেমন অর্থহীন। বড় টেবিল, সাদা চাদর, কারুকার্যময় ন্যাপকিন, সব আছে শুধু মানুষগুলো একে একে তাঁকে ছেড়ে গেছে। তিনি বললেন, তোমাকে হিংসে করতেও আমার ভাল লাগছে। মানুষের জন্য পৃথিবীতে তারপর আর কি দরকার থাকে বুঝি না। তোমরা ঝগড়া করলে আমার খুব খারাপ লাগে।

তারপর যেন ছোটবাবুকে বলার ইচ্ছে ওহে মানবজাতির অপোগণ্ড তুমি বুঝতে পারছ না, সবকিছু হারিয়ে সামান্য একটা জাহাজের ওপর বাজি রেখেছিলাম। ভেবেছিলাম, দেয়ার লাইজ এ ওয়াইড অ্যাণ্ড প্লেজেন্ট রোড দ্যাট সিমস রাইট, কিন্তু এখন দেখছি দ্যাট এণ্ডস ইন ডেথ। কেউ আমাদের কোনো ডাঙায় পৌঁছে দেয় না ছোটবাবু। নিজেকে সাঁতরে পার হতে হয়।

স্যালি হিগিনস মুখ ন্যাপকিনে মুছে বললেন, তোমরা খাও। আমি উঠছি। ফের ঝগড়া করলে খুব খারাপ হবে। বলে তিনি উঠে গেলেন।

বনি বলল, খাবার নিয়ে কি দরকার ছিল নাটক করার!

ছোটবাবু বলল, বেশ করেছি।

স্যালি হিগিনস এলি-ওয়েতে দাঁড়িয়ে গেলেন। ধমক দিলেন—আবার!

দু'জন চুপচাপ ফের। কোনো কথা আর কানে ভেসে আসছে না। তিনি দাঁড়িয়ে থাকলেন। নড়তে ইচ্ছে করছে না। সৌরলোকে আর একটা নতুন পৃথিবী তৈরি হয়ে গেছে। দু'জনই সমুদ্রে দাঁড়িয়ে লম্ফের আলোতে নতুন ডাঙার অনুসন্ধানে আছে। তিনিও ছিলেন—আজীবন সেই ডাঙা খুঁজে বেড়িয়েছেন। সামান্য আশ্রয় প্রেম। বিশ্বাসহীনতায় বেঁচে থাকতে কখনও চাননি। অথচ সংশয় সন্দেহ এবং এক অশুভ প্রভাব যেন কি করে এই এক মহাজীবনে এসে যায়—মনে হয় তিনি, তার অস্তিত্ব এক মহামায়া, শেষ নেই যার। কেনো অলৌকিক জলযানের মতো নিরুদ্দিষ্ট যাত্রা। অথচ পাশেই আছে জীবনপ্রবাহ—কি তাজা আর খাঁটি! এত জেনেও তাঁর কেন এখন চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। ধরা পড়ে যাবেন ভেবে তিনি ওপরে উঠে যাচ্ছেন। আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে হাউ-হাউ করে এভাবে তিনি কার জন্য কাঁদছেন। বুক থেকে কেন সেই অমোঘ বাণী জোরে উঠে আসছে না—কেন জোরে জোরে গাইতে পারছেন না, গ্লোরি হ্যালেলুজা আই অ্যাম অন মাই ওয়ে। আড়ষ্ট গলায় তবু তিনি কোনোরকমে গাইলেন, গ্লোরি হ্যালেলুজা—আই অ্যাম অন মাই ওয়ে। কেউ দেখছে না, স্যালি হিগিনস অন্ধকার সমুদ্রে ভাঙা জাহাজ-ডেকে দাঁড়িয়ে গাইছেন—চোখে অবিরাম অশ্রুপাত—কি করুণ আর অসহনীয় এই শেষ সমুদ্রযাত্রা। তাঁকে সব ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। তিনি তবু সবকিছু তুচ্ছ করে হাঁকলেন, এলিস আমি ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস বলছি—শুনতে পাচ্ছ! এলিস এ-আমাদের শেষ পর্যন্ত কোথায় নিয়ে এলে! কি চাও তুমি! কি ইচ্ছে তোমার! এলিস, ভগবানের দোহাই, সবার অশুভ প্রভাব থেকে বনিকে বাঁচাও। আমি আর কিছু চাই না এলিস। পৃথিবীতে আমার আর কিছু চাইবার নেই।

গমগম করে সেই অসীম অজানা সমুদ্রে স্যালি হিগিনসের কণ্ঠস্বর ভেসে যাচ্ছিল। দূরদিগন্তে নীহারিকালোকে যেন তিনি তাঁর শেষবার্তা পৌঁছে দিচ্ছেন। ছোটবাবু, বনি, সারেঙ বুঝতে পারছিল না স্যালি হিগিনস কোথায় দাঁড়িয়ে এভাবে পাগলের মতো চিৎকার করছেন। ওরা লম্ফ নিয়ে জাহাজ- ডেকে ছোটাছুটি করছে। কোথায় তিনি! বোট-ডেকে নেই, আফটার-পিকে নেই, কেবিনে নেই। তবু কিছু অস্পষ্ট চিৎকার জাহাজের কোথাও থেকে যেন উঠছে। সমুদ্রে ডুবে যাবার আগে যেভাবে একজন আর্ত মানুষ দুহাত তুলে চিৎকার করতে থাকে—

স্যালি হিগিনস তেমনি এক মুহ্যমান আর্তনাদে ভেঙে পড়ছেন। ছোটবাবু তাঁকে শেষ পর্যন্ত ফরোয়ার্ড-পিকে খুঁজে পেল। উইণ্ড-সেলের আড়ালে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। সেই শান্ত মুখ আর নেই। পরনে সোনালী রংয়ের রাতের পোশাক। একজন সন্ত মানুষের মতো দাঁড়িয়ে সমুদ্রের সঙ্গে চিৎকার করে কথা বলছেন—যেন কোনো রমণীর চেয়েও বেশি রহস্যময়ী সমুদ্রকে তাঁর জীবনের সুখ দুঃখ হতাশার কথা শোনাচ্ছেন। জ্যোৎস্না রাতে সমুদ্রের ভয়ংকর নির্জনতার ভেতর বনি বাবার বুকে আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল। বলল, বাবা কি হয়েছে তোমার! কি হয়েছে বল! এমন করছ কেন? এভাবে এখানে দাঁড়িয়ে কাকে কি বলছ! কি, কথা বলছ না কেন! আমরা কি সত্যি আর ফিরে যেতে পারব না!

স্যালি হিগিনস শান্ত কণ্ঠে শুধু বললেন, তুই তো জানিস আমার মাঝে মাঝে এমন হয়। তুই ঘাবড়ে গেলে চলবে কেন! খুব আদর করে মেয়ের কপালে চুমো খেলেন। তারপর লজ্জায় যেন মুখ লুকিয়ে ফেললেন বনির চুলের ভেতর। কি তাজা ঘ্রাণ চুলে। এমন একটা ছেলেমানুষী করে তিনি যেন আর লজ্জায় মুখ তুলতে চাইছেন না। কাউকে আর মুখ দেখাতে চাইছেন না।

বাপ মেয়ে পৃথিবীর যাবতীয় সুখ দুঃখ ভুলে গেছে বুঝি। ওরা পরস্পর কি নিবিড় স্নেহ মমতায় পরস্পরকে জড়িয়ে রেখেছে। ছোটবাবুর কেন জানি বুক বেয়ে এই বৃদ্ধ মানুষটির জন্য কান্না উঠে আসছিল। হাঁটু গেড়ে প্রায় কোনো মধ্যযুগীয় নাইটদের মতো তার বলার ইচ্ছে হচ্ছিল, আপনি আমার ওপর বিশ্বাস রাখতে পারেন। তারপর সেই নাটকীয় শব্দসমূহ তার কণ্ঠে প্রায় ভেসে আসছিল, স্যার সমুদ্র আর ঈশ্বরের নামে শপথ করছি। যেন তরবারি থাকলে সে এক্ষুনি মাথার ওপরে দুলিয়ে অশুভ প্রভাব জাহাজের কেটে কেটে ফালা ফালা করে দিত। কোনো প্রাচীন ঐতিহাসিক যুবার মতো এই জ্যোৎস্না রাত, নির্জন সমুদ্র, কাঠের ক্রস আর আকাশের অন্তহীন নক্ষত্রমালা ছুঁয়ে ওর শপথ নিতে ইচ্ছে করছিল—আমি আছি, আমি থাকব। আমি কোনো পাপ কাজ করব না। কোনো অশুভ প্রভাবে বনিকে পড়ে যেতে দেব না।

সারেঙ্গ-সাব দেখলেন, ছোটবাবু জ্যোৎস্নায় শুধু সমুদ্র দেখছে। একটা কথা বলছে না। তিনি হিগিনসকে বললেন, সাব অনেক রাত হয়েছে।

ওরা তারপর নিঃশব্দে নেমে আসছিল ডেকে। বোট-ডেকে যে যার মতো উঠে গেল। কেউ কোনো কথা বলল না। বোট-ডেকে এখন সবাই থাকে বলে ক্যাপ্টেন তাঁর কেবিনে, বনি নিজের কেবিনে এবং সারেঙে-সাব খোলা ডেকে শুয়ে পড়লেন। ছোটবাবু শুয়ে থাকল ও-পাশের বয়-কেবিনে। আর মধ্যরাতে মনে হল তার কেউ ডাকছে। পোর্ট-হোলে দাঁড়িয়ে ফিস-ফিস করে ডাকছে। বনির কথা ভেবে কি করবে বুঝতে পারছিল না। কিন্তু চোখ মেলে সে দেখল—পোর্ট-হোল থেকে টর্চের ফোকাস আসছে—সে বলল, বনি তুমি আমাকে পাগল করে দেবে দেখছি। আর তখনই সামান্য জোরে কথা বলছে কেউ। বনির গলা মনে হল না। ক্যাপ্টেন পোর্ট-হোলে দাঁড়িয়ে ডাকছেন—স্যালি হিগিনস বলছি ছোটবাবু। শিগগির ওঠো। চেঁচামেচি করবে না। ভারী সন্তর্পণে কথা বলছেন।

দরজা খুলে ছোটবাবু বের হয়ে এল। হিগিনস আর একটা কথা বললেন না। সিঁড়ির নিচে সে দেখল, সারেঙ-সাব দাঁড়িয়ে আছেন। সমুদ্রে তেমনি ছলছল কলকল শব্দ। ঢেউ-এর ওপর জ্যোৎস্না পিছলে যাচ্ছে। দূরে নদীর পাড় ভেঙে পড়ার মতো সহসা সব ভারী শব্দ উঠছে। হিগিনস তখন বলছেন—ভয় পাবে না। বোধ হয় কোনো বড় তিমি মাছ দূরে কোথাও ডুবছে ভাসছে।—এস। এবং ওরা তিনজন এভাবে সেই কার্পেন্টারের ঘরের দিকে এগুতো থাকলে ছোটবাবু বলল, বনি জেগে গেলে ভয় পাবে স্যার। ওকে একা এভাবে ওপরে রেখে আমাদের ঠিক নিচে নামা উচিত হবে না।

স্যালি হিগিনস বললেন, ওপরে অসুবিধা আছে ছোটবাবু।

—কোনো অসুবিধা হবে না। আপনি আসুন। আমরা বরং বোট-ডেকের নিচেই বসি। বনি

ডাকলেই সাড়া দিতে পারব।

হিগিনস বললেন, বনি জেগে গেলে সব টের পাবে।

—তা-হলে চাচা ওপরে থাকুক। তিনি আমাদের দরকারে খবর দেবেন।

স্যালি হিগিনস যেন নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচলেন। বনির জন্য তবে পৃথিবীতে আর একজন তাঁর চেয়ে কম দুর্ভাবনায় থাকে না। তাঁর ভীষণ ভাল লাগল। তিনি প্রায় ভেতরে পুলক বোধ করলেন। এবং সেই ছেলেমানুষের মতো পুলকে প্রায় শিস্ দিতে যাচ্ছিলেন। তখন ছোটবাবু বলল, স্যার আপনার কেবিনেও আমরা বসতে পারি।

স্যালি হিগিনস দাঁড়িয়ে গেলেন। ছোটবাবু এবং সারেঙ দাঁড়িয়ে গেল। ওদের ছায়া স্থির। এবং মনে হচ্ছে জাহাজটাকে বাতাসে সামান্য ভাসিয়ে নিচ্ছে। বাতাস কি সমুদ্রস্রোত ওরা বুঝতে পারছে না। তবু এই মধ্যরাত্রে মনে হচ্ছে জাহাজটা যেন নিয়ত চলছে।

স্যালি হিগিনস বললেন, খুব সাবধান।

ওরা এবার প্রায় চুপি চুপি উঠে যাচ্ছিল। যাবার সময় টর্চ মেরে ছোটবাবু দেখল বনি সাদা চাদর গায়ে ঘুমিয়ে আছে। নীলাভ চুলে ওর মুখ প্রায় ঢাকা। এবং সুন্দর স্তন এই প্রথম সে বুঝতে পারল খুবই ভারী হয়ে উঠেছে। বোধহয় ওর শরীরে রাতের পোশাকও নেই। ছোটবাবুর মাথা ঝিমঝিম করছে।

স্যালি হিগিনস ওপরে দাঁড়িয়ে আছেন। ছোটবাবুর দেরি দেখে বললেন, দ্যাখো তো সারেঙ ছোটবাবু কি করছে!

সারেঙ ঘুরে ও-পাশে নেমে গেলেই ছোটবাবু সতর্ক হয়ে গেল। টর্চের আলো নিভিয়ে দিল। বলল, ঘুমোচ্ছে। বাঁচা গেল। সিঁড়িতে ওঠার মুখে খুব আস্তে আস্তে বলল, স্যার বনি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। আমরা নিশ্চিন্তে এখন বসতে পারি।

স্যালি হিগিনস এবার লম্ফ জ্বালিয়ে দিলেন। একটা বড় নীল রঙের চার্ট বের করলেন পকেট থেকে। সাদা সব দাগ। সেই দাগগুলো বড় একটা কাগজে সোজা কেটে কেটে বললেন, ছোটবাবু এদিকে এসে তুমি বোস। সারেঙ-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, তুমি দাঁড়িয়ে থাকলে কেন। বোস।

সারেঙ-সাব বললেন, ঠিক আছে সাব।

ছোটবাবু টেবিলে ঝুঁকে আছে। হিগিনস ঝুঁকে আছেন। তিনি বললেন, ছোটবাবু কাল তোমাদের বোট দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তার আগে সব বুঝে নাও। তোমরা থাকছ না।

—আপনি কি বলছেন!

হিগিনস সহসা ক্ষিপ্ত গলায় বললেন, চেঁচাবে না। বনি ঘুমোচ্ছে। মাঝে মাঝে তোমার হাবভাব আমার একদম ভাল লাগে না ছোটবাবু। তুমি চেঁচাবে আমি জানতাম। এজন্য নিচে নেমে যেতে চেয়েছিলাম।

ছোটবাবু বলল, কিন্তু স্যার।

—আগে আমার কথা শেষ করতে দাও। আমার বলা শেষ হলে বলবে। কতদিন বলেছি কথার মাঝে কিছু বলবে না। আগে শুনবে তারপর বলবে।

ছোটবাবু বসে পড়ল।

—ছোটবাবু, তুমি ভয় পাচ্ছ। তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন।

ছোটবাবু বলল, স্যার আস্তে। বনি ঘুমোচ্ছে।

হিগিনস বসে পড়লেন। তারপর কপাল টিপতে থাকলেন। মাথা ধরেছে বুঝি। এবং চোখের নিচে কালি পড়ে গেছে। তিনি যেন কতদিন না ঘুমিয়ে আছেন।

ছোটবাবু বলল, বোটে আমরা কে কে থাকছি?

—বনি এবং তুমি।

—আপনারা?

—আমরা জাহাজে থেকে যাচ্ছি।

—সবাই নেমে গেলে হত না!

—এই রাসকেল, জাহাজটা তোমার না আমার। জাহাজের কাপ্তান তুমি না আমি। কে নামবে, কে নামবে না তুমি বলবে, না আমি বলব।

ছোটবাবুর এটা ভাল লাগে না। মাঝে মাঝে বুড়ো অহেতুক রেগে যায়। ভাল কথা বললেও রেগে যায়। কেমন রগচটা মানুষের মতো তখন আবোল-তাবোল বকতে থাকে। সে আর একটা কথা বলল না।

আর হঠাৎ কি যে হয়ে যায় হিগিনসের। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, সারেঙ, তুমি ওপরে থাক। .আমরা নিচে যাচ্ছি। বনি জেগে গেলে বলবে, আমরা স্টোর-রুমে আছি। তিনি প্রায় দ্রুতগতিতে এবার নেমে যেতে থাকলেন। ছোটবাবুকে একবার বললেনও না, তুমি আমার সঙ্গে এস। অথচ ছোটবাবু প্রায় লেজ তুলে বুড়ো মানুষটার পেছনে ছুটছে।

সিঁড়ি ধরে নিচে নামার সময় ওপরে টর্চ মেরে বললেন, কি পায়ে জোর পাচ্ছ না? খুব জোয়ান! একটা বুড়ো মানুষের ঘাড়ে চেপে থাকতে খুব ভাল লাগছে!

ছোটবাবু বলল, স্যার সমুদ্রের আমি কিছু জানি না।

হিগিনস বললেন, কেউ জানে না। সবাই বড় বড় কথা বলে। সমুদ্রকে জানা বুঝি ইয়ার্কি। বলে লাফ দিয়ে নেমে পড়লেন নিচে। তারপর হাত নেড়ে অন্ধকারে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গেলেন। ছোটবাবু বলল, স্যার টর্চ জ্বালুন। কিছু দেখতে পাচ্ছি না। তিনি ফস করে দেশলাই জ্বালিয়ে লম্ফ খুঁজে বের করলেন। ওটা জ্বেলে দেয়ালে টানিয়ে দিলেন। প্রায় খাদের নিচে এখন দু'জন মানুষ। দু'জন যতই চেঁচামেচি করুক কেউ টের পাবে না। দু'জন মানুষ আর দু'টো ছায়া যতক্ষণ থাকবে, ছোটবাবুর ভয় থাকবে না। কারণ একটা হয়ে গেলেই বুঝতে পারবে হিগিনসের কোনো ছায়া নেই। জাহাজে হিগিনস তবে সত্যি আস্ত শয়তান। জাহাজটার সবই ভুতুড়ে। প্রলোভনে ফেলে ছোটবাবুকে রেখে দিয়েছে হিগিনস। সে সব সময় হিগিনসের চেয়ে তার ছায়ার প্রতি বেশি নজর রাখছিল।

হিগিনস বড় একটা কাঠের বোর্ডে পেরেক পুঁতে দিচ্ছেন। আর অজস্র কথা, ছোটবাবু সমুদ্রে অগ্নিকাণ্ড নিজের চোখে দেখেছ। কি কথা বলছ না কেন? আরে আমি মানুষ। শয়তান নই। তোমার চোখ এমন হয়ে যাচ্ছে কেন?

—স্যার বলুন। আমি শুনছি।

—কী মনে হয়েছে? জাহাজ-ডুবি ভুতুড়ে ব্যাপার—আমেরিকান অয়েল-ট্যাঙ্কার ভূত সেজে ভয় দেখাচ্ছে। কিছু না। কোথায় কি প্রাকৃতিক কারণে ঈশ্বরের ইচ্ছেয় কি হচ্ছে আমরা জানি না। আমরা নানাভাবে তাঁকে বিশ্বাস করতে ভালবাসি। কিছু অবিশ্বাস্য দেখলে ভূতটুত ভাবি। বাজে কথা। সব বাজে কথা।

ছোটবাবু কি বলতে যাচ্ছিল তিনি থামিয়ে দিয়ে বললেন, শেষ করতে দাও।

তিনি এবার লম্ফের আলোতে চার্টের মাথায় কি দেখালেন।—কাছে এস। দূরে দাঁড়িয়ে তুমি কি দেখবে! এই দ্যাখো, যদি তুমি সোজা নব্বই ডিগ্রি বরাবর উঠে যাও মনে রাখবে পালে বাতাস' পাবে দক্ষিণ-পূর্ব আয়নবায়ুর। তোমার হাল ঠিক থাকলে, যে-কোনো দিকে বোটের মুখ ঘুরিয়ে দিতে পার—একমাত্র সাউথ-ইস্ট বাদে সব দিকে। জুন মাসের এখন মাঝামাঝি সময়। তুমি জুলাই অবধি এই বায়ুপ্রবাহ পাবে মনে রাখবে। বাতাস উঠলেই পাল খুলে দেবে। আর সব সময় কম্পাসের কাঁটা নব্বই ডিগ্রি বরাবর। পাঁচ-সাতশ' মাইলের ভেতর তুমি দু'টো দ্বীপ দু'পাশে পাচ্ছ, যদি কোনো কারণে ভুল, ভুল হওয়া স্বাভাবিক। বরং ঠিক ঠিক

উঠে যাওয়া কঠিন, তবে দু'টো দ্বীপের ফাঁকে আরও ওপরে চলে যাচ্ছ মনে রাখবে। প্রায় তিনশো তেত্রিশ-টেত্রিশ হবে দূরত্ব, এলিস দ্বীপ, এ-দ্বীপগুলোতে সব পলিনেশিয়ানদের বাস। এছাড়া আশেপাশে অজস্র দ্বীপ আছে ভয় পাবে না। হাতে দেড়-দু'মাস সময় বায়ুপ্রবাহ তোমার অনুকূলে। যা খাবার আছে, যদি আধপেটা খাও মাস চালিয়ে দিতে পারবে। জল যতটা দরকার নেবে। সব ফুরিয়ে গেলে ঘাবড়ে যাবে না। সামুদ্রিক সব মাছ দেখবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দরকারে বড়শিতে মাছ শিকার করবে। আগুনে ঝলসে খেয়ে নেবে। আর যদি দ্যাখো ঝড়ে পড়ে গেছে বোট—সী-অ্যাংকার ফেলে দেবে সামনে। ছোটবাবু মনে রাখবে—ইউ হ্যাভ এ গুড সোল। জল, খাবার ফুরিয়ে গেলে মরীচিকা দেখবে সব অদ্ভুত রকমের, ভয় পাবে না। দেন প্রেজ দ্যা লর্ড। হি ইজ দ্যা গ্লোরি অফ হিজ পীপল্ প্রেইজ হিম। তারপর তিনি বললেন, ইয়ং ম্যান লিসেন টু মি অ্যাজ ইউ উড টু য়োর ফাদার। লিসেন অ্যাণ্ড গ্রো ওয়াইজ ফর আই স্পিক দ্য ট্রুথ। ডোণ্ট টার্ন অ্যাওয়ে।

ছোটবাবু ওঁর কথা শুনতে শুনতে কেমন আবিষ্ট হয়ে গেছে। সে দেখছে স্যালি হিগিনস তার মাথার ওপর হাত রেখে যেন দাঁড়িয়ে আছেন। পৃথিবীতে এই জাহাজ, বনি, সারেঙ-সাব এবং বুড়ো মানুষটা বাদে আর কোনো তার অস্তিত্ব আছে—সে ছোটবাবু নয়, সে অতীশ দীপঙ্কর দেবশর্মণঃ, সে শ্রীযুক্ত চন্দ্রনাথ দেবশর্মণ নামক ব্যক্তির জাতক—মা তাঁর দরজায় রাতে শব্দ হলে জেগে যায়—আর মনে করতে পারছে না।

তিনি ফের বলছেন, লিসেন টু মি, মাই সন। লার্ন টু বি ওয়াইজ। ডেভেলাপ গুড জাজমেন্ট অ্যাণ্ড কমনসেন্স। সমুদ্র তোমাকে অযথা তবে ভয় দেখাতে পারবে না।

তিনি এবার ঘুরে দাঁড়ালেন—ছোটবাবু এবার দেখতে পাচ্ছে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন পেছন ফিরে। সে তাঁর মুখ দেখতে পাচ্ছে না। তিনি কি পেছন ফিরে কাঁদছেন। তিনি তাঁর সব সাহস হারিয়ে ফেলেছেন! সে তাঁর সাহস ফিরিয়ে আনার জন্য কিভাবে যে কি করবে বুঝতে পারছে না। ভেতরে ছটফট করছে। এবং লম্ফের আলোতে অতীব অস্পষ্ট এক করুণ অপার্থিব অভিজ্ঞতা। সে কেমন স্থির গলায় তখন স্যালি হিগিনসকে ঈশ্বরের কথা বলে যাচ্ছে। নিজেকে সে বিশ্বাস করতে পারছে না—সে এভাবে বলতে পারে। বিশ্বাস করতে পারছে না—সে বলছিল, স্যার উই লিভ উইদিন দ্যা শ্যাডো অফ দ্য অলমাইটি, শেলটারড বাই দ্য গড হু ইজ এভাভ অল গডস্। তবে আমরা ভয় পাব কেন। যেখানেই যাই তাঁর কাছে আমরা থাকব।

আর তখন হিগিনস প্রায় ঈশ্বরের নামে অশ্রুপাতের মতো ছোটবাবুকে ছুটে এসে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি চিৎকার করে বলতে থাকলেন—সব বাইবেলের কথা তুমি জানলে কি করে! বলেই কেমন শক্ত গলায় বললেন, তোমাদের নিশ্চিন্তে বোটে নামিয়ে দিতে পারতাম—আমার বিশ্বাস ছিল কেউ তোমাদের অনিষ্ট করতে পারবে না। কেউ না। কিন্তু ছোটবাবু, আর্চিকে তুমি খুন করেছ। তিনি তোমাকে ক্ষমা করবেন না। আর তারপরই ঘুরে ঘুরে প্রায় জাহাজডুবির গল্প যেন বলে যাচ্ছেন—সমুদ্রে অতীব মায়ায় পড়ে গেলে মরীচিকা প্রায়, তেষ্টায় যখন বুক ফেটে যাবে, মাঝে মাঝে সমুদ্রে ডুবে স্নান করে নিতে পার ছোটবাবু। ঘামে যা নুন বের হয়ে যাবে, শরীর ঠাণ্ডা হলে তা লাঘব হবে। সামান্য লোনা জল খেয়ে ফেলতে পার। তারপরও দেখবে তৃষ্ণা যাচ্ছে না। চোখ বসে যাচ্ছে, গলা শক্ত হয়ে যাচ্ছে কাঠের মতো। তখন যদি পারো কোনো মাছ শিকার করে য়ো ক্যান সাক্ হার ব্লাড। এবং মনে রাখবে যা হয়ে থাকে, তখন মানুষ দিকবিদিকজ্ঞানশূন্য হয়ে যায়, সে পাশের লোকটির ওপর ঝাঁপিয়ে তার গলা কামড়ে ধরে। তুমি বনিকে অনায়াসে ধরতে পার। তুমি তাহলে বেঁচে যাবে।

ছোটবাবু বুঝতে পারছিল মাথা ঠিক রাখতে পারছেন না তিনি। মাঝে মাঝে ছোটবাবুকে ভীষণ অবিশ্বাস করছেন। তিনি তবে জানেন, তিনি জানেন সে আর্চিকে খুন করেছে। সে কিন্তু কোনো পাপ কাজ করেছে বলে মনে করতে পারে না। একটা হত্যাকাণ্ড—এটা সে কেন যেন বুঝতে পারে না, শ্বাসরোধ করে মারা হত্যাকাণ্ডের সামিল। অথচ বার বার সে আর্চির মুখে সামান্য কীট-পতঙ্গের ছায়া দেখেছে। নির্বোধ, অর্থহীন চোখে যে সামান্য মায়া থাকে, তাও

পর্যন্ত ছিল না। সে কোনো কীট-পতঙ্গ হত্যার মতো আর্চিকে হত্যা করেছে। হিগিনসের কথায় সে সামান্যতম ব্যাকুল বোধ করল না। বলল, শুধু একটা কথা আমার। যদি রাগ না করেন।

তিনি হাত উঁচিয়ে বললেন, নো। আমার এখনও শেষ হয়নি। সব খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছ আশা করি। আর একটা কথা। খাবার ফুরিয়ে গেলে সমুদ্রে প্ল্যাংকাটন পাবে। ছাঁকনি দিয়ে তুলে নেবে। শ্যাওলার মত সবুজ। সঙ্গে কুচোচিংড়ির মতো জেলি ফিশ থাকবে। সব অণুর মতো। ওগুলো বেছে নেবে। খেতে খুব খারাপ লাগবে না। খাওয়ার অভ্যাস হয়ে গেলে দেখবে, সমুদ্রে তোমার জল এবং খাবার না হলেও চলবে। যতদিন বোট ভেসে থাকবে, তোমরা ততদিন বেঁচে থাকতে পারবে।

ছোটবাবু আবার হাত তুলে কিছু বলতে চাইলে তিনি বললেন—নো। আর কোনো কথা না। তুমি কি বলবে আমি জানি। তুমি আমাকে নিয়ে নামতে চাইবে। সারেঙকে আমি সব খুলে বলেছি। সারেঙ আমাকে ছেড়ে যেতে চাইছে না। সেই এক অহঙ্কার। জাহাজটাকে সমুদ্রে ফেলে ডাঙায় ফিরে গেলে লোকে হাসাহাসি করবে। বুঝতে পারছ না জাহাজ না নিয়ে আমাদের বন্দরে যাবার নিয়ম নেই। আর সেই বা কি ভাববে?

তারপর তিনি থেমে থেমে বলতে থাকলেন—সিউল-ব্যাংক আমাকে ছেড়ে দেবে না। আমি সঙ্গে থাকলে সব অশুভ প্রভাব তোমাদের বোটে উঠে যাবে। আমাকে কেউ ছেড়ে দেবে না। সিউল-ব্যাংক, এলিস, ক্যাপ্টেন লুকেনার এতদিন সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। ওদের হাতে সুযোগ এসে গেছে। সিউল- ব্যাংক আমার ওপর তার সব বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছে। আমিও তার বিশ্বাসের মর্যাদা দেইনি। জাহাজ বিক্রিবাট্টার কাগজ পত্রে আমি সই করেছি। নেমকহারাম আমি।

ছোটবাবু আবার কিছু বলার চেষ্টা করলে চিৎকার করে উঠলেন—যা বলছি শোনো। এটা সেই সমুদ্র, সেই আকাশ, সেই নক্ষত্রমালা যার নিচে এলিসকে আমি খুন করেছিলাম ছোটবাবু। এলিস মৃত্যুর পর আমাকে কোথাও ছেড়ে যায়নি। মাঝে মাঝে আমি ওকে দেখতে পেতাম ছোটবাবু। এখন আমার পাশে সেও নেই। তাকে আর দেখতে পাচ্ছি না। সে আমাদের ঠিক তার জায়গায় টেনে এনেছে।

কথা বলতে বলতে হিগিনস কেমন ম্রিয়মান হয়ে যাচ্ছেন। করুণ চোখ-মুখ। ভীতু মানুষের মতো ছোটবাবুর দিকে অপলক তাকিয়ে আছেন। আর যেন প্রায় স্বীকারোক্তির মতো তিনি সব বলে যাচ্ছেন। লম্ফটা তেমনি দপদপ করে জ্বলছে।—বুঝলে ছোটবাবু, এলিস আমার প্রথম পক্ষের স্ত্রী। বনি আমার দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান। স্বাভাবিক কারণেই বনির ওপর তার আক্রোশ। এতদিনে বুঝতে পারছি—সে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। সকালে দেখতে পাবে সামান্য একখণ্ড জমি সমুদ্রে দ্বীপের মতো। ওপরে ক্রস। প্রবালে দ্বীপে হয়তো পলি পড়ে পড়ে ক্রসটা আরও মাথার ওপরে উঠে এসেছে। আমার কেন জানি মনে হয় এলিস শুয়ে আছে তার নিচে। মমির মতো শরীর। সারাক্ষণ সমুদ্র তার ওপর আছড়ে পড়ছে। তুমি ভুল দ্যাখোনি। আমিও না। তারপর মুখ নামিয়ে নিলেন। আর একটা কথাও বলছেন না।

ছোটবাবুর মনে হল তিনি আর কথা বলবেন না। সে এগিয়ে গেল। এবং ডাকল, স্যার...! তিনি তবু কেমন স্থির আর অস্বাভাবিক রকমের ঠাণ্ডা।

—আর কথা না ছোটবাবু। এই বলে তিনি লম্ফটা হাতে নিলেন। চার্ট তিনি ছিঁড়ে ফেললেন। এবং সিঁড়ি বেয়ে ওঠার সময় সহসা থমকে দাঁড়ালেন।

ছোটবাবু বললে, কি হল স্যার?

—বনি জানবে না। বনি জানবে না, তোমাদের সমুদ্রে আমরা ভাসিয়ে দিচ্ছি। তোমরা, কাছে কোথাও ডাঙা আছে সেখানে যাচ্ছ। দু-একদিনের ভেতর লোকালয় পেয়ে যাবে—আমরা আছি জাহাজে। ডাঙা পেয়ে গেলে খবরাখবর পৃথিবীতে পৌঁছে দেবার চেষ্টা করা হবে। তারপর রেসকিউ—আমরাও ফিরে যাচ্ছি তখন। ঘুম থেকে উঠে বনি চোখ-মুখ দেখে

যেন টের পায় আমরা ভাল আছি। আমরা বেঁচে আছি। কারো চোখে-মুখে মরা মানুষের ছবি দেখতে চাই না ছোটবাবু। তারপর ওপরে উঠে যেতে যেতে বললেন, আমার সামনে বনি ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরে যাবে –আর আমি ভাবতে পারছি না ছোটবাবু আশা করি তুমি ওকে ঠিক পৌঁছে দেবে। তাকে কোনো কষ্ট দেবে না। বলতে বলতে ছোটবাবুর দু'হাত জড়িয়ে ধরলেন। মুখ তাঁর অন্য দিকে। ছোটবাবু বুঝতে পারল, তিনি এখন বালকের মতো কাঁদছেন।

॥ তিপ্পান্ন ॥

বনি অঘোরে ঘুমোচ্ছিল। হিগিনস ভাঙা যীশুর মূর্তি টেবিলে জোড়া লাগাচ্ছেন। সারেঙ পোর্ট- হোলে দাঁড়িয়ে আছেন। ফ্যাকাশে চাঁদ সমুদ্রে ডুবে যাচ্ছে এবং অজস্র চাঁদ এভাবে যেন হাজার লক্ষ চাঁদের প্রতিবিম্ব ভাসছে সমুদ্রে। তারপর অন্ধকার। কিছু দেখা যাচ্ছে না। সমুদ্রে তেমনি কল-কল ছল-ছল শব্দ। ছোটবাবু হেঁটে যাচ্ছে ডেক ধরে। সে শেষবারের মতো জাহাজটা ঘুরে ঘুরে দেখছে। সবই মনে পড়ছিল। যেন পাশে দাঁড়িয়ে মৈত্রদা বলছে—কিরে ছোট, তোরাও চললি। সে পিছিলের রেলিঙে এসে ঝুঁকে দাঁড়াল। ডাঙার কাছে এলে, মৈত্রদা সে অমিয় জব্বার মনু দাঁড়িয়ে থাকত।—কিরে ছোটবাবু বিফ খেয়েছিস বলে মন খারাপ! পৃথিবীটাকে এত ছোট ভাবিস কেন। আমি বামুনের ছেলে না! আমার জাত নেই বুঝি? অথবা যেন দূরে বোট-ডেকে ডেবিড দাঁড়িয়ে হাঁকছে, ছোটবাবু সামনে আটলান্টিক। এবার আমরা ভারত মহাসাগর পার হয়ে যাচ্ছি। অথবা মৈত্রদার দু'টি একটা কথা, হেঁটে যাবার সময় মনে করতে পারছে। গ্যালিতে ভাণ্ডারি জ্যেঠার চর্বি ভাজা চাপাটির গন্ধ একটু নাক টানলেই যেন পেয়ে যাবে। সে পিছিলে এসে গেছে। কত জমজমাট ছিল জায়গাটা। অনিমেষের গলা যেন এক্ষুনি শুনতে পাবে—সে যেন পায়ে ঘুঙুর বেঁধে গাইছে—ওলো সই ললিতে, যাচ্ছি আমি গলিতে। অথবা গানের সঙ্গে তার গলায় বাজছে—ছোটবাবু ভূত দেখেছে। সিঁড়ি ধরে নিচে নেমে গেলে অন্ধকারটা আরও চাপ বেঁধে আছে। কোন শব্দ নেই। কেবল স্টিয়ারিং-এনিজিনের পেনিয়ান এখনও বাতাসে কক্ কক্ করছে। কাল তাদের জাহাজ ছেড়ে সমুদ্রে ভেসে পড়তে হবে। বনি এত বড় বিপদের কথা বিন্দুমাত্র জানে না। বনি অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

অন্ধকারে কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। সব ফোকসালের দরজা বন্ধ। দু'টো-একটা ইঁদুর ছুটে যাচ্ছে। আর এক ধাপ সিঁড়ি ভেঙে গেলে তার ফোকসাল। জাহাজে এটাই ছিল তার প্রথম আস্তানা। সে টর্চ জ্বেলে এবার ভিতরে ঢুকে নিজের বাংকে কিছুক্ষণ বসে থাকল। মৈত্রদা পাশেই আছে মনে হচ্ছিল। যেন বলছে, খাও ছোটবাবু, খাও। সমুদ্রে কারো বাবা-মা থাকে না। আমরাই আমাদের বাবা-মা। বাংকে তেমনি মৈত্রদার বিছানা পাতা। অমিয় যাবার আগে ওর বিছানাটা উল্টে রেখে গেছে। সব হুবহু তেমনি আছে। সবই এখন স্মৃতি। ডেবিড বন্ধু অনিমেষ জব্বার কিভাবে সমুদ্রে বেঁচে আছে কে জানে! চুপচাপ অন্ধকারে সে বসে থাকল। সে কিছু আর ভাবতে পারছে না।

ছোটবাবুর এভাবে তন্দ্রার মতো এসে গেছিল। তখন মনে হল সারেঙ- সাব ডাকছেন। ছোটবাবু বুঝতে পারছে সারেঙ-সাব দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকছেন। হাতে একটা লম্ফ! সারেঙ-সাবের সাদা পোশাক সাদা চুল সাদা দাড়ি, কোনো কিংবদন্তীর পুরুষের মতো অথবা মনে হয় সেই শৈশবের ফকিরসাব যেন—হাতে তাঁর মুশকিল আসান। একটা পয়সা লম্ফের ভেতর ফেলে দিলেই তিনি তার কপালে ফোঁটা টেনে দেবেন—মুশকিল আসান আসান করে—সেই মাঠে লম্ফ জ্বালিয়ে অন্ধকার রাতে শৈশবে সে যেমন দেখেছে, একজন মানুষ উঠে আসছে, গলায় মালা তাবিজ, গায়ে কালো কাপড়ের অজস্র তালি মারা জোব্বা, হাতে মুশকিল আসানের লম্ফ—তিনি এখন তেমনি দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছেন। বলছেন—কখন তুই এখানে নেমে এয়েছিস! ভাবলাম ছোট ওদিকে যাচ্ছে কেন! তারপর আর তোর পাত্তা নেই। আমার দিলে ধুকপুক উঠে গেছে। নেমে এলাম। এখানে তুই কি করছিস!

সে বলল, চাচা কাল তো আপনি আমার সঙ্গে থাকবেন না!

সারেঙ-সাবের মুখটা কালো হয়ে গেল।

ছোট বলল, তখন এভাবে কে দেখবে! কে খুঁজে বেড়াবে আমি কোথায় আছি!

তিনি ওপরে হাত তুলে দিলেন! যেন বলার ইচ্ছে, তিনি দেখবেন, ছোট। তারপর বললেন, ওপরে চল। কতক্ষণ বসে থাকবি!

ছোটবাবু ঘড়িতে দেখল চারটে বেজে গেছে।

—একটু ঘুমিয়ে নে ছোট।

—সকাল হয়ে যাচ্ছে। ঘুম আসবে না।

—তবু একটু গড়িয়ে নে।

—শুলে আর উঠতে ইচ্ছে করবে না। চলুন ওপরে যাই।

আর ওপরে এসেই ছোটবাবু তাজ্জব। সেই ক্রস, সেই আলো—প্রায় ফসফরাসের মতো সাদা উজ্জ্বল-বর্ণময় আলো ক্রসটা থেকে দপদপ করে জ্বলছে। একেবারে সামনে। মনে হয় আধ মাইলের ভেতর—কি আরও কাছে কি দূরে কতদূরে হবে—সে এবং সারেঙ-সাব বুঝতে পারছে না। আর ফসফরাসের আলো কখনও জ্বলছে নিভছে। কখনও নীল হলুদ অথবা রক্তবর্ণ হয়ে যাচ্ছে—প্রাচীন মোজেসের সেই দৈববাণীর মতো যেন ক্রসটা বিধাতার করুণ অহমিকা। অথবা অট্টহাস্য করছে সমুদ্রে। ওরা ছুটে যেতে পারল না। হাত পা স্থবির হয়ে যাচ্ছে। বোধ হয় ছোটবাবু মূর্ছা যেত। তখনই কাপ্তানের গলা, আমার সঙ্গে এস।

হিগিনস যেতে যেতে সহসা সতর্ক গলায় ধমক দিলেন, তুমি ওদিকে কোথায় গিয়েছিলে?

—ফোকসালে স্যার।

—কি দরকার এখন সেখানে ঘোরার!

—নেমে যাবার আগে...

তখনও তেমনি ক্রসটা আকাশের নিচে জ্বলছে। সমুদ্রে সামান্য ঢেউ আছে। বাতাস বেশ জোরে বইছে। জাহাজটা উঠছে নামছে। তার মনে হচ্ছিল ক্রসটা উঠছে নামছে। কখনও আকাশের গায়ে অতিকায় হয়ে যাচ্ছে কখনও ঢেউ-এর আড়ালে পড়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে।

তিনি ওদের নিয়ে বোট-ডেকে উঠে যাচ্ছেন। কিছু বলছেন না। চুপচাপ। ছোটবাবু আর না পেরে খুব সতর্ক গলায় বলল, আপনি কিছু বলুন। আমাদের এ কোথায় নামিয়ে দিচ্ছেন।

হিগিনস খুব সহজ গলায় বললেন, ক্রসটা দেখে ঘাবড়ে যাবে না। তারপর বললেন, সকাল হয়ে যাচ্ছে। যত সকাল হবে ক্রসটার সব আগুন অথবা লাল নীল ফসফরাসের জ্বলা কমে আসবে। দিনের আলোতে কিছু দেখতে পাবে না। বোধ হয় কোনো প্রবালের পাহাড়টাহাড় সমুদ্র থেকে ভেসে উঠে এমন হয়েছে। ঝড়ে বৃষ্টিতে রোদে জলে ক্ষয়ে পাহাড়ের মাথাটা এক অতিকায় ক্রস। যত দিন যাচ্ছে তত এটা বড় হয়ে যাচ্ছে। বিশ বছর আগে যা দেখেছিলাম ওটা, এখন তার চেয়ে অনেক বড়। ক্রমশ ওটা সমুদ্রের পাতাল থেকে ওপরে উঠে আসছে বুঝি। গায়ে তার অজস্র ফসফরাস জোনাকির মতো। আত্মগোপন করে আছে।

এবং সত্যি ছোটবাবু দেখল যত পুবদিক ফর্সা হয়ে যাচ্ছে, যত সমুদ্র আর আকাশ কুসুম-কুসুম রঙ ধরছে তত ক্রসটার বিচ্ছুরণ নিস্তেজ হয়ে আসছে। আর সকালে স্পষ্ট দেখল ওটা একটা পাহাড়ের শীর্ষদেশ। এঁকেবেঁকে ক্রুশের মতো। ক্ষয়ে গিয়ে চারপাশে চারটা কালো স্তম্ভ। এবং দূর থেকে দেখতে হুবহু একটা লম্বা প্রায় মাস্তুলের মতো উঁচু ক্রস। ছোটবাবু বলল, কেমন ভয় পেয়ে গেছিলাম পাহাড়টা দেখে। পাহাড়টা কেমন ওপরে উঠে যাচ্ছে।

—ওর দোষ কি বল! ওতো উঠে আসতে চাইবেই।

আর চেঁচামেচিতে বনিও উঠে এসেছে। সে খুব অবাক—ওরা তিনজন দাঁড়িয়ে একটা কালো কুচকুচে প্রবালের খাড়া পাহাড় দেখতে দেখতে কেউ কোনো কথা বলতে পারছে না। সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। ক্রসের মাথা থেকে যে জল চুইয়ে পড়ছে নিচে তাও দেখা যাচ্ছে। সমুদ্রের ঢেউ পাহাড়টাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে চাইছে।

বনি বলল, বাবা জাহাজটা ওটার গায়ে গিয়ে আবার ধাক্কা খাবে নাতো!

কারণ তখন তো জাহাজটাও যে কি কারণে ছুটে যাচ্ছে। কোন দিকে যাবে—ওটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না চারপাশে গভীর খাদে নিবিষ্ট এক চোরাস্রোতে পড়ে গেছে জাহাজ বোঝা যাচ্ছে না। তিনি হেঁকে উঠলেন, বনি, তোমার যা কিছু আছে ঠিক করে নাও। তোমরা নেমে

যাবে। পাহাড়টা দেখে সব ঠিক করে ফেলেছি।

বনি বলল, কি ঠিক করে নেব?

—তোমার যা কিছু আছে সব।

—কেন বাবা! কি হবে?

—কাছে একটা দ্বীপ পাবে। সেখানে তোমরা যাবে। ছোটবাবুকে আমি সব বুঝিয়ে দিয়েছি। তোমরা খবর পাঠালে আমরা ঠিক উদ্ধার পাব। জাহাজটা উদ্ধার পাবে। দ্বীপে মানুষজন আছে। একটু থেমে বললেন, সবাইর জাহাজ ছেড়ে যাওয়া ঠিক না। আমি আর সারেঙ থাকলাম।

বনি মাথামুণ্ডু কিছু বুঝছে না। সে কি ঘুমের ঘোরে স্বপ্ন দেখছে! ভাল করে চোখ মুছে দেখল, না, সে ঠিকই দেখছে। বাবা তাকে ভীষণ তাড়াতাড়ি করতে বলছেন। আর ছোটবাবুকে ধমক—এই তোমাকে যে বললাম, বনিকে নিয়ে যাও তুমি, কি হে এত তুমি ভীতু—তোমার কাণ্ডজ্ঞান নেই কিছু। বয়সে তো আর ছোট নেই, কবে দামড়া হয়ে গেছ।

বনি বলল, কতদূর বাবা?

—এই কাছেই। দু-তিন দিনের ভেতর ডাঙা পেয়ে যাবে। সব বলে দিয়েছি। কম্পাসের কাঁটা কত ডিগ্রী বরাবর রাখলে দ্বীপটা পেয়ে যাবে তাও বলে দিয়েছি। পালে জোর বাতাস লাগলে এক আধ দিনেও পেয়ে যেতে পার। দ্বীপটায় সবকিছু পাবে।

বনি বলল, কি মজা! সে ছুটে প্রায় চলে যাচ্ছিল—কিন্তু কি মনে হওয়ায় সে ফের ফিরে এসে বলল, একটু চা করে তোমাদের খাইয়ে যাচ্ছি বাবা। আর কোনও আমাদের তা হলে ভয় নেই বলছ ত!

হিগিনস বললেন, আরে না না, কোনও ভয় নেই। এবারের মতো সবাই বেঁচে গেলাম। তারপর কি মনে পড়ায় বললেন, তা মন্দ না, কি বল সারেঙ। চা করলে ভালই লাগবে। বনি তাড়াতাড়ি করবে! এই রাসকেল—কি, দাঁড়িয়ে থাকলে কেন। হাত লাগাও। বলে তিনি বোটে দু'লাফে উঠে গেলেন। হুড তুলে বললেন, রেশন আগে রাখো। জল রাখো। বাকি সব কাল আমি ঠিক করে রেখেছি। সব আছে। এই একটা দা রেখে দিয়েছি দ্যাখো। রাত-বিরেতে অক্টোপাসের ঠাণ্ডা পা বোটে উঠে এলে দা দিয়ে কোপ মারবে। একজন ঘুমোবে একজন পাহারায় থাকবে।

বনি নিচে নেমে গেছে। ছোটবাবু বোটে উঠে এসেছে। সারেঙ-সাব নিচ থেকে রেশন টেনে তুলছেন। ছোটবাবু আর কাপ্তান সব সাজিয়ে রাখছে—যেন হাতে যা সময় পাওয়া যায়—ছোটবাবুকে সমুদ্র সম্পর্কে আরও কিছুটা অভিজ্ঞ করে তোলা। কাল রাতে একবারে ভেঙে পড়েছিলেন—মাথা ঠিক ছিল না। এখন খুব মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজকাম করে যেতে হবে। বার-বার তিনি সমুদ্র সম্পর্কে বলে যাচ্ছেন—বুঝলে ছোটবাবু, খাবার ফুরিয়ে গেলে প্ল্যাংকাটন সম্বল। প্রাণীজাতীয় শৈবালজাতীয় দু'রকমেরই পাবে। সমুদ্রে এমন সব অনু-পরিমাণ মাছ ভেসে বেড়ায়। চোখে ঠিক দেখা যায় না। হিগিনস আশেপাশে খুঁজে দেখলেন, বনি কাছে কোথাও আছে কিনা। এই দেখছ এটা তোমাদের দিয়ে দিলাম। এটা জলে ফেলে এই বিশ পঁচিশ মিনিট পরে তুললে সামান্য প্ল্যাংকাটন উঠে আসবে। বেশ জল ঝরে গেলে প্রায় সবুজ জেলির মতো দেখতে। আর মনে রাখবে জল না থাকলে তোমরা কাঁচা মাছ চিবিয়ে খেতে পার। ওতে তেষ্টা নিবারণ হবে। আর শোনো সবসময় দু-চারটা মাছ তুলে ভেতরে গর্ত করে রাখবে—কিছুটা লালার মতো জমলে চেটে খেলে তেষ্টা নিবারণ হবে। ওয়াটার ওয়াটার এভরিহোয়েয়ার বাট নট এ ড্রপ টু ড্রিংক—মিথ্যে কথা। ঈশ্বর কোথাও মানুষের আহার রাখেননি তা হতে পারে না। কোলরিজ কিছু জানতেন না। তাঁর কবিতায় নায়কেরা মরীচিকা দেখেছে। সব রপ্ত হয়ে গেলে তোমরা সমুদ্রকে কলা দেখাতে পারবে। একজন যুবকের পক্ষে দীর্ঘ দিন সমুদ্রে বেঁচে থাকা খুব কঠিন না।

আসলে তিনি ছোটবাবুকে সাহস দিচ্ছিলেন। সমুদ্র সম্পর্কে যতটা জ্ঞানগম্যি আছে—যা তিনি পড়াশোনা করেছেন—এবং কিছুদিন আগে কনটিকি অভিযানের সব পৃথিবী তোলপাড় করা খবর তিনি জানেন এবং এইসব ঘটনা, অর্থাৎ মহাসমুদ্রে সামান্য মানুষেরা ভেলায় চড়ে হাজার হাজার মাইল পাড়ি দিলে কি কি অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হতে হয় তার একটা নিদারুণ ছবি তিনি ছোটবাবুকে দিতে পারতেন—কিন্তু ইচ্ছে করেই দিলেন না। কেবল বললেন, যদি কোন অতিকায় হাঙর দেখ পেছন নিয়েছে—তাকে অনিষ্ট করার চেষ্টা করবে না। সমুদ্রের কোন জীব অহেতুক হত্যা করবে না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত মাছ সমুদ্র থেকে তুলবে না। ছোট ছোট সব কাঁকড়া এইসব ক্রান্তীয় সমুদ্রে ভেসে বেড়ায় খেতে বেশ সুস্বাদু। তোমার সঙ্গে জল, কয়লা, এবং এই দ্যাখো লোহার উনুন, একেবারে পাটাতনের সঙ্গে ফিট করা সব—সমুদ্রের দুলুনিতে যেন কিছু আবার ছিটকে পড়ে না যায়।

কাল সারাদিন কখন যে সারেঙ-সাব সব করে রেখেছেন! তিনি এতটুকু সময় নষ্ট করেন নি। খেতে পরতে যা লাগে সব তিনি তুলে এনেছেন বোটে।

বনি উঠে আসছিল। চা-এর ট্রে হাতে। কাপ উপুড় করে সন্তর্পণে উঠে আসছে। কালো অ্যাপ্রন, সাদা ফ্রক এবং সে গলায় বেশ সাদা পাথরের মালা পরেছে। নীলাভ চোখে কি দীপ্তি, ছোটবাবু ইশারায় চোখ টিপে দিল। বলল, আসছে।

সঙ্গে সঙ্গে হিগিনস প্রায় লাফ মেরে নামলেন নিচে। ছোটবাবুও নিচে নেমে গেল। ওরা বোটে হেলান দিয়ে চা খেতে খেতে তখন কত রকমের কথা বলতে থাকল—বনি, বাবা এবং ছোটবাবুর দিকে তাকিয়ে আছে। দ্বীপটার কি নাম, শহরে কি পাওয়া যায় কাপ্তান সব বানিয়ে বলে যাচ্ছেন। সব আম, জাম, নারকেল গাছ আর লেবুর জঙ্গল—আনারসের খেত—ঠিক সামোয়ার মতো দেখতে—সামনে তার দিগন্ত জোড়া বালিয়াড়ি—কি আনন্দ ছোটবাবু। খুব সাবধান, আমাদের কথা গিয়ে ভুলে যাবে না। ওখানে পৌঁছে প্রথমে তোমরা খবরের কাগজের অফিসে দেখা করবে—তোমাদের কথা বলবে—আমাদের কথা বলবে—মিসিং জাহাজটার তোমরা ক্রু বলবে। কাপ্তান, বৃদ্ধ সারেঙ জাহাজটায় রয়ে গেছে বলবে। ওদের জন্য রেসকু চাই। তারপরই দেখবে জাহাজটা নিয়ে আমরা পৌঁছে গেছি। একজন কাপ্তানের পক্ষে এর চেয়ে গৌরবের আর কি আছে!

বনি বলল, আমার ভাল লাগছে না বাবা! মনটা আমার কেমন করছে!

—দূর বোকা মেয়ে—স্যালি হিগিনস সহসা যেন মুখ ফিরিয়ে সমুদ্রে ঝুঁকে পড়লেন। বললেন, ছোটবাবু বোটে ক্রস তুলে নাও। এস এদিকে এস। তিনি কাপ বনির হাতে দিয়ে এগুতে থাকলেন। বনি বলল, বাবা ক্রস কেন?

—বুঝতে পারছ না, সমুদ্রে কত রকমের অপদেবতা থাকে। শয়তান থাকে। অশুভ প্রভাব থাকে। তাদের হাত থেকে তোমাদের রক্ষা করতে হলে আর কি দিতে পারি। ক্রসটা মাঝখানে থাকবে। তিনি বলতে চাইলেন, মহাসমুদ্রের অন্তহীন এই যাত্রায় মৃত্যু প্রায় অনিবার্য—তবু শুভ প্রতীকের মতো অথবা ঈশ্বরের সেই অমোঘ বাণী খোদিত আছে যেন ক্রসের গায়ে—সেই কঠিন বিভীষিকার ভেতর মৃত্যু যত অনিবার্য হয়ে উঠবে—তত এই ক্রস সব অশুভ প্রভাব থেকে মুক্ত রাখবে বনি এবং ছোটবাবুর মৃতদেহ—অর্থাৎ তিনি যেন জানেন, বোট ভাসতে ভাসতে কোথায় চলে যাবে—অথবা পালে বাতাস লাগলে কতদিন কে জানে এবং যখন কিছু জানা নেই মৃত্যু অনিবার্যতার সামিল এবং যেহেতু মেয়েটার কঠিন মৃত্যুর দৃশ্য চোখের ওপর দেখার তাঁর সাহস নেই—ছোটবাবুকে দিয়ে দূরে পাঠিয়ে তিনি এলিসের ক্রূরতার হাত থেকে রেহাই পেতে চাইছেন। সঙ্গে ক্রস থাকলে কবর-ভূমির ওপর কোনোদিন কেউ যদি ক্রসটা পুঁতে দেয়। যেন ক্রসের নিচে শুয়ে আছে বনি এবং ছোটবাবু।

তিনি বনির দিকে এখন তাকাচ্ছেন না। যতটা দ্রুত সম্ভব ওদের নামিয়ে দিতে পারলে তিনি বেঁচে যান। জাহাজ এবং সেই পাহাড় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আছে। অথবা সেই অতিকায় ক্রসটা—প্রায় দু'টো ষাঁড় লড়ার মুখে মনে হয়। এবং আকাশে খণ্ড খণ্ড মেঘ। সারেঙ সব তুলে যা

যেখানে দরকার রেখে দিচ্ছেন। কাপ্তান একটা ক্রস কাঁধে বয়ে আনলেন। ক্রসটা বোটের মাঝখানে শুইয়ে রাখা হল। অন্য ক্রসটা ছোটবাবু এবং কাপ্তান মিলে জাহাজের মাথায় পুঁতে দিচ্ছে। লোহার বড় বড় পেরেক পুঁতে ওটাকে জাহাজে দাঁড় করিয়ে কিছুটা ভয় থেকে মুক্ত হবার মতো তিনি চিৎকার করে ডাকলেন—সারেঙ।

সারেঙ কাছে এসে দাঁড়ালে ডাকলেন, বনি!

বনি কাছে এলে বললেন, সব তুলে দিয়েছ?

বনি ফের কেবিনে ঢুকে ওর শেষ সম্বল দুটো বর্শা এবং অক্সিজেন সিলিণ্ডার তুলে দিল বোটে। তিনি বললেন, খুব রোদ উঠলে হুড তুলে দেবে। নিচে দু'জনের মতো শোবার জায়গা আছে। হুড খুলে দিলে কতটা জায়গা তাও দেখিয়ে দিলেন। কোথায় কি রেখেছেন বনিকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। কোথায় ওরস্ ক্রাচেজ, বোট-হুক, প্লাগস, বাকেট, বেলার সব ঠেলে ঠেলে দেখিয়ে দিলেন। কম্পাস, কুড়োল, ল্যাম্প, ম্যাচিজ, কোথায় কিভাবে রেখেছেন দু'জনকেই দেখিয়ে দিলেন। পালের মাস্তুল বোটের কিনারায় ঝুলিয়ে নেবে। তবে কিছুটা তোমাদের বেশি জায়গা হবে। ছোটবাবুকে ডেকে বললেন, এই দ্যাখ্যো এখানে অয়েলব্যাগ থাকল। মাথায় সী-অ্যাংকার। গ্যালনের মতো এনিম্যাল অয়েল রেখে দিয়েছি। হাত- পাম্প কোথায় রাখলাম আবার! তিনি জলের ড্রামের পেছনে উঁকি দিলেন, আরে এখানেই তো রেখেছি! না, সেই দূরের পাহাড় আর কাছে আসছে না। জাহাজের মাথায় ক্রস তুলে দিয়ে তিনি সব অশুভ ভয় থেকে মুক্ত হয়ে গেছেন। বেশ নিশ্চিন্তে তিনি খুঁজছেন যেন।—এই তো হাত-পাম্প। এই হচ্ছে বিস্কুটের টিন, বার্লি চিনি সব ষোল আউন্সের মতো করে আছে। এগুলোতে প্রথমেই হাত দেবে না।

ছোটবাবু দেখল, স্যালি হিগিনস নিজের কথায় নিজে ধরা পড়ে যাবেন। সে তাড়াতাড়ি বলল, স্যার সিগন্যালিং টর্চ কোথায় রেখেছেন?

সারেঙ বললেন, ওপরের দিকে আছে। এই দ্যাখ বলে তিনি সিগন্যালিং টর্চ-রকেট-প্যারাসুট, ফ্ল্যাশ- লাইট সব এক এক করে তুলে দেখালেন। এখানে ফার্স্ট-এড, একটা ছোট্ট কাঠের বাকসের ভেতরে রেখেছেন কোরামিনের ফাইল। জীবন ধারণের শেষ প্রয়াস এটা। খুব যত্নের সঙ্গে কাঠের বাকসে মানুষের আত্মার মতো বন্দী করে রেখেছেন সারেঙ। তিনি বোটে ছুটে ছুটে যাচ্ছিলেন বলে, বোট, দু'টো ডেবিডের হুকে বেশ দুলছিল, দু'টো কপিকল দিয়ে ডেবিড কাত করে দিলেই বোট নিচে ঝুলে পড়বে। তারপর উইনচ চালিয়ে শুধু দড়ি ছেড়ে দেওয়া। কপিকলে ঝুলে থাকা ডেবিডের হুক থেকে বোট ধীরে ধীরে নেমে যাবে। পাল তিনি মাস্তুলে পরিয়ে একেবারে ঠিকঠাক করে শেষবারের মতো নেমে এলেন। এখন বোধহয় বোট নামিয়ে দেওয়া হবে।

সারেঙ-সাব ছোটবাবুকে বললেন, তোর আর কিছু পড়ে থাকল না তো!

ছোটবাবু ভেতরে ভেতরে অস্থির হয়ে পড়ছে। সে চোখ তুলে তাকাতে পর্যন্ত পারছে না। এই ছোট্ট বোট নিয়ে এমন অকুল সমুদ্রে একা ভেসে পড়া—কি যে কঠিন আর ভয়াবহ—তার হাত পা যত সময় এগিয়ে আসছে তত যেন ঠাণ্ডা মেরে যাচ্ছে –বনি প্রায় অবলার মতো—এবং সে একা থাকলে তবু দায়িত্ব কম—নিজের জন্য চিন্তা-ভাবনা তার তত নয়, এই মেয়েটা ফুলের মতো মাত্র ফুটে-ওঠা মেয়েটা জানে না সামনে কি নিদারুণ সমুদ্র হাঁ করে আছে। তার ভেতর ঢুকে গেলে পৃথিবীর কোনো মানুষের সাধ্য নেই ফের তাকে আবিষ্কার করে—তখন কিনা-সারেঙ-সাব তার কি আর পড়ে আছে জিজ্ঞাসা করছেন—সব জেনে কেন এমন করছেন তাঁরা! কি হবে কিছু পড়ে থাকলে! সে দাঁত চেপে বলল, সরুন এখান থেকে, সামনে থেকে সরে যান! সরে যান বলছি! আপনারা আমাকে কি পেয়েছেন!

স্যালি হিগিনস তখন কাঁধে হাত রাখলেন ছোটবাবুর। তাকে খ্রীষ্টের গল্প শোনালেন। বললেন, ছোটবাবু স্ট্রাগল ইজ দ্যা প্লেজার। এত সহজে ভেঙে পড়লে চলবে কেন! বনি

আসছে। তিনি মুহূর্তে গলার স্বর পাল্টে ফেললেন। সতর্ক হয়ে গেলেন খুব। ছোটবাবুকে টিপে দিলেন।

কাপ্তান এবার হাঁকলেন, বনি! বনির দিকে তাকিয়ে আর একটা কথাও বলছেন না। বনি কিছুতেই বাবার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। সে বলল, এই তো আমি।

—ওপরে উঠে বসো।

—ছোটবাবু!

—ছোটবাবু দড়ি ধরে নেমে যাবে। আমরা দু' বড়ো ডেবিড থেকে বোট হারিয়া করতে পারব না। স্থির এবং ভীষণ গম্ভীর গলা। বনি আর একটা কথা বলতে সাহস পেল না। সে লাফ দিয়ে বোটে উঠে বসল। পাটাতনে একটা ম্যাট্রেস পেতে নিতে পার। তিনি বনিকে যেন বলছেন না। অন্য কাউকে। বনি এখনও বাবার মুখ দেখতে পাচ্ছে না। সে সেই দুঃসময়ের মতো, মা চলে যাবার পর যেমন অসহায় গলায় ডাকত, বাবা, তেমনি ডেকে উঠল, বাবা।

কিন্তু স্যালি হিগিনস তখন ডেবিডের গোড়ায় গিয়ার খুলে প্রায় ছোটবাবুর সঙ্গে সঙ্গে ডেবিডের মাথা এগিয়ে ধরলেন, ছোটবাবু তখন চিৎকার করছে, বনি শক্ত করে ধরো, না হলে পড়ে যাবে—বোট ভীষণ দুলছে। বনি বোটের একটা দিক চেপে ধরে আছে। বোট দুলে দুলে নিচে নিয়ে গেলে সে যেন নিচে না পড়ে যায়। এবং উইনচ ছেড়ে দিলে হড়হড় করে বোট নিচে নেমে গেল। বনি তখনও ডাকছে, বাবা বাবা! তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছ না কেন! আমার ভীষণ ভয় করছে! এবং ছোটবাবু দেখল বোট জলে নেমে গেছে, সে তাড়াতাড়ি দড়ি ধরে ঝুলে পড়ল নিচে। দড়ি বেয়ে বেয়ে নেমে যেতে থাকল। বোট সরে যাচ্ছিল—আর সে চিৎকার করছে, বনি দড়ি টেনে রাখ। আমি পড়ে যাব সমুদ্রে। বনি তখনও চিৎকার করছে, বাবা, তুমি কোথায়? তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না কেন! বনির খেয়াল নেই বোট নিচে নেমেই জাহাজের পাশে থাকছে না। ঢেউ খেয়ে ছিটকে দূরে সরে গেছে। ছোটবাবু তেমনি দড়িতে ঝুলে থাকল, বনি দড়ি টেনে ধরো প্লিজ। কি করছ তুমি! তোমরা সবাই মিলে আমাকে কি পেয়েছ?

বনি এবার কেমন নিচে তাকালে দেখল ছোটবাবু দড়িতে ঝুলে আছে। পা প্রায় কিছুটা সমুদ্রের জলে ডুবে গেছে। ঢেউ এলে ওর সবটা ডুবে যাবে। সে তাড়াতাড়ি এবার দড়ি টেনে ধরলে বোট ছোটবাবুর কাছে এগিয়ে গেল। ছোটবাবু বোটে লাফ দিয়ে পড়লে বনি অতি করুণ গলায় ডেকে উঠল, বাবা তোমরা আমাদের কোথায় পাঠিয়ে দিচ্ছ! বাবা আমি তোমাকে আর দেখতে পাচ্ছি না কেন!

ছোটবাবু আর বিন্দুমাত্র দেরি করল না। সে বোটের গুড়াতে মাস্তুল বসিয়ে দিল। তারপর সব রিং পরিয়ে পাল টানিয়ে দিল বোটে। লাল রংয়ের শালুর তেকোনা পাল, তুলে দিতেই হাওয়ায় টান ধরল। নিমেষে বোট চঞ্চল হয়ে উঠল। ছোটবাবু এক হাতে দড়ি সামলাচ্ছে, অন্য হাতে বোটের হাল ধরার জন্য ছুটে যাচ্ছে। পালের দড়ি দড়া আলগা বলে এক দিকে বোট একেবারে হাওয়ায় কাত হয়ে গেছিল। এবং সে দেখল, বনি প্রায় ছিটকে ওদিকে পড়ে গেছে। এবং এখন ওর এ-সব দেখার সময় নয়। ভীষণ দ্রুত সে দড়ি বোটের হুকে বেঁধে দিতেই এবার বোট সোজা হয়ে গেল। আর তখনই জাহাজের ডেকে স্যালি হিগিনস প্রায় দু'হাত আকাশে তুলে চিৎকার করে উঠলেন, এম্মানুয়েল—আমাদের সহিত ঈশ্বর। বনির গলার সেই অসহায় স্বর আর তিনি শুনতে চান না। বোট যত এগিয়ে যাচ্ছে, দূরে সরে যাচ্ছে তত তিনি চিৎকার করে হেঁকে যাচ্ছেন—এম্মানুয়েল, আমাদের সহিত ঈশ্বর। এম্মানুয়েল, আমাদের সহিত ঈশ্বর—বলতে বলতে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। তিনি হাঁটু মুড়ে রেলিঙের ধারে বসে পড়লেন—তারপর হা হা করে হারিয়ে যাওয়া ছোট শিশুর মতো মাঠে বসে যেন কান্না। সব হারিয়ে তিনি হা হা করে কাঁদছেন। সারেঙ সাব পাশে মাথা গুঁজে বসে আছেন। তিনি কি বলে সান্ত্বনা দেবেন বুঝতে পারছেন না।

॥ চুয়ান্ন ॥

পালে বাতাস লেগেছে। ছোটবাবু শেষবারের মতো দুর থেকে হাত তুলে হাঁকল, গুডবাই ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস, গুডবাই। আর সে তখনই দেখতে পেল এলবা উড়ে আসছে সাঁ-সাঁ করে। সোজা বোটের মাথায় বসে গেল। সে ফের তখন চিৎকার করে বলছে, চাচা, অপনি আমার জন্য ভাববেন না। ঠিক আমরা পৌঁছে যাব। এলবা বোধ হয় আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।

ছোটবাবু দেখল বনি তখন দু'হাঁটুর ভেতর মাথা গুঁজে দিয়েছে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। ছোটবাবু ডাকল, বনি প্লিজ—কি হচ্ছে বনি! পালে বাতাস লেগেছে, এলবা বোটের চারপাশে উড়ছে—এবং সে কখনও আকাশের ওপরে উঠে যাচ্ছে কখনও আবার নিচে নেমে এসে ঝুপ করে বসে পড়ছে বোটের মাথায়, বোট দুলে উঠছে—অসংখ্য সব ছোট ছোট, ঝাঁকে ঝাঁকে শোলমাছের বাচ্চার মতো কতসব বিচিত্র মাছ, এবং তার নিচে কোনো বড় মাছের ঝাঁক এই পাঁচ-সাত ফুট লম্বা এবং চারপাশে জলের নিচে এক ডিজনি-ল্যাণ্ডের মতো ব্যাপার। এত স্বচ্ছ যে একটু নিচে তাকালেই যেন সমুদ্রের অতল দেখা যায়। গুচ্ছ গুচ্ছ কখনও সব সবুজ শ্যাওলা—আর হয়তো অতিকায় কোনো প্রাণী ভেসে উঠলে জলের নিচে তার কালো ছায়া প্রথম ভেসে উঠবে—ছোটবাবু সমুদ্রের বিশালতায় কি আশ্চর্য রোমাঞ্চ বোধ করতে থাকল। মৃত্যু যতই অনিবার্যতার শামিল হোক—সে কেমন সাহস পেয়ে যাচ্ছে—জাহাজ যত চোখের ওপর থেকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছিল, যত সে বনিকে নিয়ে অকুল সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছে তত সে এক আশ্চর্য পৃথিবীর খবর পেতে চঞ্চল হয়ে উঠছে। সে হুকের সঙ্গে দড়ি বেঁধে ফেলল। বনির কান্না থামছে না। সে ওর পাশে হাঁটু মুড়ে বসল। নানভাবে বুঝিয়ে সে বনিকে শান্ত করতে পারছে না। বনি বুঝতে পেরেছে সব। এবং বনির কান্না ছোটবাবু একদম সহ্য করতে পারে না। সে শেষে ওর মুখ তুলে বলল, এই, আমি বুঝি, তোমার কেউ না!

বনি যেন কতকাল পর, কতদিন পর এক সাম্রাজ্য জয়ের অধিকারে সহসা ছোটবাবুর বুকে মুখ লুকিয়ে ফেলল। আর কি নরম সাবলীলতা রয়েছে সেই বলিষ্ঠ বাহুতে। যত ছোটবাবু সেই সমুদ্রে পাটাতনের ওপর আকাশের নিচে বনিকে বুকে টেনে নিচ্ছে যত ওকে আদর করছে, তত বনি ওর শরীরের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে, তত লতাপাতার মতো সে শরীরে জড়িয়ে যাচ্ছে এবং মসৃণ ত্বকের বর্ণমালায় ছোটবাবু ক্রমশ ডুবে যাচ্ছিল। বনি কি যে করছে! বনি তখনও ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বুঝি কাঁদছে—অথবা যুবতী হবার মুখে তার উপত্যকায় সত্যি বুঝি ফুল ফুটে যাচ্ছে—সেই যাতনা ফুলের, ফুল ফোটার যাতানায় বনির মুখে চোখে অধীর কুসুম কুসুম রঙ। পালে তেমনি বাতাস। সমুদ্রের জল কেটে কেটে বোট প্রায় উড়ে যাচ্ছে। আর ওদের মাথার ওপর এলবা উড়ছে। হঠাৎ বনি ওপরে এলবাকে দেখে পা গুটিয়ে ফেলল, এই, এলবাটা দেখছে। এস ভিতরে এস। বনি ছোটবাবুকে নিয়ে ছই-এর ভেতরে ঢুকে গেল।

তারপর বনি বলল, ছোটবাবু আমরা কোথায় যাচ্ছি? ছোটবাবু হাঁটুর কাছে মুখ নিয়ে বলল, জানি না বনি, আমরা কোথায় যাচ্ছি জানি না। তবু জানি এ-ভাবেই আমাদের সবাইকে কোথাও না কোথাও পৌঁছে যেতে হয়। সামনে কি থাকে আমরা কেউ জানি না।

বনি বলল, বাবা কোথায় যাচ্ছেন? বাবা আমাদের বোটে ভাসিয়ে দিল কেন?

ছোটবাবু বলল, তিনিও রওনা হয়েছেন। কোথাও যাবেন বলেই তিনি আমাদের ফেলে গেলেন এখানে। তারপর ছোটবাবু যেন এক অকূল সাগরে ভেসে যাচ্ছে। বলল, শৈশবে আমার পাগল জ্যাঠামশাই ছিল, ঈশম দাদা ছিল। ফতিমা, মা বাবা কত কি ছিল। এখন শুধু তুমি আছ। তুমি ভেঙে পড়লে আমার আর এতটুকু দাঁড়াবার জায়গা থাকবে না বনি।

এভাবে এক অধীর প্রাণপ্রবাহ সামান্য এই বোটে উদ্দাম হয়ে উঠেছিল। নিশীথে যখন নক্ষত্রমালা বিরাজমান আকাশে এবং খেলাচ্ছলে ওরা বোটের নিচে শুয়ে নিজেদের ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখছিল—পাখিটা তখন বোটের মাথায় পাখায় ঠোঁট গুঁজে রেখেছে। ওরা যখন পাশাপাশি

দাঁড়িয়ে জ্যোৎস্নায় সমুদ্রের অন্তহীন রহস্য খুঁজে বেড়াচ্ছে পাখিটা তখন বাতাসে ডাঙার গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে, ওরা যখন বোটের ভেতর রেশমের মতো নরম উলের বল নিয়ে খেলা করছে—আকাশের নক্ষত্রমালা তখন সব নিচে নেমে এসেছিল, চুরি করে দেখেছে ওরা কি যে এক অতীব সুন্দর বল ছুঁড়ে দিচ্ছে। মনে হয় এখুনি সেই নরম উলের বল বাতাসে উড়ে গিয়ে আকাশের দু'প্রান্তে দু'টো নক্ষত্র হয়ে যাবে। বনি বলছিল, ছোটবাবু আমার পৃথিবীতে আর কিছু লাগে না।

ছোটবাবু বলছিল, আমারও না।

ছোটবাবু বলেছিল, বনি ক্রসটা ভাসিয়ে দিচ্ছি। বোট হাল্কা হলে তাড়াতাড়ি ডাঙায় পৌঁছতে পারব।

বনি বলেছিল, দাও। ওটা আমাদের কোনো কাজে লাগবে না।

ছোটবাবু ক্রসটা নামিয়ে দেবার সময় কি ভেবে বলল, থাক। আছে যখন থাক। আগুন জ্বালানো যাবে।

বনি এবং ছোটবাবু এভাবে মৃত্যু এবং বিধাতাকে যখন অস্বীকার করে পৃথিবীতে ফিরতে চেয়েছিল—তখন স্যালি হিগিনস জাহাজে চুপচাপ শুয়ে আছেন। সারেঙ পাশে দাঁড়িয়ে বলছেন, সাব খাবার খান এ-ভাবেই নিশীথে জাহাজ ভেসে যায়। দিন যায় জাহাজে। আবার রাত আসে। আবার নক্ষত্র মালার নিচে জাহাজ ভেসে যায়।

হিগিনসের চোখেমুখে শুধু বনি, বনির সেই অবোধ মুখ। যত দিন যাচ্ছে কেবল সমুদ্রের ভেতর থেকে তার আর্ত কান্না শুনতে পাচ্ছেন—বাবা তোমার মুখ দেখতে পাচ্ছি না কেন, বাবা! তুমি আমাকে বোটে নামিয়ে দিচ্ছ কেন?

হিগিনস একদিন বললেন, তুমি খেয়েছ?

সারেঙ-সাব বললেন, খেয়েছি। আসলে কিছুই আর সারেঙ-সাব খাচ্ছেন না। আহার এবং পানীয় বলতে যা কিছু সব নিঃশেষ। এবং এই বোধহয় শেষ খাবার। সারেঙ-সাব চোখে ভাল দেখতে পাচ্ছেন না। তিনি শীর্ণকায় এবং অতীব দুর্বল হয়ে পড়েছেন। নিশিদিন স্যালি হিগিনস বিছানায় চুপচাপ শুয়ে আছেন। জাহাজটা মনে হচ্ছে নিশিদিন ছুটে যাচ্ছে কোথাও। সারেঙ-সাব টেবিলে শেষ জল এবং খাবার রেখে প্রায় হাঁটু মুড়ে নিচে বসে পড়লেন একদিন। চোখে আর কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। স্যালি হিগ্রিসকে কিছুতেই বুঝতে দিচ্ছেন না তিনি ক্রমশ দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলছেন। এবং বোধহয় বুঝতে পারছিলেন এই শেষবার তাঁর এ-ঘরে আসা। তিনি অন্ধকারে বাইরে বের হয়ে এলেন। ডেকের ওপর বসে দু'হাত বিধাতার কাছে প্রার্থনার মতো বিছিয়ে রাখলেন—মনে হচ্ছিল চার পাশে শুধু সীমাহীন অন্ধকার, এক অন্ধকার জগতে তিনি এখন বিরাজমান—এবং মাঝে মাঝে দু'টো একটা আয়াত তাঁর মনে আসছিল-কেয়ামতের দিন তিনি কি জবাব দেবেন তাঁকে, এ-সবই বার বার মনে আসছিল। এবং তখন জাহাজটাকে ভাবাই যায় না আর সাধারণ জাহাজ, কেমন নিশীথে সে বেশ ছুটে চলেছে। এই অন্ধকার আকাশ নক্ষত্রমালা আর সমুদ্র অতিক্রম করে তার কোথাও যেন এক অলৌকিক যাত্রা শুরু হয়েছে। তিনি বুঝতে পারছিলেন, সমুদ্র ফের প্রলয়ঙ্কর ঝড় নিয়ে ছুটে আসছে। তিনি স্থির এবং অবিচল। জলোচ্ছ্বাসে তিনি ভেসে যাবেন হয়তো, কোনো দুঃখ থাকছে না—তাঁর কাছে এখন এই জাহাজ, সমুদ্র, জলোচ্ছ্বাস সব সমান। তাঁর কাছে এখন বিশ্বস্ত থাকার চেয়ে বড় কিছু নেই। তাঁর শেষ আহার ভোজ্যদ্রব্য যা কিছু তিনি স্যালি হিগিনসের টেবিলে রেখে এসেছেন। কেয়ামতের দিন বিধাতার কাছে তাঁর এটাই একমাত্র জবাব—বিশ্বস্ততা। শুধু এই সম্বল নিয়ে তিনি আল্লার কাছে করুণা প্রত্যক্ষ করছেন এখন। এবং সেই জলোচ্ছ্বাসে নিঃশ্বাস ক্রমে বন্ধ হয়ে এলে কেমন নীল বিন্দু বিন্দু বেলুনের মতো উজ্জ্বল আলোর মালার ভেতরে তিনি যাত্রা করেছেন। তারপর তারা একে একে সবাই নিভে যেতে থাকল। জীবনের এক রহস্যময় যাত্রা থেকে অন্য এক রহস্যময় যাত্রায় তিনি আবার রওনা হয়েছেন। গভীর

বায়ুহীন আলোহীন এক জগৎ তাঁকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলল।

স্যালি হিগিনস ক্ষীণকণ্ঠে ডাকলেন, সারেঙ।

কোনো জবাব নেই। আবার ডাকলেন, সারেঙ।

শুধু হিস হিস সমুদ্রের তরঙ্গমালার শব্দ। জাহাজটা এবার যেন গতি পেয়ে গেছে। কোনো আলো নেই। আকাশে কোনো জ্যোৎস্না নেই। কোথায় কবে তিনি কোন জাহাজে উঠে এসেছিলেন মনে করতে পারছেন না—কেবল ঝড়ো বাতাসে জাহাজ দুলছে। আর বোধহয় সব তরঙ্গমালা জাহাজ ডেক ভাসিয়ে নিচ্ছে। ঝড়ের ভেতর তিনি বের হয়ে ডাকলেন—সারেঙ তুমি কোথায়? তুমি খাবে না?

শুধু অন্ধকার চারপাশে। নিরবছিন্ন অন্ধকার। আর আশ্চর্য তিনি আকাশের নক্ষত্রমালা দেখতে পাচ্ছেন না। আকাশে তবে এখন প্রলয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটে যাচ্ছে। যত জোরে সম্ভব দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকলেন। হাত পা কাঁপছে। শরীর মনে হচ্ছে শক্ত হয়ে গেছে। গলা কাঠ। শেষ জল এবং আহার সারেঙ রেখে চলে গেছে। সারেঙ বনির কেবিনে থাকত। সব ফাঁকা। কিছু নেই।

তারপর তিনি ফের শুয়ে পড়লেন এসে। তিনি বুঝতে পারছিলেন, জাহাজে এখন একা তিনি। জাহাজটা যা চেয়েছে পেয়ে গেল। সে তার বিশ্বস্ত আরোহীকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। তাঁর আর কোন দুঃখ থাকল না। তিনি জাহাজটার জন্য মায়া বোধ করলেন। জাহাজটা এখন নিশিদিন সমুদ্রে ভেসে বেড়াবে। তিনি এবং সে। সমুদ্রে তিনি এবং সে। এক অলৌকিক জলযানে তিনি সমুদ্রে ভেসে যেতে থাকলেন। এবং ক্রমে এভাবে দিন যায়। রাতে তিনি পোর্ট-হোলে আকাশের নক্ষত্র দেখতে পান, চাঁদের আলো এসে পড়ে—সমুদ্র নিথর নীরব, বর্ণহীন, গন্ধহীন। তিনি সাদা বিছানায় সাদা পোশাকে লম্বা হয়ে শুয়ে আছেন। শেষ খাবার আর জল টেবিলে। হাত তুলে খেতে পর্যন্ত পারছেন না।

হাত-পা ক্রমে এ-ভাবে ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। যেন অসাড় চোখ, স্থির বায়ুমণ্ডলে ভারী অক্সিজেনের অভাব। দু-হাতে তিনি সমস্ত বায়ুপ্রবাহ গিলে খেতে চাইছেন। পারছেন ন। কঠিন যন্ত্রণায় চোখ ঠেলে বের হয়ে আসছে। পাশে এখন কত সব মিছিলের মতো ছায়া এসে জড়ো হচ্ছে। এবং বার বার সেইসব শৈশবের মুখ, বাবা মা ছোট বোন, আর তারপর যৌবনে সেই প্রেমিকারা। কেউ কেউ ভারী অস্পষ্ট। তাদের তিনি চিনতে পারছেন না। কেবল তিনি দেখতে পেলেন এলিস পোর্টহোলে এসে দাঁড়িয়েছে। এবং দরজায় লুকেনার। আর আর কে আছেন, বনি ছোটবাবু তোমরা কোথায়—বনি বনি এবং বুঝতে পারছেন তিনি তাঁর অলৌকিক জলযানে এবার সত্যি আবার বের হয়ে পড়েছেন—কেউ তাঁর কথায় সাড়া দিচ্ছে না। এত কষ্ট এত যাতনা এবং স্থবির শরীর থেকে যেন শেষ বায়ুপ্রবাহ বের হয়ে যাবার আগে, সমস্ত ভূমণ্ডল জুড়ে প্রকম্পন। সবকিছু লণ্ডভণ্ড হয়ে যাচ্ছে। উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে লাভা। শিলাস্তর ভেঙে খানখান হয়ে যাচ্ছে গ্রহনক্ষত্রের। আহা ক্রমে সব আবার শিথিল স্থবির হয়ে আসছে—শান্তি, পরম শান্তির বাণী তাঁর কানে বাজছিল—কেউ যেন পাশে দাঁড়িয়ে আছেন—তাঁর হাতে সবুজ লণ্ঠন, লণ্ঠনের আলোয় সেই পরম করুণাময়, আশ্চর্য সুধাপারাবারের খবর পৌঁছে দিচ্ছেন তাঁর কানে। তিনি বলছেন, ডোনট বি অ্যাফরেড—আই অ্যাম দ্য ফার্স্ট অ্যাণ্ড আই অ্যাম দ্য লাস্ট। আজানু তাঁর সোনালী আলখাল্লায় ঢাকা। মাথায় বড় বড় সোনালী চুল। বড় বড় সব লাল নীল হলুদ অথবা ক্রিমসন কালারের আলোময় সৌরজগতের ভেতর দিয়ে তিনি হেঁটে যাচ্ছেন। এবং বার বার সেই অমোঘ বাণী, সব গ্রহনক্ষত্র থেকে যেন ভেসে আসছে। যত তিনি সেই অলৌকিক জলযানে ভেসে যাচ্ছেন সেই অমোঘ বাণী সব গ্রহনক্ষত্রের ভেতর গীর্জার ঘণ্টার মতো গমগম করে বাজছিল —ডোন্ট বি অ্যাফরেড, আই অ্যাম দ্য ফাস্ট অ্যাণ্ড আই অ্যাম দ্য লাস্ট।

সিউল-ব্যাংক জাহাজ নীল আকাশের নিচে ঘুরে ঘুরে কখনও অন্ধকারে, অথবা সাদা জ্যোৎস্নায় অজানা সমুদ্রে এভাবে ভেসে যাচ্ছিল। তার প্রিয় ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস ভেতরে

শুয়ে আছেন। সাদা চাদরে ওঁর শরীর ঢাকা। পোর্ট-হোলে তেমনি সূর্যের আলো, কখনো সমুদ্রের জল, কখনও সব নক্ষত্রমালার ছবি।

অসীম সমুদ্রে সিউল-ব্যাংক এখন একটা ভাসমান কফিনের মতো। নীল আকাশের নিচে নীল অন্ধকারে সাদা জাহাজটা এখন শুধু একজন ক্যাপ্টেনের কফিন। আর কিছু না। ক্যাপ্টেন স্যালি হিগিনস যেন ভেতরে শুয়ে আছেন। ঘুমিয়ে আছেন। ভেসে যাচ্ছেন তাঁর প্রিয় অলৌকিক জলযানে। যেন বলছেন, গ্লোরি হ্যালেলুজা আই অ্যাম অন মাই ওয়ে।

*****

পরিচিতি

জন্ম ১৩৩৭ ঢাকা জেলার রায়নাদি গ্রামে। বাবা অভিমন্যু বন্দ্যোপাধ্যায়, মা লাবণ্যপ্রভা দেবী। যৌথ পরিবারে তার শৈশব কৈশোর অতিবাহিত। দেশভাগের পর ছিন্নমূল। এদেশে এসে প্রবেশিকা পরীক্ষা। কাশিমবাজারের মনীন্দ্র কলোনিতে পৈতৃক বাড়িতে কিছুকাল থিতু হয়ে থাকা। তারপর যাযাবরের মতোই প্রায় কেটেছে যৌবন। যখন যে কাজ পেয়েছেন আনন্দে গ্রহণ করেছেন। ১৯৫৬ সালে বি.কম পাস করেন, বি.টিও পাস করেন। কখনো নাবিক রূপে সারা পৃথিবী পর্যটন, কখনো ট্রাক ক্লিনার। পরে প্রাথমিক স্কুলে শিক্ষকতা, প্রধান শিক্ষক ছিলেন একটি সিনিয়র বেসিক স্কুলের। আবার ঠাই বদল প্রধান শিক্ষকের কাজ ছেড়ে 1963 সালে পাকাপাকিভাবে চলে আসেন কলকাতায়। কখনো কারখানার ম্যানেজার, কখনো প্রকাশনা সংস্থার উপদেষ্টা।

শেষে সাংবাদিকতা। প্রথম গল্প বহরমপুরের অবসর পত্রিকায় সমুদ্র মানুষ লিখে পান মানিক স্মৃতি পুরস্কার। ১৯৫৮ বঙ্কিম পুরস্কার পান দুই ভারত বর্ষ উপন্যাসের জন্য। ১৯৯৮ পঞ্চযোগীনির জন্য, ১৯৯৩ সালে ওয়ার্ল্ড কাপ পুরস্কার, ১৯৯১ সালে পুরস্কার তারাশঙ্কর স্মৃতি পুরস্কার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় এবং সুধা পুরস্কারেও সম্মানিত। ২০০১ সালের সাহিত্য একাডেমী পুরস্কার পান তার ৫০ টি গল্পের জন্য।

২০০৫ সালে শরৎ পুরস্কার এবং ২০০৮ সালে আইআইপিএম কর্তৃক প্রবর্তিত সুরমা চৌধুরী আন্তর্জাতিক স্মৃতি পুরস্কার পান নীলকন্ঠ পাখির খোঁজের জন্য, সাম্মানিক মূল্য ১০ লক্ষ টাকা। তার উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে, মানুষের ঘরবাড়ি, অলৌকিক জলযান, ঈশ্বরের বাগান, আবাদ, ঝিনুকের নৌকা, দুই ভারত বর্ষ, নগ্ন ঈশ্বর, একটি জলের রেখা, শেষ দৃশ্য, দেবী মহিমা, মানুষের হাহাকার, টুকুনের অসুখ, জীবন মহিমা প্রভৃতি।

নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে সিরিজের তৃতীয় পর্ব অলৌকিক জলযান উপন্যাসটির পরিমার্জিত অখন্ড সংস্করণ প্রকাশ উপলক্ষে কিছু প্রাসঙ্গিক কথা। যেমন উপন্যাসটি সাপের দশকের মাঝামাঝি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় অমৃত সপ্তাহি কে যেমন এই উপন্যাসের প্রাথমিক সূত্র পাওয়া যাবে লেখকের ফ্রেন্ডশিপ গল্পে পঞ্চাশের দশকে উত্তর কাল নামে বহরমপুর থেকে প্রকাশিত লিটিল ম্যাগে গল্পটি ছাপা হয়। পরে এই গল্পের সূত্র ধরেই একটি ক্ষুদ্র উপন্যাস ও রচনা করেন তিনি। যেহেতু নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে সিরিজ লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ফসল অনন্ত অসীম সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালায় জাহাজের নাবিক হয়ে যেহেতু পৃথিবীর প্রায় সব সমুদ্রেই বিচরণ করেছেন তিনি যেহেতু নাবিক জীবনের সেই লৌকিক অলৌকিক উপলব্ধি জাত বিস্ময় তার জীবনেরই এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা তাই এই বিস্তীর্ণ উপন্যাসে সেই দুঃসাহসিক সমুদ্রযাত্রার কথাই উঠে এসেছে। নীলকন্ঠ পাখির খোঁজে সোনা তাই এই পর্বে জাহাজের ছোট বাবু।